রম্যাঁ রলাঁ

ভারতবর্ষ

(INDE)

দিনপঞ্জী (১৯১৫-১৯৪৩)

ফরাসী থেকে অনুবাদ
অবন্তীকুমার সান্যাল

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব।কলিকাতা-৭৩

বাংলা অনুবাদস্বত্ব ঃ   র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ   ১৯৬০

প্রকাশক ঃ   প্রসূন বসু
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর ঃ   বিকাশ হাজরা
বিষ্ণু প্রিন্টিং হাউস
৩৮/১এ হরিতকী বাগান লেন/কলিকাতা-৬

বিজ্ঞপ্তি

রম্যাঁ রলাঁর দিনপঞ্জী থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ক প্রতিটি অংশ এবং সেই ভাবে একই বিষয়ের অন্য কোনো কোনো অংশ নিয়ে এই গ্রন্থটি গড়ে উঠেছে।

দিনপঞ্জীটি, সমগ্রভাবে, কতটি স্থূলকায় খণ্ডে শুধু আত্মপ্রকাশ করতেই আগামী পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে বলে, আমাদের মনে হয়েছে,—অংশগুলো যখন রম্যাঁ রলাঁর এবং বিষয়টি ভারতবর্ষ,—তাদের একটি বিষয়ে একত্র করলে, এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হবে।

মারী রম্যাঁ রলাঁ

—এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সীমিত সংখ্যায়, এদিশিয়ঁ ভিনত্‌, বাল-লোজান থেকে ১৯৫১ সালে।

সূচিপত্র

দিনপঞ্জী

১৯১৫ ... ... ১৭
১৯১৬ ... ... ১৯
১৯১৭ ... ... ২০
১৯১৯ ... ... ২২
১৯২০ ... ... ২৩
১৯২১ ... ... ২৫
১৯২২ ... ... ৩৩
১৯২৩ ... ... ৩৮
১৯২৪ ... ... ৫৪
১৯২৫ ... ... ৭৯
১৯২৬ ... ... ৯৮
১৯২৭ ... ... ১৬৮
১৯২৮ ... ... ২০৬
১৯২৯ ... ... ২৩২
১৯৩০ ... ... ২৩৮
১৯৩১ ... ... ২৬৩
১৯৩২ ... ... ৩২৫
১৯৩৩ ... ... ৩৬৭
১৯৩৪ ... ... ৩৯৫
১৯৩৫ ... ... ৪১৩
১৯৩৬ ... ... ৪৩৩
১৯৩৭ ... ... ৪৩৪
১৯৩৮ ... ... ৪৪১
১৯৩৯ ... ... ৪৪৭
১৯৪০ ... ... ৪৫১
১৯৪১ ... ... ৪৫১
১৯৪২ ... ... ৪৫২
১৯৪৩ ... ... ৪৫২

পরিশিষ্ট ক

ভারতবর্ষের সংবাদ :

১. ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের যুদ্ধ ঘোষণা … ৪৫৩
২. রাজা আটকেছেন … … ৪৬২
৩. 'বিপ্লব',—অদৃশ্য নেতা … … ৪৭২
৪. মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি … … ৪৮২

পরিশিষ্ট খ

১. অনশনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী … ৪৮৮
২. হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর মাধ্যমে ঐক্যের পথে ভারতবর্ষ … ৪৯০
৩. ক. অস্পৃশ্যদের জন্য অনশন সম্পর্কে গান্ধীর বিবৃতি … ৪৯৩
খ. ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে টীকা … ৪৯৫
৪. কলকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী (মে ১৯৩৩) … ৪৯৭
৫. জহরলাল নেহেরুর বিবৃতি : প্রাকৃতিক ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক ভূমিকম্প … ৫০০
৬. ২ নভেম্বর (১৯৩৩), শুক্রবার রম্যাঁ রলাঁ ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপচারী … ৫০৪
দ্বিতীয় আলাপচারী : বিদায় সাক্ষাৎকার … ৫১০
৭. আনন্দকুমার স্বামীর 'লা দাঁস দ্য শিভ' গ্রন্থের মুখবন্ধ … ৫১২
৮. 'ওয়ার্ডস অফ দ্য মাস্টার' গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ … ৫১৮
৯. জাঁ এরবেরকে লেখা দুটি চিঠি … ৫১৯
১০. "জীবই শিব" ; শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে ফ্রান্সের এক তীর্থযাত্রীর অর্ঘ … ৫২১
রম্যাঁ রলাঁর জীবন ও কর্মের কাল-পঞ্জী … ৫২৫
নির্ঘণ্ট … ক-ট

১৯১৫

ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। —এক ভারতীয় লেখক, ইংলন্ডে বাস করেন, ইংলন্ডেই বিয়ে করেছেন নাম ডঃ আনন্দকুমার স্বামী ; আমাকে একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রবন্ধ উৎসর্গ করেছেন, সেটি পাঠিয়েছেন ব্রিট্‌ফোর্ড (স্যালিসবেরি) থেকে : 'ভারতবর্ষের জন্যে এক বিশ্বরাজনীতি' (প্রকাশিত হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর, ১৯১৪, 'নিউ এজ' পত্রিকায়)। —তা থেকে কয়েকটি পংক্তি তুলে রাখছি :

"ভারতীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজ রেসিডেন্টদের সৃষ্টি, ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলোর মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তারা তাদের প্রভুদের কলহ-বিবাদে অন্ধভাবে সমর্থনে অভ্যস্ত—একথা যারা ভুলে যায়, তারাই নিজেদের এই ভেবে ধোঁকা দিতে পারে যে, ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির পক্ষে আছে। অন্যদিকে একথা সন্দেহাতীত যে, যে-ভারতীয়রা ইংলন্ডে বাস করে, তারা নিজের-ব'লে-গ্রহণ-করা দেশটিকে ভালবাসে। ভারতবর্ষে চিঠিপত্র পোস্টাফিসে খুলে দেখা হয় এবং শান্তির সময় বিনাবিচারে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়, একথাটি যদি ভাবা যায়, তাহলে এতে আশ্চর্যের কী আছে ! আমি অবশ্যই বলবো যে, নতুন ক'রে ইউরোপ-বিভাগে এমন এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংশ্রব নেই। আমাদের জাতিগত আদর্শ বিপদগ্রস্ত না হওয়ায় মানবতার আদর্শ পরিত্যাগ করার জন্যে জার্মান অথবা মিত্র শক্তিদের অজুহাত আমাদের নেই। আমরা যারা বিশ্বাস করি, মানুষকে আরও শিল্পী, আরও প্রেমময় এবং আরও প্রাজ্ঞ ক'রে তোলা ছাড়া সভ্যতার আর কোন লক্ষ্য নেই, আমাদের চিন্তার স্বাধীনতাকে আপোষ করাতে ইউরোপীয় চিন্তাশীলদের অজুহাতও আমাদের নেই। হতে পারে, দুটি মন্দের মধ্যে আমাদের কাছে কম মন্দ ইংলন্ড ; হতে পারে, এই যুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের কাজে লাগবে···কিন্তু আমাদের স্থায়ী স্বার্থের সঙ্গে এই সবকিছুর সোজাসুজি সম্পর্ক নেই...ইউরোপের এই যুদ্ধ পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সংকটকে চিহ্নিত করছে। এ খ্রীষ্টধর্মের আনুগত্যহীনতা এবং ভন্ডামিকে দেখিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের সংস্কৃতি আবার নতুন ক'রে গড়ে ওঠার মুখে। যুদ্ধের পর ইউরোপ সৃষ্টিধর্মী কর্মের একটি পর্বে পা দেবে, অথবা অবশেষে, পূর্ববর্তী যুগের আবিষ্কৃত সত্যগুলোকে তার বহির্জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। সেটা হবে উপনিষদ এবং বুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো কিছু। সে-কাজটি আংশিক হতে পারে না ; সেখানে এশিয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। সমরবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, শিল্পযোজনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে অবলুপ্ত হবে এবং এশিয়ায় তা বেঁচে থাকবে—তা হতে পারে না। তাই ভারতবর্ষকে জগৎসভায় তার ভূমিকা পালন করতে হবে। এই মুহূর্তে হৃদয় ও মনের এক বিশ্বযুদ্ধ, এক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম (Kulturkamp) চলছে, যা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে মানবতার সত্তা। এবং এজন্য আমাদের

ভারতীয়দেরও অংশ গ্রহণ করতে হবে। সন্দেহ নেই, আধুনিক ভারতবর্ষকে মনে হয় মৃত ; এর আত্মা নেই, চরিত্রও নেই। কিন্তু এই আত্মা ও চরিত্রকে নতুন ক'রে খুঁজে পাবার জন্যে নিজের জীবন এবং নিজের সুখ ছাড়া অন্য জিনিস খুঁজে পেতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ দিয়েই শুধু সে নিজেকে ফের খুঁজে পাবে। সে যেন ভারতীয়দের জন্যে কাজ না করে, ইংরেজের বিরুদ্ধে না করে, যেন করে সমস্ত মানুষের জন্যে এবং ইউরোপকে দেয় মন্দের বদলে ভালোকে ! এই মুহূর্তে সে যদি সৃষ্টিধর্মী নাও হয়, অন্তত পক্ষে তার আছে অতীতের প্রাজ্ঞতা ; তার হাতের মুঠোয় আছে শান্তির বিজ্ঞান, যা নিষ্ক্রিয়তাকে দৃঢ়মূল করা দূরের কথা, অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিল মনকে হানাহানির ঊর্ধ্বে রেখে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করতে এবং তাকে দেখিয়েছিল জীবনের ক্ষণস্থায়ী আত্মশ্লাঘা আর নিষ্কাম সংগ্রামের প্রয়োজনকে। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বিশ্বজগতের গভীরতম দর্শনকে সূত্রবদ্ধ করেনি, দর্শনের এবং প্রেমের ভিত্তির উপরে এক সামাজিক অবয়ব, ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাসনবাদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। ইউরোপে শিল্পী, পরিত্রাতা এবং দার্শনিকেরা কার্যকর ব'লে গণ্য হননি একমাত্র এই কারণে যে, যাঁরাই এই দাবি করেছেন, তাঁরা পথপ্রদর্শকদের অনুসরণ করার কথা ভাবেননি : এই জন্যেই ইউরোপের বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস হয়েছে লক্ষ্যহীনভাবে সামনে এগিয়ে চলার একটা পদক্ষেপ। ইউরোপের ধর্ম কোন্ কর্ম সাধন করেছে ? শান্তির সময়ে যেমন, যুদ্ধের সময়েও তেমনি, ইউরোপীয় সমাজের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে নিজেই নিজেকে অপরাধী করেছে। তার ধর্ম খণ্ডকালের ধর্ম…খণ্ডকালের ধর্মে ঈশ্বর, আমার নিকটতম জন এবং আমি মিলে হই তিন ; আর অনন্তকালের ধর্মে তারা শুধুই এক। এই অনন্তকালের ধর্ম যা খাঁটি খ্রীষ্ট, লাও-ৎসে, উপনিষদ এবং ভাগবদগীতারও ধর্ম—এ ছাড়া শান্তিকে লাভ করতে পারা যায় না। সময় এসেছে যখন ইউরোপ নিজের মধ্যে এই অনন্তকালের ধর্মকে আবিষ্কার করবে…আমি জানি না ইউরোপ সম্পূর্ণ একা সেই পথটি খুঁজে নিতে পারবে কি না, যা তাকে ওখানে নিয়ে যাবে ; কিন্তু আমি জানি, আমাদের সাহায্য নিতে তার খুব বেশি বিমুখতা নেই, খুব বেশি অহংকারও নেই এবং আমরা যদি তার সঙ্গে নাও থাকি, তার বিরুদ্ধে যাবো না…আমাদের এক বিশ্বরাজনীতি আছে ; এবং তাকে অনুসরণ করেই আমরা আমাদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করবো ; এবং গভীরতম যা কিছু আছে, বিশেষ ক'রে আমাদের দর্শন আমাদের আবেগ, আমাদের সংগীত - সবকিছুই জগতকে দিতে হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে, ভারতবর্ষের যাই ঘটুক না কেন তার মূল্য সামান্য, যদি অবশ্য তার ফলগুলো উর্বর মাটিতে পড়ে। সভ্যতা পৃথিবীর এক অংশ থেকে অন্য অংশে চালান দেবার বস্তু—যা ইংরেজ অথবা জার্মান সমস্ত সাম্রাজ্যের গতানুগতিক অজুহাত—এই ধারণাকে আমাদের ভেঙে দিতে হবে ; একই সঙ্গে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এক নতুন মানবতা, স্থানভেদে বিচিত্র এক সংস্কৃতি—কিন্তু যা হবে মুখ্যত সকলের সভ্যতা এবং সকলের সচেতন সৃষ্টি—তারই বিবর্তনের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই ধারণাকে স্থানচ্যুত করতে হবে।" (মাদলিন রলাঁকৃত সারাংশ তর্জমা)।

এটা পাঠানোর সূত্র ধরে কয়েকটা চিঠি লেখালিখি করলাম। আনন্দকুমার স্বামীর

কাছ থেকে দুটি গ্রন্থ পেলাম : 'ভাগবদগীতা'র একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং 'দি আর্টস্ অ্যান্ড ক্র্যাফটস্ অব ইন্ডিয়া এন্ড সিলোন' নামে তাঁর একটি সুন্দর রচনা।—চিত্রিত পৃষ্ঠাগুলো ওলটাতে ওলটাতে এক পরমানন্দ অনুভব করলাম। এই জগৎ এতো ঐশ্বর্যশালী, এতো সমৃদ্ধ! আমার বুকটা ফেটে পড়ে। একে ধারণ করার পক্ষে বুকটা এতো ছোটো—যদি জীবনের আরও ১০ কি ২০ টি বছর আমাকে দান করা হয়, তাহলে আমার জাতের চিন্তাকে আমি নিয়ে যেতে চাইবো পৃথিবীর উচ্চ মালভূমিতে, যার চোখের দেখাও সে পায়নি।—হে ভগবান! জীবন এতো হ্রস্ব। যখনই চাবি-কাঠিটি হাতে আসে, যা দিয়ে সেই বাগানের দরজাটা খোলা যায়,—যে-বাগান থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন আদম ও ইভকে বিতাড়িত করা হয়েছিল,—তখনই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে…

১৯১৬

অক্টোবর, ১৯১৬।—যেমনটি আশা করা গিয়েছিল· এশিয়াবাসীরা ইউরোপের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। গত ১৮ জুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি জাপানকে ইউরোপের সভ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

"…জাপান এশিয়ার অগ্রদূত হয়ে উঠেছে ; নতুন পথে তাকে অনুসরণ করতে সে এশিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছে…কিন্তু হে জাপানবাসীগণ, আপনারা এই আধুনিক সভ্যতাকে ঠিক যেমনটি আছে তেমন ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না ; আপনাদেরই তার রূপান্তর ঘটাতে হবে, যার দাবি জানাচ্ছে আপনাদের প্রাচ্য প্রতিভা। আপনাদের দায়িত্ব বিরাট। আপনাদেরই প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে সেখানে, জীবন যেখানে শুধুই যান্ত্রিকতা ; স্বার্থের প্রাণহীন হিসাবনিকাশের বিকল্প স্থাপন করতে হবে ; এক সমন্বিত জীবন্ত বিকাশকে সত্যকে সৌন্দর্যকে অভিষিক্ত করতে হবে সেখানে, যেখানে চরম প্রভুত্ব করে শক্তি ও সাফল্য। ইউরোপ থেকে যে সভ্যতা আমাদের কাছে এসেছে তা সর্বগ্রাসী এবং প্রভুত্বকামী ; যে-মানুষদের এ আক্রমণ করে তাদের নিঃশেষ ক'রে ফেলে, এর অভিযানে যে-জাতিই বাধাসৃষ্টি করে তাকেই ধ্বংস করে অথবা নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। এ এক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সভ্যতা, এর প্রবণতা নরখাদকের ; এ দুর্বলকে পীড়ন করে এবং তার ধনেই সম্পদশালী হয়। এ এক নিষ্পেষণের যন্ত্র। এ সর্বত্র ঈর্ষার, মতানৈক্যের বীজ বপন করে, তার সামনে সৃষ্টি করে শূন্যতা। এ এক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, মানবিক সভ্যতা নয়। এর শক্তি এসেছে এই থেকে যে, সে তার সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে নিজেকে সম্পদশালী করার একমাত্র লক্ষ্যের দিকে, ঠিক যেমনটি করে এক কোটিপতি—যে নিজের আত্মার মূল্যে আত্মসাৎ করে প্রচুর বিত্ত। দেশপ্রেমের নামে সে দেওয়া প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে ; নির্লজ্জভাবে সে মিথ্যায়-বোনা জাল ছড়ায় ; যে-দেবতাকে সে পুজো করে সেই 'লাভের' নামে তৈরি মন্দিরে মন্দিরে অতিকায় আর দানবীয় সব প্রতিমূর্তি খাড়া ক'রে। কোনো দ্বিধা না ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, এই সবকিছু চিরদিন টিকবে না, কেননা সংসারে একটি সার্বভৌম নৈতিক বিধান আছে—যা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সমষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনই

প্রযোজ্য। কোনো একটি জাতির নামে এই বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে চলতে—এবং যারা এই বিধানকে মানে তাদের যে সুযোগ এ নিশ্চিত করে, তা ব্যক্তিগত ভাবে একই সঙ্গে ভোগের আশা করতে—পারা যায় না। নৈতিকতার সমস্ত আদর্শকে এইভাবে ধ্বংসের চেষ্টা সমাজের প্রতিটি মানুষের উপরে প্রতিক্রিয়ায় শেষ হয়, দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের দিকে নিয়ে যায়, গোপনে গোপনে অবিশ্বাস এবং ধৃষ্টতার জন্ম দেয়··· বিধির বিধানের বিরুদ্ধে এ এক বিদ্রোহ, এ শুধুই শেষ হতে পারে এক চরম বিপর্যয়ে···”

(এই বক্তৃতাটি—যা মানুষের ইতিহাসের একটি বাঁককে চিহ্নিত করেছে এবং ইউরোপের কোনো বড় সংবাদপত্রে যার একটি কথারও স্থান হয়নি,—পুনর্মুদ্রিত হয়েছে নিউ-ইয়র্কের 'দি আউটলুক' পত্রিকায় ৯ আগস্ট, ১৯১৬ তারিখে।)

এসব খুবই ঠিক; কিন্তু জাপানকে অবশ্যই এতে তার অংশ গ্রহণ করতে হবে।

কী আসে যায়! যেমনটি আমি জি. দ্যুপ্যাঁকে লিখেছি, আমি ভবিষ্যতকে ভয় পাই না। ফ্রান্স ও জার্মানীর মুকুটধারী ব্রাহ্মণদের চাইতে খ্রীষ্ট বুদ্ধের অনেক কাছাকাছি।

১৯১৭

মার্চ, ১৯১৭। —আবেগদীপ্ত হৃদয়সংবাদী চিঠি এসেছে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ভারতীয়ের কাছ থেকে (গৌরীপুর, আসাম, ই. ডি. এস. আর, ভারতবর্ষ, —৩১ জানুয়ারি)। তিনি সদ্য 'জাঁ-ক্রিসতফ' পড়েছেন; এবং আমার তরুণ জাপানী বন্ধুর মতো পশ্চিমের এই দর্পণে নিজেকে চিনতে পেরেছেন। হৃদয়ের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সাক্ষ্য। —যেদিন' তিনি লিখেছেন, চিঠির মধ্যে সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনটির মনোমুগ্ধকর বর্ণনা—বর্ণনা শব্দের, গন্ধের, বর্ণের।

আমি তাঁকে উত্তর দিলাম:

“সুদূরের বন্ধু,—আপনার সহৃদয়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আনন্দিত, আমার 'জাঁ-ক্রিস্তফ' আপনার মনে এতো সাড়া জাগিয়েছে। আমার কাছে এটা হৃদয়ের বিশ্বজনীন সমধর্মিত্বের আরও একটা প্রমাণ। এই সমধর্মিত্বে আমি বিশ্বাস করি এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত জাতির মানুষের মধ্যে এরই গভীর চেতনা সৃষ্টির জন্যে কাজ করি। একেবারে বিশেষভাবে, কয়েক বছর যাবৎ আমি অনুভব করছি ইউরোপের ভাবনার সঙ্গে এশিয়ার ভাবনার মিলন ঘটানোর জরুরী প্রয়োজনটি। নিজের জন্যে একা একা কেউ যথেষ্ট নয়। এরা চিন্তার দুই গোলার্ধ। এদের আবার এক হতে হবে। এই হোক্ আগতপ্রায় যুগের মহৎ উদ্দেশ্য। যদি তরুণ হতাম, আমি নিজেই এতে নিজেকে উৎসর্গ করতাম। ভবিষ্যতের যে-সভ্যতা মানবহৃদয়ের দুই অর্ধের মিলনকে বাস্তব ক'রে তুলবে, আগে থেকেই তার সম্পূর্ণতার আস্বাদের আনন্দে আমি পরিতৃপ্ত। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করি, কারণ, অনুভব করি, তাঁর মধ্যে এখনই এই ঐকতান ঝঙ্কৃত হচ্ছে। আপনাকে ঘিরে আছে যে-আলো—আপনি যখন তার বর্ণনা করেন,

আপনার পংক্তিগুলোর মধ্যে যাকে দেখতে পাই—ভারতবর্ষের সেই আলো আমার দুই চোখ (আমার মনের মতোই) যেন একদিন পান করে।

এপ্রিল, ১৯১৭। —'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ('দি উওম্যানস ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ লিগ, আমেরিকান অরিয়েন্টাল ব্রাঞ্চ, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ উইমেন' কর্তৃক প্রকাশিত, ২৩৮৮ চ্যাম্পলিন স্ট্রিট, ওয়াশিংটন) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার ধারণার অতিনিকট-সম্পর্কিত ধারণা : জাতি ঐক্য—সদ্য সদ্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখছেন, পৃথিবীজোড়া মানুষ ঐক্যের জন্য আকুল আগ্রহী, অথবা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেইদিকে চালিত। সময়টা চমৎকার। "সমগ্র ইতিহাসের এ সবচেয়ে বড় যুগসন্ধিক্ষণ।" এই সর্বপ্রথম মানবজাতি নিজের সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বাস্তব যুদ্ধে মোটেই নিরুৎসাহী নন, এর মধ্যে তিনি তাঁর ধারণার নঞর্থকতাও দেখেন না। তিনি বলেছেন : "সমস্ত বৃহৎ আন্দোলনের মধ্যেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে। যুদ্ধ কেবলমাত্র নঞর্থক দিক, মননের প্রতিরোধের অভিব্যক্তি, জাতিগুলোর মধ্যে প্রাথমিক সংকীর্ণ সংযোগের ফলে অবশ্যম্ভাবী অভিঘাত। এ এক অস্পষ্ট উষা, এরই মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে ঐক্য, শান্তি এবং আলো।" রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন আধুনিক সভ্যতাকে, যাকে জড়বাদ পীড়ন করছে। তিনি তাকে তুলনা করেছেন এক বিরাট জিরাফের সঙ্গে; বুদ্ধিমত্তা বেড়ে উঠেছে এক সামঞ্জস্যহীন ধরনে, আর হৃদয় থেকে তা বিচ্ছিন্ন; সমস্ত দেহটা ক্ষীণ। আধুনিক জাতিরা মূর্তিপূজক; তাদের মূর্তি শক্তির। সভ্যতা সৃষ্টি করছে এক বিশাল যন্ত্র, "এক যথার্থ ফ্র্যাংকেনস্টিন (শ্রীমতী শেলীর উপন্যাস), লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসীর ধ্বংসের মধ্যে প্রতীকীকৃত।" কিন্তু, এই জড়বাদী চরম সংকট থেকেই বেরিয়ে আসবে ইতিহাসে নজিরহীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি যুগারম্ভ। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার কাছ থেকে অনেক আশা করেন। তাকে জাতিগুলোকে সমন্বিত করতেই হবে। তাকে হতে হবে বিরাট একটা পরীক্ষাগার, যেখানে মানবজাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তিনি ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বৈষম্য দেখিয়েছেন ভারতীয় মানসের, সেখানে কখনো জাতীয় ঐক্যের জন্যে ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা না-ক'রে উদ্ভব হয়েছে অবিমিশ্রভাবে ব্যক্তিতাবাদী সভ্যতার। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ জাতিরূপে গঠিত মানুষদের অধীনস্থ হয়েছে; কিন্তু তার চিন্তা পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বাধীনই আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ দেখছেন ভারতবর্ষের দর্শনের মধ্যে ভবিষ্যতের পরিত্রাণ।

(এই সংক্ষিপ্তসারের শেষে মনে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক 'প্রিন্সের' ছেলে। মানুষ হয়েছেন কলকাতায়। ২৪ বছর বয়সে নিজের দেশে ফিরে গেছেন, তাঁর গ্রন্থগুলো লিখেছেন, বিশেষ ক'রে লিখেছেন অনেক জনপ্রিয় বাংলা গান। লোকে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, সেগুলো

ইংরেজিতে তর্জমা করার পর ইংলন্ডের মুষ্টিমেয় লোক ভারতবর্ষের (মাটির মানুষদের) মতোই তাদের নিজেদের চিনতে পেরেছে)।

১৯১৯

১৩ এপ্রিল, ১৯১৯।—ফ্রেডেরিক ভান ইডেন ছিলেন ওলন্দাজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উৎসাহী অনুবাদক ; তাঁর কবীরের উপরে লেখা বইটি তিনি সবার চেয়ে পছন্দ করেন। (এই পারসীক কবির মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার খাঁটি প্রেরণা দেখতে পান।) তাঁর চিন্তা গভীরভাবে খ্রীস্টীয় হলেও প্রাচ্য প্রভাবে নিষিক্ত। উপনিষদগুলোর মধ্যে পবিত্রতম উৎস দেখতে দেরি হয় না, সেখান থেকেই বাইবেল বেরিয়ে এসেছে (তিনি বলেন, ভারতীয় গ্রন্থগুলো যদি না-জানা থাকে, বাইবেলের কিছু কিছু অপরিহার্য কথাবার্তা বোঝা যায় না)। এইরকমই তিনি লাওৎ-সের মধ্যে দেখেন আদিম খ্রীস্টান ধর্মের এক ধারাবাহককে, যিনি তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি শ্রীমতী এডির খ্রীস্টানী জ্ঞান বরদাস্ত করতে পারেন না, রুডলফ স্টেইনের ভন্ড-পাণ্ডিত্যও (charlatanism) পারেন না। কিন্তু তিনি আজকের কোনো কোনো মহৎ ভারতীয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস মানবতার সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পান।

জুলাই, ১৯১৯। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অত্যন্ত হার্দ সম্মতি* (২৬, জুন শান্তিনিকেতন)। তাঁর চিঠি যতটা মৌলিক বা বিশিষ্ট, তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

আগস্ট, ১৯১৯। —আমার কল্পনা আছে ইউরোপ ও এশিয়ার এক সাময়িক-পত্রের এবং এ বিষয়ে প্রথমে বলেছি রবীন্দ্রনাথকে (২৬ আগস্ট) :

তাঁর ২৪ জুনের চিঠি এবং দু'খানি গ্রন্থ 'ন্যাশনালিজম' ও 'ঘরে বাইরে' পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছি :

"ইউরোপ তার শক্তির যে ভয়ঙ্কর অপব্যবহার করেছে তার জন্যে, বিশ্বের এই ধ্বংস, এই বিনাশের জন্যে এবং এতো আধিভৌতিক ও নৈতিক সম্পদ, মানুষের মহত্তম শক্তিসমূহ—যাদের নিজের সঙ্গে এক ক'রে রক্ষা করা এবং বাড়িয়ে তোলাটাই তার নিজের স্বার্থ হওয়া উচিত ছিল—তার হাতে কলুষিত হওয়ার জন্যে—আমার এক গভীর যন্ত্রণা (বলা উচিত, অনুতাপ, যদি আমি নিজেকে ইউরোপীয় মনে করার চেয়ে মানুষ ব'লে বেশি মনে না ক'রে থাকি) আছে। সময় এসেছে প্রত্যাঘাত করার। এটা কেবলমাত্র ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়, এটা মানবতার পরিত্রাণের প্রশ্ন। —এই লজ্জাকর বিশ্বযুদ্ধ—যা ইউরোপের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করেছে—তার বিপর্যয়ের পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপ নিজেকে বাঁচানোর পক্ষে নিজে

'মনের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'-এ।

আর যথেষ্ট নয়। তার চিন্তায় প্রয়োজন আছে এশিয়ার চিন্তার, ঠিক যেমন এশিয়া ইউরোপের চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে লাভবান হয়েছে। এরা মানবতার মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধ। যদি একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, দেহের অপকর্ষ ঘটে। এদের মিলন ঘটানোর এবং সুস্থ বিকাশের জন্যে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন—আমি একাধিকবার গভীরভাবে চিন্তা করেছি এশিয়া ও ইউরোপের এক সাময়িক পত্র সম্পর্কে (স্বাভাবিক ভাবেই আমেরিকাকে আমি ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে গণ্য করেছি), যা ভ্রাতৃস্থানীয় এবং শত্রুস্থানীয় জগতের নৈতিক সম্পদগুলো প্রকাশ করবে। এ মোটেই রাজনীতির ব্যাপার হবে না, হবে চিন্তা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের ঐশ্বর্য। সমস্ত কিছু যুক্তভাবে রাখা হবে। আমার বিশ্বাস, ইউরোপের লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটা সেরা অংশকে পাওয়া কঠিন হবে না – যাঁরা এই জাতের একাধিক ভাষায় (অন্ততপক্ষে ইংরেজি ও ফরাসী এই দুই ভাষায়) প্রকাশিত সাময়িক পত্র সম্পর্কে অনুরাগী হবেন, এবং এর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যে-কার্যকর সাহায্য প্রয়োজন, এশিয়ার প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো থেকে এই পরিকল্পনা তা পেতে সমর্থ হবে? এটা শুধু একটা কল্পনা নয়; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি এ আজ অনেকের মনের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে; আর এইজন্যেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। যেদিন এ বাস্তবে পরিণত হওয়া শুরু হতে দেখবে, সেদিন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার সমাবেশের অভাব এর ঘটবে না।

১৯২০

২৩ আগস্ট, ১৯২০। —বাংলাদেশের এক তরুণ ভারতীয়, দিলীপকুমার রায়, দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে। আসলে তিনি কেমব্রিজের ছাত্র এবং তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণ নয়, কেননা, সাহিত্য ও সংগীতে সত্যকারের প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি সদ্য গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বয়সে তরুণ, মাথায় লম্বা এবং সুদর্শন গঠন, চুলগুলো খুব কালো আর কোঁকড়ানো, কিন্তু পাতলা, অপ্রচুর, গায়ের রং বর্ণসঙ্করের মতো কমলা-বাদামী, মুখের ছাঁদ কমনীয়, কেবল ঠোঁটদুটো সামান্য মোটা। তিনি শুধু ইংরেজিই জানেন, তার মধ্যে কিছু কিছু হাতড়ানো ফরাসী শব্দ; আমি ইংরেজি না-জানায় তিনি বেশ নিরাশ হলেন। কিন্তু আমার বোন দোভাষীর কাজ চালালেন। তাঁর বাবা ছিলেন কবি-নাট্যকার এবং বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত-রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। সোয়েনেকের বাগানের উপরে উপাসনাগারের কাছে একটা বেঞ্চিতে আমাদের পাশে বসে তিনি অনেকগুলো বিখ্যাত ভারতীয় রাগ-রাগিণী গেয়ে শোনালেনঃ কতকগুলো তাঁর বাবার এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা (ওগুলো বরং প্রাচীন বিষয়বস্তুর ভিন্ন রূপ), এবং শোনালেন ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর ধ্রুপদ রাগ-রাগিণী। সেগুলো আমাকে বড়ই মুগ্ধ করল। বিশেষভাবে করল মোগল সম্রাট আকবরের সভার সবচেয়ে বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা তানসেনের একটি ধর্মমূলক গান। এদের সঙ্গে আমি গ্রেগোরীয় রাগ-রাগিণীর অতি-নৈকট্য খুঁজে পাই এবং আরও বেশি পাই গ্রীক

স্তবগানগুলোর সঙ্গে, যারা ছিল গ্রেগোরীয় গানের মূল ; কিন্তু চমৎকার কুণ্ডলাকার কণ্ঠধ্বনিগুলো, সুরেলা পংক্তির চারপাশে যাদের ভাঁজ খোলাই শেষ হয় না, সেগুলো নিশ্চিতভাবে আরবের আদর্শে প্রভাবিত। আর তানসেনের প্রবলভাবে সক্রিয় এবং আবেগদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তা ভুলিয়ে দিতে পারে কি না, তা পরিষ্কার অনুভব করা যায় ১৭শ শতাব্দীর অপর বিখ্যাত সংগীত-রচয়িতার কাজের মধ্যে।

যখন লোক-সংগীতের সুরগুলো শোনা যায় তখন ভালো ক'রে অনুধাবন করা যায়, ভারতীয় জাতির নিখাদ প্রতিভা কোথায় ধরা পড়ে। মনোমুগ্ধকর, সূক্ষ্ম, প্রাণচঞ্চল, কাব্যময়, সুন্দর তালময় সেই গানগুলো দিলীপকুমার রায় গেয়ে শোনালেন, যেগুলো আমাদের কাছেও (স্বরসংযোগের ধ্বনিগুলো বাদে) লোক-সংগীত হতে পারতো। লোক-শিল্পকলা বিদগ্ধ শিল্পকলার চেয়ে সীমান্তগুলোকে অনেক কম স্বীকার করে, এইটেই চোখে পড়ে।

গভীর এক তিক্ততার সঙ্গে দিলীপকুমার রায় ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের কথা বললেন। তিনি আমাদের কাছে গান্ধীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন, ভারতীয়দের উপর তাঁর প্রভাব অসাধারণ। তিনি ছিলেন মাদ্রাজের ব্যবহারজীবী, ৭ কি ৮ বছর আগে তাঁর সমস্ত সম্পদ ত্যাগ ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন জনগণের জন্যে, যাদের উপর তিনি চুম্বকের মতো ক্রিয়া করেন। তিনি তাদের কাছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রচার করেন এবং তাদের হিংসা থেকে সরিয়ে রাখেন। ইংরেজরা তাঁকে অন্তরীণ করার পর বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মনে হয়, তিনি তলস্তয়ের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে তলস্তয় অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁর কোনো কোনো রচনা,—মহৎ উপন্যাসগুলো নয়—জনপ্রিয় গল্পগুলো, বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। দিলীপকুমার রায় বললেন, আমার নাম এবং আমার 'তলস্তয়ের জীবন' বাংলাদেশে জনপ্রিয়। আমার 'জাঁ-ক্রিস্তফ' সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, এবং তাকে তিনি তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরেজি সাহিত্যে তিনি সবার চেয়ে ভাল বাসেন টমাস হার্ডিকে (সবার চেয়ে 'টেস'-এর জন্যে) এবং ঘৃণা করেন কিপলিংকে। বাংলা ভাষায় সেক্সপিয়রের অনুবাদ হয়েছে—তিনি জার্মান সাহিত্যের কিছুই জানেন না, ফরাসী সাহিত্যেরও খুবই কম জানেন।

ভারতবর্ষে আমার 'জাঁ-ক্রিস্তফ'এর যা সবচেয়ে পছন্দ তা হচ্ছে 'বয়ঃসন্ধি,' 'আঁতোআনেৎ' এবং 'ল্য ব্যুইস'নারদাঁ'। এ মোটামুটি আমার পছন্দের কাছাকাছি। জাতিগত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে সরলতম এবং গভীরতম অনুভূতির বিশ্বজনীনতা দেখতে পাওয়াটা কৌতূহলজনক।

দিলীপকুমার রায়ের মাতামহ* ছিলেন অতি বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক এবং একই সঙ্গে ছিলেন প্রদেশপাল। বাবা ছিলেন একাধারে সংগীত-রচয়িতা এবং সরকারী কর্মচারী। ভারতবর্ষে পেশাদার সংগীত-রচয়িতা কেউ নেই—অথবা আর নেই।—তাছাড়া, সংগীত লেখা হয় না বা ছাপা হয় না ; এ মুখে মুখে ফেরে এবং এইভাবে

---

*তথ্যগত ভুল। পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন গায়ক এবং কৃষ্ণনগর রাজের দেওয়ান—অনু

এ আদিম রাগ-রাগিণীর নিরন্তর গুণ পরিমাণের, পরিবর্তনের, বা ভিন্নতার বশবর্তী হয়েছে।

দিলীপকুমার রায় যখন কোনো গানের সুর ধরতে যান, শুরু করেন (এইটেই রীতিসিদ্ধ) কথাহীন রাগ-রাগিণী গুনগুন ক'রে,– কারণ, "রাগ-রাগিণীই হচ্ছে গানের আত্মা"। তিনি গান করেন আনুনাসিক স্বরভঙ্গিতে; এবং তাঁর গলা ওঠে বেশ উঁচু পর্দায়, তার সঙ্গে স্বরসংযোগের ঢঙের একটানা প্রস্ফুটন এবং অলংকরণের এক অনন্য নমনীয়তা—যা দিয়ে সুরেলা পংক্তিটি মালাভূষিত হয়ে ওঠে।

ভারতীয়রা, মনে হয়, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যায় কম কৌতূহলী, কাব্য ও দর্শনের মতোই তারা যেন গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী। কিছুদিন আগে এক ভারতীয় তাঁর প্রতিভাজাত স্বতঃলব্ধ জ্ঞান এবং সংখ্যাসম্পর্কিত এক নতুন তত্ত্বের জন্যে ইংলণ্ডে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এক বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কেরানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল, লণ্ডনে আনা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, কয়েক মাস পরে তিনি মারা গেলেন; কারণ ধর্মীয় আচরণে তিনি বড়ই কঠোর ছিলেন, সমস্ত আচার-বিচার মানতে গিয়ে ইংলণ্ডে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে দ্রুত যক্ষ্মার কবলে পড়েন।

…দিলীপকুমার রায় আমাদের বললেন, ভারতবর্ষে হালের সবচেয়ে মৌলিক লেখক হচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন (সম্ভবত এখনো আছেন) ভবঘুরে, ঠিক গোর্কির মতো। তাঁর প্রধান রচনাগুলো বাংলায় লেখা এবং যেগুলো নিঃসন্দেহে ইংরেজিতে অনুবাদ হতে চলেছে (ম্যাকমিলান থেকে), সেগুলো হচ্ছে:

'শ্রীকান্ত' (এক ধরনের আত্মজীবনী), এবং 'চরিত্রহীন'।

১৯২১

১৯ এপ্রিল, ১৯২১। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন দেখা করতে, সঙ্গে তাঁর ছেলে। পথচলতি পারীতে দিন সাতেক আছেন বুলোঞ এস/সেইন, ৯ কে দ্যু, ৪ সপ্‌তে'বর্‌ 'ওতুর দ্যু ম'দ'-এ। পরনে ভারতীয় বেশ, কালো ভেলভেটের উঁচু টুপি, আর ছাই রঙের এক লম্বা জোব্বা। তিনি খুবই সুন্দর—প্রায় অতি মাত্রায় সুন্দর,—লম্বা, মুখখানা সুন্দর সুষম, খাঁটি আর্যজনোচিত, কিন্তু সেই টকটকে রঙের, যা সোনালি রৌদ্রমাখা জীবনের দান; উজ্জ্বল বাদামী দুই চোখ—তাতে সুন্দর চোখের পাতার ছায়া, খাড়া নাক, সাদা গোঁফের নিচে হাসিমুখ, রেশমের মতো দাড়ি তিন ভাগে ছুঁচলো, দুই সাদা ভাগের মাঝের ভাগ এখনো কালো। এক প্রচুর ও প্রশান্ত আনন্দ গোটা মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি কথায়; তিনি শুধু ইংরেজিতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। আমার দোভাষীর কাজ চালালেন আমার বোন। তাঁর চেহারা অনেকটা সেই প্রাচ্য ঋষির মতো। আনন্দের বিষয়, তাঁর হাবভাব সহজ এবং শালীন।

তিনি যা বলেন তা হৃদয়গ্রাহী এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি দেড় ঘন্টা রইলেন, হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীলতায়, মাঝে মাঝে চিত্রময় বাকভঙ্গিতে অনেক কথা বললেন।

ভারতবর্ষে তিনি একটি এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন, তিনি চান এশিয়ার সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় অধ্যাপকদের সেখানে নিয়ে যেতে এবং ইউরোপীয় ও এশীয় ছাত্রদের যোগাযোগ ঘটাতে। তাঁর মনোমুগ্ধকর বিনয় সত্ত্বেও, বুঝতে পারা যায়, ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার—সবার উপরে ভারতবর্ষের - নৈতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়। তিনি বললেন, ইউরোপ যেন এক দক্ষ কারিগর, একটা সুন্দর সংগীত-যন্ত্র বানিয়েছে। কিন্তু সংগীত সৃষ্টি করা তার সাধ্যায়ত্ব নয়। সংগীত ভারতবর্ষের ভাগে। তিনি আরও বললেন, ভারতীয় জনগণ বাস্তবে পরিণত করবে (এ সম্পর্কে তাঁর আশা দৃঢ়) আদর্শ শান্তিবাদ—যাকে বাকি পৃথিবী বৃথাই অনুসরণ করছে। কেননা এইটেই জাতির যথার্থ সত্তা। হিংসা দিয়ে হিংসাকে তিনি কখনো প্রতিরোধ করবেন না। তাঁর এই অ-প্রতিরোধ (non resistance) যুগ যুগব্যাপী শক্তি, যাতে প্রতিহত হয়ে প্রতিটি বহিরাক্রমণ ভেঙ্গে পড়েছে, গান্ধীর মাধ্যমে যা সদ্য সদ্য সচেতন কর্মের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার উত্তরে আমি বললাম, অ-প্রতিরোধ কার্যত ফলপ্রদ এবং খুবই সহজ যখন এ প্রযুক্ত হয় এক বিপুল জনশক্তি দ্বারা, বিস্ময়কর প্রাণশক্তির কল্যাণে শেষকথা বলতে যে দৃঢ় নিশ্চিত। সর্বদা নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয়ে ভীত পাশ্চাত্য জনগণের পক্ষে এ সমস্যা আরও বেশি বিপজ্জনক। শান্তিবাদ দুই রকমের : আত্মত্যাগের ফলে, জীবনের দারিদ্র্যের ফলে। এবং শান্তিবাদ নিজের শক্তির প্রতি প্রশান্ত প্রত্যয়ের ফলে, জীবনের অতি-প্রাচুর্যের ফলে। এই শেষোক্ত শান্তিবাদ, একমাত্র ভারতবর্ষই যথার্থ কার্যে পরিণত করার বিলাসের মূল্য দিতে পারে। সবকিছুই বলার ও করার শেষে, আসল জিনিসটা হচ্ছে প্রাণশক্তির প্রশ্ন। পাশ্চাত্যের সর্বত্র-বিস্তৃত চরম বর্বরতা তাঁর মনে যে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ গোপন করলেন না। তাঁর পক্ষে এ সমর্থন করা কষ্টসাধ্য এবং এখানে তিনি থাকতে পারবেন না। আমরা যারা কখনো এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি, ইতি করেছি তা প্রায় আর অনুভব না-ক'রে। একজন ভারতীয় এ থেকে পার হয়ে যায় আতংকে, যেমন দান্তে পার হয়েছিলেন। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, শিকারের নামে ইতর হত্যাকান্ড তার কাছে বিশেষ ক'রে বীভৎস। এতে কেবল তার অনুভূতিই আহত হয় না, আহত হয় মানবিক মর্যাদাবোধ। এসবকে তার মনে হয় কুৎসিৎ, পাশবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্তর আমেরিকার চেয়ে কোনো কিছুই বেশি গুরুতর পীড়ার কারণ ঘটায় না। তাঁর কাছে সে এক নিশাতঙ্ক। ভারতবর্ষের ক্লান্তিহর প্রশান্তি ও মাধুর্যের যে চিত্র তিনি আমাকে দিলেন, তা আমাকে বলতে প্ররোচিত করল যে, আমার মতো অনেক ইউরোপীয়ই বর্তমান বর্বরতা থেকে বৃথাই পৃথিবীতে একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন : আমরা তাহলে ভারতবর্ষকে বেছে নেবো। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে আমাকে ভারতবর্ষে তাঁর কাছে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষে তলস্তয় বেশ পরিচিত এবং পঠিত, একথা সত্য কি না। তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস তা সত্য, কিন্তু তাঁর প্রকৃত চিন্তাধারা

নিঃসন্দেহে অনুপলব্ধ। গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত ; কিন্তু তিনি ভুল করেন ; তার অ-প্রতিরোধ আর যাই হোক্ তলস্তয়ের নয়। বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ তলস্তয়কে খুব পছন্দ করেন না ; তিনি তাঁর মতবাদের তপশ্চর্যা এবং কঠোর সন্ন্যাসের দিকটা সইতে পারেন না (তিনি বলেন, কোনো ভারতীয়ই পারে না)। ভারতবর্ষের আকাশ ও প্রকৃতি তার অনুকূল নয়। প্রকৃতির প্রতিকূলে সন্ন্যাস আত্ম-অস্বীকৃতি এবং পাশ্চাত্যের পক্ষে (এবং জাপানের পক্ষেও) মঙ্গলকর ঠিক এই কারণে যে, তারা অত্যন্ত উগ্র এবং তাদের রিপুগুলোকে হঠাতে হবে। দমনের চেয়ে উদ্দীপনই বরং ভারতবর্ষের প্রয়োজন হবে। মোটের উপর বলতে গেলে, সংঘর্ষ, চিরন্তন সংগ্রাম ছাড়া ইউরোপের শিল্পে ও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ আর কিছু দেখতে পান ব'লে মনে হয় না ঃ আর তা তাঁর পছন্দ নয়।

সংগীত নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। বেহালায় সমস্ত ঢঙের ইউরোপীয় সুরগুলো তিনি বাজিয়ে নিলেন ঃ বাখ্ বিঠোফেন প্রভৃতি থেকে দেবুসি পর্যন্ত। তিনি বললেন, সেগুলো তিনি বুঝতে এবং তাদের তারিফ করতে পারেন। জোর দিয়েই বললেন, বাখের সংবেদনশীলতা তাঁর সংবেদনশীলতার অত্যন্ত কাছাকাছি। (এতে আমি খুবই বিস্মিত হলাম।)—ভারতবর্ষে ভাগনারের অপেরা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয়রা যদিও প্রায় একচেটিয়া ভাবে গায়ক (অথবা হয়তো সেই কারণেই) গানের চেয়ে ভাগনারের অর্কেস্ট্রার আস্বাদ গ্রহণ করেন। (তাঁরা ভুল করেন না।)—রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানের সুর রচনা করেন ; তিনি স্বীকার করেন যে, সংগীতে তিনি এক বিদ্রোহী ; যে-নিয়ম একমাত্র রাগগুলো অথবা প্রাচীন বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে বলে, তিনি তার বশ্যতা স্বীকার করেন না, তিনি নতুন এক ঢঙে তাদের পরিবর্তিত করেন, মৌলিক সুর রচনা করেন। লোকে মানে তিনিই ঠিক, কেননা, লোকের মুখে তাঁর অসংখ্য গান শোনার আনন্দ রবীন্দ্রনাথের আছে, তারা সেগুলো গ্রহণ করেছে।

তিনি নিজের মুখে আমাকে বললেন না, কিন্তু আমার সঙ্গে একমত হলেন যে, ইউরোপীয় ভারত-বিশেষজ্ঞরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করেন সামান্য সত্য-উপলব্ধি, এক ধরনের অভিভাবকজনোচিত বিনয় এবং কিছুটা অবজ্ঞা নিয়ে। তিনি বললেন, ইংরেজরা (তাদের মধ্যে কেউ কেউ) অনেক কষ্ট স্বীকার করেন, বোঝেনও যথেষ্ট, কিন্তু সহৃদয় ভাবনার অভাবে তাঁরা উপলব্ধি ক'রে উঠতে পারেন না। আমরা একমত হলাম যে, রুশরা অন্য জাতিগুলোর সংবেদনশীলতার গাঁটছড়া বাঁধতে সবচেয়ে পটু এবং হয়তো এরাই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করবে।

(জাপান সম্পর্কে তিনি বললেন, সেখানে প্রচুর উদ্দীপনা দেখেছিলেন ঃ সেখানে তিনি আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন ; কিন্তু সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এবং বাধা সৃষ্টি করেছিল। তিনি বললেন, এক কেন্দ্রীয় সর্বগ্রাসী শক্তির হাতে তরুণ জাপানীদের দম আটকে আছে।)

(রবীন্দ্রনাথের ছেলেকে বড় জোর কুড়ি বছরের [তাঁর বয়স তার বেশি] মনে হয়,

তিনি ইউরোপীয় পোষাক পরেছেন, মাথায় এক ধরনের ফেজ টুপি। তিনি কোনো কথা বলেন নি ; দেখতে বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ। গায়ের রং বাপের রঙের চেয়ে খুবই আলাদা, এটা প্রমাণ করে এক বর্ণসঙ্কর জাতির সঙ্গে মিশ্রণের, যেখানে কালোরও ভূমিকা আছে। তাঁকে দেখে ভেবেছিলাম যেন এক ভারতীয় মুসলমান।)

২১ এপ্রিল, ১৯২১। রবীন্দ্রনাথ আমাকে ও আমার বোনকে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন ‘ওতুর দ্যু ম’দ’-এ, তিনি সেখানকার অতিথি। (এটি ‘ওতুর দ্যু ম’দ’ প্রতিষ্ঠানের আবাসিকদের চক্র ; এটির অবস্থান রমণীয়, সেইনের বাঁধের উপরে, গ্রাম ও স্যাঁ-ক্লু-র গাছে-ঢাকা সানুদেশের মুখোমুখি। এখন বসন্ত কাল, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।) এই চক্রের আবাসিক-সম্পাদিকা এবং পুরনো এক আবাসিক ছাড়া আমাদের এই ঘরোয়া দল। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছেলে, ছেলের স্ত্রী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র। দুঃখের বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে পারি না ; আমার বোনের মাধ্যমে পাই শুধু তাঁর কথার ভাবটুকু। আমি আবার তাঁর কথার ও ভঙ্গির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক হাস্যময় প্রশান্তি, যার কখনো অভাব ঘটে না। তিনি কথা বলতে ভালবাসেন, কথা বলেন এক সাবলীল শান্ত ভঙ্গিতে, একটু উচু পর্দায় (সুরেলা), কিন্তু সব সময়েই সংযতভাবে। যখন তাঁর থামার সময় আসে, তখন একেবারে থেমে যান। নীরবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেন না, যেমনটি আমাদের মধ্যে লোকে ক’রে থাকে। বাংলা দেশের বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতনে যে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন তিনি তার কথা বললেন। তিনি ইউরোপ ঘুরছেন সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে। সামনের সপ্তাহে যাচ্ছেন স্পেনে ; তারপর যাবেন সুইজারল্যান্ডে এবং ইতালিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আনুকূল্যের জন্যে ছাপানো একটা আবেদনপত্র আমার হাতে তুলে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য “এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে (সেমিটিক, আর্য, মোঙ্গোল প্রভৃতি) পুনর্মিলিত করা তাদের একটা সমন্বয় ঘটানো, এরই সঙ্গে যুক্ত করা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে, যা সে সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানে, দর্শনে এবং শিল্পে।” তাঁর চিন্তায় এটি “এশিয়ার নবজাগরণকে” চালিত করার ব্যাপার। তাঁর মনে হয়েছে, ইউরোপীয় ভারতবিদেরা—এমনকি প্রাজ্ঞ জনেরাও ভারতবাসীর প্রকৃত চিন্তা উপলব্ধি করতে চরম অক্ষম। তিনি আমাদের তাঁর দুটো গান শোনালেন : সে-দুটো ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতা ; আমাদের আগেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এগুলো পুরোপুরি রীতিসিদ্ধ রচনা নয়, কেননা ভারতীয় সংগীতে তিনি একজন “প্রাচীনপন্থী” নন। সে-দুটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে রচিত এবং তাললয়সমন্বিত, ইউরোপীয় সুরগুলোর খুবই কাছাকাছি, সবকিছু বিচার করলে খুব আগ্রহোদ্দীপক নয়, কিন্তু একে ধরে রাখা এবং লোক-সংগীতের ঢঙে হাতবদল করা সোজা। আমার ধারণা যুক্তিযুক্তই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ সংগীতের ক্ষেত্রে খুব বেশি মৌলিক নন এবং ভারতবর্ষের যথার্থ প্রাচীন সংগীতের - যার সঙ্গে দিলীপকুমার রায় গত বছর আমার পরিচয় ঘটিয়েছেন—অনেক

বেশি মহৎ মূল্য আছে। তিনি গান করলেন বসে বসে পা দিয়ে তাল রেখে। তিনি বললেন 'গীতাঞ্জলি'র সমস্ত কবিতাতেই গানের সুর বসিয়েছেন,—তাঁর সমস্ত কবিতাই এই রকমের। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, প্রায়ই তিনি আগে কবিতা লেখেন, কিন্তু কোনো কোনো সময় আগে আসে গানের সুর ; এবং তার পরে ভাবে-উদ্বুদ্ধ কথাগুলো বসান। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংগীতের স্থান দেয় না ; এমনো ঘটে যে, কীর্তন গাইতে-গাইতে চলা শোভাযাত্রা মুসলমানদের মসজিদের সামনে দিয়ে পেরুতে গিয়ে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ইরানে ইসলাম ধর্ম ধর্মস্থান দখলে ব্যর্থ হয়েছে এবং সাধারণ ভাবে সংগীত গৃহীত হওয়ায়, শিল্পে আর্য-রক্ত প্রবল ভাবে টিকে আছে ঃ ইরানী মুসলমানরা তাঁদের স্তবগুলো গান করেন। আমি রবীন্দ্রনাথের হাতে আমার 'ক্লেরাঁবো' ও আঁপেদক্ল' দিলাম।

চলে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শ্রীমতী ক্যাপেলের বাড়ীতে তার সঙ্গে আমাদের নিমন্ত্রণ করালেন। আমরা আসতে পারলাম না। আমরা বুলোঞ-এ ফিরলাম ২৬ তারিখে, তাঁর যাত্রার আগের দিন ; এবং তাঁর ঘরে বসে শুধু তাঁরই সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হলো। আমার বোন এবারও মধ্যবর্তিনী। তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং ইংলন্ডের দিক থেকে তিনি কী কী বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন—প্রায় ঐ একটি বিষয়েই তিনি বলে গেলেন। সরকার অবিশ্বাস করে ; ভারতীয় স্বাধীনতার কোন কেন্দ্রকেই তার বিশ্বাস নেই ; তাঁকে বাধা দেবার সব চেষ্টাই সে করেছে। আর আজ যখন সরকারের অপচেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর ভাবাদর্শ ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাঁকে সমর্থন করার ভান করছে, তাকে কুক্ষিগত করার জন্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রথমে বিরুদ্ধতা ক'রে নষ্ট করার চেষ্টার পর এখন নষ্ট করতে চাইছে বদান্যতায়। রবীন্দ্রনাথকে প্রস্তাব দিয়েছে, সংগঠনের সমস্ত ব্যাপার থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবে, তহবিল জোগাবে, অধ্যাপক ও ছাত্র নির্বাচন ক'রে দেবে। সেদিন সকালেই এই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছেন ঃ তিনি লিখেছেন, এতো সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁকে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশে তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি কখনো তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না, কারণ, তিনি এক "ভবঘুরে," সরকারী কেউ নন ; তিনি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে চেয়েছেন কেবলমাত্র অতিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বা অধ্যাপকদের জন্যে নয়, যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে দরিদ্র ছাত্রদের, সকল দেশের স্বাধীনচেতাদের জন্যেও। তাছাড়া, তিনি আরও বলেছেন, তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে, কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিকল্পনা তাঁর নেই। (আমি তাঁকে স্বীকার করালাম যে, সরকারগুলোর অবিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে ঃ কেননা, তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে—মূলগতভাবে—আন্তর্জাতিক মন, যে-মন আমাদের দু'জনের)—তাঁকে পরামর্শ দিলাম, সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাইরে, ইংলন্ডের স্বাধীন লেখকদের কাছে তিনি আবেদন করুন, যাতে তাঁরা একটা জনমত গড়ে তুলতে পারেন, যা সরকারের অসদভিপ্রায়কে বাধা দিতে পারবে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, ইংরেজ লেখক ও শিল্পীদের অত্যন্ত সামান্য

সংখ্যকের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। (বার্ট্রাণ্ড রাসেল বাদে, তিনি এখন চীনে।) কারণ হিসেবে তিনি বললেন যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে তাঁর সম্মানসূচক খেতাব ফিরিয়ে দেবার পর থেকে তিনি সন্দেহভাজন হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় না এইটেই সত্যকার কারণ। তাঁর মহৎ বিদ্রোহ বরং এর বিপরীত, যা মুক্তমতি ইংরেজদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল।)—আমার মনে হয়, ভারতীয়দের দরুনই তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষে তাঁর ধ্যান-ধারণার অনুবর্তী কেউ আছেন কি না, তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, নিঃসন্দেহে এমন অনেকে আছেন যারা তাঁকে শিল্পী ব'লে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের মিলন ও বোঝাপড়ার আদর্শ সমর্থন করেন, তাঁরা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য—সম্ভবতঃ কেউই নেই। তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ অতিমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা যা কিছু সহ্য করেছেন তার ফলে, ইউরোপের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতায় স্বেচ্ছায় সম্মত হবার পক্ষে জাতবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র। সর্বোপরি তাঁরা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে চান না, কারণ, তাঁরা ভাবেন, তাঁদের সম্পর্কে ইউরোপের কাছে শুধুই বোঝার অক্ষমতা এবং অবজ্ঞা। আর এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে একদিকে ইংরেজদের সম্পর্কে এতো সতর্ক থাকতে হচ্ছে, তাঁর কাজ যেন ইংলণ্ডের একটা হাতিয়ার ব'লে সন্দেহভাজন না হয়, এবং এই ভয়েই ইংরেজদের উপরে নির্ভর করাটা তাঁকে এড়াতে হচ্ছে। তিনি বললেন, আর অন্যদিকে, এটা অত্যন্ত জরুরি বটে যে ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে আসতে হবে (লেখাটাই যথেষ্ট নয়, ভারতীয়দের কাছে প্রমান করতে হবে, পাশ্চাত্যে তবুও এমন মানুষেরা আছেন যাঁরা তাদের শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং তাদের ভবিতব্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন। এটি একটি জরুরি প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসাহী তরুণচিত্তদের ফ্রান্সে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর নয়—তাঁরা সেখানে যেতে পা বাড়িয়েই আছেন—যদি অবশ্য যাওয়াটা তাঁদের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব হয়। কিন্তু এটা স্বীকার করাই কর্তব্য যে, সবচেয়ে জার্মানী এবং রাশিয়া থেকেই সহানুভূতি এবং সম্মতির প্রবল সাড়া আসবে। আর এখন সময়ের এমনই ফের যে, ঠিক এই দুটি দেশের মানুষেরাই এখন ভারতবর্ষে যেতে পারে না। রুশরা পারে না, কারণ তারা বলশেভিকবাদের সন্দেহভাজন। জার্মানরা পারে না, কারণ ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার যুদ্ধের পাঁচ বছর পরেও আইন করেছে, কোনো জার্মানই সেখানে ঢুকতে পারবে না। —(কী প্রচণ্ড ব্যগ্রতায় ইউরোপের ঘৃণ্য প্রভুরা তাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণার সীমান্তের খোঁয়াড়ে আটকে রেখে মানুষে মানুষে যুক্ত হবার, মিলিত হবার প্রতিবন্ধকতা করছে!)...

আমার ভয় হয়, এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কাজ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া খুব কষ্টসাধ্য না হয়ে ওঠে। আমাকে যা সবচেয়ে পীড়িত করে তা তাঁর স্বীকারোক্তি যে, ভারতীয়দের মধ্যে একজনও নেই যিনি তাঁর মুখ্য সহকারী হতে পারেন। মাত্র

দু'জন অনুবর্তী আছেন যাঁদের উপর তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁরা আবার দু'জনই ইংরেজ, বাস করেন ভারতবর্ষে।

যে-সব তরুণেরা তার কাজে সহযোগিতা করতে চাইবে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সবার আগে চাইবেন,—বিশ্বাস,—তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাস।

যখন তিনি আমার বোনের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলছিলেন অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মুখের কমনীয় ও গর্বিত পার্শ্বরেখা দেখছিলাম। তাঁর সৌন্দর্যে আমি অভিভূত হলাম। সুসমঞ্জস প্রশান্তি—প্রথমেই যা আমি উপলব্ধি করেছিলাম,—তার অন্তরালেও আছে ছাপিয়ে-ওঠা এক বিষণ্ণতা, মানুষ সম্পর্কে এক মোহহীন পুরুষোচিত বুদ্ধিমত্তা,—দৃঢ়তার সঙ্গে যা সমস্ত সংগ্রামের মুখোমুখি হয়,—যদিও তাঁর হৃদয় কখনো অস্থির না-হয়ে-ওঠার এক বিধান তৈরি করেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬০ বছর হতে চলেছে। (আর জুইগ আমাকে এই সেদিন লিখেছেন যে জার্মানরা ৬০ তম বর্ষপূর্তির উৎসব করতে চলেছে,—যা ফ্রান্সে অগোচরেই রয়ে গেছে,— সম্ভবত ইংলণ্ডেও।) তাঁর কোঁকড়ানো চুল— যাতে তাঁর কানের একাংশ ঢাকা পড়েছে, তার শুভ্রতা সত্ত্বেও বয়সের চেয়ে তাঁকে কম দেখায়,—আমার চেয়েও কম। তাঁর রং তামাটে এবং টকটকে। কন্ঠস্বর কিছুটা উচ্চগ্রামের। যখন কথা বলেন, আলাপকারীর দিকে তাকান না, একমাত্র তাকান যখন থামেন,—সোজাসুজি মুখের দিকে, স্মিত হাসির সঙ্গে—কিন্তু শুধুমাত্র মুহূর্তের জন্যে; তারপরেই তাঁর দু'চোখ আবার নত হয়ে পড়ে। ঝুঁকে করমর্দন করার পর যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিলাম তিনি জোড়-করা দুই হাত ঠোঁটের কাছ পর্যন্ত তুললেন,—যেন এক প্রার্থনার ভঙ্গি।

আগামীকাল সকালে তিনি স্ট্রাসবুর্গ রওনা হবেন, তারপর মনে করেছেন সুইজারল্যান্ড যাবেন, তারপর জার্মানী, সুইডেন এবং নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়ম, সর্বশেষে ইতালি, আর জুনের শেষ দিকে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে জাহাজ ধরবেন।

প্রসঙ্গত বলি, সেদিন এফেল টাওয়ারের সামনে আমার বোন তাঁকে বলেছিল: "ওটা কি আপনার ভাল লাগবে?" তিনি হেসে বলেছিলেন: "ওটা একটা বিস্ময়ের চিহ্ন, পারীর অধিবাসীরা নিজেরাই খাড়া করেছে নিজেদের বাহবা দেবার জন্যে।"

সেপ্টেম্বর, ১৯২১। —পল রিশার নামে একজন ফরাসী—ভারতবর্ষে ছিলেন কোটগড়ে হিমালয়ের নির্জনতায়—আমাকে দীর্ঘ অসাধারণ একটি চিঠি লিখেছেন (২০ আগস্ট)।

ডিসেম্বর, ১৯২১।—আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে পল রিশার তাঁর অতীত জীবনের কিছু খুঁটিনাটি জানিয়েছেন (২১ নভেম্বর, ১৯২১) :

তাঁর বয়স ৪৭ বছর। পারীর কোর্ট অফ এ্যাপিলের ব্যবহারজীবী ছিলেন এবং সেখানে তাঁর নাম সবসময়েই লেখা থাকার কথা। তিনি সাংবাদিক হয়েছিলেন। ১৯০৭-৮এ 'সিয়েক্‌ল'এ প্রতিদিনের "স্বাধীন মতামত"-স্তম্ভের লেখক। বিবরণ লিখেছেন 'গায়নার সশ্রম কারাদণ্ডের উপরে, সেখানে মিশনে গিয়েছিলেন ১৯০৫ সালে। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 'লোরর্‌'এ বৈদেশিক রাজনীতির উপরে দৈনিক প্রবন্ধ।—কিছু দার্শনিক গ্রন্থ,—তাঁর ভাষায় "পড়তে ক্লান্তিকর,"—গূঢ়বাদী গ্রন্থ লিখেছেন : 'লেতের দিভাঁ'—'লে দিউ্য' (সম্পা· ফিশ্‌বাশের), সংশ্লেষণাত্মক রচনা 'ল্য পুর্‌কোয়া দে ম'দ্‌' (কেবলমাত্র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের এক দর্শন-পত্রিকায়),—'লে পারোল এতের্‌নেল,' ২০০০ গ্রন্থ থেকে সংকলন, সর্বকালের ঋষিদের মহাবাণীধৃত সর্বগ্রন্থসার (যুদ্ধে নিহত শার্ল দ্য ফঁৎনেই-এর সহযোগিতায়) জাপানীতে প্রকাশিত এবং কিছু পরে ভারতবর্ষে ইংরেজিতে প্রকাশিত।

১৯১৪ সালে তাঁর বন্ধু অরবিন্দের কাছে এসেছিলেন কিছুদিন থাকার জন্যে ; অরবিন্দ ছিলেন ১৯০৫ সালের বাংলার জাগরণের প্রথম আন্দোলনের একজন নেতা, আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আছেন পন্ডিচেরিতে ; সেখানে ১৯১০ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় রিশারের,—আর এখন তিনি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার স্বীকৃত নেতা। তাঁর সঙ্গে মাসিক পত্রিকা 'লারিয়' ইংরেজিতে (এবং ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধের জন্যে রিশারের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত, ফরাসীতে) প্রকাশের চেষ্টা করেন।

তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন আর্মি সার্ভিস কোর্‌-এ এবং ছয় মাস ধরে ছিলেন বুনো ঘোড়া বাগ-মানানোর কাজে। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দু'দুবার বাতিল হয়ে যান।—তিনি এশিয়ায় ফিরে আসেন। জাপানে এশিয়ার নতুন সভ্যতা সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন এবং সেখানে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একদল বন্ধুর সঙ্গে তিনি 'দি এশিয়ান রিভিউ' প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর কথায়—যা সমস্ত এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন (চীনে যাবার প্রতীক্ষায়), কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁকে যেতে হলো এক প্রচন্ড সংকটের মধ্যে দিয়ে* "এক ভয়াবহ অন্তর্‌সংগ্রাম, যা আমাকে ছুঁড়ে দিল একাকী, মৃত্যুর মুখোমুখি—সে-মৃত্যু ভিতরের—এবং অগ্রবর্তী দিব্য সম্ভাবনার মুখোমুখি,—শ্বেত শুভ্র চূড়াগুলোর উপরে হিমালয়-সমুদ্রের বিপুল ও মহিমান্বিত শূন্যতার মধ্যে… আমার বিশ্বাস এখন লড়াই থেমেছে। এবং মানুষের মধ্যে নেমে যাবার ডাক এসেছে।' —তাঁকে ৩১ ডিসেম্বর আমেদাবাদ কংগ্রেসে ভারতের 'মিশন' সম্পর্কে বলতে হবে। ভারত-তিব্বত পথে তাঁকে প্রায় ১০০০ কি. মি. পায়ে হাঁটতে হবে (তিনি আছেন কোটগড়ে) প্রথম রেলস্টেশন সিমলা পৌঁছুতে।

---

*আসলে, তাঁর স্ত্রী মিরিয়াম, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক ইহুদী মহিলা তাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু এবং সহযোগী অরবিন্দ ঘোষকে বিয়ে করার জন্যে।—র. র.-'র টিপ্পনী।

১৯২২

৪ এপ্রিল, ১৯২২।—আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এক তরুণ ভারতীয়, তিনি ছাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, পড়েন পারীতে,—নাম কালিদাস নাগ। বুদ্ধিমান, মেধাবী, প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। গাঢ় বাদামী রঙের টাইপ, মাথায় খাটো। রবীন্দ্রনাথের মতো বাঙালী। যে চিন্তাধারার পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীকে আলাদা করেছে, তিনি তার কথা বললেন। বললেন, তিনি দু'জনকেই শ্রদ্ধা করেন (পনের দিন আগে গান্ধী ইংরেজ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন)। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা বারব্যুসের সঙ্গে বিতর্কের সময়ে আমার অবস্থার অনুরূপ। তিনি ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক; আর গান্ধী নিজে "অ-প্রতিরোধী" হয়েও ব্যক্তিকে গণ-কৌশলের অধীন করায় তার মর্যাদার হানি ঘটান। কিন্তু আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর সুবিধা, কারণ বহু শতাব্দী ধরে ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে ভারতবর্ষের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিমূলে, আর ইউরোপ একে ভালো ক'রে চেনেইনি। একথা সত্য যে, আধুনিক শিল্প ও জাতীয়তাবাদের প্রবাহে পড়ে ভারতবর্ষ গভীরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। শেষেরটির সময় হচ্ছে ১৮৭০ সালের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ দেখলেন, তাঁর নিজের দেশবাসীর মধ্যে তিনি বিচ্ছিন্ন। সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল ১৯১৭-১৮ সালের দিকে। তিনি সদ্য 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন এবং জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি আক্রান্ত হয়েছেন সবদিক থেকে, যেমন ভারতীয়দের দিক থেকে তেমনি ইউরোপীয়দের দিক থেকে। সেটা ছিল একটা কঠিন সংকট, আর সম্ভবত তাই তাঁকে আরও সুন্দর, আরও বীরোচিত কবিতার প্রেরণা দিয়েছিল। (তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ আত্মকথামূলক বেশির ভাগ কবিতার মতো সেগুলো এখনো প্রকাশিত হয়নি।) কালিদাস নাগ তাঁর কবিতাগুলোর একটি আমাকে দিলেন, সেটা তিনি আমার জন্যে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন: "লো দেয়ার এন্ডস্ দ্য নাইট…" (এপ্রিলের শেষ রাত্রি হচ্ছে ভারতবর্ষের নববর্ষের প্রথম।) এ এক জ্বলন্ত ও বীরোচিত নৈরাশ্যবাদের কবিতা। এর তীব্রতা বিটোফেনের করুণ রসের সমগোত্র। রবীন্দ্রনাথের কোনো কিছুই আমার কাছে এতো মহৎ, এতো পৌরুষময় ব'লে মনে হয়নি। কালিদাস নাগ হালে-তোলা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কৌতূহলজনক ফটো আমাদের দেখালেন বোলপুরে তাঁর বিদ্যালয়ে, মুক্ত অঙ্গনে তাঁর ছোট ছোট ছাত্রের সঙ্গে, অথবা কথা বলছেন লেভির সঙ্গে—যিনি প্রকৃতই তাঁর অতিথি। তিনি কবির সকলের বড় ভাইয়ের কথা বললেন, তিনি দার্শনিক, অনেক বয়স হয়েছে, অত্যন্ত ভালো মানুষ, তাঁর গায়ে বনের পাখি আর কাঠবিড়ালিরা এসে বসে, আর তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন, ঠিক যেন এক ফ্রাঁসোয়া দাসিজ্।

কালিদাস নাগ 'জাঁ-ক্রিস্তফ' সম্পর্কে উৎসাহী, এবং তিনি বললেন, এইটেই প্রথম ইউরোপীয় গ্রন্থ যা সোজাসুজি যেন ভারতীয় মনের সঙ্গে কথা বলেছে, এইটিই একমাত্র গ্রন্থ যা ইউরোপীয় হবার আগে হয়েছে বিশ্বজনীন। আমার গ্রন্থ প্রথম প'ড়ে তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের টিকাটিপ্পনিগুলো, তিনি আমার জন্যে এনেছেন: (তিনি পড়েছেন

রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া গ্রন্থটি, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গ্রন্থের অধিকারী)। তিনি এ থেকে দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলো, বিশেষ ক'রে মহাকাব্যজনোচিত ও আধিবিদ্যক অংশগুলো টুকে নিয়েছেন, যেমন 'ল্য ব্যুইস'নারদাঁ'-য় তার দেবতার সঙ্গে ক্রিসতফের কথোপকথন, যেমন, 'লা ন্যুভেল জুনে'-র ক্রিসতফের মৃত্যুর পরবর্তী লাইনগুলো। এর মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের প্রাচীন বৈদিক সূক্তের প্রায় আক্ষরিক ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পেয়ে (স্বীকার করছি, আমার জানা ছিল না) তিনি কৌতূহলী বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলেন। আধুনিক ফরাসী মননের এই গ্রন্থ এক নতুন প্রবণতার ছাপ ফেলেছে ভারতীয়দের প্রাচীনতম অনুপ্রাণনায়, যার অর্থ ম্লান হয়ে গেছে। 'জা-ক্রিসতফ'-এর তরুণ বাঙালী পাঠকেরা এইভাবে মানবতার ঐক্য ও অনন্ত-কালীনতার আকস্মিক সত্য-উপলব্ধি করেছে। আমি বললাম, এশিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে যে অগ্রবর্তী আর্যরা এসেছিল, আমি তাদের শেষ বংশধর,—আর এখন হারিয়ে গেছি পশ্চিমের নেগ্রয়েড ও সেমিটিক জাতিদের মধ্যে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'ব্যুইস'নারদাঁ'-র ট্রাজিক কথোপকথন ভারতীয়দের মধ্যে যে আবেগ-দীপ্ত প্রতিধ্বনি তুলেছে তা আমার দেশবাসীর মধ্যে কখনো তোলেনি।

এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, কালিদাস নাগ পারীর পড়াশোনার আবহাওয়া খুবই প্রশংসনীয় ব'লে মনে করেন। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডে, গতবছর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অক্সফোর্ড ছেড়ে এখানে আসতে উপদেশ দেন। আর এখন কালিদাস নাগ তাঁর কালের দেশের সমস্ত লোকদের ইংলন্ড ছেড়ে পারীতে এসে পড়াশোনা করার উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে পেয়েছেন নিঃশ্বাস ফেলার পক্ষে আরও উপযুক্ত, আরও মুক্ত, আরও জীবন্ত আবহাওয়া, মনের আরও কৌতূহল; কলেজ দ্য ফ্রাঁস্ ও সরবনের সরকারী পাঠক্রমের উদারতা সম্পর্কে তিনি সচেতন, এখানে যে-কেউ যোগ দিতে পারে; তিনি আমাদের ভারততত্ত্ববিদ এবং বিশেষ ক'রে চীনতত্ত্ববিদ অধ্যাপকদের জ্ঞানের প্রশংসা করলেন। বললেন, একথাও সত্য যে, সেই জ্ঞান নিশ্চিতই পুঁথির বাইরে বেশিদূর যায় না : মন তাতে আগ্রহী নয়।

তিনি আমাদের কয়েকটি ভারতীয় স্তব, রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা গেয়ে শোনালেন। শেষের জন মোটেই সুশিক্ষিত (instruit) সংগীতজ্ঞ নন। তিনি তাঁর স্বরলিপি করতে জানেন না। গাইতে গাইতে সেগুলো লেখা হয়েছে। আর প্রায় বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে-শোনা সুরের সঙ্গে তার সুন্দর কবিতাগুলোর কথা তখন-তখনই বসিয়ে গেছেন। আবার, ভারতবর্ষে কিন্তু তিনিই প্রথম, যিনি জনপ্রিয় সুর সৃষ্টি করেছেন; (তার আগে পর্যন্ত সংগীত ছিল পাণ্ডিত্যী কলা)। আমাকে কয়েকটা ব্যাখ্যা করার সময় জার্মান 'লিয়েডের'-এর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হলাম। আর আমার দুঃখ এই যে, গ্যেটে এবং হাইনের কবিতা বাংলায় অনুবাদ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটি অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হয়ে থাকবে।

লোকের খুবই ইচ্ছা আমাকে ওখানে আসতে দেখে, অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বোলপুরে, তারপরে হিমালয়ে। আমারও কী ভীষণ ইচ্ছা!

এপ্রিল, ১৯২২।—আমার বোনের অনুবাদ আনন্দকুমার স্বামীর 'লা দাঁস্ দ্য শিভ' রিয়েডের থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে আমার লেখা ভূমিকা, একই সময়ে সেটি প্রকাশিত হয়েছে রোমের মার্কিন সাময়িকী 'ব্রুম'এ 'হোমেজ টু শিভ' নামে।

এপ্রিল, ১৯২২। এদুয়ার মনো-হেরজেন বিশ্বাস করেন যে তিনি এশিয়ার চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট; কিন্তু এর সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আবেগ নেই (কারণ তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী, বাপের মতোই তিনি বিশ্বাসকে নামিয়ে এনেছেন নৈতিকতায়,—তার অর্থ, ইহজাগতিক জীবনে); কালিদাস নাগের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো আমার এখানে এবং এক বিদ্রূপাত্মক সৌজন্যের সঙ্গে তিনি তাঁকে সুস্পষ্ট সেই প্রশ্নগুলোতে চেপে ধরলেন যা থেকে ভারতীয়রা নিজেদের সরিয়ে রাখে। গান্ধী এবং তাঁর প্রকৃত সংকট প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সবশেষে, আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর এক হাত নেবে?" আস্তে কাঁধ দুটো তুলে কালিদাস নাগ হাসলেন, বললেন, "এতো রাজনীতির ব্যাপার…"। (গূঢ়ার্থ ঃ এতে আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই…)—বুঝতে না পেরে এদুয়ার মনো-হেরজেন মুখটা অর্ধেক হাঁ ক'রে রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলেন। যাদের কাছে রাজনীতি কিছুই নয়,—অন্তর্জীবনই সবকিছু, একজন ইউরোপীয় তাদের বুঝবে কি ক'রে?

কালিদাস নাগ তবু ইংরেজদের সম্মুখীন ভারতীয়দের বিস্ময়ের কথা বললেন। তাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে তারা অনেক আক্রমণ, অনেক রাজত্ব দেখেছে। কিন্তু সব, সব-প্রভুরা—চীনা, আরব, ইরানী প্রভৃতি সবাই মনের আত্মভূত হয়েছে; এদের যে কেউই প্রভুত্ব করুক এরা তাতে উদাসীন। কিন্তু ইংরেজরা কিছুই নেয়নি, কিছুই শেখেনি, কিছুই বোঝেনি; এরা হ্রাসবৃদ্ধিহীনই রয়ে গেছে। ইউরোপের সমস্ত জাতির মধ্যে এরা নিজেদের দ্বৈপায়ন অহংবোধে সবচেয়ে সংকীর্ণভাবে প্রাচীর-বেষ্টিত; স্বতন্ত্র কোনো জীবনে পরিবর্তিত হতে সবচেয়ে অক্ষম, মানিয়ে চলতে সবচেয়ে অপারগ। ধ্বংসও হবে তার পুরোপুরি মৌলিকত্ব নিয়ে। আর মনো-হেরজেন মনে করিয়ে দিলেন জীব-বিজ্ঞানের এই নিয়মটি, যারা মানিয়ে চলতে পারে একমাত্র তারাই টিকে থাকতে সক্ষম।

ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রকৃত চিন্তা কোথাও, এমনকি ইউরোপেও লিখতে বা ছাপতে না পারার জন্যে কালিদাস নাগ আমার কাছে দুঃখ জানালেন। ভবিষ্যতে তা তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে যাবার বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হবে না।

এশিয়ার স্টাইল ঃ

—কালিদাস নাগকে আমি চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। আনন্দ প্রকাশ ক'রে আমাকে লিখেছেন, তিনি আসছেন "সত্যের পাত্রে (coupe) পান করতে"।

—জাপানী পত্রিকার (*Kaizo*) এক সম্পাদক একটি প্রবন্ধ পাঠাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে লিখেছেন, "মহাশয়, আমাদের কামনার তীব্রতা পরিতৃপ্ত করুন।"

জুন, ১৯২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠির এই অংশটি কালিদাস নাগ আমাকে জানিয়েছেন, এটি আমাকে প্রকৃত আনন্দ দিয়েছে, কারণ তাঁর প্রতি আমার যতটা সহানুভূতি আমার প্রতি তিনিও ততটাই দেখিয়েছেন।

“শান্তিনিকেতন, ৯ মে, ১৯২২।

…আমি জেনে খুব খুশী হয়েছি যে রম্যাঁ রলাঁর অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে তোমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। পশ্চিমে যাঁদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়েছি, তাঁদের সকলের চেয়ে রলাঁকেই আমার হৃদয়ের নিকটতম এবং আমার ভাবনার সবচেয়ে সগোত্র বলে মনে হয়েছে। ভাষার ব্যবধানের ফলে রলাঁর সঙ্গে আমার চিন্তাধারার সোজাসুজি আদানপ্রদানে আমার অক্ষমতাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। কিন্তু তা যাই হোক, রলাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ফল হিসেবেই, আমি অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রত্যয়শীল হয়ে ভারতবর্ষে ফিরেছি আমার দেশের মানুষের হৃদয়ে সেইসব আদর্শ জীবন্ত ক'রে তুলতে, যার জন্যে রলাঁর মতো মানুষেরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

…রলাঁর মতো মানুষেরা সামগ্রিক ভাবে মানবতার কল্যাণের জন্যে স্বেচ্ছায় তপস্যার জীবনকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে দেশ এবং জগতের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। আর এইজন্যেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা তাঁদের তাড়া ক'রে ফিরছে। কিন্তু আমার পূর্ণ সহানুভূতি রলাঁ এবং তাঁর সহকর্মীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি। চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে, যার মধ্যে আছে সত্যকার স্বাধীনতা এবং সত্যকার মুক্তি।”

জুন, ১৯২২। ৩০ মে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা এক ব্যক্তিগত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার কাছে এই মনোভাবগুলো সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে আমাকে দেখতে পাবেন ব'লে আমাকে তাঁর আনন্দের কথা জানিয়েছেন, এবং জানিয়েছেন যে, ভাষার পার্থক্য কোনো বাধাই হবে না। ইউরোপ থেকে ফিরে তিক্ত জাতীয়তাবাদের যে-অবস্থায় ভারতবর্ষকে দেখতে পেয়েছেন, তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন, এবং তাঁর দায়িত্ব বর্তায় ইংরেজের জঘন্য রাজনীতির উপরে। নিজের মানুষের মধ্যে এমন বিপুল নিঃসঙ্গতা তিনি আর কখনো অনুভব করেননি। আপন জনের চেয়ে আমার সঙ্গেই তিনি অতি-নৈকট্য অনুভব করেন। তিনি আমাকে একটি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, সেটি প্রকাশ করেছেন 'মডার্ণ রিভিউ'-তে, নাম ঃ 'মুক্তধারা'।

১৭-২০ আগস্ট, ১৯২২। দিলীপকুমার রায় দেখা করতে এসেছেন…

…—রায়কে গান্ধীর কথা বললাম—(গান্ধীর প্রকাশক মাদ্রাজের গণেশন সদ্য আমাকে একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' নামে গান্ধীর প্রবন্ধের একটি সংকলনের প্রুফ পাঠিয়েছেন)—তিনি স্বীকার করলেন যে, গান্ধী (আমি যেমন তাঁকে লক্ষ্য করেছি) তাঁর আদর্শবাদের মধ্যেও প্রায়-বিভ্রান্তিকর বাস্তববুদ্ধির মানুষ; তিনি আমাকে বিশ্বাস ক'রে বললেন, এই যেমন ভারতবর্ষের

মুসলমানদের দুই নেতা আলি ভ্রাতৃদ্বয়—যাঁদের সঙ্গে গান্ধী গাঁটছড়া বেঁধেছেন,—নৈতিক দিক থেকে তাঁদের অতি সামান্যই গ্রহণযোগ্য, আর গান্ধী এ জানেন না তা হতে পারে না : এদিকে এই মহাত্মাটি মিত্র হিসেবে তাঁদের পাকড়াও করেছেন এবং গদগদভক্তিতে তাঁদের কথা বলেছেন, কারণ, ভারতীয়দের ঐক্যসাধনের মহান্ কর্মে তিনি তাঁদের অপরিহার্য ব'লে মনে করেন। আমার চোখে গান্ধী আর যাই হোন, আমার জাতের আন্তর্জাতিকতাবাদী নন ; তিনি জাতীয়তাবাদী, কিন্তু মহত্তম, সর্বোত্তম জাতীয়তাবাদী এবং সেই রকম,—যিনি ইউরোপের সমস্ত ইতর, অথবা নীচ, অথবা অপরাধপ্রবণ জাতীয়তাবাদের সামনে আদর্শ ব লে গণ্য হওয়া উচিত। তিনি এক আদর্শবাদী জাতীয়তাবাদী, যিনি চান তাঁর জাতি হোক আত্মবলে বলীয়ান,—নতুবা তার মৃত্যু হোক এবং নৈতিক সমুন্নতিতে জগতে আধিপত্য বিস্তার করলেও সে হোক বাকি জগতের কাছে বড় ভাইয়ের মতো,—কিন্তু বড় ভাই। এটা লক্ষণীয় যে গান্ধী ঘোষণা করেন জগতের কোনো কিছুর বদলেই তিনি কোনো মুসলমানের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না, এমনকি যাঁকে তিনি সবচেয়ে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর সঙ্গেও না। তিনি হিন্দুধর্মের সামান্যতম নমনীয়তাও মেনে নেবেন না। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, কোনো মানুষকে বাঁচাতে তিনি কখনো গো-হত্যা করবেন না। (এটা সমস্ত প্রাণীর জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধার ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র গুরুসংক্রান্ত বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপার)। আমার মনে হয়, তলস্তয় বা আমার ধাতের কারুর চেয়ে কোনো ক্যাথলিক সন্তের সঙ্গে (যেমন ফ্রাঁসোয়া দাঁসিজ্) তাঁর অনেক বেশি মিল।

(লঘু চিত্ত [léger] দিলীপকুমার রায়ের গালগল্প নির্ভরযোগ্য নয়।)

আগস্ট, ১৯২২। মাদ্রাজের প্রকাশক গণেশন মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র কিছু প্রবন্ধের সঙ্কলনের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন, তার অসমাপ্ত প্রুফও পাঠিয়েছেন ; তার উত্তরে লিখলাম :

"আমি মহাত্মা গান্ধীকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু আপনি ভূমিকা লেখার যে অনুরোধ করেছেন তা পারি বলে মনে করি না। বস্তুত, এই মহামানবকে যে-শ্রদ্ধা আমার করা উচিত, সেই সমস্ত শ্রদ্ধাটুকু নিয়ে আমি কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে চিন্তাধারায় কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি। আপনি তাঁর রচনাবলীর যে-অংশবিশেষ আমাকে পাঠিয়েছেন, তা থেকে আমি তাঁকে যতটা বুঝেছি, তিনি যতটা আদর্শবাদী তার চেয়ে কম (আমার মতো) আন্তর্জাতিকতাবাদী। আমি তাঁর মধ্যে পাই অধ্যাত্মবাদী জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে খাঁটি এক আদর্শ,—আজকের দিনের অদ্বিতীয় আদর্শ, এবং প্রকৃত ইউরোপের অহংবাদী এবং জড়বাদী জাতীয়তাবাদগুলোর সামনে একে মডেল হিসেবে দাঁড় করানো উচিত। আমার আশা, কোনো একদিন ইউরোপের কোনো সাময়িক পত্রে আমি তা করবো, কিন্তু গ্রন্থের একটা ভূমিকায় আমি তা পারি না, কারণ কোথায় আমার পার্থক্য তা আলোচনা করতে এবং দেখিয়ে দিতে আমি ততটা স্বাধীনতা পাবো না। আরও লিখলাম যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে তড়িঘড়ি মতামত দেওয়া আমার

কর্মপদ্ধতির অতিবিরুদ্ধ। একবার ভাসাভাসা পড়েই আমি তৃপ্ত নই ; অবসরকালেও আমি এ নিয়ে ভাবতে চাই। মহাত্মা গান্ধীর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার সম্মান যদি প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে ক্ষমা করবেন। তার যথাযথ কারণ, তার সম্পর্কে আমার এতো উঁচু ধারণা যে মনোযোগ দিয়ে পড়া শোনার পরই আমি তাঁর সম্পর্কে বলতে চাই, এবং তা চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে।—(বি দ্র. আপনি আমাকে যে প্রুফ পাঠিয়েছেন তাতে আরম্ভ ও শেষের পাতাগুলো নেই। যাই হোক না কেন, হাতে পেয়ে আদ্যন্ত পড়ার আগে আমি কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে কখনো কিছু বলি না।)

১৯২৩

জানুয়ারি, ১৯২৩। আমি জানি, জেনেভা সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মর্মপীড়া ঘটিয়েছেন ; যুদ্ধের সময়ের মতোই তারা অতি নির্বোধভাবে মিত্র শক্তিগুলোর চেয়ে বেশি "মিত্রশক্তি প্রেমিক" হয়ে রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, আলেক্‌সি ফ্রাঁসোয়া, বুভিয়ে প্রভৃতিরা তাঁকে ভয়ংকর ভাবে বলশেভিক ঠাউরেছেন। এই বিবরণকে, আমি এক মস্করা ব'লে ধারে নিয়েছি। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর বেরনার বুভিয়ে সেদিন আমার কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছেন, তা থেকেই এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমার কাছে এইভাবে চিত্রিত করলেন :

"তাঁর বক্তৃতার পর তিনি সাল'তে (মনে হয়, ক্লাপারেদে) বসে রইলেন যাজকজনোচিত এক অনমনীয় কাঠিন্যে, আর কিছুটা তীক্ষ্ণ চড়া গলায়, বিনা অঙ্গভঙ্গীতে, বিনা আবেগে বলতে শুরু করলেন ইউরোপের, পাশ্চাত্যের ভয়ংকর ব্যাপারগুলো, তার অপরাধগুলো, যার শাস্তি তাকে পেতে হবে ; তাঁর গলার স্বর হয়ে উঠল আরও তীক্ষ্ণ, আরও উগ্র। এবং অবশেষে, তিনি এক ভঙ্গি করলেন, ঠিক গিলোটিনের খাঁড়ার মতো। সেটা ভীতিপ্রদ।"…

বুভিয়ে বেশ অবাক হয়ে গেলেন, যখন আমি তাঁকে বললাম, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ আর যারই প্রতিনিধি হোন, বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার প্রতিনিধি নন। কিন্তু আমি তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মাতে পারলাম না। কারণ মূলত তিনি আমাকে ওইরকমই ভয় করেন।

গান্ধীর রচনাবলী পড়ে আমার মনে যে ধারণা হয়েছে এবং শুদ্ধীকৃত জাতীয়তাবাদের এই মহান্ দূতের মধ্যে আমি মধ্যযুগীয় যা খুঁজে পেয়েছি, সে সম্পর্কে কালিদাস নাগের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করায়, তিনি ১৯২২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা একখানা চিঠির প্রতিলিপি আমাদের দিলেন : এর সঙ্গে আমার চিন্তার মিল আছে :

"ভারতবর্ষে ফিরে আসার পথে আমি ভেবে দেখেছি যে, আমাদের দেশের মানুষের হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধী সেই ভাবাদর্শকে গভীর ও বিস্তৃতভাবে জাগিয়ে তুলেছেন, যার জন্যে রম্যাঁ রলাঁর মতো মানুষেরা উৎসর্গিত। আর আমি ঠিক করেছিলাম, আমার লেখায় ও কাজে আমি এই আন্দোলনে সহযোগিতা করবো। কিন্তু ভারতবর্ষে

ফেরার পর এমন আবহাওয়ার গন্ধ পেলাম যা আমাকে হতচকিত করেছে। প্রথম রোগটি যা আমার কাছে ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে, জনসাধারণের মনের উপরে স্বৈরাচার। তুমি জানো যে, আমাদের দেশের মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নিষ্ক্রিয়তা ও ঐতিহ্যিকতার দিকে ঝোঁকে ; অধিকন্তু তার উপর এখন এক নৈতিক স্বৈরতন্ত্র ; খুব কম লোকেরই সাহস আছে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির) বিরুদ্ধমত প্রকাশ করার। অন্যভাবে বলতে, আমি দেখেছি যে রাজনৈতিক স্রোত স্বাধীনতার প্রতিকূল। সম্ভবত সেই কারণেই পুরুষ নারী ও শিশুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই অবিশ্বাস্য ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করছে যে, চরকার মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্বরাজ অবশ্যই লাভ হবে, এবং সেই অনুসারে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত আলোচনা বর্জন করতে হবে। কারুরই এই ইচ্ছা নেই, সম্ভবত সৎসাহস নেই, পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করে : 'এই স্বরাজ বস্তুটি কী ?' এমনকি আমাদের দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও বলতে শুরু করেছেন, এই তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের ধর্মীয় বদ্ধমূল ধারণা এবং আলোচনা অর্থহীন। যদি একটা দেশের সাখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাই এমন অসম্ভব একটা উক্তিকে বেদবাক্যের মতো স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তাহলে সেটাই হবে স্বরাজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ! অবশ্য নেতারা এহেন মানসিক স্বৈরতন্ত্রের চোরাবালির উপরেই স্বরাজের অতিকায় অট্টালিকার স্বপ্ন দেখছেন। এ নয় যে সকলেই বিশ্বাস করে ৩১ ডিসেম্বর কোনো অলৌকিক উপায়ে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে কিন্তু বিশ্বাস করে, জনগণকে সম্মোহিত করার এই রকমটাই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা।...তুমি জানো যে, বহু শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষ হীনকর্মের অধিকারী (শূদ্র পারিয়া) ব'লে গণ্য হয়ে আছে ; তাই, যার উচ্চকর্মের অধিকার আছে সেই শ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সবসময়েই নৈতিক কথার মারপ্যাঁচের পন্থায় তথাকথিত হীন শ্রেণীকে উন্নত করাই যেন তার কর্তব্য ব'লে গণ্য করেছে ! তার স্বাভাবিক ফল হয়েছে, তারা কেবলমাত্র উন্নত করতে পারেনি তা নয়, তারা তার মনকে হত্যা করেছে। আমাদের আধুনিক রাজনৈতিক নেতারা সেই একই রাজনীতি অনুসরণ করছেন বলে মনে হয়। এটা সম্পূর্ণ এইরকম, যেন শেকলবাঁধা একটা পাখির ডানায় সুতো বেঁধে তাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা চলছে, যে-শেকলে তার পা বাঁধা আছে তা থেকে যাতে সে বেরিয়ে আসে ! তার ফল এই যে, বেচারা পাখি পা ভেঙেছে, সেইসঙ্গে ডানাও ছিঁড়ে গেছে। এমন পদ্ধতি তারাই অবলম্বন করতে পারে, যারা মনে মনে শেকলের দেবতারই ভক্ত। নতুন বন্ধন দিয়ে তারা পুরনো বন্ধন ভাঙার চেষ্টা করছে ! তুমি ভালো করেই বুঝতে পারো, কেন এমন জিনিস আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তাই আমিও জানিয়ে দিয়েছি, আমি সত্যকে মানতে প্রস্তুত,—নিছক গান্ধীকে নয় ;—এবং এইকথা অনেকের মনঃপূত হয়নি।

...পরে আমি আবিষ্কার করেছি, গোটা আন্দোলনই পশ্চিমের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধিতায় সংক্রামিত হয়েছে। আমি জানি, গতানুগতিক জাতীয়তাবাদের জগন্নাথের রথকে জাতিবিদ্বেষের রশির টানে সাধারণভাবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু আনন্দে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমরা এখন জগতকে (গান্ধীর

নেতৃত্বে) দেখাতে সক্ষম হতে চলেছি যে, আমাদের রাজনীতির ভিত্তি এই বিদ্বেষ এবং এই বিরোধিতার উপরে নয়। একটু একটু ক'রে আমি আবিষ্কার করেছি, যখন বিদ্বেষ সহজেই দেহ থেকে মনে স্থানান্তরিত হয়, তার মন্দ ফলটা কম হয় না। এই সমস্ত বছরগুলো ধরে নেতারা প্রতিটি কংগ্রেসে ফিরে ফিরে এসে পাঞ্জাবের নৃশংসতা এবং খিলাফতের অবিচারের উপরেই অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। এই সত্যের উপরে কম জোর দেওয়া হয়েছে যে, ভারতবর্ষের স্বায়ত্বশাসন নির্ভর করে ভারতবর্ষের নৈতিক সমুন্নতি এবং বীর্যবত্তার উপরে। অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায়ের স্মৃতি জনসাধারণের মনে দিনের পর দিন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে ; অবশ্য বিদ্বেষ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যে (অন্তত মৌখিকভাবে) সাবধান করা হয়েছে। এ যেন নাকে নস্যি গুঁজে দিয়ে হাঁচা নিষেধ ব'লে সাবধান করা হচ্ছে ! কিন্তু যখন অবশ্যম্ভাবী বিস্ফোরণ ঘটল (বিদেশীদের বিরুদ্ধে হিংসার আকারে), তখন মনে হলো, নেতারা বিস্মিত হয়েছেন, তাঁরা ঘোষণা করলেন, জনসাধারণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে এখনো প্রস্তুত হয়নি।...বারংবার গান্ধী তাঁর দৃষ্টিকোণ ঘোষণা করেছেন ঃ "শয়তানীকে ঘৃণা করতে পারো, কিন্তু শয়তানের প্রতি তোমার প্রেম যেন আবিল না হয়।"—কিন্তু সাধারণ জনেরা সূক্ষ্ম পার্থক্যটি ধরতে পারেনি। তাই তাদের বিদ্বেষ এবং তাদের ক্রোধ নেমে এসেছে পাপের বিগ্রহের প্রতি,—বিমূর্ত পাপের উপরে নয়।

এইভাবে অসহযোগের সবচেয়ে দুটি শক্তিশালী স্তম্ভই ধ্বসে পড়েছে। প্রথমটি হচ্ছে স্বরাজ লাভের নির্দিষ্ট-করা সময়সীমা (৩১ ডিসেম্বর) ; এটা ধ্বসে পড়েছে, কারণ সাফল্য সব সময়েই আমাদের কঠোর প্রচেষ্টার সমানুপাতিক, তাকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করা যায় না, যেমনটি আমাদের নেতারা চরকা দিয়ে করতে চেষ্টা করেছিলেন ! —আমাদের দ্বিতীয় আশ্রয়টি যা ধ্বসে গেছে, তা হচ্ছে অহিংসা, কারণ যখন বিদ্বেষকে সংক্রামিত করার চিন্তা নিরন্তর আমাদের মনকে সংক্রামিত করছে, তখন পাকাপাকিভাবে হিংসাকে এড়ানো কঠিন। পূর্ণ অহিংসা তখনই সম্ভব, যখন বিরুদ্ধ চিন্তার মূল উপড়ে ফেলা হয়। এইখানেই প্রকৃত সত্য। নিছক নৈতিক সূচিকাভরণে তা লাভ করা যায় না, এমনকি গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এলেও না…

অধিকন্তু, এই শত্রুতা কেবলমাত্র সরকার এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমেত সবকিছু নিয়ে পশ্চিমের সভ্যতার বিরুদ্ধে। যেন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলে কোনো ভেদরেখা আছে ! ঠিক এমনিভাবে অসহযোগীরা তাদের প্রচার শুরু করেছে বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে, এমনি ভাবেই এরা চেয়েছে বিদেশী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে ! এবং আমি যখন প্রতিবাদ করেছি, প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা আমাকে এই বলে বিদ্রূপ করেছে যে, পশ্চিম থেকে পাওয়া প্রচুর প্রশংসা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে আমার চিন্তা সবসময়েই পশ্চিমের অভিমুখী হয়ে আছে। আর, আমার মানসিক বিপথগামিতা প্রমাণিত হচ্ছে আমার বিশ্বভারতীর জন্যে আমি আমার পশ্চিমের বন্ধু ও অতিথিদের যে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পশ্চিমে

আমি দেখেছি, রম্যা রলাঁ এবং অন্যদের মতো মহৎপ্রাণেরা তাঁদের জীবন কেমন ক'রে মানবতার স্বার্থে উৎসর্গ করেছেন ; তাঁদের কাছে জাতীয় ও বিজাতীয়ের ভেদরেখা লুপ্ত হয়েছে ; আর এইজন্যেই নিজেদের দেশের জাতীয়তাবাদীদের হাতে তাঁদের নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে, মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও গান্ধী জাঁকালো আদর্শটিকে—যার মধ্যে বস্তু আছে—ভারতীয় রাজনীতির সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি সব সময়েই বিশ্বাস করি, দেশ একমাত্র সেই আদর্শেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে যে-আদর্শ দেশের ঊর্ধ্বে। নেতারা সব সময়েই জোর দিয়ে বলেন, স্বদেশের আদর্শকে আমাদের প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, এবং একমাত্র তারপরই বিশ্বজনীন আদর্শকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। মনে হয় তাঁরা ভুলে যান, যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানুষকে নিরাময় করে, তা মূলত বিশ্বজনীন। যে পরিমাণে আমরা মানবতাকে উপলব্ধি করবো, আজ আমরা সেই পরিমাণেই দেশকে উপলব্ধি করতে পারবো। কিন্তু অনেকেই ভাবেন, প্রাচ্যকে উপলব্ধি করার পথ হচ্ছে পশ্চিমের পথকে নস্যাৎ করার মধ্যে। কোনোদিন এই দার্শনিকেরা ঘোষণা করবেন যে, পশ্চিমের হতভাগ্য মানুষদের জন্যে শক্তিহীনা বসুমতী সূর্যের চারপাশে ঘুরছেন, আর তার বিপরীত ভগবান-প্রেরিত প্রাচ্যের মানুষদের জন্যে বসুমতী স্থির হয়ে আছেন অনন্ত বাসুকীর মজবুত ফণার উপরে।...

আমি দেখছি যে আমাদের দেশের মানুষের মন গুরুর নির্দেশ এবং চরকার অলীক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে! গোটা আন্দোলনটাই মনে হচ্ছে এমন এক দৃষ্টি পরিধিতে ছড়িয়েছে যেখানে আছে শুধু প্রাচ্যের দিকটাই, যেখানে পাশ্চাত্যের দিকটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত!..."

জানুয়ারি, ১৯২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন থেকে (২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২)। এক স্নেহপূর্ণ চিঠি, তাতে আমাকে তাঁর উপন্যাস 'গোরা'র ফরাসীতে প্রকাশের ভার দিয়েছেন, আর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আমি যেন সত্বর ভারতবর্ষে যাই।

মার্চ, ১৯২৩। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে দু'মাস (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি) কাটালাম, সেটা প্রকাশিত হবে দু'টি নিবন্ধে সাময়িক পত্র 'য়ুরোপ'-এ, পরে তা গান্ধীর রচনাবলীর ফরাসী ও জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধের কাজ করবে। কয়েকমাস ধরে প্রতিটি সন্ধ্যা কাটিয়েছি, আমার বোন আমাকে পড়ে শুনিয়েছে মাদ্রাজে প্রকাশিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র মোটা খণ্ডটি (গান্ধীর প্রবন্ধ সঙ্কলন), আর ভারতবর্ষের গান্ধীবাদী সাহিত্য।—বন্ধুবর কালিদাস নাগ কিছুটা আলোকপাত ক'রে আমাদের সাহায্য করেছেন।

এপ্রিল, ১৯২৩। হেরমান হেসের "সিদ্ধার্থ"—যার প্রথম খণ্ড আমাকে উৎসর্গ করা হয়েছে—ভারতীয় চিন্তার উপরে ভিত্তি ক'রে (ভাবিত হয়ে) রচিত ইউরোপীয় লেখকদের প্রগাঢ়তম রচনাগুলোর মধ্যে একটি। (কালিদাস নাগ যখন লুগানোতে

এটি পড়েন, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।) শেষের পনর থেকে কুড়ি পৃষ্ঠা ভারতীয় প্রজ্ঞার সঞ্চিত ঐশ্বর্যে সংযোজিত হতে পারে: কারণ এগুলো তাকে শব্দান্তরে প্রকাশ ক'রে তৃপ্ত হয়নি, তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। হেস আমাকে লিখেছেন, তাঁর অন্য কোনো রচনা এমন এক গভীর নীরবতার মধ্যে পড়েনি। তাঁর বন্ধুরা ধন্যবাদ জানানোর কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেন নি।

এপ্রিল, ১৯২৩। যাতায়াতের পথে আমাদের সুযোগ হলো কমন্স সভায় গিয়ে ই. ডি. মরেলকে দেখার, গত বছর বিপুল ভোটাধিক্যে চার্চিলকে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

...আলোচনার সময় ই. ডি. মরেলের একটি কথায় জানলাম, সি. এফ. এনড্রুজ লন্ডনে আছেন। এনড্রুজ রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর বন্ধু, গান্ধীর বিষয়ে পড়াশোনার সময় তাঁর সাক্ষ্য এতো মূল্যবান ছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হোটেল সেসিল্-এ দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলাম (তিনি থাকেন খুব কাছে, পোলক্-এ স্ট্র্যান্ডে)। তিনি এলেন, আমাদের সঙ্গে ৪ঠা মে'র দুপুরটা কাটালেন।

ছোটোখাটো, গোল মাথা, একজোড়া ভারি গোঁফ, আর পাকধরা দাড়ি। ধর্মপ্রচারকোচিত শান্ত, গম্ভীর চেহারা। (ওঁকে দেখে প্রায়ই কল্পনা করি খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যদের একজনকে।) কথা বলেন অত্যন্ত আস্তে, শান্তভাবে, মুখে হাসি লেগে থাকে। তিনি হাইল্যান্ডের স্কচ, ভারতবর্ষে আছেন গত বিশ বছর। ১৯০৩-৪ সালে গান্ধী যখন জেলে, ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে ট্রান্সভালে পাঠানো হয় গান্ধীর স্থান নেবার জন্যে; তিনি গান্ধীর জীবনের, তাঁর দুঃখকষ্টের ভাগীদার হয়েছেন, এবং ১৯১৪ সালে গান্ধী আর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মধ্যে যে সন্তোষজনক মীমাংসা হয়, তাঁর বিজ্ঞতায় এবং যোগ্যতায় তাতে তিনি অনেকখানি সাহায্য করেছেন। পূর্ব আফ্রিকায় নতুন ক'রে নির্যাতিত ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্যে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা লাভের আশায় তিনি এখন ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্যে যোগসূত্র, আর শিক্ষকতা করেন শান্তিনিকেতনে।

তিনি বললেন: যখন এক অটুট ধৈর্যে কথা বলতে শুরু করেন তখন ছাড়া, গান্ধী মানুষটি ছোটখাটো, দেখতে অকিঞ্চিৎকর। তাঁর ভাবভঙ্গিতে কঠোর কিছু নেই। তিনি হাসেন শিশুর মতো, এবং শিশুদের ভীষণ ভালবাসেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর শান্তিনিকেতনে তিনি প্রথম ঘন্টাটি কাটিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে মাটিতে বসে। এনড্রুজ দেখেছেন, একটি শিশুর মৃত্যুতে তিনি কী তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর তপশ্চর্যা চরম। যদিও প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে, এনড্রুজ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখকষ্টকে তেমন বড় কিছু ব'লে গণ্য করেন না, তবু হাসতে হাসতে স্বীকার করলেন, তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সঙ্গী ছিলেন, জীবনটা কঠিন ছিল। গান্ধীর নীতি হচ্ছে এই যে, সেটা হবে দুঃখ ভোগের, নির্যাতন সহ্য করার, ফাঁসিকাঠে-ঝোলার এক প্রস্তুতি। এবং বাংলাদেশে যে ফল লাভ করেছেন

তা বিস্ময়কর। এখন তিনি জেলখানায়, তিনি সুখী; তিনি চান, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসে। তিনি নিজের শুদ্ধি করছেন, উপাসনা করছেন, আর তিনি বিশ্বাস করেন যে, এইভাবে তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে ফলপ্রদ পন্থায় কাজ করছেন।—প্রকৃতপক্ষে এনড্রুজ নিঃসন্দেহ যে, এই গ্রেপ্তারের ফলে অনেক লাভ হয়েছে। একদিকে, এ ভারতবর্ষের উদ্দীপনাকে জাগিয়ে রেখেছে; গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষ দেখেছে শ্রীকৃষ্ণকে (পুরাণে আছে, কৃষ্ণও এইরকম বন্দী হয়েছিলেন এবং অলৌকিকভাবে তাঁর কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন)। এবং সর্বোপরি, ভারতবর্ষের আন্দোলনে দন্ডপ্রাপ্ত গান্ধীর আরোপিত অপেক্ষার নীতি হিংসার বিপদ এড়াবার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। মূলত, গান্ধীর গোঁড়া অনুগামীদের বেশির ভাগই—বিশেষভাবে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় সবকিছুর আগে রাজনীতিবিদ। এনড্রুজ বললেন, তাঁর সেরা শিষ্য সম্ভবত তাঁর ছেলে, ২৪ বছর তার বয়স। (তাঁর ৪ ছেলে।) এনড্রুজ প্রকাশক গণেশনের কথাও বললেন, তিনি যেন এক উৎসাহী ধর্মপ্রচারক। শ্রীমতী গান্ধী অত্যন্ত ভালো মানুষ, অত্যন্ত সরল এবং সাহসী। স্বামীর দুঃখকষ্টের ভাগ নিতে কখনো ইতস্তত করেন নি।

ভারতবর্ষে ফিরে যাবার কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল এনড্রুজ ছিলেন তার একমাত্র সাক্ষী। তিনি তাঁদের বর্ণনা করলেন, তাঁরা যেন দু'টি বিরোধী ভারতীয় জাতির দু'টি নমুনা: গান্ধী পশ্চিম ভারতের, কম কল্পনাপ্রবণ, অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন জাতির লোক। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আলোচনার প্রথম বিষয় ছিল প্রতিমাপ্রসঙ্গ। গান্ধী তা সমর্থন করলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস, জনসাধারণ এখুনি বিমূর্ত ভাবাদর্শে জেগে উঠতে অক্ষম। জনগণকে অনন্তকাল ধরে শিশুর মতো দেখা হবে, এটি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন না। প্রতিমা-পতাকার (idol-drapeau) মাধ্যমে ইউরোপে যে বড় বড় জিনিস লাভ হয়েছে গান্ধী অজুহাত হিসেবে সেগুলো তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদের সুযোগ পেয়ে গেলেন। ইউরোপের পতাকায় যেখানে ঈগল ইত্যাদি আছে সেখানে তিনি তাঁর পতাকায় চরকা বসিয়েছেন, তার তুলনামূলক বৈষম্য দেখিয়ে গান্ধী নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে। গান্ধী তাকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হলে জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—ঠিক যেমন শান্তিতে পৌঁছুতে হলে যেতে হয় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। (ভয়াবহ যুক্তি!) এইজন্যেই তিনি ইংরেজের বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের জন্যে এতো বার কাজ করেছেন। এ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে এনড্রুজ তাঁকে কুড়িখানা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু গান্ধী কখনো হার মানেন নি।

গান্ধীর সঙ্গে সন্ত পলের এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্লেটোর তুলনা এনড্রুজ অনুমোদন করলেন। হেসে বললেন, গান্ধী পুরোপুরি সন্ত পল।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা বললেন, তিনি তাঁকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ছিলেন প্রিন্স, তিনি তাঁর সম্পত্তি নয়ছয়

করেছিলেন, কেবল ছেলের জন্যে একটা অংশ সন্দেহজনক উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ছেলে (রবীন্দ্রনাথের বাবা) সে-অর্থ মোটেই গ্রহণ করেন নি ; তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দাবীদারদের। তারা এই সততায় এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, তাঁকেই পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক করেছিল। কয়েক বছর পরে তত্ত্বাবধানের দক্ষতায় ঋণশোধ করতে এবং সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি সব ছেড়েছুড়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। আজকে যাকে শান্তিনিকেতন বলে, সেখানে সৌন্দর্যহীন নগ্ন প্রান্তরে দু'টি গাছের নীচে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সের ছেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি গান গাইতেন আর বাবা প্রার্থনা করতেন। সাধকের এই ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের জমিদার অঞ্চলটি তাঁকে দান করেছিলেন। গল্প আছে, যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, এক ডাকাত এসেছিল তাঁকে হত্যা করতে, সে ভেবেছিল, তিনি এক গুপ্তধনের উপরে আসন ক'রে বসে আছেন, কিন্তু প্রার্থনাকারীর মুখচ্ছবির সৌন্দর্য দেখে সে সংকল্প ত্যাগ করেছিল এবং তাঁরই সঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথও নির্দিষ্ট পর্বে পর্বে ধর্মীয় ভবঘুরেপনার কবলে পড়েছেন। যদিও তিনি বন্ধুবান্ধব এবং আপনজনদের দরদ দিয়ে ভালবাসেন, তিনি পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকোয় বেরিয়ে পড়েন এবং কয়েক মাসের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যান। যখন আরও তরুণ ছিলেন, বলতে কি, তিনি এইরকমই ছিলেন—তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে কৌতূহল জাগাতে সারা ভারতবর্ষে সম্প্রতি এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাতে এখন তিনি বড়ই ক্লান্ত। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিপূর্ণ উন্নতির পথে—শান্তিনিকেতনে কোনো কড়া নিয়ম নেই, অন্যদিকে গান্ধীর আশ্রমে সবকিছু প্রায় সামরিক নিয়মমাফিক! তপশ্চর্যার এক সামরিক বিদ্যালয়!

ভারতীয় রসিকতা সম্পর্কে কালিদাস নাগের কাছ থেকে আমরা যা জেনেছিলাম (সে রসিকতা ইউরোপীয়দের চোখে সবচেয়ে গুরু গম্ভীর প্রাচীন পুঁথিগুলোতেও চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ে) তা যথার্থ ব'লে এনড্রুজ আমাকে জানালেন। তিনি গল্প বললেন, প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন, মনে মনে ভেবেছিলেন এক নিখুঁত গাম্ভীর্য দেখাতে হবে ; কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি তাঁকে নিয়ে এক রসিকতা জুড়ে দিলেন, সে-কথা বলতে বলতে এনড্রুজ হাসলেন ;—কিন্তু সেটি মোটেই বললেন না। 'মডার্ন রিভিউ'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত পিয়র্সনের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ যে উপন্যাসটি আমার বোন অনুবাদের পরিকল্পনা করেছে—সেই 'গোরা'—এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর কাহিনী, এক প্রচন্ড বিশ্বাসে জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করার পর আবিষ্কার করল যে সে ভারতীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ আমার প্রতি যে স্নেহ পোষণ করেন এবং তাঁর ওখানে আমাদের যাওয়া সম্পর্কে যে প্রতীক্ষায় আছেন, তার কথা জোর দিয়ে তিনি বললেন।— (কয়েক সপ্তাহ পরে পিয়র্সন ইংলন্ডে এসে কলম্বোগামী এক জাহাজে একসঙ্গে একটি

কেবিন ঠিক ক'রে রাখার প্রস্তাব ক'রে চিঠি লিখেছেন, মার্সেই থেকে সেটি ছাড়বে ২ নভেম্বর।)

মে, ১৯২৩। রবীন্দ্রনাথের ২৭ এপ্রিলের চিঠি (শান্তিনিকেতন)। তিনি আমাদের দু'টি অপ্রকাশিত গল্প (ইংরেজিতে) পাঠিয়েছেন, তার একটি আমার বোন 'য়ুরোপ'-এর জন্যে অনুবাদ করেছে; সেটি চমৎকার। হাস্যমুখর, আলাপচারী, ব্যঙ্গপ্রবণ এক রবীন্দ্রনাথ,—ইউরোপে ইনি কম পরিচিত। তাঁর আশ্রমে একটা শীত কাটিয়ে যাবার জন্যে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। কালিদাস নাগ এসেছেন সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহটা কাটাতে। তিনি আমার বোনকে সকালে বাংলার পাঠ দিলেন; সমস্ত ভাষার মতো এই ভাষাতেও আমার বোনের অতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। বিকেলে তিনি আমার অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, ভারতবর্ষে বই লিখতে চান এটা মনে রেখে। তাঁর খাতিরে আমার পুরনো কাগজপত্রের একটা অংশ উদ্ধার করলাম; এবং তা থেকে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কথা পড়ে শোনালাম। তাঁর মতো আমিও অন্তর্জীবনের শক্তি এবং ফরাসীদের মধ্যে তার ব্যতিক্রমী চরিত্রগুলোতে অভিভূত হলাম। ১৯০৮ সালে জানিক্যুলের সত্য-উপলব্ধি, রদাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ১৯১০ সালে মাহ্‌লের-ফ্রেশট্‌ক্রিফ্‌ট থেকে একমাত্র জার্মান ভাষায় প্রকাশিত শৈশবের পরিচ্ছেদটি তিনি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলেন। ভিলা অলগায় কালিদাস নাগের সঙ্গে ডব্লিউ. ডব্লিউ. পিয়র্সনের দেখা হয়ে গেল এবং তিনি সেখানে একটি দুপুর কাটিয়ে গেলেন। পিয়র্সন ছিলেন এনড্রুজের সঙ্গে ট্রান্সভালে গান্ধীর, তারপর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহচর, সেখানে তিনি শিক্ষক, তাঁর ছবি দেখেছি, মুখটা আগেই পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সঙ্গে তোলা ফটোতে দেখা যায় তাঁর মুখে, নিঃশংক চোখদু'টিতে কিন্তু বয়স আর ক্লান্তির ছায়া পড়েছে। আমরা শুধু গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের কথাই আলোচনা করলাম। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানলাম রবীন্দ্রনাথের কঠিন—প্রায় বিপজ্জনক অবস্থার কথা। নিজের পরিবারে তিনি বিচ্ছিন্ন, পরিবার তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তাঁর প্রতি যে-তিক্ত ক্ষোভ পোষণ করে তা, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের পিছনে তাঁর নিজের সম্পত্তি নষ্ট করা সম্পর্কে ক্ষোভের চেয়ে কম নয়। পরিবারের মধ্যে ব্যতিক্রম তার ছেলে আর ছেলের স্ত্রী, তাঁর সঙ্গে এঁদের ত্রুটীহীন, এমনকি স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ…প্রায় একমাত্র নিজের টাকাতেই শান্তিনিকেতনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কোন মহারাজা, কোনো পার্শি বা উচ্চবর্ণের কোনো লাখোপতিকে তিনি পান নি, যিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেবেন, তা সে আত্মগরিমার জন্যেই হোক অথবা স্নবারির জন্যেই হোক। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বৈষয়িক লোক নন এবং দুর্ভাগ্যবশত তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে কারুর উপর নির্ভর করতে পারেন না; সারা জীবনের মতো প্রকাশক ম্যাকমিলানের কাছে হাস্যকর শর্তে নিজেকে বাঁধা দিতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের গহ্বরে মোটা

অংক তলিয়ে যায়; আর বিগত বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারির আয় প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। আয়ের জন্যে তিনি বক্তৃতা দিতে এবং এমনকি কলকাতায় নাট্যাভিনয় করতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে গেয়েছেন, নেচেছেন। তার জন্যে তিক্ত অসম্মান লাভ হয়েছে। কাব্যের প্রতি তাঁর পবিত্র কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করতে না পারার জন্যে তিনি পীড়িত। স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি পালিয়ে যাবার কথা ভাবেন। এই শীতেই তিনি এখন চীনে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের কি হবে? পিয়র্সন শান্তিনিকেতনে গান্ধীর প্রথম আগমনের বর্ণনা করলেন: তাঁর আসার দিন সন্ধ্যায় সবকিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন। পিয়র্সন ও অন্য অধ্যাপকরা গান্ধীর খুশিমতো সবকিছু দেখানোর জন্যে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী সবচেয়ে আগে চাইলেন স্বাস্থ্য ও বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হতে। তিনি গৃহস্থালি দেখলেন এবং রান্নাঘর থেকে বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন: "রাঁধুনিরা নোংরা। বিদেয় করুন ওদের।" সঙ্গে সঙ্গে ওদের বিদেয় করা হলো। পরে, কাজকর্ম বিশৃংখল হয়ে পড়ায়, তিনি ছাত্রদের চাকরের কাজে এবং রান্নার কাজে লাগালেন—(অবশ্য তাদের সঙ্গে মাস্টারদেরও)। আর অদ্ভুত এই যে, প্রথম থেকে প্রত্যেকে তাঁকে মেনে চলল। পিয়র্সন বললেন: "আমরা আর মাস্টার রইলাম না। প্রতিটি ছাত্র গান্ধীর নির্দেশ উৎসাহ-ভরে পালন করল।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "তাঁর গলা কেমন?" উত্তরে পিয়র্সন বললেন: "তাঁর গলা নেই। এই আমরা যেমন এখানে (এক টেবিলের দু'ধারে বসে) বলছি, এর চেয়ে জোরে তিনি লোকের সামনে বলেন না। কিন্তু তাহলে, তা শোনা যায় না?—শোনা যায় না। আর গোটা জনতা তাঁর ঠোঁটের সঙ্গে লেগে থাকে এবং অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করে। তাঁর ক্ষমতা চুম্বকের মতো।" তাঁর মত পাল্টানো অসম্ভব ব্যাপার। সমস্ত আলোচনার কিছুই পাল্টাবে না। গোখেলকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং তখন গোখেল মৃত্যুশয্যায়, যে-কোনো মুহূর্তে ইহলোক ত্যাগ করতে পারেন, তিনি প্রতিদিন ট্রান্সভালে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এক আইনে সই করার অনুনয় জানিয়ে, গান্ধী যে-সই করতে নারাজ। গান্ধী জানতেন যে, তাঁর অস্বীকৃতি গোখেলের মৃত্যু ঘটানোর হেতু হতে পারে: কিন্তু কিছুই তাঁকে পাল্টাতে পারেনি। জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে কাজের ব্যাপার ঠিকঠাক হলে গান্ধীর উচিত ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়া, টেলিগ্রামে জানানো হয়েছিল তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক। কিছুতেই কিছু না।—"চুক্তি সই করার আগে আমি ফিরবো না।" চুক্তি সই করানোর জন্যে পিয়র্সন গেলেন জেনারেল স্মার্টসের খোঁজে, ভোর চারটে থেকে অপরাহ্নের প্রথম অবধি: স্মার্টস সই করতে রাজি হলেন। তখন, গান্ধী জায়গা ছেড়ে নড়লেন।—তিনি ও তাঁর স্ত্রী দেখতে শীর্ণ, একজন অন্যজনের মতোই দুর্বলস্বাস্থ্য: আর আশ্চর্য এইটেই যে, তাঁরা প্রতিরোধ করতে জানেন। পিয়র্সন শ্রীমতী গান্ধীর উচ্চ প্রশংসা করলেন, তাঁর সরলতা, তাঁর দাক্ষিণ্য, তাঁর শালীনতার সাধুবাদ করলেন: এসব ছাড়া, তাঁর মধ্যে কোনো উচ্চস্তরের বুদ্ধিগত কিছু নেই।—(আমার বিশ্বাস) কালিদাস নাগের সুখস্মৃতি আছে ১৯১৬ সালের

শেষ নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনের ; তখন একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল আনি বেসান্তকে, যিনি আবার সভানেত্রীত্ব করছেন শেষবারের মতো ; দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে – উদ্বোধনী কবিতা পাঠ করছেন তাঁর বিস্ময়কর কণ্ঠে, তা শুনছে বিশালতম জনতা ; মল্লবীরের মতো তিলককে, আর গান্ধীকে। তিনি আরও দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক অভিনয় করছেন গান্ধীর সামনে, আর প্রথম সারিতে বসে গান্ধী তাঁর আবেগ প্রকাশ করছেন এক শিশুর মৃত্যুতে কেঁদে ভাসিয়ে।

পিয়র্সন গান্ধীর একটি সুন্দর ফটো আমাদের দেখালেন, ট্রান্সভালে তোলা, এন্‌ড্রুজ আর পিয়র্সয়নের মাঝখানে তিনি ; আমরা মঁত্র্য থেকে তার ফটো-কপি করিয়ে নিলাম। জুরিখের প্রকাশক এমিল রনিজে (তাঁকে আনিয়েছি যাতে পিয়র্সন আর নাগের সঙ্গে দেখা হয়) এর একটা নেগেটিভ সংগ্রহ করলেন।

ভিলন্যভে কালিদাস নাগ আছেন ২ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তারপরেই রওনা হবেন ইতালি, সেখান থেকে চোদ্দ দিনে পৌঁছে যাবেন ভারতবর্ষে। একসঙ্গে বসে যে আলাপচারী হলো তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, মাদাম ক্রুপি আর মনো-হেরজেন ছাড়া এমন একজনও ফরাসী বুদ্ধিজীবী নেই, যিনি তাঁর কাছে আমার অখ্যাতি করেন নি। যেহেতু আমাকে খুব যুক্তিযুক্ত ভাবে বিশ্বাসঘাতক বলতেও পারা যায় না, আমার নৈতিক সততায় সন্দেহও করা যায় না, আমাকে দেখানো হয়, যুদ্ধে অস্বাস্থ্যকরভাবে পীড়িত এবং তা থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে অক্ষম এক হতভাগ্য ব'লে। আমার শেষের রচনাগুলোতে বিনা অনুমতিতেই তা থেকে বেরিয়ে আসায় এখন তাদের বড়ই খারাপ লাগছে। আমার 'গান্ধী' আরও হয়েছে পুকুরে হাঁসের দঙ্গলে ছোঁড়া ঢিল। দেখা যাচ্ছে (এতে আমার সন্দেহ থাকা উচিত নয়)—যে, ফ্রান্সে আমিই প্রথম আধুনিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তথ্যসমন্বিত সমীক্ষা প্রকাশ করেছি। ভারতবিদ্যাবিদদের মধ্যে সোরগোল উঠেছে। প্রাচ্যবিদ্যাবাগীশদের গোত্রভুক্ত না হয়ে কেমন ক'রে আমি প্রাচ্য সম্পর্কে বলতে সাহস করলাম ? বিশেষ ক'রে আঁচড় লেগেছে সিলভ্যাঁ লেভির গায়ে (গত শীতকালটা তিনি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এসেছেন) ঃ কারণ আমি তাঁকে পিছনে ফেলে গেছি—(অবশ্যই না ভেবে)। আমাকে পরামর্শ-উপদেশের জন্যে তিনি কালিদাস নাগের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার গ্রন্থের শিরোভাগে নাগকে ধন্যবাদ দেওয়ায় তাঁকে বোকার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষাবিদ্বেষের মুখে ফেলে দিয়েছি ; আর তখন থেকে পণ্ডিত মহলে তাঁর সঙ্গে ইচ্ছাকৃত নিরুত্তাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। সুখের বিষয়, তাঁর আর ওঁদের প্রয়োজন নেই, সাফল্যের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রাচ্য ভাষাসমূহের গবেষণা-প্রবন্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং এশিয়ায় ফিরে যাচ্ছেন। এর আগেই আমার বিরুদ্ধে সিলভ্যাঁ লেভি শত্রুতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলেন, যখন পারীতে থাকার সময় নাগ রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করেছিলেন। সিলভ্যাঁ লেভি চটে গিয়েছিলেন। (আর রবীন্দ্রনাথ যখন আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন তাঁকে বলা হয়েছিল, আমি পারীতে নেই। আকস্মিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ আমার ঠিকানা পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন এবং আমাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ যদি বিঘ্নিত করতে না পেরেও

থাকে, মেজঁ দ্যু মঁদে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, সেখানে যেসব বে-সরকারী মতামতের ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাতো, তাঁদের চিঠিপত্র আটকানো হতো। সেটা কষ্টসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ফরাসী পড়তে জানতেন না। যেমন খুশি চিঠিপত্রের অর্থ করা হতো। এটা সম্ভাব্য যে, ইউরোপের অন্যদেশে পারীর চেয়ে পৃথকভাবে আচরণ করা হয় না ; আর এইভাবে, কবিকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা এবং তার কাছে মুক্ত ইউরোপকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জেগেছিল ; এবং আমাদের সাক্ষাৎ মিথ্যার এই সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য নস্যাৎ ক'রে দিয়েছিল।)

যুদ্ধের সময় পিয়র্সন বন্দী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাপানে, সেখানে শান্তিবাদ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি অতি নরমপন্থী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের ইচ্ছে ছিল তাঁকে জাপানে গ্রেপ্তার করানো। জাপান তা প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু চীন ছিল আরও বশংবদ। পিয়র্সন গ্রেপ্তার হলেন পিকিংএ, পাঠানো হলো, বিচার হলো হংকংএ (সেখানে জজসাহেব তাঁকে বললেন, তাঁর অপরাধের জন্য তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতে পারেন না) এবং তাঁকে চালান করা হলো লন্ডনে, সেখানে কয়েক দিন পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। হাসিমাখানো প্রশান্তিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে গেলেন।

কালিদাস নাগকে বিদায় দিতে আমাদের দুঃখ হচ্ছে, তাঁর প্রাণবন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব মনকে প্রসন্ন করে এবং আমি বিশ্বাস করি, ফুরিয়ে-আসা প্রশান্ত গ্রীষ্ম যাকে সাজিয়েছিল, সেই ভিলা অলগার এই সাতটি দিনের সুখস্মৃতি তিনি তৃপ্তমনে বয়ে নিয়ে যাবেন। ভারতবর্ষে যাবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে, আর তা যত তাড়াতাড়ি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আমার পক্ষে তা হবে—সে-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত—এক সুযোগ এবং আমার ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষেও হবে তাই, তাঁরা মনের দিক থেকে বড়ই বিচ্ছিন্ন এবং তাঁদের সঙ্গেই আমার ভাবনার যোগ আছে ব'লে আমি অনুভব করি।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। জেনেভায় লিগ অফ নেশনস্-এর তথাকথিত কার্যাবলী দেখে দুঃখিত পিয়র্সন আবার ভিলন্যভ হয়ে গেলেন। লিগ অফ নেশনস্ তাঁকে গভীরভাবে হতাশ করেছে।—শান্তিনিকেতন সম্পর্কে যা কিছু বললেন তা বেশ নিরুৎসাহজনক। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের—(বাস্তবের চেয়ে বেশি কাল্পনিক)—অভাব প্রকৃত সংগঠনের। শিক্ষার বিষয়বস্তুর শ্রেণী-বিভাগের কোনো পরিকল্পনা নেই। ইতিহাস অথবা সাহিত্য বা সাধারণ দর্শনের একটা কোর্স নেই। বক্তৃতার তালিকা এবং বৎসরের কোর্স হঠাৎই নির্দিষ্ট হয়। এই কোর্সের সময়সূচি চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত। কখনো কখনো ছাত্ররা আসে নির্দিষ্ট সময়ের এক কি দুই ঘন্টা পরে। বাঙালীরা বুদ্ধিমান, অত্যন্ত গুণী, কথায় ও অঙ্গভঙ্গিতে দাক্ষিণাত্যদের মতো উচ্ছ্বসিত, কিন্তু অধ্যবসায় নেই, লেগে-থাকার মন নেই। তারা যেমন তাড়াতাড়ি এলিয়ে পড়ে, তেমনি তাড়াতাড়ি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

তাদের প্রয়োজন বলিষ্ঠ পরিচালনা। কিন্তু তা তারা অন্য কোনো বেশি কর্মশক্তি সম্পন্ন জাতির কাছ থেকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। আর রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন কবি, মোটেই বাস্তববুদ্ধির লোক নন। তাছাড়া দেখা যায়, তাঁর দেশবাসীর মতো তিনিও অতি দ্রুত এলিয়ে পড়েন। কয়েক বছর যাবৎ তিনি বিদ্যালয়ের জন্যে অতি উৎসাহী ছিলেন; এখন তাঁর বড় একটা আগ্রহ নেই। তিনি ইউরোপ অথবা আমেরিকার যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ পেতে পারলে কাজের হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন। মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে সেই একই ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তাঁকে বাধা দিতে যা ইউরোপে এমনভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে তিনি জীবন্ত মতামতের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে না পারেন। অতি সম্প্রতি জেন এ্যাডামস্ ভারত ভ্রমণে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে নিরীক্ষা করছেন। শান্তিনিকেতন কলকাতার কাছে এবং সেখানে মেয়েরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর বিদ্যালয়কে না দেখেই জেন এ্যাডামস্ ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে গেছেন। পিয়র্সন আমেরিকা-সফরেরও সেই কথা আমাদের শোনালেন, সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। সানফ্রানসিস্‌কোয় দ্বিতীয় দিন,—রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতার পরের দিন,—পুলিশ এলো যে-হোটেলে তিনি ছিলেন, তাঁকে বলল, তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে: আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে খুন করতে চায়। তাই পুলিশ-পাহারায় রবীন্দ্রনাথের যাওয়া-আসা দরকার। সেই মুহূর্তের পর থেকে চাপিয়ে-দেওয়া পাহারা রবীন্দ্রনাথকে আর ছেড়ে গেল না, রাস্তায়, তাঁর বক্তৃতা-সভায়, সর্বত্র তাঁকে ঘিরে রইল। তাঁর নিজের জাতের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। সংবাদপত্রগুলোয় চিঠি পাঠিয়ে বৃথাই তিনি প্রতিবাদ জানালেন যে, এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র তিনি বিশ্বাস করেন না, আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে। পিয়র্সন নিজে সংবাদপত্রগুলোয় চিঠি নিয়ে গেলেন। কেউ তা ছাপল না।

এই কাহিনীর সূত্র ধরেই পিয়র্সন আমাদের বললেন দম-আটকানো পুলিশি-ব্যবস্থার কথা, ভারতবর্ষকে যা পিষে মারছে। গোয়েন্দার এক বিপুল বাহিনী। তিক্ততার সঙ্গে পিয়র্সন আমাদের বললেন বিশেষ গুণসম্পন্ন ভারতীয়দের ঘটনা, যাঁদের তিনি চেনেন, যাঁরা বন্দী হয়েছেন, ফাঁসিতে ঝুলেছেন, নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন,—বা গোয়েন্দা দ্বারা স্থায়ী বিপদে ঘেরাও হয়ে আছে বুঝতে পেরে পাগল হয়ে গেছেন, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছেন কিংবা প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। পিয়র্সন এক নিরীহ ভারতীয় যুবককে দেখেছেন: পায়ে পায়ে সর্বত্র গোয়েন্দা ঘুরছে—এই কথা ভেবে ভেবে নির্যাতনের মুখে পড়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে পিয়র্সন গিয়েছিলেন গভর্নরের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে; তিনি বুদ্ধিমান এবং মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। পেছনে-ঘোরা বন্ধ করার জন্যে পুলিশের উপর এক নির্দেশ তাঁর কাছ থেকে আদায় করলেন, কিন্তু সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও পুলিশ তার কাজ করেই চলল। যন্ত্র চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল! আর হতভাগ্য বাঙালী যুবকটি মারা গিয়েছিল পাগল হয়ে। একথা ভুললে চলবে না, এই জাতটা

কতখানি অনুভূতিপ্রবণ। এই কঠোর শাসন-ব্যবস্থায় অন্যদের চেয়ে এ অনেক বেশি যন্ত্রণা ভোগ করছে।

ভারতীয় ভাবুক অরবিন্দ ঘোষের প্রতি পিয়র্সনের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা। ইংরেজ সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং তিনি পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে বহু বছর আছেন। তিনি বললেন, অরবিন্দ গান্ধীর ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রকাশের প্রতিভার মিলন ঘটিয়েছেন। বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পর তিনি তা থেকে অবসর নিয়েছেন এই প্রত্যয়ে যে, মানবতা এখনো পরিপক্ক হয়নি। পিয়র্সন পণ্ডিচেরি গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে, দেখলেন পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন—তাঁর ভাষায়—মার্থা আর মেরিতে। (মার্থা জনৈকা ইংরেজ মহিলা, মেরি পল রিশারের স্ত্রী, তাঁরা দুজনেই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত।) বাড়ি থেকে বেরুতেই এক ফরাসী পুলিশ পিয়র্সনের সঙ্গে মোলাকাৎ করেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল: তিনি কে, অরবিন্দের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন; জাহাজেও সে তাঁর সঙ্গে ছিল এবং তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিল সেই কলম্বোয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁকে তুলে দিয়ে। (স্বৈরতন্ত্রগুলোর নিজেদের মধ্যে এই রকমই বোঝাপড়া।)

পিয়র্সন ভারতবর্ষে আছেন ১৯০৭ সাল থেকে। আগেই জেনেছি, যুদ্ধের সময়ে তিনি কেমন ক'রে বন্দী হয়েছিলেন, কেমন ক'রে তাঁকে লণ্ডনে আনা হয়েছিল। ১৯১৬ সালের দিকে তিনি যখন ভারতবর্ষে এলেন, পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে। ইংরেজের মুখোমুখি তাকাতে এবং তাকে উপেক্ষা করতে ভারতীয়রা সাহস করেছে; দেশের মধ্যে সর্বত্র গান্ধীর নামটি পবিত্র, তাঁর নির্দেশ পালিত হচ্ছে ধর্মীয়ভাবে। দুঃখের বিষয় একটা জাতের পক্ষে দীর্ঘকাল উৎসাহের তুঙ্গে উঠে থাকা কঠিন বলে মনে হয়। এবং সম্ভবত অন্য জাতের চেয়ে ভারতীয়দের পক্ষে তা আরও কঠিন।

ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পিয়র্সন কষ্ট পান; বাংলাদেশে মাত্র চারটি মাস তাঁর কাছে সহনীয়। তাঁর চোখ ফুলে ওঠে, রক্তাধিক্য হয়। এনড্রুজ কিন্তু গ্রীষ্মেও যেমন শীতেও তেমনি উদাসীন, দিনের সবচেয়ে প্রচণ্ড সময়টাই বাইরে বেরুবার জন্যে বেছে নেন। আর রোদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর নিজের পরিবেশেই থাকেন।

পিয়র্সনের মতো মানুষের ভবিতব্যে আমি এক স্বভাবগত বিষণ্ণতা উপলব্ধি করি। তাঁর শিকড় উপড়ে গেছে, তিনি তাঁর স্বদেশকে হারিয়েছেন, আর তা কোথাও পাননি। বিশুদ্ধ রক্তের এই ইংরেজটি অবশ্যই ভারতবর্ষে নিজেকে নিদারুণভাবে বিদেশী ব'লে মনে করেন,—আর সবচেয়ে তা করেন বাঙালীদের মধ্যে, স্বভাবে যারা ইংরেজদের চেয়ে সবচেয়ে দূরগত। তা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও আর তিনি থাকতে পারেন না। ইউরোপের জীবনেও তিনি অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং সে-জীবন আর সহ্য করতে পারেন না। আমি যতদূর দেখতে পাই, ন্যায়ের প্রতি প্রচণ্ড আবেগে তিনি সর্বদাই আন্দোলিত হন এবং সেটাই অনেক আগে থেকে তাঁকে তাঁর দেশবাসীর বিরোধিতায় দাঁড় করিয়েছে। আমি অনুমান করি, তাঁর

জীবনের সীমিতকালে তিনি অবশ্যই পাবেন অনেক ধ্বংসাবশেষ, এবং সামান্য সান্ত্বনা। এক বিশাল মরুভূমি।—সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখায় স্কচ ইভেন্‌জেলিস্ট এনড্রুজকে।

শান্তিনিকেতনের গুণী ব্যক্তিদের অন্যতম ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে পিয়র্সনের অতি উঁচু ধারণা; সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর এবং তিনি কবীরের দোঁহা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাময়িক পত্রিকা ‘দি বিশ্বভারতী’তে প্রায়ই তাঁর নাম দেখি।

—ভারতীয় জাতিগুলোর বিচিত্র ব্যক্তিত্বঃ বাঙালীরা শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী। মারাঠীরা রাজনীতিক; তাদের মধ্যে থেকেই এসেছেন তিলক এবং গোখেল। বোম্বাই বড় বড় সওদাগর পার্শিদের সহর। গান্ধীকে নিয়ে গুজরাত দেখাচ্ছে তার বিশ্বজনীনতার মন এবং কর্মশক্তি প্রয়োগের প্রতিভা।

অক্টোবর, ১৯২৩।—মস্কোর তলস্তয়-মহাফেজখানায় বিরুকফ তলস্তয়ের কাছে লেখা প্রাচ্যবাসীদের কিছু নতুন চিঠিপত্র খুঁজে পেয়েছেন, এবং আমার কাছে যা আগ্রহজনক—তা হচ্ছে ১৯১০ সালে তলস্তয় ও গান্ধীর মধ্যে ঘটা স্বল্পকালীন পত্রালাপ। দুঃখের বিষয়, গান্ধীর প্রথম চিঠিটি—যেটি অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—হারিয়ে গিয়েছে; তলস্তয় নিজেই লিখেছেন যে, সেটি তিনি আর খুঁজে পাননি; এবং তলস্তয়ের তিনটি চিঠির জায়গায় গান্ধীর আছে শুধু একটি। চিঠিটি টাইপ করা যে-কাগজে তার মাথায় লেখাঃ এম. কে. গান্ধী, অ্যাটর্নি, তার সঙ্গে ঠিকানা এবং নম্বর। আমি অবাক হচ্ছি, ১৯১০ সালেও গান্ধী তাঁর ‘এ্যাটর্নি’ উপাধিটি বজায় রেখেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণ দেয় তাঁর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মনটিরঃ নিঃসন্দেহে তিনি এটিকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর দেশবাসীর পক্ষ সমর্থনে।

অক্টোবর, ১৯২৩।—এক ইংরেজ এডমিরালের মেয়ে মিস মার্ডালিন স্লেড এসেছিলেন দেখা করতে; শিল্পের জন্যে,—বরং বলা উচিত শিল্পীদের স্বার্থের জন্যে (কারণ শিল্পের ব্যাপারে তাঁর নিজের শিক্ষাদীক্ষা কম ব’লে মনে হয়),—নিজেকে উৎসর্গ করায় তিনি নিজের পরিবার এবং জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেনঃ লন্ডনে তিনি লামন্ড এবং হ্বেইনগার্টনের-এর কনসার্টের আয়োজন করেছেন এবং শিল্পীদের লাভ করিয়ে দিতে গিয়ে নিজে ঋণের পথ বেছে নিয়েছেন—যা সচরাচর ইম্‌প্রেশারিওদের তালিকায় থাকে না।

অক্টোবর, ১৯২৩।—আমার বোনের সঙ্গে (আমার ইংরেজির দোভাষী) রবীন্দ্রনাথের নতুন সাময়িক পত্র ‘বিশ্বভারতী কোয়াটারলি’ পড়তে পড়তে ভারতীয় মহান্‌ মিস্টিকদের সঙ্গে আমার চিন্তার আত্মীয়তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

নিশ্চিতভাবে, আমি ছিলাম শিশু (বা বড় জোর কিশোর), খ্রীষ্টীয় মিষ্টিকদের চেয়ে স্বভাবে তাঁদের অনেক কাছাকাছি।—এইরকম, ১৬শ শতাব্দীর সেই জনপ্রিয় দ্রষ্টা দাদূ, সেই, চর্মকার-কবি, যিনি সৃষ্টিকে মনে করতেন সর্বদা বহমান ব'লে, এবং যাঁর কাছে পরমাত্মা, প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার আত্মার মতোই, এই সংসারে নিরন্তর আত্ম-প্রকাশ ক'রে চলেছে বিনা প্রয়োজনে, নিজেদের আনন্দের জন্যে। দু'জনেই স্রষ্টা এবং নিজেদের সৃষ্টিতে স্থায়ীভাবেই দু'জনে যুক্ত হয়।—"তোমার নিজেকেই তুমি উৎসর্গ করো! অন্য আর কোনো চিন্তাতেই তোমার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। কেননা, তা প্রভুর মতোই হয়ে-ওঠা···হে ভগবান, তোমাতেই আনন্দিত হতে আমাকে শেখাও, যেমন তুমি আমাদের সম্মিলনের জমকালো সভায় আমাতে নিজে আনন্দিত হও নিরবধি কাল, নিরবধি কাল!"

তাই ভগবান ও মানুষের এই "সৃষ্টির মধ্যে সৌভ্রাত্র," এ আমার স্বভাবের মৌল বিশ্বাসের গোপন ভিত্তিগুলোর একটি।

সেইরকম তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই কাহিনীতে, যেখানে এক পবিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মের (বিশ্বজগতের সত্ত্ব ও রূপ,—পরম অবয়বী, যিনি তাঁর অবয়বগুলোর মতো নিজের মধ্যেই সমগ্র মানব প্রজাতিকে,—এবং আমি এর সঙ্গে যোগ করবো, সমগ্র প্রাণময় প্রজাতিকে—ধারণ করেন)—সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জৈবরাসায়নিক বস্তু থেকে ধাপে ধাপে জীববিদ্যায়, তারপর মনোবিদ্যায়, তারপর অধিবিদ্যায় উঠতে উঠতে শেষ করছেন পরম উপলব্ধি আনন্দে: "আনন্দেই উপলব্ধি···ব্রহ্মকে জানলেই একমাত্র মুক্তি।"

"অমৃত পুরুষ নিজের দ্বারাই আলোকিত,
যিনি আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অন্তহীন আয়তনের সমস্ত কিছুই জানেন,
অমৃত পুরুষ নিজের দ্বারাই আলোকিত,
যিনি সেই নিজের মধ্যে, যা আমাদের, সমস্ত বস্তুকে জানেন,
একমাত্র তাঁকে জেনেই আমরা অনন্ত জীবনলাভ করতে পারি।
মুক্তির আর অন্য কোনো পন্থা নেই।"

এইভাবে ধর্ম এবং সংস্কৃতি, বিশ্বাস-করা এবং জানা এক অনন্য পন্থা এবং একই পন্থা।

জরথুস্ত্রবাদের এবং ভারতবর্ষের নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় অধ্যাপক হিহ্বনটারনিজ লক্ষ্য করেছেন যে, পারসিক ধর্মগ্রন্থগুলো নৈতিক শিক্ষাকে, অহং-এর শুদ্ধতাকে প্রথম স্থান দেয়,—ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলো দেয় পরমের জ্ঞানকে। উপনিষদগুলো এই ভয়ংকর কথা পর্যন্ত বলে: "সত্যবিজ্ঞান লাভ হলে নিকৃষ্টতম কর্মও মোচন হয়ে যায়।"

ব্রাহ্মণ্য বিধি বলেন: "সত্যই সূর্যের উদয় ঘটায়, জলকে প্রবাহিত করায়··· দেবতারাই সত্য।"

বশিষ্ঠ স্মৃতি বলেন: "নিকটে নয়, দূরে দৃষ্টিপাত কর,—সর্বোন্নতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যা সর্বোন্নত নয় তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রো না।"

ভারতবর্ষের এই মহাবাক্যগুলো আমার হৃদয়ে কী অনুরণন জাগায়! বাহ্য প্রকাশগুলো সত্ত্বেও—নৈতিক আদর্শ নয়, সত্যের, জ্ঞানের, ব্রহ্মের সত্যবিজ্ঞানের (বিশ্বজগতের সত্ত্ব ও শৃঙ্খলার) আদর্শ ছিল—আমার সমগ্র জীবনপথে চিরকাল আমার নিজের।

অক্টোবর, ১৯২৩।—ইংলন্ড থেকে পাওয়া এক চিঠিতে পিয়র্সনের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ জানলাম। দ্বিতীয়বার ভিলনভ হয়ে যাবার (শেষের সন্ধ্যাটির কথা বলেছি) দুই তিন দিন পরে তিনি এক রেলদুর্ঘটনায় বলি হয়েছেন। মিলান থেকে তিনি যাচ্ছিলেন ফ্লোরেন্সে, এবং পিস্তোইয়ার কাছে ভাল-ক'রে-বন্ধ-না-হওয়া দরজায় ভর দিতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে যান। সেদিন ১৮ সেপ্টেম্বর। তাঁকে কেউ পড়ে যেতে দেখেনি। এক মজুর দেখতে পায় এবং তাঁকে নিয়ে আসে কম্‌তে-কর্‌সিনির কাছে এক ভিলায়। সেখানে জ্ঞান ফিরে আসে, তাঁকে পিস্তাইয়ার হাসপাতালে সরানো হয়। সেখানে এক বিস্ময়কর ধৈর্যে ও প্রশান্তিতে আট দিন তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, নিজের কী হলো তার চেয়ে, যাঁরা তাঁর সেবা করেছে তাদের অত্যন্ত খাটতে হচ্ছে দেখে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাই ও বোন খবর পেয়ে এসে পেঁছুবার সময় পেয়েছিলেন। তিনি মারা গেছেন ২৫ সেপ্টেম্বর, সমাধিস্থ করা হয়েছে পিস্তোইয়ায়। এই ভয়ংকর ঘটনাটি তাঁর বোন ডরোথি বি. পিয়র্সন আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন এক মাস পরে (২৩ অক্টোবর)। আমি বিমূঢ় হয়ে গেছি। এই অপূরণীয় ক্ষতি শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনের এবং রবীন্দ্রনাথের নয়— তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সঙ্গী, এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমর্থক—, এ কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এক অতি জীবন্ত শোক: যে দু'টিমাত্র দিন আমি পিয়র্সনকে দেখেছিলাম তাঁকে ভালবেসে ফেলার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। আরও বেশি এইজন্য যে, তাঁকে দেখতে দেখতে আমি উপলব্ধি করেছিলাম (এবং মনে হয় তা লিখে রেখেছি)—এক অশুভ ভবিতব্য, এক অ-বশ্য দূরদৃষ্ট এই উদার হৃদয়ে ভার হয়ে আছে; এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মর্মন্তুদ পরিণামের অনুমান করতে না পেরে, পূর্বাভাস পেয়েছিলাম এক আনন্দহীন ও প্রতারিতভাগ্য জীবনের বিষণ্ণতার,—যা আর দীর্ঘায়িত হবে না। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২ বছর, জন্ম ১৮৮১ সালে, কিন্তু মৃত্যু এসে হানা দিল। দশ বছর আগেকার (ট্রান্সভালে গান্ধী এবং এনড্রুজের সঙ্গে তোলা সুন্দর ফটোর) তরুণ মুখখানি, দুই চোখের নিঃশংক আনন্দময় উত্তাপ, এই খাড়া মাথা এবং যার দৃষ্টি উঁচুতে, এই গর্বিত ভঙ্গি— এদের সঙ্গে ক্লান্ত, বেদনার্ত, অতি শান্ত, একটু ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং রক্তাধিক্যে-ভোগা অতিথি, যিনি আমাদের সঙ্গে আলাপচারী হয়েছিলেন—তার তুলনা করলে, এই দশ বছরে তাঁর জীবনের বিপর্যয়গুলোর মূল্যায়ন করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তিনি তাঁর বীরধর্মোচিত ঔদার্যের মহৎ এবং সুখদুঃখে-নির্বিকার বলি, আপন জন থেকে নিজেকে পৃথক করেছিলেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন অনেক দূরের এক মানুষদের জীবনের অংশ নিতে, যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক বিদেশী। তাছাড়া, কী বেদনা!—

আমার আশা ছিল কোনোদিন ভারতবর্ষে তাঁর দেখা পাবো এবং সম্ভবত তাঁর হৃদয়ে আরও একটু বেশি প্রবেশ করবো, তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে তাঁকে সাহায্য করবো।—কেমন যেন এক সহজাত প্রেরণা আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে গত জুন মাসে লন্ডন থেকে আমাকে লিখতে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল, যে-জাহাজটি তাঁকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে, আমাদের দু'জনের জন্য তার একটা কেবিন ভাড়া করার প্রস্তাব দিয়ে।—এবং আমাকে ঠিক ছেড়ে গিয়েও তিনি আমার কাছে রেখে গেছেন এক তরুণের মুখচ্ছবি, দু'টি স্বচ্ছ চোখ—আমি যখন এই লাইনগুলো লিখছি—আমার ঘরের এক দেয়াল থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর তাঁর ভস্মাবশেষ ঘুমিয়ে আছে আপেনিনের পায়ের নীচে আমার অরসিনোর* সহরে।

অক্টোবর, ১৯২৩।—ফাকুল্‌তে দে লেতর্‌ দ্য পারী [Faculté des Letteres de Paris] এবং ওৎজেত্যুদ-এর [Hautes Etudes] অস্থায়ী অধ্যাপক পল মাসনুর্সেল [Paul Masson—Oursel] তাঁর দু'খানি বই 'ফিলসফি কঁপারে' ও 'এসকিজ দ্যুন্‌ ইস্তোয়ার দ্য লা ফিলসফি এঁ্যাদিয়ান্‌' আমাকে পাঠিয়েছেন ; এগুলো অবশেষে সর্‌বনের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছে। তাঁর নিরীক্ষাগুলোর মধ্যে, যেমনটি আমাকে লিখেছেন (২২ অক্টোবর), তুলনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে ভালো ক'রে বুঝতে এবং তাকে বেশি বিষয়মুখী দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। "এশিয়াকে পরীক্ষানিরীক্ষা করা ইউরোপের সমালোচনায় বহুলাংশে উপযোগী হতে পারে।"...

অক্টোবর, ১৯২৩।—হ্বাল্‌ডেমার বন্‌সেল তাঁর 'ইন্ডিয়েন্‌ফাব্‌রট্‌' গ্রন্থের একটি কপি পাঠিয়েছেন, তাতে তিনি আমার 'মহাত্মা গান্ধী'র এই বাক্যটি লিখেছেন : "দুর্বলতার চেয়ে হিংসার আমরা কম শত্রু।"

ডাক খরচা লেগেছে ৯৬০ মিলিয়ন মার্ক (অক্টোবরের শেষ, ১৯২৩)।...

ডিসেম্বর, ১৯২৩।—শান্তিনিকেতনে অনেকগুলো অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি, তার মধ্যে আছে আমার 'ক্রেদো কিয়া ভেরুম'।

গান্ধী সম্পর্কে আমার নিবন্ধ ভারতবর্ষে ইংরেজি (গান্ধীর সাময়িকী 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে) গুজরাতী ও হিন্দিতে বেরুচ্ছে।—আমেরিকায় ছাপছে 'সেঞ্চুরি ম্যাগাজিন'।

১৯২৪

জানুয়ারি, ১৯২৪।—বিবেকবান প্রতিবাদী (conscientious objector) এবং যুদ্ধের সময়ে কারারুদ্ধ উইলফ্রেড ওয়েলেক্‌-এর (নেলসন, ল্যাংকাশায়ার) সঙ্গে

---

* রম্যাঁ রলাঁর প্রথম রচনা (অপ্রকাশিত)।

পত্রালাপ। শান্তিবাদ সম্পর্কে তাঁর একখানি গ্রন্থ ভারতবর্ষে 'অহিংসা ও বিশ্বশান্তি' নামে অনূদিত হয়েছে এবং তার বক্তব্য ভারতীয় মতামতের খুব কাছাকাছি। 'লেভেই দ্য ল্যাঁন্দ্' নামে একখানি কৌতূহলজনক এবং তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এনড্রুজ, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (তাঁর ১৯০৯ সালের বিদেশযাত্রার পর থেকে)...প্রভৃতির মতো স্বাধীন ইংরেজ পর্যবেক্ষকদের ন্যায়বিচারের মানসিক স্বচ্ছতার সঙ্গে ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সেই চিরাচরিত নির্বুদ্ধিতার বৈপরীত্য এই গ্রন্থে সেই একই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে।

২৭ জানুয়ারি, ১৯২৪।—পল রিশার ও তাঁর ছেলে দেখা করতে এসেছেন। পল রিশার হচ্ছেন সেই ফরাসী, যিনি বছর বারো ভারতবর্ষে এবং জাপানে কাটিয়েছেন, তার মধ্যে দুই বছর হিমালয়ের নিভৃতে, এবং যাঁর রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরতে তিনি দুই বছর লাগিয়েছেন, এসেছেন মেসোপেটেমিয়া, সিরিয়ার মরুভূমি, পালেস্টাইন এবং মিশর হয়ে। জেনেভায় তিনি এই পরিবারকে খুঁজে পেয়েছেন, যাকে ফেলে গিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে। জেনেভা থেকে তাঁর প্রথম চিঠিতে 'মরুভূমি' নামে আমাকে একটি কবিতা পাঠিয়েছেন— উল্লেখ করেছেন, যে, "সিরিয়ার মরুভূমি তাঁর কাছে ইউরোপের চেয়ে কম শূন্য বোধ হয়েছে।"

তিনি প্রাতরাশের জন্যে এলেন। গায়ে সাদা ভারতীয় খদ্দর, নেমে এসেছে পা পর্যন্ত, সাদা জুতো, ভাগকরা পাকা দাড়ি, লম্বা পাকা ঘাড়ের চুল। তিনি লম্বা, দেখতে সুন্দর, সুগঠিত অবয়ব, মাথাটা পেছনে হেলানো। তিনি এশীয় প্রশান্তিটি পেয়েছেন, কথা বলেন আস্তে আস্তে, অঙ্গভঙ্গি নেই। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা বেশ ইউরোপীয়ই আছে। লেখা পড়ে ভয় হয়েছিল কিছু বাগাড়ম্বরের। তার কিছুই তাঁর নেই। তিনি কথা বলেন স্বাভাবিকভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে, কখনো দম্ভপ্রকাশের প্রয়াস নেই। তাছাড়া, তার মন যথেষ্ট বিচারশীল; যাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করেন সেই মহৎ ব্যক্তিদেরও অল্পই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাঁর চিন্তার ভিত্তিকে আমি খুব বেশি বিশিষ্টতা দিই না। ভারতীয় ও জাপানী প্রীতি সত্ত্বেও আমার কাছে উত্তরের এই প্রাচীন ধর্মযাজকটিকে মনে হয় কোনো কোনো মুসলমানের মনের বেশি কাছাকাছি (কারণ তাঁরা, তাঁরই মতো, বাইবেলের সন্তান); সভ্যতার প্রতি ক্রুদ্ধ এই ইউরোপীয় ফকিরের কাছে ধ্বংসের দেবদূত বা বিধাতার গদা অপ্রীতিকর হবে না। এশিয়ার বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। ১৯১২ সাল থেকে তিনি বেহাবাদের নেতা আব্দুল-বেহাকে চেনেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করেন; দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন, এবং শুধু নৈতিক পবিত্রতা নয়, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতারও উচ্চ প্রশংসা করেন; ১৯১২ সালে আব্দুল-বেহা তাঁকে বলেছিলেন: "সার্বিয়া আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধতে চলেছে; এবং তাতে সার্বিয়াই হারাবে,"—যা, এভাবে বলায়, পল রিশারের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এমন ঘটেছিল যে, এক আলোচনার মাঝখানে আব্দুল-বেহা হেসে পল

রিশারকে বলেছিলেন ঃ "আমি আপনার কথা শুনছি, আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি ; কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মন রয়েছে কনস্টান্টিনোপলে।" তাঁর মনের যা অভাব—সাধারণভাবে মুসলমান মনের যা অভাব (এবং রিশার তার জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করেন)—তা হচ্ছে একান্তভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক রাজ্যে তাঁর মনের সীমাবদ্ধতা। ধীশক্তির জগতে সামান্যই উন্মোচন। তাছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে আব্দুল-বেহার এক অজুহাত আছে ঃ জীবনের এক বড় অংশই তিনি তুর্কী জেলখানায় বন্দী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বেহাবাদ লক্ষ্যহীন বলে মনে হয়। ধর্মটি ছড়িয়েছে আমেরিকায় সেখানে কিছু মন্দির আছে,, এবং ইউরোপে আছে অল্প ; কিন্তু এশিয়ার ও মিশরে এ ব্যর্থ হয়েছে। ফিরে আসার পথে রিশার অনেক সুফির সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর মনে গভীরতম ছাপ ফেলেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি আমাকে যা বললেন তা আমাকেও একই রকম বিস্মিত করল। যেমন, তাদের মধ্যে ব্যাপক এই বিশ্বাসটি রয়েছে যে, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি তথাকথিত পয়গম্বররা ঈশ্বরের সর্বোচ্য প্রকাশ নন, তিনি পৃথিবীতে নিরন্তর জীবন্ত আছেন কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে (সবসময়েই একই সংখ্যক, ২০ অথবা ৪০), যে-মানুষেরা প্রায়ই অখ্যাত, এমনকি অজ্ঞাত, কিন্তু তবু তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তি বিরাজ করে। এই সুন্দর কাহিনীটি ঃ "আজ রাতে তোমার বাড়িতে কি কোনো কিছুই ঘটেনি, কোনো গুরুতর ঘটনা ?"– "না, কিছুই ঘটেনি।"—"তোমার বাড়িতে কি অমুক নামে কেউই নেই ?"—"আমি জানি না : খোঁজ ক'রে দেখছি।"—ক্রীতদাসদের তালিকা খুঁজে দেখা হলো। নামটা পাওয়া গেল।—"হ্যাঁ, আজ রাতে সে মারা গেছে।"—মহম্মদ বললেন ঃ "চলো, তাঁকে দেখে আসি।"—তাঁরা গেলেন। এই তো মৃতদেহ। মহম্মদ সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন।—তিনি বললেন ঃ পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে ইনিই ছিলেন অগ্রগণ্য।"

গান্ধীর সঙ্গে রিশারের ভালো পরিচয় আছে ; তিনি তাঁর আশ্রমে থেকেছেন। শেষবার গান্ধীর গ্রেপ্তারের পূর্বাহ্নে তাঁর ছোটোখাটো মতপার্থক্য ঘটেছিল। যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, চৌরিচৌরার ঘটনার পর, তা থামিয়ে দেবার পেছনে গান্ধীর মনোভাব তিনি বুঝতে পারেন নি। (তিনি বললেন, তাছাড়া, ভাইসরয়কে চিঠি লেখার এবং অসহযোগ সংগ্রাম ঘোষণা করার আগে গান্ধী চৌরিচৌরার অশান্তি সম্পর্কে জানতেন ;—নির্বিচারে নিহত মানুষগুলোর দৃশ্য দেখে ভেঙ্গে-পড়া তাঁর ছেলের একখানি চিঠি এবং একজন শিষ্যের হস্তক্ষেপ তাঁর প্রদত্ত নির্দেশ প্রত্যাহারে প্ররোচিত করেছিল)। গান্ধীর সঙ্গে অহিংসা সম্পর্কে এক আলোচনায় রিশার—যিনি (যদি তিনি তাঁর রীতি-মাফিক স্বীকার করেন) রাজনীতিতে তা অনুমোদন করতে পারেন ব'লে মনে হয় না—গান্ধীকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন ঃ "ধরুন, ইংলন্ডে এক রক্তাক্ত বিপ্লব দেখা দিল এবং তা থেকে আপনার জনগণের স্বাধীনতা এলো ! আপনি কী করবেন ?" গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন : "আমি বিপ্লবকে বাধা দেবো।" এবং তিলকের পৃথক মনোভাব আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধী স্বীকার করেছিলেন যে, তিলক সত্যের চেয়ে তাঁর দেশের মানুষের স্বাধীনতাকে

সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দেন, আর তিনি স্বাধীনতার চেয়ে অগ্রাধিকার দেন সত্যকে। —কথাগুলো কিছুটা অবিবেচকের মতো পল রিশারের বারবার আওড়ানো, এবং যে-কথাগুলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ঝড় তুলেছিল। রিশার (আমার মতোই) লক্ষ্য করেছেন ইংরেজি আদর্শের প্রতি গান্ধীর গোপন পক্ষপাতিত্ব এবং তাঁর দুর্জয় আশা যে, এই আদর্শ পরিণামে রাজনীতির বিকৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। রিশার বিশ্বাস করেন, গান্ধী যদি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, তাহলে আবার এক নবজন্মলাভ-করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার চুক্তি করতে প্রস্তুত থাকবেন।

রিশার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবেশের সঙ্গেও পরিচিত। তিনি সবার চেয়ে শ্রদ্ধা করেন রবীন্দ্রনাথের বড় ভাইকে (তিনি দেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে আমার বাবার চেহারার মিল আছে)। বৃদ্ধ ভারতীয় দার্শনিক, বৃদ্ধ ঋষি, তাঁর মতে শান্তিনিকেতনের প্রকৃত জ্যোতিঃ। এই বড় ভাই- যাঁকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করেন, এবং রোজ সকালে তাঁর কাছে যান পায়ের ধুলো নিতে—বিখ্যাত ছোট ভাই সম্পর্কে কথা বলেন সস্নেহ উপেক্ষায়, বলেন : "রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের কিছু সহজাত গুণ আছে, কিন্তু অধিবিদ্যার কোনো মাথাই নেই।" রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৌন্দর্যের আস্বাদ করেছেন যে-রিশার, তিনিই দুঃখ করেন কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অস্থির সংকল্পতার দুর্বলতা দেখে ঃ তিনি আসলে এক সৌন্দর্যরসিক। আর জগতের দুর্ভাগ্য বিরাট, কারণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরই একমাত্র, যা গোটা জগতকে শোনানোর সুযোগ পাওয়া যেতো। তিনি জাপানী ছাত্রদের আশাভঙ্গের কথা বললেন, তারা সোৎসাহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে অগ্রদূতের বাণী শোনার আশা করেছিল ঃ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে একটা বক্তৃতা দিলেন আর্টের উপরে। পরদিন রিশার রবীন্দ্রনাথকে এক জাপানী প্রাসাদের চত্বরে (চিন্তার জগতে মূল্যহীন এক ধনীর বাড়িতে, যিনি তাঁকে বগলদাবা করেছিলেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বাধা দিতে দুর্বল হয়ে পড়েন) সমুদ্রের বিস্ময়কর এক দিগন্তের মুখোমুখি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "এই মুহূর্তে ইউরোপ যখন এক নরককুণ্ড, এখানকার সবকিছু উপভোগ করতে আপনার কোনো বিবেকদংশন হয় না?"—একথা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, তিনি প্রথমে এর উত্তর দেননি,—কিন্তু আট দিন পরে রিশারকে বলেছিলেন : "আপনি যা বলেছেন, তা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু আপনারা দেখবেন, কী কাজ আমি করতে চলেছি।" তিনি ভাবছিলেন তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা; তাঁকে রিশার তাই পরোক্ষভাবে একরকমে সামনে চালিয়ে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু রিশার আরও বললেন : "তাঁর পক্ষে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো এই যে, তিনি জন্মেছেন ধনীর ঘরে এবং জীবনের সামাজিক দুঃখদুর্দশা থেকে বিচ্ছিন্ন। কখনো তিনি রিজার্ভ কামরা ছাড়া পথ চলেন না। তিনি সভাসদপরিবৃত। শান্তিনিকেতন কোনো বিদ্যালয় নয়। একটা ছোটোখাটো স্বর্গ, দেবদূতে ভর্তি, তারা ঈশ্বরকে ঘিরে গান গেয়ে চলেছে।"

পল রিশার ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ঘুরেছেন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যা, এবং

যা ফরাসীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—কখনো কোনো দেশি ভাষা শেখার কষ্ট স্বীকার না-ক'রে। তিনি শুধুই ইংরেজি জানেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, পরস্পর বোঝাবুঝির জন্যে কোনো ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই, এবং যেখানেই তিনি গিয়েছেন, হীনতমদের মধ্যেও, কোথাও ভাই-ভাই হতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ভাই-ভাই যথেষ্ট নয়। ভাইয়ের ভাবনা চিন্তাকেও জানতে হবে। আরও বলি, এই নতুন ঢঙের তীর্থযাত্রীটি সিরিয়ার মরুভূমি পার হয়েছেন মোটর গাড়িতে, মক্কা যেতে ধনী তীর্থযাত্রীরা যেমনটি, মনে হয়, আজকাল করে। অবশ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী শ্রেণীর সংসর্গে তিনি বাস করতে শিখেছেন এবং তিনি সমস্ত প্রদেশের বিচিত্র গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করেন, যাদের মিলন সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান সমন্বয় ঘটাবে।

৪ বা ৫ ফেব্রুয়ারি।—মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি…মনে হয় এটি নতুন শ্রমিক মন্ত্রীসভার প্রথম কার্যাবলীর একটা।—এখনও পর্যন্ত আমাদের রুম (৮ এপ্রিল, ১৯১৭, 'লুমানিতে'-র 'পবিত্র যুদ্ধ'-এর লোকটি ', রেনোদেল এবং অন্যান্য সামাজিক-দেশপ্রেমিকদের সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদের উপরে শুধু-এক অত্যন্ত সীমিত বিশ্বাস আছে। দেশের মধ্যে তাঁরা প্রয়োজনীয় সংস্কার করবেন, এতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা সব সময়ে তখনই মানবতার অধিকার রক্ষা করবেন, যখন ইংলন্ডের স্বার্থের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য ঘটবে না।—ক্ষমতায় আসার পরদিন প্রথমেই র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষের উদ্দেশে যে ঘোষণা করেছেন, তা লর্ড কার্জনের চেয়ে কম উদ্ধত নয়, বরং কম খোলাখুলি মাত্র।—মহান্‌ 'উদারনৈতিক' বুর্জোয়া গ্ল্যাডস্টোন, উইলসন ইত্যাদির কাছ থেকে যেমনটি পেয়েছে, তার চেয়ে আরও বেশি নির্দয় প্রবঞ্চনা জগৎ আর কখনো পায়নি।

১ মার্চ, ১৯২৪। শ্রীমতী দুশেন খেতে এসেছেন। 'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে নারী লিগের' ওয়াশিংটন অধিবেশনে তিনি ফরাসী কমিটির প্রতিনিধি ছিলেন।

তিনি আসছেন ইংলন্ড থেকে, এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নৈরাশ্যজনক ছাপ। গত দু'বছরে জনসাধারণের মন পুরোপুরি বদলে গেছে। যুদ্ধের সময়ে ফরাসী প্রতিনিধিরা উৎসাহে-উল্লাসে অভ্যর্থিত হতেন। এখন তাঁদের সঙ্গে শীতল ব্যবহার করা হয়; কিন্তু যখন জার্মান প্রতিনিধিরা আসেন, সবাই তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁদের হাতে চুমো খায়। জনমতের আবেগপ্রসূত চপলতা, এমনকি যাদের সবচেয়ে স্থিতধী মনে করা হয় (ভুল ক'রে), তাদের মধ্যেও। ক্ষমতাশীল লেবার-পন্থীদের লাভ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। এখনো যারা উচ্চমঞ্চ থেকে অপরকে দেখে, তাদের উত্তাপহীন ও কিছুটা উদ্ধত চালচলন তারা পুরনো বন্ধুদের সম্পর্কেও গ্রহণ করেছে। আর কেউ তাদের সমালোচনা করবে, এটা তারা আর সহ্য করে না, যেহেতু তারা "পৌঁছে গেছে"! আরও বলি, রুঢ়ে ফরাসীদের অপরাধ সম্পর্কিত বিপজ্জনক পুস্তিকা-ইস্তাহার ছড়ানোয় তারা আনুকূল্য করে, "বেলজিয়ামে জার্মান নিষ্ঠুরতা'

সম্পর্কে যে প্রচারাভিযানকে তারা সম্প্রতি ধিক্কার দিয়েছিল, এটা সেই প্রচারাভিযানের সমতুল্য। এবং শ্রীমতী সোয়ানউইক নামে জনৈকা বিজ্ঞমহিলা এটাকে সমর্থন করেছেন। ইংলন্ডের আগের মতোই চালিয়ে-যাওয়া এশিয়ার জনগণের নিপীড়নের পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা হোক, জনৈক মার্গারেট বনফিল্ড মোটেই (আর) মানতে চাননি। কারণ শ্রমিক-মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রথম কাজটিই ছিল এই ঘোষণা যে, তারা কখনো ভারতবর্ষের 'হোমরুল' মঞ্জুর করবে না! কারণ, কখনো ইংলন্ডে ভন্ডামি তার অধিকার হারায়নি। আর গান্ধীকে মুক্তি দেবার সাধুবাদও লেবার-পন্থীদের দিতে পারা যায় না: কারণ মুক্তি দেওয়াটা পূর্ববর্তী মন্ত্রীসভারই গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল। (ঘটনাটি খাঁটি, সত্যনিষ্ঠ ও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল মিস মার্শাল সমর্থিত।)

(ইংরেজদের হাতে গান্ধী একেবারে মরতে বসেছিলেন। এখন ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া সংবাদপত্র থেকে তা জানতে পারছি। ডিসেম্বরের শেষ থেকে আমাশার প্রকোপে অসুস্থ হলে তাঁকে অবহেলা ভরে দেখা হয়। রোগ হঠাৎ খারাপের দিকে যায়; তড়িঘড়ি মেজর ম্যাডক্‌কে ডাকা হলে, তিনি বুঝলেন এ্যাপেনডিসাইটিস পেকেছে এবং জরুরি বিধায়, এমনকি গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই, গান্ধীকে তাঁর গাড়িতে তুললেন, নিয়ে এলেন হাসপাতালে, অস্ত্রোপচার করলেন (১৩ জানুয়ারি)। তিন দিন রোগীর কাটল জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, কারণ রোগটা ছিল গুরুতর এবং গান্ধী ছিলেন শরীরের দিক থেকে নিঃশেষিত। ইংলন্ড নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে থাকবে, কারণ গান্ধী যদি জেলখানায় মারা যেতেন, ভারতবর্ষ ভয়ঙ্করভাবে বিদ্রোহ করতো। তাই তড়িঘড়ি তাঁর মুক্তির আদেশনামায় সই করা হলো (ফেব্রুয়ারির গোড়ায়)। গান্ধী কখনো তাঁর মনের স্বাচ্ছন্দ হারাননি। সেরে উঠবার সময় তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিলীপকুমার রায় আমাকে জানিয়েছেন, এবং তখন প্রসঙ্গ ছিল আমার বইটি আর সঙ্গীত। কিন্তু গান্ধীকে কয়েক মাসের বিশ্রাম নিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বুঝতে পারা যায়, তাঁর দায়িত্বের বোঝা আবার কাঁধে তুলে নিতে তাঁর কোনো আনন্দ নেই।)

১০ মার্চ, ১৯২৪। ফ্রামরো পেস্টনজি পশা—...পুনার এক তরুণ পার্শি। গত মাসে অস্ত্রোপচারের কিছু পরে পশা হাসপাতালে গান্ধীকে দেখেছেন। তিনি গান্ধীকে আগেই জানতেন এবং তাঁর চেহারার পরিবর্তন চোখে পড়েছে। আগে তাঁর মুখের চেহারা শান্ত থাকতো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিতরে থাকতো উদ্বেগ। এখন এক হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্তি মুখখানা আলো ক'রে থাকে। তার বেশির ভাগ অনুবর্তী সম্পর্কে পশার ধারণা খুব উঁচু নয়, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা আছে; তিনি বললেন, তাঁর সন্তসুলভ দয়াদাক্ষিণ্যের কোনো ধারণা করা যায় না; যা ভাবা যায় তার চেয়ে গান্ধীর জীবনে তিনি অনেক বেশি।—পোষ্য হরিজন মেয়েটি তাঁদের পরিবারের একমাত্র মেয়ে। পশা ছোট মেয়েটিকে দেখেছেন, রুটির একটা টুকরো কামড়ে ছিঁড়ে সে গান্ধীর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তিনি তাই খাচ্ছেন;

এখানে ব্যাপারটা খুবই সহজ,—কিন্তু ভারতবর্ষে এর গুরুত্ব অসাধারণ, সেখানে সংস্কার অত্যন্ত প্রবল।

মার্চ, ১৯২৪। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শান্তিনিকেতন, ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের এক দীর্ঘ চিঠি পেলাম, সঙ্গে মূল বাংলা সংস্করণের 'বলাকা'র একটা কপি, তাতে তাঁর এবং কালিদাস নাগের সই ঃ

“আমার অতি প্রিয় বন্ধু,—আপনার সর্বশেষ চিঠিটি আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে, চীনের উদ্দেশে জাহাজে ওঠার আগে (এবং তার সময় ঘনিয়ে এসেছে) তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পিয়র্সনের ছিল প্রীতির সহজাতগুণের এক প্রাচুর্য, তা তিনি উদারহস্তে তাদের সমর্পণ করতেন, যারা তাদের অখ্যাতির জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হতো। তারা ছিল রাত্রির পটভূমির মতো, যাতে তাঁর প্রেম তার আলোকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হতে দেখতো। বিশেষ গুণ বা উপযোগিতা থাকুক বা না থাকুক, ব্যক্তি-মানুষের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে তিনি স্পর্শকাতর ভাবে সচেতন ছিলেন এবং যখনই সেই ব্যক্তি সামাজিক সুসমন্বয়ের অভাবে বা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারের ফলে অবজ্ঞাত বা আহত হতো, তাঁকে তা তীব্রভাবে পীড়িত করতো। এটা তাঁর মধ্যে এতো অধিক মাত্রায় জন্মেছিল যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠান—যাদের এমন আদর্শ আছে যার ব্যাপক পরিধি রক্তমাংসের ব্যক্তিসম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে যায়—তাদের সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধভাবে সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শেষদিকে তাঁর মন বিচলিত হয়ে উঠেছিল, যখন শান্তিনিকেতন বেড়ে উঠছিল অব্যবহিত অঞ্চলের অঙ্গীভূত নিছক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিকে ছাড়িয়ে, যখন বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তারই প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করছিল—যাকে আমি মনে করি বর্তমান যুগের মহান আহ্বান। তাঁর ভয় হয়েছিল, ভাবের আদানপ্রদান এবং সমাদর্শের এক গোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্যে আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রদের থেকে আমাদের দৃষ্টি—যত কম মাত্রায়ই হোক্ না কেন—পাছে একটি খাতে না প্রবাহিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত সেবার সুখতৃপ্ত বাস্তবতায় কোনো দুঃসাহসী আদর্শের দখলদারির আশংকায় তিনি যখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর আগে কিছুকাল ধরে আমি তাঁর জন্যে উদ্বেগ বোধ করেছিলাম। সন্দেহ নেই যে, জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ছাঁচেই আদর্শবাদ এক অশান্তির হেতু, আর তাই সমৃদ্ধিশালীরা এর সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ পোষণ করে। আবেগগত সমৃদ্ধির উপভোগের মতো এমন এক বস্তু আছে, যেখানে আমাদের প্রেমের ব্যক্তিগত অনুভূতির উদ্দীপন অবিরত যোগান পায়। পিয়র্সন এটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ও পাশের গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁর সংসক্তির নিজস্ব স্বভাবজাত প্রবণতা পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। তারপর আশ্রমপুষ্পের পাপড়ি ঝরিয়ে প্রবল বায়ুর মতো এলো বিশ্বভারতীর ধারণা। শেষদিন পর্যন্ত পিয়র্সন এর সঙ্গে কখনো পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারেননি। বুদ্ধিগত দিক থেকে এর বিরুদ্ধে তাঁর কিছুই বলার ছিল না, কিন্তু তাঁর হৃদয় ব্যথিত হতো, কারণ তাঁর মনটা ছিল

মৌমাছির মতো, ফলের সঙ্গে যার কারবার নেই, কারবার শুধু ফুলের সঙ্গে। তাঁর মনের এই দ্বন্দ্ব আমি বুঝি, কারণ আমার সৃষ্টিধর্মী শিল্পীরূপী ব্যক্তিত্ব—যাকে স্বাভাবিক্‌ ভাবেই হতে হবে নির্জনবাসী, এবং আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ব—যা নিজেকে উপলব্ধি করবে জটিল চরিত্রের কাজের মধ্যে দিয়ে, যে-কাজে প্রয়োজন বৃহৎ সংখ্যক মানুষের সহযোগিতার বৃহৎ ক্ষেত্র—এদের মধ্যে একধরনের গৃহযুদ্ধ নিরন্তর আমার নিজের স্বভাবের মধ্যে চলছে। আমার মধ্যে আমার দ্বন্দ্ব আমার চরিত্রের দুই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে, পিয়র্সনের ক্ষেত্রে যেমন, সেইরকম আমার ব্যক্তিগত মানসিক প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নয়। দুই বিরুদ্ধ শক্তিই আমার কাছে সমান স্বভাবজাত হওয়ায় জীবনের সমস্যা সরল করার জন্যে আমি তাদের একটির হাত থেকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পেতে পারি না। আমি মনে করি, এক সুষম ছন্দ লাভ করা সম্ভব যেখানে উভয়েই সমন্বিত হতে পারে এবং সৃষ্টিধর্মী মনের নির্জনতা-থেকে-আসা নিঃশ্বাসের স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমার কর্ম জনতার হৃদয়ে তার স্বাভাবিক মাধুর্য খুঁজে নিতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের দাবি রূঢ়ভাবে নিজেকে জাহির করছে, গণ্ডির মধ্যে তাকে কেমন ক'রে আটকে রাখবো জানি না। আমার ভেতরের কবি আহত, তার অবসরের পরিবেশ ধুলোয় ভরা। আমি চাই না আমার জীবনের সূর্যাস্ত আয়াসসাধ্য কর্মের—যে-কর্ম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার শান্তির অসীম পটভূমিকে গিলে খাচ্ছে—ঝাপসা আবাহাওয়ায় এইভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, মৃত্যুর আগে সময় কালে আমি উদ্ধার পাবো। ইতিমধ্যে, আমি চলেছি চীনে, জানি না কোন্‌ যোগ্যতায়। কবি হিসেবে, নাকি সদুপদেশ আর গভীর সাধারণ-জ্ঞানের বাহক হিসেবে?—প্রীতির সঙ্গে,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

মার্চ, ১৯২৪।—মাদ্রাজের প্রকাশক গনেশন আমাকে গান্ধীর এক বার্তা পাঠিয়েছেন (মাদ্রাজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি)। তিনি পুনা গিয়েছিলেন, সেখানে "মহাত্মাজি" এবং সি. এফ. এন্‌ড্রুজের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁকে আমার বার্তা পড়িয়ে শুনিয়েছেন; এবং আমাকে বার্তা পাঠাবার ভার গান্ধী তাঁকে দিয়েছেন ঃ

"তার চিঠির অনুবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, এবং তাঁর শুভেচ্ছার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ার আশা আমি সাগ্রহে পোষণ করি। শোচনীয় দুর্ঘটনার দুদিন আগে পিয়র্সন তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এটা জানাই আমার কাছে এক গভীর আনন্দ ও সান্ত্বনা। গভীর অন্তরঙ্গতার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি এবং আমি জানি আমরা পরস্পরকে এক ভ্রাতৃসুলভ প্রীতিতে ভালবাসি।"

গণেশন সদ্য সদ্য 'ও দেস্যু দ্য মেলে', 'লে প্রেকুরসর,' 'জাঁ-ক্রিসতফ' এবং 'ক্লরাঁবো' পেয়েছেন। গান্ধীর অনুরোধে তিনি সেগুলো তাঁর কাছেই রেখেছেন, কারণ তিনি সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে চান। তিনি এখনো অত্যন্ত দুর্বল, কাজকর্ম শুরু করতে এখনো কয়েক সপ্তাহের বিশ্রাম প্রয়োজন; কিন্তু অবসর

সময়টুকু একে ওকে উপদেশ দিতেই কেটে যায়। গান্ধী সম্পর্কে আমার গ্রন্থটি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র গুজরাতী এবং হিন্দি সংস্করণে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে।

'হিন্দ্ স্বরাজ'এর জন্যে গান্ধীর মূল পান্ডুলিপির একটি সুন্দর ফ্যাকসিমিলি পাঠিয়েছেন। এটি লেখা গুজরাতীতে।

মার্চ, ১৯২৪। জগদীশচন্দ্র বসুর পুস্তিকা 'সারকুলেশন এন্ড এ্যাসিমিলেশন অফ প্ল্যান্টস্' (লন্ডন, ১৯২৪), তার সঙ্গে পারী থেকে লেখা ক'টি লাইন (২৮ মার্চ):

"প্রিয় মহাশয়, মানবতার সর্বজনীন স্বার্থের জন্যে আপনার কর্মসাধনা আমার গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে। প্রাণের ঐক্য সম্পর্কে আমার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার একটি কপি আপনাকে পাঠাবার অনুমতি দেবেন, বিগত ৩০ বছর যাবৎ ভারতবর্ষে এটি ছিল আমার অনুসন্ধানের (শব্দটি দুষ্পাঠ্য)—আমি অল্প দিনের জন্যে ইউরোপ সফরে এসেছি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে চলেছি। এখন আমি আমার দেশে ফিরে চলেছি—আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ—ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ আমার অতি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগত বন্ধু।"

—আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেখার এবং মহৎ কর্ম সম্পর্কে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম; সেগুলোর প্রকাশিত অংশ এবং পত্রপত্রিকার সমালোচনা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে।

মার্চ, ১৯২৪। ইউজেনিও অনাগ্নিন আমাকে জানাচ্ছেন (১৫ মার্চ) যে, আমার গান্ধী সংক্রান্ত বইটি রাশিয়ায় অবাঞ্ছিতের তালিকায় উঠলো (mis a l'index।

এখন এটি প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে; ফ্রান্স ও জার্মানীতে একটার পর একটা দ্রুত সংস্করণ হচ্ছে ও ধর্মীয় জগতে, বিশেষ ক'রে প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে, এ গভীর প্রতিধ্বনি তুলেছে। তাদের মধ্যে এ ঘুমন্ত খ্রীষ্টকে জাগিয়ে তুলেছে। স্বয়ং মহাত্মাকে মনে হচ্ছে প্রায় নবজীবনধারী খ্রীষ্ট।

মার্চের শেষ, ১৯২৪। ...আমার 'গান্ধী'-র ২১তম সংস্করণের একটা পরিশিষ্ট লিখলাম। গান্ধীর মুক্তির পরে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর ইতিহাস সম্পূর্ণ করলাম।

এপ্রিল, ১৯২৪। ২০ মার্চ এস. গণেশন লিখছেন যে তিনি সদ্য গান্ধীকে দেখে এসেছেন, তাঁর ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে গেছে। মহাত্মা আছেন বোম্বাইয়ের কাছে এক বিশ্রামস্থলে। তিনি আমার বইগুলো পড়েছেন এবং সেগুলো সবসময় তাঁর কাছে। তিনি শীঘ্রই আমাকে লিখবেন। আমি যে বইটি তাঁকে উৎসর্গ করেছি পুনায় গণেশন তার কথা বলেছেন। এবং গান্ধী এতে খুশি হয়েছেন। তিনি দেখেছেন, আমি তাঁর মতবাদের মাত্র দুটি জায়গা ভালো ক'রে বুঝিনি; এবং সি. এফ. এনড্রুজের মারফতে তিনি এ বিষয়ে আমাকে লিখে পাঠাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

একটি বিষয় হচ্ছে, তার শিষ্য অধ্যাপক কালেল্‌কার এবং ‘গসপেল অফ স্বদেশী’ সম্পর্কে আমার কঠোর অভিমত। তিনি বলেছেন যে, বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে এই মত বিচার করতে পারি না, আমাকে ভারতবর্ষে আসতে হবে। “আমি নিশ্চিত যে তাঁকে তাঁর মত পালটাতে হবে।” কালেল্‌কারও আমাকে লিখবেন ব’লে ঠিক করেছেন। গণেশনের দিক থেকে ব্যক্তিগত মত এই যে, গান্ধীর শিষ্যদের সম্পর্কে আমার মন্তব্যগুলো খুবই সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু তিনি দুঃখিত এইজন্যে যে, মন্তব্য প্রকাশের জন্যে আমি বেছে নিয়েছি কালেল্‌কারকে, মহাদেব দেশাইকে ধরে তিনি গান্ধীর সবচেয়ে বড় শিষ্য ঃ এই দুজনেই গান্ধীকে সবচেয়ে ভালো বুঝেছেন।

এপ্রিল, ১৯২৪। আমার একটি ছোট কথার উত্তরে মহাত্মা শান্ধী নিজে আমাকে লিখেছেন ; তাতে আমি আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, আমি সব সময় তাঁর চিন্তাকে হয়ত ভালো ক’রে ধরে উঠতে পারিনি, এবং দেখিয়ে দিলে, আমার ত্রুটিগুলো সংশোধনের অভিপ্রায় জানিয়েছিলাম। (শেষের মন্তব্যটি সত্ত্বেও সমান সমান লাইনে পেন্সিলে লেখা)। (ইংরেজিতে।)

“আন্ধেরি, ২২ মার্চ, ১৯২৪।

প্রিয় বন্ধু, আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করি। প্রবন্ধের স্থানুবিশেষে যে ভুল করেছেন তাতে কী আসে যায় ? আমার কাছে বিস্ময় এই যে, আপনি ভুল করেছেন এতো কম এবং ভিন্ন পরিবেশে ও বহু দূরে থেকেও আমার বাণীকে এমন সত্যভাবে ব্যাখ্যা করার সাফল্য অর্জন করেছেন। এ আরও একবার দেখিয়ে দিল মানবতার স্বভাবের স্বাভাবিক ঐক্যটি, তা যতই ভিন্ন আকাশের নীচে বিকশিত হোক না কেন। আমার শ্রদ্ধাসহ, আন্তরিক ভাবে আপনার

এম. কে. গান্ধী।

পেন্সিলে লেখার ত্রুটি দয়া ক’রে মার্জনা করবেন। কলম ব্যবহার করতে আমার হাত এখনো খুবই কাঁপে। এম. কে. জি.।

মঁ. রম্যাঁ রলাঁ।”

এপ্রিল, ১৯২৪। তাঁর পক্ষ থেকে সি. এফ. এনড্রুজ আমাকে লিখছেন শান্তিনিকেতন থেকে (২২ মার্চ)। (ইংরেজিতে) ঃ

“প্রিয় বন্ধু, এই মুহূর্তে আমি মহাত্মার সঙ্গে আছি এবং এখানে এখন দেড় মাসেরও বেশি তাঁর গুরুতর অসুখের মধ্যে তাঁর সঙ্গে রয়েছি। তাঁর কাছে থাকাটা আমার বিরাট এক আনন্দ এবং এক বিরাট অধিকার। তাঁর জীবনটাই এক মহান্ সৌন্দর্যের,—দিনের পর দিন দেখার মতো। এর কোনো অংশই নেই যা ত্যাগ এবং অপরের চিন্তায় পরিপূর্ণ নয় : এবং মনে হয় না যে, এতে একটিও ব্যক্তিগত চিন্তার স্থান আছে। কবির জীবনকে. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকে দেখাটাও এক বিরাট আনন্দ ; কিন্তু মনে হয়, সেখানে দেখি নিজের সঙ্গে আলাপচারী অন্তর্জীবনকে, এবং তা নির্জনতায় তার নিজস্ব অন্তরের শান্তি খুঁজে পেয়েছে। এখানে মহাত্মাজীর

ক্ষেত্রে মহত্তম যা, তা হচ্ছে অপরের জন্যে প্রচণ্ড আবেগ, যে প্রচণ্ড আবেগ খ্রীষ্টের। আমি বলতে চাই না যে, গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) জীবন অহংবাদ বর্জিত নয়; তাঁর জীবন মহত্তম ভাবে তাই।—কিন্তু অহংবাদের এই অনুপস্থিতি থাকে অপরকে সাহায্য করার জন্যে এবং জীবনের নিতান্ত সাধারণ বস্তুগুলোয় নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জন্যে অন্তর্জগৎ থেকে (সেখানে তা থাকে নিরন্তরভাবে) বেরিয়ে আসার মধ্যে। তিনি আমাকে বলেছেন, যখন তিনি একটানা কয়েক মাস বজরায় গঙ্গায় থাকতে পেরেছিলেন, এবং যখন কেবলমাত্র ঈশ্বর ও প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলতে, আর সমস্ত রাত্রিগুলো এমন এক গভীর আলাপনে জাগ্রত থাকতে পেরেছিলেন যে, নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্যন্ত অনাবশ্যক বস্তু হয়ে পড়েছিল,—তাঁর জীবনের পরমতম আনন্দের কাল এসেছিল তখনই। তিনি আমাকে বলেছেন, অন্তরঙ্গ উপলব্ধির মুহূর্তগুলোতে তাঁর কত যে দিন প্রকাশ্য মানুষের নতুন জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে, যে জীবন যাপন করতে তিনি এখন বাধ্য হচ্ছেন। সেটা তাঁর কাছে এক যন্ত্রণা, প্রায় ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার মতো। কারণ সে-পর্বে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বাইরে অপরিচিত কবি।—গান্ধিজীর কাছে সেবাই হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয় আবেগ। এমনকি তাঁর ভয়ঙ্কর অসুখের মধ্যেও এমন ছোটোখাটো সেবা করা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা কঠিন ছিল, যা তাঁকে শ্রান্ত করতে পারতো। তাঁর খাটের পাশের সব রোগীদের কথাই তিনি দিনরাত ভাবতেন। নার্সের দিকেও নজর রাখতে হতো, তার খাটুনি না অতিরিক্ত হয়; এখন যে তিনি একটু একটু ক'রে ভালো হচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য ফেরাবার চেষ্টায় আছেন, এখনও তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছেন দুটি রুগ্ন তরুণীকে, সমুদ্রের হাওয়ায় যাতে উপকার হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে তিনি এক সন্ত ফ্রাঁসোয়া দাসিজ্। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি মূলত ব্যবহারিক এবং তিনি আধুনিক কালের সবচেয়ে জটিল সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণায় আমি প্রায়ই (কিছুদিন আগেও) তাঁকে 'মধ্যযুগীয়' ব'লে ভেবেছি; (এবং এই প্রবণতা এখানে ওখানে নিঃসন্দেহে ফুটে বেরোয়)। কিন্তু কোনো কোনো দিকে, এমনকি আজকের বিজ্ঞানের চেয়েও, দূরে চলে গেছেন এবং ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতেই চিন্তা করেছেন। এই অর্থে, তিনি আধুনিক। তাঁর সম্পর্কে একটা কাহিনী এই সঙ্গে আপনাকে পাঠালাম, সেটা অত্যন্ত সুন্দর। আমি জানি আপনাকে সেটা কতখানি নাড়া দেবে। আপনার নমস্কার জেনে তার কত যে আনন্দ হয়েছে, এবং আমি তাঁকে আপনার ও আপনার বোনের কথা প্রায়ই বলে থাকি। অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে আমার শুভকামনা জানাবেন। লণ্ডনে সেই যেদিন আমরা একত্র হয়েছিলাম তার কথা কখনো ভুলবোনা! আপনার অত্যন্ত আন্তরিক বন্ধু, সি. এফ. এনড্রুজ।"

(সঙ্গে পাঠানো কাহিনীটি 'নিউ লিডর'এর ২৯ জুলাইয়ের উদ্ধৃত অংশ। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বর্ণনা করেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে শিকারের উপজীবিকার উপরে নির্ভরশীল আদিম অধিবাসী ভিলদের বাসস্থান একটি প্রদেশে নিজে থেকে তিনি গান্ধীর একটি কথার বিস্ময়কর প্রভাব যাচাই করেছেন। "জঙ্গলের শান্তি বজায়

থাকুক' —মহাপুরুষের এই কথা মুখে মুখে ফিরতে শুনে জঙ্গলের সেই মানুষগুলো শুধু শিকার করাই ছেড়ে দেয়নি, গৃহপালিত পশুগুলোকে খাটানোও ছেড়ে দিয়েছে। এবং অন্যদের সঙ্গে যে পশুগুলোর তারা মালিক ছিল, তাদের কোনো ব্যবস্থা করতে না পারায় তাদের ছেড়ে দিয়েছে। এটি অন্য সব সময়ের চেয়ে বেশি মনে পড়ায় সন্ত ফ্রাঁসোয়ার কাহিনী।)

(প্রাগ) ২৬ মে, ১৯২৪। সকালে ভ্যালেনটিন বুলগাকফ এলেন।…গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে এবং 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র গোষ্ঠীর সঙ্গে তলস্তয়-গোষ্ঠীকে যুক্ত করার জন্যে আমি তাঁকে জোর দিয়ে বললাম ঃ তিনি তা করবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মে, ১৯২৪। …হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, এশিয়ায়, ভারতবর্ষে গভীর আশাভঙ্গ, সেখান থেকে (শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক) এফ বেনোআ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাকে লিখছেন (চন্দননগর, ৯ এপ্রিল) ঃ

"…দু' সপ্তাহ হলো গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) চীনের উদ্দেশে জাহাজে চেপেছেন, সঙ্গে আছেন এলমহার্স্ট—এক তরুণ ইংরেজ, আমাদের কৃষি ইন্সটিটিউটের প্রধান, নন্দলাল বসু—সুপরিচিত শিল্পী, ক্ষিতিমোহন সেন—আমাদের অন্যতম পণ্ডিত, শান্তিনিকেতনের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং ভারতীয় লোকসাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের জন্যে খ্যাত, সর্বশেষে কালিদাস নাগ। রেঙ্গুনে ভারতীয় ও চীনা অধিবাসীরা সোৎসাহে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এর পরই থামবেন সিঙাপুরে। তাঁর সফর খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে। কিন্তু আমার বুক কাঁপে এই ভেবে যে, অত্যাধিক গরম আর ক্লান্তিতে গুরুদেবের স্বাস্থ্যের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখা দেয়; এই শেষ বছরের উদ্বেগে তাঁর স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়ে গেছে। তিনি ভীষণভাবে বুড়িয়ে গেছেন। চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয়। পেটের গোলমাল আর অনিদ্রায় ভুগছেন। আমার মতে তিনি নিঃশেষ হয়ে গেছেন। তিনি যে জীবন যাপন করেন তা যারা দেখে, তাদের কাছে এ কিছুই বিস্ময়ের নয়। শান্তিনিকেতনে চৌপ্রহর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তাঁকে দখল ক'রে আছে। এই মার্কিন পর্যটক বা অন্যরা আসছেন, তাঁরা তাঁদের দ্রষ্টব্য তালিকায় তাঁকে রেখেছেন; এই কলকাতা বা অন্য কোনো খান থেকে বাবুমশায়েরা আসছেন, কয়েকটা দিন কাটাতে এবং তাঁর সঙ্গে ভারতীয় রীতিতে নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারের জন্যে। অবশেষে আছেন আশ্রমেরই সাধুজনেরা, যাঁরা তাঁর পরামর্শ ছাড়া কিছুই করতে চান না, যাঁরা তাঁদের হালফিল সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারও তাঁকে অবহিত করাতে চান। সে এক বিরামহীন জনপ্রবাহ, সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দিতে চান না। তাছাড়া এই আবহাওয়ায় দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থাই একমাত্র সম্ভব ঃ আমরা যে বাংলোগুলোয় থাকি তাদের সব দিকই খোলা, এবং নিজেকে আলাদা ক'রে রাখাটা কঠিন। তার পরিণাম হচ্ছে এই যে, তিনি পড়ে-থাকা কোনো

কাজই করতে পারেন না। কিছুই লিখতে পারেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু কয়েকটা গান মনে জাগে, এবং সব বিরক্তি সত্ত্বেও স্নানের ঘরে পালিয়ে গিয়ে তিনি গান বাঁধেন। সেইসব সভা, বৈঠক, উৎসব যাতে সভাপতিত্ব করার জন্যে প্রতিদিন তাঁর কাছে দাবি আসে—তাদের কথা, নির্দেশমাফিক কলকাতা বা অন্য কোথাও বক্তৃতা দেবার কথা, সর্বোপরি অসম্মানজনক সফরগুলো নিয়মিতভাবে তাঁকে দিয়ে যা করানো হয়, (আমরা যার নাম দিয়েছি : ভিক্ষার সফর) এবং যা থেকে তিনি সাধারণত ফিরে আসেন বিধ্বস্ত হয়ে—তাদের কথা তুলছিই না। এসব বিশ্বাস করা কঠিন, তবু এ এইরকমই। একমাত্র এন্ড্রুজ এবং পিয়র্সন এসব বুঝতে পারেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু পিয়র্সন চলে গেছেন আজ এক বছর হলো, আর ফিরে আসবেন না; এবং এন্ড্রুজ তো শান্তিনিকেতনে বড় জোর এক মাস কি দু'মাস থাকেন। দর্শকদের কাফিলাকে আটকাবার জন্যে এখন তিনি প্রকৃতপক্ষে আন্ধেরিতে মহাত্মা গান্ধীর দরজায় পাহারায় আছেন, যেমনটি তিনি ক'রে থাকেন গুরুদেবের দরজায়, প্রতিবার যখন এখানে আসেন। এসত্ত্বেও মহাত্মাজীকে সেদিন কাগজে কাগজে এক বিজ্ঞপ্তি ছাপতে হয়েছে এই বুঝিয়ে যে, দর্শনের সংখ্যা যদি না কমে, তিনি কোনো কাজই করতে পারবেন না। এবং তিনি আরও বলেছেন যে, ভালো হওয়া দূরে থাক, তাঁর স্বাস্থ্য একই রকম চলছে...”

(প্রাগ) রবিবার, ১ জুন। নাম স্বাক্ষরের জন্যে বই আর এ্যালবামের গাদা এসেছে। যা অবাক করে তা এই যে, আমার বইগুলোর মালিক যারা, তাঁদের সংখ্যার মধ্যে আছে কিছু হোটেলের পরিচারক, মোটরগাড়ির চালক, ইত্যাদি। (জুরিখ থেকে ভিয়েনায় আসতে শয়ন-যানের তরুণ এক কণ্ডাক্টার গার্ডের হাতে কি আমার ফরাসী ‘গান্ধীর’ একটা কপি দেখিনি।)

জুন, ১৯২৪। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর কাছ থেকে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ (ইংরেজিতে) চিঠি (কলকাতা, ২০ মে); তাঁর ইংরেজ প্রকাশকের মারফতে আমাকে পাঠিয়েছেন দুটি গ্রন্থ :—১. ‘রেসপনস ইন দ্য লিভিং এ্যাণ্ড নন-লিভিং,’ ১৯২২; ২. প্যাট্রিক গেডেসের লেখা ‘দি লাইফ এন্ড ওয়ার্ক অফ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু’। ভারতবর্ষে তাঁর বাড়িতে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

১৬ জুন, ১৯২৪। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা লালা লাজপত রায় ও তাঁর তরুণ সেক্রেটারি কে. ও. কোহালর আগমন। (গান্ধী প্রায়ই তাঁর রচনাগুলিতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তাঁর কথা লেখেন)। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনিই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত দু'বছর জেলে ছিলেন। সেখান থেকে বুকের অসুখ বাধিয়েছেন, এসেছেন সেটা পরীক্ষা করাতে এবং সম্ভবত লেজ্যাঁতে তাঁর চিকিৎসা করাতে। তাঁর বয়স ৫৯ বছর। শুধু ইংরেজিই বলেন। দেখতে ছোটখাটো, গাট্টাগোট্টা, পেশীবহুল খুবই কালচে রঙের, টাইপটা কিছুটা অসুন্দর,

বাঙালী বাবুর টাইপ, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান। খোলাখুলি ও স্পষ্ট ক'রে তিনি খুব কথা বলেন ; এবং উচ্চ কণ্ঠে হাসেন। বেশীর ভাগ ভারতীয়ের চেয়ে স্পষ্ট ক'রে তিনি খুব কথা বলেন ; এবং উচ্চ কণ্ঠে হাসেন। বেশীর ভাগ ভারতীয়ের চেয়ে স্পষ্ট ক'রে নির্দেশ করার স্বভাব তাঁর অনেক বেশি। তিনি আমার গ্রন্থের কালানুক্রমের ধারাবাহিক ভুল ধরে সেগুলো আমাকে দেখিয়ে দিলেন : তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। মুখ্য হলো, এই যে, দৃঢ়সংকল্প হয়ে রাজনীতিতে ঢোকার জন্যে গান্ধী তিলকের মৃত্যুর অপেক্ষা করেননি এবং ছয় মাস আগে থেকেই তিনি তাঁর দলের পত্তন করেছিলেন, সেই দল এরই মধ্যে তিলকের দলকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল। তিলকের বন্ধু লাজপত রায় গান্ধীর পাশ থেকে সরে এসেছিলেন ; ১৯২০ সালে যখন তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিলক ও গান্ধী কথা বলেছিলেন ; এবং এই দলত্যাগের জন্যে তিলক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। (চার দিনের অসুখের পর তিলক হঠাৎ পরলোক গমন করেন।)—তাছাড়া, গান্ধীর আদর্শ প্রসঙ্গে আমি যে কিন্তু ভাব দেখিয়েছি—তা, এবং কালেলকারের মতো অতিশয়িত শিষ্যদের সম্পর্কে সমালোচনা—লাজপত রায় সমর্থন করলেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ব'লে তিনি মনে করেন। একদিকে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার চাপা উত্তেজনা : (তিনি এই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছেন যে দুই ধর্মের মিলন অসম্ভব)। অন্য দিকে, বিপ্লবীদের সন্ত্রাস এবং অবিচার—যার মাধ্যমে ইংরেজ সরকার এর উত্তর দেয়। লালা লাজপত রায় ফিরছেন ইংলন্ড থেকে, সেখানে শ্রমিক সরকারের কোনো কোনো সদস্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল ; শ্রমিক সরকার সম্পর্কে তাঁর বেশ খারাপ ধারণা। "ভুঁইফোড় এক রক্ষণশীল রাজনীতি চালিয়ে নিজেদের জন্মসূত্রকে মার্জনা করানোর চেষ্টায় আছে।" তাছাড়া, সমস্ত ইউরোপীয় সরকারগুলো সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কম বাঙ্গাত্মক ও অবজ্ঞাজনক নয়। ইংরেজ সম্পর্কে ভীত সরকারগুলোর ভারতবর্ষের প্রতি দেখানো-সহানুভূতিতে তিনি প্রতারিত নন। ইউরোপের প্রকৃত অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি নতুন ইয়োরোপের—যে-ইউরোপ গেড়ে বসেছে আফ্রিকায়—বিরোধিতা করেন (আমরা একসঙ্গে বিরোধিতা করি)। তিনি প্রায়ই ইউরোপে এসেছেন। যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘুরছিলেন তখন যুদ্ধ বেধে যায়। যতদিন যুদ্ধ চলেছে তাঁকে ভারতবর্ষে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমেরিকায় তিনি তরুণ ভারতবর্ষের উদ্ভবের উপরে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ।

জুন, ১৯২৪। লালা লাজপত রায়ের তরুণ সেক্রেটারি কে. ও. কোহলির আগমন। আমার 'মহাত্মা গান্ধী'র নতুন সংস্করণের জন্যে তিনি (আমার অনুরোধে) সংশোধনের একটি বিস্তৃত তালিকা এনেছেন—লাজপত রায় বস্তুত ভালম'তে চিকিৎসায় আছেন। তাঁর মতো কে. ও. কোহলিও পাঞ্জাবের লোক। ১৯২২এর এপ্রিল থেকে ১৯২৩এর অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর মতো তিনিও বন্দী ছিলেন। তাঁর ভাষায় "পশুর মতো ব্যবহার করা হয়েছিল"। ফাঁসির আসামীদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক খাটুনিতে

লাগানো হয়েছিল। পাঞ্জাবে তিনি ছিলেন অ-প্রতিরোধের ৫০০ স্বেচ্ছাসেবকের নেতা। তাঁর মুখখানি প্রীতিপ্রদ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং মনটি স্পষ্ট যথাযথ, পশ্চিমের ঐতিহাসিক প্রণালীতে অভ্যস্ত। স্বাভাবিক ভাবেই, নিজের পৃষ্ঠপোষক লাজপত রায়কে অগ্রগণ্যের ভূমিকায় আরোপিত করার দিকে তাঁর ঝোঁক। তিনি বললেন যে, গ্রেপ্তার হওয়ার সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে লাজপত রায়ের সঙ্গে সবসময়ে পরামর্শের অভ্যাস গান্ধীর ছিল ঃ কারণ ১৭ বছর বয়স থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় লাজপত রায়ের এক বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানালেন ঃ চৌরিচৌরার ঘটনাবলীর আগে, গান্ধী যখন গোটা ভারতবর্ষের জন্যে আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, বড়লাট লর্ড রিডিং এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, তিনি লাজপত রায় ও পণ্ডিত '—'কে ডেকে পাঠান এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দিতে সম্মতি জানান, যদি গান্ধী তাঁর বিদ্রোহের নির্দেশ প্রত্যাহার ক'রে নেন। লাজপত রায় এবং তাঁর সহযোগী গান্ধীকে টেলিগ্রাম করেন, তাঁদের মতোই গান্ধী তা গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রহণের ঘোষণা জানিয়ে বড়লাটকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। কিন্তু যোগাযোগ-ব্যবস্থার ঢিলেমিতে এমন হলো যে, তাঁর টেলিগ্রাম পৌছুল যেদিন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হবে সেদিন সকালে। তারপর থেকে ঘটনাবলী ঘটতে লাগলো, যেমনটি সবাই জানে। এবং লাজপত রায় এখন দেখছেন যে, এ রকম হওয়াটা ভালই হয়েছিল। অসহযোগের বিরাট আন্দোলনের জন্যে তিনিই প্রথম কারাবরণ করেছিলেন। আগের দিনে যেমন করতেন, বর্তমানে গান্ধীকে তিনি তেমনই শ্রদ্ধা করেন ; কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যে, স্বরাজ্য পার্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধী ভুল পথ ধরেছেন। তিনি বলেন, দু'টোর মধ্যে একটা হবে,—হয় ভারতবর্ষ গান্ধীর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপত্র মানবে না, নয়তো এ পরাজয় বরণ করবে।

গনেশনের কাছ থেকে গান্ধী সম্পর্কে লেখা আমার গ্রন্থের তামিল (ভারতবর্ষের অন্যতম স্থানীয় ভাষা) সংস্করণের কয়েকটি কপি পেলাম।

৪ জুলাই, ১৯২৪। লাজপত রায় আমাকে ও আমার বোনকে গ্রাঁদ-অতেল দ্য তেরিতে-য় ভালমঁর ডাঃ আয়মেরুলির সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। এই ভারতীয়দের বিস্ময়কর প্রাণবন্ততা সম্পর্কে আয়মেরুলি আমার কাছে তাঁর শ্রদ্ধার কথা বললেন। তিনি কখনো ভাবতে পারেন না তাঁর এই রোগী, এই প্রবল উচ্চকন্ঠের হাসি আর শত্রু সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি নিয়ে দু'বছর জেল খেটে বেরিয়েছেন, সে-দু'বছর ধরে তাঁর কাজ ছিল দড়ি পাকানো। (সত্যি কথা বলছি ! লাজপত রায় বইপত্র পাওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেক্রেটারি যাঁতা ভাঙতেন, তেলের ঘানি টানতেন—ক্রীতদাস সুলভ কাজে আটকে থাকতেন।) অনেক এশিয়াবাসীর

মতোই রায়ের অন্তরের অন্তস্তলে ইউরোপ ও তার আদর্শবাদী দাবিগুলো সম্পর্কে এক গভীর এবং ব্যঙ্গাত্মক নৈরাশ্যবোধ আছে। এমনকি তিনি নিশ্চিত নন, তাঁদের সংশয় এখন সমস্ত মানবিক আদর্শবাদে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা। লোভাতুর ইউরোপের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী সুইজারল্যান্ড কেমন ক'রে টিকে আছে তা বুঝবার চেষ্টায় আয়মেরুলির সমস্ত যুক্তি শোনার পর লাজপত রায় বললেন: "আর তাছাড়া, পাহাড় ছাড়া এখানে চুরি করার কিছুই নেই। এখন বুঝতে পারছি।"

(অধিকন্তু, তিনি আরও বলেন যে, তিব্বত তবুও ইংরেজের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কেননা সেখানে কয়লাখনির সন্ধানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।)

পি. গেডেস-এর 'দি লাইফ এ্যান্ড ওয়ার্ক অফ স্যর জগদীশ চন্দ্র বোস' পড়ে (বোনের মাধ্যমে) উদ্দীপ্ত।

জুলাই, ১৯২৪। কয়েক মাস যাবৎ কালিদাস নাগের আর কোনো সংবাদ জানতাম না, তিনি ২৬ জুন সুনওয়া মারু (জাপান) থেকে এক দীর্ঘ পত্র আমাকে লিখেছেন, পত্র শেষ হয়েছে ২৮ জুন শাংহাইতে এবং "ভায়া সাইবেরিয়া" চটপট এসে পৌঁছেচে (১৭ জুলাই ভিলন্যভে)। এশীয় চিন্তার মিলনকে জাগ্রত করা এবং দূর প্রাচ্যের গুণীজন ও ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে আকৃষ্ট করার জন্যে চীনে ও জাপানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সফরের এক বিবরণ আমাকে পাঠিয়েছেন। এখন সফর শেষ হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগের সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। দুই সফরকারীর মনের উপর প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে কৌতূহলজনক, আমার প্রতি দু'জনের প্রীতির সাক্ষ্য হিসেবে মূল্যবান, কিছু কিছু অংশ এই বিরাট পত্রখানি থেকে আমার বোনের তর্জমা অনুযায়ী তুলে দিচ্ছি।

· · ···"আমরা চীন ও জাপানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছি, সমস্ত ধরনের মানুষের সামনে বক্তৃতা দিয়েছি, আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলোর সবসময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, সময়ে সময়ে স্পষ্টতই বিরোধী—সঙ্গে কথা বলেছি। তাছাড়া, আমার গুরু আপনার অন্তরের এতো প্রিয় শান্তির ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের বাণী রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর অধম শিষ্যের ভবিষ্যদ্বক্তাসুলভ কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে। সুকঠোর আত্মিক সংগ্রামে—যেখানে পরস্পর বিরোধিতা করছে এক দিকে দু'জন বিচ্ছিন্ন ভারতীয়, অন্য দিকে প্রাচ্যে 'সভ্যতা বিতরণকারী" মার্কিন ধনবাদী ও সমরবাদীরা এবং পাশ্চাত্য থেকে আসা মোক্ষদাতা মিশনারীরা, এই দ্বন্দ্বে - আমার গুরু আপনাকে আমরা প্রতিদিন স্মরণ করেছি। এবং এখানে আপনার চিঠি আমাদের হাতে এসেছে আশা ও প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে। কতবার আমি সে-চিঠি পড়েছি! রবীন্দ্রনাথকে তা পড়িয়ে শুনিয়েছি এবং আমরা আপনাকে আমাদের অতি গভীর ভালবাসা ও আমাদের হার্দ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দ্রুত কয়েক

লাইনে আমি শুধু চেষ্টা করবো আমাদের কাজ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা আপনার কাছে তুলে ধরতে। আপনি আমাদের অন্তরের এতো কাছাকাছি ও এতো প্রিয় যে, আমাদের বোধ হয় যেন দিনের পর দিন আমরা সব কিছুই আপনার সঙ্গে আলোচনা করছি,—(প্রকৃতপক্ষে, প্রতি সন্ধ্যায় আমি তো তাই করি, আপনি তা অনুভব করতে পারেন না ?)—ভিলন্যভে সেই আলাপনের অনির্বচনীয় আনন্দের দিনগুলোয়, তা করার কী সৌভাগ্যই না আমার হয়েছিল।

বিস্ময়কর সত্যগুলোর জন্য আপনি যে সংগ্রাম করেন, সর্বত্র আমি তাদের অনুমোদনই দেখতে পাই। সাংহাই, নানকিং, পিকিং, টোকিও, কিয়োটো, ওসাকা যেখানে যেখানে তরুণগোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলার আমন্ত্রণের সম্মান আমি পেয়েছি, সর্বত্রই গভীর আনন্দ পেয়েছি এই দেখে যে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, আপনার চিন্তাই দূরপ্রাচ্যে কাজ ক'রে চলেছে। কী আনন্দে, কী গর্বে আমি আপনার মহৎ কর্মের সাক্ষ্য দিয়েছি ; যদিও চীন মুখ্যত স্বপ্নচারিতার অবস্থায় আছে ব'লে মনে হয়. জাপান ভালো করেই জেগে উঠেছে, এবং নতুন এক মানসিকতার দিকে নিজেকে চালিত করছে। যদি ইউরোপে প্রকাশক পাই, কোনো একদিন আমার নোটগুলো ছাপবো। ইতিমধ্যে. আমি অনুভব করি যে, ২৫ শতাব্দী আগে বিশ্বজনীন শান্তি ও প্রেমের যে বিরাট মনটি বুদ্ধের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, আজ তাই আপনার, গান্ধীর এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সক্রিয়। নিউম্যানের বৌদ্ধ রচনাবলী অনুবাদের সাফল্যের কথা জেনে আমি আনন্দিত। এটা যুগের চিন্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এইসব গ্রন্থের বেশির ভাগ আগেই অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু সাধারণকে উদাসীন ক'রে রেখেছিল. কারণ এইসব অনুবাদ ছিল ভাষাতত্ত্ববিদদের সময়-কাটানোর পণ্ডিতী প্রয়াস। নিউম্যান আংশিকভাবে সফল হয়েছেন, কারণ এই কাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু যে পালি অনুশাসনের সঙ্গে তিনি যুক্ত তা বৌদ্ধ ধর্মের একটি মাত্র দৃষ্টিকোণের প্রতিনিধিত্ব করে ; সংস্কৃত অনুশাসন ফরাসী পণ্ডিতেরা বিস্তৃতভাবে বিচার করেছেন। অধ্যাপক মাসনুর্সেলকে অনুরোধ করুন সিলভ্যাঁ লেভির প্রবন্ধগুলো, সেনারের 'মহাবস্তু', জে. প্রজুলুস্কির 'অশোকাবদান' সম্পর্কে গবেষণা (এই বছরে সরবনে দাখিল করা) আপনাকে পাঠাতে ; এবং আপনি মহাযানের দুর্ধর্ষ জগতটিকে দেখতে পাবেন। কিন্তু এসবই হচ্ছে একটি মানুষ এবং তার আন্দোলনকে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা মাত্র, বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য দিয়ে যার সীমানা যথাযথ নির্দিষ্ট হয়নি। খ্রীষ্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ ছাড়া খ্রীষ্টকে কেউ বুঝতে পারে না। বুদ্ধ এখনো তাঁর সত্যিকারের জীবনীকার খুঁজে পাননি। আমরা অপেক্ষা করবো সেই ব্যক্তিত্বের, যিনি তাঁরই জীবন যাপন করবেন, তাঁরই যন্ত্রণা সহ্য করবেন, তাঁর চরম আনন্দ উপলব্ধি করবেন, এবং এই তীব্র ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডিত্য ও সন্ন্যাস সংক্রান্ত উপাদানগুলোর বিপুল পুঞ্জকে ছেঁকে তুলবেন। এবং একমাত্র তখনই আমরা পাবো বুদ্ধের প্রকৃত আত্মিক জীবনী।...

··জাপানীরা বিস্ময়কর ভাবে সক্রিয় এবং "প্রতিবেদনশীল," চীনাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; চীনারা যেন এক শতাব্দী পেছনে। প্রাচ্য সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নারীর সচেতন বা অচেতন মূল্যাবনতির মধ্যে। সুখের বিষয়, জাপানে, যেমন ভারতবর্ষে, নেতারা এবং শিক্ষিত শ্রেণীরা বিপদ সম্পর্কে অবহিত এবং নারীদের শিক্ষিত করতে ও মুক্তি দিতে চেষ্টা করছেন। চীন কিন্তু আমার দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাচ্ছে। মার্কিনী লোভ এবং উপর-চটক আধুনিক চীনাদের মনের মধ্যে ঢুকেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এতই আধুনিক যে, এরা সমরবাদবিরোধী, যন্ত্রবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রাচীনপন্থী ব'লে গণ্য করেছেন! কিন্তু নব্য চীনের এই তথাকথিত নির্মাতারা চীনের নারীদের প্রতি, সমাজের আভ্যন্তর স্বাস্থ্যের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি না দিয়ে জাপানের সমরবাদ এবং মার্কিন ধনবাদের নকল ক'রে চলেছেন। চীনের আধুনিক চিন্তার নেতাদের সঙ্গে আমাদের প্রচণ্ড লড়তে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আগমন অনেক মঙ্গল করেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারটাতেই তরুণ চীনাদের চীনের মার্কিনীকরণ রাজনীতির পুনর্বিচার ও সংশোধন করতে হয়েছে। তাঁরা আদর্শবাদের প্রতি এক নির্লজ্জ অবিশ্বাস প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু তাঁদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয়েছে যে, তাঁদের কর্মতৎপরতার পিছনে, ভাবগত না হোক, কোনো একটা গঠনমূলক চিন্তা থাকা প্রয়োজন। সংখ্যাধিক্যেরা উপযোগবাদী (utilitaire) এবং প্রয়োগবাদী (pragmatique)। অবশ্য, আমরা প্রতিটি সহরে আদর্শবাদীদের একটি গোষ্ঠী আবিষ্কার করেছি, তাঁদের ক্ষমতা নেই কিন্তু তাঁরা খাঁটি এবং আমরা তাঁদের মধ্যে দিয়ে কাজ করার আশা রাখি। অন্যদিকে জাপান পুরোপুরি জেগে উঠেছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই। কী মর্যাদাবোধ ও ধৈর্যের সঙ্গে তারা ভূমিকম্পের বিপর্যয় ও তার ফলাফলের মধ্যে দিয়ে কাজ ক'রে চলেছে,—এবং চলেছে মার্কিনী বহিষ্করণ আইনের অসম্মানের মধ্যে দিয়েও! আমরা এক শুভমুহূর্তে এখানে এসেছি এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে তাদের নিজেদের ভবিষ্যদ্বক্তা-কবিদের একজনের মতোই অভ্যর্থিত হয়েছেন। সর্বত্র গভীরভাবে তাঁর মূল্য উপলব্ধ হয়েছে। এবং জাপানের মাধ্যমে আমরা চীনকে প্রভাবিত করার আশা রাখি। আমরা জাপানে এক নতুন আদর্শবাদের প্রভাতকে অনুভব করেছি। তাছাড়া, আমরা উপলব্ধি করেছি যে, অন্য কোনো দেশের চেয়ে জাপানেই নারী, শিল্প এবং ধর্ম প্রকৃতরূপে জাগ্রত-শক্তি হয়ে উঠেছে।…

··ভিলা অলগা থেকে বিদায় নেবার সময় বাংলায় লেখা আমার যে-কবিতাটি আমি আপনার উদ্দেশে নিবেদন করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ তার তারিফ করেছেন। আমি আপনার জীবনকে স্বর্গীয় নদীর সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি চিত্রকল্প উত্থাপন করেছেন: রলাঁ প্রেমের অতল হ্রদ, স্বর্গীয় অশ্রুজলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ইউরোপে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে এই ছবিটি জেগেছে। সেই বিস্ময়কর নীল চোখদুটি, লেমাঁ হ্রদের মতো অনাবিল ও নির্মল, অবশ্য তাদের স্বচ্ছ ঝলকের নিচে লুকিয়ে রেখেছে বিষণ্ণ সমুদ্র, অশ্রুজলে গভীর ও ভয়ংকর।…রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, আপনিই তাঁর একমাত্র আত্মিক সঙ্গী বেঁচে

আছেন ; আপনাকে না লিখলেও, তিনি আপনার উপস্থিতি অনুভব করেন এবং যতবারই তাঁর কিংবা আমার কাছে আপনার বোনের চিঠি আসে, তিনি আমাকে আবার পড়ে শোনাতে অনুরোধ করেন। পিয়র্সন সম্পর্কে আপনি তাঁকে যা লিখেছেন, তা তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে, এবং প্রতি চিঠিতে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনার ভ্রাত্রোচিত কুশলপ্রশ্ন তাঁর হৃদয়কে অত্যন্ত স্পর্শ করেছে। আগে থেকেই তাঁর এক ধারণা হয়েছে, জানিনা কেন, মাত্র আর কয়েক বছরের বেশি তিনি বাঁচবেন না এবং কাজ করতে পারবেন না : এখনো কাজ এতো বিপুল, লড়াই সবে শুরু হয়েছে, এবং তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন যে, তাঁর ভ্রাতা রলাঁ আন্তর্জাতিক আলাপনের কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে অনেক—অনেক বছর যেন বেঁচে থাকেন। আমার পক্ষে, যে-জগতে রবীন্দ্রনাথ ও আপনি নেই, সে-জগতে আমি তো বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই পারি না ! আমাদের মধ্যে আপনারা দু'জনে অনেক কাল বেঁচে থাকুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা !…

…আপনাদের হৃদয়ের অগ্রগতিতে যোগাযোগ কী বিস্ময়কর ! দক্ষিণ আমেরিকার আদর্শবাদীদের সঙ্গে নতুন সম্পর্কের বিষয়ে আপনি সদ্য সংবাদ জানিয়েছেন ; আপনার শেষ চিঠিতে মেক্সিকোর কথা বলেছেন। সব বিস্ময়ের বাড়া, এখানে জাপানে দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রতিনিধিরা আগামী ডিসেম্বরে তাঁদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে সদ্য নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন ! দু'জন অধ্যাপককে নিয়ে (এই অধম শুদ্ধ) সেখানে যাবার প্রতিশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁরা আদায় ক'রে নিয়ে গেছেন এবং পথখরচা তাঁরাই দেবেন। এই জন্যে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হলো এই ঃ প্রস্তুত হবার জন্যে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে রবীন্দ্রনাথ তাড়াহুড়ো করছেন। আর আমি ফরাসী-ইন্দোচীনে যাবো কম্বোজ, আংকোরভাট ইত্যাদির পরিবর্তন খুঁটিয়ে জানতে ম', পিনোর সঙ্গে, তিনি দয়া ক'রে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার ছুটি আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেন (আশা করি বাড়িয়ে দেবেন, রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেছেন), তবে সেপ্টেম্বরের শুরুতে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার কয়েক সপ্তাহ আগে, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলবো। রবীন্দ্রনাথ খুবই চাইছেন আমি সঙ্গে যাই। ইতালি ও স্পেনে বক্তৃতা দিতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন, দেশ দু'টি এখনো দেখেননি। সেখান থেকে তিনি পেরু যাত্রা করবেন, অবশেষে ৯ ডিসেম্বর উৎসবে উপস্থিত থাকবেন। যদি অক্টোবরে আমরা ইতালি ও স্পেনে কাটাই, তাহলে সীমান্তের কাছে কি কোথাও আপনাকে দেখার আশা করতে পারি না, যাতে আপনার মতামত এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি ? দক্ষিণ আমেরিকার নেতাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে এবং আপনার উপদেশ হবে অমূল্য। তাই, আমার গুরু আপনি আমাদের জানাবেন, কোথায় এবং কিভাবে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবো। জুলাইয়ের শেষ অবধি আমার ঠিকানা হচ্ছে, ম'. পিনো, ডিরেক্টর, লেকল ফ্রঁসেইজ্‌ দেক্‌স্‌ত্রেমরিআঁ, হানয় (ইন্দোচীন)—এবং তার পরে কেঃ অঃ রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল, ইন্ডিয়া…

...পুনশ্চ...আপনাকে অনুরোধ জানাই, নিজেকে পীড়িত করবেন না এবং সবচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে স্বাস্থ্য ঠিক রাখবেন! আপনি সম্ভবত জানেন না, আপনার জীবন কত মূল্যবান! আপনাকে জগতের প্রয়োজন আছে এবং আপনার উপরে সে নির্ভর ক'রে আছে।"

জুলাই, ১৯২৪। তাড়াতাড়ি কালিদাস নাগের চিঠির উত্তর দিলাম; আর প্রথমে লিখলাম জোসে বাসকোনথেলোসকে (মেক্সিকো),—দ্বিতীয় কার্লোস আমেরিকো আমাইয়া, লা প্লাতার (আর্জেনটিন) 'বালোরাথিওনেস' পত্রিকার সম্পাদককে— আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক ক'রে দিতে। কারণ আমার ভয়, ইউরোপের মতো, রক্ষণশীল শক্তিরা রবীন্দ্রনাথকে না কুক্ষিগত করে এবং তাঁর নাম ভাঙায়; আমি প্রগতিশীল গোষ্ঠীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সংযোগ ক'রে আগ বাড়িয়ে যেতে।

গান্ধীর উপরে নতুন একটা প্রবন্ধ লিখলাম, তাঁর প্রবন্ধাবলী : 'ইয়ং ইন্ডিয়া র ফরাসী সংস্করণের একটি ভূমিকা. সেটি প্রকাশিত হচ্ছে স্টক-প্রকাশনী থেকে। এতে আমি জোর দিয়েছি তাঁর কর্মের "পরীক্ষা মূলক' এবং দুঃসাহসিকভাবে সক্রিয় চরিত্রের উপরে। নিষ্ক্রিয় কোনো কিছুই নেই। (২০ জুলাই)

২৬ জুলাই, ১৯২৪। চারজন এশিয়াবাসীর আগমন; আমাদের কাছে আসতে বলেছেন পল রিশার এবং নিয়ে এসেছেন তাঁর ছোট ছেলেঃ—চিন্তাবিদ ও কবি জাপানী হিরাসাওয়া; গান্ধীর শিষ্য এবং মুসলমান থিওসফিস্ট হাতিন আলভি; সিন্ধুর হিন্দু সুফি অমৃত যাসুন্ঘানি; এবং পল রিশারের হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী হবার পর পারীতে বিজ্ঞানের ছাত্র রামাইয়া নাইডু। রামাইয়া নাইডু একেবারে তরুণ, গায়ের রঙ প্রায় কালো, সকলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে আকর্ষণ করেন; রমণীয় মুখখানি হাসোজ্জ্বল চোখদুটিতে উদ্ভাসিত,—প্রাণ-প্রাচুর্যে এবং হার্দ বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ। যতদূর জানি, তিনি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের *...আলভি গান্ধীর আশ্রমে থেকেছেন এবং যাসুণ্ঘানি গান্ধীর মতোই গুজরাতের লোক।

২৮ জুলাই, ১৯২৪। লাজপত রায়ের পুনরাগমন। এবার এসেছেন তাঁর এক ছেলের সঙ্গে, ছেলেটি বার্লিনে পলিটিকাল-ইকনমির ছাত্র। তিনি আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ক্লারীয় আছেন, তারপর আবার ভারতবর্ষে যাত্রা করবেন। গান্ধীর সঙ্গে আবার দেখা করবার এবং তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তাঁর তাড়া আছে :

---

* ভুল। নাইডু জাতিচ্যুত হয়েছিলেন, কারণ তিনি অস্পৃশ্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন

কারণ তিনিই একমাত্র রাজনীতিজ্ঞ যিনি গান্ধীকে উপদেশ দিতে পারেন এবং গান্ধী তাঁর কথা মন দিয়ে শোনেন : দাসের সঙ্গে – এবং সম্ভবত দাসের আগে, তিনিই প্রথম সারির একমাত্র ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা। আমার যা মনে হয়, তাতে তাঁর মনটা অদ্বিতীয়রূপে রাজনৈতিক ; এবং তিনি যদি গান্ধীর অসহযোগের মতবাদ গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা করেছেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে (যা—আমার মনে হয়—গান্ধীর বড় একটা মনোমত নয়।) লাজপত রায় মুক্তির পর থেকে গান্ধীর কর্মসূচি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছেন ; তিনি বললেন, গান্ধী যদি মোটেই পরিবর্তন না করেন, তবে তাঁর থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে : যা ভারতীয় স্বার্থের মর্যাদায় গুরুতর আঘাত হবে ;—কিন্তু তাঁর অন্য কোনো উপায় নেই। তিনি বললেন : গান্ধীর সামনে রয়েছে শুধু দুই পক্ষের মধ্যে বেছে নেওয়া : হয়, নিজেকে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া, কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নৈতিক ও ধর্মীয় গতিপথকে রক্ষা করা এবং উঁচুদরের শিষ্য তৈরি করা, যাঁরা তাঁর চিন্তাধারা বয়ে চলবেন ;—নয়, তাঁর রাজনৈতিক কৌশল সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা এবং স্বরাজ্যপন্থীদের পঙক্তিতে এসে দাঁড়ানো। দলের সকল সদস্যের উপরে চরকা চাপানোর বাসনার একগুঁয়েমি অবাস্তব এবং তা ব্যর্থ হতে—যা সবচেয়ে খারাপ, দলকে ভাগ করতে বাধ্য। এমনকি আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি বয়কট, যা এমনিতে ভাল এবং ন্যায়সঙ্গত, কার্যত দীর্ঘস্থায়ীরূপে অসম্ভব। কেবলমাত্র একটা পরীক্ষা হিসেবেই নির্দিষ্ট সময়-সীমা গ্রহণে দল রাজী হয়েছিল। পেরিয়ে-যাওয়া সময়সীমা, যথেষ্ট ফলের অভাব অথবা পরিষ্কার খারাপ ফল—প্রমাণ করছে যে, এ প্রত্যাহার করা উচিত। গান্ধীকে তাঁর রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতবাদের একমাত্র অহিংসাকে—যা এর হৃদপিন্ড—অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে, এবং যেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তার গতির স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে বাকিটুকুতে আঁকড়ে থাকলে চলবে না। তাছাড়া, নিজের কথা বলতে লাজপত রায় বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের জন্যে লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক দিক থেকে সত্য অহিংসা (তার সংখ্যাগত ও প্রাণবন্ত বিপুল শক্তির দরুণ) পরম ও সর্বজনীন নীতি হতে পারে না ; আর বৃহৎ কোনো জাতির দ্বারা বিপদ ঘনিয়ে এলে রাজনৈতিক কর্তব্য হচ্ছে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানানো। এই নিয়ে আমাদের আলোচনা হলো। আমি মোটেই তাঁর মতের পক্ষপাতী নই, এমনকি ঠিকঠিকভাবে, রাজনৈতিক ও ফলিত দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিষয়েও না ; আমার বিশ্বাস, এইরকম অবস্থায় অস্বীকৃত লড়াই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে ; এবং একটি অহিংস ও স্বীকৃতিবিমুখ জাতির সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে ফলপ্রদ অস্ত্র হচ্ছে অনমনীয় নৈতিক প্রতিরোধ। কিন্তু এটি আত্মিক উৎকর্ষের এক প্রশ্ন। সেখানে প্রতিটি পরীক্ষায় এক নৈতিক দৃঢ়তার পোড় খাওয়ার প্রয়োজন।

আমি বিস্মিত হয়েছি (এইরকম আমার বোনও হয়েছে) বাঙালী (রবীন্দ্রনাথ, নাগ, রায় প্রভৃতি) এবং পাঞ্জাবের ভারতীয়দের (যেমন লাজপত রায়) মধ্যেকার পার্থক্য দেখে। ওঁরা যেন কেমন বেশি কর্কশ, বেশি অমার্জিত ব্যবহারে কম পরিশীলিত এবং এমনকি, কিছুটা স্থূল। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর

মধ্যে যেমন আমাদের আজকের অতিথির মধ্যে। এঁরা মার্কিনীদের কাছাকাছি, রুজভেল্ট টাইপের; এবং প্রকৃতপক্ষে এঁদের মধ্যে অনেকেই মার্কিনীভাবাপন্ন। যে-জাতের বাঙালীদের আমরা দেখেছি, তাদের ক্ষেত্রে এরকম কখনোই সম্ভব হবে না। একটা ভারতবর্ষ নেই। আছে ইউরোপের জাতিগুলোর মতো অনেক ধরনের ভারতবর্ষ। এটা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, ইউরোপের হাত থেকে মুক্ত ভারতবর্ষে সে-ই সুবিধা করতে পারবে, যে হবে দার্শনিক ও কবিদের গোত্রের কেবলমাত্র আমরা যাঁদের জেনেছি। এক মার্কিনী ধরনের ভারতবর্ষের আচমকা বিরোধিতার কথা কী ক'রে বলি! এবং কে জানে মূলে ভারতবর্ষের জাপানের চেয়ে—যে-জাপান বাহ্য লক্ষণ সত্ত্বেও, মূলত আদর্শবাদী—বেশি মার্কিনী হবার প্রবণতা হবে কি না!

১৭ আগস্ট, ১৯২৪। পল রিশারের আগমন। সব সময়ের মতোই ডাইনে বাঁয়ে কয়েকজন এশিয়াবাসী,—সুশোভন রামাইয়া নাইডু বোম্বাইয়ের এক তরুণ পার্শি, লন্ডনে বিজ্ঞানের ছাত্র কে. এল. কাব্রাজি এবং তার বাগদত্তা, লন্ডনের অধ্যাপিকা কুমারী হিন্ডে। পল রিশার ফিরে এসেছেন ফ্রান্সে, তাঁর জন্মভূমি মঁ-পেইয়ে-য়, সেখানে তিনি অনেক দিন যাননি। কৌতূহলজনক এই মানুষটি শেজিয়ের-এর কাছে তাঁর 'একোভে'-দের আশ্রমে সকল ধর্মের চিন্তাশীলদের টেনে আনছেন। ক্যাথলিক ধর্মযাজক, পারীর ল্যাঁস্তিত্যু কাতোলিক্-এর গ্রীক দর্শনের অধ্যাপক, মোহান্ত সিমুতের-এর সঙ্গে দুটো দিন সদ্য কাটিয়ে এসেছেন; তিনি বললেন, ধর্মযাজক অতি খোলা মনের, গান্ধীর মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আরও একবার আমি লক্ষ্য করলাম সদাশয়তার অভাব,—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রতি মূলত পল রিশারের যে-অভাব আছে। আমি বিশ্বাস করি, এটা ইচ্ছাকৃত নয়; আর যখন তাঁকে সেটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তিনি রুখে ওঠেন। কিন্তু আবার শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথকে, মুখ্যত, তাঁর আভিজাত্যবাদের জন্যে তিনি ক্ষমা করেন না। আর গান্ধীর ক্ষেত্রে অ-প্রতিরোধের প্রতি তাঁর কোনোই রুচি নেই। এশিয়াতে তাঁর পক্ষপাতিত্ব জাপান ও মুসলমান জগতের প্রতি। পার্শি কাব্রাজি অশ্বেতকায়ের মতো বড় একটা নন, প্রায় ইউরোপীয়ের টাইপ, নিয়মিত গঠন, যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ও মার্জিত,—শীতলতা-বর্জিত নন। তাঁর বাগদত্তার সঙ্গে ফিরছেন জার্মানী থেকে, সেখানে তাঁরা শান্তিবাদী ছাত্রদের আলোচনা-সভাগুলোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ ভালো সঙ্গীতজ্ঞ। (তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধান পার্শি সঙ্গীত রচয়িতা অথবা প্রধান রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম।) আমি তাঁদের বিঠোভেন এবং জে. এস. বাখ্ বাজিয়ে শোনালাম। তাঁর তরুণ ফরাসী বন্ধু গাব্রিয়েল মনো-হেরজেনএর মতো রামাইয়া নাইডু একজন থিওসফিস্ট। আমি এতে আশ্চর্য হওয়ায় (এবং পল রিশার থিওসফির প্রতি আর তেমন বেশি সদয় নন,) সুন্দরভাবে বিব্রত নাইডু বললেন, এটা কৃতজ্ঞতার জন্যে ঃ শিক্ষার জন্যে তিনি ভারতের থিওসফিক বিদ্যালয়ের কাছে ঋণী। মনে হয় ভারতবর্ষে হিন্দুর পুরাতন ধর্মীয় মূল নীতির অর্থের প্রাণসঞ্চার করতে

থিওসফিস্টরা যেন অনেক কিছু করেছে। কিন্তু আনি বেশান্ত জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে তাদের প্রবল প্রতাপ পড়তির মুখে।

অক্টোবর, ১৯২৪। রবীন্দ্রনাথ পারী পৌঁছেছেন, কিন্তু সঙ্গে কালিদাস নাগ নেই, এনড্রুজও নেই। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া, তৎপরতা, বাস্তববুদ্ধি সফরকালে যা যা দরকার, তার জন্যে এই দুই সঙ্গী বড়ই প্রয়োজনীয় ছিলেন। তাঁর কিছুটা বেপরোয়া পেরু-অভিযানের জন্যে তাঁকে সরবরাহ করার মতো আমার যে তথ্যাদি ছিল, ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে তা জানানো হলেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগমন সম্পর্কে আমাকে জানাননি ; ঠিক যেদিন তিনি ফ্রান্স ছেড়ে যাচ্ছেন তার আগে, তিনি ফ্রান্স হয়ে যাবার কোন ইঙ্গিত আমাকে দেননি। ১৭ অক্টোবর (বুলঞ্-স্যুর-সেইন্ থেকে) তিনি আমাকে লিখছেন :

"প্রিয় বন্ধু,—দক্ষিণ আমেরিকা যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ আমাকে জানানো হলো, একমাত্র যে-জাহাজে আমার মনোমত স্থান পেতে পারি সেটি আজই শেরবুর্গ থেকে ছেড়ে যাচ্ছে। তাই আমি ফেরার পথে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রেখে অবিলম্বে ইউরোপ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। প্রীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

সুখের বিষয় প্রাচ্যের উদ্বেগহীনতাকে আমি অবিশ্বাস করেছিলাম ; এবং আট দিন আগে আমি পারীর ভারতীয় এস. আর. রানার কাছে রেজিস্ট্রি করা খামে বাস্‌কোন্‌থেলোস্‌, আয়া দেলিয়া তোরেস এবং লা প্লাতার ছাত্রদের চিঠিগুলো রবীন্দ্রনাথের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি ; সঙ্গে দিয়েছি একটি চিঠি আমার কথা বুঝিয়ে, তাঁকে ভার দিয়েছি সেটা রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ-করা পেরুর সরকারী আমন্ত্রণের আপোসসুলভ চরিত্র সম্পর্কে আগেভাগেই যা পড়া গেছে, তার পরে—(এবং এখন আর রবীন্দ্রনাথ না জেনে পারেন না)—আমার সম্পর্কে খোঁজ নেবার সামান্যতম চেষ্টা না ক'রেই এই তড়িঘড়ি প্রস্থানে যে একটা বড় রকমের লঘুতা, তা স্বীকার করতেই হবে।

ডিসেম্বর, ১৯২৪। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ আমেরিকা সফরের সঙ্গী বুয়েনোস্-এয়ারেস্ থেকে (২৬ নভেম্বর) আমাকে লিখছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইনফ্লুয়েঞ্জার বড়ই পীড়িত হয়ে পড়েছেন, পেরু-যাত্রা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বুয়েনোস্-এয়াবেসের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছেন : কিছু পরে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার আশা রাখেন এবং জেনোয়া হয়ে জানুয়ারির শেষে ইউরোপে ফেরার কথা ভাবছেন ; আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, জেনোয়া থেকে ভিলনাভে যাওয়াটা সহজ হবে কি না। তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে জানালাম, আমরা অপেক্ষায় থাকবো।

ডিসেম্বর, ১৯২৪। কালিদাস নাগ সদ্য গান্ধীকে দেখে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা আমাকে জানাচ্ছেন (২১ নভেম্বর) :

"...ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর থেকে (তিনি চীন ও জাপানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন) মহাত্মার সঙ্গে দেখা করার এবং নিজে তাঁকে আপনার নমস্কার জানাবার সুযোগ লাভের ব্যগ্র অপেক্ষায় ছিলাম। তার জন্যে কিছুই করতে হয়নি, সুযোগটা হঠাৎ এসে গেল, যখন মহাত্মা কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এলেন এবং দলের ঐক্যের জন্যে সর্বশেষ ব্যবস্থা নিয়ে এক সপ্তাহ সি. আর দাসের বাড়িতে রইলেন। আমি মোটেই রাজনীতিজ্ঞ নই, আপনি তা জানেন ; আমি এই প্যাক্টের গুরুত্ব বুঝি না ; হয়ত এই আপোস সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু ৭ নভেম্বর আমাকে গান্ধীর সামনে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল, তিনি আমার ঠিকানা খোঁজ করেছিলেন (আপনার মুখবন্ধে আমার নামটির সহৃদয় উল্লেখের কল্যাণে), আমি তাঁর পায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকার জন্যে গর্ববোধ করছিলাম। তাঁকে ম্লান দেখাচ্ছিল, কিন্তু এক বিশেষ ঔজ্জ্বল্য তাঁর দুই চোখে ঝকমক করছিল ; মুখে ছিল সেই স্বর্গীয় হাসি, যা আত্মাকে শান্ত করে...কে ভাবতে পারবে যে এই মানুষটি কোটি কোটি মানুষের নেতা ! তিন সপ্তাহের অনশনের পর তাঁকে বড়ই দুর্বল মনে হচ্ছিল ; কিন্তু মনটি আগের মতোই তৎপর। আমি যখন তাঁর সামনে মাথা নত করলাম, তিনি আশীর্বাদ জানালেন এবং আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অল্পক্ষণের সাক্ষাৎকারে, আমার যতটা সাধ্য, আপনার খবরাখবর দিলাম ; আপনার প্রীতি এবং আপনার শ্রদ্ধার প্রতীকরূপে এবং লুগানোর সেই গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ে (যেখানে ভগিনী মাদলিনের ইচ্ছানুসারে আমার সুযোগ হয়েছিল গান্ধীর জীবন সম্পর্কে বলার) প্রথমবার যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল, আপনার সেই মন্ত্রশিষ্যদের স্মরণে,—এই ঘটনার স্মরণে এবং আমি বলবো, আপনার আত্মিক গুণাবধারণের প্রতীকরূপে, আমি মহাত্মাকে উপহার দিলাম মহিলা কংগ্রেসের একটি (সচিত্র) কার্ড ; তাতে আপনার স্বাক্ষর নিয়েছিলাম, যদি সেকথা আপনার মনে থেকে থাকে। মহাত্মা গভীরভাবে অভিভূত হলেন এবং আপনার সম্পর্কে ও আমাদের 'পশ্চিমের কর্মী ভ্রাতারা, যাঁরা একই স্বার্থে,—মানবতার সমস্বার্থে, শান্তি ও প্রেমের স্বার্থে কাজ ক'রে চলেছেন"—তাঁদের সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন ক'রে চললেন। এই মহৎ স্বার্থের সত্যের প্রতি 'তাঁর' হৃদয়ের অনুমোদন আপনাকে জানাবার জন্যে আমাকে বললেন। কিন্তু আমি অনুভব করেছি, মহাত্মা তার দিক থেকে আপনার 'অনুমোদনও চাইছেন," চাইছেন আমাদের পশ্চিমের আত্মিক ভ্রাতাদের কাছ থেকেও, যাঁদের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা মানবতার মহান্ স্বার্থের পক্ষে অপরিহার্য।—পশ্চিম থেকে যে প্রশংসা বা নিন্দা আসতে পারে তার চেয়ে, যে-কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা কোনো সরকারী পাগলামির চেয়ে, এইটেই আমার কাছে হাজারগুণে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিবিদ গান্ধী কালের সঙ্গে তুচ্ছতায় বিলীন হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু যে-গান্ধী ঐক্যবদ্ধ করেছেন, যে-গান্ধী একটি যুগের মানবহিতকর কার্যাবলীর সদা সংঘর্ষময় বিভিন্ন ধারাকে নিজের ব্যক্তিত্বের

মধ্যে কেন্দ্রীভূত বা প্রতীকীভূত করেছেন, সেই গান্ধী চিরকাল জীবন্ত ও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। জড়বাদী ও জাতীয়তাবাদী আচ্ছন্নতায় যে-প্রাচ্য গা ঢেলে দিয়েছে, তার চেয়ে সম্ভবত পাশ্চাত্যে তিনি বরং তাঁর শিষ্যদের এবং সবচেয়ে খাঁটি বন্ধুদের খুঁজে পাবেন। হয়ত সেই কারণেই যখন বিদায় নিলাম, মহাত্মার রহস্যময় কথা শুনতে পেলাম: ‘রম্যাঁ রলাঁকে বলবেন, আমার তুচ্ছ জীবনের যে ভাষ্য তিনি করেছেন, আমি তারই মতো হতে চেষ্টা করবে।’

মহাত্মার এই গভীর কথাগুলো নিঃসন্দেহে শেষবারের মতো যখন শুনতে পেলাম, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ‘মাথা নত ক’রে আমি চলে এলাম’।”

(কালিদাস নাগ তাঁর চিঠির সঙ্গে লুগানো কংগ্রেসের একটা কার্ড পাঠিয়েছেন, তাতে সম্প্রতি আমি আমার নাম দিয়েছি, নাম দিয়েছেন হেরমান হেসও। “আপনাদের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে মহাত্মাও হিন্দিতে তাঁর নাম সই করেছেন।” একই সঙ্গে নাগ ৪ নভেম্বর তারিখের ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার কাটিং পাঠিয়েছেন; সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল সাক্ষাৎকারের একটা সময়ে উপস্থিত ছিলেন। এটি আমার ও গান্ধীর উপরে একটি প্রবন্ধ।)

ওল্ডেনবার্গের ‘বুদ্ধ’ সম্পর্কে আমার মতকে নাগ, কিছুটা হতাশ হয়ে, সত্য বলে স্বীকার ক’রে নিয়েছেন। “এই বই সম্পর্কে আপনি যা যা বলেছেন সবাই সত্যি। পাশ্চাত্যের বহু পন্ডিতের পক্ষে (তাঁদের প্রাচ্যের শিষ্যদের পক্ষেও!) যেমন, ওল্ডেনবার্গের পক্ষেও তেমনি পশ্চিমের বিজ্ঞান,—প্রাচ্যের কোনো কোনো অদ্ভুত ব্যাপার যেমন বুদ্ধ: ত্যাগের দর্শন, সর্বজনীন হিতের দর্শন (মেইৎসু) উচ্চনাদী কুসংস্কারের…প্রতি সদয় মনোনিবেশের (প্রশংসা যদি নাও হয়) অনুমোদন করেছে। আর, বিজ্ঞান তো বেশি দূরে যায় না! নইলে, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ মহাশয়রা যখন বাইরের সীমায় পড়ে রইলেন, আপনি একজন শিল্পী, আপনি একজন প্রেমিক, বিজ্ঞানের কেউ নন, আপনি কী ক’রে প্রাচ্য সংস্কৃতির অন্তরে পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন…”

ডিসেম্বরের শেষ, ১৯২৪। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: ‘আ কাতর্ ভোয়া,’ [‘চতুরঙ্গ’] অনুবাদ করেছে আমার বোন, বেরিয়েছে সাজিতের্ প্রকাশনী থেকে, নির্দেশনা করেছেন ফিলিপ সুপো, সঙ্গে আমার মুখবন্ধ।

‘য়ুরোপ’ পত্রিকার জন্যে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে এই উপন্যাসটি চেয়েছিলাম, দু’বছর অপেক্ষার পর পত্রিকাটি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাতে ‘য়ুরোপ’-এর সঙ্গে সহযোগিতা প্রত্যাহার করেছিলাম, এবং সেটাকে দিয়েছিলাম ‘রেভ্যু য়ুরোপেয়ান্’-এ। আমার ‘য়ুরোপ’-এর বন্ধুরা তাঁদের বোকামিতে লজ্জিত হয়ে দায়িত্ব চাপিয়েছেন পল কলাঁর উপরে, তাঁরা দাবি করেন, কল্যাঁর রিপোর্ট ছিল উপহাসাত্মক। এখন, কল্যাঁ আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন, সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়েছেন অন্যদের উপরে এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছেন।

১৯২৫

জানুয়ারি, ১৯২৫। দিলীপকুমার রায়ের বন্ধু, তরুণ বাঙালী সুধীন্দ্রনাথ ঘোষের আগমন। মনটি বেশ ঝকঝকে, পরিশীলিত, ভাসাভাসা, এবং ইউরোপের ছলাকলা আধাআধি তাঁকে জয় ক'রে ফেলেছে।

২০ জানুয়ারি, ১৯২৫। জেনোয়া থেকে রবীন্দ্রনাথের ছেলে টেলিগ্রাম করেছেন তাঁর বাবা সদ্য (বুয়েনোস-এয়ারেস থেকে এসে) জাহাজ থেকে নেমেছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে। প্রথমে তিনি ইতালি সফর করবেন, তারপর ভিলন্যভে আসার ইচ্ছা।

জানুয়ারি, ১৯২৫। আমি গান্ধীকে সতর্ক ক'রে দিয়েছি যে, ইউরোপে তাঁর নামের অপব্যবহার করা হচ্ছে। মস্কোর কমিউনিস্টরা (অথবা সেখানে যারা তাদের নির্দেশ নেয়) দুমুখো নীতি নিয়েছে : একদিকে তারা গান্ধীবাদকে শত্রুরূপে দেখাচ্ছে এবং ভারতবর্ষে অহিংসার ব্যর্থতা ঘোষণা করছে,—অন্যদিকে গান্ধীকে দেখাচ্ছে বলশেভিকদের ছদ্মবেশে (বারবুস দ্রষ্টব্য) এবং মস্কোতে আসন্ন আগমন সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সোরগোল তুলছে। গান্ধী এই সেদিন পর্যন্ত বলশেভিকবাদকে এমন চোখে দেখছিলেন যেন প্রায় তার অস্তিত্বই নেই, এবারে তিনি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় (২৪ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি) তা সংশোধন করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলশেভিকদের নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"আমি কোথা থেকেও কোনো আমন্ত্রণ পাইনি, তা সে জার্মানিই হোক, আর রাশিয়াই হোক, এবং দেশগুলো দেখার তিলমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। যাই ঘটুক না কেন, কোনো বিদেশী দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমার পরিকল্পনা সকলের ভালো করেই জানা আছে, আমার কিছুই লুকোবার নেই এবং আমি খোলাখুলি ভাবে অগ্রসর হই। হিংসার সমস্ত পদ্ধতিই আমার আদর্শের বিরোধী। বলশেভিকবাদ কী তা আমি একেবারেই জানি না। এই মতবাদটি সম্পর্কে আমি পড়াশোনা করিনি এবং আমি জানি না, এ রাশিয়াতে ভালো ফল দিয়েছে কি না। এ ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু বলশেভিকদের অনুষ্ঠিত হিংসার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাদের সমর্থনে সামিল হতে পারবো না। মহত্তম উদ্দেশ্যের জন্যে হলেও হিংসাকে আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা করি। এইজন্যই আমার ও বলশেভিকদের মধ্যে কোনো সাধারণ মিল থাকতে পারে না।"

এই বিবৃতি মস্কোর ভারতীয় বলশেভিকদের ক্রুদ্ধ করেছে; এঁদের মুখ্য মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্ভবত এই মারপ্যাঁচটা বাতলে দিয়েছিলেন এবং আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন, যা গান্ধী ভেস্তে দিলেন। গান্ধীর বিরুদ্ধে তিনি এক প্রতিবাদ

ছুঁড়েছেন, গান্ধী নিজের মতকে চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি দিয়ে কয়েকটি মন্তব্য জুড়ে এক দারুন সৌজন্যে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় (জানুয়ারির গোড়ার দিকে) তা ছেপে দিয়েছেন।

এই বিবৃতিটি ইউরোপের কাগজে ঘুরছে, তারা এটাকে অবশ্যই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং ওদের মিথ্যার বিরুদ্ধে এক বিপরীত মিথ্যাকে দাঁড় করাচ্ছে যা কম ন্যক্কারজনক নয়। 'ল্য মাত্যাঁ' ("ভায়া লন্ডন") গান্ধীর প্রবন্ধের এক তথাকথিত সারাংশ ছেপেছে, তার অর্ধেকটা (বলশেভিকদের নিন্দা) ঠিক, অপর অর্ধেক পুরো মিথ্যা। মিথ্যাবাদীটি উদ্ভাবনের ঝুঁকিতে যায়নি: সে সোজা গান্ধীর 'না' গুলোর জায়গায় 'হাঁ' বসিয়ে গেছে। গান্ধীর মুখ দিয়ে বলিয়েছে, মস্কো তাঁর কাছে ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তাব ও অর্থ পাঠিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এইরকম দক্ষিণে মিথ্যা, বামে মিথ্যা। সাধারণ পাঠকের পক্ষে যাচাই করার কোন উপায় নেই। সত্য বলে প্রমাণপত্র লাগানো কিন্তু বেনামী সংবাদের ("ভায়া লন্ডন,', "অমুক এজেন্সি" ইত্যাদি) কী করে উত্তর দেওয়া যায়?

কাদায় ডুবছি।

জানুয়ারি, ১৯২৫। মর্মান্তিক সংবাদ প্রাপ্তির* ঠিক আগে মনে এক ক্ষোভ জেগেছিল, সে-ক্ষোভ একেবারে ভিন্ন জাতের, কিন্তু তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। যে-রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় আছি তিনি মিলান থেকে টেলিগ্রাম করেছেন, আবার অসুখে পড়েছেন; খুব শীঘ্রই তাঁকে ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দিতে হবে। কোনো হোটেলের ঠিকানা নেই, যাতে তাঁর সঙ্গে আবার মিলতে পারি। আমাকে শুধু বলা হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি তিনি ভেনিস থেকে জাহাজে উঠবেন।

আমি কেবলমাত্র প্রতিশ্রুত সাক্ষাতের নৈরাশ্যই অনুভব করলাম না। আমার ধারণায় এই সাক্ষাতকারের অবশ্যই বিরাট গুরুত্ব ছিল।

অদূর ভবিষ্যতের এক নৈরাশ্যজনক চিত্র আমি দেখছি (হয়ত ভুল ক'রে)। আমি দেখছি এক ক্রমবর্ধমান দ্রুততায় ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে প্রচন্ড ধাক্কাটি আসছে। ঝড়ের মেঘগুলো প্রতিদিন ঘন হয়ে উঠছে। বিপদের মুখে-পড়া সাম্রাজ্যকে নতুন ক'রে দখলের সাহায্যের জন্যে ইংলন্ডের রক্ষণশীল সরকার চাইছে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর এক মৈত্রী। সে ফ্রান্সকে ধরে রেখেছে ঋণ ও জার্মানীর ভয় দেখিয়ে; ফরাসী কাগজগুলো সে কিনে নিয়েছে। বিরাট বিরাট শিরোনামযুক্ত পৃষ্ঠাগুলো, যেমন 'ল্য মাত্যাঁ' এশীয় বিপদের গান জুড়েছে; আর এখনো ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ে দুর্বলতর এরিয়ে জ্বালাময়ী জাতীয়তাবাদী বক্তৃতার মাধ্যমে (ন্যাশানাল ব্লকের গলাভাঙা ধেড়ে মোরগগুলোকে লজ্জা দিয়ে) সংসদে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার পর, উচ্চনাদী সাক্ষাৎকারগুলোর 'প্রবৃত্তির পায়ে আত্মসমর্পিত মানুষদের'

---

*মাদাম ক্রুপির মৃত্যু।

বিরুদ্ধে (এই স্থলে অভেরনুবাসীটি জাপানের অথবা ভারতবর্ষের মানুষদের কথা বলছেন ব'লে মনে হয়) জোটবাঁধা ইউরোপের একসঙ্গে এক অভ্যুত্থানের জমি প্রস্তুত করছেন। তাই আমি আগে থেকেই সেই দিনটি দেখতে পাচ্ছি, যে-দিন ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে, আমরা কেমন ক'রে যোগাযোগ রাখতে পারব ? আর কোথায়, কোন্ অবস্থায়, কোন্ মাটিতে আমাদের দেখা করা এবং 'হানাহানির ঊর্ধ্বে' আমাদের কথা বলা সম্ভব হবে ? ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, এই কাঁটার মতো বিঁধে-থাকা প্রশ্নটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবো। যদি সম্ভব হয়, আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের এক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করবো। হয়ত রনিজে এবং তাঁর বহুকাল ধরে পরিকল্পিত 'মৈত্রীভবন'-এর সাহায্য নেবো। 'ইউরেশিয়ান' বুলেটিন প্রকাশনার, মহাফেজখানা এবং আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের এক সম্পূর্ণ পরিকল্পনা একসঙ্গে বসে আলোচনা করার ছিল…

তিনি চলে গেলেন। নিরর্থক নিজের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে এই দীর্ঘ ছয় মাসের সফরে কী কাজ হলো ? কী দেখলেন তিনি পারীতে ? কী দেখলেন তিনি বুয়েনোস-এয়ারসে ? আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার, আর বিশ্রাম করার বদলে (আমি সবকিছু আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম ঃ ভালমঁতে তিনি স্বাস্থ্য ফেরাতে পারতেন এবং তাঁর বিশ্রামস্থল ভালো ক'রে পাহারা দেওয়া হতো—), কুয়াশাচ্ছন্ন বরফ-ঢাকা মিলানের বক্তৃতামঞ্চে, থিয়েটারে, স্কালায় নিজেকে ঘোরাতে, দর্শনীয় হতে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছেন। এবং আরও একবার ভিলন্যভের সাক্ষাৎকার অজানা দূরত্বে সরিয়ে রাখা হলো। যেন আমরা এমন একটা সময়ে আছি, যখন আজকের সন্ধ্যায় যা শেষ ক'রে ফেলতে বড় একটা নিশ্চিত নই, তা কালকের জন্যে ফেলে রাখতে পারি। আমার নিরুৎসাহ-জনক দুঃখের কথা কালিদাস নাগকে গোপন করিনি। দীর্ঘ কয়েক মাস আমি নাগের কাছ থেকে আশা ক'রে আছি সেই নোটগুলো, রবীন্দ্রনাথের চীনসফরের উপরে যে-নোটের প্রতিশ্রুতি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি ঃ "বন্ধু ভুলবেন না যে, আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসার, বেশি অনুগত সুহৃদ ভারতবর্ষের নেই ; কিন্তু আমরা আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারি না যদি আপনারা আমাদের সাহায্য না করেন—এবং আপনারা আমাদের সাহায্য করছেন না !" ভারতীয়রা শতাব্দীতে অভ্যস্ত ; ওরা জীবনকে পালিয়ে যেতে দেয় কর্তব্য না ক'রে - দিনের মজুরি না ক'রে।

ইতালি গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমার খুঁজে বার করার পক্ষে যখন খুবই দেরি হয়ে গেছে, অবশেষে তখন মিলানের হোটেল কাভুর থেকে তিনি আমাকে লিখলেন (২৯ জানুয়ারি, ১৯২৫) ঃ

"প্রিয় বন্ধু,—অসুস্থতার জন্যে আমি লজ্জিত বোধ করছি। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি সব ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমি ফিরে যাচ্ছি শীঘ্রই ইউরোপে আবার আসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

আপনাকে দেখার এবং যে-সব জিনিস আমার মন অধিকার ক'রে আছে, সে-সব সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার উদগ্র বাসনা রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার সামান্য যে পরিচয় পেয়েছি তা উৎসাহজনক নয়। ওখানকার মানুষেরা হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছে এবং ওদের আত্মানুসন্ধানের সময়ের অভাব। চিন্তার জন্যে ইউরোপের উপর ওদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা দেখতে বড়ই করুণ, সেই চিন্তা, ওদের কাছে তৈরি-অবস্থাতে আসা চাই। যে-কোন ফ্যাসানই ওরা ধার করে বা এই মহাদেশ থেকে যে-সংস্কৃতিই ওরা কেনে, তার জন্যে গর্ববোধ করতে ওদের লজ্জা হয় না। একদিন আসবে যখন ওরা ওদের ঐশ্বর্যের উৎস ফুরিয়ে ফেলবে এবং তখন ওদের মনের বন্ধ্যাত্ব সমস্ত ধার-করা অলংকার বর্জিত হয়ে তার চরম দারিদ্র্যে চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরবে। যে ছাত্ররা আপনার গুণগ্রাহী ব'লে নিজেদের ঘোষণা করেছিল, আপনার ব্যক্তিগত চিঠিগুলো তাদের প্রকাশ করতে দেখে আমি খুশি হইনি। প্রতীক্ষার দিনগুলোর পর, আজ আমি বিছানা ছেড়ে উঠবার অনুমতি পেয়েছি কিন্তু এখনো পায়ে জোর পাচ্ছি না। আজ অপরাহ্নে আমি ভেনিসে চলেছি, সেখান থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের জাহাজে চড়বো। প্রীতিপূর্ণ বিদায় সম্ভাষণের সঙ্গে,—সব সময়ে আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

জানুয়ারি, ১৯২৫। কালিদাস নাগকে লেখা আমার চিঠি থেকে ঃ

"রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ায় আমি গভীর ভাবে আহত হয়েছি...দুটি মানুষের আলাপ-আলোচনার এমন প্রয়োজন আগে কখনো হয়নি। আমরা ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পূর্বাহ্ণে পৌঁছেচি। আমাদের নিজেদের একসঙ্গে পরিকল্পনার দরকার ছিল। ঝড় যখন উঠবে—যে-ঝড় আমি উঠতে দেখছি—তখন ইউরোপ ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠাংশের ঐক্য রক্ষা করার জন্যে ইউরোপে এক প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে তুলতে আমি—ইউরোপে প্রায় একা চেষ্টা করছি। আমার জরুরী প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেবার, প্রয়োজন ছিল শান্তিনিকেতনে এক ধরনের ইউরোপীয় শাখা, একটি বিশ্বমৈত্রীভবন, একটি কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক মহাফেজখানা, ইউরোপীয়-এশীয় প্রকাশনার ভিত্তিপত্তনের জন্যে আমাদের একমত হওয়ার...তিনি আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন! চীনসফর সম্পর্কে আপনার নোটের অপেক্ষা এখনো ক'রে আছি। মনে রাখবেন, এখানে সুইজারল্যান্ডে এবং পারীতে যে স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় আছেন তাঁদের চেয়ে প্রিয় সুহৃদ ভারতবর্ষের আর নেই—আপনারা যদি আমাদের সাহায্য না করেন, আপনাদের বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না। এবং আপনারা (প্রিয় নাগ, আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না, আমি জানি আপনি অত্যধিক কাজের চাপে পিষ্ট হচ্ছেন,—বলছি, আপনাদের দেশবাসীদের), আমাদের সাহায্য করছেন না...সময় চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড় আসছে। হয়ত ইউরোপীয়-এশীয় সভ্যতার উপর এক সুদীর্ঘ আলোআঁধারি নেমে আসছে, দিনের শেষ দণ্ডপলগুলোর সুযোগ নিতে হবে!"...

১৯ জানুয়ারি, ১৯২৫। রবীন্দ্রনাথের চীন এবং বুয়েনোস্-এয়ারেসের সঙ্গী এস. কে. এলম্‌হার্স্ট এসেছেন। তড়িঘড়ি চলে যেতে বাধ্য হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন অন্ততপক্ষে তাঁর তরুণ বন্ধু এবং সেক্রেটারি যেন এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন। এলম্‌হার্স্ট ইংরেজ, বয়স ৩০ থেকে ৩৫এর মধ্যে, লম্বা, রোগা, বুদ্ধিমান, সক্রিয়, বুদ্ধিতে ও কথায় সজীব, সবকিছু দেখেন যথাযথভাবে এবং তাতে সূক্ষ্মতার অভাব নেই। তিন বছর তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রীনিকেতনে কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভার দিয়েছিলেন; এবং বিদ্যালয়টি এখন সুসমৃদ্ধ। এলমহার্স্ট এখন ইংলন্ডে ফিরে যাচ্ছেন, সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন 'বিবেকবান-প্রতিবাদী'।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালো করেই জানেন, এবং এখনো পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁদের যে-কোনো কারুর চেয়ে তিনি এই বিরল মনটির বর্ণনা ভালো ক'রে দিতে পারেন; কিন্তু তা করতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তবুও একটু একটু ক'রে তিনি কথাবার্তায় রাশ আলগা ক'রে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যে জিনিসটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে তাঁর অতি-সংবেদনশীলতা। এমনকি তা অস্বাভাবিক শক্তি ধরে। তার একটি দৃষ্টান্ত ঃ— ল্য হাভর্ ও বুয়েনোস্-এয়ারেসের মধ্যে জাহাজে এক রাতে অকারণে এক বিক্ষুব্ধ ও প্রচন্ড ভাবের শক্তি তাঁর উপর ভর করেছিল, তার ঘোরে তাঁকে কবিতা লিখতেই হয়েছিল, যার কোনো ব্যখ্যাই নিজের কাছে করতে পারেন নি। বুয়েনোস-এয়ারেসে পৌঁছে—সেখানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিছানা নিয়েছিলেন—তিনি কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের সংবাদ পেয়েছিলেন, যা তাঁকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছিল (—বাংলাদেশে নতুন ক'রে গ্রেপ্তার)। তখন তিনি বিশ্বাস করলেন, তিনি এর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। জাহাজে কোন্ তারিখে তাঁর এই অনন্যসাধারণ ভরটি ঘটেছিল তা খুঁজে বার করলেন। ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর সেই একই তারিখ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, টেলিপ্যাথির এইরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার তাঁর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছে। এলম্‌হার্স্ট আরও বললেন, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত যে আর্জেন্টিনায় তাঁর অসুস্থতা এবং ইতালিতে হঠাৎ আবার তা শুরু হওয়ার কারণ ছিল আভ্যন্তর বিপর্যয়, যা তাঁর দেহযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়বারে করেছিল আতঙ্ক, যা ঘটিয়েছিল ফ্যাসিবাদ।

এই ধরনের স্পন্দ-জাগানো সংবেদনশীলতা জীবনে তাঁকে অবশ্যই অনেক ভুগিয়েছে। এলম্‌হার্স্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের টোকিওর শেষ বক্তৃতার কথাটা আলোচনা করলাম এবং দুঃখ প্রকাশ করলাম যে, কিছু কিছু অংশ (ইউরোপীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গ থেকে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিঃসন্দেহে বিকৃত করেছিল) পশ্চিমের (এবং আমেরিকার) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হতে দিয়েছে। এলম্‌হার্স্ট একমত। এক নতুন লক্ষণ হিসেবে এ তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন; এবং এর দিকে তিনি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অস্বীকার করতে করতেও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এ স্বীকার ক'রেছেন; কারণ এটা তাঁর অভিপ্রায় নয়। তিনি

এলম্‌হার্স্টের কাছে স্বীকারোক্তি করেছেন : "কিন্তু অন্য সময়ে ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় আমি যা সহ্য করেছি, তার সবকিছুই আপনি জানেন না। সব সময়ে মনে হয়েছে আমি প্রকাশ্যে অপমানিত হচ্ছি।" সেই সময়ের কথা তিনি বললেন, যখন ভারতবর্ষে তিনি তখনো বিখ্যাত হননি, যখন হেঁজিপেঁজি ইংরেজ, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ভাবতো তাঁর সঙ্গে অসম্মানজনক কাটখোট্টাভাবে ব্যবহার করা চলে। আমেরিকায় অবস্থাটা পুরোপুরি এক ধরনের ছিল না। সেখানে যখন যান, তখন তিনি খ্যাত—অতিখ্যাত। এবং সেখানে তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কাজের জন্যে টাকা তুলতে। এলম্‌হার্স্ট তাঁর সঙ্গে ছিলেন (অথবা তাঁর সঙ্গে মিলেছিলেন); এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনিই খুব বড় বড় মার্কিন ধনীদের এক সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বিশদ ক'রে বলবেন। যখন রবীন্দ্রনাথ এই সমাবেশের মধ্যে পড়লেন, তাঁর এই হাত পাতার জন্যে, এমনকি এইসব লোকের মধ্যে এসে পড়ার জন্যে এমন অপমানিত বোধ করলেন যে, তিনি বিদ্রোহ ক'রে উঠলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং যে বক্তৃতা তাঁর দেওয়ার কথা ছিল, তা থেকে অন্য আর এক বক্তৃতা উপস্থিত মতো বিনা প্রস্তুতিতে ক'রে গেলেন; প্রচণ্ডভাবে তিনি ইউরোপীয়-মার্কিন সভ্যতার দোষাবলীর বিরুদ্ধে বলে গেলেন। সে এক বিরাট কেলেঙ্কারি হলো। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ অখুশি হয়েছিলেন। সবকিছু তাঁকে আহত করেছে এবং মার্কিন ও ইংরেজ—সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ভিতরে ভিতরে যে-যন্ত্রণা তিনি সহ্য করেছেন, তা কোথাও প্রকাশ করেননি; কিন্তু সেসব পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং তিনি না চাইলেও, এখন তা পশ্চিমের বিরুদ্ধে নির্মম বক্তৃতাগুলোতে ফেটে পড়ছে। (আমি আবার বললাম, তবু তিনি তা অস্বীকার করেছেন; কারণ তাঁর মনোগত অভিপ্রায়—এবং তাঁর গভীরভাবে বিচার-করা চিন্তা—বিরোধিতার বদলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিলনই খোঁজে।)

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নেই। তিনি মানুষটি ভালো, স্নেহপ্রবণ, সব দিকে নজর রাখেন, কিন্তু চরম অভিমানী। নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি অতি সতর্ক। যখনই তিনি কারুর প্রতি আসক্ত হন এবং কেউ তাঁর প্রতি আসক্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে নিজের উপর তার দাবি মেনে নেন। কিন্তু সে-দাবি তিনি সইতে পারেন না; যারা তাঁকে ভালবাসে তারা কর্তৃত্ব ফলাতে চায় ব'লে তাদের সন্দেহ করার প্রবণতা তাঁর আছে। তিনি ভুল করেন, প্রায়ই ক'রে থাকেন। কিন্তু যেহেতু কাউকে তিনি তা বলেন না, ভুলের মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না; এবং তা বেড়েই চলে। দীর্ঘকাল তিনি তাঁর অবিশ্বাসকে লালিত করেন। দিনের পর দিন তা বেড়েই চলে বুঝতে পারা যায়। এবং এ তাঁর পক্ষে বড়ই কষ্টকর, যেমন কষ্টকর তাঁর সন্দেহের পাত্রটির পক্ষে। হঠাৎ তিনি ফেটে পড়েন! তখন অত্যন্ত উগ্র, এমনকি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন। এলমহার্স্টের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, ঘটনাটা আর্জেন্টিনায় গত সফরের সময়কার! তিনি বললেন, যখন ফেটে পড়ার ব্যাপারটা ঘটলো, সব সত্ত্বেও তিনি স্বস্তি বোধ করলেন। অপেক্ষা করাটাই ছিল সবচেয়ে বিশ্রী। কৈফিয়ৎ দেবার

পর তিনি একা বেরিয়ে পড়লেন বেড়িয়ে আসতে। যখন ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ সজল চোখে এলেন তাঁর কাছে এবং তাঁকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং ভয় পেয়েছেন এলম্‌হার্স্ট তাঁকে একেবারেই না ছেড়ে যান। তিনি তাঁর কাছে স্বীকার করলেন যে, এইভাবে তিনি অনেক বন্ধুকে হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রবণতা মজ্জাগত। বৃথাই তিনি তার সঙ্গে লড়াই করেন। তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার এ চিরন্তন প্রয়োজন, যা তাঁকে তার রক্ষায় সতর্ক ড্রাগনের মতো সজাগ ক'রে রেখেছে। তার বিষণ্ণ পরিণাম হচ্ছে এই যে, তিনি একা।

সত্যসত্যই, তাঁর পাশে জনকয়েক অত্যন্ত অনুগত লোক আছেন ; কিন্তু কেউই তাঁকে পুরোপুরি বোঝেন না ; প্রত্যেকে বোঝেন (এবং স্বীকার করেন) তাঁর স্বভাবের মাত্র একটি দিক। সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন এনড্রুজ, তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেন (দেখতে চান) অদ্বিতীয় ঋষি, শিক্ষাবিদ, ভবিষ্যদ্বক্তাকে, তিনি কবিকে দেখতে অস্বীকার করেন। সেটা এতোদূর পর্যন্ত যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কুড়ি বছরের পরিচয় হলেও একেবারের জন্যেও তাঁর মুখে তাঁর কবিতার আবৃত্তি শোনেন নি বা অভিনয় দেখেন নি। এই অসম্বন্ধ ও কোলাহলমুখর তরঙ্গে, যেখানে কিছুই টিকে থাকে না, তাঁর বাঙালী শিষ্যবৃন্দ এবং ছাত্রদের পক্ষে তাদের মহাগুরুর পথ-রেখার কী অবশিষ্ট থাকবে ? এই ব্যাপারে এইটেই যথেষ্ট ঃ সব সময়ে বিনা প্রস্তুতিতে উপস্থিত মতো বলে-যাওয়া তাঁর বৈঠক-আলাপগুলোতে বহু বছর ধরে তিনি মুগ্ধ ক'রে আসছেন, সেখানে যে ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেন তাঁর লেখাগুলোয় তার তিন ভাগের এক ভাগেরও দেখা মিলবে না। এই বৈঠক-আলাপগুলোর একটা লাইনও নেই। তাঁর শ্রোতাদের একজনেরও এগুলো লিখে রাখার কথা মনে হয়নি। (একমাত্র ব্যতিক্রম এলম্‌হার্স্ট ; তিনি শান্তিনিকেতনের জীবন এবং এশিয়াসফর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তিনটি বছরের নোট নিয়ে এসেছেন।)

দেখা যায় শান্তিনিকেতনের জীবনটা ছিল আদিম সরলতার জীবন। এলম্‌হার্স্ট (যিনি অবশ্য নরম ধাতুর লোক নন, কারণ জীবনে তিনি কষ্টসাধ্য উপজীবিকা গ্রহণ করেছেন, বিশেষ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন দরিদ্রের মতো থাকতেন) যখন অবিশ্বাস্য হচ্ছে-হবে-ভাবের বাঙালীর প্রসঙ্গ তোলেন, তাঁর মুখে সবসময়ে হাসি ফুটে ওঠে। এটা ভালো যে, যে-ইউরোপীয়েরা আসতে রাজী হন, তাঁরা তবু জেনে রাখতে পারেন। প্রত্যেককে নিজের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। স্বাস্থ্যনীতির বালাই নেই। খাবার জল, জলে ডোবানো মাখনের উপর নজর রাখতে হয়। এই সেদিন পর্যন্ত এখানে কোনো ডাক্তার ছিল না, ছিল এক জাতের গ্রাম্য হাতুড়ে, প্রাথমিক জীবাণুরোধক সম্পর্কে যার কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না ; কাটা সেলাই করতে ঘোড়ার চুল যোগাড় ক'রে আনতো। এরপর, মনে হয়, বাঙালীদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি ; বাঙালীরা প্রথম দর্শনে উত্তাপময়, সব সময়েই অত্যন্ত ভদ্র এবং সেখানে খারাপদের মধ্যে থেকে দুটি কি তিনটি সত্যিকারের ভালো এবং কাজে-লাগার মতো বাঙালীকে আলাদা ক'রে নিতে সময় লাগে। প্রথম দিকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল, সময়-না মানা ছাত্রদের নিয়ে এলম্‌হার্স্ট খুব কষ্ট পেয়েছেন, আর এখন তারা তাদের ইউরোপীয় গুরুদের উপদেশ বা নির্দেশ

বাতিল না-করলেও তা নিয়ে তর্ক তুলতে মুখিয়ে থাকে। রাজনীতি তছনছ ক'রে দিয়েছে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই, এটা কিছু-না-করার একটা অজুহাত। চার পাঁচটি ছাত্রকে শাস্তি দেবার, বাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দেবার দরকার হয়েছিল। এ ছাড়া, বাঙালী জনসাধারণ খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু বড়ই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সবচেয়ে বড় সামাজিক শক্তি হচ্ছে পাকাপোক্ত ভাবে গড়া গ্রামের শক্তি। কিন্তু ভাগ্যের কত উত্থান-পতনই না এই দেশ দেখেছে! মাত্র যে একটি প্রদেশে এলম্‌হার্স্ট কাজ করেছেন তার বিগত শতাব্দীগুলোর ঐতিহাসিক চিত্র দিলেন। চিত্রটি হতবুদ্ধিকর। পর্যায়ক্রমে, উর্বর গ্রামাঞ্চলে বছরে তিনটি ফসল ওঠে,—তারপর আক্রমণ চলে, এবং পরে আসে দুর্ভিক্ষ,—জনপ্রাণীও থাকে না,—জঙ্গলে সব ঢেকে যায়, তারপর নতুন ক'রে জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটে, এর পরে কী আসবে কে জানে? নদীর পাড়ে নিরন্তর এক জোয়ার-ভাঁটা। এলম্‌হার্স্ট জোর দিয়ে বললেন, বর্তমানে অবশ্য সত্যকার দুর্ভিক্ষ বিরল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুততা অতীতের বিপর্যয়কে রুখে দেয়। আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে মহামারী, তাতে গ্রামের পর গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস ক'রে ফেলে।

তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা বোঝার অক্ষমতার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন মনে হয়। তাঁর ব্যবহারিক যোগ্যতা প্রমাণের গোপন অভিপ্রায় নিয়ে (তিনি তা এলম্‌হার্স্টকে বিশ্বাস ক'রে বলেছিলেন) তিনি তাঁর কৃষিবিদ্যালয়ের উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল প্রত্যয় ছিল যে, গান্ধীর চেয়ে ভারতীয় চাষীকে তিনি বেশি ভালো চেনেন। এবং তাঁর গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গান্ধীবাদী নীতির চেয়ে বেশি ফলপ্রদ এবং ভালো। চরকার বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনার অন্ত নেই; এবং এলম্‌হার্স্ট তাঁর হয়ে সেগুলোই আবার শুরু করলেন। তাঁর মতে, সহরের প্রান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলেই শুধু গান্ধীর পরিচালনার মূল্য আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর গোটা রাজনীতিকেই দোষ দেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিচ্ছায়া এলম্‌হার্স্ট এই সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন (তাঁর গুরুর অনুসরণে) এক স্পষ্ট অসূয়া স্বল্প এবং উপলব্ধি নিয়ে। ত্রিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব যাঁর উপরে, তাঁর নীতি ও কাজের মধ্যেকার কমবেশি দৃষ্টিগোচর অসামঞ্জস্যের জন্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করার সুযোগ সেই চিন্তাবিদেরই আছে যিনি কোনো কাজই করেন না। আশু কর্মপন্থার জন্যে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত মৈত্রীর সমস্যা জটিল না ক'রে তুলতে গান্ধী বিগত কংগ্রেসে হরিজনদের কথা তোলেননি, এই কারণে, হরিজনদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, তাঁর প্রতি এমন অভিযোগ পর্যন্ত করতে যাওয়া হচ্ছে না কি? আসলে, জীবনের সমস্ত রূপের জন্যে অনুরাগী (এবং সহনীয় ভাবে পল্লবগ্রাহী) স্বাধীন মন এবং পিউরিটান মন—যে-মন তার অনুবর্তীদের উপর চাপিয়ে দেয় আত্মদমন, তপশ্চর্যা এবং কঠিন শৃংখলা, যাতে এ থেকে গড়ে তোলা যায় যে-কোনো ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত এক বাহিনী,—এই দুই মনের অনতিক্রম্য পারস্পরিক বিরূপতাই অনুভব করা যায়। দুঃখবেদনাকে যখন মহৎ উদ্দেশ্যের পায়ে নৈবেদ্য রূপে উৎসর্গ করা হয়, তখন তার প্রতি গান্ধীর ঔদাসীন্য—সে-ঔদাসিন্য নিজের দুঃখবেদনার প্রতি যেমন অন্যের প্রতিও

তেমন—রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জাগায়, যে-বিতৃষ্ণা অবিচারের পর্যায়ে পর্যন্ত ওঠে। মনে হয় যেন তিনি এর নৈতিক মহিমা মেনে নিতে অস্বীকার করছেন। গান্ধী যে ধর্মঘটগুলোর বিধান দিয়েছেন তাতে তাঁর যে অনুভূতির অভাব আছে, এবং ঠান্ডা রাজনীতির পরিণামের মতো তা যে সর্বনাশের সৃষ্টি হয়েছে, তার চিত্র এলমহার্স্ট তুলে ধরলেন। এই বীর বিশ্বাসীর প্রতি এর বেশি অবিচার আর হয় না। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—দুই জগতের ব্যবধানের ঝোঁকটা থামছে না।

আর এক দিকে, রবীন্দ্রনাথ,—যিনি গান্ধীবাদী তপশ্চর্যা থেকে দূরে,—নিজের সামাজিক শ্রেণী থেকে কত বিচ্ছিন্ন! কে এটা বিশ্বাস করবে? লুই-ফিলিপের আমলের বুর্জোয়াদের মতোই কৃত্রিম ও ভীরু এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য বুর্জোয়ারা রবীন্দ্রনাথের জন্যে লজ্জিত। এরা তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে স্বীকার করে না! এদের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার চেয়ে "জঘন্য" আর কিছু নেই। প্রেমের পদ্য লেখা! তাও আবার ছাপানো! ব্রাহ্মণে করবে! না, তা মানা যায় না। এবং রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছিলেন, তাঁর শ্রেণীর কোনো বুর্জোয়া তখন তাঁর হাতে ছেলেদের সঁপে দিতে চায়নি! একথা বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ (এবং তাঁর লোকজন) গাইতে, নাচতে অভিনয় করতে, লোকের সামনে হাজির হতে ভালবাসেন। আর সেটাই ষোলোকলা পূর্ণ করেছে! (এই প্রসঙ্গে এলমহার্স্ট গল্প বললেন, অভিনেতা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কম গর্ব ছিল না। তিনি জগতের সর্বাগ্রগণ্য অভিনেতা ব'লে নিজেকে মনে করতেন। কিন্তু শেষের বারে টোকিওয় 'নো' অভিনয় দেখতে দেখতে এলমহার্স্টের দিকে ঝুঁকে বলেছিলেন: "এবারে স্বীকার করছি, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।")

অনেকক্ষণ ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথের দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা সফরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। এলমহার্স্ট উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন। কিন্তু শেষেরটির ফলাফল হয়েছিল খুবই খারাপ। এবং আমি এই প্রথম এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার লিখে রাখছি।

রবীন্দ্রনাথ টোকিওয় দক্ষিণ আমেরিকার কনসালদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ দেখার এবং গত ডিসেম্বরে পেরুর জাতীয় উৎসবের দর্শক হবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তিনি সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভালো ক'রে জানাশোনার সময় না দিয়েই আর্জেন্টিনা যাত্রা করেছিলেন। বুয়েনাস-এয়ারসে তিনি অসুখে পড়লেন এবং অসুখ আরও খারাপ হতে পারতো। কারণ এলমহার্স্ট প্রথমে আবিষ্কার করলেন যে, আর্জেন্টিনাস্থ পেরুর রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর কিছুই জানেন না; এবং পেরুর সরকারও তাঁকে কোনো নির্দেশ পাঠায়নি। টেলিগ্রাম চালাচালি হলো এবং অবশেষে, সরকারী আমন্ত্রণ এলো। কিন্তু তা আসতে দেরি হলো এবং এরই মাঝখানে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখা দিল। দুটি চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে আর্জেন্টিনার সংবাদপত্রগুলো উত্তপ্ত বিতর্কে গা ঢেলে দিল,—একখানা (হায় রে!) আমার ব্যক্তিগত চিঠি, লিখেছিলাম 'ভালোরাথিওনেস' পত্রিকার তরুণ সম্পাদকদের অনুরোধ জানিয়ে, যাতে সরকারী ভাবে পেরু সফরের বিপদ সম্পর্কে তাঁরা

রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক ক'রে দেন : (আসলে আমি জানতাম পেরুর ছদ্মপ্রজাতন্ত্রী সরকার —যে সরকার স্বাধীনচেতাদের নির্বাসিত করে এবং দেশীয় শ্রমিকদের গুলি ক'রে মারে - জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল ; তাঁকে তার জাতীয় উৎসবাদিতে প্রদর্শন করা হতো এবং এইভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারের সহযোগী ক'রে ফেলতো। কিন্তু দরকার হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে গোপনে সাবধান ক'রে দেবার এবং এটা প্রকাশ্যে বলাটা অযৌক্তিক ছিল, কারণ তাহলে রবীন্দ্রনাথকে এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হতো।) আমার চিঠিতে শব্দ ব্যবহারে তবু কিছুটা মাত্রা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি চিঠি বোমার মতো ফেটে পড়ল। এলম্‌হার্স্ট যা বললেন সেই অনুসারে চিঠিখানায় স্বাক্ষর ছিল আর্জেন্টিনায় আশ্রয়-নেওয়া জনৈক পেরুবাসীর। কিন্তু এলম্‌হার্স্ট দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারস্যাপার এবং লোকজন সম্পর্কে কমই জানেন ; আমি প্রায় নিশ্চিত যে চিঠিখানা ছিল আয়া দেলিয়া তোরেসের। এটা ছিল পেরুর নির্বাসন-দাতাদের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড আক্রমণ, এবং নিজের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি জড়িয়ে ফেলেছিল...

এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। তিনি পেরু যেতে চাইলেন ; সদ্য সরকারী আমন্ত্রণ এসেছে ; এবং আর্জেন্টিনা (ঐশ্বর্যে যে ফেটে পড়ছে) তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহারের জন্যে একটা ড্রেডনট (!) দিল গোটা আমেরিকা ঘুরে তাঁকে যাতে সোজা পেরু নিয়ে যেতে পারে। ঠিক তখনই, পরামর্শক চিকিৎসকেরা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সফর নিষেধ ক'রে দিলেন। ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা! পেরুযাত্রা প্রত্যাখ্যান সংবাদপত্রের প্রচারের সময়ে সঙ্গে মিলে গেল। এটাকে ব্যাখ্যা করা হতে পারে· ব্যাখ্যা করা হবেই—পেরুর সরকারের প্রতি প্রযুক্ত সম্মানহানিকর এক অস্বীকৃতি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথই শুধু এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লেন না, আর্জেন্টিনা সরকারের অস্বস্তি হলো অনেক বেশি। তার ভয় হলো, পেরু না অভিযোগ করে যে সে-ই রবীন্দ্রনাথকে যাত্রার মত পরিবর্তন করিয়েছে ; তখন এই সংকটজনক মুহূর্তে তার প্রাণপণ চেষ্টা হলো, পেরুর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা। তাই, সে রবীন্দ্রনাথ এবং এলম্‌হার্স্টের যুক্তি বুঝতে চাইল না ; সে জোর করতে লাগলো যে তাঁকে স্বীকৃত কর্মসূচি মানতে হবে। শেষ পর্যন্ত পেরু-সফর ও থাকা খাওয়ার অতি আবশ্যক খরচার জন্যে একটা টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এলম্‌হার্স্ট পেরুর রাষ্ট্রদূতের কাছে তা জানাতে এলেন। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দেওয়াটা বাধাপ্রাপ্ত-যাত্রার সন্দেহজনক চরিত্রকে আরও প্রকট ক'রে তুললো। এ সম্পর্কে আলোচনার পর, মনে হয়, পেরুর রাষ্ট্রদূত ঔদার্য দেখিয়ে বললেন, যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই সেই টাকা রেখে দিতে এলম্‌হার্স্টকে বাধ্য করলেন। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত জটিলতা বিষয়ে শুধু একটু আধটু জানতেন, তার বৃত্তান্ত তাঁর কাছে চেপে যাওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজরটাই কাম্য ছিল। কিন্তু অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ায় তিনি বুঝেছিলেন কিছু ব্যাপার তাঁর কাছে গোপন করা হচ্ছে এবং তাঁর কল্পনা ধৈর্য হারাচ্ছিল। কেবলমাত্র জাহাজে বুয়েনাস্‌-এয়ার্‌স আর জেনোয়ার মাঝখানে এলম্‌হার্স্ট তাঁকে সব খুলে বলেছিলেন।

—অন্যদিকে, দূর প্রাচ্যের সফর অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। বহু দিন ধরে তৈরি-হওয়া এই সফর চমৎকার সফল হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে এ দূরবর্তী পরিণামে ফলপ্রসূ হবে। যা জানার তা আমি ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত বৃত্তান্তে এবং কালিদাস নাগের চিঠি থেকে জেনেছি। কালিদাস নাগও এই অভিযানে ছিলেন। এলম্‌হার্স্ট সে-সব সত্য ব'লে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, চীনের একেবারে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত শ্রদ্ধায় মণ্ডিত হয়ে তাঁর সঙ্গীদল ও তিনি কী অভিভূত হয়েছিলেন! চাষীরা তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিল সেই দেশের দূত ব'লে, যেখান থেকে অনেক কাল আগে তাদের কাছে এসেছিল বুদ্ধের বাণী। অবশ্য বহু শতাব্দী যাবৎ চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যেকার সমস্ত আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। চীনে ভারতবর্ষের জন্যে ধর্মীয় শ্রদ্ধা আছে, পাশ্চাত্যে সে-শ্রদ্ধা পুণ্য-ভূমির জন্যে হতে পারে (বরং হতে পারতো)। অধিবিদ্যার ব্যাপারে বিনয়ী চীনারা স্বীকার করেঃ "এইসব চিন্তার পক্ষে আমরা তেমন দড় নই," এবং এই ব্যাপারে তারা ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব মানে। এলম্‌হার্স্ট সবচেয়ে প্রশংসা করলেন চীনের চাষীদের, তাদের সরলতার, তাদের সততার। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, রুশ বলশেভিকবাদ তাদের উপরে তিলমাত্র ক্রিয়া করতে সক্ষম হবে। চীনের গ্রামের আছে ধ্বংসাতীত দার্ঢ্য। যাদের ভাঙন ধরেছে তারা তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষ ক'রে সমুদ্রোপকুলোবর্তী অঞ্চলের; এবং একই সময়ে তারা আমেরিকার কাছ থেকে তার যা-কিছু খারাপ, তাও নিচ্ছে। তাছাড়া, চীনের উপর তার কব্জা শক্ত করার জন্যে আমেরিকাও স্থূল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, —শুধু বৈষয়িক ভাবেই নয়, নৈতিক ভাবেও। প্রধান যন্ত্র হিসেবে তার আছে শক্তিশালী ওয়াই. এম. সি. এ; সেটা ওখানে গেড়ে বসেছে এবং সেটা একটা নির্ভেজাল প্রচারযন্ত্র (অতীতের রোমের মতো), সঙ্গে এক বিপুল অর্থশক্তি। এর একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে: সেটি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকদের একটা হাতে-খড়ির জায়গা। যে-জাতির মধ্যে সে গেড়ে বসে তার প্রাচীন মনের কিছুই সে অক্ষুণ্ণ রাখে না। যেখানেই যায় সর্বত্র মার্কিনীকরণ চালায়—এবং সেটা ১০০ ভাগই মার্কিনী। চীনারা সাদাসিধে সরল (যা ভাবা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী), নিজেদের এতে ধরা দেয়। এখানেই চীনের সবচেয়ে বড় বিপদ।

এলম্‌হার্স্ট অনেকক্ষণ ধরে জাপানের সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প করলেন, —তাঁর বুদ্ধিমত্তা তাঁর কাছে মাঝারি গোছের ঠেকেছে,—মনোমোহিনী সম্রাজ্ঞীর তুলনায় তা নিচু স্তরের।

রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে তৃপ্ত করেছে জাপান। যুদ্ধের সময়ে শেষবার যখন তিনি এখানে এসেছিলেন, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার পরে এখানে সর্বসাধারণ তাঁকে বয়কট করেছিল। একরকম ভাবে তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এবার তার বিপরীত, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা ছিল সর্বসম্মত। কোনো কোনো সরকারী ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন যে, তারপর থেকে তাঁদের ভাবনাচিন্তা পরিচ্ছন্ন হয়েছে; মনে হয় যেন টোকিওর ভূমিকম্প সর্বসাধারণের উপরে গভীর এবং মহৎ হবার মতো প্রভাব ফেলেছে। ব্যবহারে যে নিখুঁত সৌজন্য, যে-শ্রদ্ধা তাঁকে দেখানো হয়েছে,—

এমনকি রাস্তার লোকেও তাঁকে যা দেখিয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন ; এবং তিনি মার্কিন স্থূলতার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। ছোটো ভারতীয় মিশনটি সঙ্গে জনকয়েক চীনা অধ্যাপক বা ছাত্রকে নিয়ে এসেছিল। আশংকা ও বিমুখতার মনোভাব, বর্জিত হয়ে তাঁরা আসেননি। জাপানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঘৃণার কারণগুলোর কথা বাদ দিলেও জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনাদের এক প্রবল প্রতিকূল সংস্কার আছে ; চীনাদের চোখে তারা বড়ই কুৎসিৎ। চালু কথা হচ্ছে : 'জাপানীদের মতো কুৎসিৎ।' "ক্ষুদে বানরগুলো…" এবং তাদের কাপট্য, তাদের নিষ্ঠুরতা চীনে বেদবাক্য। কিন্তু 'টেগোর মিশনের' চীনারা ৮ দিন যেতে-না-যেতেই তাঁদের প্রতিকূল সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন ; মিশনের ভারতীয়দের সমমর্যাদায় যে আন্তরিকতা এবং সৌজন্যে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, তাতেই তাঁদের জয় করা হয়েছিল। চীন ও জাপানের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হার্দ সম্পর্কের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে,—যেমন হয়েছে ভারতবর্ষের সঙ্গে এই দুই দেশের।

এলম্‌হার্স্ট বললেন : 'রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত আচরণ মেজাজের খামখেয়ালিপনা, এমনকি তাঁর চরিত্রের ছোটো ছোটো দিকগুলো নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক অনন্য-সাধারণ বুদ্ধি ও মনের অধিকারী।' এলম্‌হার্স্ট তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসেন। এবং তা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম এর জন্যে তাঁকে ভুগতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তেমন মনস্তত্ত্ববিদ নন, বরং চূড়ান্তভাবে আবেগ ও কল্পনাপ্রবণ, তিনি মানুষ সম্পর্কে চিরকাল ভুল করেন। অপাত্রে তিনি বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ন্যস্ত করেন ; এবং তা থেকে তাঁকে ফেরানো কঠিন। এলম্‌হার্স্ট সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস ছিল। শান্তিনিকেতনে তাঁকে নিয়োগ করার পর না-আসার জন্যে তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, কারণ, যে বিদ্যালয় তিনি পরিচালনা করবেন তার টাকার অভাব ছিল। এলম্‌হার্স্ট তা মানেন নি ; নিজের ঝুঁকি ও বিপদ মাথায় ক'রে তিনি চলে এসেছিলেন ; এবং অনেক মাস পরে, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর গুরুর মধ্যে সেই একই বিচারের ভ্রান্তি প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন।

মার্চ, ১৯২৫। বেচারী কালিদাস নাগের গভীর বেদনা। তাঁর ছোটো ভাই,* তাঁর সহযোগী এবং সহায়ক (এক প্রতিভাবান তরুণ লেখক, 'জাঁ-ক্রিসতফ' বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ করেছিলেন) হঠাৎ গুরুতর যক্ষ্মার কবলে পড়েছেন ; বাংলাদেশে এই রোগ কমই রেহাই দেয়। কালিদাসের কাঁধে পরিবারের ভার ; এবং কাজের গুরুভার। তাঁর ভয় যে, তাঁর বেলায়ও স্বাস্থ্য না ভেঙ্গে পড়ে। তা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথের অবস্থায় আমাদের মতোই দুঃখিত। রবীন্দ্রনাথ সদ্য ভারতবর্ষে ফিরেছেন। কালিদাস নাগ তাঁর আগেই বোম্বাইতে ছিলেন দেখা করার জন্যে এবং কয়েকদিন বিশ্রামের পর তার সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন। তিনি দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ

---

*'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক গোকুল নাগ।—অনু.

অত্যন্ত পাল্টে গেছেন, রোগা হয়েছেন, দেহে ও মনে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে ; এবং তাঁর চিকিৎসকরা বেশ কয়েক মাসের পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। পরে, যদি যাত্রার ধকল সইতে পারেন, তিনি হয়ত ভারতবর্ষের গ্রীষ্মের হাত এড়াবার জন্যে ইতালিতে ফিরে আসবেন। নীচে নাগের চিঠির কিছু কিছু অংশ এই (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫) (আমার বোনের কৃত তর্জমা) ঃ

"...গতকাল আপনার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে তার চরিত্র তাঁকে বুঝিয়ে আপনার শেষ তিনখানি চিঠি তাঁকে মুখে মুখে তর্জমা ক'রে যেতে আমাকে অনুরোধ করলেন ; সমস্যার গুরুত্ব এবং আপনার সনির্বন্ধ মিনতি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ; এবং তিনি আপনাকে এইজন্যে একখানা চিঠি মুখে ব'লে আমাকে দিয়ে লেখালেন। আর একটু ভালো বোধ করলেই তিনি নিজে আপনাকে লিখবেন। আপনার চিঠির কিছু অংশ তিনি আমাকে ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে দিতে বললেন, যাতে পরে তিনি প্রসঙ্গত দেখতে পারেন এবং তার এই অংশগুলো তর্জমা করেছি ঃ

১ম. ইউরোপ ও এশিয়ার মুক্তমতিদের নতুন গোষ্ঠীগঠন ;
২য়. বিশ্বমৈত্রীভবন ;
৩য়. এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ও মহাফেজখানা ;
৪র্থ. ইউরোপীয়-এশীয় প্রকাশনা।

তিনি এই দেখে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছেন যে, তাঁর আদর্শ,—যাকে তিনি শান্তিনিকেতনের মধ্যে রূপায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, আপনার মনে এবং আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত রনিজের মতো, স্টেফান জুইগের মতো আপনার মহান বন্ধুদের হৃদয়ে এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি ও সাড়া খুঁজে পেয়েছে···নীচের চিঠিখানা তিনি আমাকে মুখে মুখে বলে গেলেন দুর্বল নিম্নকণ্ঠে—(সেই দরাজ কণ্ঠ এতো ক্ষীণ !)—কিন্তু সে-কণ্ঠ আপনার প্রতি আবেগ ও প্রীতিতে স্পন্দিত ঃ

(কালিদাস নাগকে মুখে মুখে ব'লে লেখানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫, কলকাতা) "আমার অতি প্রিয় বন্ধু,—আমি ভগ্ন ও নিঃশেষ হয়ে ফিরেছি। আমি ফিরেছি সেই দেশে যে-দেশ মেতে আছে অনেক কিছু নিয়ে, যে-দেশের অন্তত আমার সম্পর্কে বা আমার আদর্শ সম্পর্কে ভাবার স্বাধীনতা নেই। আমি অনুভব করি এখানে, অন্তত এই মুহূর্তে, আমি প্রয়োজনীয় নই। আমার ভয় হয়, আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শকে অসময়োচিত ব'লে, অধিকন্তু, এক কাব্যিক বিলাস—যাতে গা ঢেলে দেবার ঝুঁকি আমাদের যুগ নিতে পারে না ব'লে, আমার দেশের লোক না ভাবতে শুরু করে।

কিন্তু আমি একই সময়ে অনুভব করি যে, আমার জন্যে এক দেশ আছে, আমার জন্যে এক বন্ধু আছেন, আর আছেন আমার আদর্শের জন্যে আমার সহযোগীরা, আছেন সহায়করা। তাঁদের সবাইকে আমি আবিষ্কার করি আপনার মাধ্যমে, আপনার গভীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে একজনের মধ্যে। এই আবিষ্কার আমাকে শক্তি

দেয়, বিশ্বাস এনে দেয়। এবং আমার জীবনের সন্ধ্যার এই ভাটার মুহূর্তে এনে দেয় সর্বশেষ আনন্দ।

যদি আমি আরও কিছুদিন বাঁচি, যদি চিকিৎসকরা অনুমতি দেন, প্রথম যা করবো তা হচ্ছে আপনার কাছে যাবো, আপনাকে শান্তিনিকেতনে আনার চেষ্টা করবো, দেখবেন সেখানে আপনার স্থান প্রস্তুত হয়ে আছে। চিকিৎসকরা বলেন যে, এখন থেকে ভীতিজনক গ্রীষ্মকালটি আমাকে ইউরোপে কাটাতে। হবে সেক্ষেত্রে, আমি আপনার কাছেই সুইজারল্যাণ্ডে আমার গ্রীষ্মাবাস বানাবো এমন ভাবে যে, আমার জীবনের শেষ কটি দিন আমি শুধু আপনার বন্ধু হিসেবেই বেঁচে থাকবো না, বেঁচে থাকবো মহৎ উদ্দেশ্যের কর্মে আপনার সহকর্মী হিসেবে।

আপনার এবং আপনাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি আশা করি।

সব সময়েই আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

এবং কালিদাস নাগ আরও লিখেছেন :

‘আপনি যখন রবীন্দ্রনাথকে লিখবেন, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁকে একটু আশ্বাস দেবার এবং সুইজারল্যাণ্ডের যে-অঞ্চল হৃদরোগের পক্ষে উপযোগী সে-সম্পর্কে স্বাস্থ্যাবাস কাছে কি না, বাড়ির দাম ইত্যাদি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত খবর দেবার চেষ্টা করবেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুর মতো এবং সম্পূর্ণ নতুন খেলনা, সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা মনে মনে ভাবতে ভীষণ ভালবাসেন…!”

—তারপর আমাদের বান্ধবী শ্রীমতি ক্রুপি প্রসঙ্গে বেদনা ও প্রীতিপূর্ণ কয়েকটি কথা নাগ লিখেছেন :

“তাঁর সঙ্গে আমি হারিয়েছি এক বান্ধবীকে, এক স্নেহকোমল জননীকে। ফরাসীদের জীবনের বিচিত্র চেহারার কোনো কোনোটিকে আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের কারু কারুর সঙ্গে (এলেন কে প্রভৃতি) আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে, এবং সর্বোপরি আমার প্রিয় গুরু আপনার আরও কাছাকাছি আমাকে নিয়ে আসার জন্যে তিনি কি না করেছেন! কত যে সন্ধ্যা আমরা আপনার কাজ, আপনার আদর্শ, আপনার পরীক্ষা, আপনার আশাভঙ্গের কথা আলোচনা ক'রে কাটিয়েছি! বয়স আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর সহানুভূতি এক বিরল মাত্রায় সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং সেখানে তিনি যুক্ত করেছিলেন বদান্যতা, দাক্ষিণ্য, সৌন্দর্যের আদর্শগুলোর (ধর্মীয় যদি নাও হয়) দিকে এক আন্তরিক বাসনাকে,—যা তার সৌহার্দকে আমার এক দুর্লভ অধিকারে এবং এক উদ্দীপনায় পরিণত করেছিল…”

এপ্রিল, ১৯২৫। পোলিশ লেখক লাদিস্লাস স্তানিশ্লাভ রেমন্ত্* (গতবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন) পারী থেকে আমাকে লিখছেন। পোলিশ ভাষায় আমার গান্ধী-জীবন অনুবাদের অনুমতি চেয়েছেন।

---

* পরের শীতেই রেমন্তের মৃত্যু হয়।

একই অনুমতি চেয়েছেন পোর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদের জন্যে কোয়াম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ভারতীয় গোষ্ঠী (স্বাক্ষর করেছেন : ফ্রান্সিসকো আদেওদাতো বারেত্তো)। তাঁরা তাঁদের বেদনা ও ক্রোধ জানিয়ে লিখেছেন যে, পোর্তুগিজ ভারতবর্ষে (গোয়া), তাঁদের ক্ষুদ্র মাতৃভূমিতে বৃহত্তর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবাইকে অজ্ঞ রাখা হয়, অতীতের সমস্ত গৌরব এবং বর্তমানের তিলক, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—সবকিছু সম্পর্কে ;—আমার বই থেকেই তাঁদের তাঁরা আবিষ্কার করেছেন।

…কালিদাস নাগ 'মডার্ন রিভিউ'এর (কালিদাস এর নতুন পরিচালক হয়েছেন) পরিচালকের কন্যা শান্তা চট্টোপাধায়কে বিয়ে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন রীতি অনুসারে সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করেছেন। একটি চিঠিতে কালিদাস আমাদের অন্তস্পর্শী বর্ণনাটি দিয়েছেন।

জুলাইয়ের প্রারম্ভ, ১২২৫। পল রিশারের আগমন। অনেক মাসের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তিনি আবার দেখা দিলেন। এ সময়টা তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন পারীতে, দক্ষিণ দেশে, আলজেরিয়ায়। অক্টোবরে তিনি ভারতবর্ষ ও চীনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বেন ঠিক করেছেন। তিনি চিরকাল তাঁর 'মহামানবের' প্রতীক্ষায় রয়েছেন। প্রতিক্ষায় রয়েছেন তিনি আসবেন অদূর মহাবিপ্লবের মধ্যে থেকে—যার নিঃশ্বাস তিনি বুক ভরে নিয়েছেন, আসবেন এশিয়ার অভ্যুত্থানের মধ্যে থেকে, ধ্বংসের মধ্যে থেকে। যে যোদ্ধু রহস্যবাদ, যে সর্বনাশা আদর্শবাদ তিনি প্রোটেস্টান্ট বাইবেলে পান করেছেন, এশিয়ায় পনরটি বছর তা তাঁর মন থেকে ঝরাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী তাঁকে কিছুটা দূরে দূরে রাখায় এখন তিনি তাদের ছোটো ক'রে দেখান ; প্রতিটি জাতির কাছ থেকে তাঁর এই পরিত্রাতার প্রতীক্ষায়—(টাইবেরিয়াস হ্রদের এক জেলের চেয়ে অনেক বেশী অগ্নিরথে এক এলিজার প্রতীক্ষায়)—প্রবঞ্চিত হয়ে তিনি তাঁর আশা ন্যস্ত করেছেন একীভবনোম্মুখী চীনের উপরে।

আগস্ট, ১৯২৫। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এক নতুন আশাভঙ্গের কারণ ঘটিয়েছেন। গত তিন মাস ধরে তিনি আমাদের জানাচ্ছিলেন, আগস্টে ভিলন্যভে উপস্থিত হবেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, ১ আগস্ট তিনি বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন। পরে, এক নতুন চিঠিতে কাজের অজুহাতে যাত্রা ১৫ আগস্ট পেছিয়ে গেল। গতকাল (১৭ আগস্ট) কালিদাস নাগের একটি কথা আমাদের উদ্বেগে ফেলেছে : তিনি লিখেছেন যে, ইউরোপে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কিছু আক্রমণ তাঁকে অত্যন্ত আহত করেছে এবং তিনি যাবেন কিনা সে-সম্পর্কেও আর তিনি নিশ্চিত নন। অবশেষে আজ এক টেলিগ্রামে স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রা নিশ্চিতভাবে খারিজ করেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল : অতেল বির', ভালম'র চিকিৎসকরা ; যেখানে শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে নারী-লীগের উদ্যোগে বার্ষিক আন্তর্জাতিক

পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই খনˮ-তে সমস্ত দেশের যৌবন রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন ক'রে আনন্দিত হতো ;—আমার সঙ্গে বসে প্রকাশক রনিজে প্রকাশনা এবং ইউরোপীয়-এশীয় বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় এক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তাঁকে পেশ করার জন্যে। সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ভারতীয়দের উপরে নির্ভর ক'রে কোনো কিছু শুরু করা প্রায় অসম্ভব : উৎসাহ এবং নিরুৎসাহের প্রতিটি ঝাপ্টার কাছে ওরা আত্মসমর্পন করে ; ওদের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, নিজেদের পরিকল্পনার শেষপর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে ওদের পিছনে লেগে থাকতে হয়। এমন এক কাজের জন্যে সময় দিয়ে এতো নিজেকে ক্লান্ত করেছি, যার সম্পর্ক আমার চেয়ে ওদের সঙ্গে অনেক বেশি এবং যে-কাজে ওদের কাছ থেকে (একমাত্র কালিদাস নাগ ছাড়া) কোনো সাহায্যই পাইনি। তাঁর সফর খারিজ করার ফলে যা কিছু নস্যাৎ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ নিজে তার ধারণাও করতে পারবেন না।

আগস্ট, ১৯২৫। বিশ্বভারতীর (যে-প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ) সচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ* আমাকে জানাচ্ছেন যে রবীনাথের প্রস্তাবানুসারে আমি ২১ জুলাই ১৯২৫ তারিখে বিশ্বভারতীর সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত হয়েছি।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। মাডলিন স্লেডের আগমন। ভারত মহাসাগরে নৌবহর পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত এক এ্যাডমিরালের কন্যা, বছর তিরিশ বয়সের এই ইংরেজ তরুণীটি কৃপার স্পর্শ লাভ করেছে। সে মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছে ; সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে ; সে ভারতবর্ষে যাত্রা করতে এবং আমেদাবাদের কাছে সবরমতী আশ্রমে ঢুকতে চলেছে, গান্ধী সেখানে তাকে গ্রহণ করেছেন। সে লম্বা, শক্তসমর্থ, বেশ সুন্দরী, রঙটা খুবই বাদামী, (ভারতীয়ের মতো অথবা জিপসীর মতো বাদামী ; তার প্র-মাতামহী তাদেরই একজন ছিলেন, অত্যন্ত সংকীর্ণমনা পরিবারের কলঙ্কের মধ্যে দিয়ে বিয়ে হয়েছিল সেন্ট-পিটার্সবুর্গে¹), দেহরেখাগুলো প্রকট, সর্বোপরি নাকটি বক্রতায় হাঙেরীয়দের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের কথা ভাবিয়ে দেয়। অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমি তার ভবিতব্যের যন্ত্র হয়েছি। দু'বছর আগে লন্ডনে আমার সঙ্গে তার পরিচয় শুরু হয়েছিল, তখন সে ছিল এক প্রচন্ড ও উদগ্র উত্তেজনার শিকার ; সে-পরিস্থিতির কোনো প্রতিবিধান ছিল না। এর জন্যে সে অনেক দিন ধরে ভুগেছে। আমি তাকে একটু পথ দেখিয়েছিলাম। গান্ধীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়েছিলাম। সে তার আবেগকে পাত্রান্তরিত করেছিল তাঁরই উপর, যাঁকে সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল খ্রীষ্টের মতো। তাঁর সমস্ত রচনা সে পড়ে ফেলেছিল। অবশ্য তাঁর মতাদর্শ অনুসরণ করবে ভাবেনি। পরের শরতে গান্ধীর ২১ দিনের মহা অনশনের সময় তার সেই জ্ঞানের আলো দেখেছিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাঁর

---

*রলাঁ লিখেছেন 'প্রশান্তচন্দ্র'।—অনু.

কাছেই জীবন নিবেদন করবে; তাঁকে চিঠি লিখেছিল এবং তিনি সেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। সে উর্দু শিখেছিল। সুতো কাটতে শিখেছিল। সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হিন্দু জীবনের বিধিনিষেধ গ্রহণ করেছিল। নিজের সামান্য যা টাকা পয়সা, তা তুলে নিয়ে বাপ-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। যা সুন্দর তা এই যে, বাপ-মা ও তার মধ্যে সম্পূর্ণ মতানৈক্য সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুরক্ত,—এমন-কি সেই এ্যাডমিরালও;—দুঃখ করেছেন, বুঝতে পারেননি, কিন্তু এই কাজের মহৎ নৈতিকতা উপলব্ধি করেছেন। আমার আশংকা, কোনো ফরাসী বাপ-মা স্বাধীনতার প্রতি এমন শ্রদ্ধা দেখাতে, নিজেদের এমন বঞ্চিত করতে সমর্থ হতেন না। আর এখন সে যাত্রা করছে তরুণী নবদীক্ষিতার আনন্দ নিয়ে যে-কারমালাইট্-সন্ন্যাসী হতে চলেছে। বোম্বাইতে— যেখানে সে জাহাজ থেকে নামবে—তার সঙ্গে দেখা করতে এবং রেলপথে এক রাতের মধ্যে আমেদাবাদে তাকে নিয়ে আসতে গান্ধী আশ্রমের এক ভারতীয়কে পাঠাচ্ছেন। সে আগেই বুঝে নিয়েছে যে আশ্রমের জীবন কঠিন; প্রতিদিন কাজ ক'রে নিজে যা অর্জন করা যায় তাই খেতে হয়, ইউরোপীয়দের পক্ষে আবহাওয়া ক্লেশদায়ক। কিন্তু কিছুই তাকে থামাতে পারেনি। এছাড়া ভারতবর্ষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, তার পনের বছর বয়সে সে নৌসেনাপতি বাবার জাহাজে ক'রে সেখানে গিয়েছিল। তখন সে শুধুই ইংরেজ সমাজকে দেখেছিল; এক ভোজসভা থেকে আর এক ভোজসভায় ঘুরেছিল; এবং তা তাকে উত্যক্ত ক'রে মেরেছিল। এখন সে বলছে: "লোকে অনুনয় ক'রে আমাকে বলে: তুমি কেমন একা হতে, ভারতীয়দের মধ্যে হারিয়ে যেতে চললে!—আর আমি বলি, জীবনে এই প্রথমবার ঘটবে যে একা আমি আর কখনো হবো না।" আমি ওকে দেখি সেই সব নারীদের একজনের মতো, যারা যিশুকে ঘিরে ছিল, যারা তাঁর কাহিনী সৃষ্টি করেছিল। আমার বিশ্বাস আছে, (মানুষের দূরদৃষ্টিকে যদি কোনো কিছু বিক্ষিপ্ত না করে), নতুন খ্রীষ্টের কাহিনী এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠায় এক মহৎ ভূমিকা পালনের আহ্বান তার কাছে এসেছে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। আমার "কন্যা" মাডলিন স্লেডকে সুপারিশ ক'রে গান্ধীকে চিঠি লিখলাম, ২৪ অক্টোবর সে বোম্বাই যাত্রা করছে। সে আমাদের লিখছে রহস্য-গূঢ় আনন্দে উদ্বেলিত চিঠি,—তাতে সহজবুদ্ধি ও রসিকতা বাদ পড়েনি। সে লিখেছে, তার দৃষ্টান্ত বাপ-মাকে টেনে এনেছে—মা সুতো কাটছেন আর এ্যাডমিরাল বাবা খদ্দর বুনছেন (গান্ধীকে গালমন্দ করতে করতে)।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। মার্কিন লেখিকা ও শান্তিবাদী, ই. ডি. মরেল, জে. এইচ. হোমস্ সেনেটার বোরা প্রভৃতির বান্ধবী শ্রীমতী জুলিয়া এলস্ওয়ার্থ ফোর্ডের

আগমন। তিনি জেনেভায় আফিং-সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে আসছেন, এবং সবচেয়ে তিক্ত ক্রোধ প্রকাশ করলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, তার আর্থিক ব্যাপারে এমন লাভজনক -এবং, প্রণালীবদ্ধভাবে নির্বীর্য ও জড়বুদ্ধি করে-তোলা জনগণের কাঁধে-চাপানো তার সাম্রাজ্যের পক্ষে নিঃসন্দেহে সুবিধাজনকও বটে - একটি বিষকে নিষিদ্ধ করতে সে অস্বীকার করেছে : কারণ এটাই লক্ষণীয় যে, ইংলন্ডে আফিং ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইংরেজী আইনে যখন নিদারুণ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তখন ইংলন্ডই ভারতবর্ষ ও চীনে তার উৎসাহ দেয়, অজুহাত দেখায় যে, ইউরোপে যা ক্ষতিকারক, ‘এশিয়ায় তা ক্ষতিকারক নয়। আর এই যে লর্ড সিসিল—যাঁকে দেখেছিলাম তিন বছর আগেও, লিগ অফ নেশনসে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সৎ মানুষদের মনে যিনি সবচেয়ে শ্রদ্ধা ও আশার প্রেরণা জাগাতেন, তিনি আজ এই নির্লজ্জ বক্তব্য সমর্থন করেছেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকে তিনি পুরোপুরি পাল্টে গেছেন, তাঁর সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করেছেন ; এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এতো বড়ো নির্লজ্জ প্রবক্তা আর কেউ নেই। এই একই রকম হচ্ছেন হায়রে ! ম্যাকডোনাল্ড ও সমস্ত লেবার-পন্থী নেতারা ! লাজপত রায় তাঁর পত্রিকা ‘দি পিপল’-এ যেমনটি লিখেছেন ইংবেজ রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্কে সমস্ত মোহ নিশ্চিত-ভাবে ত্যাগ করা উচিত। যতক্ষণ তাঁরা বিরোধী পক্ষে থাকেন, ততক্ষণই শুধু তাঁদের আদর্শবাদ ও নিঃস্বার্থপরতার নীতি থাকে। ক্ষমতায় বসতে না বসতেই তাঁরা ক্ষমতা ও বাস্তব রাজনীতির কাছে সমস্ত নীতি বিসর্জন দেন।—এই উপলক্ষে আমেরিকা ক্রোধ প্রকাশের মওকা পেয়ে গেছে। কিন্তু তার নিজের সব জোরজবরদস্তি আদায়-করা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে যাচ্ছে। আর আমি, আরো একবার, লক্ষ্য করছি সেই মারাত্মক হিংসা, শান্তিবাদীরা শান্তির সেবায় যার আমদানি করছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জগতের অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যে শ্রীমতী জুলিয়া এলসওয়ার্থ ফোর্ড ও তাঁর বন্ধুরা সব কিছু করছেন। জগতকে যুদ্ধে টেনে নামাচ্ছে বলে তাঁরা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। এ সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁরাই প্রথম।

অক্টোবর, ১৯২৫ - রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখছেন (ইংরেজিতে, তর্জমা আমার বোনের) (কলকতা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) :

“আমার অতি প্রিয় বন্ধু,—আমি নিশ্চিত যে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে, এবং আমাদের সাক্ষাৎ নিরর্থক হবে না। এই শরতের প্রারম্ভ,—যখন আমি ভারতবর্ষ ছাড়ার মুখে, ইউরোপের সঙ্গে আমার নবপরিচয়ের অতি সীমাবদ্ধ অবকাশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। অন্য দিকে, আমার স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে যেমন, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যেও তেমনি, ওখানে আগামী গ্রীষ্মটা কাটাতে ছ'টা মাস সহজেই হাতে পেয়ে যেতাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না যে আমার অতি-বিচক্ষণ চিকিৎসক

আমাকে আটকে দিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন। তিনি একেবারেই বোঝেন না, ভারতবর্ষে থাকাটাই আমার উপরে যে মানসিক উত্তেজনা চাপিয়ে দিয়েছে, তা কী প্রচন্ড। এক নৈতিক নিঃসঙ্গতা, যা অদৃশ্য এবং নিরন্তর বোঝা—তাই আমাকে বেশী পীড়িত করছে। যদি মহাত্মা গান্ধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং এইভাবে সাধারণের অনুমোদনের প্রবাহে নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো! কিন্তু আমি আর গোপন ক'রে চলতে পারি না যে, আমাদের সত্যের ধারণায় এবং আমাদের সত্যের অনুসরণে আমরা আমূল পৃথক। আজকে ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত না হয়ে থাকাটা এবং তবুও চারপাশে শান্তি খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব। আর এই জন্যেই এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা নিয়ে আমি আগামী মার্চে আমার পলায়নের অপেক্ষায় আছি। আমি জানি যে ইউরোপে আমার বন্ধুরা আছেন, যাঁরা আমার সত্যিকারের আত্মীয় এবং যাঁদের সহানুভূতি আমার এই বর্তমান অবসন্নতার অবস্থায় প্রকৃত সঞ্জীবনীর মতো কাজ করবে।

প্রীতিসহ সব সময়েই আপনার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

ডিসেম্বর, ১৯২৫। "আমার কন্যা" মাডলিন স্লেড তার সবরমতী পেঁছনো এবং গান্ধী তাকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, সে-সম্পর্কে আমাদের এক পরমানন্দময় চিঠি লিখেছে। আমার বোনকে একটানা লেখা তার চিঠিগুলো পরে একদিন ধর্মীয় ইতিহাসের এক বিস্ময়কর দলিল হয়ে থাকবে। মহাত্মার সঙ্গে তার কথাবার্তা, যে ভক্তিসমাহিত চিত্তে সে তাঁর কথা শোনে এবং তা ধারণ করে,—তা এক নতুন খ্রীস্ট-বাণীর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। গান্ধী নিঃসন্দেহে দাক্ষিণ্যে ও পূতচারিত্র্যে খ্রীস্টের চেয়ে ন্যূন নন; এবং অন্তরস্পর্শী নম্রতায় তিনি খ্রীস্টকেও ছাড়িয়ে যান। আর মাডলিন স্লেড তো—যেমনটি আমি দেখেছিলাম,—এই নতুন পরিত্রাতার ঠিক এক সন্ত নারী।

এই মনটির সৌন্দর্যকে চিনতে গান্ধীর দেরি হয় নি। ১৩ নভেম্বর তিনি আমাকে লিখছেন:

"প্রিয় বন্ধু,—আপনার সহৃদয় পত্রটি পেয়েছি। শ্রীমতী স্লেড তার ঠিক পরপরই এসেছেন। কী সম্পদ আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন! আমি এই মহৎ বিশ্বাসের উপযুক্ত হবার চেষ্টা করবো; পূর্ব ও পশ্চিমের এক সেতু হয়ে ওঠার জন্যে তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না। শিষ্য পাবার পক্ষে আমি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। তিনি আমার সন্ধানী সাথী হবেন এবং যেহেতু আমি বয়সে বড়ো, আর তারই জন্যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় বড়ো ব'লে মানিত, আমি আপনার সঙ্গে পিতৃত্বের অংশীদার হবার চেষ্টা করছি। শ্রীমতী স্লেড মানিয়ে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। বাকিটুকু শ্রীমতী স্লেড আপনাকে বলবেন ব'লে ছেড়ে দিচ্ছি।

তাঁকে বলেছি, তাঁর আসার কয়েকদিন আগে যে-ফরাসী ভগিনীটি এসেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আপনাকে লিখতে।

সবরমতী — আপনার
১৩.১১.২৫ — এম. কে. গান্ধী”
মঁ. রলাঁ

আর মাডলিন স্লেড সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে ১২ নভেম্বর লিখছে ঃ

“আহা !…তিনি যে কতো স্বর্গীয় তা কল্পনা করতে পারিনি। আমি এক পয়গম্বরের প্রতীক্ষা করেছিলাম, আমি এক দেবদূতকে পেয়ে গেছি…আহা ! আমি যেন যোগ্য হতে পারি !…”

(গান্ধীর উল্লিখিত “ফরাসী ভগিনী”টি লিলের সাধারণ অবস্থার এক মহিলা, আমার বই পড়ার পর তিনি সম্পূর্ণ একা আমেদাবাদ যাত্রা করেছিলেন। থিওসফি তাঁর মাথার গোলমাল ঘটিয়েছিল এবং তিনি কিছুটা এলোমেলো বকেছিলেন। তাছাড়া, ফরাসী ছাড়া তিনি অন্য কোনো ভাষা জানতেন না ; সত্যাগ্রহ আশ্রমে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বা তাঁর কথা বুঝতে পারেনি। শ্রীমতী স্লেড তাঁর দোভাষী হয় ; সে বলে যে, মহাত্মার কথা হতভাগিনীর বিভ্রান্ত মনে প্রবেশ করছে এবং সেই মনে আলো ও শান্তি ফিরিয়ে আনছে, এ দেখাটা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। কয়েকদিন পরে এই অজ্ঞাত ফরাসী মহিলাটি একাই, যেমন এসেছিলেন তেমনই, স্বদেশে যাত্রা করেন, হৃদয়ে বহন ক'রে নিয়ে যান সেই বাণী যা আলোকিত করে।)

১৯২৬

২০ মে, ১৯২৬। ভারতবর্ষের জহরলাল নেহরু এবং তাঁর ছ' বছরের মেয়ে ইন্দিরা এসেছেন দেখা করতে। তিনি গান্ধীর মুখ্য শিষ্যদের অন্যতম, সুইজারল্যান্ডে এসেছেন যক্ষ্মাক্রান্তা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যে। স্বরাজ্য পার্টির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম মতিলাল নেহরুর ছেলে তিনি। যত ভারতীয়কে আমি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে ইনি দেখতে ইউরোপীয় ধরনের,—কমনীয় অবয়ব, সুদৃশ গঠন, মাথার গড়ন এবং ভাবভঙ্গি একেবারে ইতালীয়ের মতো। রং ফ্যাকাশের উপরে তামাটে। তার কারণ, তিনি উত্তরাঞ্চলের লোক,— উদ্ভব কাশ্মীর থেকে,—আর্যবংশের খুব কাছাকাছি। তিনি বললেন, গান্ধীর বন্ধু তাঁর বাবা গান্ধীর একেবারে বিপরীত। গান্ধী এসেছেন কিছুটা ভীরু (তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায়, কি বীরোচিত শৃঙ্খলায় তিনি নিজের স্বভাবকে বাধ্য করেছেন), অত্যন্ত নম্র, জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ-ঘটা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর, এবং পুরোপুরি হিন্দু এক জাত (এবং শ্রেণী) থেকে।

মতিলাল এসেছেন মুসলমান এবং ইরাণী উপাদানের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্কিত, সক্রিয়, ভীষণভাবে সংগ্রামপ্রবণ এক জাত থেকে। গান্ধীর কারাবাসের সময় কাউন্সিলে অংশগ্রহণের দাবি জানিয়ে তিনি স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। জহরলাল নেহরু ছিলেন ব্যবহারজীবী; লেখাপড়া করেছেন কেমব্রিজে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাজ ছেড়ে দেন। গান্ধীবাদের প্রতি তার আনুগত্য ১৯১৯ সাল এবং রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে আন্দোলনের সময় থেকে। তিন বার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। তিনি বললেন, গান্ধী ভারতীয় জনগণের উপরে সেই একই কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন; কিন্তু ভারতীয় 'এলিত'দের উপরে প্রায় তাঁর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের ব্যাপারে তিনি বেশ নৈরাশ্যবাদী; সেই বিভেদকে প্রশ্রয় দেয় ইংরেজ সরকার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, যারা নিজেরা মনে করে বিভেদের ফলেই তারা টিকে আছে। তাছাড়া, এই উত্তেজনা শহরগুলো ছাড়া অন্যত্র সামান্যই ঘটেছে; এবং গ্রামাঞ্চলে, যেখানে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ বাস করে, সেখানে হিন্দু ও মুসলমান সদ্ভাবেই আছে। কিন্তু একথা মানতেই হবে, সহধর্মীদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ভূমিকা পালন করতে পারেন, গান্ধীর সঙ্গে তুলনীয় এমন কোনো নৈতিক ও ধর্মীয় কোনো উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তি মুসলমান দলে নেই। (উল্লেখযোগ্য এই, হিন্দু ও মুসলমান একই জাতির। সাধারণভাবে, দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হয়েছে।)

৩১ মে, ১৯২৬। লাজপত রায় এসেছেন, বেরিয়েছেন মোটরে, সঙ্গে এক ভারতীয় বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী (ভারতীয় বেশে, কপালে প্রতীক ফোঁটা, যেন জেলিতে ডুবিয়ে বুড়ো আঙুলে দেওয়া)। লাজপত রায় পুরোপুরি সুস্থ, সবল, হাসেন উচ্চকণ্ঠে। ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান এই ব্যক্তিটির প্রতি আমার বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই: নেই ঠিক এই কারণে যে, এই টাইপটিকে ইতিমধ্যেই আমি ইউরোপে চিনেছি। গান্ধীর এই পুরনো বন্ধুটি সবচেয়ে কম গান্ধীবাদী। অস্থিমজ্জায় সংগ্রামী। এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী (বুদ্ধিমত্তা আছে, কিন্তু আছে আবেশ এবং দুর্ভেদ্যতা)। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত সংঘর্ষে তিনি নিজেকে খুশি মনে করছেন। "এই ভালো হলো। এইটি হওয়া উচিত ছিল। এখন আবহাওয়া এ-থেকে মুক্ত হবে।" এবং তিনি আরও বললেন গর্বিত প্রত্যয়ে—যার অংশীদার হবার কোনো কারণ আমার নেই: "এখন, মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে ঝুঁকবে, কারণ ওরা দেখবে কাদের সঙ্গে ওদের কারবার করতে হবে!'··· এক খেয়োখেয়ির রাজনীতি, শান্তির জন্যে যুদ্ধের রাজনীতি···ওটা জানা আছে! তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন, হিন্দু-মুসলানের সংঘর্ষের পর সামনের বছর সমঝোতা হবে। এবং এমনকি এও বলতে চাইলেন যে, এ থামাতে পারবেন না বুঝতে পেরেই গান্ধী হানাহানির বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, আর সবচেয়ে ভালো, ঘটনার মধ্যে থেকে গ্রহণযোগ্য

শিক্ষা বেরিয়ে আসবে। লাজপত রায় জেনেভায় এসেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের জন্যে। বিরাট ধর্মঘটের সময় তিনি লন্ডন হয়ে এসেছেন।

৩১ মে, ১৯২৬। গতকাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেপলসে পৌঁছেছেন। রোম থেকে লিখেছেন, দিন বারোর মধ্যে তিনি ভিলন্যভে আসার আশা রাখেন।

২১-২২ জুন, ১৯২৬। আমরা গিয়েছিলাম মরা-য়। ভিলন্যভে ফিরে এলাম মাঝরাতের দিকে। ভাগ্যিস ফিরেছিলাম, কারণ আমাদের অনুপস্থিতিতে ধার্য দিনটির একদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছেন। সুখের বিষয়, আগেই আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলাম। আমাদের অবর্তমানে আমাদের বন্ধু মার্সেল মার্তিনে মঁত্র্য স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে মোটরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন অতেল বিরঁতে, বাড়িতে ঢোকার আগেই ২২ জুন রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তাঁর চেহারা তেমনই সুন্দর, তেমনই মহিমাব্যঞ্জক এবং মার্জিতই আছে, কিন্তু তিন বছর আগে পারীতে তাঁর স্বাস্থ্যের যে প্রাচুর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তা আর নেই ; তিনি কিছুটা রোগা হয়েছেন, শ্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, আসলে, আবার তাঁর দুর্বলতা দেখা দিয়েছে শেষের দিনগুলো থেকে। ইতালি তাঁর দম বার ক'রে দিয়েছে ; তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে কোনোই নজর দেওয়া হয়নি। এখানে থেকে সেরে উঠবার দিকে, অন্তত বিশ্রাম নেবার দিকে, তিনি ঝুঁকেছেন ব'লে মনে হয়। তিনি বললেন সুইস সীমান্তে পা দিতে না দিতেই তিনি স্বস্তি বোধ করেছেন। তিনি কথা ব'লে চললেন শান্ত, দুর্বল, 'সোপ্রাণো' গলায়। আপাত-প্রশান্তির অন্তরালে কোনো এক উত্তেজনা আছে, লক্ষণ দেখে বুঝলাম। এরই মধ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরার কথা বলতে লাগলেন, সেই জাহাজে ইতিমধ্যেই তিনি আসন ঠিক ক'রে রেখেছেন এবং এরই মধ্যবর্তী কালে—তাঁর শ্রান্তি ও বিশ্রামের বাসনা সত্ত্বেও—প্রাগ, জার্মানী, হল্যান্ড, ইংলন্ডে যাবার ইচ্ছের কথা বললেন। ইউরোপের দেশগুলোকে শেষবারের মতো দেখে নেবার এবং সেখানে তাঁর সর্বশেষ বাণী বয়ে নিয়ে যাবার এক ব্যাকুল ত্বরা তাঁর মধ্যে।

২৩ জুন, ১৯২৬। জায়গাটা, পরিবেশ এবং হোটেল তাঁকে খুশি করল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এখানে এক মাস থাকবেন,—এমনকি এখানেই থেকে যাবেন, এখানে একটা বাড়ি নেবেন। সারাদিন তিনি আছেন ঘরের মধ্যে। কিন্তু চায়ের সময় আমরা পেলাম তাঁর সুন্দরী পুত্রবধূ প্রতিমা,* অধ্যাপক মহলানবীশ

---

* রলাঁ সর্বত্র লিখেছেন 'প্রতিনা'।—অনু.

এবং তাঁর তরুণী পত্নী ও "কবির" সচিবকে ; সচিব এক তরুণ যুবরাজ, গদিনশীন রাজার ছেলে।** এই গোটা চক্রটিই এক মার্জিত বৈশিষ্ট্যের। মহিলা দু'জনের আকর্ষণী শক্তি প্রবল ঃ প্রতিমার মুগ্ধকর দুই চোখ, শ্রীমতী মহলানবীশের নিখুঁত গড়ন, দু'জনের মিষ্টি সুরেলা এক হাসি ; বিশেষ ক'রে প্রতিমার মধ্যে বুদ্ধি, দয়া, চাতুর্য : তাঁর ছোট নাকটা ডগার দিকে একটু বাঁকানো। শ্রীমতী মহলানবীশের কপালে রঙীন ফোঁটা এবং চুলের সিঁথিতে গেরুয়া-লাল রেখা ; গণিতবিদ অধ্যাপক মহলানবীশ জ্ঞানের যে-কোনো কিছুর প্রতি অত্যন্ত খোলা মনের ; গায়ের বাদামী রঙে এবং বুদ্ধিমত্তার প্রাণবন্ততায় কালিদাস নাগের ধরনের। তাঁর ইচ্ছা ছয় থেকে আট মাস ইউরোপে থাকবেন, এবং একমাত্র ইনিই গোটা কয়েক ফরাসী শব্দ বলতে পারেন। আর সকলে শুধুই ইংরেজি জানেন। তরুণ রাজাটি কলকাতা থেকে ১২ ঘন্টার দূরত্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বে এক স্বাধীন রাজ্যের (ত্রিপুরা) প্রভু। তিনি মালয়ী ধরনের খুব কাছাকাছি, চেরা চোখে অনেকখানি বন্যতা। তাঁর বংশ শিল্পীর ; প্রায় সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ; তিনি খোদাই করেন এবং ছবি আঁকেন ; কিন্তু এক নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে, সে-নেশা শিকারের। জঙ্গলে বড় শিকার না ক'রে সপ্তাহ যায় না,—বাঘ শিকার, হাতি শিকার, মোষ বা বাইসন শিকার। অন্যদের মতোই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং নিজের উপরে দখল রাখেন। প্রথম দিকে কথায় কথায় ইতালির ফ্যাসিবাদের বিষয়টি ছুঁয়ে যাওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথের ইতালীয় বন্ধুদের প্রতি, বিশেষ ক'রে বিখ্যাত প্রাচ্যাবিদ ফর্মিচির প্রতি, মহলানবীশ অত্যন্ত নির্মম, তিনি তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা এবং মুসোলিনির প্রতি তাঁর দাসত্বের কঠোর সমালোচনা করলেন। কিন্তু তাঁরা ইঙ্গিত দিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির ছলাকলায় ভুলেছেন, তাঁর কাছে মুসোলিনি নিজেকে সরল ও স্বাভাবিক ব'লে দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা তাঁকে দেখেননি, বা ইতালির গুণীজনের সঙ্গে তাঁদের হয়েছে শুধু সরকারী ভাবে যোগাযোগ। বেনেদেত্তো ক্রোচে একমাত্র নামী ইতালীয় যিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এসে থাকবেন।

ডাক্তার দেখে যাবার পর সন্ধ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গেলাম। গত সন্ধ্যার চেয়ে তাঁকে বেশি শ্রান্ত মনে হলো। পূর্ণ আলোয় তাঁর চেহারা দেখালো কিছুটা ফুলোফুলো এবং রসস্থ, রং চকচকে কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা অসুস্থতা-জনিত। জানালার সামনে এক বিরাট আরামকেদারায় বসে আছেন। আমি আর আমার বোন তাঁর দুই দিকে ; রবীন্দ্রনাথ বলেন, দুর্বল শান্ত গলায় স্পষ্ট ক'রে ; আমার বোন তর্জমা করে ; আমি উত্তর দিই ; সে তর্জমা করে ; কয়েক পা দূরে এক ডিভানে বসে অধ্যাপক মহলানবীশ নোট নেন। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দেখলাম, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না ; এবং এটা বেশ আশ্চর্যজনক যে, এমন একজন মহৎ শিল্পী, এতদিন ইউরোপে কাটিয়েছেন, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে এমন একজনকেও কখনো পাননি যিনি সঙ্গীত ঘটিত কোনো কিছুতে পারদর্শী ; গ্লুকের নামও তাঁর কাছে অজানা। ইউরোপীয় সঙ্গীতের যা

** কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবর্মাণিক্য (লালু কর্তা)।—অনু.

তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন তা শুধু তার নির্মাণ-কৌশলের আর তার বহুধ্বনির (polyphonic) জটিলতা নয় ঃ তা হচ্ছে সেই সঙ্গে তার প্রকাশের (বা প্রকাশের ইচ্ছার) এবং ব্যাখ্যার যথাযথ কাঠিন্য ঃ অবকাশের অপ্রতুলতা (বা অবকাশের অভাব)—যাকে সে দাঁড় করায় সৃষ্টিধর্মী স্বপ্নের স্বচ্ছন্দলীলা ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে। তার উত্তরে আমি দেখাতে চাইলাম যে, ইউরোপের সঙ্গীত অনেক যুগের, অনেক পৃথক স্তরের মধ্যে দিয়ে এসেছে এবং তাঁর যে-রূপগুলোর (forms) প্রতি টান, সে-সবও এর জানা আছে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে দোষারোপ করলেন উপায়কে লক্ষ্য ক'রে তোলার জন্যে, আবেগেই থেমে যাওয়ার জন্যে,—যেখানে কবির ক্ষেত্রে, (তিনি যেমনটি বোঝেন), মনের উঁচু ধাপের অভিমুখে আবেগই পন্থা। আমি বললাম, সঙ্গীতের কারবার যে-ধ্বননশীল পদার্থ, সংবেদনশীল উপাদান নিয়ে, তা কণ্ঠ্য উপাদানের চেয়ে বেশি তীব্র গুণসম্পন্ন হওয়ায় এইটেই স্বাভাবিক যে সঙ্গীতকে অনেক সহজেই সংবেদন ও আবেগের ঢালে (pente) টেনে আনা যায় ; কিন্তু ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে একই কাজ ঘটে সুসম্বন্ধ বিন্যাস (ordre) ও পরম চিন্তাটিকে বার ক'রে আনার জন্যে ; উপাদানগুলো আরও সমৃদ্ধ এবং আরও প্রচুর হওয়ার জন্যে কেবলমাত্র ভারসাম্য আনাটা বেশি কঠিন।

আলোচনার সময় বসে ছিলেন মহলানবীশ, রবীন্দ্রনাথের ছেলে এবং ছেলের স্ত্রী প্রতিমা।

২৪ জুন, ১৯২৬। রবীন্দ্রনাথের ঘরে। ঘরের সামনে সমুদ্রের মতো বিশাল বিস্তৃত হ্রদ। এই সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের গোলাপী লাল আর কমলা রঙে দিগন্ত অলৌকিক দীপ্তিতে বলয়িত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উপভোগ করছেন ; তিনি বললেন, প্রকৃতি যেন পুরোপুরি একটা ফল। ফুল আর পাখির গানের প্রাচুর্যের প্রতি তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল (আমাদের আলাপের সময়ে যাদুকর ব্ল্যাকবার্ডগুলো তাদের বিচিত্র কাকলির বিরত ঘটায়নি) ; তিনি ওদের উদার কাকলির মুগ্ধ প্রশংসা করলেন, তা প্রাচ্যদেশগুলোর চেয়ে উচ্চ স্তরের। বাতাসে ঝড়ের গন্ধ ; মেঘ জড়ো হচ্ছে, ; আর যখন কথা বলছি, মেঘের গর্জন গড়িয়ে চলেছে পাহাড়ের চক্রব্যূহে। এখন ভারতবর্ষে বর্ষা ঋতু, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম ঋতু। কিছুটা মন-কেমন-করা ভাবের সঙ্গে তাঁর মন চলে গেছে ওদিকে। সেখানে প্রতিটি ঋতুর গান আছে। কিন্তু সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বসন্তের গান নয় (ফেব্রুয়ারিতে), বর্ষাঋতুর গান। তবু রবীন্দ্রনাথের গানে সামান্যতম বর্ণনাত্মক অনুকৃতি ছাড়াই তারা তাঁর কাছে ব্যঞ্জনা জাগায় বর্ষাধারার আর পরিবেশের। এবং আলোচনা এইদিকে গেল ঃ সুর আব প্রকৃতির মধ্যে কি কোনো গোপন যোগসূত্র আছে ? নাকি, সেখানে আমরা যাদের খুঁজে পাই, তারা অনুষঙ্গ ও স্মৃতি থেকে আসে—যে অনুষঙ্গ ও স্মৃতি আমরা সেখানে মেশাই ? নতুন ক'রে আমাদের আলোচনা হলো সঙ্গীতের সারাৎসার নিয়ে ; জাতি ও রীতিনীতির সমস্ত ভিন্নতা সত্ত্বেও, সঙ্গীতে ও কাব্যে অপরিহার্য ও বিশ্বজনীন কী আছে ? রবীন্দ্রনাথ কীট্‌সের কয়েকটি লাইন

উদ্ধৃত করলেন, কীট্‌স যে-ভাবগুলো ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন এগুলো তাঁর মধ্যে অনুরূপ ভাবের আলোড়ন তোলে, যদিও কীট্‌স ইংলন্ডের যে-বসন্তের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন তা তাঁর কাছে অপরিচিত। বোঝা যায় যে, ছবি আর প্লাস্টিক আর্ট এক অভিন্ন মডেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, মডেলটি বহিরঙ্গ প্রকৃতি। কিন্তু কাব্যের, সঙ্গীতের অন্তরঙ্গ উপাদানগুলো কী কী? আমি দেখলাম যে, মূলত এরা নির্ভর করে রক্তের এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালের উপরে, এরাই নিয়ন্ত্রণ করেছে উদাত্ত (arsis) ও অনুদাত্ত স্বর (thesis), এরাই বিন্যস্ত করেছে যতি, পর্ব এবং স্তবককে, এরা প্রায়শই সঙ্গীতজ্ঞকে সিম্ফনির পূর্ণ অংশের (morceaux entiers) উৎপাদক কোষের জোগান দিয়েছে।

সাধারণভাবে আর্ট সম্পর্কে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ জোর দিলেন প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীর নিরন্তর সংবাদশালিতার উপরে, জোর দিলেন মহাজাগতিক মননের উপরে, সারা জীবন তাঁর মধ্যে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে; এর সঙ্গে তিনি বৈষম্য দেখালেন ইউরোপীয় আর্টের, তাঁর চোখে যা শাসিত হয় এক যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা। তার উত্তরে আমি বললাম, মনের এই স্বয়ংচল প্রবনতার জন্যে বিজ্ঞানকে দায়ী করার প্রয়োজন নেই। এমনকি এক স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভাও উত্তরপুরুষের কাছে মডেল হিসেবে গৃহীত হতে পারে এবং তার পক্ষে খেয়ালি রীতিনীতির এক জটিল জাল, অনমনীয়, প্রাণহীন নিয়মকানুন হয়ে উঠতে পারে; নিজে নিজে দেখার, অনুভব করার এবং সৃষ্টি করার জন্যে মনের মুক্তির নিরন্তর নবীকরণ হওয়া চাই। মহাজাগতিক মননের ব্যাপারে, প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার ব্যাপারে, এ নিঃসন্দেহ যে, মোটের উপর ইউরোপের নগর-সভ্যতা এখানে একটা বাধা হয়ে আছে; কিন্তু ইউরোপের মহত্তম শিল্পীরা ভারতবর্ষের শিল্পীদের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে গভীর হয়ে সংবাদী আছেন। আমি বিঠোভেন ও লেওনারের* উল্লেখ করলাম, তাঁদের মাথায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার রূপের সাদৃশ্য বোঝাই থাকতো (মাথাভরা চুলের গোছা আর নদী) এমনকি ঋতুর সঙ্গে ও বৎসরের দিনগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের গানের এই যে ঘনিষ্ঠ ও অনন্য আত্মীয়তা, ইউরোপ এও জানে। ভাগ্‌নারের 'মেইস্‌টেরসিঙ্গের' গুলো হাস্যোদ্দীপক অতিরঞ্জনে ফুল-ফোটা, সবুজ ঘাস, প্রকৃতির দৃশ্যের বিচিত্র রূপের সঙ্গে যথাযথভাবে অনুষক্ত এইসব সাঙ্গীতিক ধরনগুলো (mode) মনে পড়িয়ে দেয়। ইউরোপের প্রাচীন লোকসঙ্গীতের সহজাত প্রবণতা, এশিয়ার সহোদরদের মতোই ভাব-অনুভাবের পঞ্জিকায় তাদের যুক্ত করেছে। সঙ্গীতে 'প্যাস্টোরাল' ধরন, ইত্যাদি।

—তারপর হঠাৎ কীসের জন্যে বিষয় পরিবর্তন? রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ট ইতালি এবং সেখানে তাঁর সফরের কথা আমাকে বলতে লাগলেন। (সেদিনই সন্ধ্যায় অধ্যাপক মহলানবীশ এ সম্পর্কে পরে আমাকে আরও যথাযথ বিস্তারিত জানিয়েছিলেন।) রবীন্দ্রনাথ বললেন, ওখানে আসতে, আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বহু দ্বিধা ছিল। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক আলাপ ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপগামী

---

* Leonardo de Vinci—অনু.

জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তারপর ইতালিতে থাকার সময় বন্ধুদের অথবা সবধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে। সকলেই ফ্যাসিবাদের গুণগান করেছেন, বলেছেন, এটা প্রয়োজন ; এর অবশ্যম্ভাবী এবং পরিত্রাতার চরিত্রটি ভালো ক'রে সমর্থনের জন্যে তাঁরা নিজেদের হেয় করেছেন, গোটা ইতালিকে হেয় ক'রে দেখিয়েছেন ; তাঁরা বলেছেন, ইতালি নিজেকে শাসন করতে, কর্তৃত্ব বজায় রাখতে, শান্তিশৃংখলা রক্ষা করতে অক্ষম। তখন রবীন্দ্রনাথ (তাঁর মধ্যে যা দেখে অবাক হয়ে গেলাম) লেগে গেলেন ফ্যাসিবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে ঃ যদি কোনো জাতি প্রকৃতই নিজেকে চালাতে অক্ষম হয়, অরাজকতায় এবং নিস্ফল হিংসায় যদি সেই জাতির তলিয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ স্বাধীনতাকে দমনকারী এক অনমনীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন তাকে মানতেই হয়। কোনো কথা না-ব'লে (রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পারা যায় না) আমি শুনে যাচ্ছি তাঁর মন্থর বাক্য-প্রবাহ, সবই প্রায় অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, তথ্যের দিক থেকে অনির্দিষ্ট এবং শুধু বলতে-ভালো-লাগার খাতিরেই আত্মসন্তুষ্টিতে দীর্ঘায়িত করা (তিনি মনেপ্রাণে বক্তা, এবং আমার আশংকা শোনার চেয়ে বলাই তাঁর দরকারী। আলোচনা করা কঠিন। তিনি দীর্ঘায়িত ক'রে বর্ণনা করা পছন্দ করেন, কেউ বাধা দিতে আসে না। কিন্তু বর্ণনার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত প্রবাহে নিজের কথা প্রচার করতে গিয়ে প্রায়ই প্রসঙ্গ-চ্যুতি ঘটে,—যখন আলাপচারী সঙ্গীর উত্তর দেওয়ার সময় আসে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে দশটি প্রশ্নের উত্থাপন করেন, সেখানে তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় একটির মধ্যে ; অনেক কিছুই বলার থাকে, তবে দরকার আসল কথায় !) তাই আমি অনেকক্ষণ ধরে শুধু শুনে গেলাম, এবং কথা বলার জন্যে অধীর হয়ে উঠতে লাগলাম।

যখন তিনি থামলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ "এবার আমি বাক্‌রুদ্ধ ইতালি, শহীদ ইতালির কথা কবি রবীন্দ্রনাথকে বলবো। যাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করছেন, আমার কাছে তাঁদের বাণী আছে তাঁকে বোঝাবার জন্যে।"

কিন্তু তখন তখনই বললাম না। আকাশে মেঘের স্তূপে চিড় দেখা দিয়েছে। আমাদের বাসায় রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করলাম। সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে জড়ো হবো ঃ তাঁর ছেলে, ছেলের স্ত্রী, মহলানবীশেরা দু'জন। রবীন্দ্রনাথ খুবই আস্তে আস্তে হাঁটছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি প্রায় হাঁটেনই নি। খালি মাথা, তাঁর সেই লম্বা চুল, বাদামী-কমলা গায়ের রং। গ্রামবৃদ্ধের মতো দাড়ি ; ধূসর রেশমী পোশাকের উপরে গাঢ় বাদামী ওভারকোট, সেটা পোষাকের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খেয়েছে। বির'র বাগানের মালিকরা দাঁড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় মোজেসকে তাকিয়ে দেখতে।

ভিলা অলগার ছোট্টো বসার ঘরটায়, দুই জানালার মাঝখানে, আলোর উল্টো-দিকে, হাতাওয়ালা আরামকেদারায় তিনি, —আমি তাঁর মুখোমুখি খোলা আলোয়—, বসতে না বসতেই, যা বলে রেখেছিলাম, তাই বললাম।

ইতালীর যুবশক্তির যে প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কথা বললাম,—বললাম মিলানের তরুণ ছাত্রদের কথা, যাদের শিক্ষকেরা ত্যাগ করেছে, বিশ্বাস-

ঘাতকতা করেছে,—লিবারাল উম্‌বের্তে জানোত্তি-বিআংকোর কথা, অসম্মানিত-বিবেক, লজ্জায় ও নৈতিক বেদনায় পীড়িত আদর্শবাদী মাজিনিপন্থীদের কথা,—নিহত জ্ঞানী আমেন্‌দোলার কথা,—নির্বাসিত এবং ঘাতকের ভয়ে সর্বদা ভীত সং সাল্‌ভেমিনির কথা,—ইত্যাদি। এবং দেখলাম রবীন্দ্রনাথের মুখখানা কুঁকড়ে গেল : কারণ তাঁর অসীম সংবেদনশীল মহৎ স্বভাব সত্যিকারের যন্ত্রণা এবং মানুষের উপরে অনুষ্ঠিত দৌরাত্ম্য সহ্য করতে পারে না। আমি মুহূর্তের জন্যে থামলাম। আমি জানি (সেদিন সন্ধ্যায় মহলানবীশ আমাকে তার যথাযথ দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন) —কোনো অতিপ্রচন্ড আবেগ সঙ্গে সঙ্গে কবির স্বাস্থ্যের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং দৈহিক ভাবে তাঁকে অভিভূত করে। (মহলানবীশ বললেন, অমৃতসরের ঘটনাবলীর পর যে যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথ যেন কয়েক সপ্তাহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ; তিনি আসন ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারতেন না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। একমাত্র বড়লাটকে লিখবার পরই স্বস্তি পেয়েছিলেন, সেই চিঠিতে তিনি ইংরেজের দেওয়া তাঁর খেতাব এবং সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন : "এ যেন বুকে-বেঁধা ছুরিটা খুলে ফেললাম।" এখন যেহেতু তাঁর স্বাস্থ্য গভীর ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, যতদূর সম্ভব, তাঁর আবেগ-অনুভূতিকে মাত্রায় রাখা হয়।)

কিছুটা নিস্তব্ধতার পর (চা খাওয়া হলো) কথাবার্তা আবার শুরু হলো, একটু পৃথক পথে :–রবীন্দ্রনাথই ভারতবর্ষের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের পক্ষে নিজেকে শাসন করা সম্ভব। বিদেশী শাসন এখনো সবচেয়ে কম খারাপ ; এবং সমস্ত বিদেশী শাসনের মধ্যে, মারাত্মক ভুলভ্রান্তি, সংকীর্ণতা ও উপলব্ধির অভাব সত্ত্বেও, ইংরেজ-শাসন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এ যদি চলে যায় ভারতবর্ষে তার স্থান নেবে আফগান অথবা জাপানী শাসন, তারা হবে সবচেয়ে খারাপ। মহাত্মাজীর (গান্ধীর) সঙ্গে তাঁর (চিন্তাধারার) পার্থক্যের কথা বললেন। গান্ধী ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর রাজনৈতিক ভুলগুলো আঁকড়ে আছেন। তিনি দেখালেন যে, খিলাফতের ব্যাপারে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সমর্থন করতে গিয়ে গান্ধী যা করেছেন, তাতে যা তিনি চেয়েছিলেন—সেই ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে কাজ করেননি, কাজ করেছেন ইসলামের ঔদ্ধত্য এবং শক্তির পক্ষে, এবং সেটাই হিন্দু-মুসলমানদের প্রচন্ড অশান্তির মধ্যে দিয়ে নিজে নিজে স্পষ্ট হয়েছে ; এ ব্যাপারে শেষোক্তরা ইংরেজ সরকারের গোপন সমর্থনপুষ্ট প্ররোচক। (সত্যি বলতে, মহলানবীশ দেখালেন, কলকাতার হালফিল অশান্তির সময় সরকারী কর্তৃপক্ষের মনোভাব ছিল জটিল, স্ববিরোধী এবং বড়ই এলোমেলো, কারণ সরকারী মহলে প্রায়ই থাকে বিরোধী প্রভাবের সংঘাত।) "অপবিত্র" ব'লে গান্ধীর বিদেশী বস্ত্র নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পুরনো ঝগড়াতেও রবীন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন : কারণ একমাত্র ধর্মীয় যুক্তিতে—(রবীন্দ্রনাথ বলেন : "পৌত্তলিক") —ভারতবর্ষের জনগণের হৃদয় স্পর্শ করা যায়, সব যুক্তির সেরা যুক্তি অর্থনৈতিক যুক্তি সম্পর্কে তারা অচেতন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'আপনি

কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে 'অপবিত্র' বস্তু ব'লে কিছু আছে ?''—গান্ধী সোজাসুজি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন (প্রায়ই তিনি তা ক'রে থাকেন) ; কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের জনগণের জন্যে তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সে তো জনগণের জন্যে মিথ্যার প্রয়োজনে বিশ্বাস করা ; এবং ভারতবর্ষের জনগণের যদি মিথ্যার প্রয়োজন থাকে, তার মানে, স্বাধীনতায় তার অধিকার নেই ; এ ইংরেজ-শাসনকে ন্যায়সঙ্গত ক'রে তোলে। সর্বশেষ আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে বলতে চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্যে তিনি কী আশা করেন। চিরকাল অত্যন্ত বাক্‌সংযমী গান্ধী বলেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তিনি ইংলন্ডের ঔদার্যের উপরে অত্যন্ত আস্থা রাখেন। তিনি আশা করবেন, ইংলন্ড তার সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন জাতের একরকম স্বায়ত্তশাসন দেবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর উপর মূল্য আরোপ করেন না এবং তিনি তা চানও না। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষ রাজনৈতিক জীবনে এখনো অনেক নিচু ধাপে আছে ; সে যদি ইংলন্ডের কাছ থেকে এ ধরনের উপহার পায়, তাহলে তা হবে বিনা যোগ্যতায় পাওয়া ; এবং সে অন্য ডোমিনিয়নদের তুলনায় এক মর্যাদাহীন অবস্থাতেই পড়ে থাকবে। তাঁর কাছে প্রথম জিনিস হলো, ভারতবর্ষকে তার স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হতে হবে, তার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এ তা থেকে অনেক দূরে ; এই যে-মাটি সে জুড়ে আছে, এই যে-রাষ্ট্রের কাঠামোর সে সুবিধা কুড়োয় (অবিচারগুলো সমেত), এর শৃঙ্খলা, এর উন্নতি, এর মূল্য-বৃদ্ধির কাজে সে একেবারেই হাত লাগায়নি। নিজের মাটিতে সে এক ভিক্ষুক হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভিত থেকে কাজ শুরু করতে হবে, বিজেতা ইংরেজের হাতে যা ধ্বংস হয়ে গেছে সেই পল্লীজীবন নতুন ক'রে গড়তে হবে। এরই জন্যে তিনি শান্তিনিকেতনের চারপাশের গ্রামগুলোয় কাজ করছেন। তিনি পল্লীসংস্কারের, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণের এক সম্মিলিত কৃত্যে বহুধা বিভক্ত গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন, ইতিমধ্যেই যে ফল পাওয়া গেছে তা চমৎকার ; সম্মিলিত নির্দেশে এবং সম্মিলিত কর্মের মধ্যে গড়ে-ওঠা আলোচ্য গ্রামগুলোয় মুসলমান ও হিন্দুরা সকলের মঙ্গলকে চিনেছে এবং সম্প্রতি কলকাতা থেকে মুসলমান প্রচারকেরা যখন এসেছে, সম্মিলিত ইচ্ছায় তাদের দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় : "আপনি গান্ধীর সঙ্গে নেই। তাহলে আপনার পরিকল্পনাটা কী বলুন। তাঁর বিরোধিতা করার মতো আপনার বাস্তব এবং কার্যকর কী আছে ?" তিনি উত্তর দেন : 'আমার জবাব কথায় নয়, কাজে। কিছু পরেই তা দেখা যাবে।' আমি বলি : উপরের (রাষ্ট্রের) সংস্কার অথবা নিচের (শেকড়ের) সংস্কার—এই দুই সংস্কারের মধ্যে দ্বিতীয়টি সুনিশ্চিতভাবে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী। তবু বাস্তব রূপ নিতে সময় লাগবে। আমাদের এই উন্মত্ত অস্থিরতা এবং অবিরত ধাক্কাধাক্কির যুগে সমস্ত আরব্ধ কর্মই কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের তালগাছের উপমায় উত্তর দিলেন, তার দশটি বছর লাগে ধীরে ধীরে শেকড় ছাড়াতে, তারপর হঠাৎ এগারো বছরে সে দ্রুত বেড়ে ওঠে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আবার মহলানবীশ এলেন। আমাকে আলাদা ক'রে ইতালীয় ফ্যাসিবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে বলার খুব আগ্রহ দেখাতেন। সফরের সমস্ত ঘটনার, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কথাবার্তার অতি সতর্ক বিবরণ তিনি লিখে রেখেছেন ; এবং তাঁর খাতা থেকে তিনি তা পড়ে শোনালেন।

রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে—(জঘন্যভাবে)—প্রতারিত হয়েছিলেন। ইতালিতে গত সফরের সময় (মিলান এবং জেনোয়ায়) তাঁর কাজ ছিল শুধু স্বাধীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে কিছু ছিল না। ডিউক স্কোত্তির মতো তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুরা ছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী ; এবং ভেনেতোর মতামতও ছিল তাই। ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল প্রবাহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; এবং মধ্য ইতালি ও রোমে তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়া বিচক্ষণের মতো হতো না। সেখানে অবশ্যই লজ্জাকর পরিস্থিতি এবং লাঞ্ছনার হাত এড়ানো যেতো না।

তারপর স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল মুসোলিনির চমৎকার চাতুর্য। গত শরতে শান্তিনিকেতনে এলেন দু'জন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ, তাঁদের একজন, বিশেষ ক'রে অধ্যাপক ফর্মিচি বহুদিন আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। (অপর জন অধ্যাপক তুচ্চ।) রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এলেন ইতালি সরকারের নামে, রবীন্দ্রনাথকে ইতালির শ্রদ্ধা জানাতে, উপহার হিসেবে ইতালীয় চিরায়ত সাহিত্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ এবং সরকারের অতিথি হিসেবে তাঁকে ইতালি যাবার আমন্ত্রণ নিয়ে,—মুসোলিনির কাছ থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়ে। দু'জনেই ছিলেন উগ্র মুসোলিনিপন্থী,—এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কাজে জড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—ফ্যাসিস্ট প্রচারের নিখুঁত দালাল। (মূল্যানুপাতে মানুষের এই কম অগৌরবজনক ভূমিকা, আমাদের আর আশ্চর্য করে না। আমরা বড়ো বড়ো বুদ্ধিজীবীকে জানি, তাদের পরীক্ষিত হতে দেখেছি ; আর এই কাহিনী শুনে ভাবছি : "আমাদের 'অমুক' কি ফরাসী ফ্যাসিবাদের স্বার্থে একই কাজ স্বীকার ক'রে নেবেন না ?")

রবীন্দ্রনাথ বিপদটি ভালো করেই বুঝেছিলেন ; এবং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ছাড়তে দ্বিধা করেছিলেন। দুষ্কর্মের সাঙাৎ দু'জন অনুকূল পরিস্থিতির জন্যে ওৎ পেতে ছিলেন। দেখা গেল, নির্ধারিত সময়ে, ইতালীয় জাহাজ ছাড়া অন্য আর কোনো জাহাজেই স্থান সংগ্রহ করতে পারলেন না, জাহাজটিকে বহাল করা হয়েছিল তাঁর ব্যবহারের জন্যেই। পরে কী হবে সে-সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনো কিছুই নির্দিষ্ট করা ছিল না ; সেই মুহূর্তের জন্যে তাকে গা ছেড়ে দিতে হলো। তিনি ভেবেছিলেন—এবং মহলানবীশেরাও ভেবেছিলেন—তাঁরা একসঙ্গে সফরে বেরুবেন। কেবল যাত্রার ঠিক পূর্বাহ্নে মহলানবীশেরা জানলেন, রবীন্দ্রনাথের জাহাজে আর অন্য কোনো স্থান নেই, তাঁদের অন্য জাহাজে যেতে হবে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গীদের থেকে আলাদা করা হলো, তাঁর সঙ্গীদের বিচারশীল মন প্রচারকদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ঘটাতে পারতো। তাছাড়াও, যাত্রার দু'দিন আগে মহলানবীশ

যখন অধ্যাপক তুচ্চিকে লিখেছিলেন ঠিক ঠিক জানতে সফরের পরিকল্পনাটা কী, রবীন্দ্রনাথ সরকারী ভাবে আমন্ত্রিত হবেন কি না, এবং তাঁর জন্যে কতদিন ধার্য করা হয়েছে,—অধ্যাপক তুচ্চি তখন কার্যসিদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন ডাঁট দেখিয়ে, এমনকি অসৌজন্যভরে।

মহলানবীশ যাত্রা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরে এবং তাঁর সঙ্গে মিলেছিলেন কেবল রোমে মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পরদিন। সাক্ষাৎকারটা ছিল নিছক সৌজন্যের, কিন্তু সেখানেই মুসোলিনি বিড়াল-তপস্বীর ভেক্ দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর দৈহিক চেহারা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন তাঁর কঠিন মাথায় খুলি, কপালের বিশেষত্ব মুখের উঁচুভাব বৈষম্য সৃষ্টি করেছে মুখমণ্ডলের নিচু দিকের সঙ্গে, মুখমণ্ডলে মিষ্টতার তিলমাত্র অভাব নেই এবং ক্ষণে ক্ষণে তা এক প্রীতিপূর্ণ ও অত্যন্ত মানবিক হাসিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। এই দ্বৈততা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।—মুসোলিনি ইংরেজী বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না। অধ্যাপক ফর্মিচি সবসময় তাঁর সঙ্গে থেকে, এক ইঞ্চি না সরে, তাঁর দোভাষীর কাজ করেছেন। মুসোলিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কতদিন রোমে থাকবেন ঠিক করেছেন। এবং পাঁচ ছয় দিন থাকবেন শুনে বলেছিলেন: "না, পুরোপুরি দশ পনরো দিন থাকা দরকার। আমি চাই যে আপনি প্রাচীন রোমের পাশেই দেখুন নতুন রোম আর তার বিড়াট উন্নতি।" তিনি বলেছিলেন: "আমি তাদেরই একজন যারা আপনার সমস্ত লেখার ইতালীয় অনুবাদ পড়েছে এবং আপনার অতিগুণগ্রাহীদের অন্যতম।"—দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির কিছু সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কে মুসোলিনির সঙ্গে আলোচনায় নেমে পড়েছিলেন কবিজনোচিত স্পষ্ট নিশ্চয়তা নিয়ে, তিনি বিদেশী ব'লে যার জন্যে পার পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কথা হয়েছিল স্বাধীনতার সঙ্গে কর্তৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে। মুসোলিনি বলেছিলেন, এমন ঐতিহাসিক ক্ষণ আছে যখন শান্তি শৃঙ্খলা এবং জনগণের কল্যাণ ডিক্টেটরীয় ক্ষমতার দাবি জানায়, তখন কিছু বিশেষ স্বাধীনতাকে মুলতুবি রাখতেই হয়; অবশ্য তা হবে এক সাময়িক চরিত্রের, রবীন্দ্রনাথ সায় দিয়েছিলেন শুধু এই কথা ব'লে যে দু'টির ব্যাপারে আপস করা অসম্ভব: একটি নিষ্ঠুরতা, অপরটি মিথ্যা। ভেকধরা ভণ্ড, ধড়িবাজ দুচে ঘাড় নেড়েছিলেন। নরম হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আপনার সম্পর্কেই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী মন্দ কথা বলা হচ্ছে।" অপর জন নিরীহভাবে উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি তা জানি। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।" তখন রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি এসেছিলেন প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে, কিন্তু ইতালি আসার পর যা কিছু দেখেছেন এবং শুনেছেন, তাতে তাঁকে মানতেই হবে যে, এই দেশে এবং এই সরকারের আমলে অনেক জিনিস হয়েছে যা ভালো: শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি (?), অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশের সুযোগদান, বুদ্ধিগত ক্রিয়াকর্মে বা জনকল্যাণের উপযোগী প্রচেষ্টায় সরকারী সমর্থন…ইত্যাদি।—অধ্যাপক ফর্মিচি ছিলেন মুখ্য সংবাদদাতা, তিনি এইসব বিকৃত ক'রে, প্রকাশ্য

সভার বক্তৃতায় বা সংবাদপত্রের মন্তব্যে (যা রবীন্দ্রনাথ এখনো পড়েননি,)—ফ্যাসিবাদকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি প্রশংসা করেছেন, ইতালির মহিমার পুনরভ্যুদয়কে ফ্যাসিবাদের প্রতি আরোপ করেছেন ব'লে সাত-তাড়াতাড়ি রটিয়ে দিয়েছিলেন।—কথাবার্তার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : জগতের কাছে ইতালির সর্বোচ্চ চিন্তার প্রতিনিধিত্ব যিনি করেন ব'লে আমরা জানি, সেই বেনেদেত্তো ক্রোচেকে না দেখে আমি ইতালি ছেড়ে যেতে পারি না।" অধ্যাপক ফর্মিচি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন : "তা সম্ভব নয়; তা সম্ভব নয়।" এক রাজকীয় ভঙ্গিতে মুসোলিনি তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন : "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমরা তাঁকে টেলিগ্রাম করছি।"—এইভাবে বেনেদেত্তো ক্রোচে এসেছিলেন প্রভুর হুকুমনামায়। তিনি এসেছিলেন এবং তিনি মুখ বুঁজে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন শুধু আত্মাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু জানেননি।

যাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পেরেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ফ্যাসিবাদের ঘোষিত উৎসাহী সমর্থক বা, সুচিন্তিত কারণে তার অনুগত,—সকলেই, শুধু একজন বাদে : মিলানে রবীন্দ্রনাথের পুরনো বন্ধু ডিউক স্কোত্তি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : "মুখ বন্ধ। কথা বলা নিষেধ।"—অধ্যাপক ফর্মিচি একইভাবে গোয়েন্দার মতো রবীন্দ্রনাথের পাশ আগলে ছিলেন, বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : "ওই, ডিউক স্কোত্তি, সবসময়ে ওঁর সবকিছুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।"…—মাত্র একজন স্বাধীনচেতার সঙ্গে, স্বাধীন যুবশক্তির মাত্র একজন প্রতিনিধির সঙ্গেও আদান-প্রদান অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ যখন রম্যাঁ রলাঁর বন্ধু মাদাম আ-র কাছ থেকে—যাঁকে তিনি জানতেন না—তাঁর বাড়ীতে এসে সন্ধ্যা কাটানোর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, বিনা দ্বিধায় তিনি এসেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর আশা ছিল রম্যাঁ রলাঁর বন্ধুর মুখ থেকে তিনি কিছু স্বাধীন বক্তব্য শুনতে পাবেন। কিন্তু তখন…মাদাম আ একজন উগ্র মুসোলিনিপন্থী বনে গিয়েছেন; এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত করেছিলেন এক ইংরেজ ক্যাথলিককে, যিনি হয়ে উঠেছেন ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে চরমপন্থী, গোঁড়া তাত্ত্বিক (বাংলাদেশের কার্যরত গভর্ণর লর্ড লিটনের এক তুতো ভাই)। (লক্ষণীয় যে, হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন, যিনি জার্মানিতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরমতম—নির্বুদ্ধিতার পর্যায়োক্ত—তাত্ত্বিক, তিনি একজন ইংরেজ।) এক্ষেত্রে বিশ্বাসের অপব্যবহার করা হয়েছে, আমি মাদাম আ কে ক্ষমা করার ধারে কাছেও নেই।

যিনি ফর্মিচির সম্পর্কে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন, (রবীন্দ্রনাথও নিজে ফর্মিচি সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়েছেন)—সেই মহলানবীশ বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন আসাজিওলি নামে এক তরুণ দার্শনিকের উপরে; মারকাটের সময় সুইজারল্যান্ডে স্বল্প দিনের জন্যে তাঁকে জেনেছিলাম; বাস্তবিক পক্ষে তিনি বুদ্ধিমান এবং সৎ, কিন্তু দুর্বল চরিত্রের। তাঁকে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আসাজিওলি বলেছিলেন যে, এই প্রশ্নে তিনি বহুদিন অন্তরে অন্তরে পীড়িত হয়েছেন এবং

এক বেদনাদায়ক মানসিক সংকটের পর তিনি অবশেষে ভিড়েছেন ফ্যাসিবাদের পক্ষে, যোগ দিয়েছেন এক প্রয়োজনের পক্ষে। সব সময়েই সেই পুরনো কৃত্রিম যুক্তি ঃ বিশৃংখলার চেয়ে অবিচার ভালো এবং জনকল্যাণের বেদিতে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করতে হবে। সবসময়েই আতশ কাঁচে বড় ক'রে দেখিয়ে একই রকম হলফ ক'রে বলা ঃ "জনগণ চায়,…" "জাতি…" "ইতালি…,"--এদিকে কিন্তু যারা বলে তাদের কারুর সারাজীবনেও গন্ডা কয়েকের বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, এবং সংবাদপত্রের মুখ বাঁধা থাকায় কোনো কন্ঠস্বরই শোনাতে পারা যায় না। এই যুক্তিগুলোই বরং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্বলতায় ছাপ ফেলেছে মনে হয়। এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আমি প্রচন্ড আক্রমণ চালালাম (কারণ বৃদ্ধ, পীড়িত রবীন্দ্রনাথ সামনে না থাকায় তরুণ ও শক্তসমর্থ মহলানবীশের কাছে আমার রাখাঢাকার কিছু নেই)। আমি আবার পুংখানুপুংখরূপে বলতে শুরু করলাম ফ্যাসিবাদের অপরাধ ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগগুলো, নতুন ক'রে বর্ণনা করলাম ফ্যাসিবাদের শিকারদের—মাত্তেওত্তি, আমেনদোলা, হাজার হাজার নিরীহ নির্যাতিতের কাহিনী ; যে-স্বেচ্ছাচারী শক্তি জাতিকে মিথ্যাচারে বাধ্য করে, তার হাতে একটি জাতির অধঃপতনকে আমি সর্বোপরি ধিক্কার দিলাম। আমি বললাম, একটা শক্তির মূল্য বিচার হয় তার (দলীয়) বিরোধিতার মূল্য দিয়ে ; আর ফ্যাসিবাদ তার বিরোধিতাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করেছে, কোনো একটি কথা—একটি মাত্র স্বাধীন কথায় তার এমনই ভয় যে, একমাত্র তার ইচ্ছা প্রকাশ ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশকে সে সহ্য করে না। একটি সংবাদপত্র নেই,—একটিও না। অধ্যাপকের একটিও পদ নেই পাশ্চাত্যে কখনো এমনধারা স্বৈরতন্ত্র চিন্তাকে গুঁড়িয়ে দেয়নি। এমনকি ঘোর যুদ্ধের মধ্যেও জার্মান সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সম্মান রক্ষা করেছে। ফ্যাসিস্ট শপথবাক্যের বাধ্যবাধকতা, বিবেকের বিশ্বাসঘাতকতা—যা এমনকি চাপানো হয়েছে অরাজনৈতিক ব্যাঙ্ক, জনকল্যাণমূলক কাজ, যাজক, সন্ন্যাসীদের উপরেও—তা চতুর্দশ লুইয়ের থিওক্র্যাটিক স্বৈরতন্ত্রকেও ছাড়িয়ে যায়। ফল কী হতে পারে? বলা হয় সাময়িক স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজনের কথা, জনগণ যতক্ষণ না স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হবে—ততক্ষণ পর্যন্ত! কিন্তু কবে আসবে এই ততক্ষণ—যদি কখনো আসে,—কী হয়ে উঠবে এই জনগণ? অধঃপতিত, অবনমিত, নিজের ও জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, অবজ্ঞেয়, ও অবজ্ঞাত, নিজেকেই অবজ্ঞাকারী। তার আত্মাকে হত্যা করা হবে। সে আর মাথা তুলবে না।

২৫ জুন, ১৯২৬। দিনটা ঝড়ের। (কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি দিনও বিনা ঝড়ে আর বিনা বৃষ্টিতে যায়নি।) মার্তিনে, রবীন্দ্রনাথের ছেলে আর তাঁর ছেলের স্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশ। দু'জনকে আমাদের এতো ভালো লাগে। ছেলে মানুষটি সুন্দর (মুখের চেহারা বাবার চেয়ে কম ধারালো এবং বেশি তামাটে), বিস্ময়করভাবে সৌজন্যপরায়ণ, নিজের উপর দখল রাখেন এমন এক বিনয়ের অধিকারী যা

পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। মনে হয় যেন বাবার সেবায় নিজের জীবনকে নিয়োজিত করতে, বৈষয়িক উদ্বেগ থেকে তাঁকে বাঁচাবার কাজে, এবং কাজের সবচেয়ে অপ্রশংসার দিকটা নিজের ভাগে নিতে, নিজেকে তিনি স্বেচ্ছায় মুছে ফেলেছেন। তরুণী স্ত্রীটিও এক প্রাণবন্ত ও প্রশান্ত বুদ্ধিমত্তার এক অতি সঙ্গত ও সূক্ষ্ম শিল্পরুচির অধিকারিণী; তিনি সরল, স্বামীর মতোই একই রকম নিজের উপর দখল রাখেন, এবং তাঁদের দু'-জনেরই রবীন্দ্রনাথের মতো এক পরিশীলিত স্বাতন্ত্র্য আছে। রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠী এবং যে-সমস্ত ভারতীয়কে আমরা দেখেছি (তাঁদের বুদ্ধিমত্তার মাত্রা যাই হোক্ না কেন)—তাঁদের মধ্যে ভঙ্গির, স্টাইলের পার্থক্য আছে, বলা চলে, সে-পার্থক্য পঞ্চদশ লুইয়ের রাজসভার এক রমণী এবং আজকের পারীর এক রমণীর মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই বিরাট। এটি সর্বোচ্চ ভারতীয় আভিজাত্য। তাঁদের সঙ্গে বাগানে কয়েক পা হাঁটলাম, আমাদের বাড়ি দুটো দেখালাম, ছবি আর ছোট-খাটো শিল্পকর্মগুলোর সামনে থেমে, শ্রীমতী ঠাকুর তাঁর তৎপর নির্ভুল দৃষ্টি দিয়ে তাদের সমালোচনা করলেন। তাঁর স্নেহমাখা সুন্দর চোখদুটি আর সুরেলা, মিষ্টি, শিশুর মতো হাল্কা হাসি; সে-হাসি ঝরে পড়ে, দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তিন ঘন্টা পরে আবার রবীন্দ্রনাথের ওখানে, চা খেলাম তাঁর সঙ্গে। পাঁচজন ভারতীয়ের গোটা দলটি—কথাবার্তার সময় বসে, সবসময়ে যেমন তেমনই আমার বোন তর্জমা করল। তা শুরু হলো রবন্দ্রনাথকে শার্ল বোদ্‌লেয়্যার একটি কবিতা পড়ে শোনানো দিয়ে, কবিতাটি তাঁকেই উৎসর্গ করা। তারপরই কবি আলোচনা শুরু করলেন গতকালের বিষয়গুলো নিয়ে। তখনো তিনি ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বলতে মোটেই ইচ্ছুক নন। সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি এ বিষয়ে কয়েকদিন ভাবতে চান। কিন্তু আমরা জানি, আমার কথাগুলো তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। গত সন্ধ্যায় আমাদের ওখান থেকে ফিরে আমি যা বলেছি, মহলানবীশ সব তাঁকে জানিয়েছেন, এই প্রথম তিনি ইতালীয় সংবাদপত্রগুলোর অংশগুলো তাঁকে পড়ে শুনিয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ সেগুলো চিনতেই পারেননি,—তাঁর কথাগুলো বিকৃত করা হয়েছে, এবং ইতালিতে তাঁর উপস্থিতিকে দেখানো হয়েছে ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর সম্মতি ও উৎসাহের আনুষ্ঠানিক কর্ম হিসেবে। এতে ররীন্দ্রনাথ রুষ্ট হয়েছেন। কয়েকদিন চিন্তা করার পর তিনি ঠিক করবেন এ সম্পর্কে উত্তর দেবেন কি না।

আজকের আলোচনায়, বিষয়ের সামান্য দিক্‌গুলোতেই আবদ্ধ থেকে (সেটি তাঁর - একটু বেশি—প্রবণতা) তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জানতে চান, সভ্যতার অবক্ষয়ের অবস্থায়—যে-অবস্থা তিনি ইউরোপের উপর আরোপ করেন,—হিংসার বর্বরতা ইউরোপকে নববলেবলীয়ান-করার-জন্যে-ঘটা এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি না, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল বর্বরদের আক্রমণ এবং উদ্দাম (sauvage) ও প্রচন্ড আবেগময় রেনেসাঁসের সময়। আমি শুরু করলাম তুলনার মাত্রাগুলোর ঐতিহাসিক যথাযথতার আলোচনা দিয়ে। বললাম, বর্বররা যদি রোমান সভ্যতাকে নববলে বলিয়ান ক'রে থাকে, তা করেছে প্রকৃতপক্ষে তাকে ধ্বংস ক'রে নয়, নিজেদের স্বার্থে তাকে গ্রহণ ক'রে, এবং তাতে নতুন রক্ত সঞ্চারিত ক'রে। (পশ্চিমের বর্বরশিল্পের ক্লাসিক পূর্ণাঙ্গতার

দু'টি উদাহরণ আমি দিলাম : রোমানদের গ্রহণ-করা গ্রেগোরিয়ান গান ; এবং নিখুঁত চমৎকার মেরোভিঞ্জীয় সোনার কাজ, যার একটা সুকুমার নমুনা আমরা সেদিন স্যাঁ-মোরিসএর মঠে দেখিয়েছি।) আর ইতালীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে "শাস্ত্রসম্মত" শিল্প : চিত্রভাস্কর্য ইত্যাদি—যাকে এ আনুকূল্য দিয়েছে এবং সাহিত্যে ও দর্শনে মনের স্বাধীন বিস্তৃতি, যা দ্রুত স্তব্ধ হয়ে গেছে,—এদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আমি লেওনারের বেদনাময় ধাঁধার কথা বললাম, নিজের মধ্যে তিনি গুটিয়ে থেকেছেন, আগলে রেখেছেন তাঁর অতিস্বাধীন প্রতিভাদীপ্ত মনের রহস্য, চিন্তাকে গোপন রেখেছেন উল্টোঅক্ষরে-লেখার আড়ালে, বিজ্ঞান বা শিল্প সম্পর্কে নোটগুলোর মধ্যে উৎসারিত হতে দিয়েছেন দীর্ঘনিঃশ্বাস অথবা তিক্ততা আর যন্ত্রণা আর্তনাদ। এবং আমি দেখলাম, আরও একবার, মহিমাময় সংবেদনশীল মুখমন্ডল কুঞ্চিত হয়ে গেল : এই ধরনের যন্ত্রণাতেই তাঁর মর্ম স্পর্শ করে।

তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে এলো তাঁর নিজের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং ভারতবর্ষের বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে। তিনি তাকে দেখছেন, - তিনি তাঁর দেশের মানুষের বর্তমানকে, ভবিষ্যৎকে দেখছেন সবচেয়ে নৈরাশ্যকর দিনের মধ্যে। বিচ্ছিন্ন বহুজনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। জাত-বেজাতের এই ধুলোর মধ্যে কোনো ঐক্য-চিন্তা অসম্ভব, সর্বত্র এরা মিলেছে, - মিশে যেতে সক্ষম হয়নি। যখন তা একবার চেষ্টা করছে,—যেমন মহাত্মাজীর চেষ্টা,– তাদের মিলন ঘটাতে, বাধ্য হচ্ছে তাদের মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এবং এই আপসই তাকে সংক্রমিত করছে, তার গতি ভঙ্গ করছে। হ্যামলেটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেন এক বিশ্বজনীন ট্রাজিডি। এ এক মহান্ আদর্শবাদীর জীবননাট্য যিনি তাঁর কর্তব্য সাধন করতে চেয়েছিলেন অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে, এবং এমনকি অভিপ্রায়েও, অপরাধের অংশ নিতে-না-নিতে তিনি ধ্বংস হয়ে গেলেন ; তাঁর নিজের বিশুদ্ধতার সঙ্গে তিনি হারালেন তাঁর শক্তি এবং তাঁর অস্তিত্বের যুক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে (বরং তাঁর চোখে) এই হচ্ছে গান্ধীর জীবননাট্য। বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর যে-আপস তাঁকে ইংলন্ডের জন্যে সৈন্যসংগ্রহে নামিয়েছিল, তখন থেকেই এটা ছিল নৈতিক অধঃপতন (রবীন্দ্রনাথের ধারণায়)। এইভাবেই তিনি বিশ্বস্ত মনে তাঁর জনগণের মুক্তির মহৎ লক্ষ্যসিদ্ধির কথা ভেবেছিলেন। সেটা বৃথাই। সেই একই রকম, যখন তিনি মহৎ পরিকল্পনার অলৌকিক সিদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট ও আশু দিনক্ষণ স্থির করেছিলেন। এইভাবে তিনি আপাত-পৌত্তলিক ব্যঞ্জনার উপায়গুলোকে খেলিয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করেছিল। এই বিশ্বাস-প্রবণতার সংক্রমণে হাজার হাজার জনকে, তাঁর দেশের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যেতে দেখে ভীত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মহত্তম জীবিত শিল্পী এবং উচ্চ চেতনার অধিকারী ব'লে মনে করেন—অলৌকিক তারিখটির কম্পিত প্রতীক্ষায় ছিলেন ; এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন, এ সম্পর্কে সন্দেহ করলেও তিনি দুঃখ পাবেন। তারিখটি বৃথাই পেরিয়ে গেল ; এবং

এইটিই হলো ব্যর্থতা। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, গান্ধী এবং গান্ধীবাদ আজ সত্যের মূল নীতির বিরুদ্ধে আচরিত ভুলগুলোর বেদনা বহন ক'রে চলেছে। কিন্তু পক্ষান্তরে, কবি হয়ে যিনি এই সংক্রমণে অংশ নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সবচেয়ে ঘৃণার, সবচেয়ে খারিজ-করা মানুষ, এখন তিনিই তাঁর আপসবিরোধী মনোভাবের সুফল জড়ো করছেন। –(আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য করছি না, এবং ব্যতিক্রম ছাড়া, শুধু রবীন্দ্রনাথের মতই লিখে যাচ্ছি।)—তাঁর দেশের মানুষ সম্পর্কে যে নৈরাশ্য তিনি ব্যক্ত করলেন, তার বিরুদ্ধে আমি পাল্টা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলাম। আমি বললাম যে, সাধারণ মানুষের কাছে বেশি দাবি করা উচিত নয়। কোনো বিশ্বাস বা কোনো আদর্শের জন্যে জনসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনার তুঙ্গে ওঠে শুধু থেমে থেমে, অত্যন্ত অল্পকালের জন্য ; তারপর তারা আবার গিয়ে পড়ে তাদের স্বভাবসিদ্ধ অনীহায়। ধারাবাহিকতা থাকে তাদের বোধের ঊর্ধ্বে শুধু মহৎ আদর্শবাদী, প্রচারক আর শহীদদের বংশধরদের মধ্যে, যারা দূরে থেকে দূরান্তে মশাল তুলে নিয়ে যায়। বিষণ্ণভাবে রবীন্দ্রনাথ বললেন, যে-ধারাবাহিকতা এই বংশধরদের ছিল, যে-ধারাবাহিকতা ইউরোপে এই বংশধরদের চিরকাল আছে, সেই ধারাবাহিকতা এই বংশধরদের এশিয়ায় পাওয়া দূরের কথা। ভৌগোলিক গঠনের কল্যাণে সংক্ষিপ্ত আয়তন এবং জলহাওয়ার কল্যাণে ইউরোপ এক আনুকূল্য লাভ-করা মহাদেশ। এখানে মানুষের প্রচেষ্টা বেশি বাধা ছাড়াই তার সমস্ত ফল বিতরণ করতে পেরেছে ; তার জাতিগুলো যত বিভিন্নই হোক্, সকলের মধ্যেই আছে এক নৈতিক আত্মীয়তা, যারা একের জন্যে ব'লেও সকলের জন্যে বলে। কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলের পিঠভাঙা বোঝা বয়ে চলেছে। জাতিগুলো হয়েছে রক্তশূন্য ; জলহাওয়াতেই তাদের শক্তির সেরা অংশ শুষে নেয় ; রোদ, বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, রোগ, প্রবল শক্তিশালী প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তিকে ধ্বংস ক'রে ফেলে। একমাত্র বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বই নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছেন, তাঁরা এসেছেন প্রায় সব সময়েই নিম্নশ্রেণী থেকে, কদাচিৎ এসেছেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে। কিন্তু তাঁদের আহ্বান চিরকাল প্রায় বিনা সাড়াতেই পড়ে আছে ; স্বর্গের দিকে তাকিয়ে এ এক আর্তনাদ ; এবং এক বিপুল নৈঃশব্দও তাকে গ্রাস করেছে। ভারতবর্ষের আদর্শবাদীরা এক নির্জনতা চেনেন, যার কোনো ধারণা ইউরোপের আদর্শবাদীরা করতে পারেন না ; তাই, তাঁরা ইউরোপের আদর্শবাদীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, (রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ 'তার জন্যেই আমি এখন এসেছি ইউরোপে, আপনাদের কাছে'), তাঁরা প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে, তাঁদের স্বার্থকে, এশিয়ার স্বার্থকে তাঁদের হাতে তুলে নিতে,—সে-স্বার্থ ইউরোপের স্বার্থও বটে ; কারণ সবই পরস্পরনির্ভর, দেহের কোনো একটি অঙ্গের অসুখ গোটা দেহযন্ত্রকেই আক্রমণ করে। আমার উদ্দেশে বলা এই আবেদনের করুণ দিকটি আমি উপলব্ধি করি। এবং একই সঙ্গে আমি উপলব্ধি করি আমার শক্তি (ইউরোপের শক্তি) এবং আমার দুর্বলতা। আমরা সংখ্যায় বড়ো কম, এবং কত ঐকাহীন ; কিন্তু (ইউরোপের) আমাদের মধ্যে আছে—এবং আমি তা

রবীন্দ্রনাথকে বললাম—এক দুর্জয় কর্মশক্তি। আর তা এলো কোথা থেকে? কর্মের এক শৃঙ্খলা এবং নিরন্তর সংগ্রাম থেকে, যা আমাদের পুরোপুরি শেখানো হয়েছে শৈশব থেকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। নিজের মধ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে, বাইরের নীচতা এবং অনীহার বিরুদ্ধে বিনা-সন্ধিতে সংগ্রাম। খ্রীস্টের বাণীর এক ঐতিহ্য—ব্যাখ্যাত হয়েছে ইউরোপের জাতিদের দ্বারা, যারা গড়ে উঠেছে কর্মের জন্যে। অবশ্য আপেক্ষিক ভাবে আমবা ভৌগোলিক ভবিতব্যের আনুকূল্য লাভ করেছি। কিন্তু (ভারতবর্ষের চেয়ে দুর্বলতর মাত্রায়) স্পেন ও দক্ষিণ ইতালি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবশ্যম্ভাবিতাকে জেনেছিল, যা ভারতবর্ষের সমতুল্য ধ্বংসের মধ্যে তাদের দ্রুত ঠেলে দিয়েছিল। শুধু যে জনসংখ্যা কমে গেছে তা নয়, শুধু যে বাস্তব ঐশ্বর্য অদৃশ্য হয়েছে তা নয়, মাটি নিজেই মরে গেছে,—এই স্পেনের মাটি, এই সিসিলির মাটি,—যে-মাটি ছিল জগতে সব চেয়ে ঐশ্বর্যবতী এবং মহত্তম জাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত। মধ্যযুগের বর্বরতমেরা এই মানুষগুলোকে এবং এই মাটিকে আজকের দিন পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ ক'রে রেখেছে। অবশ্য, ২০ বছর হলো তারা নতুন জন্মলাভ করেছে। আমরা দেখছি আগুনের স্ফুলিঙ্গকে নিজেই জ্বলে উঠতে,—যা, তাহলে, তাদের মধ্যে মরে যায়নি! তার কারণ তারা কখনো—এমনকি তাদের শ্মশানশয্যাতেও—পাশ্চাত্যের খ্রীস্টিয় ও সংগ্রামী আত্মার এই অগ্নিকণাকে হারায়নি—যে অগ্নিকণাকে কিছুই নেভাতে পারে না। ভারতবর্ষে এমনটি কেন হবে না? কেন সে এই কর্মশক্তির চর্চার এই বীরোচিত শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করবে না? সবসময়েই সেই এক উত্তর ঃ ভারত মহাদেশের সর্বনাশা অবস্থা, তার বিশালত্ব, তার সব রকম রক্তের বিকট জগাখিচুড়ি, নিজেকে সংগঠিত করার অক্ষমতা… (ঈর্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে পড়িয়ে দেন এর বিপরীত দৃষ্টান্ত জাপানকে,—যে তার সভ্যতা থেকে সংগঠিত—ইউরোপের সবচেয়ে ত্রুটিহীনের চেয়েও উচ্চ স্তরের—বিস্ময়কর ঐক্যের জন্যে তার ক্ষুদ্র আয়তন এবং তার বাছাই-করা জাতিগুলোর কাছে ঋণী।)—একমাত্র যে জিনিস ভারতবর্ষের বিচিত্র জনতাকে একত্র করতে পারে তা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতি তার মুগ্ধ আকর্ষণ। কিন্তু জনতার মনে এই ব্যক্তিত্বগুলো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় পৌত্তলিক ভাবাপন্ন, এবং তাদের আসল কাজটাই নস্যাৎ হয়ে যায়। পারস্পরিক আদানপ্রদানে অসমর্থ সেই পাশাপাশি-থাকা জাতিগুলোর জগাখিচুড়ির অন্তহীন ট্রাজিডি! শুধু বাংলাদেশেই নয়, শান্তিনিকেতনের চারপাশে, ভারতীয়—আদিম অবস্থায়-থাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয়, দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোল, নেগ্রয়েড জাতিগুলো পাশাপাশি থাকে। এবং গান্ধী যদি কঠোরভাবে "অস্পৃশ্যতার" অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করেও থাকেন, তিনি কখনো বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চাননি (এটি সেই বিষয়গুলোর অন্যতম, যে-বিষয়ে গান্ধীকে ক্ষমা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন)। এটা গান্ধীর পক্ষে নিঃসন্দেহে সুযোগের প্রশ্ন। এই মুহূর্তে তিনি চান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে, যা আপেক্ষিকভাবে সহজ। এখনই তিনি অন্তহীন জটিল এবং অতি বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যাকে আক্রমণ করতে চান না। রবীন্দ্রনাথ

বললেন, কিন্তু সামাজিক সমস্যা সমাধান না ক'রে কী ক'রে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে? এ হচ্ছে বালির প্রাসাদ গড়া !

(বর্ণবিভেদ সম্পর্কে ভাবনার এই প্রতিফলনগুলোর উদ্ভবের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, পাশ্চাত্যের নিরন্তর পুনরুজ্জীবনের অন্যতম উৎস ছিল এইটেই যে, চার্চের কল্যাণে—রাজবংশের কল্যাণে যদি নাও হয়—বিভিন্ন জাতির এবং, এমনকি, অবস্থার সাম্যের নীতি সবসময়ে রক্ষিত হয়েছিল। চার্চের সর্বময় কর্তা জন্মগতভাবে শূকরপালক অথবা কৃষ্ণকায় বা সেমিটিক জাতি থেকে উদ্ভূত হতে পারতেন। জীবন ও প্রতিভাকে অবারিত করার কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না।)

রবীন্দ্রনাথ যখন কথা বলছিলেন আমি তাঁর প্রশান্ত টকটকে মুখখানা দেখছিলাম ; মুখখানিতে সবকিছু সুসমঞ্জস : এমনকি যে বলিরেখাগুলো শৃঙ্খলা-হীনতায় ও অসমতায় মুখের বেশির ভাগ অংশকে বিকৃত করেছে, তারাও—রেখাগুলো কেন্দ্রাভিমুখী ঢেউয়ের সুন্দর রেখাগুলোর মতো ; নাকের সবচেয়ে কাছের গুলো 'পর্চের' (porche) আকারে সমান ভাবে ফ্রেম পরিয়ে রেখেছে বাড়ির দরজার মতো। —আর যেগুলো উপর থেকে এসেছে, একই কেন্দ্রের চারধারে নিজেদের বিন্যস্ত করেছে। মনে হচ্ছে এরা নিজেরা মুছে যাচ্ছে হাওয়ার নীচে ঢেউয়ের মতো, কখনো জমাট বাঁধছে না, কঠিন হয়ে উঠছে না।

আর তাঁর কথা,—যে-কথা তিনি শুনতে খুব ভালবাসেন বা যে-কথাকে তিনি খেলান ধীর, সুমিষ্ট, তরল অতি-ধারাবাহিকতায়,—(তিনি জন্মবক্তা, চিন্তাকে ভাষা দিয়ে চলেন উঁচু গলায়, নিচু গলায়—অপরের সামনে—"সঙ্গের" চেয়ে অনেক বেশি "সামনে")—সেই কথা সম্পর্কে আমি লক্ষ্য করলাম, হয়ত অবচেতন প্রচেষ্টা বা দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে, তাঁর প্রতিটি একালাপ (যাকে তিনি মনে করেন সংলাপ) শেষ হয় তাঁর প্রাথমিক চিন্তায়—প্রায় প্রাথমিক বাক্যটিতে ফিরে এসে (কখনো কখনো তা ফিরে আসে দূরগত ও অনপেক্ষিত সংক্রমনে)।

২৬ জুন, ১৯২৬। আমাদের এখানে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মহলানবীশ এবং ত্রিপুরার তরুণ রাজকুমারের প্রাতরাশ। সব সময়েই এই স্বাভাবিকতা এবং শালীন আন্তরিকতা এই ক্ষুদ্র চক্রে আমাদের প্রীত করে। এই তিন জনের মধ্যে সব দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষ্য করার মতো হচ্ছেন তরুণ রাজকুমার। গতকাল রবীন্দ্রনাথের ওখানে আমার বোন বোদুয়ঁ্যার কবিতা (তাঁরই করা ইংরেজি তর্জমা) পড়ে শোনানোর সময় তিনি যখন শুনছিলেন, আমি তাঁর সহজ অবস্থার মুখখানি দেখছিলাম আর তারিফ করছিলাম : তাঁকে লক্ষ্য করা হচ্ছে জানতে না-পারায় তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জাতের চরিত্রটি : এক সতর্ক চিতাবাঘ, রেখাগুলো কেমন পিছনে টানা, টানটান, চোখদুটো শক্ত ও কঠিন। আজ তিনি জাগতিক সচেতন মানুষ, হাস্যময় এবং মার্জিত। তিনি গল্প করছেন তৎপরতা ও খুশির সঙ্গে ; কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে তাঁর চোখে বন্য ঝলকানি দেখা দিচ্ছে,—এই

যখন তিনি রসিকতা ক'রে বলছিলেন যে, অন্য সময় ভারতবর্ষের রাজারা খুব ভালো হতো, কারণ তা না হলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া হতো এবং একাধিরাট পানভোজন হতো ঃ তাঁর রাজত্বে একদিনে দু'জনকে রাজা করা হয়েছিল (এবং খারিজ করা হয়েছিল—অর্থাৎ হত্যা করা হয়েছিল) ; এবং গল্পের এই মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি যেন ঠিক ছুরির মতো এসে আঘাত করলো। আমার বোনকে বললেন একটা চিতাবাঘ অথবা একটা সিংহের বাচ্চা পাঠিয়ে দেবেন। উত্যক্তকারীদের দরজার মুখে আটকাবার পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে একটি সুপ্রস্তাব। কিন্তু ভিলন্যাভের মিউনিসিপালিটি এ ব্যাপারে কী বলবে ?—এটি এখনো শিকার করার প্রশ্ন, এই শিকারই তাঁর নেশা ; এবং তিনি আমাদের কাছে জঙ্গলে-গর্জনকরা বাঘের স্মৃতি জাগিয়ে তুললেন। কিন্তু তিনি আর্ট সম্পর্কেও বললেন, আর্ট তাঁর অপর নেশা ঃ কাঠের উপরে কাজ বা মডেলিং ঃ তাঁর নমুনা দেখাবেন, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অধ্যাপক মহলানবীশ মারাত্মক অনুসন্ধিৎসু এবং তার্কিক। তার হাতে পড়তে দেখলে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তিবোধ করেন। তিনি বলেন ঃ "ও ওঁদের মেরে ফেলবে।" এবং তাঁর স্ত্রী রসিকতা করেন। মহলানবীশ কিন্তু ঠান্ডা মেজাজে হাসেন এবং বিচলিত না হয়ে, যেখানে ছেড়েছিলেন, সেখান থেকেই প্রশ্নগুলো আবার তুলে নেন, যেখনে শেষ হবার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, সেখানে পৌছুতে কিছুই তাকে আটকাতে পারে না। আজকে নতুন ক'রে আলোচনা ফ্যাসিবাদ নিয়ে। মহলানবীশ বললেন, স্বভাবে জনমতের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী ও একজন অপ্রিয় মানুষ হওয়ার জন্যে (গান্ধীবাদী অসহযোগের বিরোধিতার ফলে ভারতবর্ষে তিনি তাই) তাঁর সহানুভূতি যায় সালভেমিনির দিকে ; কিন্তু তার জিজ্ঞাসা, কোন্ পদ্ধতি, কোন্ দলীয় সরকারকে দিয়ে ফাসিবাদের বিরোধিতা করা যায়। সংসদীয় পদ্ধতি সম্পর্কে ফ্যাসিবাদী সমালোচনায় তাঁর সায় আছে, এবং তাঁর মনে হয় না, বিরোধীদলহীন কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বহীন সংসদীয়বাদের অন্তর্বর্তী কোনো দলকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি বললাম, গোটা ইউরোপেই সংসদীয়বাদের সংকট আজ প্রকট, কিন্তু এক অতিরেক থেকে অন্য অতিরেকে যাওয়ার মধ্যে মোটেই যুক্তি নেই, সংসদীয় পদ্ধতিকে ধ্বংস করার চেয়ে, দরকার হচ্ছে তার স্বাভাবিক চৌহদ্দির মধ্যে (সাধারণ আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে) তাকে সীমিত রাখা এবং দক্ষতার যন্ত্রণায় শক্তিশালী কার্যনির্বাহিকের—ও অন্য মেরুতে, সমস্ত নাগরিকের জীবনকে স্পর্শ করে এমন সমস্ত প্রশ্নে জনমত যাচাইয়ের (উদাহরণ ঃ সুইজারল্যান্ডের গণভোট)—এক সংগঠনে তাকে পুরোপুরি পরিপূর্ণতা দেওয়া। মহলানবীশ অনুধাবন করতে পারলেন ব'লে মনে হয় ; কিন্তু আমার কাছে মনে হয় তিনি সব সময়েই রাষ্ট্রের প্রতি, প্রতিষ্ঠিত শক্তির প্রতি এক ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তিনি বললেন ঃ "কিন্তু বিরোধী শক্তি কি ফ্যাসিস্ট সরকারের নীতিগুলো নিয়েই মাথা ঘামাবার দাবি জানাবে না ? আর সেকি তাই সহ্য করবে ?"—কিছুটা উদ্দীপনার সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম ঃ "কিন্তু তাহলে এই অলঙ্ঘনীয় নীতিগুলো কী ? ফ্যাসিস্ট-শক্তি বস্তুটি কী, যাকে সমালোচনা করার, নড়বড়ে দেখার অধিকার

থাকবে না ? তার উৎকর্ষের কোন্ প্রমাণ সে দিয়েছে ? বিদেশীদের জন্যে রাজপথে, হোটেলে আপাতশান্তিশৃঙ্খলা ? দু'তিন বছর গায়ের জোরে অপরাধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে কর্তৃত্ব আত্মসাৎ করেছে। তার মতো চিন্তা করে না এমন সমস্তকিছুর গলা টিপে মেরেছে। তাকে সমালোচনা করার অধিকার থাকবে না ? বলা হয় ইতালি···—ইতালি !···আমি আপনাকে আর এক ইতালিকে দেখাচ্ছি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহত্তম,—মাজিনির ইতালি !...''আমি তাঁকে মাজিনির কথা বললাম। তাঁর জন্যে 'এপিস্তোলারিও' খুঁজে নিয়ে এলাম, উম্বের্তো জানোত্তি-বিআংকো একটি সুন্দর ও বেদনাকরুণ ভূমিকা দিয়ে তার একটি উদ্ধৃতি-গ্রন্থ সদ্য প্রকাশ করেছেন। আমি তার কয়েকটা পাতা পড়ে শোনালাম, বিশেষ ক'রে যেখানে মাজিনি লিখেছেন : "তোমার স্বদেশের স্বার্থ সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নে সক্রিয় হবার আগে প্রশ্ন করো : 'আমার কাজ মানবতার পক্ষে লাভজনক হবে, না ক্ষতিকারক হবে ?' যদি উত্তর হয় : 'ক্ষতিকারক,' দ্বিধা করো না। মানবতার স্বার্থে স্বদেশের অহংসর্বস্ব স্বার্থ বিসর্জন দিও।'' এবং আমি তাঁকে বললাম ঃ "এই সেই ইতালি মুসোলিনি যার কণ্ঠরোধ করেছে, বিশ্বাসের জন্যে যাকে হত্যা করেছে ! মহত্তম ইতালি ! আমার ইতালি !—আর এই ইতালির সাহায্যের জন্যেই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, এর জন্যে লড়তে হবে,—লড়তে হবে আপনাকে, রবীন্দ্রনাথকে, আমি যেমন লড়ছি। এ আমাদের কর্তব্য।''

মনে হলো মহলানবীশের মনে দাগ কেটেছে। তিনি সায় দিলেন।

৫ টার কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর ছোটো দলটি নিয়ে। মঁত্রোর এক ফটোগ্রাফার রড স্কেমেরকে ডেকে আনিয়েছি ; আমাদের দলটির নানা রকম ছবি তোলা হলো (সঙ্গে রইলেন আমার বৃদ্ধ পিতা, তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সদ্য মৃত, দার্শনিক বড় ভাইয়ের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন)। ফটো তোলা হলো গোলাপ গাছগুলোর মধ্যে ভিলা লিঅনেতের বাগানে। জুনের এক সুন্দর দিন, মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের ডালগুলো দুলছে, এমন প্রাণ খুলে কলরব ক'রে পাখিরা কখনো গান গায়নি,—বৃষ্টিঝরা দীর্ঘ সপ্তাহগুলো বসন্তকে পণ্ড করেছে, ওরা যেন সেই সপ্তাহগুলো পুষিয়ে নিচ্ছে।

তখনো পাখিদের কাকলি উৎসারিত হয়ে চলেছে, ভিলা অলগায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের জন্যে পিয়ানোয় কয়েকটি সুন্দর ইউরোপীয় সুর বাজালাম, আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে তাঁর সংবেদনশীলতার কাছাকাছি কয়েকটি বাছাই ক'রে নিলাম ঃ – ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দু'টি গ্রেগোরীয় সুর,—দু'টি লোকসংগীত, একটি আলসাসের, অন্যটি ব্রেতাঞের (এটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিয়ে দিল অনুরূপ একটি ভারতীয় সুর ; তিনি সেটা গেয়ে শোনালেন অতি নিখুঁত বলিষ্ঠ গলায় ; আর মিলটা সত্যিই বিস্ময়কর) ;—তারপর গ্ল্যুকের দু'টি রচনা : 'সাঁজেলিজে'র মূক দৃশ্য এবং 'অরফে'র বাঁশির সুর ; 'আলসেস্ত্'-এর ধর্মীয় শোভাযাত্রা ;—অবশেষে খাদের পর্যায় (Ut mineur) বিঠোভেনের সিম্ফনির মধ্যলয়ের রচনা (andante)। হায়রে ! আমাকে ভালো করেই স্বীকার করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোটো দলটি এর

সৌন্দর্য খুবই কম বুঝতে পারেন। গ্লুকের 'সাঁজেলিজে'গুলো তাঁদের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু বিঠোভেনের করুণ কণ্ঠস্বর তাঁদের হৃদয়ে পৌঁছোয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, এটা কেমন আশ্চর্য ব্যাপার যে, কবিতা এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিজেকে পাঠাতে পারে, সঙ্গীত পারে না। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে, ইউরোপে যা ঘটে তা এর বিপরীত ঃ গ্যয়টে ও শেলি অনূদিত হতে পারে না ; বিঠোভেন সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধ হয়,—উত্তরাঞ্চলেও যেমন তেমনই দক্ষিণাঞ্চলে। রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে ইউরোপের সমস্ত জাতির একটি সর্বজনীন সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য আছে। কিন্তু এশিয়ার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য একেবারে পৃথক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সঙ্গীতের কথা বললেন। কাব্যের চেয়ে একে তিনি বেশী মূল্য দেন। তিনি বললেন, তাঁর কবিকর্মের, তাঁর নামের মৃত্যু হতে পারে ঃ তাঁর গানের কখনো মৃত্যু হবে না ; এখনি বাংলাদেশে তা সকলের সম্পত্তি হয়ে গেছে ; সবাই গান গায় ; তাঁর গান উৎসব আর ঋতুর সঙ্গে, দিন আর ক্ষণের সঙ্গে সব সময়েই জড়িয়ে আছে। তিনি উনিশশ'রও বেশী গান বেঁধেছেন (প্রায় কোনোটাই লেখা নয়, মুখে মুখে রচনা) ঃ তিনি বললেন, যখন এদের কোনো একটা প্রথমবার তাঁর মনে আসে, যেন নেশাতুরের মতো তিনি তখন সত্যি সত্যি উপলব্ধি করেন, প্রেরণা কী। আর তাঁর পক্ষে এটা ভাবা বেদনাদায়ক যে, এই নেশাতুরতা, এই পরমানন্দ জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন না। তাঁর প্রতিটি গান—যা তাঁকে আনন্দ ও বিষাদে প্লাবিত করে—(তাঁর নিজের অথবা অতীতের) যুগযুগান্তের স্মৃতিতে, আবেগ-জাগানো অনুষঙ্গে ভারাক্রান্ত ও সুরের প্রারম্ভ থেকেই একটা গোটা মানসিক অবস্থা, মহাজাগতিক জীবনের একটি ক্ষণ জেগে ওঠে ; এবং এরই মধ্যে ভারতবর্ষে প্রত্যেকে উপভোগ করে যা কিছু আসছে সব—সঙ্গীতের সমগ্রতাটি। কেন এমন হবে যে, আবেগের এই ঐশ্বর্য ইউরোপের প্রিয়তম বন্ধুদের কাছে অসংবাদী থেকে যাবে ? (আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম ঃ "তাই কি ?" আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি ভারতীয়ের অন্যান্যসাধারণ একগুঁয়েমি আছে আগেই মনে-ভাবার যে, একমাত্র তারাই তাদের শিল্পের শ্রেষ্ঠ বস্তু বুঝতে পারে। আমি তখন তর্ক তুলি না।…হায়রে! ইউরোপের একজন মহৎ শিল্পীও কি কখনো তাঁর চিন্তার নিকটতমের, সবচেয়ে অন্তরঙ্গের হৃদয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হন ? এটি সর্বজনীন নিয়ম।) প্যাট্রিক গেডেসের এক বেহালাবাদক আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের বাছাই-করা গানের এক সংকলন করেছেন এবং তা ছাপার পরিকল্পনা করছেন।

২৭ জুন, ১৯২৬। রবিবার। (গতকাল যখন রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, তাঁকে গ্রীক শবাধারের ফটোগুলো ঃ 'লা নাসিতা দি ভেনের' দেখিয়েছিলাম, এগুলো আমার শোবার ঘরের লাইব্রেরিতে সব সময়ে সাজানো (তিনি সবচেয়ে তারিফ করেছিলেন বসে-থাকা রমণীটিকে—কাপড়ে ঢাকা, কাপড় গায়ে আঁটোসাঁটো এবং তাকে তিনি বাংলাদেশের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন)। এবং আমি যখন গ্লুক্যের 'অরফে'

(অরফিউস) বাজাচ্ছিলাম, তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম ভিলা আলবানির অরফিউস-ইউ রদিসের বাসরিলিফ।—বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে তিনি অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন (রেইএঞ-র) গথিক সন্ন্যাসিনীর ছাঁচে-তোলা মুখের সামনে এবং তার সূক্ষ্ম ও প্রীতিকর চাতুর্য তারিফ করাটা শেষই হচ্ছিল না। সর্বোপরি তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন একটি মেক্সিকান ক্যালেন্ডারের (calendrier) ছাঁচে-তোলা প্রতিকৃতির সামনে, সেটি আমাকে দিয়েছিলেন আয়া দেলিয়া তোরেস। ওর মাঝখানে তিনি চিনতে পেরেছিলেন দেবী কালীকে (কালী থেকেই "কালাদ্রিয়ে" কথাটি এসেছে; কালী একই সঙ্গে মৃত্যুর দেবী এবং কালের দেবী,—যে কাল সংহার করে। যে শিব অনন্ত, তিনি তাঁর প্রেয়সী ও ঘরণী। তিনি নৃত্য করেন, অনন্তে আবর্তিত হন। এর আগের দিনই তাঁর ছেলে ও ছেলের স্ত্রী এই প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে একই বিস্ময়োক্তি করেছিলেন। মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের রক্ত-সম্পর্কিত, এতে কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।)

রবিবার সকালে আমার বোন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছেলের স্ত্রী, শ্রীমতী মহলানবীশ এবং ত্রিপুরার রাজকুমারকে একটা ঢাকা গাড়িতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল—তেরিতে-ভেভে'র উপরের রাস্তা ধরে—গ্লিঅঁ—লেজাঁভা-সাঁবি—ব্লনি হয়ে। দিনটা অতি চমৎকার। যত সামান্য ক্ষণের (দু'ঘণ্টার কম) জন্যে হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই বেশ বেশি, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

অপরাহ্নে এলেন কঁজের ভাতোয়ার দ্য জেনেভ-এর শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লিদি মালাঁ, সঙ্গে চোদ্দ-পনের জন ছাত্রী বা বন্ধু। তাদের তিনি ১৬শ শতাব্দীর কয়্যারের দলে ভাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে থাকবেন জানার আগে তিনি আমাকে একটা ছোটো কনসার্ট শোনাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি আমি গ্রহণ করেছি। ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের এই কনসার্ট হলো অতেল বির'র একটা হলে। লিদি মালাঁ সুন্দরী না হলেও তরুণী এবং শ্রীময়ী; তাঁর নমনীয় কাঁধ আর পেলব বাহু দুটি তাকিয়ে দেখাটাও আনন্দের, মনে হয় তারা সাঁতারুর মতো ভেসে ভেসে তাল মিলিয়ে যাচ্ছে। ওঁরা (এবং কয়েকজন পুরুষ) গাইলেন ভিক্তোরিয়ার বেশ কয়েকটি যুগলবন্দী ভজন, বেলজিয়ামের লোকসঙ্গীত, গুদিমেল-এর একটি স্তব, ক্লদ ল্য জ্যন-এর প্রাচীন ছন্দের কবিতা এবং বহুধ্বনিযুক্ত গীত, এবং জোসক্যাঁ দেস্‌প্রের একটি অতি চমৎকার, অতি সূক্ষ্ম গীত। আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ এতে অনেক বেশি আগ্রহ দেখালেন বোধ হলো। তিনি বললেন, যে-মুহূর্তে বাজনা ছাড়াই শুধু কণ্ঠস্বর কানে এলো, তিনি অনেকখানি ঘরোয়া বোধ করলেন; ভালো ক'রে না বুঝলেও এই গানগুলোর সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের অনুভূতিবেদ্য জ্ঞান তাঁর আছে। ভিক্তোরিয়ার সবচেয়ে করুণ 'স্যাঁতিনাস্' (St- lgnace) সম্ভবত তাঁকে সবার চেয়ে অভিভূত করল। আমরা জেনেভার এই পাখির দলটিকে চা খাওয়ালাম, ওঁরা এসেছিলেন ৩-৩০ মিনিটের স্টিমারে, তাতেই ফিরে গেলেন ৫-৩০ মিনিটে। আমি লিদি মালাঁকে ভালবাসি, তিনিও আমাকে ভালবাসেন।

কনসার্টের আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপচারী।

আমাদের কথা হলো যন্ত্রের রাজত্ব নিয়ে। এবং বলশেভিক চিন্তা যন্ত্রের উপরে, বলশেভিক কবি ও শিল্পীদের সমাবেশ দিয়ে অনুষ্ঠিত যন্ত্রের উৎসবের (দেবায়নের) উপরে যে পৌত্তলিকতাসুলভ বিশ্বাস আরোপ করতে চলেছে (রাশিয়া সম্পর্কে ফুলপ-মুলারের বই থেকে যা জেনেছি) তার বর্ণনা করলাম; এই অদ্ভুত উন্মাদনা মানুষকে তার ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করতে, তার অহংকারকে অন্ধ শক্তির পায়ে সঁপে দিতে, নিজেকে শুধুই যৌথ যন্ত্রের একটা চাকা হিসেবে দেখতে চাইতে ঠেলা দিচ্ছে; —এই পাগলামি মার্কস এবং লেনিনের অর্থনৈতিক জড়বাদের পরিণাম এবং এ জড়বাদ থেকে পরিণত হয়েছে অন্য এক ধর্মে। (লেনিনের ভক্তরা তাঁর কথা বলতে এবং তাঁর গুণকীর্তন করতে গেলে বিপত্তি; কেননা তাঁর মধ্যে এক স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে দেখে ব'লে স্বীকার করতে পারে না: তাই তারা প্রাণপনে চেষ্টা করে যুগের শক্তিসমূহের এক ধরনের সমন্বয় করতে।) রবীন্দ্রনাথকে আমি বৃদ্ধ ফরেলের দৃষ্টান্তও দেখলাম; তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বৃদ্ধ মানুষটি দয়া, দাক্ষিণ্য ও ত্যাগের এক আদর্শ; আর তিনি তাঁর আশা ও আনন্দ ন্যস্ত করেছেন মানবতার জন্যে পিঁপড়ের আদর্শের স্বপ্ন দেখায়! রবীন্দ্রনাথের মজা লাগল, তিনি কৌতূহলী হলেন, তিনি অবাক হলেন এই ভেবে যে, ইউরোপের যে-মানুষেরা স্বাধীনতার সুবিধা পেয়েছিল, তারা এশিয়ার যৌথ মস্তিষ্কবিকৃতিতে পৌঁছুবার কণ্ডুয়নের কবলে পড়েছে। আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম,—গণতন্ত্রের আবির্ভাব এবং যন্ত্রের আবির্ভাব (শিল্পের উর্ধ্বগতি) · এই দু'টির আবির্ভাব থেকে এক শতাব্দী ধরে এই দুর্বিপাক ইউরোপে কেমন ক'রে বেড়ে উঠেছে। শৃঙ্খলমুক্ত শক্তিগুলো তাদের প্রতীক্ষাকে অনেক বেশি পেরিয়ে গেছে, যারা বিশ্বাস করেছিল মানবতার কল্যাণে এদের নিয়োগ করা যাবে। এবং আমি তাঁকে গ্যয়টের 'লাপ্রাঁতি সরসিয়ে' (L'Apprenti Sorcier কবিতাটি শোনালাম, তিনি সেটি জানতেন না, উজ্জ্বল মুখে সেটি শুনলেন।

তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "কিন্তু ইউরোপকে যা এই যান্ত্রিক উন্মত্ততায় ঠেলে দিচ্ছে সে জিনিসটা কী? সে কি মুনাফার আকাঙ্ক্ষা, আধিপত্য করার লালসাতুর ঔদ্ধত্য?" আমি বললাম: "খুব সহজ ক'রে বলতে, আবিষ্কারের এই অসুস্থ, এই উন্মাদ প্রয়োজন মনের জ্বর,—মস্তিষ্কের দানব।' এবং এর কিছু ভয়ঙ্কর উদাহরণ দিলাম: উদাহরণ দিলাম আমেরিকার সেই মারাত্মক আবিষ্কারগুলোর, অধ্যাপক জাঙ্গের যাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন,—সেই যান্ত্রিক নিখুঁতীকরণ, যেমন মোটরগাড়িগুলোর ক্ষেত্রে যে-নিখুঁতীকরণ কেনা হয় বিষক্রিয় উপায়ের মূল্যে (ধ্বংসাত্মক বেনজইন), যারা ২০ বছরের মধ্যে একটা বড় শহরের মানুষগুলোকে ধ্বংস ও নির্বীজ ক'রে ফেলতে পারে। স্তম্ভিত রবীন্দ্রনাথ মাথা নিচু ক'রে বসে রইলেন, যেন বসে রইলেন সুপ্রাচীন ভবিতব্যের সামনে—যে-ভবিতব্য বিরাট বিরাট সভ্যতাকে শাস্তি দেয় আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে।

তাঁর চিন্তা সবসময়েই এক বেদনাদায়ক পীড়া নিয়ে ফিরে আসে তাঁর ভারতবর্ষে

—যাকে তিনি দেখছেন প্রকৃতির বিপুলত্বে থেঁতলে যেতে। মানুষ সেখানে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে না। সেখানে মন অনুভব করে হারিয়ে গেছে অন্তবিহীন অসীমের মধ্যে; আর নয়তো তার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধে; নয়তো হাল ছেড়ে দেয়, তলিয়ে যায় গভীরে। ইউরোপের তৃপ্ত প্রকৃতির, বিশেষ-সুবিধা-ভোগ-করা মাটির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ ঈর্ষার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন; এখানে সামঞ্জস্যহীন প্রচেষ্টা ছাড়াই মানুষ ও সভ্যতা ফুটে উঠতে পারে, থাকতে পারে, বিকশিত হতে পারে;—জাপান সম্পর্কেও সেই একই কথা, তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং সবার উপরে ভালবাসেন: তার মাধুর্য, তার বুদ্ধি, তার সৌজন্য, তার গরিমা—যা তার সর্বজনীন সহজাত গুণ; এবং বিপদের মুখোমুখি তার বজায়-রাখা সহজ বীরত্ব; তার সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের বিপর্যয় এই মানুষগুলোর শাশ্বত মূল্যগুলোকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। যে ভাগ্য সে পেয়েছে, তার আনুকূল্যের জন্য জাপান তাঁর কাছে ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করার মতো এশিয়ার প্রায় একমাত্র অংশ।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে এক নৈতিক ধর্মের পুরোপুরি অভাব—যেরকম ধর্মের সুবিধা ইউরোপ পেয়েছে। বৌদ্ধধর্ম মরে গেছে; এবং হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এখানে ওখানে বীজ-ছড়ানো রামের, কৃষ্ণের কাহিনীগুলো সত্ত্বেও—তার বিধানাবলীর চরিত্র নৈতিক নয় বাহ্যিক, সামাজিক এবং আচারগত। তার "অপবিত্রতা' যে-ধারণা সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে, তা নৈতিক ও অনৈতিক মূল্যহীন আচরণ-বিধি লংঘন করার কাজেও যেমন প্রযুক্ত হয়, তেমনি প্রযুক্ত হয় বিশেষিত অপরাধে। একমাত্র ১৯শ শতাব্দীতে কবির পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসীদের মনে নৈতিক ধারণা ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল; তা সে ধার করেছিল খ্রীষ্টধর্মের কাছ থেকে, এবং, এমনকি প্রতিক্রিয়া হিসেবে খ্রীষ্টধর্ম থেকে সবচেয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তী ও নীতি-পরায়ণ প্রবণতাগুলো নিয়েছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখে এ সংকীর্ণতা সমর্থনযোগ্য ভারতবর্ষের নৈতিক নৈরাজ্যকে আটকাবার প্রয়োজনে। এ ভালো ফল দিয়েছে;—কিন্তু এখনো বেশ সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতে শুনতে যেমন. এমন আর কখনো আমি ভালো ক'রে উপলব্ধি করিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রবল গুণটি এবং তার সবকিছু, যার জন্যে পশ্চিমের জাতিগুলো তার কাছে ঋণী: সক্রিয় এবং যন্ত্রণাভোগ-করা খ্রীষ্টের স্থায়ী দৃষ্টান্ত,- নিধানপ্রদীপের (Lampe dust-Serement) মতো বিবেকের নিরন্তর বিনিদ্র প্রহরা,—প্রতিদিনের পরীক্ষা—নৈতিক স্বীকারোক্তি—ইত্যাদি। বেদনা ও সক্রিয় আত্মোৎসর্গের মানব। প্রেম ও বেদনার জননী। ইউরোপের মানবতার চিরন্তন প্রতীক এবং সঙ্গী, তার উৎসাহদাতা. সান্ত্বনাদাতা। এর ধর্মীয় ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর দাগ কাটলো। ইউরোপের দলিত পিষ্ট মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মার এই শক্তির কয়েকটা উদাহরণ তাঁকে দিলাম;—ভারতবর্ষও যা কখনো হয়নি, ১৭শ শতাব্দীর জার্মানী ছিল তারচেয়েও বেশি ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পদদলিত, অধঃপতিত, নাভিশ্বাস-ওঠা,—তবু তার কাজের মধ্যে সে বহন করেছে জে. এস. বাখের বীজ।

হায়রে! ভারতবর্ষ শুধু একটি নাম—একটি নাম-প্রতিমা। সে বাস্তব

কোনো কিছু নয়। তার অস্তিত্ব নেই। ভারতবর্ষের কোনো অংশ প্রতিবেশীর জীবনের অংশ নেয় না। বাংলাদেশের পাঞ্জাব সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথা নেই। ঐক্য আছে একমাত্র রাজনীতিবিদদের সমাবেশে। শুধু কথা আর কথা! তলায় সবচেয়ে অমানুষিক অহংসর্বস্বতা, কিংবা ঔদাসীন্য। রাজনীতিবিদরা তাদের ভূমিকা অভিনয় করে, যা দুনিয়া জুড়ে একই রকম। কিন্তু জগতের বাকি লোকদের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরা বিচার করতে বেশি অক্ষম, এবং উদাসীন।

এবং রবীন্দ্রনাথে – সব সময়ে – সব সময়ে ফিরে আসেন (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) গান্ধী এবং গান্ধীপন্থীসের বিরুদ্ধে তাঁর তিক্ততা (rancoeur) প্রকাশে। তিনি কেবল দেখেন গান্ধীর ছোটো ছোটো দিকগুলোই (বড় দিকগুলোও ভালোই স্বীকার করেন, কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেন না): তাঁর মতবাদগত একগুঁয়েমি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং উন্নাসিক আচারপ্রিয়তা,—ভারতবর্ষের মনের উপরে যার প্রবল প্রতাপ। তাই গান্ধী ঘোষণা করেন (এক বিরাট ভোজের পর, যাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, এবং যা সঙ্গত কারণেই তাঁর নিদারুণ বিরক্তি ঘটিয়েছিল) যে, তাঁর প্রতিটি আহারে পাঁচ রকম উপাদানের বেশি কিছু (নুন, চিনি, ভেষজ ইত্যাদি) আর ব্যবহার করবেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে বেশি (যা ছয়টি উপাদানের তৈরি একটা ওষুধ) প্রয়োজন হলেও জেদ ক'রে প্রত্যাখ্যান করবেন। নিয়ম অনুশাসন বন্ধ হয়। এই কিম্ভূতগুলোয় কিছুই হয় না, বিমূর্ত বিধানাবলী যদি অমানুষিকতায় না পৌঁছোয়। ১৯২১ সালে আসামের ধর্মঘটের সময়ে, বলতে গেলে অসহযোগের প্রথম বৃহৎ সমাবেশের সময়ে, কুলিদের মধ্যে কলেরা শুরু হয়েছিল; প্রয়োজন ছিল অসহযোগের নির্দেশ প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া, এবং দ্রুত এই জনতাকে সরানোর জন্যে রেলপথ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাস (যাঁর ভারতীয়দের দেওয়া নামের অর্থ "দেশের বন্ধু") তা করতে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। এই ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর সাক্ষী এনড্রুজ গান্ধীকে মিনতি জানালেন, গান্ধী সহানুভূতি প্রকাশ করলেন, ব্যথিত হলেন, কিন্তু নিজে মত প্রকাশে বিরত রইলেন। বিনা সহযোগিতায় বিনা সাহায্যে হাজার হাজার মানুষের যন্ত্রণার উপরে অসহযোগের নির্দেশ বহাল রইল অনড় হয়ে। রবীন্দ্রনাথ এটা ক্ষমা করতে পারেন না; এবং যে আচরণগুলোকে মনে হয়—আমার নিজের কাছে মনে হয়—অনেক বেশি নির্দোষ, রবীন্দ্রনাথের অতি-সংবেদনশীলতা তাদের সম্পর্কে তেমনই বেশি বিরূপ: গান্ধীর একটা রীতি আছে, তাঁর কেউ—তা তাঁর আশ্রমের একমাত্র শিশুটিও যদি হয়—যখনই পাপ করে, তিনি নিজের উপরে অনশনের শাস্তি চাপিয়ে দেন। এটাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বিকট, শিশুর প্রতি এক দুর্বিসহ নিষ্ঠুরতা; শিশুটি দেখে তাকে এইভাবে ভারতবর্ষের নৈতিক তুরুমে (pilori) ঠুকে দেওয়া হয়েছে; এবং গান্ধী তাঁর অনশনের যে প্রচার চালান তিনি তা আরও ক্ষমা করতে পারেন না। সেকেলে কোনো ভারতীয়, ইচ্ছে হলে, অনশন করেন,—কিন্তু চুপচাপ থাকেন, লোককে ব'লে বেড়ান না। আমি কিন্তু গান্ধীর অভিপ্রায় বুঝতে পারি, বুঝতে পারি তাঁর প্রবল প্রতিভাকে—যে-প্রতিভা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যার প্রতিটি আচরণের লক্ষ্যবস্তু শুধু তিনি নন,—সকলে।

এই নয় যে, ইউরোপের মুক্তমতিদের ক্ষেত্রে অন্ধ জাতীয়তাবাদের চেয়ে, অসহযোগীদের পীড়নকারী অন্ধ গোঁড়ামি, ভারতবর্ষের মুক্তমতিদের ক্ষেত্রে কম অত্যাচারী ছিল না। মহলানবীশ বললেন, তিনি যুদ্ধের তরঙ্গ দেখেছেন ১৯১৪ সালে ইংলন্ডে, ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে। ভারতবর্ষে অসহযোগের জনতরঙ্গ ছিল অনেক বেশি প্রচন্ড। তিনি নিজে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে ফিরে যখন কলকাতায় প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এক বিরাট জনতা অনেক আগে থেকেই হল্ দখল ক'রে বসেছিল ; সাধারণত কবিকে বিরাট জয়ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হতো, কিন্তু তার বদলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এক জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা। যদি পুরনো প্রভাব, কবি হিসেবে তাঁর মহাগৌরব না থাকতো, তিনি খুন হয়ে যেতেন, তাকে ছিঁড়ে ফেলতো। এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ এইসব অসম্মান মোটেই হজম করেননি, আরও যেমন, গান্ধীকে ক্ষমা করেন নি কিছুটা অবজ্ঞেয় (তাঁর নিজের অর্থে) কাজের জন্যে, যা মহাত্মাজী তাঁর আন্দোলনে তাঁর জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি তাঁকে লিখেছিলেন : "আমাকে কেন ডাকছেন না ? আমাকে দেবার মতো কোনো কাজ আপনার নেই ?" মহাত্মাজী বলেছিলেন : "সুতো কাটুন !"—"অন্য আর কিছুই না ?" "অন্য আর কিছুই না। সুতো কাটুন !' রবীন্দ্রনাথ কখনো সুতো কাটেননি।

আলাপচারীর পর রবীন্দ্রনাথ আবার ইতালির ফ্যাসিবাদের কথা তুললেন। ডিউক স্কোত্তিকে (ইতালির অন্যতম বিরল মুক্তমতি, যাঁকে তিনি জানতেন) তিনি চিঠি লিখবেন স্থির করেছেন ; স্কোত্তির সম্পর্কে প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানা কথার আড়ালে রাজনৈতিক ইতালির প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ; তিনি তাঁকে লিখেছেন যে, ক্রোচেকে দেখতে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছেন, কারণ একটা দেশের যা তাঁর মনকে টানে, তা তার চিন্তাবীরেরা, বাহ্যিক শক্তির ব্যর্থ পশরা নয়। তিনি লিখেছেন তুরিনে ডিউক উস্তের যুবক পুত্রের (এক বিশিষ্ট ও শিক্ষিত তরুণ) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সে ডিউক স্কোত্তির মতোই ঠোঁটে আঙুল চেপে ছিল : "মুখ বন্ধ। কথা বলা সম্ভব নয়।" চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, ইতালির তরুণরা যেন বুড়োদের বিচক্ষণতা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা একটা খারাপ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বললেন, ভেবে দেখার পর, তাঁর কাছে মনে হয়েছে, প্রকাশ্যভাবে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সবচেয়ে ভালো উপায় তাঁর একটা ইন্টারভিউ নেওয়া। তিনি চাইলেন, আমরা বলি কে ইন্টারভিউ নেবেন।

(আমি যতটা না অনুমান করেছিলাম, অধ্যাপক ফর্মিচি তার চেয়ে অনেক বেশি নীচ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মুসোলিনির গুণগান ক'রে এবং কবিকে তা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা ক'রে তিনি কেবল মুসোলিনির দালালিই করেননি, সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে রবীন্দ্রনাথকে বাধা দিয়েছেন। এমনকি ফর্মিচির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ডিউক স্কোত্তিকে যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, সেটাও তিনি পাননি ; ফর্মিচি সংবাদটি গাপ ক'রে ফেলেছিলেন ; স্কোত্তি খবরের কাগজ

দেখে দৈবাৎ জানতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তুরিন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজে বার করতে,—ফর্মিচি তাতে খেপে গিয়েছিলেন। বড় বড় বুদ্ধিজীবীর দাসসুলভ কাপুরুষতা,—যে অত্যাচারী এদের কাজে লাগায় তার চেয়েও হাজার গুণে ঘৃণ্য।)

(তরুণ ভারতীয় রাজকুমার আমাকে তাঁর কার্ড দিয়ে গেলেন; তাঁর নাম মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন। ত্রিপুরা রাজ্য।)

২৮ জুন, ১৯২৬। সকালে আমার বোন গেল রবীন্দ্রনাথের কাছে, তিনি তাকে বাংলার একটা পাঠ দিতে চেয়েছেন। দু'জনে মিলে একটা কবিতা পড়লেন।

অপরাহ্ণে অগুস্ত ফরেল এলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে, যেমনটি আমাদের মধ্যে ঠিক হয়েছিল। বৃদ্ধ, অশক্ত মানুষটি হাজির হলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, গায়ে কর্ডুরয়ের জ্যাকেট, পায়ে ভারি জুতো, আয় পিঠে তাঁর ঝোলা (কারণ বাঁ হাতে তিনি কিছুই বইতে পারেন না, শরীরের একটা দিকের সবটুকুই অবশ);—আলোছায়ায় অতি কষ্টে দেখতে পাচ্ছেন, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছেন, এবং নিজেকে প্রকাশ করছেন কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে—এক জামাইকে সদ্য হারিয়েছেন, দুর্ঘটনায় জলে ডুবে মারা গেছে এবং গরীব হওয়া সত্ত্বেও পরলোকগতের পরিবার তার স্ত্রী ও ৮ থেকে ১৪ বছরের ৫টি শিশুকে তাঁকে টানতে হয়; ভাগ্যের সমস্ত অসম্মান সত্ত্বেও বিনা তিক্ততায় এবং মুখে হাসি ফুটিয়ে এক শৌর্য বজায় রেখেছেন; যে-মানুষেরা তাঁকে একটা বুড়ো পাগল ভাবে, তিনি তাদের মঙ্গল খুঁজে চলেছেন এবং পরম আনন্দের সঙ্গে কামনা করছেন সুখদায়ক নাস্তিকে, জীবনের শেষে যার প্রতীক্ষায় তিনি আছেন;—পাশ্চাত্যের এই অদ্ভুত বীরটি, যাঁর অনলস প্রাণশক্তিকে কিছুই ভাঙতে পারেনি,—এই নাস্তিক সন্তটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর দাগ কাটলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন মধুর প্রীতিপূর্ণ হাসি দিয়ে; আর কারুর সাক্ষাতে তিনি এতো বেশি অভিভূত হননি; বিধ্বস্ত দেহের সঙ্গে মানসিক শক্তির এমন বৈষম্য তাঁর পরলোকগত পিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফরেল শুধু আধ ঘন্টা রইলেন। রবীন্দ্রনাথকে বললেন, গান্ধীর চেয়ে অনেক বেশি তাঁর সঙ্গে তিনি আছেন এটা, তাঁর অজান্তে কবিকে সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ উপায়)। ভারতবর্ষ ও চীনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন; জগতের সমস্ত জাতির ঐক্যের ইচ্ছা ও আশা ব্যক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর লোকজনদের বিতরণ করলেন তাঁর কিছু পুস্তিকা: বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের সবরকম পিঁপড়ে সম্পর্কে তাঁর একটি নিরীক্ষা (রবীন্দ্রনাথ বললেন, এতে তাঁর কৌতূহল আছে, বিশেষ ক'রে আছে এইজন্যে যে, বহু সময় তিনি এদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন; লাল আর কালো পিঁপড়ের এক লড়াই তিনি তিন দিন ধরে দেখেছিলেন।)

বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম রবীন্দ্রনাথকে দেখতে। কিন্তু তিনি শ্রান্ত।

তিনি স্ট্রিকনিন সম্পর্কে অভিযোগ করলেন, তাঁকে ডাক্তারে তার বিধান দিয়েছে (রবীন্দ্রনাথের ছেলে বললেন, ওষুধ সম্পর্কে তাঁর অরুচি আছে ; এবং হতে পারে যে, তার অস্বস্তিতে 'অটোসাজেসসানের' হাত আছে।) খুব সম্ভবত, মোটরে বেড়ানো উচ্চতার হঠাৎ পরিবর্তন তাঁর ক্ষতি করেছে। আমরাও বেশিক্ষণ রইলাম না। কালিদাস নাগ এবং জাপানের বন্ধুদের জন্যে কয়েকটা কার্ড সই করিয়ে নিলাম। তারপরই, সকলে মিলে চা খেতে খেতে তাঁর সামনে মহলানবীশের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম আধুনিক জার্মানী সম্পর্কে : ফ্রিটস্ ভন উনরু সম্পর্কে,—যাঁর প্রতিভা মহলানবীশকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে সেই আইনস্টাইন সম্পর্কে ; আমি নিট্‌শের—আসল নিট্‌শের কথা এবং মাল্‌হ্বিডা ভন মেইজেনবার্গের কথাও বললাম।

ইউরোপের, এমনকি ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলোতেও যে-অসংখ্য মন্তব্য বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা জেনেছেন ; সেই সব মন্তব্যে তাঁকে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সংবাদপত্রে এর উত্তর দেবার জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র এবং ইন্টারভিউ নেবার মতো নিরপেক্ষ লোক খুঁজছেন। তিনি আরও প্রস্তুত হবেন এক প্রবন্ধে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুলে লিখতে।

রাতে, খাওয়াদাওয়ার পর, আমাদের ভিলায় এলেন তরুণী শ্রীমতী ঠাকুর এবং ত্রিপুরার যুবরাজ। যুবরাজ তাঁর একটা হাতের কাজ আমাদের দেখালেন—একটা হাতির দাঁতের কাগজকাটা ছুরি, তার পায়ের ফুলের নক্সা খোদাই করেছেন, আর হাতলের ডগায় একটা হাতি ও অন্য একটা জন্তু। এটা একটা সংযত ও ধ্রুপদী শিল্প। একটা ফটোর অ্যালবামও তিনি দেখালেন, তাঁর রাজ্যের পল্লী-অঞ্চল থেকে তুলেছেন ; ফ্রান্স ও ইংলন্ডের পল্লীদৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমার বোনকে তিনি তাঁর রাজ্যের মেয়েদের হাতে-বোনা কাজ-করা একটা কাপড় দিলেন, এবং শ্রীমতী ঠাকুর দিলেন প্যারাসোলের একটি বাঁট, রঙকরা আর সিংহলের লাল-সোনালি গালার কাজ-করা। যুবরাজ প্যারীতে কয়েকটা দিন কাটাতে যাচ্ছেন, সর্বোপরি তাঁর ইচ্ছা অলংকার-সজ্জার মিউজিয়ম এবং আসবাব কারখানাগুলো দেখার।

২৯ জুন, ১৯২৬। সকালে আমার বোন রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার দ্বিতীয় পাঠ নিলেন। মার্তিনে চেয়েছিলেন ওদের সঙ্গে বসতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতা পড়লেন : 'বিজয়'* ; এবং কথাগুলো না বুঝতে পারলেও সঙ্গীত থেকে বেরিয়ে-আসা প্রকাশক্ষম ও বেগবান শক্তিতে মার্তিনে ভীষণভাবে মুগ্ধ হলেন। তাঁর কাব্যিক মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন। তিনি বললেন, তিনি ভারতীয় কবিতা (বাংলা কবিতা) নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন, ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দী থেকে এর অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র লোকসঙ্গীতের মধ্যে। তিনি ভবিষ্যতের সব পথ খুলে দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের পর বাংলাদেশের সকল কবিই—এমনকি তাঁর

---

* সম্ভবত কবিতাটি 'পূরবী'র 'বিজয়ী'।—অনু.

প্রতিপক্ষরাও—তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বললেন: "এখন আমি মারা গেলেই যেন ভালো হয়। আমি একটা বড় গাছ, যার আবরণ পড়েছে সবার উপরে এবং নতুন জীবনের বাধা ঘটাচ্ছে। এমনকি যাঁরা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাঁরাও আমার সৃষ্টিকরা ছাঁদগুলো লড়াই করার জন্যে ব্যবহার করতে বাধ্য হন।'

আসার অনুরোধ জানিয়ে জর্জ দুআমেল ও এমিল রনিজেকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। দু'জনেই এলেন একই সময়ে, একজন পারী থেকে, অন্যজন রেইনু-ফেল্ডেন থেকে। তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে এলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম (সব সময়েই সঙ্গে দোভাষী আমার বোন যে, গত দশটি বছর কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে নিঃসঙ্গতা আর বিপদ,—রাশছেঁড়া জনতা, অন্ধ জনমত আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাধীন চিন্তাবিদ এবং মুক্তমতি আদর্শবাদীদের যা বিধিলিপি। আমি বললাম, ভারতবর্ষের চিন্তাবিদদের আরও উদ্বেগজনক যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয় আদর্শবাদীদের কাছে পাঠানোর জন্যে যে-আবেদন আমার কাছে করেছিলেন, তাতে আমি কতখানি অভিভূত হয়েছিলাম। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এবং এই চিন্তাই আমাদের মনে—আমার ও এমিল রনিজের মনে এক আন্তর্জাতিক "মৈত্রীভবন"-এর কল্পনা জাগিয়ে দিয়েছে: দুআমেল ও আমি সেখানে ফ্রান্সের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ দুআমেলকে কয়েকটি শ্রুতিসুখকর কথা শোনালেন (বললেন যে, তিনি বেশ পরিচিত এবং যুদ্ধের সম্পর্কে লেখা তাঁর বইগুলো ভারতবর্ষে প্রশংসিত), রনিজে বললেন তাঁর মৈত্রীভবনের খসড়াটা বুঝিয়ে দিতে। রনিজে বললেন, শান্তিনিকেতনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের জন্যে তিনি যা করেছেন, ইউরোপের জন্যে তিনি ওই রকম কিছু করতে চান। কিন্তু এই ভীতু মানুষটি (তাছাড়া একটু কানে কম শোনেন, তাঁর ফরাসীতে দখল ও পুরো হয়নি) বড় একটা বোঝাতে পারলেন না। তার বদলে আমি তাঁর সাধারণ পরিকল্পনার ৪টি কি ৫টি নির্দেশক জানানোর চেষ্টা করলাম: প্রকাশনা, সাময়িকী, মহাফেজখানা, আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এবং অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে প্রস্তাব করলাম যে, আমাদের ইচ্ছে, ইউরেশিয়ান-রিপোর্টের (Eurasische Berichte) আগামী সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হবে কবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উদ্দেশে, গান্ধীর চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-চিন্তা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে তার উদ্দেশে, এই বিরোধী দ্বৈত-ক্রিয়ার উদ্দেশে, এবং গোটা দুনিয়ার পক্ষে অতি গুরুতর ভারতবর্ষের বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতার উদ্দেশে,—যে-ভারতবর্ষে গান্ধীপন্থী অসহযোগের মুখোমুখি স্বাধীন চিন্তা জাতীয়তাবাদগুলোর মুখোমুখি ইউরোপের স্বাধীন চিন্তার মতো একই অবস্থাতে পড়ছে। কারণ ওখানেই স্বৈরাচারী মতান্ধতার এক বিষাদকরুণ দৃষ্টান্ত, যাতে কার্যত সবচেয়ে উন্নত এবং পবিত্র ধর্মীয় চিন্তার ইতি হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করলেন। এই মুহূর্তে জগতের সামনে বিরোধগুলোর চেহারা হাজির করতে তাঁর যে নৈতিক বিমুখতা আছে, তার কথা বললেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এর সঙ্গে ভীষণ

জড়িত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসভাজন বিচক্ষণদের এই ছোট চক্রে বেশ একটি দীর্ঘ বর্ণনায় তিনি সেটি ব'লে গেলেন। তাতে, নতুন ক'রে গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ (raucune) ঢুকে পড়তে মোটেই দেরি হলো না। তিনি গান্ধীকে দেখালেন শিল্পীর অনুশীলনের পক্ষে এক বিস্ময়কর কৌতূহলজনক বিষয়বস্তু হিসেবে,—চূড়ান্ত জটিল, বিশালত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের মিশ্রণ, এক উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর রুচিতে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক এবং তাঁর নৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণাগুলো এই লক্ষণে দুষ্ট। তিনি জোর দিলেন তাঁর পরিবর্তনশীলতার উপরে, তাঁর পরস্পর বিরোধিতাগুলোর উপরে, যে-আপসগুলো তিনি মেনে নিয়েছেন সেগুলোর উপরে এবং এই ধরণের গোপন অসাধুতার (mauvaise foi) উপরে—যা কুতার্কিকের মতো তাঁকে দিয়ে প্রমাণ করায় যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই পুণ্য, সেটাই দিব্য নিয়মের, এমনকি যখন তা সম্পূর্ণ বিপরীতও হয় এবং তিনি তা না জেনে পারেন না। (তাছাড়া, এটি ভারতীয় মনের একটি প্রবণতা, সে-মনের অনুরাগ কৃত্রিম আইনগত যুক্তি-প্রদর্শনের প্রতি এবং সে একে ব্যবহার করে নিজের কাছে প্রমাণ করার জন্যে যে, তার বাসনাই হচ্ছে তার কর্তব্য।) তিনি আবার ফিরে এলেন গান্ধীর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ প্রসঙ্গে, যা তিনি আগেই আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। এবং অবশেষে নিজেকে পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে তিনি মহাত্মাজীর বীরোচিত গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করলেন। আমাদের এই ধারণা হলো (আমাদের চেয়ে দ্যুআমেলের বেশি স্থূলভাবে) যে, গান্ধী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মধ্যে বেশ কিছু মিশ্রিত মনোভাব আছে,—এবং সম্ভবত বাস্তব যুক্তির চেয়ে মনোভাবগুলোই বেশি আছে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী: মানুষের দুটি জাতি, দুটি শ্রেণী (অভিজাত, 'প্রিন্স'—এবং লোকগুরু); দ্বন্দ্বটা হচ্ছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মের পয়গম্বর, যিনি দিব্য-বাণী (Le verde divin) ও নৈতিক মূল্যের সামনে বুদ্ধিগত মূল্যকে অবজ্ঞা ও খর্ব করেন এবং পরম শিল্পী, যিনি বেঁচে থাকেন তাঁর চিন্তার মহাকাশে—এঁদের মধ্যে। দ্যুআমেল যোগ করলেন: কে জানে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক মনোভঙ্গি গান্ধীর মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়ায় চালিত কিনা,—এবং গান্ধী যদি না থাকতেন বা অদৃশ্য হয়ে যেতেন, তাঁর স্থান কিছুদূর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দখল করতেন কি না?

বিজেতা ইউরোপীয়দের হাতে পীড়িত, অধঃপতিত ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্দশার চিত্র রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে তুলে ধরলেন,—এবং তাতে আমি ইতালীর ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে ফিরে আসার অজুহাত পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু বললেন তার ব্যাপক মূল্য আছে, এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে যে-শক্তি গলা টিপে মারে তার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তাঁর নিন্দাই শ্রেষ্ঠ অভিযোগ যা ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে করা যেতে পারে। আরও একবার আমি ধিক্কার দিলাম এর অপরাধীসুলভ জবরদস্তিকে এবং মহলানবীশ (তিনি উপস্থিত ছিলেন) ও রবীন্দ্রনাথকে খোলাখুলি বললাম, আমি বুঝতে পারি না আপনারা কী ক'রে এর পক্ষে ওজর খুঁজে বার করতে এবং একে লঘু করতে পারেন। সব কিছুই

সম্পর্কিত। ইতালির ক্ষমতার অপব্যবহারকে এবং চাপানো মিথ্যাচারকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের যুক্তিতে যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ভারতবর্ষের স্বার্থ সমর্থনের কোনো অধিকারও নেই। রবীন্দ্রনাথ ও মহলানবীশ কোনোই উত্তর দিলেন না, মাথা নিচু ক'রে রইলেন, মৃদু হাসতে লাগলেন, মনে হলো তাঁরা মেনে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা লিখে প্রকাশ করবেন।

আমি তখন নিজে ভার নিলাম তাঁকে বলার যে, ইতালি এবং ফ্যাসিবাদের উপরে তাঁর ইন্টারভিউ দেবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা ভেবেছি, সেটা ছাপানো হবে একটা বড় ফরাসী দৈনিকে। এবং আমি তাঁকে দ্যুআমেলের নাম করলাম এই ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে যোগ্যতম লোক ব'লে। রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন, কিন্তু বললেন, তাঁর পছন্দ উত্তরগুলো লিখিত ভাবে হবে, যাতে বেশি নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি যা বলতে চান তার বেশি না ব'লে ফেলেন। ঠিক হলো প্রশ্নগুলো দ্যুআমেল লিখিত ভাবে পেশ করবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নগুলোতে আটকে না থেকে বরং সেগুলো থেকে বরং প্রেরণা নেবেন। এবং তিনি উত্তর দেবেন লিখিত ভাবে।

চলে আসার সময় মহলানবীশ এবং রবীন্দ্রনাথ রনিজেকে ধরে রাখলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যে।

রাত্রে ভিলা অলগায় দ্যুআমেল আর রনিজে খেলেন।

৩০ জুন, ১৯২৬। দ্যুআমেল প্রশ্নগুলো লিখেছেন, সেগুলো রবীন্দ্রনাথকে পেশ করতে হবে। আমার বোন ইংরেজিতে তর্জমা করলো এবং আমরা একসঙ্গে আলোচনার পর টাইপ করলো। সেগুলো রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসা হলো, তিনি ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর উত্তর লেখার জন্যে সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে রইলেন।

চায়ের সময়ে এলেন শ্রীমতী ঠাকুর এবং শ্রীমতী মহলানবীশ ; শান্তিনিকেতনের ফটোর একটা এ্যালবাম আমাদের দেখতে দিলেন, সেগুলো তেমন চিত্তাকর্ষক নয়,— দু'য়েকটি সুন্দর গাছের ফটো ছাড়া, তাদের, নিচে গুরুমশায়রা পড়াচ্ছেন। আমার বোন, দুই ভারতীয়া, দ্যুআমেল, রণিজে এবং আমি পার্ক আর গ্রাঁশাঁ-র উপরের বনের মধ্য দিয়ে সিঅঁ পর্যন্ত বেড়িয়ে এলাম। দিনটা চমৎকার।

রাত্রে খাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত উত্তর পড়ে শোনাতে তাঁর হোটেলের ঘরে আমাদের ডেকে পাঠালেন ; আমার বোন সেটা আমাদের জন্য তর্জমা ক'রে গেল।

আর, তখন সে এক আতঙ্কজনক দৃশ্য ঃ

দ্যুআমেলের প্রশ্নগুলো পাবার আগে রবীন্দ্রনাথ তাদের উত্তর লিখেছিলেন একটি প্রবন্ধের আকারে। তিনি বললেন, প্রশ্নগুলো পড়ার পর, তিনি পরে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, তাদের মূল বক্তব্যের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে।

আসলে, তিনি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেননি।

প্রবন্ধটি ফাঁদা হয়েছে অস্পষ্ট ও এলোমেলো রীতিতে, যথাযথতার ধারেকাছে

যায়নি। আত্মসন্তুষ্ট ভাবে রবীন্দ্রনাথ এতে লিপিবদ্ধ করেছেন "ভালবাসা" ও শ্রদ্ধার সাক্ষ্যগুলোকে, ইতালিতে তিনি যার ভাজন হয়েছিলেন। তিনি ভালোই ইঙ্গিত করেছেন—কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে—যে, তিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের অতিথি ছিলেন এবং সরকারের চোখ দিয়েই সব দেখেছেন। তত্ত্ব ও বক্তৃতার ঢঙে তিনি ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক জনৈক ইতালীয় অধ্যাপকের সঙ্গে—যাঁর নাম তিনি দেননি—ফ্যাসিবাদের বিমূর্ত নীতিগুলো সম্পর্কে এক তৃপ্তিদায়ক ও সৌজন্যপূর্ণ আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন; ইঙ্গিত করেছেন সে-সব তিনি সমর্থন করেন না,—কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই ভঙ্গিতে, যে-ভঙ্গিতে দর্শনের ক্ষেত্রে অধ্যাপকসুলভ কোন হৃদয়াবেগ ছাড়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ খাড়া করা হয়, যা জীবনকে আগ্রহী না ক'রে আগ্রহী করে তোলে মনকে। তাড়ঘড়ি তিনি যোগ করেছেন যে, ফ্যাসিবাদের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি বিচার করতে পারেন না, তিনি কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেননি, কিছুই বোঝেননি, কিছুই জানেননি, তিনি হাত ধুয়ে ফেলেছেন। অবশেষে তিনি হঠাৎ থেমে গেছেন মুসোলিনির সঙ্গে ডবল সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ ক'রে; তাঁর এক স্তুতিকর ছবি এঁকে ঃ মুখের উপরের দিকে অদম্য প্রাণশক্তি, নিচু দিকে মানবিক স্নিগ্ধতা; তাঁকে তুলনা করেছেন আলেকজান্ডার এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে; এবং শেষ করেছেন কয়েক লাইনে,—সেখানে তিনি এইসব কর্মবীরদের চেয়ে চিন্তাবীরদের প্রতি তাঁর নিংকাম পক্ষপাতিত্ব জানিয়েছেন।

হতবুদ্ধি হয়ে আমরা শুনছিলাম; এবং কেউ কারুর দিকে তাকাতে সাহস করছিলাম না। যখন তিনি শেষ করলেন, শীতল কঠিন স্তব্ধতা নেমে এলো। তবু কথা বলা দরকার। আমি আর দ্যুআমেল দ্রুত দৃষ্টি ও কথা বিনিময় করলাম (কথা হলো ফরাসীতে—যা আমাদের অতিথি মোটেই বোঝেন না, তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন; কিন্তু তখন তখনই তাঁকে উত্তর দিতে আমরা অস্বস্তি বোধ করছিলাম; এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনেই নিচু গলায় কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম; তিনি আমাদের অসন্তুষ্টি বুঝতে পারছিলেন এবং নিজেও আমাদের অস্বস্তির পাল্লায় পড়ে একটা বই তুলে নিলেন মনের ভাব চাপা দেওয়ার জন্যে।) পরে দ্যুআমেল বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পড়াটা তাঁকে এমন এক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যে, তিনি মাঝপথেই প্রায় উঠে পড়েছিলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। মানুষের দুর্বলতায় আমি তাঁর চেয়ে বেশি অভ্যস্ত এবং বড় ধরনের মোহ থেকে মুক্ত; আমি ওজর দেখালাম রবীন্দ্রনাথের বয়সের, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থার, এবং তাঁর চরিত্রের, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজনের, তাঁর বিশ্রাম বিঘ্নিত হবার ভয়ের; এবং ইতালীয় নিমন্ত্রণ-কর্তাদের প্রতি পালনীয় তাঁর প্রকৃত কর্তব্যের—সে-নিমন্ত্রণকর্তা যাঁরাই হোন না কেন, আর তাঁদের আমরা যেভাবেই বিচার করি না কেন। এতে আমি কম আশাহত, কম দুঃখিত হইনি। এবং হৃদরোগে আক্রান্ত এই বিশিষ্ট মানুষটির প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা থাকা উচিত সে-সব নিয়েই আমরা বাধ্য হলাম তাঁর কাছে মোটেই গোপন না-করতে যে,—আমরা তাঁকে সমর্থন করছি না।

একেবারে প্রথমেই দ্যুআমেল আমাকে জানিয়ে দিলেন, এ হেন প্রবন্ধ তিনি

কোনো ফরাসী দৈনিকে দিতে রাজি নন, এটা হয়েছে 'রেভ্যু দ্য মঁদ্'-এর প্রবন্ধ ; তিনি অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করলেন, এবং বললেন যে, কবির মনোভাব বিচার করার প্রয়োজন তাঁর নেই, এই প্রবন্ধটি সেই রকম যা কবিই লিখতে পারেন, কিন্তু এ আমাদের উদ্বেগের কোনটিরই উত্তর দেয়নি। আমি বললাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে না, এ কবির উদ্বেগেরও উত্তর দিয়েছে ঃ কারণ তাঁকে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ইতালীয় সংবাদপত্রে বিরক্তিকর মন্তব্যগুলোর ফলে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে' তা যদি তিনি কাটাতে চেয়ে থাকেন, তাহলে প্রবন্ধটি তার পক্ষে বড়ই অস্পষ্ট এবং ঢাকাঢুকি দেওয়া। আমরা যা ভাবছি তার কঠোরতা এই অতিসংবেদনশীল বন্ধুটির কাছে যাতে বেশি প্রকাশ না পায়, তার জন্যে আমাদের নিজেদের উপরে যে জবরদস্তি খাটাতে বাধ্য হচ্ছিলাম. তাতে বিব্রত হয়ে বেশ অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম এই নিয়েই ; কিন্তু তিনি তা অনুমান করতে পারলেন ; আর সেটা আমার কাছে বেদনাদায়ক, যতটা বেদনাদায়ক তাঁর কাছে। তিনি তাঁর স্টাইলের ধরন দিয়ে নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করলেন. তাঁর স্টাইল চিত্রকল্প দিয়ে চিন্তাকে সজ্জিত করে। কিন্তু দ্যুআমেল তার কিছুটা গুরুভার এবং নির্মম স্পষ্ট সত্যতা নিয়ে তাঁকে বললেন যে, গতকাল তিনি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনেছেন ঃ তাঁর তর্কপদ্ধতির তিনি তারিফ করেছেন, সেটা ইউরোপের তর্কপদ্ধতির চেয়ে সন্তোষজনক ; তিনি তারিফ করেছেন তাঁর সেই বাস্তব যথাযথতাকে, ইচ্ছে করলে যাকে তিনি প্রয়োগ করতে জানেন তেমন-আঁকা ছবির উপরে, যেমন এঁকেছিলেন গান্ধীর ছবিটি ; এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে—যেমন তিনি করেছেন—নিজের চিন্তাকে নিখুঁত ভাবে ঢাকতে জানেন, এবং ইচ্ছে করলে তার ঢাকা খুলতেও জানেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন, বিব্রত হলেন, হাসলেন। ইতালির ব্যাপারস্যাপারে তার অজ্ঞতার দোহাই দেবারও চেষ্টা করলেন, তাঁর প্রবন্ধটি সমর্থন করারও চেষ্টা করলেন, প্রবন্ধটির ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক সমালোচনা অতিরঞ্জিত করলেন। আমি বললাম, তিনি যেহেতু ইউরোপের কাছে বলতে চান, তাঁকে ইতালীয় মানসিকতার এবং সেখানে এই কথাগুলোয় যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ইতালি আর তার ফ্যাসিবাদের কথা বলেছেন যেন নিরাসক্ত টুরিস্টের মতো টুরিস্ট-ট্রেনের শয়নযান থেকে—যে আসে আর চলে যায়। আর আমরা আটকে আছি নদীর পাড়ে—যারা আমাদের ঘিরে আছে, যারা আমাদের মিনতি জানাচ্ছে—তাদের কণ্ঠস্বরের, আমাদের নিহত বন্ধুদের বেদনায় নিদারুণ পীড়িত হয়ে ; আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি কবি রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে কী বলতে যাচ্ছেন,...তিনি আমাদের কিছুই বললেন না। তিনি মুসোলিনির এক প্রীতিপ্রদ ছবি এঁকেছেন। তাঁকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজেকে মুক্ত ব'লে বিশ্বাস করেছেন !...নেপোলিয়ন !...এ হেন তুলনার ভয়ংকরত্ব কি তিনি নিজে বুঝতে পারেন না ? সমস্ত অপরাধ সমেত নেপোলিয়ন মুসোলিনি এবং ইতালীয় জনসাধারণের কাছে এক গৌরবের আদর্শ, যাকে রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছাকাছি টেনে এনেছেন দেখে তারা উল্লসিত হয়ে উঠেছে ! এহেন প্রবন্ধ ইউরোপে ফ্যাসিবাদের

দেবায়ন ব'লে গণ্য হবে। নিরীহ কিন্তুগুলো পেছনে পড়ে থাকবে...এবং দুআমেল রবীন্দ্রনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, (ফ্যাসিস্ট ইতালির পর) নির্বাসিত ইতালিকে,—নিষিদ্ধ ঘোষিতদের—এবং সর্বাগ্রগণ্য সালভেমিনিকে দেখার আগে মতামত দেওয়া এবং প্রবন্ধটি প্রকাশ যেন বন্ধ রাখেন। তখনই—একমাত্র তখনই তার বিচার করার অধিকার হবে। দু'পক্ষের কথাই তাঁর শোনা হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রবন্ধটি আবার দেখবেন, ফ্যাসিবাদের সমালোচনা আরও জোরাল করবেন এবং পরিষ্কার ক'রে দেখাবেন। কিন্তু এতে আমাদের প্রত্যয় জন্মাল না—তাঁরও না। এখন আমরা ভালো করেই বুঝতে পারছি যে তিনি সরাসরি অভিমত দেওয়াটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, যা করতে তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে। আমাদের দলে টানবার জন্যে যখন তিনি ইতালিতে থাকাকালীন কয়েকটি কাহিনী শোনালেন,—বিশেষ ক'রে শোনালেন বেনেদেত্তো ক্রোচের অবিশ্বাস্য কাহিনীটি,—আমরা ভালো করেই দেখলাম, ফ্যাসিবাদ ইতালির মনকে মিথ্যা ও নীচতার যে-অবস্থায় টেনে নামিয়েছে তার সম্পর্কে তিনি যে জানেন না, একথা সত্য নয়; একথা সত্য নয়, যেমনটি তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইতালিতে তিনি কিছুই জানতে বা অনুমান করতে পারেননি; তিনি জেনেছেন, অনুমান করেছেন। কিন্তু তা বলতে চান না; তা তাঁকে বিব্রত করে। এবং প্রশ্নটি কৌশলে এড়াবার জন্যে তিনি নিজেকেই যুক্তি দেখাচ্ছেন।

রাত ১১ টায় আমরা তাঁকে ছেড়ে এলাম। আমাদের মন ভেঙ্গে গেছে (দুআমেল তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত মারমুখী, সহানুভূতিবর্জিত)। আর রাত্রে এই ভেবে আমার এতো বেদনা যে, আমরা তাঁর নিন্দা করছি এই চিন্তা ক'রে বৃদ্ধ মানুষটি কত বেদনা ভোগ করছেন...

(মহলানবীশের আগেই-বলা ক্রোচের কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বর্ণনা অনুসারে সংশোধন ক'রে নিতে হবে এইভাবে:

রোমে পৌঁছুবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল মুসোলিনির অনুমতি ছাড়া তা অসম্ভব। তিনি অবাক হলেন, চটে গেলেন। কিন্তু ঠিক পরদিন তিনি মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করলেন; এ সম্পর্কে তাঁকে বললেন। অধ্যাপক ফর্মিচি হাজির ছিলেন, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: অসম্ভব!...অসম্ভব!..." শান্তভাবে মুসোলিনি বললেন: "আসলে তিনি রোমে নেই।' —রবীন্দ্রনাথ বললেন: "তা ঠিক, কিন্তু তিনি ইতালিতে আছেন। তিনি যেখানেই থাকুন, দেখা করতে আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত।" দেখা গেল মুসোলিনি কেবলই বলে চলেছেন: "কী দুঃখের! কী দুঃখের! তিনি কোথায় কেউ জানে না।" রবীন্দ্রনাথ জিদ ধরে বসে রইলেন। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে কেউ বুঝে উঠতে পারবে না, তিনি ইতালি থেকে চলে এলেন তাঁকে না দেখেই, যাঁকে ইতালীয় চিন্তার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়। ক্রোচেকে খুঁজে বার করার জন্যে অবশেষে মসোলিনি ফর্মিচিকে ভার দিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেশ সন্দেহ হয়েছিল, এই নির্দেশ পালনের জন্যে ফর্মিচি

কিছুই করবেন না। প্রকৃতপক্ষে কিছুই হতো না যদি-না এক ইতালীয় ক্যাপ্টেন [যিনি সেখানে ছিলেন, অথবা ঠিক পরেই যিনি জানতে পেরেছিলেন]—এক তরুণ, গোপন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, ক্রোচের ছাত্র ও দার্শনিক—সেই রাত্রেই ক্রোচের খোঁজে নেপলস অভিমুখে বেরিয়ে পড়তেন ; এবং ক্রোচে নিজেই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে আসার জন্যে রাতের এক ট্রেন ধরলেন, যেদিন রবীন্দ্রনাথ রোম ছেড়ে যাচ্ছেন সেদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে বললাম যে বিনা মন্তব্যে এই কাহিনীর সরল বর্ণনাই তাঁর প্রবন্ধের চেয়ে বেশি ফলপ্রদ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কথা বলা অসম্ভব! অমুক না তমুক লোককে এ ফ্যাসাদে ফেলতে পারে...ইত্যাদি।)

১ জুলাই, ১৯২৬। দ্যুআমেল ও রনিজের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্যুআমেলের এক অসমীচীন চরম কঠোরতা। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখা করিয়ে দিয়েছি ব'লে দুঃখ বোধ করছি। এমনকি তিনি পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন (- তা তিনি কাজে পরিণত করবেন, যদি আমার বোন ও আমি প্রতিবাদ না করি যে, রবীন্দ্রনাথ একরকম আমাদের অতিথি এবং আমাদের আঘাত না ক'রে তাঁকে আঘাত করা যায় না), যে-দুদিন কাটালেন তার কথা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার কথা প্রকাশ্যে বলে দেবার ; তাঁর ছুতো হলো, কবিকে জাগিয়ে তুলতে এমন আঘাত দরকার হতে পারে। আমি বললাম, এটা ওঁকে মেরে ফেলবে ; এটা হবে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা। দ্যুআমেল নির্মম এই জন্যে যে, তিনি দাবি করেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধানভাবে তিনি দেখেন : আত্মশ্লাঘার এক প্রয়োজন, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা কুড়ানোর লালসা,—এবং এই জাঁকালো সমারোহ, যা তাঁকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং তাঁকে প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের এবং আচার-আচরণের সরল সাধাসিধে বা অভ্যাসগত চরিত্রটি তিনি দেখেন না। সুসময়ে তাঁর পক্ষপাতহীন বছরগুলোর এবং বীরোচিত সংগ্রামের কথা তিনি কিছুই জানেন না। যে মধ্যপন্থা অনেক বছর ধরে দ্যুআমেলকে বিরোধী শিবিরগুলোর মধ্যে দোলাচলচিত্ত ক'রে রেখেছিল, তার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থেকে বিরত হতে দ্যুআমেল নিজেই যখন দেরি করেছিলেন, তখন এক বৃদ্ধের অপারগতা সম্পর্কে এতোটা আপসবিরোধী হয়ে উঠবেন,—এ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। (সে-সম্পর্কে তিনি সচেতন ; তিনি যখন লেঅঁ দোদের সঙ্গে একই কমিটিতে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন, তখন আমি যে-ভর্ৎসনা করেছিলাম, সে-কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যাপার থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারের পার্থক্য দেখিয়ে তিনি এ থেকে নিজেকে কাটান দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরই মতো রবীন্দ্রনাথ গতকাল তাঁর মনোভাবের ব্যাখ্যার জন্যে আমাদের—নিজেকে যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এমন একভাবে, যা আমাদের এবং তাঁকে যেন শান্ত করতে পারে।)

সাড়ে তিনটের সময় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দলের সঙ্গে স্টিমারে বেড়াতে গেলাম। দুআমেল ও রনিজে আমাদের সঙ্গে পারঘাটা পর্যন্ত এলেন, তাঁরা সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন, সাড়ে তিনটের প্রথমজন গেলেন পারী, দ্বিতীয়জন রেইন্‌ফেল্ডেনের দিকে। ভিলন্যভ এবং স্যাঁ-গাঁগলফে মাঝখানে স্টিমারে দু'ঘন্টা। দিনটি চমৎকার। ভারি মিষ্টি রোদ। (কবি আসার পর থেকেই এই রকম। তিনি বলতে ভালবাসেন যে এটাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁর নামের অর্থ ‘সূর্য’’ এবং তিনি সর্বত্র তাকে সঙ্গে নিয়ে চলেন।) আমরা জন বারো লোক। ভারতীয় ছোট দলটির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুটি ইংরেজ মহিলা, তাঁরাও আছেন বিরঁ হোটেলে এবং তাঁদেরও আমরা আমন্ত্রণ করেছি: উপন্যাস-লেখিকা লুকাস ম্যালেট্‌ (চার্লস্‌ কিংস্‌লের মেয়ে) এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্টিমারে চা খাওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথ একবার বসে জায়গা থেকে আর নড়ছেন না, দৃশ্যাবলী দেখছেন কি দেখছেন না, কিন্তু হাওয়া ও জল উপভোগ করছেন; মাথায় তাঁর জরথুস্ত্রীয় টুপি—ইরাণি রসায়নবিদের টুপি—বেগুনি রং, লম্বা জোব্‌বার ধূসর রং; বলা নিরর্থক যে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেন। (তাঁর দু'ভাগে ভাগ করা দাড়ি এবং লম্বা সাদা চুলে তাঁকে যেন দেখায় অনন্ত-পিতা। একজন মহিলা বললেন, তাঁর মনে হলো তিনি দেখলেন, ভগবান ঢুকলেন!)...আমার বোনের সঙ্গে আলাপচারীতে শ্লেমের যে ফটোগুলো তুলেছেন, সেগুলো তাঁকে আমরা দেখালাম, এবং তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগলো সেইটি, যাতে বাগানের মধ্যে আমরা সকলেই রয়েছি।...তিনি ফিরে গেলেন গতকালের প্রবন্ধ-পাঠের প্রসঙ্গে; এবং তিনি চেষ্টা করলেন আমার বোনের তাঁর নিজের প্রত্যয় জন্মাতে যে, প্রবন্ধটি ত্রুটিহীন। “ইংরেজি প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর অত্যন্ত দখল আছে। প্রবন্ধের মধ্যে যা শ্লেষে ঢাকা আছে তা তাঁর জানা আছে; এবং তিনি নিশ্চিত যে, তাঁর ইতালীয় বন্ধুরা তা বেশ বুঝে ফেলবেন: তাঁদের অসন্তোষের প্রকাশ এড়াবার জন্যে তিনি ফেরার সময় ইতালি হয়ে যাতে না যেতে হয় তার খেয়াল রাখবেন।” আমি হলফ ক'রে বলছি, এসবের মধ্যে আমি দেখছি, আমাদের অনুমোদন তাঁর মধ্যে যে মনস্তাপ জাগিয়ে তুলতে পারে, তা সরিয়ে দেবার জন্যে নিজেকেই ধাপ্পা দেবার একটা চেষ্টা। তাঁর এই জাঁকালো প্রশান্তি—যা এক প্রাচ্য অভ্যাস—সত্ত্বেও তিনি এক গোপন উত্তেজনার অবস্থায় আছেন। তিনি এক জায়গায় আটটা দিনও বসে থেকে বিশ্রাম নিতে পারেন না, নিজের সঙ্গে তো একটা দিনের অর্ধেকও কাটাতে পারেন না। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও—যাঁদের বিধান একটিও তিনি মানেননি (তিনি বলেন, তাঁর ওষুধও যেদিন বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই তিনি অত্যন্ত ভালো আছেন)—তিনি রবিবার সন্ধ্যায় ভিলন্যভ থেকে যেতে চাইছেন সোমবার জুরিখে একটা বক্তৃতা দিতে; এবং তারপরেই তাঁকে আবার ভবঘুরের পথ ধরতে হবে: প্রাগ, ভিয়েনা, পারী, লন্ডন...এমনকি আমেরিকাতেও (সম্প্রতি তার সম্পর্কে যে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন তা সত্ত্বেও) এক নতুন সফরের কথা বলছেন। তাঁর এক নিরন্তর প্রয়োজন আছে ভুলবার চেষ্টার, ঘুরে বেড়াবার, দেখে বেড়াবার—যা নিজেকে দেখিয়ে বেড়াবার?)। এটা কেমন একটা অসুস্থ জিনিস এবং এটার প্রতি নিঃসন্দেহে তাঁর

মনের টান। দুঃখের বিষয়, একমাত্র যিনি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সেই আমাদের বন্ধু ডাক্তার অয়মেরালি উপস্থিত নেই,–নিজেই তিনি অসুস্থ ; তাঁর জায়গায় যাঁরা আছেন—লোজানের ডাঃ দেমিয়েভিল এবং ভেভে-র ডাঃ মিয়েভিল–তাঁরা তাঁদের বিখ্যাত মক্কেল সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীন। আর রবীন্দ্রনাথের পরিবার বলতে, মনে হয় যেন তার অস্তিত্বই নেই। ছেলেকে মনে হয় ভালো মানুষ, অনুগত, পিছনে থাকেন ছায়ার মতো। বিনা তর্কে রবীন্দ্রনাথের খামখেয়ালি ইচ্ছা শিরোধার্য করা হয়।

রাতে খাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের ছেলে, ছেলের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর এবং ত্রিপুরার তরুণ রাজকুমার আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। তাঁরা পারী রওনা হবেন, সেখানে প্রতিমা তাঁর বান্ধবী আঁদ্রে কার্পেলের অতিথি হবেন। প্রীতির সঙ্গে তিনি আমাদের শান্তিনিকেতনে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর শ্রী এবং মর্যাদাবোধ আমাদের ভালো লাগে।

২ জুলাই, ১৯২৬। আমি দ্যুআমেলকে লিখলাম প্রার্থনা জানিয়ে, আমাদের অতিথিরা তাঁকে যে মনের কথা বলেছেন তা যেন বাইরে না বলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি নরম ভাব দেখাতে এবং এমনকি সুবিচার করতে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম ; বহু বছর ধরে তিনি যে পক্ষপাতহীনতা ও নির্ভীকতা দেখিয়েছেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। বয়স ও অসুখের দরুণ তাঁর যে অপারগতা, তা দিয়ে তাঁকে বিচার করাটা ঘোর অন্যায় হবে। "আমরা এখনো মরিনি। আমরা কি জানি আমাদের অপারগতা কেমন হবে ?"

আমার বোন রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার পাঠ নিতে যায়, কিন্তু কয়েক বার যাবার পরই তার বিরক্তি ধরে গেল। কোন্ গ্রন্থটি তাঁর চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তাঁর চিন্তা সবসময়েই গতিশীল এবং তাঁর কোনো পুরনো গ্রন্থে তা পুরোপুরি আছে ব'লে মানেন না ; 'সাধনা'-র সময় থেকে তার বিবর্তন হয়েছে ; এবং রবিবারে তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন—যদি সেগুলো সংকলনে একত্র করার মনস্থ করেন,—আজ সমগ্রভাবে সেই বক্তৃতাগুলোই হবে তার যথাযথ প্রকাশ।...পরজন্ম ও আত্মার অনন্তত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, সতর্কভাবে তিনি একমাত্র নিশ্চিত বিজ্ঞান এবং স্বতোপলব্ধি (intuition) বা মনের স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য করলেন। তাঁর দিক থেকে তিনি এই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা সব সময়েই কম-সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবার দেহধারণ করে, প্রতিবারই জীবনের ও চিন্তার বৃহত্তম আয়তন আলিঙ্গন করে। চরম সংজ্ঞা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে মতামত দেওয়াটা তিনি এড়িয়ে গেলেন। স্যর জেমস ফ্রেজার এসে পড়ায় এই কথাবার্তায় বাধা পড়ল।

অপরাহ্ণে বোনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমে তিনি ফ্রেজারের এই সাক্ষাতের কথা বললেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে, আর্জেন্টিনায় আমেরিকান-

ইন্ডিয়ানদের অনুষ্ঠান ও উৎসব নিয়ে তোলা একটা ফিল্ম তিনি দেখেছিলেন। পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ইন্ডিয়ানরা তাদের পুজো করছে বাঁশের ঝাড়ের আকারে। এই একই তুলনা বংশানুক্রম বোঝাতে ভারতবর্ষে চালু আছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কুলের" বদলে আমি হচ্ছি "ঠাকুর বংশের"। ভারতবর্ষ ও আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে আত্মীয়তার আরও একটা লক্ষণ। আমার মেক্সিকান ক্যালেন্ডারে রবীন্দ্রনাথ যে কালীদেবীকে আবিষ্কার করেছেন তাও ফ্রেজারকে জানিয়েছেন: এ সম্পর্কে ফ্রেজারের জ্ঞান নেই।

এ থেকেই কথাবার্তা চলতে লাগল গাছপালা সম্পর্কে; রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে মানুষের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার কথা বললেন। আমরা আমাদের ধারণা ও আমাদের উপকথার কাহিনীগুলো বলাবলি করলাম।

তারপর প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সম্পর্কে; 'গোরা'-কে তিনি তাঁর মুখ্য উপন্যাস ব'লে মনে করেন; দুঃখের বিষয় এটি ইউরোপে পরিচিত একটি খারাপ অনুবাদের মাধ্যমে, তাতে তাঁর স্টাইলের সব সৌন্দর্য চাপা পড়েছে। ২৫ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছিলেন ভারতীয় জাতীয় সংকটের গভীরতার মধ্যে। 'গোরা' প্রথমে বেরিয়েছিল 'ক্রমশঃ' হয়ে। এবং কাহিনীর শুরুতে পাঠকসাধারণ বিশ্বাস করেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করছেন। গোরা ভারতীয় নায়ক হিসেবে গণ্য হয়েছিল এবং সময়ে তার ধ্যানধারণাকে সমর্থন করা হয়েছিল। শেষ অংশে যখন নাচের পুতুল হুমড়ি খেয়ে পড়ল, রুদ্ধশ্বাস পাঠকসাধারণ একে আমল না দেবার চেষ্টা করেছিল এবং এমন ভাব করেছিল যেন পড়েইনি। কিন্তু একসঙ্গে বইটি বেরুনোয় প্রমাণের সামনে হার মানতে হয়েছিল: রবীন্দ্রনাথ তাদের ফাঁদে ফেলেছেন। আর তারা ক্ষেপে গিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ পুলিশের হাতে নিগ্রহ ভোগ করেছেন কিনা। তিনি বললেন, লর্ড কার্জনের সময়ে তিনি বড়লাটের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কথা বলেছিলেন; এবং সরকারের সচিবালয় তা বন্ধ করার জন্যে তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল: সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বিপজ্জনক যা কিছু বলেছেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক্ তাঁর পেছনে লাগা হয়নি। তাঁর প্রবন্ধাবলীর কিছু কিছু অংশ এক সংকলনে বেরিয়েছিল। সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং সম্পাদক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ছোঁয়া হয়নি। তবু শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ি সার্চ করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল; এবং তিনি তার অপেক্ষায়ও ছিলেন। ভয় দেখানো মোটেই কাজে পরিণত হয়নি। কেন হয়নি তা এখনো রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে ভাবেন: কারণ সেই সময়ে তিনি কোনো মতেই বিখ্যাত ছিলেন না; এবং তাঁর নামের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি এই অনুমান মন থেকে সরিয়ে দেন না যে, সরকারী মহলের কোনো পদস্থ ব্যক্তি হয়তো তাঁর কবিতা পড়ে থাকবেন এবং তা তারিফ ক'রে কবিকে তার দুর্গতি থেকে রেহাই দিয়ে থাকবেন। অন্যদিকে সবসময়েই বিপ্লবী সমিতিগুলো—তার নাম কাজে লাগিয়ে চাঁদা আদায়ের জন্যে হলেও—রবীন্দ্রনাথকে বিপদগ্রস্ত করাটা এড়িয়ে গেছে।

বেহাবাদের নেতা আব্দুল-বেহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁর মনে জোরালো দাগ কাটতে পারেননি। তাঁকে যা বলতে শুনেছেন তা সবই মহৎ এবং নীতিগত, কিন্তু মৌলিকতাবর্জিত। তাঁর পূর্ববর্তী বেহাবাদীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছু গোলমাল করলেন: প্রথম বাবু ও বেহা-উল্লাকে একই লোক বললেন। রবীন্দ্রনাথের মতে বেহাবাদে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের লক্ষণ বেশি। সেইজন্যে আমেরিকায় তার চাহিদা।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এবং চীনের ছাত্রদের উপরে বিপর্যয়কর মার্কিন প্রভাবের সর্বনাশা ফলের কথা বললেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাতিগত গুণগুলো হারায়, তার বদলে গ্রহণ করে মার্কিন মনের সবচেয়ে খারাপটিকে।

আমাদের বন্ধু অধ্যাপক আদলফ্ ফেরিয়েরের বোনের সঙ্গে এলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে। আমরা আগেই তাঁর পরিচয় দিয়ে রেখেছিলাম ভালো মানুষ ডাক্তারের* প্রতিচ্ছায়া ব'লে।

দুপুরের শেষ দিকে শ্রীমতী মহলানবীশ গল্প করতে এলেন আমার বোনের সঙ্গে। বাগানে বাঘের ছালের উপরে বাবু হয়ে বসে অনর্গল তাঁর জীবনের কথা, বর্ণভেদের কঠোরতায় বাধা-পাওয়া তাঁর বিয়ের কাহিনী ব'লে চললেন। তাঁর বাবা ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি-সম্মানিত কর্তা-ব্যক্তি; এবং শুধু আধা-ব্রাহ্মণ ও ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন মতাবলম্বী ব'লেই তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে বিধিমতে মিলতে পারেননি। ব্যক্তিগত ভাবে এই তরুণটির প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর বাবা-মা সাত বছর এই বিয়েতে বাধা দিয়েছেন। দুই প্রেমিকের একনিষ্ঠতা এবং রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপ অবশেষে বাধা দূর করেছিল। অসবর্ণ হিন্দুবিবাহের এটি প্রথম বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। এরপর আমাদের বন্ধু কালিদাস নাগ বিনা বাধায় শান্তা চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করতে পেরেছেন তার চেয়ে নিচু বর্ণের হয়েও। তরুণী রানী শ্রীময়ী, স্বাভাবিকতা স্বতঃস্ফূর্ত, সর্বদা বিশ্বাসপ্রবণ এবং হাস্যময়ী। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল স্নেহ। মহলানবীশ পেশায় কলকাতার কাছে আবহাওয়াবিদ। তাঁদের বাড়ি সহর থেকে দূরে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম নিতে আসেন।

(সামাজিক অভ্যুত্থান এবং মানবীয় ভাব-আবেগের উপরে পৃথিবীজাত (tellurique) এবং সৌরমন্ডলীয় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। আমরা একসঙ্গে নির্ধারণ করলাম, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ মনের এই যে একই প্রমত্ত চরম উত্তেজনা, একে ব্যাখ্যা করার পক্ষে কোনো যুক্তিই পর্যাপ্ত নয়।)

৩ জুলাই, ১৯২৬। ছেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দুপুরে ভিলা অলগায় খেতে এলেন। গত ৪০ বছর নিরামিষাশী হলেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় কারণে খাদ্যাখাদ্যের কোনো বিধিনিষেধ মানেন না; কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে ভাত, ম্যাকারনি এবং

---

* আদলফ্ ফেরিয়ের-এর বাবা ড. ফ্রেডেরিক ফেরিয়ের মারা গেছেন ১৯২৪ সালে।

বিশেষ ক'রে চিনি নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি সুরাপান করেন না, তাঁর ছেলে এ শুরু করেছেন কেবল ইতালিতে, কিন্তু এর পার্থক্য করেন শুধু রং দেখে।

হোটেল থেকে ভিলায় উঠতে যে কয়েক পা উঠতে হয়েছিল তাতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ব'লে মনে হলো। কিন্তু খাওয়ার শেষ দিকে তিনি সজীব হয়ে উঠলেন এবং আসার তিন ঘণ্টা পর তাঁকে যতো প্রাণবন্ত, যতো উৎফুল্ল দেখলাম তেমনি আর কখনো দেখিনি।

প্রথমে আমি গাছপালা সম্পর্কে আলোচনাটা আবার শুরু করলাম এবং তাঁকে সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক এই সম্পর্কিত বিচিত্র ফরাসী উপকথা শোনালাম; এরা রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিপরীত দেখিয়ে দেয় যে, খ্রীস্টধর্ম গ্রামদেশের প্রকৃতি উপাসনার কল্পনাকে কোনো মতেই নস্যাৎ করেনি, মানুষ ও দেবতাকে তারা গোটা প্রকৃতির সঙ্গে সৌভ্রাত্রে বেঁধেছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, গত বছর তাঁর উৎসবের জন্যে রীতি অনুসারে পাঁচটি পৃথক জাতের গাছ পোঁতা হয়েছিল: একটি দৃষ্টিশোভার জন্যে, অন্যটি স্বাদ-গন্ধের জন্যে, একটি ওষুধের জন্যে, একটি ধর্মের জন্যে ইত্যাদি।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক ফেরিয়ের-এর কী আলোচনা হয়েছিল। তিনি বললেন, ফেরিরের তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিক্ষায় 'যোগের' প্রণালী প্রয়োগ করা যায় কি না। তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'যোগ' এক জটিল বিজ্ঞান এবং পুরোপুরি না জেনে তার ব্যবহার করতে গেলে বিপজ্জনক হবে। তাছাড়া, 'যোগের' প্রাচ্য মনঃসংযোগের ধরনটা কোনো ক্রমেই ইউরোপীয়দের পক্ষে উপযোগী হবে না। ইউরোপের শিশুদের উপরে মানসিক নিবিষ্টতায় বিচ্ছিন্নতা এবং নিরংকুশ মৌন চাপিয়ে দিতে চাওয়াটা বেমানান হবে। কিন্তু কর্মতৎপরতার ইউরোপীয় প্রয়োজনে, আবিষ্কারের বা বাস্তবায়িত করার কোনো যথাযথ বস্তুতে, এই মনঃসংযোগের চেষ্টা করা যেতে পারে। কার্যত, যাঁরা সৃষ্টি করেন বা যাঁরা মানসিক অনুসন্ধানে নিবিষ্ট হন, ইউরোপ এবং এশিয়ায়, তাঁরা সকলেই না জেনেও যোগী। কিন্তু যাঁরা নিজেরাই মনঃসংযোগের সঙ্গে পরিচিত নন এবং যাঁরা কৃত্রিম উপায়ে এই 'যোগের' চেষ্টা করেন, যেমন আমেরিকানরা করেন, তাঁরা উন্মাদ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ রঙের কথা বললেন। লাল রঙে তিনি খুবই কম সাড়া দেন। (ইতালিতে, যেখানে প্রান্তরে পপির বিপুল বিস্তার আগুনের শিখার মতো জ্বলে ওঠে, তিনি খুবই কম আকৃষ্ট হয়েছেন।) তিনি পরম আনন্দ পান সবার উপরে নীল-বেগুনীর মাত্রাবিন্যাসে। সবুজের ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম তারতম্যও তাঁর কাছে স্পষ্ট রং; তিনি ভেবে পান না কী ক'রে যে এদের একটি নামে ডাকা চলে। আমি প্রশ্ন করলাম বাংলা-ভূখণ্ডের রং কেমন। বসন্তকালের ইউরোপের মাটির সূক্ষ্ম তারতম্যের বৈচিত্র ও শ্রীর ধারে কাছেও এ নয়। অতি সামান্য গাছ-পালা। মাটি বাদামী, গেরুয়া বা ধূসর; বর্ষাঋতুতে নদীর ধারে ধারে মাটি নিজেকে সাজায় সবুজ হয়ে-ওঠা গালিচায়। (বড় সমস্যা হচ্ছে পানীয় জল; তার জন্যে অনেক দূরে যেতে হয়; তাই পথিককে এক গ্লাশ জল দেওয়াটা বিশিষ্ট দান।) দেশের সমস্ত সমারোহ

আকাশে। একমাত্র তার কথা ভাবলেই রবীন্দ্রনাথের মন-কেমন-করায় পেয়ে বসে। তারই নিচে তিনি রাত কাটিয়েছেন এই আলোর সমুদ্রে অবগাহনের জন্যে। তেমনই তিনি পাহাড়ী দেশে বেশি দিন থাকতে পারেন না। এমনকি এখানেও যেখানে আমাদের লেমাঁর বিশাল বিস্তৃতির কল্যাণে দিগন্ত এতো বিরাট—তাঁর আকাশের আয়তনটি পান না।

আমারা আরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সে-সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁকে একেবারে শিশুকালে চিনতেন। তিনি একই জাহাজে ছিলেন, যে-জাহাজে শিশু অরবিন্দ তখন বয়স ৭ থেকে ৮, ভাই (বা ভাইদের) এবং মায়ের সঙ্গে ইউরোপে এসেছিলেন। এইটিই কৌতুহল-জনক যে, এই ভারতীয় গভীর চিন্তাবিদ পেয়েছিলেন পুরোপুরি এক ইংরেজি শিক্ষা এবং ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন অনেক পরে। শিক্ষিত হয়েছেন অক্‌স্‌ফোর্ডে, ইউরোপীয়ের মতো জীবনযাপন করেছেন, কেবলমাত্র ইংরেজিই বলেছেন, প্রাচীন ভাষাগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করেছেন, গ্রীকবিদ হয়েছেন! (তাঁর ভাই ইংরেজিতে উঁচু দরের কবি হয়েছিলেন।) তিনি যখন ভারতবর্ষে ফেরেন তখন তার কিছুই জানতেন না। ভাষার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার ফলে তিনি বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর বাংলা কখনো পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয়ে উঠেনি; তার মধ্যে কেমন যেন বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর বেদের টীকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উঁচু ধারণা। এতো প্রাচীন গ্রন্থের টীকা সম্বন্ধে গ্যারান্টি কমই থাকে ব'লে আমাদের যে আপত্তি, তার উত্তরে তিনি বললেন, এমনকি প্রাচীন টীকাকাররাও কেউ বেদের সমকালীন নন, তাই অরবিন্দের টীকা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। একথা সত্য যে, তিনি তাঁর যুক্তির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমালোচনার কোনো কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। অরবিন্দ সবসময়েই পণ্ডিচেরিতে থাকেন; কিন্তু কলকাতায় ঢুকতে পারতেন; তার বিরুদ্ধে জারি দণ্ডাজ্ঞা রদ করা হয়েছে। যদি তিনি না ফিরে আসেন, আসেননি তাঁর নিভৃত আশ্রয় এবং তাঁর ধ্যান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে; ফিরে এলে বিভিন্ন দলের ভাবাবেগের হাতে নাম ভাঙাতে দেবার ঝুঁকি নিতেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সর্বশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছুই জানেন না, সে-সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ তা বিচার করার জন্যে অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে এক উচ্চ স্তরের মানুষ ব'লে গণ্য করেন এবং তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবেচনা ও শ্রদ্ধা দেখালেন।

(আমরা তিলকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম; সৌরমণ্ডল ও গ্রহনক্ষত্রের কোনো পর্যবেক্ষণ অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন বৈদিক আর্যদের উদ্ভব সুমেরু অঞ্চলে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন, তিনি মনে করেন, এই তত্ত্ব দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত; কিন্তু এটি সময়ের বেশ প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে। সৌরমণ্ডলের এই ধরনের আবর্তনগুলো ঘটার পক্ষে হাজার হাজার বছর দরকার; এই এতো সময় ধরে একটা ভাষা অখণ্ডভাবে নিজেকে বজায় রাখতে পারে, এটা অসম্ভব বলে মনে হয়।)

হার্তোশ এলেন; তিনি এসে হাজির হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন, যেন তাঁরা পুরনো বন্ধু। প্রথমে তাঁরা কথাবার্তা বললেন শিশুশিক্ষা সম্পর্কে,—তারপর, কেমন ক'রে এসে গেলেন জাপানে; আর রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ, মর্যাদাবোধ, শিষ্টাচার, জন্মগত আভিজাত্য সম্পর্কে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তিনি গদগদ হয়ে উঠলেন গেইশা নাচ সম্পর্কে,—জাপানী থিয়েটার সম্পর্কে; এই থিয়েটার নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বললেন। তিনি বললেন, ভালো অভিনেতা বলে নিজে অহংকার করতেন, কিন্তু যখন জাপানী অভিনেতাদের দেখলেন, বুঝলেন তাদের কাছে তিনি শিশুমাত্র। তিনি থিয়েটারের একটা গোটা তত্ত্ব হাজির করলেন। থিয়েটার হচ্ছে—হওয়া উচিত—এক বিশেষ আর্ট। ইউরোপে এ তা নয়, এখানে এ গ্রন্থ আর অভিনেতার মধ্যে একটা আপস। ইউরোপের থিয়েটার অভিনেতাকে লেখকের অধীনস্থ করে ("কোন্ অধিকারে?"--জিজ্ঞাসুভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন)। মূলত ইউরোপীয় নাটক অভিনেতা ছাড়াই সম্পূর্ণ। সেক্সপিয়রের নাটক দেখার চেয়ে পড়তে ভালো; তার সংখ্যাধিক্যের ফলে অভিনেতা এই অসংখ্য ভূমিকার প্রতিটির কেবল একটি মাত্র দিকই দেখাতে পারে। জাপানে অভিনয় প্রকৃতই এক সৃষ্টিধর্মী স্বাধীন আর্ট, শুধু এর জন্যেই এ মূল্যবান। তাঁর দেখা একটা নাটক রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করলেন: এক রাজা এক অভিজাতকে নির্বাসন দিয়েছেন; সে তার অনুগতদের নিয়ে চলে যাচ্ছে; নগরের তোরণের কাছে তাকে থামানো হয়েছে; সন্দেহভাজন পলাতকদের বলা হলো তীর্থযাত্রী এবং তারা বই সামনে নিয়ে বিড়বিড় ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলো; কিন্তু যখন তথাকথিত বইগুলোয় চোখ পড়ল, দেখা গেল একটা সাদা পাতা ছাড়া কিছুই নেই। জিজ্ঞেস করা হলো তাদের দলপতি কে। সন্দেহ অন্য দিকে সরিয়ে নেবার জন্যে দলের এক জন এগিয়ে এলো। পরীক্ষার জন্যে এক বিশাল পাত্রে মদ আনা হলো, এক চুমুকে তা খেতে হবে; তারপর মুখে মুখে একটা কবিতা রচনা করতে হবে এবং নাচতে হবে (সে-সময়ে যে-কৃতিত্বগুলো অভিজাতদের জন্যে আলাদা করা ছিল)। ছদ্ম দলপতি পরীক্ষা দিলো এবং তাতে উত্তীর্ণ হলো। দলটি বেরিয়ে যেতে পারলো। এই হচ্ছে নাটকটি। রবীন্দ্রনাথ বললেন এটা একটা জগৎ। কোনো বাস্তব তুচ্ছতা নেই। এক মর্যাদাপূর্ণ চালচলন, এক স্বাভাবিক এবং কল্পকথার জাঁকজমক,—বাদ্যবৃন্দ, মঞ্চের একটি পাশ থেকে মাঝে মাঝে বিলাপ শুনিয়ে চলেছে, অথবা বেহালার আঘাতে ক্রিয়ার তালের যতি রেখে চলেছে। অভিনেতাদের চলন-বলন তালের সঙ্গে সঙ্গীত রাখছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, থিয়েটারকে হতে হবে একধরনের নাচ, যার গতিভঙ্গির তাল মিল রেখে চলবে কবিতার তালের। বাস্তব বা প্রাত্যহিক জীবনের কাছাকাছি অঙ্গভঙ্গি এবং চলাফেরার তালের উপরে নির্ভরশীল পশ্চিমের নিয়মিত পদ্য-আবৃত্তি দেখার মতো কিছুতে আর কিছুই নেই। আরও বলতে, জাপানী থিয়েটারে, একটা রাস্তা মঞ্চকে একই সমতলের প্রেক্ষাগৃহের পিছনের দিকে বরাবর যুক্ত করেছে। এতে নাটকের নায়কদের দেখা যায়, অনেকক্ষণ ধরে, আসছে, চলে যাচ্ছে; এবং নাটকের ক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়, একটা পরিবেশে ঘিরে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলে চললেন উৎসাহে,

আনন্দে, অর্কেস্ট্রার ঘা-মারা যন্ত্রগুলো এবং তাদের টানা তাল অনুকরণের জন্যে এক হাতে অন্য হাতের তালি বাজিয়ে। তাঁর দুই চোখ জ্বলজ্বলে। তিনি আনন্দিত। তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন সেই সাড়ে তিনটেয়।

কথাবার্তায় এই তিনটি ঘন্টা রবীন্দ্রথাথের ছেলে চুপ ক'রে বসে ছিলেন। বাবার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিলেন। এবং এই আচরণ তাঁর ক্ষেত্রে দৃঢ়মূল অভ্যাসের মতো দেখা গেলেও, তাঁর জন্যে আমার দুঃখ হয়। বাপের বিপুল আওতায় যে ছেলেরা শ্বাসরুদ্ধ হয়, তিনি তাদের একজন।

অপরাহ্ণে পর পর কথা হলো মার্তিনের সঙ্গে, তারপর মহলানবীশের সঙ্গে; মহলানবীশ অনেকক্ষণ ধরে বিশ্বভারতীর (যার কর্মপরিষদে আমি আছি সাম্মানিক সদস্য হিসেবে) সংগঠনের বিস্তৃত পরিচয় দিলেন এবং তাকে বাড়াবার উপায় সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কথা, আর তা আমাদের উপরে যে বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার কথা আমি তাঁকে গোপনে আবার বললাম। আমি তাঁকে বললাম, যুদ্ধের সময়ে-বলা তাঁর কোনো কোনো উচ্চাঙ্গের স্বাধীন বক্তব্য, সাম্রাজ্যবাদ যন্ত্রবাদ ও পশ্চিমের অন্ধ শক্তির প্রতি ভবিষ্যদ্বক্তাসুলভ ধিক্কার—এবং তাঁর উপরে আরোপিত আপাতপবিত্র ভূমিকা—এ সবের চেয়ে তাঁর কবিকর্মের ওপরে তাঁর জনপ্রিয়তা ইউরোপে খুবই কম নির্ভর করে; তাঁর কবিকর্ম লোকে কম জানে, কিংবা মোটেই জানে না। আজ পশ্চিমের নিকৃষ্টতমসাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, পাশবিক ডিক্টেটরবাদের সঙ্গে তিনি আপস করেছেন ব'লে মনে হওয়ায়, এক ধাক্কায় তা হারাবার ঝুঁকি নিচ্ছেন। চিন্তাধারায় আমার চেয়েও নরমপন্থী দ্যুআমেলের মতো মানুষের বিদ্রোহ এক বিপদসংকেত। বিচলিত মহলানবীশ বললেন যে, তিনি ইউরোপের ইতালীয়দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটাবার জন্যে সমস্ত কিছু করবেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এবং তার বিরুদ্ধে তাঁকে আলোকপাত করতে পারবেন। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, ইতালীয় নিমন্ত্রণ-কর্তাদের সম্পর্কে যে সাবধানতা রক্ষায় তিনি বিশ্বাস করেন, তার উপরে তাঁর কিন্তুভাব নির্ভর করছে না। কিন্তু ঐতিহাসিকের মতো সমালোচকের মন নিয়ে দলিলপত্র বিচার করার মানসিক প্রবণতা তাঁর মোটেই নেই; দলিলপত্রে কিছুই তাঁর কাছে ধরা পড়ে না। একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং মানসিক সংস্পর্শই তাঁর মনকে নাড়া দেয়। অধ্যাপক সালভাদোরি সুইজারল্যান্ডে আছেন, তাঁকে আমরা টেলিফোন করলাম এবং সালভেমিনি ইংলন্ডে আছেন, তাঁকে চিঠি লিখলাম, যাতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে সচেষ্ট হন।

রাত্রে খাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদায়-সাক্ষাৎ। বির" হোটেলের দোতালায় যে ঘরটিতে তিনি আছেন, এক সময় সেটি ছিল ভিক্তর উ্যগোর; এবং আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর ভাই উ্যগোর কিছু কবিতা তর্জমা করেছিলেন; এবং তিনি তরুণ বয়সে নত্র্‌-দাম দ্য পারী' ও 'কাত্র্‌-ভ্যাঁ-ত্রেইজ' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু তর্জমা না হওয়ায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে নিজে কোন ধারণা করতে অক্ষম।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি তাঁর নাট্যরচনার কথা বললেন। বোঝা যায় যে, তাঁর কবিকর্মের এই অংশটির জন্যে, এবং অভিনেতা হিসেবে তাঁর সাফল্যের যে-স্মৃতি এ মনে পড়িয়ে দেয় তার জন্যে—তাঁর এক পক্ষপাতমূলক অনুরাগ আছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটির দৃশ্যবিবরণী তিনি গল্প ক'রে শোনালেন, বিশেষ ক'রে শোনালেন একটির—যাতে তিনি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। (সংস্কৃত পুরাণ অনুসারে, এক ব্যাধের প্রাণীহত্যার ফলে জাত ক্রোধের বশে না-ভেবেই বাল্মীকি প্রথম শ্লোক সৃষ্টি করেছিলেন:—তিনি চিৎকার ক'রে উঠেছিলেন: "প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীসমা।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলোর কোনো কোনোটি রচনা করেছেন স্বপ্নে। তাঁর সৃষ্টিধর্মী, রোমাঞ্চকর স্বপ্নগুলোর কোনো কোনোটি তিনি বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন,—একই সঙ্গে হয়েছেন বিস্মিত দর্শক ও "নাট্যক্রিয়ার (নৃত্যের) পরিচালক" (maitre de l'action)।

আমরা তাঁকে গল্পকথা হয়ে-ওঠা ইস্ত্রাতির কাহিনী শোনালাম।

তিনি আমাকে একটি সুন্দর ফটো নাম লিখে পাঠালেন, ফটোটি তোলা হয়েছিল ফ্লোরেন্সে।

সুন্দরী তন্বী মহলানবীশের অ্যালবামে আমি লিখলাম: "ষোড়শ শতাব্দীর এক পুরনো ফরাসী প্রবাদ বলে: 'যার সূর্য আছে, তার রাত্রি নেই।'··· ভারতীয় বন্ধুরা, 'রবির' সহযাত্রীরক্ষীরা—তোমারা সুখী।"

৪ জুলাই, ১৯২৬। সকালে আমার বোন গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার শেষ পাঠ নিতে এবং শ্রীময়ী রানীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে; রানী তাঁকে মূল্যবান শাড়িগুলো দেখালেন। বিকেলে শার্ল বোদুয়্যাঁ এলেন (তাঁকে টেলিগ্রাফে জানিয়েছিলাম) রবীন্দ্রনাথকে দেখতে। চারটে নাগাদ তাঁর ঘরে গেলাম শেষবারের মতো দেখা করতে; ঘরটার সামনে হ্রদ, গত রাত থেকে ঝড়ো মেঘ আকাশ কালো ক'রে আছে। (কিন্তু ঠিক শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সূর্য তার "রবির" জন্যে লড়াই ক'রে চলেছে বীরবিক্রমে।) তিনি তেমনি, সব সময়ের মতোই তাঁর বিশাল আরাম-কেদারায়, কথা বলছেন কিছুটা শ্রান্ত গলায়,—বিষণ্ণতা তাঁর মধ্যে, বিষণ্ণতা আমাদের মধ্যে। আমাদের ছেড়ে যাবার বিষণ্ণতা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়েছে, বিষণ্ণতা তা অনুভব ক'রে। তামরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ফিরে আসবেন কিনা, একদিন এখানে ঘর বাঁধার কথা ভাবেন কি না। সোজাসুজি উত্তর তিনি এড়িয়ে গেলেন, পরে বললেন, তাঁকে খুবই পেয়ে বসেছে ওখানকার স্মৃতি, তাঁর বিশাল নদীর স্মৃতি,...মেয়েরা স্নান করছে, রাখালের দল, গরুর পাল সেই সব গ্রাম্য, লোকযাত্রার স্মৃতি। লেমাঁ হ্রদের বিস্তৃতি নিঃসন্দেহে গঙ্গার বিশালত্ব মনে পড়িয়ে দিলেও, যে-ভারতীয় নদীকে ঘিরে চারপাশের মানুষ ভীড় করেছে, তার শক্তিমান দেবত্বের পাশে এ যেন একেবারে মৃত। এবং আমাদের ইউরোপের নদীগুলো তার পাশে একেবারে শিশু। আসল কথা, তাঁর ভারতবর্ষের জন্যে মন কেমন করছে; কিন্তু তবুও যে-কাজ নিজে ঘাড়ে নিয়েছেন,—যে-কাজ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, তা শেষ

না-করার আগে সেখানে ফিরে না-যেতে তিনি নিজেকে দায়বদ্ধ করেছেন ঃ কারণ এখন দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্ত করেছেন ইউরোপের পর আমেরিকায় যাবেন, এবং জাপানে থেমে ফিরবেন প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে, তাতে তাঁর ভারতবর্ষে ফেরা পিছিয়ে যাবে আগামী বছরের শেষের দিকে। বেশ ক্লান্তিকর, তাঁর স্বাস্থ্যের এই অবস্থায় বেশ বিপজ্জনক সফর, এবং আমার বেশ ভয় হচ্ছে, তা শেষ তক সুসম্পন্ন হবে কি না! কিন্তু তাঁর উপর কারুর জোর খাটে না। এক গোপন উত্তেজনা না-থেমে দুনিয়া ঘুরে মরার জন্যে তাঁকে তাগিদ দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ "বেরিয়ে পড়াটা এতো কষ্টকর, একবার বেরিয়ে পড়লে চলার গতিবেগের অর্জিত শক্তির সুযোগ নিতে হয়, থামলে চলে না।" আরও বললেন ঃ "আমার এই বয়সে, স্বাস্থ্য ফিরুক কাজ করবো ব'লে বসে থাকতে হলে, বৃথাই বসে-থাকা হবে, কিছুই করা হবে না।"—তিনি মনে করেন, ইতালিতে যাওয়া সম্পর্কে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে। বললেন, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা করার ইচ্ছে না-থাকলে তিনি ইউরোপে আসতেন না। কিন্তু এখানে আসার জন্যেই তাঁকে ইতালি আসা মানতে হয়েছে, অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, ভবিষ্যতে প্রতি বছর আবার এসে আলাদা আলাদা জায়গায় দু'তিন মাস ক'রে কাটাবেন, কিন্তু প্রতিবারই থাকবেন জায়গায় বসে, যাঁরা তাঁকে দেখতে চাইবে তাঁদের কাছে ডেকে পাঠাবেন ঃ কারণ তিনি ভালো করেই বুঝেছেন, এখন যে ভাবে সফর করছেন,—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এই যে তাড়াহুড়ো চলা, বক্তৃতার উচ্চ মঞ্চ থেকে এই যে দূরগত ও কৃত্রিম যোগাযোগ, এ সবে ভাসা ভাসা ছাড়া স্থায়ী কিছুই মেলে না। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবলাম, এ সব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তাঁর খুবই কষ্ট হবে। এ এক আয়ত্ত-করা অভ্যাস এবং তাঁর চরিত্রের একটি দিক।

আমরা তাঁকে সঙ্গে ক'রে ভিলন্যভ স্টেশনে নিয়ে এলাম, সেখান থেকে ৫ টায় জুরিখের ট্রেন ধরবেন...শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমার বোনের সঙ্গে হোটেলের মোটরে বসে রইলেন ; খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে লাগলাম। যখন ট্রেনের কামরায় উঠলেন আমি তাঁর হাত চুম্বন করলাম (তিনিও বিদায় নিতে, বারবার আমার হাত ধরলেন, তার পরই দুই হাত জড়ো ক'রে ঠোঁট অবধি তুললেন)। আমার চোখে জল এসে গেল। তরুণী রানী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না ট্রেন দৃষ্টির বাইরে গেল, হাত নাড়তে লাগলেন। আমার বোন ও আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হলাম। আমাদের মনে হলো মহান্ প্রিয় বন্ধুটি আর কখনো ফিরে আসবেন না,—এবং কে জানে নিজের দেশেই তিনি ফিরতে পারবেন কি না ?

আরও ব্যাপক আর এক বিষণ্ণতা ঃ এই মহান্ জীবনের এক আধা-ব্যর্থতার ধারণা ; তাঁর কাব্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা গভীরতম, যা মজ্জাগত,—এবং তাঁর ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টাসুলভ সামাজিক ভূমিকা, পরিস্থিতির নির্দেশে যা তিনি গ্রহণ করেছেন—এদের মধ্যেই তাঁর স্বভাব নিরন্তর ভাগ হয়ে থেকেছে। এই ভূমিকা সমারোহপূর্ণ ; এবং উৎসাহিত অনুপ্রেরণার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করেছেন। কিন্তু নিজেকে সেখানে ধরে রাখতে পারেন নি। কবি আবার বড়ো হয়ে উঠেছে, বড়ো হয়ে

উঠেছে আভিজাত্য—যা জনতা আর তাঁর মধ্যে বেড়া তুলেছে। তা থেকেই এসেছে তাঁর দোলাচলতা, মাঝ পথে থেমে-যাওয়া ভূমিকা, একটা কাজ ছকে নেওয়া, পথের একভাগ গিয়ে তা ফেলে রাখা,—খেদ, অরুচি, গতির ও কিছুটা বন্ধ্যা কথার উন্মাদনা, নিরন্তর নিজেকে খণ্ড খণ্ড করা। দুঃখের ব্যাপার, তাঁর অভাবগুলো পূরণ করার এবং তিনি ছেড়ে দিলে হাল ধরার উপযুক্ত সহায় মোটেই তাঁর নেই। কোনো ভারতীয়ের এমন-কি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ভারতীয়েরও সংগঠন করা এবং তা চালিয়ে নিয়ে যাবার মানসিকতা নেই। এখানকার সফরেই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের আমার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। তাঁরা সময় করতে পারেননি। চলে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক মহলানবীশ টেনেবুনে ফেনানো ধরনে আধঘণ্টা ধরে বিশ্বভারতীর ব্যাখ্যান শুরু করেছিলেন। অবশেষে আসল কথায়, যেমন ক'রে আমরা, ইউরোপের লোকেরা, তার জন্যে কাজ করতে পারি—আসতেই আমাদের বাধা পড়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে, মহলানবীশ দুই থেকে চার ঘণ্টার জন্যে আজ আসবেন কথা শেষ করতে। যে কারণেই হোক, তিনি আসেননি। এবার এই যে রবীন্দ্রনাথ রইলেন, এর গোটাটাই এই ভাবে কার্যত নিষ্ফল হয়ে থাকবে। অসংখ্যের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত। আমাদের ইউরোপীয়দের কাছে এতো নিরুৎসাহজনক। কোনো কিছুর গভীরে না গিয়ে, কোনো কিছু সংগঠিত না ক'রে, ইউরোপের এক সহর থেকে আর এক সহরে বক্তৃতা, এই ছুটোছুটি আমার কাছে কী নিরর্থক ঠেকে!

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বয়স ও অসুখ নিঃসন্দেহে অনেকখানি এই তো তিন বছর আগে পারীতে তাঁর চরিত্রের ও কর্মের যথেষ্ট বেশি দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু তবুও এটা তাঁর স্বভাবের জন্মগত লক্ষণ। তিনি শুধুই সহজ হন তাঁর দেশের, তাঁর পরিচিত জনের সঙ্গে, তাঁর শান্তিনিকেতনে তাঁর গাছপালা, তাঁর আকাশ ও তাঁর শিশুদের মধ্যে। বুঝতে পারা যায়, পথে পথে ঘোরা "রবির" পরিক্রমায় শান্তিনিকেতনের প্রতিটি দিন আর রাত্রির গান তাঁকে অনুসরণ করে; কিন্তু বাকি জগৎকে তিনি দেখেন ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, এক উচ্চাসন থেকে এক অনন্ত-পিতার ভঙ্গিতে।…

এটাও কি আরও বলতে হবে? এই ভঙ্গি, যা তাঁর কাছে স্বাভাবিক, গোষ্ঠীপতিজনোচিত এই গাম্ভীর্য, যা প্রাচীন এশীয় মনোভাব এবং যা তাঁর থেকে চেপে বসে তাঁকে ঘিরে-থাকা সমস্ত কিছুতে—এ প্রথমে মোহ ঘটায়, কিন্তু তার পরেই ইউরোপীয় বন্ধুদের তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপার ঘটায়। আমি তাঁকে দরদ দিয়ে ভালবাসি, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি; এবং তবুও (আমি কি তা স্বীকার করবো?) আলোচনার সময়, সে শুধু একবার নয়—যখন আমি হঠাৎ উঠে পড়ার, বেরিয়ে যাবার, এই সাড়ম্বর সৌজন্যের, এই কেতাদুরস্ততার বাধা ভেঙ্গে ফেলার জ্বালাকর শয়তানী বাসনা অনুভব করিনি। তিনি তা মোটেই লক্ষ্য করেন না; তাঁর সঙ্গীরা তো করেনই না। এ তাঁদের সামাজিক, অভ্যাসগত, শতাব্দীবাহিত জীবনের ধরন। কিন্তু যে কর্মব্যস্ত পাশ্চাত্য উঁচুনিচু সমান করে, যে পাশ্চাত্য ছাঁটকাট করে, সেই পাশ্চাত্যের আর ঋষিদের প্রাচীন প্রাচ্যের মধ্যে এ অবশ্যম্ভাবী-

রূপে সংঘাত বাধায়। এই সংঘাত আমার কাছে কখনো তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, যেমনটি দ্যুআমেল আসায় হয়েছে।

সালভাদোরিকে টেলিগ্রাম করলাম, যাতে তিনি জুরিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁকে আলোকপাত করেন। সালভেমিনিকে চিঠি দিলাম, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করেন। আমি আরও লিখলাম প্রেসিডেন্ট মাসারিককে, তাঁকে জানালাম রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে চান এবং তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ভিয়েনার ঠিকানা দিলাম।

দ্যুআমেলের এক টিপিক্যাল বৈশিষ্ট্য—(যার গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অবশ্য প্রয়োজন নেই) ঃ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময়, হোটেলের ঘরে রবীন্দ্রনাথ যখন কথা বলছিলেন, আমি দেখছিলাম দ্যুআমেল তাঁর পায়ের দিকে টেবিলের নীচে তাকাচ্ছেন, টেবিল রয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের মাঝখানে ঃ তিনি লক্ষ্য করেছেন কার্পেটের উপরে রয়েছে একটা-দুটো আলপিন ; তিনি ঝুঁকলেন, প্রথমে একটা খুঁটে নিলেন, তারপর অন্যটা ঃ পাশ পকেট থেকে বার করলেন আলপিন ভরা একটা কৌটো, আলপিন দুটো বিঁধিয়ে রাখলেন এবং কৌটোটা পকেটে পুরলেন।

এই দৃশ্যের কিছুই উপস্থিত ভারতীয়দের নজর এড়ালো না ; এ থেকে তাঁরা মিতব্যয়িতা ও শৃঙ্খলার ইউরোপীয় মানসিকতার যে সাধারণীকরণ করবেন, তা অনুমান করতে পারি।

দ্যুআমেলের কাছ থেকে আমার জবাবে একটি চমৎকার চিঠি পেলাম (৬ জুলাই)। অন্য অনেকের উল্টো, দ্যুআমেলের প্রথম পদক্ষেপটা খাঁটি নয়,—খাঁটি হচ্ছে ভেবেচিন্তে বাগমানানো এবং সংশোধন করা দ্বিতীয় পদক্ষেপ। এখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অনেক বেশি ঠিক ; বরং তিনি তাঁকে সমালোচনা করতে চান না।

৭ জুলাই, ১৯২৬। জন হেইনেস হোমসের জনৈক আমেরিকান বন্ধু হেনরি এস. হান্‌টিঙ্‌ডন এসেছেন দেখা করতে ; কোনো কোনো নৈতিক নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তিনি ইউরোপে এসেছেন,—এবং বহু ক্ষণ ধরে তিনি, বিশেষ ক'রে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে ঠেলে দিলাম মাসারিক, রবীন্দ্রনাথ এবং কে. টি. পলের দিকে।

(হেলসিংকিতে ওয়াই. এম. সি. এ.-র আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হতে চলেছে, সেখানে গান্ধীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে ; গান্ধীর জন্যে কে. টি পলকে একটা চিঠি ও একটা প্রশ্নোত্তর পাঠাতে এবং কে. টি. পলের মাধ্যমে গান্ধীর কাছ থেকে ইউরোপের

তরুণ খ্রীষ্টান সমিতিগুলোর উদ্দেশ্যে একটা ধর্মপত্রী (épitre apostolique) আনিয়ে নেবার প্রস্তাব তাঁদের কাছে রেখেছি—একথা কি লিখেছি ?)

রবীন্দ্রনাথের সুবিধা মতোই কাজ করবেন ব'লে লন্ডন থেকে জি. সালভেমিনি আমাকে উত্তর দিয়েছেন (৮ জুলাই)।

জুলাই, ১৯২৬। মিস সেন্নতের কাছ থেকে ফটোর একটা প্যাকেট পেলাম, ফটোগুলো গান্ধী এবং তাঁর আশ্রমের, সেগুলো সে তুলেছে আমাদের মৈত্রী ভবনের জন্যে।

জুলাই, ১৯২৬। রবীন্দ্রনাথের চিঠি—১৫ জুলাই, ভিয়েনা, ব্রিস্টল হোটেল :

"আমার অতি প্রিয় বন্ধু,

আপনার সান্নিধ্য ছেড়ে এসে ঘরছাড়া-আমি দিশাহারা বোধ করছি। যারা চলে যায় সব সময়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং কাউকে চিনতে না পারা, মনের দিক থেকে বড়ই ক্লান্তিকর। এ যেন এক পাখির মতো ডাল থেকে ডালে উড়ে বসছে, এবং দেখতে পাচ্ছে ডাল তার দেহের ভার রাখতে পারছে না। প্রতিদিন সকালে জেগে উঠে নিজেকে দেখি এক মানুষের জগতে, যাদের নাম নেই, যারা এক চলন্ত পুঞ্জ সেই মেঘের মতো যা ঢেকে ফেলতে পারে কিন্তু সঙ্গ দিতে পারে না। নিজেকে মনে হয়, অতি সহজে এক ঘটনার স্রোতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি, এমন কোনো ঘাট জানা নেই যে ডাঙ্গায় উঠবো। এখানে আমার জন্যে একজন এক বিরাট হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন, এইসব আমাকে চিরকাল পীড়িত করে, প্রতিবারই মেগাফোনে কথা বলতে ভয় হয়। দুঃখের বিষয়, আমার এক ভারি গোছের খ্যাতি আছে, এবং লোকে আমার কাছে আশা করে এক ভারি গোছের কাজ, এক বিরাট ধরনের হৈচৈ। কী অপচয়! এক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি, আজ অপরাহ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করা ঠিক হয়েছে। তারপর জানি না ইউরোপে কী করবো। ভারতবর্ষ থেকে বেরুনোর আগে আমার মাথায় ছিল একটা স্থির লক্ষ্য—আপনার সঙ্গে দেখা করা। এবং আমাদের দেখা হলো, তা মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে হলেও, দিনগুলো ছিল পরিপূর্ণ, আনন্দমুখর। উৎসবে মেলে মনোমত পরিবেশ এবং আরও অনেক কিছু। সেখান থেকে আমি বেরিয়ে পড়েছি পথে কোনো গন্তব্যস্থল ছাড়াই। জুরিখে শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার ফলাফল পরে দেখবেন। ইতালিতে আমি নিজেকে অশুচি হতে দিয়েছি, তার শুদ্ধির অনুষ্ঠানের (cérémonie de purification) মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। আপনার বোনকে আমার সাদর শ্রদ্ধা জানাবেন, তাঁর প্রতি আমার গভীর স্নেহ বোধ করছি। অন্তত মূল ছন্দ-সুরসহ আমার একটি কবিতা তাঁর জন্যে রেখে আসতে পেরেছি ব'লে আমি আনন্দিত। প্রীতির সঙ্গে র.ঠা.।"

সেইদিনই অধ্যাপক মহলানবীশ আমাকে ভিয়েনা থেকে লিখছেন, তাতে তিনি শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপচারী এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর মধ্যে যে-ক্রিয়া চলছে—তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন :

"শ্রদ্ধেয় বন্ধু,—অধ্যাপক সালভেমিনি কবিকে লিখেছেন এবং আমরা দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করার চেষ্টায় আছি। ভিয়েনায় থাকতেই সিনর মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে দেখা করার কথা তিনি কবির কাছে পেড়েছেন, মোদিগ্লিয়ানি ছিলেন মাত্তেওত্তির মামলার উকিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার একটা দিন ঠিক করেছি। জুরিখে শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই আগ্রাহোদ্দীপক হয়েছে। তিনি যা বলেছেন তাতে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন, তিনি বলেছেন অত্যন্ত সোজাসুজি ও সহজ ভাবে। কাটা কাটা কথায় তিনি শুধু নিজের অভিজ্ঞতাই বলেছেন, তা মনে অত্যন্ত দাগ কেটেছে। আমি সাক্ষাৎকারের নোট নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃত পরিবেশটি বোঝানোর পক্ষে তা একেবারেই অপ্রতুল। তাঁর কাহিনী শুনে কবি তেমন কিছু বলেননি, কিন্তু বুঝতে পারা যায় যে, তিনি এক তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছেন··· (তারপর সাক্ষাৎকারের সময়ে নেওয়া কিছু কিছু নোট)। শ্রীমতী সলেভাদোরি তাঁর অবস্থা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরদিনই কবি ফর্মিচিকে একটা চিঠি লিখেছেন···এই মুহূর্তে তিনি ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা লিখতে, বরং সংশোধন করতে ব্যস্ত। গতকাল হঠাৎ তিনি আমাকে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। দেখতে পেলাম, এ সম্পর্কে তিনি ভীষণ ভেবেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত মানসিক অবস্থায় আছেন এবং আমি জানি যে, তাঁর মনোভাবের যথাযোগ্য প্রকাশ যতক্ষণ না ঘটাতে পারবেন, তাঁর এই অবস্থা কাটবে না। ভিলনাভে তিনি এই প্রশ্নের ব্যক্তিগত চেহারার সঙ্গে মুখোমুখি হননি; এবং স্বাভাবিক ভাবেই, তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী, তিনি একে দেখেছেন বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন। এখন তিনি সোজাসুজি অনুভব করতে পারেন, শুধুমাত্র বুদ্ধিগত ভাবে আর নয়। ইতালিতে যাওয়ার জন্যে চরম ক্ষুব্ধ; কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না, কারণ তাঁকে ইউরোপে আসতে হবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আর ইতালি না হয়ে আসতে পারতেন না। ইতালীয়দের কাছে তাঁর গত বছরের প্রতিশ্রুতির জন্যে তিনি একেবারে ইতালিকে বাদ দিতে পারেননি···"

২১ জুলাই মহলানবীশের নতুন চিঠি ভিয়েনা থেকে :

রবীন্দ্রনাথ সালভেমিনির একখানা, অধ্যাপক ও শ্রীমতী সালভাদোরির দু'খানা চিঠি পেয়েছেন; অনেকক্ষণ ধরে তিনি মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে কথা বলেছেন, এবং কথা বলেছেন আঞ্জেলিকা ব্লাবানফের সঙ্গে, ব্লাবানফ কিছুদিন আগেও 'আভান্তি'-

তে মুসোলিনির সঙ্গে কাজ করেছেন। সি. এফ. এনড্রুজের কাছে লেখা চিঠির মধ্যেই ফ্যাসিবাদ সম্মন্ধে তাঁর মনোভাবের শেষ প্রকাশ ঘটেছে ; সেই চিঠি অবিলম্বে এনড্রুজকে ভারতবর্ষে প্রকাশ করতে হবে। আমাকে তার একটা কপি পাঠিয়েছেন, এই সঙ্গে পাঠিয়েছেন অধ্যাপক ফর্মিচিকে লেখা দুটো চিঠি। প্রাগের অধ্যাপক হিন্‌টারনিজ জার্মানে এক প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি এনড্রুজকে লেখা চিঠির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশগুলো উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিটি আমাকে ফরাসীতে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দলবল আগামী কাল ভিয়েনা থেকে পারীতে যাবেন, পথে মিউনিক ও জুরিখে থামবেন।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠির অংশগুলো (আমার বোনের তর্জমা) লিখে রাখছি।

১. ফর্মিচিকে লেখা প্রথম চিঠি (জুরিখ, ৭ জুলাই) :

"প্রিয় বন্ধু,—ইতালি ছেড়ে আসার পর ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য আমার গোচরে এসেছে, সেগুলো আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আমার পক্ষে পরিস্থিতি বিশেষ ক'রে হতবুদ্ধিকর হয়ে উঠেছে, কারণ আপনাদের সংবাদ-পত্রগুলো থেকে ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ফ্যাসিবাদকে আমি নৈতিক সমর্থন দিয়েছি,—যদিও (আপনার জানা আছে) সব সময়ে এবং একভাবে আমি ইতালির প্রশ্নে আমার চরম অযোগ্যতার কথা সাংবাদিকদের জানিয়ে এসেছি… জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমার বক্তৃতায় ও আমার লেখায় আমি অত্যন্ত জোরালো ভাবে আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি, নিন্দা করেছি সেই নৈতিক আত্মহত্যাকে—যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে, নিন্দা করেছি সেই নরবলিকে যা সংঘটিত হচ্ছে জঘন্য জাতি-উপাসনার ক্ষেত্রে। একটা জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্যে কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বিধাশূন্য অপরাধের কর্মসূচী অনুমোদন করছি দেখানোটা আমার কাছে চরম বিরক্তিকর। আপনাদের ইতিহাসের এতো গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান পর্ব,—যা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে প্রতিদ্বন্দ্ব জানাচ্ছে,—অত্যন্ত ভাসাভাসা হলেও, তার সঙ্গে আমার যোগ যে এক দায়িত্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যদি সম্ভব হতো, তাকে এড়াতে আমি সব কিছু করতে রাজি। আমি গভীরভাবে পীড়িত হচ্ছি, কারণ আমি জানি এর ফলে আপনারা কতখানি পীড়িত হবেন, আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে এর ফলে কতখানি টান ধরবে ও জট পড়বে।…ব্যক্তিগত ভাবে মুসোলিনির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার যে বাধকতা আছে, তা আমাকে, তিনি যে-আন্দোলনের নেতা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণে সন্দেহ করতে বা তাদের গুরুত্ব ছোটো ক'রে দেখতে তাগিদ দেয়। কিন্তু দিনের পর দিন সে সব না-জেনে চলাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এ সবকিছুর জন্যে আমি অত্যন্ত অসুখী বোধ করছি এবং যে-ঘটনাচক্র আমাকে এই পরিস্থিতিতে টেনে এনেছে এবং নীরব নিরপেক্ষতায় থাকতে আমার বাধা ঘটাচ্ছে, তার জন্যে দুঃখ বোধ করছি…"

(র. রলাঁর মন্তব্য : আমি মানতে রাজি নই যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ চোখ খুলতে বাধ্য হওয়ার জন্যে দুঃখ বোধ করবেন এবং রাজনৈতিক অপরাধ ও সমস্ত রকম স্বাধীনতাকে ধারাবাহিক ভাবে ধ্বংস করার ব্যাপারে "নীরব নিরপেক্ষতায়" থাকতে কেউ তাঁর বাধা ঘটাবে ; সাধারণ কেউ এরকম কম-পালিশ-করা দুঃখ প্রকাশ করতে পারে ; রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ পারেন না। আভিজাত্যের বাধ্যবাধকতা থাকে। শক্তির সমস্ত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে জগতে এক আত্মিক স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন, কি করেন না ? যদি করেন, তাহলে চোখ ফিরিয়ে নিতে এবং নিরংকুশ ডিক্টেটরবাদের সামনে চুপ ক'রে থাকতে পারেন না।)

২. ফর্মিচিকে লেখা দ্বিতীয় চিঠি (২১ জুলাই, ভিয়েনা) :

"প্রিয় বন্ধু,—যে-চিঠি আমি এনড্রুজকে লিখেছি তার কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। তা থেকে আপনি ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমার মনোভাবের একটা ধারণা পাবেন। আমি আবার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ শুধু ইউরোপেই নয়, ভারতবর্ষেও জনরব উঠেছে যে আমি ফ্যাসিবাদী মত সমর্থন করেছি এবং ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তার পক্ষ সমর্থনের ব্রত নিয়েছি। ইতিমধ্যে অন্য দিকের সাক্ষ্যপ্রমাণ ভিড় ক'রে আসছে ; এবং এইসব তথ্যের কোনো কোনোটির চেহারা অস্বস্তিকর। আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না তারা আমাকে কী ভীষণ পীড়িত করছে… কারণ আপনার দেশবাসীর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। এও বুঝেছি যে, আমার মতামত আপনাকে আঘাত করবে ; এবং এই ভাবনাই আমাকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। এতে ইতালিতে আমাদের বিশ্বভারতীর স্বার্থের হানি হবে,—সেটা আমার আছে অতি বড়ো দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তবু আমি যা করছি, তা করা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না,…আমি কিছু আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করি, যার জন্যে স্বদেশের অপ্রিয়তার মুখোমুখি হয়েছি এবং যা আমাকে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো অংশে হাস্যাস্পদ করেছে। ইতালি থেকে ফেরার পর গত বছর ভারতবর্ষে সংবাদপত্রগুলোয় যে বিবরণ বেরিয়েছিল তার মধ্যে ছিল মানবিক আদর্শগুলোর জন্যে আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ-করা ইতালীয় সংবাদপত্রগুলোর উদ্ধৃতাংশ। আমি নিশ্চিত যে ফ্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক আত্মহত্যা। কিন্তু ঠিক এইটিই সর্বত্র, ইউরোপে এবং অন্য মহাদেশগুলোয়, সমস্ত মতের মানুষেরা বিশ্বাস করছে। প্রতিবাদ না ক'রে জনরব চলতে দেওয়াটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ; এবং খুবই বেদনার সঙ্গে আমি এই আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার অবস্থান সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশের অনুমতি চাইছি।"

(র. রলাঁর মন্তব্য : এখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা বেশি সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু তবুও যথেষ্ট নয়। "মতামত প্রকাশের অনুমতি চাইবার" প্রয়োজন তাঁর নেই। তাঁর পরম কর্তব্য তা উচ্চকণ্ঠে এবং কোনো পরোয়া না করেই বলা। নইলে ইউরোপের এবং ভারতবর্ষের মনের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা তাঁকে ছাড়তে হবে। এই

ভূমিকার উপযুক্ত বহুধা ব্যাপ্তি (envergure) তাঁর নেই। তাঁর ব্রতের চেয়ে তাঁর কাব্যিক ও প্রীতিপূর্ণ স্বভাব অনেক বেশি জোরালো।)

৩. সি. এফ. এনড্রুজকে লেখা চিঠি (ভিয়েনা, ২১ জুলাই) ঃ

(চিঠিটি খুব দীর্ঘ, ফ্যাসিবাদকে স্পষ্ট ধিক্কার দিয়ে বির* হোটেলের লেখাটি সংশোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ এতে আবার উত্থাপন করেছেন। তা ছাড়াও তিনি এতে মিশিয়েছেন মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কাহিনীগুলো, যা থেকে লোকটার প্রীতিকর ধারণা থেকেই যায়। আমার বোনের তর্জমা করা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ এই) ঃ

"প্রিয় বন্ধু,—আমার মন চলেছে এক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। ইতালির জনগণের প্রতি আমরা ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে। আমার প্রতি তাদের এতো স্বতঃস্ফূর্ত, এতো উদার শ্রদ্ধার মনোভাবের মর্ম আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। (?) অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদে প্রকাশিত ইতালি সরে দাঁড়াচ্ছে সেই আদর্শ ছবি থেকে, এই দেশ সম্পর্কে যা আমি গড়ে তুলেছিলাম এবং যাকে আমার মনের মধ্যে লালন করতে চেয়েছিলাম। আমার ঐকান্তিক আশা ছিল যে, এই আন্দোলন ইতালির জীবনের প্রকৃত স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এটা বহিঃপৃষ্ঠের এক ক্ষণকালীন বিস্ফোরণ। ইতালি ছেড়ে আসার পর এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিদিন যেসব বেদনাদায়ক তথ্য আমার গোচরে আসছে, ইতালীয়রা আমার প্রতি শ্রদ্ধার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তার জন্যেই তারা প্রায় আমার প্রতি এক ব্যক্তিগত অভিযোগ (grief) পোষণ করছে।…"

(তারপর, তাঁর প্রথম ইতালি সফর এবং যে সম্প্রীতিপূর্ণ ধারণা সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, সে-সম্পর্কে কয়েকটি, লাইন,—তারপর, 'শান্তিনিকেতনে মুসোলিনির জাঁকালো উপহার, যা তাঁকে মহাদানশীলতার যথোপযুক্ত কর্মে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশক্ষম এক ব্যক্তিত্বের সংসর্গ অনুভব করিয়ে দিয়েছে,"—তার সম্পর্কে। তিনি নতুন এক সফরের মন ঠিক করেছেন।)

"আমি যা কিছু পড়তে পেরেছি, সেই মতো আমাকে অনুমান করতে হয়েছে যে, ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে আমার আদর্শের বিরোধী উপাদান আছে, তার সাফল্যের বিপরীতে আছে নির্যাতিত জীবন, নির্বাসিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তা বিষাক্ত হয়েছে গোপন ষড়যন্ত্রে, ইউরোপের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে তা এক প্রকাশ্য বর্বরতায় ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং পশ্চিমের দেশগুলো থেকে-আসা সংবাদে আমরা সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছি…ইত্যাদি…ইউরোপীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে আমার ছিল না এবং যখন ইতালিতে এসেছিলাম আমার নিরপেক্ষ মনটি বজায় রাখতে চেয়েছিলাম…কিন্তু কর্মের বন্ধন আমাকে টেনে এনেছে…"

(বড়োই সহজ কৈফিয়ত! অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের মনের নিরপেক্ষ থাকার অধিকার নেই। আর পশ্চিমে আমরা যখন

কোনো ভুল করি, বলি না: “এটা কর্মের ফল।” বলি: “আমিই অপরাধী” (“Mea culpa”)। র-র-র মন্তব্য।)

(তারপর জোর ক'রে ভুল ধারণা দেওয়া ইণ্টারভিউগুলো সম্পর্কে।)

“…এই সব লেখাগুলোর কোন কোনটি এই ধারণা দিয়েছে যে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে আমি আমার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছি এবং আমার প্রশংসা অপরিসীম…”

(কোনো সাহসী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হওয়ার জন্যে যে-মুসোলিনি তাঁকে আটকেছেন, তাঁর আতিথেয়তা সম্পর্কে কথা।)

(তারপর, যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁদের অনুকূল অভিমত, বিশেষ ক'রে শান্তিবাদী অধ্যাপকের (আসাজিওলির) অভিমত, যিনি ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনে ও দর্শনে আস্থাশীল হয়েছেন।)

…এই প্রয়োজনের তিনি বিচারক হতে পারেন না।)

(র. র-র মন্তব্য “কেন পারবেন না?”)—“…কিন্তু ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি এবং নীতিগুলো সমগ্র মানবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর এটা কল্পনা করাটাই অদ্ভুত যে আমি কখনো এমন এক আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে কণ্ঠরুদ্ধ করে, যা ব্যক্তি বিবেকের বিরোধী বাধ্যবাধকতা দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে এবং যার যাত্রা হিংসার রক্তাক্ত ও অপরাধের চোরাপথে। আমি সব সময়েই বলেছি এবং আবার বলছি, পশ্চিমের অধিকাংশ জাতির ধর্মীয়ভাবে অনুশীলিত জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মন গোটা জগতের পক্ষেই এক ভয়ের ব্যাপার। ইউরোপীয় রাজনীতিতে এ যে নীতি-ভ্রষ্টতার সৃষ্টি করছে নিশ্চিতভাবে তার ফলে দেখা দেবে মারাত্মক, সর্বোপরি তা দেখা দেবে প্রাচ্যের জাতিগুলোর উপরে—যাদের শোষণের পশ্চিমী পদ্ধতিগুলো রুখবার শক্তি নেই। এমন এক রাজনৈতিক আদর্শ যা সভ্যতার শক্তি ব'লে পশুশক্তির উপরে তার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তার জন্যে আমার তারিফ জানানো, আমার পক্ষে প্রায় অপরাধমূলক নাও যদি হয়, তা হবে আরও বেশি অদ্ভুত। এই বর্বরতা বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে বেমানান নয় নিশ্চয়ই; কিন্তু তার মূল্য ভয়াবহভাবে বিরাট সর্বনাশা। জাতীয়তাবাদের মাধ্যম হিসেবে এই দ্বিধাশূন্য শক্তি-উপাসনা আন্তর্জাতিক ঈর্ষার আগুন লালন করে, যা বিশ্বব্যাপী অগ্নিকান্ডের, ধ্বংসের ভয়ংকর তান্ডবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই নৈতিক বিপথগামিতার বিপদ বিরাট, কারণ আজ জাতিগুলো পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে এবং চালু-ক'রে-দেওয়া ধ্বংসের প্রণালী একযোগে কাজ করে। এইসব দেখেশুনে, এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে আমি বেহালা বাজাবো, আর ওদিকে মানুষের আহুতি নিয়ে এক বীভৎস আগুন পুষ্ট হবে?”

(তারপর, মন্তব্য বিদ্রূপ সম্পর্কে, যে-বিদ্রূপের কথা হয় যখন আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির ব্যাপারে খ্রীস্টধর্মের কথা ওঠে।…তারপর মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চিঠি শেষ। তিনি দুচের এক প্রীতিকর ছবি দিয়েছেন। তা হলেও, নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁকে তুলনার প্রশ্নটি আর নেই।)

(মোটামুটি, নীতিগতভাবে ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করতে রবীন্দ্রনাথ কিছু

জোরালো বাক্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু ইতালির অপরাধগুলোর যথাযথ প্রাসঙ্গিকতা সমস্তই এড়িয়ে গেছেন। এবং সর্বত্র তিনি বর্ণহীন, মিঠে-মিঠে কথার ভিড়ে এই তিরস্কার ডুবিয়ে দিয়েছেন, তাতে মুসোলিনি ও ইতালির জনগণের প্রতি প্রশংসা ছড়াতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। গোটাগুটিভাবে নিলে, চিঠিটা কাউকে খুশি করবে না এবং রবীন্দ্রনাথেরর সমুচ্চ নৈতিক চরিত্র ইউরোপের কাছে যে-প্রত্যাশা জাগায়, তা মোটেই পূরণ হবে না। তাহলেও, ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর নরম মনোভাব যে মারাত্মক ধারণা সৃষ্টি করেছে, তা কিছুটা দূর করতে তার বন্ধুদের সুযোগ দেবে।)

আগস্ট, ১৯২৬। আমি সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে খোলাখুলি-বলা লাইনগুলো এক জায়গায় করলাম এবং এই অংশগুলো 'য়ুরোপ' পত্রিকায় সঙ্গে সঙ্গে ১৫ আগস্টের সংখ্যায় পাঠিয়ে দিলাম। পরদিন সেগুলো ছাপা হলো, 'ল্যুমানিতে', অন্যান্য কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী পত্রিকায় সেগুলো আবার ছাপা হলো। এটার খুবই প্রয়োজন ছিল; কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফ্রান্স থেকে পাওয়া সমস্ত চিঠিতে তাঁর কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছিল। এবং এমনকি আমি নিশ্চিত নই যে, তাঁর সম্পর্কে কচুকাটা মোহগুলো (illusions...fauchées) আবার জাগিয়ে তোলার পক্ষে এ যথেষ্ট কি না।

গুরনিজেলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়লাম :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (ইতালীয় তর্জমায়)। কিছু কিছু ঘটনায় মুগ্ধ হলাম (গঙ্গার উপরে রাত্রিগুলো এবং শ্মশানে দুই রাত্রি);

'রামায়ণ' (ফরাসী তর্জমায়)।

আগস্ট, ১৯২৬। জাক্‌ মেস্‌নিল আমাকে অধ্যাপক ফর্মিচি সম্পর্কে কয়েকটা ছোটোখাটো তথ্য দিলেন : এই "বৌদ্ধ ফ্যাসিস্টটি" (!) রবীন্দ্রনাথকে মুসোলিনির খপ্পরে টেনে এনেছে। ফর্মিচির লেখা "বৌদ্ধধর্মের নামে অকিঞ্চিৎকর বস্তুটি" ফরাসীতে তর্জমার ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল। পড়ে দেখে তিনি প্রত্যাখান করেছেন। লেখককে না জানলেও, এই রকম কিছু লাইন পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন :

"মানুষ ভালো হতে সমর্থ নয়, যদি সে এক আলোকস্তম্ভ থেকে আলো—এক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি—প্রতিফলিত হতে না দেখে..."

"ধর্মবিশ্বাস যতো মহিমান্বিতই হোক্‌ না কেন, তা বিষময়,—যদি তা সমাজ-বিরোধিতার প্রশ্রয় দেয়, রাষ্ট্রকে টুকরো টুকরো করার ভয় দেখায় বা যে-কোনো ভাবেই হোক, তাকে দুর্বল করে..."

আগে থেকেই ফ্যাসিস্ট জাতীয়তাবাদ উঁকি মারছে চোখে পড়ে। তাঁর বৌদ্ধধর্মের ধারণা—সমস্ত ধর্ম সম্পর্কেই ধারণা—'রোমান'।

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। উচ্চ পদস্থ ভারতীয় খ্রীষ্টান কে. টি. পল এসেছেন, সঙ্গে এসেছেন ওয়াই. এম. সি. এ-র বিশ্বমৈত্রীর নিখিল বিশ্ব কমিটির অন্যতম তরুণ সদস্য এ. সেনো।

তিনি হেলসিংকিতে ওয়াই. এম. সি. এ.-র আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে অংশগ্রহণ ক'রে আসছেন। আশা করা গিয়েছিল গান্ধী সেখানে আসবেন, তিনি ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু তাঁর হিন্দু কর্তব্য তাঁকে এশিয়ায় আটকে রেখেছে। তখন আমরা "তরুণ খ্রীষ্টানদের" প্রশ্ন ও সন্দেহগুলোর উত্তর চেয়ে, তাঁকে পাঠাতে কে. টি. পলকে ভার দেবার কথা ভেবেছিলাম।

কে. টি. পল মাদ্রাজের লোক। গায়ের রং খুবই বাদামী; দেখতে ছোটো-খাটো, বয়স হয়েছে পঞ্চাশের উপরে, নাকের ডগা মোটা, চোখে চশমা, মাথায় সাদা পাগড়ি; দৈহিক গঠন এবং কায়দাকানুন কিছুটা লাজপত রায়কে মনে পড়িয়ে দেয়। কথা বলেন উদাত্ত কণ্ঠে এবং হাসিটি সরলতামাখা।

আমদের যে ট্রাজিক সমস্যাটি পীড়িত করে তৎক্ষণাৎ আমি সেটি তাঁর সামনে তুলে ধরলাম ঃ

সমস্ত ধর্মেই,—বিশেষ ক'রে খ্রীষ্টধর্মে—ধর্মবাণীর 'মেতানোইয়া', জাগতিক সমস্ত মূল্যের প্রত্যাখান—অথবা নাশ ("সমস্ত ত্যাগ করো, আমাকে অনুসরণ করো")—এবং ধর্মীয় মতবাদকে সমাজজীবনে, ব্যবহারিক কর্মে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা—পরস্পবিরোধী। এদের বিরোধ দূর করা কি সম্ভব? এবং সম্ভব হলে কেমন ক'রে? বর্তমান জগতে চোখে পড়ে ভণ্ডামির হতবুদ্ধিকর দৃশ্য, যেখানে এই সব প্রচেষ্টাকে টেনে নিয়ে যায়। আর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক্য অধ্যাপক লুইগি আফেল্লির যে দুটি বই সদ্য আমি পেয়েছি, তা থেকে প্রকৃত ধর্মপ্রান মনের বিশৃংখলাটি স্পষ্ট নির্দিষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে। মুসোলিনির মতো মানুষ যখন স্যাঁ-ফ্রাঁসোয়া দাসিজের শতবার্ষিকী উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তখন সেই যুগটিকে কী ব'লে ভাবা হবে! আর রোমান চার্চ প্রতিবাদ করা দূরে থাক, এর মধ্যে তার মুনাফা খুঁজছে। গান্ধীর মতো মানুষ কী ভাববেন? যে তরুণেরা এই বিকল্পের সামনে দাঁড়িয়ে, কী উপদেশ তিনি তাদের দেবেন ঃ খ্রীষ্টের বাণী অনুসরণ করো (এবং তা নিঃসন্দেহে আত্মত্যাগ), না সমাজের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে খ্রীষ্টের প্রতি মিথ্যাচার করো?

এবং সর্বপ্রথম যুদ্ধের প্রশ্ন ঃ (তা যে-কোনো সময়ে উঠতে পারে)। আমরা কী তরুণদের বলবো ঃ "অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করো,—তার অর্থ তো বলা, আত্মবিসর্জন দাও!" না কি বলবো ঃ আত্মসমর্পন করো, মানিয়ে নেবার চেষ্টা করো!"

আর মামলা শুধু যুদ্ধ নিয়ে নয়। স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের হাতে ইতালীর বিবেকের পীড়ন দাবি জানাচ্ছে নৈতিক সাহায্যের, নির্দেশের, পরামর্শের। সে কি স্বৈরতন্ত্র শেষ হবার দিন গুনতে গুনতে বাধ্যতার ভান করবে (কিন্তু তাতে বিবেকের বেশ্যাবৃত্তি করা হবে; মিথ্যা আত্মাকে অধঃপতিত করে) না কি সে নিকৃষ্টতম নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়াবে?

আমি পরিস্থিতির কিছু চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার দুই শ্রোতাকে বিস্মিত করলো মনে হলো (তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন ব'লে মনে হলো না, ভারতীয়টির চেয়ে জেনেভাবাসীও বেশি জানেন না), কিন্তু কোনো উত্তর মিলল না। এহেন সমস্যার বিশ্বজনীন দিকটি কে. টি. পল দেখতে পান ব'লে মনে হয় না এবং সন্দেহ হয়, গান্ধীও দেখতে পান কি না। তিনি হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিবেচনা করেন। এক খ্রীষ্টধর্মের (যা এক হিন্দুধর্মের) অদ্ভুত শক্তিহীনতা,—একমাত্র ধরনই ভিন্ন হয়, মূল বিশ্বজনীন থাকে—এইটি না দেখে, যা মানব বিবেকের এহেন সংকটে উদাসীন থাকে! কারণ সবকিছু বিচারের শেষে, সমস্যাটি হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যক্তি-বিবেকের, মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টের—এবং রাষ্ট্রের বৈরিতা।

এইসব বড়ো বড়ো বিশ্বাসীদের, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠদেরও মন যথেষ্ট বিশ্বজনীন নয়। যে-ঐক্য ঈশ্বরের, তার চেয়ে যে-পার্থক্য মানুষের, তার প্রতি এঁরা বেশি সংবেদনশীল।

একমাত্র যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌছুলাম তা এই যে, এই ইউরোপীয় সমস্যাগুলো এখানে এসে বুঝবার জন্যে এবং পরে তা গান্ধীর কাছে ব্যাখ্যা করার জন্যে কে. টি. পল এনড্রুজকে আমন্ত্রণ জানাবেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মতো ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে এক মধ্যস্থ হচ্ছেন এনড্রুজ। কিন্তু এতে এইটি বোঝায় যে, কে. টি. পল মতামত প্রকাশ করতে চান না।

তারপরে, কথাবার্তা বললো অনেক কিছু নিয়ে। (কে. টি. পল শুধু ইংরেজি বলেন। আমার বোন ও সেনো দোভাষী।)

কে. টি. পল নতুন রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়কে প্রশংসা করলেন, আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রকৃত মনে সাড়া জাগায়। অন্যত্র ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত ধর্মের সঙ্গে যেমন, তেমনই এই হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি ভালো সম্পর্ক রেখে দিন কাটান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মগুলোর মধ্যেকার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপরে তিনি খুবই জোর দিলেন। (হিন্দু ও মুসলমান) কারুর কারুর মধ্যেকার সংঘর্ষের একমাত্র কারণ রাজনৈতিক। একমাত্র অসহিষ্ণু সম্প্রদায় আর্যসমাজ, সম্প্রতি এরা লাজপত রায়কে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কে. টি. পল বললেন যে, তাঁর সৌজন্যের অভাবের জন্যে তিনি অনেক শত্রু করেছেন। (তাঁর অত্যাধিক ভদ্রতা সম্পর্কে ইউরোপীয়রা যা মনে করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।) তিনি তোষামোদ করতে জানেন না; এবং তিনি যদি উচ্চাসন থেকে নেমে শুধু এক পা এগিয়ে যেতেন, শান্তিনিকেতনের কাজের জন্যে অনেক সাহায্য আসতো। এমনকি তাঁর নিজের প্রদেশ বাংলায় তিনি বেশি

সমালোচনার মুখে পড়েছেন। কে. টি. পল বললেন, বাঙালীর চরিত্র কিছুটা ঈর্ষাকাতর। কিন্তু অন্য সমস্ত প্রদেশে তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত।

কে. টি. পল সামাজিক এবং বিশেষ ক'রে, কৃষি সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন। এলমহার্স্টের সঙ্গে শ্রীনিকেতনে তিনি ভারতীয় গ্রামপুনর্গঠনের কাজ করেছেন। ধর্মীয় কাজের চেয়ে তিনি অনেক বেশি বৈষয়িক কাজে অংশ নেন। তিনি বিয়ে করেছেন, আটটি সন্তান আছে।

(জাতিগত মনোভাব প্রসঙ্গে, সেনো বললেন যে, হেলসিংফোর্সের সাম্প্রতিক সফরে কে. টি. পল দেখতে পেয়েছেন—শুধু এ্যাংলো-স্যাক্সনরাই নয়, সাধারণভাবে নর্ডিকরাও—ভারতীয়দের সম্পর্কে কেমন এক দূরত্বের মনোভাব বজায় রাখে। সুইজারল্যান্ডে ও ফ্রান্সে এটা অন্য ব্যাপার। এখানে এই জাতিগত বাধা অজানা। কে. টি. পল বললেন, তাঁর শেষ সফরে আমেরিকায় সর্বদা তাঁকে এই ধারণা কতো ব্যথিত করতো যে, যে-কোন সময়ে তিনি অপমানিত হতে পারেন।)

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। আমাদের বন্ধু কালিদাস নাগের শ্বশুর ও 'মডার্ন রিভিউ'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী আর. কে. দাস (শ্রীমতী দাস রুশ; এবং শ্রীযুক্ত দাস 'লিগ অফ নেশনসে' যুক্ত আছেন, তিনি ব্যাপৃত আছেন কৃষি-অর্থনীতি নিয়ে), এবং জগদীশচন্দ্র বসুর তরুণ ছাত্র জোহার আগমন। লম্বা সাদা দাড়ি আর তাই ভেদ-করা ভালোমানুষী মুখখানায় বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায়কে দেখায় যেন এক দয়ালু তলস্তয়। তিনি এই প্রথম ইউরোপে এসেছেন এবং ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা আছেন। তরুণী শ্রীমতী দাস সন্তানের মতো তাঁকে সেবা করেন; তিনি বললেন, দূরে সরে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি কাঁদেন, আর তাঁর খাওয়া-পরা, জীবনধারণের ভাবনাচিন্তার সবকিছুই ক'রে দিতে হয়। তাঁর মতো দরের বৃদ্ধের তুলনায় তাঁর মধ্যে আছে এক বিনয়, এমনকি চোখে-লাগার মতো ভীতুভাব। তাছাড়া, যে-কোনো কারুর চেয়ে ভারতীয় সাহিত্য তিনি ভালো জানেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ; শান্তিনিকেতনে গান্ধীর সঙ্গে বিখ্যাত আলোচনাগুলোতেও তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি বললেন, কথাবার্তার সময় গান্ধী চিত্তাকর্ষক, চতুর, অত্যন্ত পরিহাসপ্রবণ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সুবিদিত মানসিক সচলতার কথা বললেন: তাঁর অগ্রজ তাঁকে নিয়ে রঙ্গ করতেন, যেন এক শিশু, সবসময়ে ছটফট করছেন, 'নিরন্তর সচলতা' ('perpetuum mobile'); সবসময়েই নতুন পরিকল্পনা করছেন, নাকচ করছেন; কখনো যথাযথ নয়; কার্যকর করার আগেই কোনো স্থির-করা কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন; সিমলায় বাড়ি ভাড়া করা হলো, জিনিসপত্র সাজানো হলো, চাকরবাকর জড়ো করা হলো, তারপর শেষমুহূর্তে তার করলেন: "আমি আসছি না।" মালহ্বিডা ভি. মেইজেনবাগের চিঠিতে যে-চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিছু খবর দিলেন: নাম জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, একজন থিওসফিস্ট, কাশ্মীরে থাকেন, এবং এখনো বেঁচে আছেন।

রামানন্দ চট্টোপাপধ্যায় এবং দাসদম্পতি গতকাল ‘লিগ অফ নেশনসে’র ঐতিহাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে জার্মানির প্রবেশ ঘটলো; এবং তাঁরা ওই ভেল্কিবাজ ব্রিআঁ’র বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছেন।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। আমেরিকান বুকাননের আগমন; তিনি সম্প্রতি গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এশিয়া ঘুরে এসেছেন।

রাজা, লেখক, রাজনীতিবিদ: বিখ্যাত মানুষদের জগৎ ঘোরার এক রেকর্ড। মাথা-পিছু পাঁচ মিনিট।

লম্বা ঢেঙ্গা, স্ফূর্তিবাজ, সৌখিন মানুষটি, নিজেকে আর অপরকে নিয়েই মশগুল।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। গান্ধীর প্রিয় শিষ্য মিস স্লেসডের মধ্যস্থতায় আমি গান্ধীকে লিখলাম,—তাঁর আসার ব্যাপারে ইউরোপের তরুণদের প্রত্যাশার কথা এবং খ্রীস্টান যুবশক্তির ধর্মীয় ধারণার উপরে তাঁর অপ্রত্যক্ষ কিন্তু নিশ্চিত প্রভাবের কথা জানাতে; খ্রীস্টান যুবশক্তি তাঁর মধ্যে দেখে খ্রীস্টের সবচেয়ে নির্ভেজাল ব্যাখ্যাতাকে। আমি তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম, তিনি যেন ভারতবর্ষের কাজের জন্যে সর্বজনীন কর্তব্য বিসর্জন না দেন (২৭ সেপ্টেম্বর)।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। বন্ধুবর কালিদাস নাগকে এক দীর্ঘ অন্তরঙ্গ চিঠিতে “ইতালিতে রবীন্দ্রনাথ” ব্যাপারটি এবং সেই ধারণাটি—ইউরোপীয়দের ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে যার জিইয়ে থাকার ভয় আছে—খুলে বলার পর,—সেই চিঠি থেকে। (রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত মনোভাব, তাঁর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র মানুষের লড়াই: মহৎ কবি—যাঁর কাছে জগতটা একটা খেলা; এবং অবিচারে আহত হৃদয়—যা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সক্রিয়। আমি কামনা করি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যেন একেবারে রাজনীতির বাইরে রাখেন, এ তাঁর সঙ্গে মেলে না এবং এ তাঁর সত্যিকারের আগ্রহ জাগায় না: কারণ তিনি সহজেই এর খেলনা হয়ে উঠবেন।) কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নয়, প্রতিটি ভারতীয়ের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি, ইউরোপের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এই অদ্ভুত নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য—এবং তা কিছুটা বিদ্রূপাত্মক। আর সেটাই আমার কাছে বেদনাদায়ক…

…“আপনাদের এইরকম হৃদয়বান ও উচ্চমনা দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একাধিকবার আমি অনুভব করেছি যে, ইউরোপের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের উদ্বেগে তাঁরা ভৌগোলিক দিক থেকে এতো দূরে, যেন তাঁরা এ থেকে কয়েক শতাব্দী দূরে সরে আছেন। তাঁরা যেন ভাবেন: ‘ও তো ইউরোপের। আমাদের

নয়…' তাহলে, স্বাধীনতার জন্যে এশিয়ার দুঃখকষ্ট ও লড়াইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও কি বলবো ঃ 'ও আমাদের নয়…' ?—আমি তা কোনো দিনই বলবো না, কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার কোনো ইউরোপীয় বন্ধুর মধ্যে ভারতীয় মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে এই ধারণা না বাসা বাঁধে…—এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমরা যা কিছু লিখবো, তাতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিশ্বজনীন স্তরে আমাদের নিজেদের রাখতে হবে। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে রাজনীতিগত নৈতিকতা বিচারের দুই পদ্ধতি নেই, থাকতে পারে না। যারাই ন্যায়বিচারের জন্যে পীড়ন সহ্য করে, স্বাধীনতার সমস্ত শহীদ—আমাদের সকলের ঃ আমি আপনাদের জনকে গ্রহণ করছি; আপনারা আমাদের জনকে গ্রহণ করুন; আমাদের ইউরোপের খ্রীষ্ট, এশিয়ার মানুষ। এবং তিনি প্রাণ দিয়েছেন সমস্ত মানুষের জন্যে।…”

সেদিন শ্রীমতী দ্যুশেনের সঙ্গে যে পরিকল্পনাটি ছকেছি তাও নাগকে জানিয়ে রাখলাম। 'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে আন্তর্জাতিক নারী লিগ'-এর ফরাসী শাখা আগামী গ্রীষ্মে তার (ছুটির সূচিতে) বার্ষিক পুনর্মিলনে আলোচনার সাধারণ বিষয় হিসেবে উত্থাপন করতে চাইবে—উপনিবেশের সমস্যা,—অথবা, আরও ভালো হয়, আমি যেটা প্রস্তাব করেছিলাম ঃ 'ইউরোপীয় ও দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যেকার সম্পর্ক'। চেষ্টা করা হবে (বিশেষ ক'রে) এশিয়ার প্রতিটি বড়ো দেশের জন্যে দু'জন ক'রে মুখ্য প্রতিনিধি পাওয়ার, একজন দেশীয় অধিবাসীর দাবির পক্ষে, অপর জন ইউরোপের (কিন্তু সবচেয়ে মানবিক, সবচেয়ে সর্বজনীন ইউরোপের) পক্ষে। আমাদের ফরাসীদের পক্ষে তা পাওয়া সহজ হবে; আমাদের এশীয় উপনিবেশ ও বিশেষ ক'রে ইন্দোচীনের জন্যে অনেক সাধারণ ফরাসীই এর প্রতি আগ্রহ দেখায়; ইউরোপের অবিচারের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের লোকের মতোই তারা আবেগপ্রবণ। কম সহজ হবে সেই সব দেশের পক্ষে, যেখানে যেখানে ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাংলো-স্যাকসন স্বার্থ জড়িত। কিন্তু আমরা এন্‌ড্রুজ, আলবার্ট শ্‌হ্বেইটজের-এর মতো লোকের সাহায্যের চেষ্টা করবো। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে নাগকে অনুরোধ জানালাম।

আমি আরও লিখলাম,—নিজেদের প্রচেষ্টা ও পরিপূরক গুণগুলোকে মেলাবার প্রয়োজন ইউরোপ ও এশিয়াকে অনুভব করানোর জন্যে,'আমার কাছে এই বিতর্ক জরুরী মনে হয়েছে।

“একথা স্বীকার করছি, যে নির্বোধ ও শিশুজনোচিত জাতীয়তাবাদী অসার আত্মশ্লাঘা ইউরোপের ভারতীয়দের পেয়ে বসেছে, তা দেখে আমি ব্যথিত। ইউরোপের কিছু না জানার আগেই তারা ইউরোপ সম্পর্কে অবজ্ঞা জাহির করে। আমাদের কিছু কিছু কথা—আমারও কিছু কথা—তাদের বেসামাল করেছে। তারা ইউরোপের আত্মিক ও নৈতিক শক্তিকে ছোটো ক'রে দেখে। তারা ভঙ্গি দেখায় নিজেদের উচ্চতর জাতি বলে - যে-জাতিকে তার আধিপত্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। (ফ্রান্সের চীনাদের মধ্যেও এই একই ব্যাপার।) আমরা জীবন কাটালাম আমাদের ইউরোপের জাতীয়তাবাদীদের, আমাদের 'লাক্‌সিঅ' ফ্র'সেইজ'-এর

দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে,—আর যাদের আমরা সমর্থন করতে চাই, তাদের মধ্যে—অত্যাচারিত মহৎ জাতিগুলোর মধ্যে—দেখতে পাবো সেই একই মনের রোগ,—সত্যি বলতে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু এটা মানব-ঐক্যের আরও একটা প্রমাণ।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। কালিদাস ও শান্তা নাগের সম্প্রতি একটি মেয়ে হয়েছে এবং তাঁরা মেয়ের জন্যে একটি নাম দিতে বলেছেন। আমরা প্রস্তাব করলাম : লুস,—ফ্রাঁস, ফ্রাঁসিস, ফ্রাঁসোয়া, এবং (আমি যোগ করলাম) মার্দালিন।

৪ অক্টোবর, ১৯২৬। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগমন। তিনি যাঁর জীবনীকার সেই মহান্ হিন্দু রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কথাবার্তা বলবো ব'লে তাঁকে দেখতে আমাদের খুবই আগ্রহ। মুখোপাধ্যায়ের বইটির যে কয়েকটি পাতা আমার বোন আমাকে পড়ে শুনিয়েছে, তাতে আমাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছি, রামকৃষ্ণ ও তাঁর তেজস্বী শিষ্য বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করা এবং ইউরোপে তাঁদের পরিচিত করা আমার কর্তব্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন অসংস্কৃত, শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষ, কিন্তু তিনি স্বতঃ উপলব্ধির অন্যতম অতি-শক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মনে হয়,- নিজের মধ্যে তিনি সমস্ত মহৎ ধর্মের নিখুঁত একীভবন বাস্তবিক করেছিলেন। আমি বলি : ‘‘বাস্তবিক করেছিলেন।’ অন্যদের কাছে যা শুধু মনের একটা আদর্শ, বুদ্ধিগত সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা, সারা জীবন রামকৃষ্ণ তা সম্পন্ন করেছিলেন সরাসরি সহজাতবৃত্তি (instinct) থেকে। সমস্ত ধারাবর্ষী রূপের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করেছিলেন। এবং যাঁরাই তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁদের উপরে তা বিকীরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। যে অলৌকিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে ছিল, তা বিস্ময়কর মনে হয়। বিনা কথায়, তাঁর উপস্থিতি, তাঁর স্পর্শ বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতো। সেই যে-বিদ্রোহী সিংহ বিবেকানন্দ তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী—এবং হাতের একটা চাপ দিয়েই তাঁর চোখের সামনে নাস্তির যে অতলতা খুলে দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন—যার শক্তি মহাকাব্যোচিত, তাদের নিশ্চিত যাথার্থ্য বাতিল করা যায় না : কারণ বিবেকানন্দ যাঁদের কাছে মনের কথা খুলে বলেছিলেন সেই সাক্ষীরা এখনো বেঁচে আছেন;—কারণ এই গর্বোদ্ধত, আধিপত্যশালী মনের মানুষটি রামকৃষ্ণ যেখানে সাধারণ মানুষ সেখানে যিনি অভিজাত, রামকৃষ্ণ যেখানে অ-মননশীল সেখানে যিনি অতি-সংস্কৃত, এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যে অহংকারী—তাঁকেই দামাস্কাসের পথে পলের মতো রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল।

নিজের ও শিষ্যদের কাজের মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রভৃতি।

ওকাকুরা যখন জাপান থেকে বিবেকানন্দের সন্ধানে এসেছিলেন, এবং গঙ্গার পাড়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাঁকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।" ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে গিয়েছিলেন। (শান্তিনিকেতনে যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন, সেটা এখনো ধর্মীয় ভাবে সুরক্ষিত)। এবং তিনিই ঠাকুর-পরিবারের কাছে তাঁদের ভারতীয় ব্রত (mission) উদ্ঘাটিত করেছিলেন; তাঁর এই আগমনের দিনটি থেকে জন্ম হয়েছে নিজের জাতিতে ও এশিয়ায় উদ্বুদ্ধ কবি, মহান্ রবীন্দ্রনাথের। অন্যদিকে অগণিত বৈদান্তিকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা ও উত্তরাধিকারী অরবিন্দ ঘোষ বিবেকানন্দের শিষ্য।

মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণের মুখে-মুখে-বলা ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট রূপ দিতে চান। ভারতবর্ষে এখনো তিন জন শিষ্য বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁকে জানেন। তাঁদের স্মৃতিকথা লিখে নেবার জন্যে মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে ফিরে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁদের কাছ থেকে বিস্ময়কর প্রমাণপত্র, আত্মজীবনী-মূলক রোজনামচা পেয়েছেন, তাদের একটা আমাকে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাঁদের কাছে একই রকম আরও বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ ধারণা পেয়েছেন। কারণ তাঁদের একজন—নামটা আর আমার মনে পড়ছে না—মুখ্য শিষ্য, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর গুরুর কাছ থেকে তাঁর অতীন্দ্রিয় বিকীরণ-ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে। তাঁর শুধুমাত্র ছোঁয়া লেগে মুখোপাধ্যায়ের একমাস ধরে মনে হয়েছিল—মাটির উর্ধ্বে মাতাল-করা এক আনন্দের জগতে তিনি চলে গেছেন; তাঁর সমস্ত উদ্বেগ, জগতের সবকিছু লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এই শক্তি যাঁর আয়ত্তে, তিনি তা ব্যবহার করতে সতর্ক থাকেন, তিনি বলেন: "হাত বাড়িও না। পড়ে যাবে।" পশ্চিমের বিচারশীল মানসিকতায় অভ্যস্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন সাক্ষীর মুখ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার অতিশয় মূল্য আছে।

মুখোপাধ্যায় তরুণ, মনে হয় না ত্রিশের কোঠার বেশিটুকু পেরিয়েছেন। চীন ও জাপান ঘোরার পর তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়; সেখানে তিনি মজুরের কাজ দিয়ে শুরু করেন; পরে সেখানেই পড়াশোনা করেন, ডিগ্রি নেন। তিনি আমাদের সেইসব হাজার হাজার ভারতীয়ের কথা বললেন, যারা ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করতো, সেখানে পরিশ্রম ক'রে সম্পত্তি কিনেছিল, তারপর সাম্প্রতিক এক নিষ্ঠুর আইনে সম্পত্তি থেকে উৎখাত ও বহিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ফিরে এবং পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে এই হতভাগ্য "আশ্রয়হীনেরা" ("Heimatlosen") ঘেরাও হয়ে ইংরেজদের হাতে নিহত হয়েছিল; এবং এটাই ছিল অমৃতসরের অভ্যুত্থানের সূচনা—মুখোপাধ্যায় ইংরেজি ও এতো খারাপ ফরাসী দ্রুত স্বরভঙ্গিতে বলেন, যা শুনে আমাদের ইস্ত্রাতির কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর টাইপটার মধ্যে তা ছাড়াও এমন কিছু আছে যা বলকানিদের কাছাকাছি পেঁছোয়। সেই শিষ্যের (নামটা ভুলে গেছি) বিবেকানন্দকে খোঁজার অভিযানের কাহিনীটি তাঁর মুখ থেকে শোনার মতো; সমস্ত ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছেন, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাচ্ছেন এবং একদিন

হঠাৎ হিমালয় থেকে নেমে-আসা এক পথিকের চেহারা দেখে মাথায় হাত দিয়ে লুটিয়ে প'ড়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন ঃ ইনি কৃষ্ণ!" এবং বিবেকানন্দ (কারণ পথিকই বিবেকানন্দ) কাছে এসে কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন ঃ "অপদার্থ! আমি কৃষ্ণ নই। তাঁকে খুঁজছি। যদি তাঁকে পেতে চাও, আমাকে অনুসরণ করো!"

রামকৃষ্ণের ধ্যানধারণা ভারতবর্ষে অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে। বিপরীত দিকে বুদ্ধিজীবীরা এ সম্পর্কে একগুঁয়ে মনোভাব দেখাচ্ছেন (যদিও রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যদের অনেকেই ছিলেন বড়ো বুদ্ধিজীবী)। মনে পড়ল. ভারতীয় খ্রীস্টান কে. টি. পল বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের এই একটা ধর্ম যার অনেক ভবিষ্যৎ আছে; এবং তিনি নিজেই একে সম্মান করেন মনে হয়েছিল; ফিরে গিয়ে রামকৃষ্ণ-মঠগুলো তাঁর দেখবার কথা। মুখোপাধ্যায় বললেন, এই মঠগুলোর ইউরোপের মঠের সঙ্গে মিল নেই; ওখানে জীবন কাটানো নিষেধ; ওখানে যায় গুরুর উপদেশ মতো নিজেকে গড়ে তুলতে, কয়েক বছর ধ্যান করতে। যখন আলো আসে, শুধু নিজের জন্যে তখন তা রেখে দেবার নিয়ম নেই। দরজার কাছে এনে দাঁড় করিয়ে বলা হয় ঃ "তোমার মধ্যে আগুন আছে। তা এখন অন্যের কাছে নিয়ে যাও!" বিবেকানন্দ ধ্যানের জন্যে মঠ স্থাপনের একটা পাহাড় কিনেছিলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুজানোয়ার, বাঘ শুদ্ধ তার বন্য পরিবেশ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, সারাদিন বাঘগুলো গর্জন ক'রে ফিরত। সেখানে তৈরি হয়েছিল ছয় কি সাত জন সাধুর উপযুক্ত মঠ, কখনোই জন বারোর বেশি নয়। এঁরা জমি চাষ করেন এবং উপাসনা করেন।...রাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্তে সমস্ত নিদ্রিত মানুষের উপরে তাঁদের প্রেম বিকীরণ করেন, যাতে তাদের মুক্তি হয়; এই সময়ে আত্মা বস্তুর বন্ধন থেকে সবচেয়ে বিশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু রামকৃষ্ণ এবং তাঁর জীবিত বড়ো বড়ো শিষ্যের পক্ষে—যাঁদের মুখোপাধ্যায় দেখেছেন—পুণ্যের এক আদর্শকে অনুসরণের প্রশ্ন নেই। বলা হয় ঃ "সেবার কথা কি ভাবো? কৃষ্ণ হও। আর বাকী সবই তোমার কাছে আসবে।'

এইটি লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের সমস্ত বড়ো বড়ো মিস্টিকদের পক্ষে (আমার বিশ্বাস, যেমন ইউরোপের প্রাচীন মিস্টিকদের পক্ষেও)—আলোকলাভের সর্বশেষের আগের মাত্রা হচ্ছে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা, এ জগতে বেঁচে থাকার অরুচি,—এবং প্রেমে পেঁছুবার ও তা ছাড়াবার প্রয়োজনে ছাড়িয়ে যাওয়া চাই। এইটেই ঘটেছিল রামকৃষ্ণের সেই শিষ্যের ক্ষেত্রে*। গুরুর মৃত্যুতে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ "সব শেষ। আমার কাছে জীবন ব'লে আর কিছু নেই।" এবং তিনি হিমালয়ে নির্জনবাসে গিয়েছিলেন। সেখানে দশ বছর রইলেন। দশ বছরের শেষে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল ঃ মানুষের ভালবাসা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন আলো ছড়াতে।

গান্ধী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মাধুর্যে প্রভাবিত হয়েছেন। এই জীবনটির ইতিহাসের চেয়ে দিব্যতর কোনো কিছু তাঁর জানা নেই। মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

---

*ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত যে শিষ্যটির নাম ব'লা মনে করতে পারছেন না।—অনু.

আলোচনা করলাম, কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে গান্ধী তাঁর জীবনী লিখতে (তিনি যা লিখতে চেয়েছিলেন) তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষেধ করেছেন। আমার বিশ্বাস (আর আমি যা বললাম তাতে মুখোপাধ্যায় অবাক হলেন), গান্ধী সচেতন যে, তিনি এই উপাদানের দিব্য মানুষ নন (যা তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পান) এবং ভক্তরা তাঁর উপরে তাই চাপানোয় তিনি আহত হন। তিনি গোঁ ভরে আপত্তি জানান। তিনি নিজে তাঁর জীবনী লিখতে উদ্‌গ্রীব, যাতে তিনি নিজেকে ছোটো ক'রে দেখাতে পারেন, প্রমাণ করতে পারেন তিনি একজন সাধারণ মানুষ, তাঁর মধ্যে দিব্য কিছুই নেই। আর এইজন্যেই—তিনি চান বা না-চান—তিনি এক সন্ত। (কিন্তু সন্ত আর দেবতা বা অর্ধদেবতার মধ্যে দূরত্ব আছে! সন্ত আমাদের মানবতার অন্তর্ভুক্ত। দেবতা থাকেন অন্য ভূমিতে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সমস্ত বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব ঃ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাঙালী। এবং মুখোপাধ্যায়ও বাঙালী।

অক্টোবর, ১৯২৬। মুখোপাধ্যায় আমাকে একটি উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখছেন (৫ অক্টোবর)।

আমি লিখতে ভুলে গেছি, তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন আব্দুল-বেহা, তিনি আমেরিকায় থাকতেন। অন্ততপক্ষে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নির্দেশের বশবর্তী হতে; কারণ তাঁকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আব্দুল-বেহা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "আপনি ভুল করছেন; আপনার স্থান আমার পাশে নয়; রবীন্দ্রনাথকে খুঁজুন।" মুখোপাধ্যায় তাঁর উপদেশ মেনেছিলেন; তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন ঃ "যখন লিখবে, কখনো তোমার চিন্তা বাংলা থেকে ইংরেজিতে, ইংরেজি থেকে বাংলায় আক্ষরিক ভাবে তর্জমা করবে না। স্বাধীনভাবে একটাকে অন্যটার জায়গায় বসাবে।" রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত সব বাঙালী লেখকেরাই তাঁদের বিদেশী প্রকাশভঙ্গির বেমানান প্রচেষ্টা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতেন। তাঁরা হয় ইংরেজি, নয় বাংলা ভাবতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শক্তিশালী ও স্বাধীন করেছেন। তিনি ভাষা সৃষ্টি—বা নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন এক অমর গৌরবের বস্তু।

মুখোপাধ্যায় শিশুকালে বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন ব'লে মনে করতে পারেন।

১৩ অক্টোবর, ১৯২৬। জহরলাল নেহরুর আগমন, এবার সঙ্গে তাঁর ভগ্নিপতি আর. এস. পণ্ডিত ও পণ্ডিতের স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। নেহরুর মতোই শ্রীমতী পণ্ডিতের কাশ্মীরের রূপ—এবং তার মতোই ফরসা রং—তাঁর চেয়েও বেশি ফর্সা ঃ লোকে বলবে এক মনোহারিণী সিসিলি-ললনা, অনুজ্জ্বল রং, যেমনটি কাতানে-য়

দেখেছিলাম; ইতালীয়রা তাদের কেউ বলেই তাঁকে মনে করবে। (লোকে বলে, কাশ্মীরে এমনই ধূসর-ফ্যাকাশে চোখ-অলা মুখ চোখে পড়ে।) বিপরীত দিকে আর. এস. পন্ডিত এসেছেন গান্ধীর দেশ (কাঠিয়াবাড়) থেকে, তাঁর রং অত্যন্ত বাদামী। তিনি ব্যারিস্টার—(একটি বিরল পেশা যাতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার আছে), কিন্তু ইতিহাস ও শিল্প সম্পর্কে কৌতূহলী; তাঁর কথাবার্তা (বেশ ভালো ফরাসীতে তিনি বলেন) কৌতূহলজনক ও দামী—আর্য ও উত্তরের মোঙ্গল থেকে, নেগ্রয়েড এবং আদিম জাতিগুলো পর্যন্ত "এই বিভিন্ন জাতির যাদুঘর" ভারতবর্ষের একটি রূপরেখা তিনি আমাকে দিলেন। তিনি মনে করেন যে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের অজানা: —(আমার বিশ্বাস, এটা বোঝাপড়ার ব্যাপার এবং নিঃসন্দেহে অসহিষ্ণুতা আসে অন্য দিক থেকে),—ব্রাহ্মণ এলিতদের মধ্যে প্রকৃত যুক্তিবাদ চিরকালই ছিল। তিনি এই মতবাদ (তা আমার মতবাদের কাছাকাছি) পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষের আর্য (তিনি বললেন: "ব্রাহ্মণ"—তাঁর স্ত্রীও নেহরুর মতো তিনিও যাঁদের একজন) ও ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধু ভাষা ও আবহাওয়ার পার্থক্য, মেজাজের এবং সভ্যতার কোনো পার্থক্য নেই: ইংলন্ড, ফ্রান্স ইত্যাদিতে একজন ব্রাহ্মণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সমস্ত ধ্যানধারণাকে নিখুঁত ভাবে অঙ্গীভূত করে এবং তার নিজের ধ্যানধারণার সগোত্র ব'লে চেনে। তারা একই বংশমূল থেকে এসেছে। বিপরীত দিকে, (এবং আমরা একমত), তারা আরব, আফগান ইত্যাদি জগৎ থেকে নিজেদের পৃথক বোধ করে, যেমন বোধ করে নিজেদের দেশের দ্রাবিড়-জাতিগুলো থেকে। পন্ডিত তাদের ভাষা পড়তে পারেন না এবং সুন্দর দ্রাবিড় কবিতাগুলো সম্পর্কে জেনেছেন শুধু ইংরেজি তর্জমার মাধ্যমে। (মাদ্রাজ চারটি দ্রাবিড় ভাষার কেন্দ্রস্থল।)

ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে গান্ধী ও মিস স্লেডকে নেহরু ও পন্ডিত দেখে এসেছেন। তাঁরা বললেন, মিস স্লেডের আসাটা গান্ধীর স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছে, একমাত্র তিনিই তাঁকে নিজের দিকে নজর দিতে, তাঁর হাত থেকে ওষুধ খেতে বাধ্য করতে পারেন—যা খেতে তিনি বিশেষভাবে আপত্তি জানাতেন।

নভেম্বর, ১৯২৬। ডারবান (দঃ আঃ) থেকে সি. এফ. এণ্ড্রুজের ৫ নভেম্বরের চিঠি।...ভারতবর্ষ ছাড়ার কিছু আগে তিনি গান্ধী ও মিস স্লেডের সঙ্গে দেখা করেছেন, এবং আমাকে তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নভেম্বর, ১৯২৬। ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দেবার আগে রবীন্দ্রনাথ আবার ভিলন্যভ হয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন (জুলাই মাসে এখানে আসার পর তিনি ইউরোপে ঘুরছেন: ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া।) দিন পনেরো আগে তাঁর সঙ্গী অধ্যাপক মহলানবীশের এক তারে তাঁর

সম্ভাব্য আগমন আমাদের জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপর চার মাস ধরে যে আশ্চর্য অতি-পরিশ্রমী (প্রতি সপ্তাহে দু'তিনটি বক্তৃতা) করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে ভিয়েনায় নতুন ক'রে হৃদদৌর্বল্য হয়েছে। ডাক্তাররা তাঁকে হাঙ্গারির এক স্যানাটোরিআমে পাঠিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন ড্যানিউবের পথে ভারতবর্ষে ফিরতে। ৬ নভেম্বর বালাতনফুরেদ থেকে এক দীর্ঘ চিঠি ইংরেজিতে) লিখেছেন (তর্জমা আমার বোনের):

"আমার প্রিয় বন্ধু—ভিলন্যভ ছাড়ার পর থেকে আমি এই চিন্তাই লালন করেছি যে, আমার ইউরোপে থাকার শেষের কয়েকটা দিন আপনার সঙ্গে কাটানো যাবে। কোনো জিনিসের বা মানুষের সংসর্গের মর্ম উপলব্ধির পক্ষে অতি ক্ষিপ্রবেগে যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন এক আকাশচ্যুত মানব-গ্রহ, প্রচন্ড আর্তনাদে নিজের হারানো কক্ষপথ ফিরে চাইছি। এই সমস্ত সময় আমি আকুল হয়ে কামনা করেছি আপনার সাহচর্যের পরিবেশে আপনার সঙ্গে হার্দ আলাপের। আমি জীবনের সেই পর্বটি কাটিয়ে এসেছি, যখন চিঠিলেখা ছিল আমার কাছে স্বাভাবিক, যখন বন্ধুদের মধ্যেকার পারস্পরিক আদান-প্রদান বর্ণমালার খালবেয়ে অনায়াসে গড়িয়ে যেতে পারতো। যেহেতু সন্ধ্যার মুহূর্তগুলোর মতো, বার্ধক্যের নিজের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা আছে, দিনান্তের নীরবতাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে আলাপনের অতরঙ্গতা,—চিন্তার জীবন্ত সঙ্গীতের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে। আমাদের মন তার কথারজীবন শুরু করে শিশুকালে,—তা থাকে কুঁড়ির আকারে; তারপর মাঝখানের পড়াশোনা আর লেখার নিয়মানুগ অভ্যাসে, সে তার কথাকে আবিষ্কার করে পাকা একটা ফলের মতো। এমন এক সময় ছিল যখন লিখতে আমি সত্যিকারের একটা আনন্দ বোধ করতাম, যেমনটি জলকে মনে হয় দানা-বাঁধার স্তরে স্ফটিকের চিত্রলিপিতে আনন্দিত হতে। কিন্তু এখন আমি আর প্রয়োজন বোধ করি না এবং আমার মন চায় শুধু এক প্রবাহে নিজেকে প্রকাশ করতে, এক জলধারার মতো, যা চলতে চলতে কথা বলে। এবং সেই মতো এই কয়েকটা দিন আমার মন যখন আপনার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিল, মুখোমুখি, অন্তরের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে শুনতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি চিন্তার পুনরুজ্জীবনের গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলাম। আমি তা চিরকাল স্মরণ করবো। হয়ত সংবাদপত্র থেকে জেনেছেন অতি-পরিশ্রমে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন কয়েকদিন বিশ্রামের পর পূর্বের হ্রস্বতম পথে যেন ভারতবর্ষে ফিরি। আর একেবারে চলে যাবার আগে আপনার কাছে যাবার দীর্ঘকাল ধরে লালিত পরিকল্পনা তাই বাস্তব হলো না। ইউরোপের যেখানে যেখানে আমি ঘুরেছি, আমার সম্পর্কে মানুষের যে প্রবল আগ্রহ আছে তা আবিষ্কার ক'রে আমি বিস্মিত হয়েছি। কালের সঙ্গে পাশ্চাত্যে আমার খ্যাতির দেউলিয়াত্ব আসতে পারে, এখানে মানুষেরা তাদের বাতিল-করা প্রিয়জনের প্রতি বিরূপতা পোষণ করে—যখন তারা মনে করে মূল্যের বেশি তাকে দেওয়া হয়েছে। তবু যা আমার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তা যদি সাময়িকও হয়, তা নিজেই বিস্ময়কর। আমি উচ্চাভিলাষী নই,

আর তাই আশু কোনো পুরস্কারের প্রতি বেশি মূল্য আরোপ করি না। কিন্তু আমার এই প্রত্যয় আছে, আমার দেশে আমার নিজের ভাষায় যে যথেষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়ে গেলাম, তার মূল্য চিরস্থায়ী। সুতরাং আমার আকস্মিক জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, আমি অনুভব করি যে, পশ্চিম আমাকে যা উপহার দিয়েছে তাতে আমার অধিকার আছে, আমার কর্মের বেশিটুকুই সাক্ষ্য দেবে যে আমি সত্যিকারের ভালবেসেছি এবং সেই মতোই, শুধু আজকের জন্যে নয়, আগামী দিনের জন্যেও আমি ভালবাসার দাবি সত্যি সত্যি জানাতে পারি। অনুগ্রহ ক'রে আপনার বোনকে আমার হয়ে সহস্র শুভকামনা জানাবেন, এবং তাঁকে বলবেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি সুখী হয়েছি। সাক্ষাতভাবে আপনাকে শুভকামনা জানাতে না পারার জন্যে অসীম দুঃখের সঙ্গে— র ঠ.।”

প্রীতির সঙ্গে উত্তর দিলাম,—এবং গোপনীয় পুনশ্চতে (১১ নভেম্বর) ইতালির সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরোক্ষ উল্লেখ করলাম—(উল্লেখ করলাম বলগ্নের (Bologne) দৌরাত্ম্যের কথা, জনতার হাতে পনরো বছর বয়সের খুনীর টুকরো টুকরো হওয়ার কথা, ইতালির সমস্ত শহরের তারপরের হিংসার বীভৎস দৃশ্যের কথা,—৫ থেকে ৬ হাজার আহত. বহু নিহত,—তাদের মধ্যে অনেকে পরিচিত, উন্মত্ত জনতা কর্তৃক বেনেদেত্তো ক্রোচের বাড়ি আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, ফ্রান্সে কর্নেল রিচ্চিওত্তি-গারিবল্দির গ্রেপ্তার—লোকটা ফ্যাসিবিরোধী সেজে ছিল, ফ্যাসিস্ট পুলিশের উচ্চ মহলের টাকাখাওয়া উস্কানিদাতা, ফ্রান্স থেকে বড়ো বড়ো ষড়যন্ত্রকারীদের ইতালিতে পাঠাতো ধরিয়ে দেবার জন্যে ঃ এবং সম্ভবত মুসোলিনিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অজুহাত যুগিয়ে দেবার জন্যে)—এইসব উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে লিখলাম ঃ

“...আপনার ইতালীয় নিমন্ত্রণ-কর্তাদের প্রতি যে আস্থা ছিল তা নির্মূল করতে গিয়ে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে হয়েছে ব'লে আমি নিজেকে তিরস্কার করেছি। কিন্তু তাতে আপনার গৌরবের স্বার্থ, যা এখনো আমার কাছে আপনার বিশ্রামের চেয়ে দামী—ছাড়া আমার অন্য কোনো স্বার্থ ছিল না। আমি চাই না যে ইতিহাসে দানবেরা আপনার পবিত্র নামের অপব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যদি আমার হস্তক্ষেপ আপনাকে কিছু কালের জন্যেও অশান্ত ক'রে থাকে, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। ভবিষ্যৎ (ইতিমধ্যেই বর্তমান) আপনাকে দেখিয়ে দেবে আমি এক সতর্ক ও বিশ্বস্ত প্রহরীর কাজ করেছি।”

নভেম্বর, ১৯২৬। হেলসিংফোর্সে'র সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হলেও, ইউরোপে না-আসার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমি মীরাবেনের (মিস স্লেডের) মাধ্যমে গান্ধীকে সেপ্টেম্বর মাসে চিঠি লিখেছিলাম। এই আসায় কি লাভ হতো তার গুরুত্বের উপরে,—যাঁরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন, ইউরোপ জুড়ে যে নৈতিক সংকট চলেছে তাতে তাঁর উপদেশ, তাঁর দৃষ্টান্ত যাঁদের প্রয়োজন ছিল—সেই সব ধার্মিকদের চিত্তের পক্ষে

তা যে মঙ্গলসাধন করতো, তার উপরে—আমি জোর দিয়েছিলাম। এর মধ্যে আমি গান্ধীর পক্ষে দেখেছিলাম, এক দিব্য দৌত্য, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একচেটিয়া কর্তব্যে তাঁকে আত্মনিয়োগ করলে চলবে না…

মীরাবেন আমাকে লিখেছে (২৮ অক্টোবর) যে, এ গান্ধীর মনে খুব দাগ কেটেছে। "তিনি খুবই কম কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর চারপাশে এই যে প্রতিবন্ধক ছিল, তা আসে কদাচিৎ, এবং আসে একমাত্র যখন তিনি গভীরভাবে নাড়া খান…আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, তিনি ইউরোপে যাবেন যে-মুহূর্তে তিনি সত্যকার, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আমন্ত্রণ পাবেন…আমার বিশ্বাস মনের গভীরে তিনি তা খুব চাইছেন। যখন তিনি 'ক্ষুদ্র' কণ্ঠ' মেনে নিয়েছিলেন এবং হেলসিংফোর্সে যেতে অস্বীকার করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন : 'আমি এখন দেখছি ওখানে আমার ইচ্ছেটা ছিল।' কিন্তু তাঁর পক্ষে ইচ্ছা—তাঁর নিজের ইচ্ছা—যথেষ্ট নয়, যদি না তাঁর 'কণ্ঠ' কথা বলে। ইউরোপ যদি সত্যিকারের আমন্ত্রণ পাঠায়, নিশ্চয়ই 'কণ্ঠ' কথা বলবে!…"

প্রকৃত পক্ষে, গান্ধী আমাকে লিখেছিলেন : "—যদি আমি না অনুভব করতাম যে আমন্ত্রণটি শুধু 'ফাঁপানো'; স্বতঃস্ফূর্ত নয়, আমি সানন্দে হেলসিংফোর্সে যেতাম। অন্য কারণও ছিল : আমি ভেতর থেকে আহ্বান আসার অপেক্ষায় ছিলাম, তা মোটেই আসেনি। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তা যখন আসবে আমি তাকে বাধা দেবো না…।"

কিন্তু চিঠির শেষটুকু আমাকে দারুন বিস্মিত করেছে। 'লিবের আমিকোরাম'*-এ তিনি অনুগ্রহ ক'রে যে-লেখাটি পাঠিয়েছিলেন তার সম্পর্কে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করেছি ব'লে তিনি বিশ্বাস করেন মনে হয় :

"…রবীন্দ্রনাথ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার বিজ্ঞাপন দেবার কাজ নিজে থেকে ঘাড়ে নিয়েছেন এমন ভাবে আপনাকে দেখানোর জন্যে আপনি আহত হয়েছেন…"!

এবং গান্ধী এক মর্মস্পর্শী বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়েছেন।

কিন্তু তিনি যেই হোন, আমি কারুর কাছে অনুযোগ করিনি। এবং কখনো অনুযোগ করার কথা ভাববো না। কারণ গান্ধী আমার সম্পর্কে এই যে কয়েকটি লাইন লিখেছেন এটাকেই আমি মহৎ সম্মান ব'লে মানি। আমার আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিবিরের মধ্যে যে-বেদনাদায়ক বিরোধ আছে এটা তারই না একটা ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ যদি নাও হন, তাঁর চারপাশের কেউ তিক্ততায় মুখ-ফস্কানো কোনো কথা আমার ব'লে ঘাড়ে চাপিয়ে কাজে লাগিয়েছে। যে সব কারণে এখন পরিকল্পিত ভারতবর্ষ সফর থেকে আমি সরে আছি, তার একটা হচ্ছে এই যে, আমি সেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে পড়বো। এক অস্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য অস্ত্রের মতো প্রত্যেকেই আমাকে ও আমার অসতর্ক মন্তব্যকে কাজে লাগাবে। স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এইসব

---

* Liber Amicoram Romain Rolland : রলাঁর ৬০ বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ সংকলন। জুরিখ থেকে এমিল রনিকের প্রকাশনা, ১৯২৬।

ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে; মহৎ ব্যক্তি, যদি নিজেকে না বাঁচান তাঁর গুণগ্রাহীদের শিকার এবং তিনি তার জন্যে দায়ী, যদি নিজেকে না বাঁচান !

আমার ঘাড়ে চাপানো মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গান্ধীকে লিখলাম ঃ

"...আপনার কাজে নিজেকে লাগাতে পারা, আপনার চিন্তাকে জগতে ছড়িয়ে দিতে পারা আমার জীবনের এক গৌরব ব'লে মনে করি। এই স্বেচ্ছাসেবীর (libre serviteur) ভূমিকা আমি নিজে গ্রহণ করেছি...প্রিয় বন্ধু, আপনাকে আমি ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, আমার ও অন্যদের কাছে, আপনি চিরদিন যা আছেন, তাই থাকুন ঃ পুরোপুরি এক মানুষ—যিনি কাউকে খুশি বা প্রশংসা করার চেষ্টা করেন না, যে-কথা ভাবেন না, তার একটা কথাও বেশি বলেন না ! আপনার সামনে সমস্ত আত্মাভিমান সরে যায় ঃ কারণ আপনিই তার দৃষ্টান্ত দেখান ; এবং আমার মতো, যে-লোক লেখে, সে মাথা নত করে তাঁর সামনে, আপনার মতো, যিনি কাজ করেন।"

গান্ধীর চিঠিটা পাঠিয়েছিল মিস স্লেড, তাকে লিখলাম ঃ

"...গান্ধী যেন কখনো পক্ষপাতী আত্মাভিমানের এক মানসিক কিন্তুভাব (arrière-pensée) আমার উপর আরোপ না করেন ! ঈশ্বরের শক্তির সামনে দাঁড়াবার সৌভাগ্য যখন হয়, তখন যদি কেউ নিজের কথা এবং নিজের অহংকারের কথা ভাবে, তবে সে বড়ই হতভাগ্য—প্রিয় মীরা, তুমি আমাকে চেনো। কিন্তু গান্ধী চেনেন না। তিনি শিল্পী-মানুষদের চেনেন এবং তাদের অবিশ্বাস করেন। আমি পরমতম সাফল্যের মুহূর্তেও সর্বদা নিঃসঙ্গ থেকেছি, আমার চেয়ে তিনি তাদের বেশি অবিশ্বাস করেন না। শিল্পীরা হচ্ছে পুরোহিত, তাদের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর সঙ্গে তারা লেনদেন করে বা খেলা করে। তারা বলে ঃ 'জীবন গুরুতর। আর্ট একটা খেলা।' অথবা ঃ 'জীবন ও আর্ট একটা খেলা।' কিন্তু আমার কাছে সবই গুরুতর। কোনোটোই খেলা নয়। এবং আমি যদি আর্টের জন্যে জীবন উৎসর্গ ক'রে থাকি, তা করেছি এই কারণে যে, তা আমার কাছে দিব্যের সঙ্গে এক নিরন্তর সংযোগ। এই যে অনন্তের রহস্যময় স্পর্শ, জীবন্ত রূপগুলোর মধ্যে যা কানায় কানায় ভরে ওঠে, আমি তা অন্যের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করি।"

ডিসেম্বর, ১৯২৬। দিন কুড়ি পর আমার বোন পারী থেকে ফিরে এসেছে। শ্রীমতী কার্পেলের সঙ্গে সে দেখা করেছে। তার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর সম্পর্কে সে কিছু নতুন খবর পেয়েছে। সেগুলো লিখে রাখছি ঃ

সবার প্রথমে, কবির ছেলে রথীন্দ্রনাথের সম্পর্কে শ্রীমতী কার্পেলের সবচেয়ে গভীর শ্রদ্ধা আছে, ঠাকুর পরিবারকে তিনি অনেক কাল আগে থেকে চেনেন। দুঃখের বিষয়, এই অত্যধিক বিনয়ী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটির (তাঁর সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা হয়েছে) বাবার উপরে সামান্যই প্রভাব ; শান্তিনিকেতনে যা

ঘটে তার জন্যে তিনি ব্যথিত হন, এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা হয়, তার জন্যে তাঁকে দায়ী করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের পরিকল্পনায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী অস্বস্তি বোধ করেছিলেন; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁকে হুঁসিয়ার ক'রে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন; কিন্তু সফরে ইচ্ছুক কবি ঝুঁকেছিলেন সবকিছুর আগে তাঁর বয়স্ক-শিশুসুলভ কৌতুহল মেটাতে, তিনি কিছুই শুনতে চাননি এবং এই সব মন্তব্যকে বিদ্বিষ্ট ও অযৌক্তিক এক নৈরাশ্যবাদের ফল ব'লেই গণ্য করেছিলেন। তা এসেছিল তাঁর সংস্কৃতবিদ দুই বন্ধু অধ্যাপক ফর্মিচি ও "সেই ব্যক্তি"র* কাছ থেকে, দু'জনেই ফ্যাসিস্ট (কিন্তু "সেই ব্যক্তি" ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার ভান করতেন)। হঠাৎ ফর্মিচি এসে বলেছিলেন, এক ইতালীয় জাহাজে জায়গা ঠিক হয়েছে। কিন্তু যখন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জাহাজে উঠতে গেলেন, ফর্মিচি তাতে বাধা দিলেন, জোর দিয়ে বললেন যে, এই জাহাজে তাঁদের মতো জায়গা নেই; নিজের লোকজনদের কাছ থেকে কবিকে তিনি আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ছেলে ও ছেলের স্ত্রী এই ব'লে ভীষণ জোরাজুরি করেছিলেন যে, কবির স্বাস্থ্য এমন নয় যে তাঁকে একলা যেতে দেওয়া চলে : এবং তাঁদের নিতেই হয়েছিল; কিন্তু এই সময় থেকেই ফর্মিচি তাঁদের শত্রুভাবে দেখেছেন। জাহাজ নেপলস পৌঁছুল। রবীন্দ্রনাথের কিছু বন্ধু আগে খবর পেয়ে জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলেন স্বাগত জানাতে; কার্পেলেরা এসেছিলেন পারী থেকে, এলম্‌হার্স্ট লন্ডন থেকে। প্রথম কোলাকুলির আনন্দে তাঁরা যখন ভরপুর, ফর্মিচি তাঁদের আলাদা ক'রে দিলেন, কবিকে বললেন : "দশ মিনিটের মধ্যে রোমের স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে।" আর সেই ট্রেনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের আসনই সংরক্ষিত ছিল। এলম্‌হার্স্ট চটেমটে ইংলন্ডে রওনা দিলেন। কার্পেলেরা রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দিন নেপলস-এ রইলেন। এই সময়টাতে কবিকে পুরোপুরি একা ফর্মিচি ও মুসোলিনির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মহলানবীশ শুধু অন্য এক জাহাজে জায়গা জোগাড় করতে পেরেছিলেন, পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলেন রবীন্দ্রনথের সঙ্গে মিলতে; কিন্তু তার মধ্যেই মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে। কবি শুধুমাত্র দর্শন ও সাহিত্যগোত্রের একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার ছুতোয় ফর্মিচি দিয়েছিলেন মুসোলিনির গৌরব সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী দীর্ঘ বক্তৃতা। জমায়েতকে সতর্কভাবে বাছাই করা হয়েছিল; উর্দিপরা পতাকা হাতে ফ্যাসিস্টদের দিয়ে মঞ্চ বোঝাই ক'রে ঘিরে রাখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ইতালীয় ভাষা জানেন না, ধৈর্য ধরে বসেছিলেন, ফাঁদটির গন্ধও পাননি। তাঁকে দিয়ে অসংখ্য সাদা পোস্টকার্ড সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সরল বিশ্বাসে তিনি সই করেছিলেন। ভীরুতায় জড়তাগ্রস্ত হয়ে ক্ষমতাহীন ছেলে বসে থেকেছেন। সর্বশেষে, যখন রবীন্দ্রনাথ ইতালি ছেড়ে যাচ্ছেন, ফর্মিচি এসে তাঁর কাছে ইতালিকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে

---

* ফ্যাসিস্ট ব'লে জানলেও এখানে শ্রীমতী কার্পেলে কিন্তু অধ্যাপক তুচ্চির নামটি উচ্চারণ করছেন না।—অনু.

কয়েকটা লাইন লিখে দিতে বললেন—যা তিনি সংবাদপত্রে দিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, তার হাতে তুলে দিলেন, একমাত্র তখনই রথীন্দ্রনাথ তাঁর ভীরুতা জয়ের এক বীরোচিত প্রচেষ্টা দেখালেন; ফর্মিচি পালাচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে থামালেন; তিনি বুঝেছিলেন হস্তক্ষেপ না করলে পিতৃদেব ডুববেন, সবচেয়ে অসত্য উক্তি তাঁর নামে চালানো হবে; তিনি ফর্মিচিকে বললেন: "মাপ করবেন, বাবা যা লেখেন আমি সব সময়েই তার কপি রাখি…।" আটকা পড়ে বাধ্য হয়ে ফর্মিচি তাঁকে কাগজটা দিলেন, আবার সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন রোষদৃষ্টি হেনে। রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্তি—যার জন্যে আমরা এতে খেটেছি,—তারপরের বাদপ্রতিবাদ—সবাই জানে। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে ভুগিয়েছে। ছোটো একটি সান্ত্বনা যে, এতে ফর্মিচি ভুগেছেন আরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের অস্বীকৃতি, ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলোয় তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি—তাঁর ম্যাকিয়াভেলীয় পরিকল্পনার সর্বনাশ ঘটিয়েছে,—এবং সম্ভবত, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে-সাফল্যের প্রত্যাশা করেছিল তারও সর্বনাশ ঘটিয়েছে: মুসোলিনির কাজে লাগার বদলে, রবীন্দ্রনাথের সফর তার ক্ষতি ক'রে ছেড়েছে। লোকে বলে, এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রথীন্দ্রনাথ ঠিক ক'রে ফেলেছেন, ভারতবর্ষে একবার ফিরলেই তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে লাগবেন। তিনি 'সেই অধ্যাপককে' জিজ্ঞেস করবেন: 'আপনি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, কি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী নন? যদি হন, তাহলে কী ক'রে ফ্যাসিস্ট সরকারের সরকারী দৌত্য গ্রহণ করতে পারলেন? যদি ফ্যাসিস্ট হন, এখানে আপনার স্থান নেই।"

এমনকি ভারতীয়দের মধ্যেও ফ্যাসিস্ট প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার; সহজাত বাঁদুরে-প্রবণতা নিয়ে বাংলার তরুণরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে এই মতবাদে, যাকে তারা দেখছে অনেক দূরে থেকে। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠীর মধ্যেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ('মডার্ণ রিভিউ'-পত্রিকার সম্পাদক) এক ছেলে, রবীন্দ্রনাথের নামে ইতালীয় সংবাদপত্রের চালিয়ে-দেওয়া ফ্যাসিবাদের সমর্থনসূচক উক্তিগুলোর প্রতিবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। এতে রবীন্দ্রনাথ চটে গেছেন।

হায়রে! ইতালীয় ফ্যাসিবাদের ফাঁদ এড়াতে না এড়াতে তিনি ধরা দিয়েছেন হাঙ্গারীয় বা বলকান ফ্যাসিবাদের ফাঁদে! হাঙ্গারির মধ্যে দিয়ে তাঁর পথযাত্রার প্রতিধ্বনি আমরা হাঙ্গারীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি। এটা শোচনীয়। আরও একবার তিনি নিকৃষ্টতম লোকদের কুক্ষিগত হতে এবং তাদের হাতে নাম ভাঙাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। (এক হতবুদ্ধিকর অতিসরলতায় (naiveté) মহলানবীশ সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন: "হর্থি লোকটা চমৎকার…" এবং যাঁরা সবার সেরা, যাঁরা মুক্তমতি, কম ভাগ্যবান—তাঁদের নিয়মমাফিক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সমস্ত ইউরোপ সফর করার লোলুপ ও শিশুসুলভ বাসনায়, আর টাকা না-থাকায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার জন্যে এক ইম্প্রেসারিওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সেখানে ধনী ও স্নবদেরই প্রবেশাধিকার। এইভাবে সর্বত্র তিনি এক তিক্ত হতাশা সৃষ্টি হতে দিয়েছেন, আর সবচেয়ে উদাসীন মানুষ হয়েও তিনি ধারণা জন্মিয়েছেন—

অহমিকার জন্যে, টাকার জন্যে তিনি সর্বত্র নিজেকে দেখিয়ে বেড়ান। এটা বেদনাদায়ক।)

১৯২৭

জানুয়ারি, ১৯২৭। আমাকে পাঠানো দি 'ইন্ডিয়ান ডেইলি মেইল'-এর একটা সংখ্যায় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ফটোর পাশে (উৎসাহ ভরে পরিচয় দেওয়া) মুসোলিনির ফটোও ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছে;—আমি প্রেরক এইচ. মারিচিকে (তিনি এই সংখ্যার সবরমতি ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন) লিখলাম (১৫ জানুয়ারি):

"আন্তরিক ধন্যবাদ…কিন্তু আমি আপনাকে জানাতে চাই, এই সংখ্যায় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের পবিত্র মুখচ্ছবির পাশে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারী মুসোলিনির ছবি দেখতে পেয়ে কতখানি ধাক্কা খেয়েছি; ইউরোপের মুক্ত মনে এ যে কী আতঙ্ক জাগায় তা আপনি জানেন না। যদি ভারতবর্ষে এমন লোক থাকে যারা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাকে চূর্ণ-করা পশুশক্তিকে পুজো করে, তারা ইতালি থেকে-আসা এই নতুন প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করুক! কিন্তু শান্তিনিকেতন ও সবরমতির পবিত্র স্থানে এই রক্তমাখা প্রতিমাটি বয়ে নেওয়ার নোংরামির ভার তারা যেন না নেয়!…"

জানুয়ারী, ১৯২৭। কালিদাস নাগকে চিঠি লিখলাম (১৭ জানুয়ারী), কলকাতার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (তাঁর শ্বশুর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা) ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সপক্ষে যে উদ্দেশ্যপূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার প্রতিবাদ জানাতে। মুখ্য উস্কানিদাতা (fauteur) হচ্ছেন তাঁর তরুণ শ্যালক, মুসোলিনির বিজয়ী পাশবিকতায় ভারতীয় তরুণদের একাংশের মতোই তিনি নির্বোধ ভাবে অনুরক্ত হয়েছেন। তাঁরা দেখছেন না—(আমি যেমনটি তাঁকে লিখেছি),—তাঁরা তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের হাতেই ঠেঙানোর লাঠি তুলে দিচ্ছেন।

মার্চ, ১৯২৭। আমাদের বান্ধবী মীরা (মিস মাডলিন স্লেড) ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত আমার বোনের সঙ্গে পত্রালাপ করছে এবং গান্ধী ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তার ধর্মীয় জীবনের অভিজ্ঞতা এক অনির্বাণ আবেগে বর্ণনা ক'রে চলেছে;—সে গান্ধীর অন্যতম মুখ্য শিষ্য ও সত্যাগ্রহ আশ্রমের পরিচালক ডি. বি. কালেলকারের একটি চিঠি (২৪ জানুয়ারী, সবরমতি) আমাকে পৌঁছে দিয়েছে। আমি তাঁর ক্ষেত্রে কঠোর হয়েছিলাম। তাঁর 'গসপেল অফ স্বদেশী' পড়ে ধাক্কা খেয়েছিলাম এবং তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ ও জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার নিন্দা করেছিলাম (আসলে ইংরেজী তর্জমায় বইয়ের নাম থেকে শুরু ক'রে হিন্দি মূলের অর্থ খুব বিকৃত হয়েছিল;

ঠিক ঠিক নামটি হবে ঃ 'স্বদেশীয় ব্যাপক মতবাদ') ; আমার বই বেরুনোর সময় কালেককার জেনে ছিলেন এবং বেশ পরে তার সম্পর্কে জেনেছেন ; এবং তাঁর বিনয় —বলা চলে তাঁর নম্রতা—তখনই আমাকে লিখতে তাঁকে বিরত করেছে। যাঁরা তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছে, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে সে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। আর তাই অবশেষে তিনি লিখতে মনস্থ করেছেন। তিনি তা করেছেন মনে-ধরার মতো সংযম ও সৌজন্যের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, তাঁর মধ্যে মোটেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নেই, এবং সর্বোপরি তা মোটেই নেই তাঁর চিন্তার জগতে, অ-শিল্পজীবী মানুষদের শোষণকে বাধা দেবার জন্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে জাতীয় ব্যক্তিত্বের সুস্থ চেতনা জাগ্রত করাই সর্বোপরি তাঁর লক্ষ ছিল ; তিনি চেয়েছিলেন প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্যে সব জাতিই যেন একমাত্র নিজেদের সম্পদের উপরে নির্ভর করে- (সত্যি বলতে, যা, এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মানব-ঐক্যের ঐতিহাসিক বৈধতা ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে)। তিনি সদ্য 'ও দেস্যু দ্য লা মেলে' ও 'ক্লেরাঁবো' পড়েছেন, এবং আমার ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বোধ করেছেন। তিনি তাঁর মত গোপন ক'রে রাখেন না, কিন্তু নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের মধ্যে। আমার "কড়া কথার" জন্যে তিনি আমাকে ভৎর্সনা করেননি, বরং ভৎর্সনা করেছেন নিজেকে, তাঁর গুরু গান্ধীর মতবাদ সম্পর্কে এইভাবে প্রতিকুল ধারণার সৃষ্টি করেছেন ব'লে।

"তাঁর সম্পর্কে আমার সমালোচনার অবিচারকে ক্ষমা করার" প্রার্থনা জানিয়ে আমি উত্তর দিলাম (১৭ মার্চ)। আমি তাঁর কয়েকটি যুক্তিও ব্যাখ্যা করলাম ঃ

"ইউরোপের জাতীয় অস্মিতা এমনই এক ভয়াবহ দুর্দৈব, এবং যার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে আমার জীবন নিঃশেষ হয়েছে - আমার বিশ্বাস যে, সর্বত্র আমি তার ছায়া দেখছি ; এবং যেখানেই তাকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখছি ব'লে মনে করছি, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে অস্ত্র ধরছি। যদিও ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে পরিস্থিতি মোটেই এক রকম নয়, তবু আমি জানি, কী ভয়ঙ্কর দ্রুততায় এই নৈতিক মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে,— এবং ব্যক্তির সঙ্গত চেতনা তার কর্তব্য ও ন্যায্য অধিকার থেকে তার দেশগত বা জাতিগত অহং-এর এক এমন অসুস্থ অতিপুষ্টির দিকে চলে যেতে পারে, যা সবকিছুকে পায়ে মাড়ায়। এইখানেই আজকের মানবতার স্থায়ী বিপদ! এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ও জাতির পরিচালকদের শক্ত হাতের প্রয়োজন, যেমন আমাদের নেতা গান্ধী এবং আপনারা। আর যেহেতু, গান্ধী বা আপনারা সেখানে চিরকাল থাকবেন না, আপনাদের উচিত এই কঠোর কান্ডারীর ভূমিকায় তাঁদের গড়ে তোলা, যাঁরা আপনাদের পর নৌকোর হালে আপনাদের স্থান নিতে পারেন। আমরা জগতের ঝড়ের মাঝখানে। মুহূর্তের জন্যেও কান্ডারীর চোখ বোঁজার উপায় নেই। আপনার চিঠিতে একটি অতি সুন্দর, অতি গভীর কথা আছে, সেটি আমার মনে গেঁথে রেখেছি ঃ

'কোনো জ্ঞানই পরদেশী হতে পারে না। এ আত্মার জিনিস।'

এই কথাটাই আমাদের ভাই বানিয়ে দিয়েছে,—এবং একই পিতার সন্তান ক'রে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেকার আর সমস্ত কিছুই গৌণ…"

(তাঁর যে-পীড়ার কারণ ঘটিয়েছি তার জন্যে তারপর সস্নেহে দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং আমার বন্ধুত্ব জানিয়েছি।)

১১ এপ্রিল' ১৯২৭। (মাদ্রাজের কাছে) কোলেনগোড়ের রাজকুমার মেনন ১ম নারায়ণের আগমণ। তরুণ, প্রীতিপ্রদ মুখ, আদবকায়দায় পরিমার্জিত, হাড়ের যক্ষ্মার জন্যে লেজ্যাঁতে ডাঃ রলিয়ে-এর ক্লিনিকে দেখাচ্ছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এনড্রুজ প্রভৃতিকে চেনেন। সবচেয়ে আগ্রহ রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের ধর্মীয় ও বিস্ময়কর বিরাট উৎসবগুলো সম্পর্কে গল্প হলো,—সবচেয়ে হলো মুখ্য উৎসবঃ সর্পোৎসব সম্পর্কে (বোঝা যায় তাঁর অতি-ইউরোপীয় মুক্ত মন হলেও তিনি তবুও এর ধর্মীয় ভীতি অনুভব করেন),—এবং অগ্নি-উৎসবসম্পর্কে; এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন তাঁর বাবা (এবং এতে উপবাস ক'রে ও মন্ত্র প'ড়ে-তৈরি ভক্তরা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, পোড়ার কোনো চিহ্ন থাকে না)। মিলান ক্যাথিড্রালে প্রাচ্যের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্য সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়েছেন।

এপ্রিল, ১৯২৭। গান্ধী গুরুতর অসুস্থ। কয়েকমাস ধরে তিনি নিজেকে অত্যধিক খাটিয়েছেন, গোটা ভারতবর্ষ ছুটোছুটি করেছেন, জনতার সামনে দৈনিক আটটা থেকে দশটা বক্তৃতা দিয়েছেন। দিন পনেরো হলো পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয়েছিল, শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে গেছে। তবুও তাঁর মনের জোর খাটাচ্ছেন মনে হচ্ছে। আমাদের বান্ধবী মীরাকে আশ্বস্ত করার জন্যে পরদিন থেকেই লিখছেন।

আমার বোনের সঙ্গে মিস স্লেডের কৌতূহলোদ্দীপক পত্রালাপ। গান্ধীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা। সে সদ্য গান্ধীর সামনে চরম ব্রত নিয়েছে। পরম সুখে সে অবগাহন করছে। আমরা অনুভব করি যে, গান্ধীকে জেনে, তাঁর বিশ্বাসকে সমর্থন ক'রে সে তার সত্যকার পথ খুঁজে পেয়েছে, সে তার বৃত্তি অনুসরণ ক'রে চলেছে—যে-বৃত্তি এতোদিন অজানা ছিল।

এপ্রিল, ১৯২৭। গত বছর যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই ভারতীয় খ্রীষ্টান কে. টি. পল কলকাতা থেকে আমাকে লিখেছেন (৭ এপ্রিল) এবং আমাকে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয় নিয়ে সেটি ছেপেছেন দৈনিক 'হিন্দু'তে। আমার সম্পর্কে এতে

তিনি খুবই বদান্য, কিন্তু ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে বেশ নরম, বেশ মেরুদন্ডহীন। ফ্যাসিবাদকে নিন্দা না ক'রে তিনি ফ্যাসিবাদের অতিরেককে দোষ দেবার চেষ্টা করেছেন, আর এমনকি, এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, ইতালীর আন্দোলন স্বরাজ্য-পন্থীদের আন্দোলনে ভারতীয় জনগণের উদ্দীপনার প্রথম মাসগুলোর অনুরূপ। দাসিজ্-এর ফ্রান্সিসকান উৎসবের পর থেকে মুসোলিনির সঙ্গে চার্চের আপসের বিরুদ্ধে আমার রাগের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু তিনি ধরে নিতে চান যেন সন্ত ফ্রাঁসোয়া মুসোলিনিকে নিন্দা করতেন না, তাঁর "ছোট ভাই" ব'লে তাঁকে সম্বোধন করতেন। গান্ধী এবং আমার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জাহির করেছেন ; কিন্তু এ কটাক্ষও করেছেন যে, এই "মহাজনেরা" নিঃসন্দেহে বড়োই "সরল"। আমি তাঁকে লিখলাম (২৪ এপ্রিল) ঃ

"প্রিয় শ্রীকে. টি. পল,—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সন্ত ফ্রাঁসোয়া সম্ভবত মুসোলিনিকে বলতেন আমার "ছোটো ভাই"। গুব্বিও-র নেকড়েকে তিনি তাইতো বলেছিলেন ! কিন্তু ওই নেকড়েটাকে কী বলেছিলেন ? 'ভাই, আর অসৎ কাজ করো না। আমাকে অনুসরণ করো। আর পাপ করো না !' এবং তিনি ফ্যাসিস্ট নেকড়েটাকে তাই বলতেন ··কিন্তু আজকের খ্রীষ্টানরা কী বলছেন তাঁকে ? তাঁর কোনো স্তাবকতা না করলেও তাঁরা বিচক্ষণের মতো চুপ ক'রে আছেন। আজকের খ্রীষ্টানরা ঝড়ে-উত্তাল হ্রদের মধ্যে যিশুর শিষ্যদের মতো।

'এবং যিশু তাহাদের বলিলেন ঃ -হে অল্প-বিশ্বাসী মানুষেরা তোমরা ভয় পাইতেছ কেন ?'

তাঁদের আজকের ভয়, দেহের কোনো ভয় নয়, সে ভয় মনের। তাঁরা মৃত্যুকে ভয় করেন না, ভয় করেন মতামতকে। তাঁরা আত্মত্যাগের ভয় করেন না। তাঁদের ভয় এই যে, জগতের চোখে এই ত্যাগ অতি-সরলতার পরিচয় ব'লে মনে না হয়। এই ভয় আমাদের মোটেই নেই। আমার শৈশবের (ক্যাথলিক) ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমস্ত জাতের চার্চ থেকে মুক্ত থাকলেও, আমার আছে বিশ্বাস। অন্তরের ঈশ্বর যখন কথা বলেন, তাঁকে মানতে হয়।

'এবং এক বিপুল স্তব্ধতা সৃষ্টি হইল।' (ম্যাথিউ, ৮, ২৬)"

২৯ এপ্রিল, ১৯২৭। (আফগানিস্থানের) কাবুল থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের আগমন। তিনি যখন আমেরিকায় লেখেন এই নামও সই করেন ঃ মিঃ পিটার, পীর প্রতাপ, সিং-খান)। উত্তর ভারতবর্ষের বৃন্দাবনে তাঁর জন্ম ; সেখানে তিনি একটি শিল্পবিদ্যালয় (ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল) খুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটি দেখেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্যে তিনি তাঁর সম্পদ ও সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্যে জার্মানীর সাহায্য লাভের আশায় যুদ্ধের প্রারম্ভে (বা তার আগেই) যখন তিনি জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, ইংরেজ সরকার সম্পত্তির অপর অর্ধেক তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। তখন

তিনি কাবুলে গিয়েছিলেন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে, সেখানেই তিনি থাকেন,—যদিও মনে হয়, তাঁকে না হলেও—তাঁর ছেলেকে ইংরেজ সরকার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি গোটা দুনিয়া ঘুরেছেন ; একটি চেষ্টা চলছে (ইংরেজের বাধা সত্ত্বেও) তিব্বতের মধ্যাঞ্চলে যাবার। তিব্বতে ঢুকেছিলেন, দালাই লামার সঙ্গে লেখালিখিও করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের জন্যে লাসা ঢোকা নিষিদ্ধ হয়। দেখা যাচ্ছে, তিনি সব সময় এইটেই ভাবেন এবং আবার তা শুরু করবেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গায়ের রং গেরুয়া-বাদামী, দাড়ি আছে। তিনি নিঃসন্দেহে খুবই সক্রিয়, বুদ্ধিমান ও অনমনীয় ; ইংরেজিতে বিশদভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর প্রতি আমার প্রবল সহানুভূতি নেই। তিনি তাঁর রাজনীতির সঙ্গে এক ধর্মীয় অধিবিদ্যা মেশান, সেট লেপ্টালেপ্টি হয়ে তালগোল পাকায় এবং তা আমার অরুচিকর : কারণ যে-অ্যাংলো-স্যাকসনদের তিনি মিঠে-মিঠে ঘৃণা করেন—তাঁদের মধ্যেও যেমন, এর মধ্যেও তেমনি একই সচেতন ভণ্ডামি খুঁজে পাই। তাছাড়া, এও বেশি জানা নেই, অধিবিদ্যা আর রাজনীতি কী ক'রে হাত ধরাধরি ক'রে চলে, কী ক'রে একসঙ্গে খাপ খায়। হঠাৎ লম্ফ দিতে হয়, কালো থেকে সাদায়। তিনি জোর দিয়ে বলতে শুরু করলেন, জগতের আদিতে সব কিছু ভালো ছিল, এবং মন্দ এসেছে সীমাবদ্ধতা থেকে, কিন্তু জগতের আন্তর শক্তি সব কিছু সত্ত্বেও তাকে আদিম দাক্ষিণ্যের অবস্থায় নিয়ে যাবে। এটা তাঁর মৌল বিশ্বাসের ভিত্তি, এক বিরাট যান্ত্রিকতা। তিনি এও বললেন, রাজনীতি হচ্ছে জগতের মস্তিষ্ক আর ধর্ম তার হৃদয়, এই মস্তিষ্কের জোরেই তাকে সক্রিয় হতে হবে,—এবং তিনি চেষ্টা করছেন, একদিকে, প্রতিটি দেশের মস্তিষ্ককে (উৎকৃষ্ট মানুষ—যাদের মানবতার বোধ আছে) ঐক্যবদ্ধ করতে, অন্যদিকে, তাদের জনগণের উপরে চাপাতে, জনগণের নেতারূপে তাদের মনোনীত করাতে। কিন্তু যখন কাজের প্রসঙ্গে আসা যায় তাঁর পক্ষে থাকে শুধু একটিই : তা হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ। তিনি বললেন, কারণ এটা জগতের সবচেয়ে অবিচার ; আর "দেবরাজ" (Jupiter) প্রতাপ (ইউরোপের ফ্যাসিবাদ, ইউক্রেনের ২ লক্ষ নিহত ইহুদি দক্ষিণ আমেরিকায় ইয়াংকিদের দখলদারি, অবশিষ্ট জগতের প্রতিটি অবিচার ইত্যাদি) তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না : একমাত্র গণ্য—ভারতবর্ষ ও চীনের বিদ্রোহ। এক দিব্য দৌত্য, জগতের নিয়ম বা মানবতার প্রেমের আড়ালে (সরল প্রত্যয়ের আড়ালে—এইটেই নিকৃষ্টতম অহংতা) চোখে ধুলো-দেওয়া এই জাতীয়তাবাদের সামনে আমি এই প্রথম পড়ি নি। আমি এ সহজে সইতে পারি না ; আমার চোখেমুখে রাগ ফুটে বেরুল, আর তা বড়ই তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেল বোনের মধ্যবর্তিতায়। না রেখে-ঢেকে আমি তাঁকে বললাম, ভারতীয় অহংবোধ, জগতের নিপীড়িত ভাইদের সম্পর্কে তাঁর উদাসীন পল্লব-গ্রাহিতা কয়েক বছর যাবৎ ভারতবর্ষের স্বার্থ থেকে আমাকে বেশ দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অতি ঔদাসীন্যে যে ভঙ্গিতে "সিং-খান" ইউক্রেনের ইহুদি নিধনের ঐতিহাসিক, গাণিতিক যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করলেন, তাতে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনার সব ইচ্ছেই উবে গেল,—যদি আলোচনা ক'রে থাকি, করেছি আমার অতিথির প্রতি সৌজন্য বশে।

এটা কতো সুখের যে গান্ধী বেঁচে আছেন ; তিনি তাঁর অন্তরে মানবতা আর তার দুঃখকে—সমগ্র মানবতাকে ধারণ ক'রে আছেন ! তিনি ছাড়া এবং ভারতবর্ষের চেতনার প্রবল সক্রিয় গতিনির্দেশ ছাড়া - ভারতবর্ষ কী হবে ? আর তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের আগ্রহান্বিত হবারই কী কোনো যুক্তি থাকবে ? কারণ তা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে ? কিন্তু হায়রে ! গান্ধী ক'দিনই বা বেঁচে থাকবেন ।

১ মে, ১৯২৭ । জহরলাল নেহরু, তাঁর স্ত্রী, এক বোন ও তাঁর শিশুকন্যা ইন্দিরার আগমন । গত বছর তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন । দু'বছর যাবৎ ইউরোপে আছেন স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যে, স্ত্রী শীতকাল কাটিয়েছেন মন্তানায় ; অক্টোবরে ফিরে যাবেন । যখন এসেছিলেন, তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী অসহযোগী । আমার কাছে মনে হলো তিনি গান্ধীবাদ থেকে সরে গেছেন, এবং তাঁর অভিমত এই যে, সাধারণ শ্রেণী ঃ শ্রমিক-কৃষকও (গান্ধীকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা ক'রে চললেও) এ থেকে সরে গেছে ; তারা দেখছে, গান্ধী তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্যে প্রায় কিছুই করেন না (কথাটা বললেন নেহরুই) ; তিনি শ্রেণীবিরোধের কথা শুনতে চান না এবং দুঃখদুর্দশার দাওয়াই হিসেবে) শ্রমজীবীদের কাছে প্রচার করছেন জীবনের পবিত্রতা (গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প গড়ে তুলতে গান্ধী যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁর গুরুত্বকে নেহরু একটু বেশি অবহেলা করেন) । নেহরু সবচেয়ে অভিভূত হয়েছেন নিম্নশ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্দশায় । এবং মনে হয়, ভারতবর্ষ থেকে যত দূরে থাকছেন ততো বেশী অভিভূত হচ্ছেন । তিনি বলেন যে, ওখানকার অবস্থা ইংলন্ডের ৬০ বছর আগেকার অবস্থার মতো খারাপ ঃ শিল্পায়নের সমস্ত দোষ, তার কোনো সুবিধা নেই । লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের এই শিল্পায়ন একেবারে হাল আমলের । ৫০ বছর আগেও ইংরেজরা ভারতবর্ষে সব রকম যন্ত্রের প্রবেশে বাধা দিতো ; গান্ধীর চেয়েও তারা তখন ভারতবর্ষে যন্ত্রায়নের বেশী শত্রু ছিল । বছর চল্লিশ হলো এই দুদৈব ছড়িয়ে পড়েছে । বর্তমানে এর সবচেয়ে আধিপত্য বোম্বাই অঞ্চলে, সেখানে বিরাট বিরাট সুতোকলের পত্তন হয়েছে, যুদ্ধের পর এরা অংশীদারদের শতকরা ২০০ থেকে ৩০০ ভাগ মুনাফা দিয়েছে, আর তাদের শ্রমিকেরা অনাহারে মরেছে । বিদ্রোহের মনোভাবও ছড়িয়ে পড়ছে ; সর্বত্র দ্রুত, ভেঙ্গে-যাওয়া ধর্মঘট ; কারণ শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে জানে না । মতবাদের দিক থেকে কমিউনিস্ট প্রচার ফলপ্রদ নয় ; শুধু মাত্র এক সাধারণ বিপ্লবী অর্থেই এ সক্রিয় ; আরও এই জন্যে যে, রাশিয়া এমন একটা দেশ যার কৃষি-অবস্থা ভারতবর্ষের সবচেয়ে কাছাকাছি । আমি যতোটা ধরতে পারছি, দু'বছরে নেহরু গান্ধীবাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে সরে গেছেন এবং মনে হয়, তিনি জগতে তার ক্রিয়া সম্পর্কে আর তেমন আগ্রহী নন । তিনি ইউরোপীয় বনে গেছেন ।···

মেয়েরা সেজেছেন তাঁদের সুন্দর জামাকাপড়ে—তাদের রং আগুনের, পাকা ফলের । তাঁদের কপালের মাঝখানে ছোটো ছোটো গোল ফোঁটা । নেহরুর স্ত্রী

বসেছেন আমার কাছে, জানলার সামনে মুখের পার্শ্বরেখা। তাঁর বেঁধানো নাকের ফুটো দিয়ে রোদের আলো দেখছি।

১৩ মে, ১৯২৭। মিস জোসেফিন ম্যাকলিঅডের আগমন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার (মার্গারেট নোবল) অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অনেক মাস—প্রায় এক বছর হবে—মুখোপাধ্যায়ের আগমনের পর থেকে আমি ও আমার বোন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রায় পুরাণ-কল্প ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, মিশন মিস ম্যাকলিঅডের মাধ্যমে এই বিষয়ের প্রায় একটা গোটা লাইব্রেরি পাঠিয়েছেন; আর আমার বোন সেগুলো উল্টেপাল্টে পড়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে পড়ে শুনিয়েছে ইউরোপে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে মিস ম্যাকলিঅড আগ্রহী হয়েছেন।

ভদ্রমহিলা আমেরিকান, বছর ষাট বয়স, সাদা চুল, লম্বা, রোগা, মুখে বলিরেখা, কিন্তু খুব প্রাণপূর্ণ, প্রখর বুদ্ধিমতী, মনটি উদগ্র ও কৌতূহলী, বেশ ভালো ফরাসীতে বাক্‌পটুতার সঙ্গে কথা বলেন, না-থেমে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান। তিনি ধনী, মার্জিতরুচি। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থেকেছেন, যাঁরা আগ্রহ সৃষ্টির যোগ্য ঃ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী (তাঁকে দেখেছেন মার্চের প্রথম দুর্ঘটনার কুড়ি দিন আগে), অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি—সবাইকে সেখানে জেনেছেন; কিন্তু সর্বোপরি জেনেছেন বিবেকানন্দকে, যিনি হয়ে আছেন তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাঁর আবেগ। অবশ্য নিজেকে যতোই তাঁর প্রত্যাদেশের দৃঢ় প্রত্যয়ী বলুন না কেন, তিনি কখনো তাঁর মিশনে ঢোকেন নি, অন্যান্য এ্যাংলো-স্যাকসনদের মতো তাঁর স্বতন্ত্র জীবন বজায় রেখেছেন; এবং আমার সন্দেহ তাঁর বিশ্বাসে নারীসুলভ পল্লবগ্রাহিতার মেশাল আছে, যা প্রবল ভাবে অনুরক্ত হয়েও এই সব অত্যাশ্চর্যে নিজে বিস্তর মজা পায়।

তাঁর কথাবার্তা লিখে রাখা কঠিন, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লাফিয়ে চলা থামে না তাঁরই মতো ক'রে বলছি, লিখছি এলোমেলো ক'রে।

আমেরিকায় তিনি বিবেকানন্দকে জানতেন ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সাল থেকে। ইংলন্ডে আবার তাঁকে খুঁজে বার করেছিলেন, সেখানে প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে (তখন তিনি মার্গারেট নোবল, লন্ডনে এক স্কুলের পরিচালিকা)। বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৯৮ সালে, বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতবর্ষ চিনিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের তীর্থভ্রমণে তিনি বিবেকানন্দের পিছন ধরেছিলেন। আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে মৃত্যুর তিন মাস আগে আবার তিনি বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন না যে, বিবেকানন্দের অসুস্থতার কোনো চিহ্ন ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন বা বিশ্বাস করতে চান যে, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বিরেকানন্দ মারা গেছেন; একমাত্র এই জন্যে যে, তিনি তাই ইচ্ছা করেছিলেন এবং তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল। মৃত্যুর দিনটির মতো এতো সবল

তিনি আর কখনো ছিলেন না। অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছেন, শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের বলেছেন: "ঈশ্বরের সন্ধানে যদি অটল থাকে, তাহলে ভারতবর্ষ অমর। কিন্তু যদি সে রাজনীতি ও সামাজিক সংঘর্ষে নামে, তাহলে মরবে।" সেদিন সন্ধ্যায় তিনি নির্জনে রইলেন এবং সমাধিতে প্রবেশ করলেন। তিনি বসেছিলেন, এক শিষ্য হাঁটুগেড়ে পাশে বসে হাওয়া করছিলেন; তাঁর শ্বাস বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন, আর তা ফেলেননি; তবুও বেশ অনেকক্ষণ ধরে বুক ধুক ধুক করছিল; অবশেষে তা থেমে গেল (৪ জুলাই, ১৯০২)।

তাঁর সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিচ্ছুরিত আকর্ষণীয় ক্ষমতা সম্পর্কে মিস ম্যাকলিঅডের বলা শেষই হতে চায় না। এক মল্লবীরের শক্তি মিশেছে মাধুর্যের সঙ্গে। শক্ত চোয়াল, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর তার সাফল্য অর্ধেক নিশ্চিত ক'রে দেয়। চেল্লোর মতো সুন্দর কণ্ঠস্বর, একটু গম্ভীর, মন কাড়ে, সাড়া জাগায়, (রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর থেকে খুবই পৃথক, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ওঠে খুব উঁচুতে), চড়ে না কিন্তু তার গম্ভীর স্পন্দনে ঘর ও শ্রোতার মন গম গম ক'রে ওঠে, আর শ্রোতা যখন মুগ্ধ হয়, তিনি সেই কণ্ঠস্বরকে ধীরে ধীরে সমে নামিয়ে আনেন, এইভাবে শ্রোতাকে টেনে নিয়ে যান মনের গভীরতম প্রদেশে। এক আশ্চর্য যোগাযোগে ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠস্বরও ছিল তারই সগোত্র।

কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বা কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। এক নিরন্তর স্বতঃস্ফূর্ততা। তাঁর কাছে যে কেউই সহজ বোধ করতো। কারণ আগ্রহ, আনন্দ, বয়স্ক-শিশুর প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে তিনি সকলের সঙ্গে যোগ দিতেন। তিনি ছিলেন রঙ্গরসে ভরপুর, (অনেক মহৎ ভারতীয়ের মতোই)। বলতেন, ঈশ্বর সন্ধানে রঙ্গরস দরকারী,—রঙ্গরসের পথ না থাকলে যে ঈশ্বর সন্ধান করে, সে ফেটে মরবে। বিবেকানন্দের মতোই, এবং তাঁর চেয়েও বেশি, এই গুণ ছিল রামকৃষ্ণেরও; এই যে-মানুষটি দেবত্বের ও তাঁর পূজ্যদের সমস্ত রূপে নিজেকে পরিবর্তিত করতেন (যা এমন পর্যায়ে যেতো যে নিজেকে নারী মনে করতেন কিংবা কালীর মতো হবার জন্যে নারীর মতো বেশও করতেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রঙ্গরসে স্রষ্টার গুণ ছিল তিনি (সাধক সাধিকার) রঙ্গরসাত্মক অনুকরণ ক'রে আনন্দ পেতেন; (তারপর মুহূর্ত পরেই হঠাৎ আবেশের ঘোরে পড়তেন)। বিবেকানন্দও স্বভাবে শিল্পী ছিলেন। তিনি বলতেন: "দেখতে পাও না, সবার আগে আমি হচ্ছি কবি?" আমাদের ইউরোপের লোকে কথাটা এতো ভুল বোঝে কারণ এই কাব্যের সঙ্গে যে একই সময়ে জড়িত থাকে এক অনড় বিশ্বাস, তা তারা ভাবতেও পারে না।

ইউরোপের তর্কবিদ্যা, কর্ম ও চিন্তার নিরন্তর যান্ত্রিকরণ, "সংগঠিত" করার দাবি ক'রে যা তাদের প্রস্তরীভূত ক'রে তোলে—বিবেকানন্দ তার জাত-শত্রু ছিলেন। তিনি চাইতেন আন্তরপ্রবাহের নিরন্তর স্বাধীনতা; তিনি স্ববিরোধিতাকে (contradiction) ভয় করতেন না। তাঁর কথাবার্তা বিরোধিতায় ভরা ছিল। তিনি তা জানতেন, আর তাই নিয়ে বড়াই করতেন। গতকাল একথা বলেছেন ব'লে অনুযোগ করা হলে অন্যের মতোই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন: "ঠিকই তো। কাল ছিল কাল।

আজ আমি এগিয়ে গেছি।" জীবন একই জায়গায় কখনো স্থির থাকতে পারে না। মিস ম্যাকলিঅড বললেনঃ "গীতার মতো তিনি ছিলেন বিরোধিতায় ভরা। তিনি ছিলেন মূর্তিমন্ত গীতা।" ক্রীতদাসের মনোভাব তিনি পছন্দ করতেন না। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে তিনি শিষ্যদের উদ্দীপ্ত করতেন। তিনি বলতেনঃ "অসুরের পথ হয়ে উঠলেও, তোমার পথ ধরে চলো, কিন্তু তা তোমার পথ হওয়া চাই!" পাপ সম্পর্কে পিউরিটানি ও খ্রীষ্টানি পেয়ে-বসা মনোভাব (hantise) তিনি (রামকৃষ্ণের চেয়ে বেশি নয়) সইতে পারতেন না। নিজের লোকজনদের কাছ থেকে তিনি সামগ্রিক স্বচ্ছতা দাবি করতেন। 'নিজের দোষগুলোকে ভালো ক'রে জানো, তাদের চোখে চোখে ভালো ক'রে তাকাও। তারপর এগিয়ে চলো! অতীতকে পেছনে ছুঁড়ে দাও!' সর্বশ্রেষ্ঠ গুণঃ স্পষ্ট মন আর সক্রিয় কর্মশক্তি।

রামকৃষ্ণের মতো তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতার চরম প্রয়োজনের কথা বলতেন। ভারতবর্ষে চালু কথা আছে, বারো বছর যে আন্তরিকতার সাধনা করে, সে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বলার গুণ পায়। এবং রামকৃষ্ণ বলতেন (বিবেকানন্দ বারবার বলতেন), চরম যৌনসংযম এক বিপুল শক্তি, এই নিয়মানুবর্তিতার বারো বছরের শেষে মানুষের স্বভাবে এক নতুন শৃঙ্গোদ্গম হয়, যা তাকে ঈশ্বরকে ভেদ করার যোগ্যতা দেয়। যিনি ঈশ্বরকে স্বামীত্বে বরণ করেন, তিনি কামজ সন্তানোৎপাদনের সমতুল্য শক্তি ধারণের অধিকারী হন। অবশ্য একটা অপরটাকে বাতিল করে। ভারতবর্ষে পুরোহিতরা কম শ্রদ্ধেয় এইজন্যে যে তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, সন্ন্যাসীরা সত্যিকারের ঈশ্বরের জন।

মনকে যা কিছু পদানত করে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্বাসের ঘোষণা সত্ত্বেও, —যে সব ফলপ্রসূ বিরোধিতার ব্যবহার ও অপব্যবহারে বিবেকানন্দ অভ্যস্ত ছিলেন তারই একটির ফলে—তিনি পশ্চিমের শৃঙ্খলাবোধের গুণাবলী গ্রহণ করতে এবং তাঁর সন্ন্যাসীদের উপরে তা চাপিয়ে দিতে শিখেছিলেন। সন্ন্যাসীদের কঠোর শৃঙ্খলা, এবং অপরকে, দরিদ্রকে, রুগ্নকে, দুঃখীকে সেবা করার বাধ্যবাধকতাঃ ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসে এটাই ছিল তাঁর বিরাট নতুনত্ব।

কার্যত, এক বাহিনী তার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শুধু বেলুড়েই তিনশোর কাছাকাছি সন্ন্যাসী। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেনঃ— সারদানন্দ আছেন কলকাতার কাছে বেলুড় মঠে, তিনি বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ জীবনী লিখেছেন,—শিবানন্দ মঠের অধ্যক্ষ;—যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, অভেদানন্দ* আছেন হিমালয়ের অদ্বৈতাশ্রমে; আর আছেন ভগিনী ক্রিশ্চিন (জন্মসূত্রে জার্মান)—সেরা ব্যক্তিত্ব, ভগিনী নিবেদিতার তুল্য, দিব্য চেতনায় নিঃশেষিত, জরাজীর্ণ; আর তাঁর উপরে ভাইয়ের মতো সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র, বিবেকানন্দের শিষ্য এক স্বামীর ভক্ত, তরুণ পন্ডিত বশী সেন, যিনি সেই মঠে ১২ বছর হলো এক ল্যাবরেটরি বসিয়েছেন।

---

* রলাঁ লিখেছেন 'অকেদানন্দ'!—অনু.

মিস ম্যাকলিঅড ভগিনী নিবেদিতাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানতেন, ভারতবর্ষে থাকার গোড়ার দিকে নিবেদিতা তাঁর কাছে আট মাস ছিলেন। লণ্ডনে যখন নিবেদিতা তখনো মার্গারেট নোবল এবং বিবেকানন্দ তাঁর স্কুলে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি প্রতিটি বক্তৃতার পর বিবেকানন্দের কাছে এসে বলতেন ঃ “ঠিক বলেছেন, স্বামীজী, কিন্তু...” তিনি চিরদিন তর্ক করতেন; প্রতিরোধ করতেন, এবং তাঁর প্রতিরোধ হয়েছিল দীর্ঘ। কিন্তু যখন আত্মসমর্পণ করলেন, সেও চিরদিনের জন্য। (জয় করার পক্ষে এমন ধরনের অনেক ইংরেজ মনের সাক্ষাৎ বিবেকানন্দ পেয়েছেন, কিন্তু একবার জয় করা হলে তারা সমস্ত পরীক্ষায় বিশ্বস্ত থেকেছে। এবং তাদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের এক গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তিনি বলতেন. ইংলন্ডে আসার আগে তিনি ইংরেজদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন কিন্তু তাদের জানার পর থেকে তিনি তাদের ভালবাসতে শিখেছেন ঃ কোনো মনই বেশী নিশ্চিত নয়!) মিস ম্যাকলিয়ড বড় একটা অনুমান করতে পারেন নি যে, মার্গারেট নোবলই স্বামীজীর সবচেয়ে ঐকান্তিক শিষ্যদের একজন হবেন। ভারতবর্ষে পেঁছুলে তাঁর কাছে যখন মার্গারেট নোবলকে আসতে দেখেছিলেন, তিনি তাঁর সে-সময়কার বিস্ময়ের কথা বললেন। তিনিও নতুন এসেছেন; মুখটা ফোলা, মশায় ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু আনন্দে উদ্ভাসিত। এবং ভগিনী নিবেদিতার মায়ের সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত ও অন্তরঙ্গ আলোচনার কথা বললেন। নিবেদিতা ছিলেন এক প্যাস্টরের মেয়ে, শৈশব ছিল বেদনাকর। মা তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিলেন ব'লে মনে হয় এবং মায়ের মনটা ছিল ভাসাভাসা। মিস ম্যাকলিঅডের সঙ্গে একা হলে একদিন ভয়ে ভয়ে তাঁকে যে-কথা বলেছিলেন তা কখনো তিনি মেয়েকে বা বিবেকানন্দকে বলেন নি ঃ—‘যখন প্রথম গর্ভবতী হলাম, আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল্যাম, মানত করেছিলাম, যদি সব ভালোয় ভালোয় মেটে, আমার সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করবো। আমার মেয়ে বা অন্য কেউ কখনো তা জানে নি। যখন ২৮ বছর বয়সে মেয়ে এসে বলল, স্বামীজীর শিক্ষা মতো চলতে চায়, আমি দেখলাম ঈশ্বর কথা বলেছেন; আর তাঁকে সব দরজা খুলে দিলাম।” (ভগিনী নিবেদিতা এ কখনো ধরতে পারেন নি; তাঁর মায়ের সম্মতি নিজের কাছে মোটেই ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।)

রামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদাদেবীকেও মিস ম্যাকলিঅড খুব জানতেন, পাঁচ-ছ বছর হলো তাঁর মৃত্যু হয়েছে। (বেঁচে থাকলে রামকৃষ্ণ ঠিক আমার বাবার বয়সী হতেন।) তাঁর কথায়, সারদাদেবী ছিলেন পুরোপুরো এক বিশিষ্টা রমণী, যে-কোন ব্যাপারেই ইউরোপীয় রমণীদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এক হতে পারতেন; এবং এক সরলতা, চারুত্ব, স্বাভাবিক মাধুর্য বজায় রাখতেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতোই গোঁড়ামি থেকে দূরে থেকে, ঈশ্বরের মধ্যে বাস ক'রে ইউরোপীয় বান্ধবীদের পরিচর্যায় এক আনন্দে আগ্রহী হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মহৎ মূল্য তাঁর নিজের গ্রামে মোটেই জানা ছিল না, কোনো অসাধারণ আচরণের মধ্যে দিয়ে সেখানে তিনি বিশিষ্টতা দেখান নি। ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে মিস ম্যাকলিঅডের খুব উঁচু ধারণা; তাঁর

মতে, সাধারণভাবে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা অনেক উঁচুতে এবং এক মর্যাদা, স্বার্থত্যাগ, সক্রিয়তা আছে—যাদের মধ্যে কোনো বিরোধিতা ঘটে না। যে সন্ন্যাসীরা, যে সাধুরা সারদাদেবীকে জানতেন, প্রায় সব সময়েই তাঁরা বাবার চেয়ে বেশি তাঁদের মাকে সাক্ষী মানেন।

কিন্তু মিস ম্যাকলিঅড বললেন, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষকে না-জানলে এবং তার ভাষায় তার পরিবেশের আস্বাদ না-পেলে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। চোখের সামনে তিনি হাজার হাজার ঈশ্বর-পাগলদের ছবি ফুটিয়ে তুললেন, তাদের দেখা যায় রাস্তাঘাটে, উলঙ্গ ও ছাইমাখা, ঈশ্বরে মাতাল, ঈশ্বরকে লাভ করেছে কিংবা মার্গানুযায়ী ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে।

(রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় ব্যাপার : কারুর কাছে তাঁর এমন কোনো ভালো প্রতিকৃতি নেই, যাতে তাঁর প্রাণশক্তি, মধুর হাসি নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের মতো ক'রে দেখানো হয়েছে। তাঁর একমাত্র যে- ফটোটি রক্ষিত আছে সেটা তোলা হয়েছিল (তাঁর অসন্তোষ ঘটিয়ে), যখন তিনি সমাধিতে ছিলেন : তার থেকেই এই হাঁ-করা মুখ, এই একটু হাবাগোবা, খেপাটে চেহারা। তাছাড়া, নিচের ঠোঁটটা বিকৃত,—ফোলা, তা হয়েছে এক সমাধির সময়ে আগুনের মধ্যে পড়ার ফলে,—কারণ সবাই জানে তিনি নিরন্তর আবেশের ঘোরে থাকতেন। রোদে খড়ির দাগ-দেখা মুরগির ছানার মতোই (শ্রদ্ধা রেখেই বলছি) তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। অসাধারণ এই যে, এই নিরন্তর আবেশে ঢলে পড়ার সঙ্গে তাঁর প্রখর সাধারণ জ্ঞানের নিরন্তর ভারসাম্যকে মেলাতে পারতেন। কিন্তু এটা কোনো ইউরোপীয় যুক্তিবাদী কখনো মেনে নেবে না।)

(নতুন আলোচনা। ১৪ মে।)

মিস ম্যাকলিঅড আমেরিকান, বড়োই ভাসাভাসা; কিন্তু নিজেকে বড়ো না-ঠাওরাবার ও নিজের উপরে কোনো ক্ষমতা আরোপ না-করার গুণটি আছে। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল; তাঁকে হাসিখুশি রাখা, তাঁকে নিয়ে মেতে থাকা ছাড়া অন্য কাজ তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর জীবনের স্বাধীনতা কিছুতেই কখনো ত্যাগ করেননি এবং বিবেকানন্দ ও তাঁর মধ্যে এ সম্পর্কে বোঝাপড়া ছিল, যদিও তিনি বলেন, তিনি তাঁকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁকে জানার পর থেকে সব সময়েই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরকে—বিবেকানন্দের ঈশ্বরকে অনুভব করেন। কিন্তু এই ঈশ্বরের সেবায় নিজের নাম লেখাবার দাবি করেন না, নিজের চিন্তা বা স্মৃতিকথা লেখারও দাবি করেন না। এ ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করেন। এইসব মুখে মুখে অন্যদের বলেন, যাতে এগুলো তারা কাজে লাগায়, আর কাজের লোকদের যখন দরকার হয়, তাদের টাকা দিতে ভালবাসেন। তাঁর মার্কিনী বাতিক—অর্থের গুণকীর্তন করা এবং এই অন্য দেবতাটির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কাজের (আমাদের মনের পক্ষে ছুলে) একটু বেশি রকম পুনরাবৃত্তি করা,—তবু এই স্বাভাবিক ও সহজ ঔদার্য তাঁর সেই বাতিকের দোষটা কাটিয়ে দেয়।

তিনি ৭ বছর ধরে বিবেকানন্দকে জেনেছিলেন ; এবং মাসের পর মাস তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যত্নআত্তি করেছিলেন। কিন্তু কখনো তাঁর কাছে নিজেকে অপরিহার্য ক'রে তোলেননি। ইউরোপে তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার পর, তিনি না-লেখা পর্যন্ত তাঁকে লেখা থেকে, না-ডাকা পর্যন্ত সেখানে তাঁকে দেখতে আসা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। তা করার পরই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষে আসতে পারেন কি না। বিবেকানন্দ এই উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

"যদি দারিদ্র্য, অধঃপতন, নোংরামি, ঈশ্বরের কথা-বলা নেংটিপরা মানুষদের দেখতে চান, তাহলে আসুন ! কিন্তু যদি অন্য কিছু চান, আসবেন না ! কারণ আরও একটা সমালোচনা আমরা সইতে পারবো না।"

মিস ম্যাকলিঅড বললেন, এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন ; যখন বুঝতে পেরেছেন মনে সমালোচনা জাগছে, সরে গেছেন।

মাসের পর মাস বিবেকানন্দ তাই তাঁর বাড়িতে থেকেছেন,—আর থেকেছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব না থাকলেও। কোনো কোনো দিন দেখতেন বিবেকানন্দ ঘর থেকে বেরুতে পারছেন না—(বাইরে বৃষ্টির দুর্ভেদ্য যবনিকা)—ঘন্টার পর ঘন্টা ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ পায়চারি করছেন, আর কথা বলছেন। তিনি যে রয়েছেন তা খেয়ালই করছেন না, নিজের সঙ্গে উচ্চ কন্ঠে কথা বলছেন। তিনি বললেন, এই কথা বলার সময় তিনি যে বদলে যাচ্ছেন, তা তাকিয়ে দেখাটা রোমাঞ্চকর। পর্যায়ক্রমে তিনি চলে যাচ্ছেন তাঁর তিনটি দশা—বহুরূপ সত্তার তিনটি আত্মা ঃ জ্ঞানের দশা, ভক্তির দশা, ও কর্মের দশা—একটা থেকে অন্যটায়। দুঃখের বিষয় এই বিস্ময়কর কথা-বলা আবার স্মরণ করতে সমর্থ ব'লে তাঁকে মনে হলো না ; শুধু ছাপটুকুই তাঁর মনে আছে।

তিনি বললেন, বিবেকানন্দ বেশির ভাগ সময়ই ছিলেন কিশোর সুলভ চরম হাস্য-চপল, (তাই একদিন তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন "স্বামীজী, আপনি ধর্মপ্রবণ লোক নন" ;—আর তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "আমিই ধর্ম।")—কিন্তু কোনো কোনো দিন ভারতবর্ষ ও জগতের দুর্দশা তাঁকে কেমন বিদ্ধ করতো, তিনি গভীর ও নিঃশব্দ বেদনার ঘোরে পড়তেন, তা থেকে কিছুই তাঁকে টেনে তুলতে পারতো না। অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা অনুভব করতেন। মহৎ ভারতীয় সাধুদের সেই বিস্ময়কর জীবনীশক্তিপূর্ণ নমনীয়তার সঙ্গেই কেবল তিনি এক দশা থেকে অন্য দশায় চলে যেতে পারতেন,—আবেগদীপ্ত বক্তৃতা থেকে (যেখানে তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন) ফেরার পথে সাদামাটা জিনিসের কথা, কোনো রান্নার কথা (কারণ তিনি পাকা রাঁধুনি ছিলেন) ব'লে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ী শ্রোত্রীকে লজ্জিত ও স্তম্ভিত করতেন।

ভারতীয়দের মধ্যে যা আমাদের সবচেয়ে অবাক করে (এবং ক্যাথলিকদের চেয়ে বেশি ক'রে প্রোটেস্টান্টদের) তা হচ্ছে, তাঁদের ধর্মীয় দর্শনগুলোকে (visions) মূর্ত ক'রে তোলার ঐকান্তিকতা। ঈশ্বরকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন না ; তাঁকে দেখেন, তাঁর কথা শোনেন এবং বাস্তবের মতো তাঁকে স্পর্শ করেন। রামকৃষ্ণকে

বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করেছিলেন : "আপনি ঈশ্বরকে দেখেন ?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : ("তোকে যেমন দেখছি, তেমন তাঁকে দেখি, তবে আরও ভালো ক'রে।" আর কথার সঙ্গে যোগ করেছিলেন : "বৈদান্তিক অর্থে নয়" (তার অর্থ নৈর্ব্যক্তিক বা বিমূর্ত অর্থে নয়)। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে বুকে, গলায় হাত দিয়ে রামকৃষ্ণ শিষ্যদের বলেছিলেন : "তিনি (ঈশ্বর) এইখানে," এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন : "বৈদান্তিক অর্থে নয়।"

এ মোটেই দু'চারজন প্রত্যাদিষ্টের বিশেষ অধিকার নয়। আন্তরিক ভক্তিমান প্রতিটি ভারতীয়ই এখানে সহজে পৌঁছে যায়। মিস ম্যাকলিঅড নেপালের এক মাধুর্যময়ী তরুণী রাজকুমারীর সঙ্গে ছিলেন, তার সঙ্গে মন্দিরে ঢুকে পুজো করতে ঘন্টা খানেকের জন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন নিস্তব্ধতা, ছায়া (সেখানে একটা প্রদীপ জ্বলছিল) আর ধুপধুনোর গন্ধের মধ্যে। বেরিয়ে এসে তরুণীটি শান্ত গলায় তাঁকে বলেছিল : "আমি রামকে দেখলাম।"

এই বিশ্বাসীদের আর আমাদের ক্যাথলিকদের মধ্যে তুলনীয় অনেক কিছু আছে। বিবেকানন্দ তা ভালো করেই দেখেছেন ও বলেছেন।

চিকাগোর ধর্মমহাসভায় যখন বিবেকানন্দ (তখন অপরিচিত) প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি যে দাগ কেটেছিলেন তা অবশ্যই প্রচন্ড। তাঁর প্রথম কথা—"আমেরিকার ভাই ও বোনেরা"—শুনেই শ্রোতাদের জন কয়েক যেন বিদ্যুস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে উঠেছিল। এবং যখন বক্তৃতার শেষে মহাসভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, এক জনতা তাঁর পিছনে চলেছিল। কেউ কেউ বলেছিল : "এই তরুণটি যদি এমন জয়ের নেশাকে দমন করতে পারেন, তাহলে ইনি মহৎ…" তাঁর উৎসাহী ভক্তরা একটি ছোটো গোষ্ঠীতে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে তিনি বক্তৃতা দিতে আসতেন। প্রথমদিকে জন বারোর বেশী হবে না, সেই বারো জনের মধ্যে দশ-এগার জনই মহিলা। কিছুকাল পরে তাঁদের একজন বললেন, এই কথাগুলো হারিয়ে গেলে দুঃখের ব্যাপার হবে, একজন স্টেনোগ্রাফার আনা দরকার। তার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল বড়োই বেশী দামে গুডউইনকে* (ইংরেজ)। সপ্তাহ না যেতেই বশীভূত গুডউইন পয়সা নিতে অস্বীকার করলেন ; এবং স্বামীজীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করলেন। তিনি হয়েছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ও সহায়ক। দুঃখের কথা, ভারতবর্ষে আসার কিছু পরে এনট্রাইটিসে ২৬ বছরে মারা যান। বিবেকানন্দের পক্ষে এটা হয়েছিল একটা প্রচন্ড দুঃখ ও অপূরণীয় ক্ষতি। (কিন্তু আমি দেখছি, তাঁর প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাত আমেরিকার অন্যান্য শিষ্যদের, বিশেষ ক'রে, স্বামী কৃপানন্দের (পূর্বনাম লেঅঁ ল্যান্ডসবার্গ, রুশ-ইহুদি) ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেছিল।)

তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে : ফরাসী মারি-লুইজ (আমেরিকায়) অভয়ানন্দ হয়ে** কোনো চিহ্ন রেখে গেছেন বলে মনে হয় না : তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন,

---

* রলাঁ লিখেছেন 'গডউইন'।—অনু.

** রলাঁ লিখেছেন 'অবয়ানন্দ'।—অনু.

কিন্তু সেখানে মোটেই থাকেন নি, সেখানে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তাতে হতাশ হয়েছিলেন মনে হয়।

হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজীর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন (জেনেভা, মঁত্র ইত্যাদি) এবং বেলুড়ের জন্যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভগিনী ক্রিস্টিন, প্রকৃত নাম মিস গ্রিনস্টেইড ছিলেন আমেরিকান, জন্মসূত্রে জার্মান।

শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী সেরভিয়ের বিবেকানন্দের সেরা বন্ধু। তাঁদের তিনি জেনেছিলেন ইংলণ্ডে; সিরভিয়ের ছিলেন নৌবাহিনীর ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন। তাঁরা ছিলেন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে শুনে বেড়াতেন। মিস ম্যাকলিঅড তাঁদের চিনতেন না, এক বক্তৃতার পর বেরিয়ে শ্রীযুক্ত সেরভিয়েরের সঙ্গে যখন আলাপ করছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "এই তরুণকে আপনি জানেন? ওঁকে যা মনে হয় উনি কি তাই?" মিস ম্যাকলিঅড বলেছিলেনঃ "হ্যাঁ।" সেরভিয়ের বলেছিলেনঃ "তা হলে তো ওঁকেই অনুসরণ করা, ওঁরই সঙ্গে ঈশ্বর সন্ধান করা দরকার।" স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ স্বামীজীর শিষ্য হতে আমাকে অনুমতি দেবে? স্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেনঃ "হ্যাঁ, দেবো।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "স্বামীজীর শিষ্য হতে আমাকে অনুমতি দেবে?" তিনি বলেছিলেনঃ "জানি না…" নিজেদের যা সামান্য টাকাপয়সা তুলে নিয়ে তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে রওনা হয়েছিলেন। (বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁদের টাকাপয়সা সবটা দিতে দেন নি। তাঁর কাজে উপাসনা ও বৈদান্তিক প্রকাশনার জন্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যৌথকর্ম ও কেন্দ্রের জন্যে হিমালয়ে মায়াবতীতে অদ্বৈতাশ্রম গড়ে তোলার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯০১ সালের দিকে ৫৪ বছর বয়সে সেরভিয়ের সেখানে মারা যান, তখন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নেই। বছরের প্রায় সব সময়েই দুর্গম পাহাড়ে মায়াবতীতে একমাত্র ইউরোপীয় শ্রীমতী সেরভিয়ের ১৫ কি ১৯ বছর শিশুদের শিক্ষা নিয়ে ছিলেন। মিস ম্যাকলিঅড তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "আপনি মানসিক শ্রান্তি বোধ করতেন না?" তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেনঃ "আমি তাঁকে (স্বামীজীকে) ভাবতাম।" তারপর বয়স ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ ইংলণ্ডে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি আজও বেঁচে আছেন।

প্রথম বারের সফরে আমেরিকা বিবেকানন্দের বিরাট আশা জাগিয়েছিল। তখন তিনি তার মধ্যে মহৎ আর শ্রেয়কেই শুধু দেখেছিলেন। তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তার আপাত-গণতান্ত্রিক সাম্য –যার জোরে ট্রামের মধ্যে কোটিপতির ঘরণী আর সাধারণ শ্রেণীর মেয়েদের ধাক্কাধাক্কি সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় বারের সফরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক দোষত্রুটি ও জাতিগত ঔদ্ধত্য তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি মিস ম্যাকলিঅডকে বলেছিলেনঃ "তাহলে, আমেরিকা সেও!…এখন সে নয়, সে চীন বা রুশ—যে কাজটা সুসম্পন্ন করবে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিরাট মিলিত দৌত্যের বাস্তব রূপায়ণের কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন।)

আক্ষেপের বিষয় এই যে, ১৯০০ সালে ফ্রান্স সফরের সময় ফরাসী মননশীলতা ও ধর্মীয় চেতনার কোনো উচ্চ স্তরের প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করেননি। যাঁরা তাঁকে দখল ক'রে রেখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জুল বোআ, পের ইয়াসঁ্যাং (Pe're Hyacinthe), এমা কাল্‌ভেরাই। (যদিও মিস ম্যাকলিঅড এমা কাল্‌ভে সম্পর্কে আপত্তি জানালেন. বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যে আন্তরিকভাবে তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল, তা তিনি দেখিয়েছেন এবং বিবেকানন্দের ইউরোপে থাকা ও মিশর হয়ে ভারতবর্ষে ফেরার বেশির ভাগ খরচই তিনি দিয়েছেন ; মিশরে মিস ম্যাকলিঅড বিবেকানন্দের সঙ্গে বিশাল পিরামিড দেখেছিলেন।) আমার হাসি পায় যে, বিবেকানন্দ ফ্রান্সের এমন ছবি নিয়ে গেলেন ; আমার দুঃখ হয় ত্বরার আতিশয্যের জন্যে, যে-ত্বরা নিয়ে, এমনকি তলস্তয়ের সঙ্গে দেখা না করেই তিনি এক ছুটে ইউরোপ পেরিয়ে গেলেন। (তলস্তয়ের চিঠি থেকে দেখতে পাই, তিনি ভারতীয় চিন্তাধারা নিয়ে কতটা ব্যাপৃত ছিলেন, এবং ১৮৯৬ সালের পর থেকে নিউইয়র্কে প্রকাশিত বিবেকানন্দের লেখা পড়েছিলেন।) যে প্রতিভাজাত তৎপরতা নিয়ে, স্বামীজী পড়ার বই গিলতেন—তার কথা মিস ম্যাকলিঅড, এবং তাঁর অন্য ভক্তরা—অনেক বলেন, গোটাটা জানার জন্যে পাতাগুলো উল্টেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন। আমার আশংকা, এইজন্যেই যেন ইউরোপীয় চিন্তার গভীরে তাঁর ঢোকা হয়নি। এবং এটা একটা বিশ্রি ফাঁক যে (অন্য অনেক এশিয়াবাসীর মতো) তলস্তয়ের মহান্ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নাড়া না খেয়েই তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে আসতে পারলেন, মারা যেতে পারলেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম গান্ধীবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের মিশন কী ধারণা পোষণ করে। তিনি নিজেকে তার বাইরে রাখেন। রাজনৈতিক কোনো কিছুকে এড়িয়ে চলেন। একমাত্র ধর্ম ও সেবার ব্যাপারেই তিনি থাকেন। তাঁর সমাজসেবার কাজগুলো ইংরেজ সরকার সুনজরেই দেখে. (একবার অবশ্য তাঁকে পরোক্ষ ভর্ৎসনা করেছিল যে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা মিশনের নামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকছে : এখানে তিনি একটা কাজ ক'রে ফেলেছিলেন, কাজটার ফল ভালো না মন্দ? ভারতবর্ষের বড়লাটকে দিয়ে এক প্রকাশ্য প্রশংসাপত্র বার করিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বেলুড় মঠের জন্যে ৫০০ টাকার দান।) তাঁর লক্ষ্য বর্তমান রাজনীতি ও কাজকর্ম ছাড়িয়ে। তিনি একগুঁয়ের মতো লেগে আছেন ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে, বিবেকানন্দ এইটেই চেয়েছিলেন এবং এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে হতে হবে নবীভূত ভারতবর্ষ ও জগতের কর্মকেন্দ্র।

বলা হয়ে থাকে, রামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের অতীত তিন হাজার বছরকে মূর্ত করেছেন এবং বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হয়েছে আগামী তিন হাজার বছর। মিস ম্যাকলিঅড একদিন সারদা দেবীকে (রামকৃষ্ণের স্ত্রী) বলেছিলেন : 'আপনার স্বামীর ভাগে পড়েছিল ভালো দিকটা ; শুধু ভারতবর্ষে, তাঁর নিজের লোকের মধ্যেই তাঁকে বলতে হয়েছে কথামৃত : সেটা তাঁর কাছে ছিল পরিপূর্ণ আনন্দও।

বিবেকানন্দের দৌত্য ছিল অনেক বেশি কঠিন ঃ বিদেশী ও বিরূপ লোকদের মধ্যে তাঁকে হতে হয়েছে ভারতবর্ষের চিন্তার বাহক ; তাঁর অংশটা ছিল সবচেয়ে বীরোচিত।' সারদা দেবী অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "ঠিকই, সে ছিল সকলের চেয়ে বড়ো ! উনি বলতেন, উনি দেহ আর বিবেকানন্দ মাথা।"

বিবেকানন্দের দুই ভাই এখনো জীবিত আছেন। একজন লেখেন, অন্যজন নৃতত্ত্ব নিয়ে থাকেন ; তাঁর* অহংকার আছে, ভাইয়ের নাম তিনি ভাঙাতে চান না ; নিজের জোরেই শ্রদ্ধেয় হতে চান।

(নতুন আলোচনা। ১৬ মে।)

ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০টি মঠ, ২০০ থেকে ৩০০ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়। কিন্তু সম্প্রদায়ে ভর্তি করা হয় একচেটিয়া ভাবে বাঙালীদের। সাধারণত মহামারীর সময়ে চিকিৎসালয় দিয়েই শুরু করা হয়। তারপর দেশের মাথাদের কাছে আবেদন করা হয়, এ টিকে থাকুক, তা তাঁরা চান কি না। একটু একটু ক'রে চারধারে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় ও উপাসনালয়। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিনিধিরা গত বছর এই প্রথম জড়ো হয়েছিলেন এক সম্মেলনে। তাঁরা বারো জন সদস্যের এক পরিষদ গঠন করেছেন, সদস্যদের বাছাই (নির্বাচিত) করা হয়েছে উচ্চতর পদমর্যাদার ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকাগো, নিউইয়র্ক, সানফ্রানসিকোয় মিশনের তিন-চারটি কেন্দ্র আছে। ইংলন্ডে কোনো কেন্দ্র নেই ; তবু ইংলন্ড বিবেকানন্দকে সবচেয়ে ঐকান্তিক বন্ধু ও শিষ্যদের যুগিয়েছে। কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে। মননশক্তির মাপকাঠিতে ইংলন্ড আমেরিকার চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের ; তার কাছে বাণী পেঁৗছে দিতে দরকার হবে দুর্লভ মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেইসঙ্গে অত্যন্ত শিক্ষিত ও ইউরোপের উচ্চ সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সমর্থ সন্ন্যাসীদের। মনে হয় তাদের সংখ্যা বেশি হবে না।

ওংকারানন্দ সম্পর্কে মিস ম্যাকলিঅডের এক বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তিনি বেলুড়ের তরুণতম সন্ন্যাসীদের একজন এবং সবচেয়ে পণ্ডিত, যেমন ভারতবর্ষের চিন্তায় তেমনি ইউরোপের চিন্তায় পারদর্শী। তিনি পরিষদের নির্বাচিত বারো জনের একজন।

সারদানন্দেরও বিরাট কর্তৃত্ব। মিস ম্যাকলিঅড বললেন, তিনি "জিব্রালটারের মতো শক্তিমান," বিশাল ও বিরাট এক পাথুরে পাহাড়,—পরম প্রশান্ত। সকালে কয়েক ঘন্টা ধরে উপাসনা করেন। তারপর দিনের একাংশ অবিচলিত থেকে প্রতিটি স্বীকারোক্তি শোনেন ; আর শুধু তাঁর প্রশান্তিই এক আশীর্বাদের কাজ করে।

পরের দিকে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অনেক আশা করা হয়েছে। মিস ম্যাকলিঅড যখন জানতে পেরেছিলেন যে তিনি এক মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তিনি ডুবে গেলেন ব'লে কেঁদেছিলেন ; কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে জানার পর

---

* মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তাঁর' বলতে র'লাঁ এখানে ঠিক কাকে বোঝাচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে না।—অনু.

থেকে, তিনি যে উচ্চ স্তরের, তা বুঝেছেন ; এবং তিনি মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবেকানন্দের একটি আশাকে দেখেন (সর্বোপরি দেখেন “অদ্বৈতবাদী” প্রবণতা) ; প্রথম দিকে মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে চাননি। তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রাচীন যুগের মহান্ শংকরের মতের। কিন্তু মিস ম্যাকলিঅড তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সেই কথাটি যা তিনি বিবেকানন্দকে বলতে শুনেছিলেন, তাঁকে যখন অনুযোগ করা হয়েছিল যে তিনি কোনো নতুন ভাব আনছেন না, ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিন্তাই পরিবেশন করেছেন : “আমি শংকর।’ তখন মুখোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

মিস ম্যাকলিঅড স্বীকার করলেন : “বিবেকানন্দ ছিলেন পূর্ণ, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যেকে তাই নিয়েছে, যা তার মনে ভালো লেগেছে। আমি নিয়েছি সর্বোপরি (এবং তা বাইরে ছড়াই) শক্তি, কারণ এটাই আমার মঙ্গল করেছে, আর আমি জানি এটাই সবচেয়ে মঙ্গল করে। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতাকে যখন বলেছিলাম : ‘তিনি ছিলেন পূর্ণশক্তি’, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : ‘কিন্তু আমি তো তা মোটেই বুঝিনি। তার কারণ তা মোটেই আপনার জন্যে নয়।” কেন না প্রত্যেকের স্বভাব এবং সাধন-মার্গ যেমন ছিল, তার সঙ্গে তিনিও তেমন ছিলেন।

মিস ম্যাকলিঅড তারপর আমার কাছে স্বীকার করলেন : মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন ; তখনো তরুণ থাকলেও, এমন অনেকদিন এসেছিল যখন জীবনের ভারে তিনি আর চাইতেন না যে, জীবন দীর্ঘায়িত হোক। তাঁকে ভয়ংকর লড়তে হয়েছে। আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে কতো ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। তাঁর বিরুদ্ধে সনাতনীরা ও অ সনাতনীরা, ইংরেজরা ও ভারতীয়রা। সে-যুগে ভারতবর্ষের ইংরেজরা ভারতীয়দের এমনকি তাদের সেরা লোকদেরও···অপমানকর অবজ্ঞার চোখে দেখতো ; এবং যে ইউরোপীয়রা তাদের সঙ্গে মেলামেলা করতো, তাদের দুর্নাম হতো : ভগিনী নিবেদিতা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। বিচক্ষণ মিস ম্যাকলিঅড যতো কম পারলেন তাঁর কথা বললেন : তাছাড়া তিনি ছিলেন আমেরিকান আর নির্ভর করতেন মার্কিন কনসাল-জেনেরাল প্যাটারসনের বন্ধুত্বের উপরে ; তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রথম দিকের বিবেকানন্দপন্থী : (কাছে আসার জন্যে বিবেকনেন্দকে দিয়ে ম্যাক্‌কিনলেকে বলিয়ে তাঁর স্বামীকে ভারতবর্ষের কনসাল-জেনেরাল করিয়েছিলেন :—কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের চোখে তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে হেয় না করার জন্যে তাঁর বাড়িতে আসতে বিবেকানন্দ আপত্তি করেছিলেন। ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এই যে, সেই অহংকারী ও সুন্দরী মার্কিন মহিলাকেই তাঁর খোঁজে যেতে হতো। অন্য দিকে, বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভারতীয় সনাতনপন্থীদের নিন্দাবাদের অন্ত ছিল না, কারণ তিনি “অহিন্দুদের মধ্যে পবিত্র বাণী প্রচার করতেন এবং তাদের সঙ্গে খেতেন। (বিপরীত দিকে, অন্যরা বলতো : “এইসব মহিলাদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে ব’সে মাথা খালি রাখার অশ্রদ্ধা দেখানোটা কি দরকারী ?”—এখন সব বদলে গেছে। ৩০ বছরে পুরোপুরি মোড় ঘুরেছে। এখন ভারতবর্ষের ইংরেজ সমাজের রীতি হয়েছে ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো লোকদের

খুঁজে বার করা, আর বেলুড়ের সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে যাবার যোগ্য অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা।

মিস ম্যাকলিঅড বিবেকানন্দের সঙ্গে কাশ্মীরে ঘোরার গল্প করলেন। তাঁরা ছিলেন চারটে শিকারায়, তাতেই থাকাখাওয়ার কাজ হতো। একটায় বিবেকানন্দ ছিলেন একা। অন্য একটায় ভগিনী নিবেদিতা। তৃতীয়টাতে শ্রীমতী প্যাটারসন। চতুর্থটিতে মিস ম্যাকলিঅড ঃ (সেই শিকারায় খাওয়ার সময় সকলে মিলতেন।) কিছুদিন পরে শ্রান্ত, উদ্বিগ্ন বিবেকানন্দ একা নিজের শিকারায় চলে গিয়েছিলেন। ১৫টা দিন নির্জনে-নিঃসঙ্গে ছিলেন ; ফিরে এসেছিলেন প্রশান্ত হয়ে। তিনি বলেছিলেন ঃ “মা (ভারতীয়দের চিরকাল পছন্দ ঈশ্বরকে মা বলা) তাঁকে বলেছেন, ‘জগতটা তোর না আমার? আমি তোকে বাঁচাই, না তুই আমাকে বাঁচাস?”—তখন তাঁর উদ্বেগ কেটে গিয়েছিল। তিনি নিজেকে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন (“তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!” “Fiat voluntas tua!’)

একবার হিমালয়ে বিবেকানন্দ ও মিস ম্যাকলিঅড এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণটি যাচ্ছিলেন আগে আগে। তাঁর কপালে ছিল রং দিয়ে রেখা টানা, তাতে তাঁকে কিম্ভূত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তা দেখালেও তাঁর অন্য সবকিছু ছিল সুন্দর, মহিমাব্যঞ্জক। মিস ম্যাকলিঅড কোনো কিছুর সমালোচনা করবেন না ব'লে নিয়ম বেঁধেছিলেন, তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের কাছে একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য না ক'রে পারলেন না ; বিবেকানন্দ সিংহের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন, তাকে যেন দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করতে চাইলেন ঃ “থামুন! আপনি নিজে কতটুকু করেছেন?” অপ্রতিভ হয়ে মিস ম্যাকলিঅড চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। পরে তিনি জেনেছিলেন, এই ব্রাহ্মণটি হতদরিদ্র, স্ত্রীপুত্র আছে,—ইনি তাঁদেরই একজন যাঁরা সবখান থেকে ভিক্ষে ক'রে টাকা তুলেছিলেন, আর সেই টাকায় পশ্চিমে বিবেকানন্দকে দৌত্যের কাজে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। এবং মিস ম্যাকলিঅড বুঝেছেন, মানুষ যে কাজ করে তাই দিয়েই তাকে বিচার করতে হয়।

এক সময় এক বিখ্যাত ভারতীয় সাধু ছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন ব'লে মানা হতো ঃ তাঁর নাম পাউরি (বা পাহাড়ী) বাবা। তিনি থাকতেন নিঃশব্দে, সব কিছু পরিহার ক'রে। লোকে বলতো তিনি হাওয়া খেয়ে থাকতেন। তরুণ বিবেকানন্দ যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ঈশ্বরকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখনো যখন রামকৃষ্ণ ও পাউরি বাবার মধ্যে দুলছিলেন, তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং কয়েক সপ্তাহ তাঁকে আঁকড়ে ছিলেন। মিস ম্যাকলিঅডের কাহিনী অনুসারে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পাউরি বাবা একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু যখন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছেন, তখন বলেছিলেন ঃ “সাধ্য ও সাধন এক হতে হবে।” এই পাউরি বাবা জীবনের ইতি করেছিলেন গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ ক'রে।

থিওসফি ও প্রেততত্ত্ব-বিশ্বাসীদের নাম শুনলে বিবেকানন্দ আঁতকে উঠতেন।

তিনি বলতেন : "যে-টাকার পিছনে ছোটে সে ইতর। কিন্তু গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ আর প্রেততত্ত্বের পেছনে যে ছোটে সে ডবল ইতর। ওটা কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁতে নেই ! নোংরা করে।"

সেরা ও বুদ্ধিমান উইলিঅম ষ্টিডকে এই নির্বুদ্ধিতায় পেয়ে বসতে দেখে তিনি যন্ত্রণা বোধ করতেন, অন্য সব ব্যাপারে মানুষটি বুদ্ধিবিচারে সমর্থ, কিন্তু এতে তাঁর সমস্ত বাদবিচার হারিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ তাঁর মহান্ শিষ্যের নাম দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, এটা অকারণ নয় (বিবেক—বিচারের ক্ষমতা)। (প্রতিটি সন্ন্যাসীর নামের সঙ্গে যুক্ত "আনন্দ"- -কথাটি বোঝায় : সুখ।)

ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো সাধু-সন্তদের আবেশ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা যখন বলা হয়, এইটি কখনো ভুললে চলবে না। এদের মধ্যে আর ইউরোপীয় নিকৃষ্ট অধিবিদ্যার মধ্যে কোনোই মিল নেই। লক্ষণীয় যে, ওই অধিবিদ্যা মিথ্যা হবে ব'লে তাঁরা তাকে ততোটা অবজ্ঞা করেন না (তাঁরা সে-কথা মোটেই বিচার করেন না), যতোটা করেন তা নিকৃষ্ট ও অকেজো ব'লে। (তাঁদের কাছে 'অকেজো' হচ্ছে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ,—সম্ভবত, এ যা ঘটাতে পারে। এ তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন ফকিরদের—দিব্যব্যাপারের বুজরুগদের হাতে।)

তাঁদের দিব্যের বিজ্ঞান যথার্থই এক পবিত্র উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান, মনের এক সুদীর্ঘ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে লাভ করা। এটা কতো কাম্য হতো, বিশ্লেষণ করার জন্য, খুঁটিয়ে দেখার জন্যে হলেও, যদি ইউরোপীয়রা পশ্চিমের বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে এ নিয়ে পড়াশোনা করতেন ! এর সামান্য যে-টুকু চোখে পড়ছে, তাই আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে চিন্তার শক্তি, এবং বিশেষ ক'রে, মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কী এক সমৃদ্ধিকে !···

রামকৃষ্ণ যখন কোনো পুরুষ বা নারীকে যাচাই করতে চাইতেন, তাঁর চোখের সামনে তাকে উলঙ্গ করতেন। যখন জানতে পারতেন কোনো শিষ্য বিয়ে করতে চায়, এই ভাবেই তিনি আচরণ করতেন। তিনি কনেকে আনাতেন এবং নিরাবরণা করে মুহূর্তের জন্য পরীক্ষা করতেন। তারপর বলতেন : 'ও তোর জুটি হবে।' নয়তো বলতেন : 'ঈশ্বরেয় পথে ও তোর সঙ্গে চলতে পারবে না।' যখন কোনো তরুণ তাঁর শিষ্য হতে চাইতো, তিনি বলতেন : "তোর বুকটা দেখতে দে !' এবং দেখেশুনে তাকে বলতেন : 'বেশ বড়ো !···হ্যাঁ, তুই পৌঁছুতে পারবি।' যখন রবীন্দ্রনাথের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেই অতিবিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিটিকে এই একই কথা বলেছিলেন : 'দেখি তোমার বুক ?' তাঁর বুক দেখেছিলেন : বুকটা খুব লাল। তিনি বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, ঈশ্বর তোমাকে ভালোই দেখা দিয়েছেন।'

তার কারণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালনের প্রশ্নটি ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে এক মৌল প্রশ্ন। নিঃশ্বাসবায়ু ও রক্তের ক্রমান্বয়িক (এবং বিপজ্জনক)

যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরা ঈশ্বর দর্শনে পৌঁছুতে পারেন। তাঁদের তত্ত্বানুসারে, পাঁচটি অভ্যন্তর পদ্ম, পাঁচটি স্নায়ুকেন্দ্র, পাঁচটি রক্ত-কপাট (écluses du sang) আছে,—তারা দেহের ভিত্তিমূল ও যৌনাঙ্গ থেকে চলে গেছে হৃদয়ে, কণ্ঠে, অবশেষে মূর্ধায় ; যখন তারা সর্বশেষ কপাটে পৌঁছোয়, বুকের চামড়া ঘোর লাল হয়ে ওঠে (এবং প্রায়ই পরে এই পোড়ার দাগ থেকে যায়), চোখে রক্ত ফুটে বেরোয় (অথবা, যেমন তাঁরা বলেন : 'পিঁপড়ের কামড় লাগে')। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো মানুষ এর বিপদ ভালো করেই জানতেন ; তিনি শিষ্যদের সতর্ক ক'রে দিতেন। সর্বশেষ সমাধির চেষ্টায় অনেকে মারা গেছেন, অথবা পাগল হয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণের মতো মানুষ—যাঁর আবেশ ছিল নিত্যদশা—ব্যতিক্রম হয়ে আছেন। এমনকি বিবেকানন্দও এ লাভ করেছেন কদাচিৎ…জীবনে দুই কি তিন বার- আর তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

গান গেয়ে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ যে ধর্মীয় নৃত্য করতেন, মিস ম্যাকলিঅড তা দেখেছেন ; সেই সম্পর্কে বললেন যে, 'নৃত্য' বলতে আমরা ইউরোপে যা বুঝি, তার সঙ্গে এর সামান্য একটু মিলও নেই। বিবেকানন্দ খাড়া হয়ে দাঁড়াতেন, লম্বা জোব্বা গোড়ালি পর্যন্ত পড়তো, পায়ে থাকতো মল (anneaux), নড়তেন কি নড়তেন না, বিনা ভঙ্গিতে দুই হাত নাড়াতেন ; শুধু চোখে পড়তো দেহটি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে,—আর পায়ের মল কাঁপছে। কিন্তু ধর্মীয় লোকোৎসবে তীর্থযাত্রীদের যে বিরাট বিরাট পবিত্র নৃত্যচক্র হয়ে থাকে, সেখানে তারা প্রায়ই শ্রান্ত ও নিঃশেষিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এটা তাদের মাদকতার ক্রিয়া—তাদের একমাত্র মাদকতা। আর এ মাদকতা নির্দোষ।

ফ্রান্স সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিদারুণ বিরক্তি ভরে মিস ম্যাকলিঅড জুল বোআর নীচতার কথা বললেন ; বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্যে তিনি কায়দা ক'রে এমা কালভেকে উত্তেজিত করেছিলেন। কিন্তু অতি মর্যাদাবতী এমা কালভে এই ব'লে তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দ এক সন্ন্যাসী, তাঁর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে। পের ইয়াসঁ্যাতের ঘরকন্না বিবেকানন্দের স্মৃতিতে এক করুণ ছাপ রেখেছিল। মনে হয়, (মার্কিন) স্ত্রীটি ছিলেন (তাঁর চিঠি থেকে আমার যেমন মনে হয়েছে) অসহ্য। যদি বিবেকানন্দের প্রয়োজন থাকতো, এই মহিলাই তাঁকে চিরকৌমার্যে অনুপ্রাণিত করতেন। এবং "বেচারী পের ইয়াসঁ্যাতের" জন্যে তাঁর সমবেদনা ছিল। পের ইয়াসঁ্যাতকেও সব সময়ে মনে হতো লজ্জিত, বিধ্বস্ত, উদ্বিগ্ন ; তিনি যে ভালো করেছেন সে-সম্পর্কে যেন নিশ্চিত নন। অনুমোদন চেয়ে চেয়ে বেড়াতেন, বলতেন : "তাই না ? আমার ছেলে যদি উচ্চমনা হয়, সেটা তো আমার কাজের যাথার্থ্যেরই চিহ্ন হবে। তাই না ? দেখতে পাচ্ছেন না ?' (যে-ঈশ্বরকে তিনি ডাকতেন, তাঁর উপরেই এর উত্তর দেবার ভার ছিল। আর সবাই জানে কোন্ 'চিহ্ন' পল ইয়াসঁ্যাৎ লয়সন হয়েছিলেন।)

রামকৃষ্ণের বিখ্যাত কথামৃতে যিনি "ম" স্বাক্ষর করেছেন, তাঁর সম্পর্কেও প্রশ্ন। তাঁর নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত*, কলকাতায় তিনি একটা বড়ো ইস্কুল চালান। তিনি সংসারেই আছেন। বাপ-মায়ের মর্মপীড়া ঘটিয়ে অনেক ছোট ছোটো ছাত্রকে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতেন।

ওকাকুরা বিবেকানন্দকে দেখতে এসেছিলেন; এবং জাপান সফরের সময়ে মিস ম্যাকলিঅডই সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে বিবেকানন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। দেখা হওয়ার পর দিনই মিস ম্যাকলিঅডকে বলেছিলেন: "উনি আপনার জিনিস নন। উনি আমাদের।"—এবং অত্যন্ত অভিভূত হয়ে আরও বলেছিলেন: "আমরা হচ্ছি দুই ভাই, বিপরীততম দূরত্ব থেকে এসে মিলেছি।" কিন্তু কিছুদিন পরেই যাঁর যাঁর কাজে তাঁরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মের মহিমা পুরোপুরি বুঝলেও তার জন্যে ওকাকুরা নিজেকে তৈরি ব'লে মনে করেন নি। তাঁর ছিল নিজের সাম্রাজ্য—আর্টের সাম্রাজ্য। মিস ম্যাকলিঅড তাঁর স্টুডিওয় বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে তাঁকে দেখছেন, শিল্পীরা তাঁদের চিত্রকর্ম সামনে হাজির করেছেন, এবং তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তা সরিয়ে দিয়ে শিল্পীর দৃষ্টিকোণ ও চিন্তায় নিজেকে বসিয়ে বিচার করতে, এমনকি সমালোচনা করতে চেষ্টা করছেন। তিনি কবিতা লিখতেন; আর যে-কবিতা লিখতেন, পরদিন সকাল থেকে তারপরের দিন পর্যন্ত ঘরের একটা প্যানেল তা দিয়ে ঢাকা থাকতো।

প্রথম দিকে ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের কাছ থেকে কঠোর ব্যবহাব পেতেন। সমস্ত প্রকারে বিবেকানন্দ তাঁর গর্বিত ও যুক্তিবাদী ইংরেজ চরিত্রটিকে নিচু করতেন। নিবেদিতা তাঁর প্রতি যে পূজারিণীর অনুরাগ (passion adoratice) দেখাতেন, সম্ভবত তার হাত থেকেও নিজেকে বাঁচাতে চাইতেন: (কেননা মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে নিবেদিতার ছিল প্রেমিকের উপাসনা (culte amoureux), আমাদের বান্ধবী মিস স্লেড যা দেখাচ্ছে গান্ধীর সম্পর্কে। কিন্তু গান্ধী ও মিস স্লেডের মধ্যে ৩০ বছরের দূরত্ব; বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে ছিল মাত্র ৫ থেকে ৬ বছর; এবং নিবেদিতার মনোভাব চিবকাল পুরোপুরি নির্মল হলেও, সম্ভবত বিবেকানন্দ এর মধ্যে বিপদের গন্ধ পেতেন।) কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি নিবেদিতাকে ভৎর্সনা করতেন, নিবেদিতা যা করতেন তাতেই ত্রুটি ধরতেন। ভেঙে পড়ে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নিবেদিতা মিস ম্যাকলিঅডের বুকে মুখ লুকোতেন। শেষমেশ এ সম্পর্কে বিবেকানন্দকে মৃদু ভৎর্সনা করা হয়েছিল। তাতে তিনি অবাক হয়েছিলেন; বলেছিলেন, ভালো ক'রে ভেবে দেখবেন; এবং তারপর থেকে তাঁর ব্যবহার সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছিলেন, নিবেদিতার সঙ্গে অনেক মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে অনুরাগ দেখানো হতো, তাকে আমল দেবার বা গান্ধীর মতো এক বাৎসল্যের

---

*রলাঁ লিখেছেন 'মোহান্দ্রনাথ গুপ্ত'।—অনু.

দাক্ষিণ্যে তাকে দেখার মতো মানুষ তিনি মোটেই ছিলেন না। তাঁর স্বভাবে প্রচন্ডতা ছিল ; আর এও আরও ভাববার যে, তিনি বয়সের আগেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি ক্রোধের ভয়ংকর কবলে পড়তেন, তখন কিছুই রাখতেন-ঢাকতেন না। মিস ম্যাকলিঅডের মনে পড়ে না তারপর তিনি কখনো ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু আরও অমায়িক ব্যবহারে তিনি তা সেরে নেবাব চেষ্টা করতেন। স্কুল-মাস্টারি পেশা থেকে নিবেদিতার মধ্যে একটু শিক্ষকসুলভ এক মনোভঙ্গি থেকে গিয়েছিল ; তার ফলে যার সঙ্গে কথা বলতেন তার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতেন এবং নিজের যুক্তিকে প্রমাণ করতেন। অনেকে তাঁর এইটি ক্ষমা করেননি। (অন্যদের মধ্যে আছেন, মিস ম্যাকলিঅডের আত্মীয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী লর্ড স্যান্ডউইচ।)

(যদিও বিবেকানন্দ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর সম্পূর্ণ অনুরক্তির মূল্য বুঝেছিলেন,—যদিও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতা উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন) তিনি মূলত পছন্দ করতেন ভগিনী ক্রিস্টিনকে। ভগিনী ক্রিস্টিন ছিলেন তাঁর অনেক কাছাকাছি। বহু বছর ধরে পরিবারের ভার বয়ে জীবনের অনেকখানি কাটিয়েছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁর আসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাজিডি এই যে, তিনি এসেছিলেন তাঁর মৃত্যু দেখতে,—মৃত্যুর তিন মাস আগে। (মৃত্যুর দিন নিবেদিতা মোটেই হাজির ছিলেন না ; তিনি পেঁছেছিলেন পরদিন।) তারপর থেকে ভগিনী ক্রিস্টিন,—আগেই যেমন বলেছি—হিমালয়ের আশ্রমে (যেখানে বিবেকানন্দ মরতে চেয়েছিলেন) নির্জনবাসী হয়েছিলেন ; তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন অদ্বৈতবাদে (মনে হয়, অদ্বৈতবাদ ছিল বিবেকানন্দের চিন্তার ভিত্তি)। ভগিনী নিবেদিতাকে মননশীল দেখালেও, ঈশ্বরত্বের দৃশ্যগোচর রূপগুলো তাঁর মন থেকে কম ঝরেছিল। তিনি ছিলেন ইংলন্ডের হাইচার্চ গোষ্ঠীর, এই গোষ্ঠী সন্তদের পুজো করে। এবং পরে তিনি অনায়াসে সমস্ত ভারতীয় ধর্মকৃত্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। মিস ম্যাকলিঅড অবাক হয়েছেন, প্রতিদিন দেবতা ও মৃতদের উদ্দেশে এই সব প্রাচীন ও অদ্ভুত নিবেদকৃত্যে নিবেদিতার কখনো ঘাটতি হয়নি।

কেননা কঠোর ধর্মীয় রীতি বহাল আছে যে, দেবতাদেব অংশ নিবেদন না ক'রে, এবং দিব্য পুরুষদের মৃত্যুতিথিতে তাঁদের আসন পাশে না-রেখে ও তাঁদের অন্ন পরিবেশন না-ক'রে কোনো আহার চলবে না। বিবেকানন্দের তিথিতেও তিনি যা যা খেতে ভালবাসতেন, তা সমস্তই তাঁকে নিবেদন করা হয়। (মিস ম্যাকলিঅড লজ্জিত ও অপরাধীর মতো মুখভঙ্গি ক'রে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, এমনকি চকলেট-আইসক্রিম পর্যন্ত।) তিনি খোলাখুলি সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন : "আপনারা কি ভাবেন এ স্বামীজীকে তৃপ্তি দেবে ?" "না !" "তাহলে, আপনাদের জন্যে ?"—হ্যাঁ। এ আমাদের তৃপ্তি দেয় !"

বিবেকানন্দ নিজে এই কৃত্য অনুমোদন করতেন। মানুষের দুর্বলতার জন্যে একে তিনি মেনে নিয়েছিলেন ; এই সব বিধিবন্ধ ও পুনরাবৃত্ত ভঙ্গিগুলো ছাড়া ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জীবন্ত চিহ্নগুলো মনে আনতে ও বজায় রাখতে মানুষ অক্ষম। তিনি বলতেন : "এ বাদ দিলে, ওদের কাছে ওটা হবে শুধুই বুদ্ধির, শুকনো চিন্তার

ব্যাপার (আর তিনি কপালে হাত দিতেন)। ভারতীয় সন্ন্যাস-জীবন ও ক্যাথলিক সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যেকার অতি-আত্মীয়তা আরও একবার এইখানে কাছাকাছি এসে পোঁছোয়।

রাত নামতে সন্ধ্যারতি। শঙ্খের আওয়াজে তার ঘোষণা সেই কৃষ্ণের কাল থেকে। অসংখ্য ঘণ্টার শব্দ। রামকৃষ্ণের প্রাত্যহিক আরতির সময় টিং টিং নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টা বাজে, আর পূজারীর এক নিষ্কম্প হাত প্রদীপ তোলে আকাশের দিকে, কিংবা গঙ্গাজল ছেটায়, কিংবা রাজমর্যাদার প্রতীক চামর দোলায়।

রামকৃষ্ণ হাতের কাজে শিল্পী ছিলেন। তিনি দেবদেবীর ছোটো ছোটো মূর্তি গড়তেন, প্রত্যেককেই তা গড়তে হয়—খড়ের উপরে মাটি দিয়ে—কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষে এবং পরে তা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়।

সাজানোগোছানো ও পারিপাট্যের এক চমৎকার বোধ ছিল রামকৃষ্ণের—যা বিবেকানন্দের মোটেই ছিল না। জানা যায়, রামকৃষ্ণ তাঁর তরুণী পত্নীকে প্রতিটি ঘরকন্নার কাজ শিখিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন (নরেন্দ্রনাথ দত্ত); কিন্তু রীতি হিসেবে তাঁকে শুধু ডাকা হতো স্বামীজী ব'লে। ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তিনি মিস ম্যাকলিঅডের নাম দিয়েছিলেন : "জো" (জোসেফিন)।

নিজের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ আচার-প্রথা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, এবং ইউরোপীয়ের মতো বন্ধুবান্ধবের ভোজে যেতেন, অন্য সকলের মতোই খেতেন (এমনকি মাংসও), আর খেতে খেতে গল্প করতেন, যা ভারতীয়রা কখনো করে না,করতে মোটে জানেও না)

মিস ম্যাকলিঅডের স্মৃতি অনুসারে তাঁর রং ছিল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম পরিষ্কার, তবে খুব ময়লা নয়। তিনি তাঁর ছাত্রাবস্থার একটা ফটো দেখালেন—মোটাসোটা হাসিখুশি এক তরুণ।

১৮ মে, মিস ম্যাকলিঅড ফিরে গেলেন। তিনি গেলেন মঁপেইয়ে-র প্যাট্রিক গেডেসকে আর ব্রতাঞ-য়ে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে আবার খুঁজে বার করতে।

ভদ্রমহিলা সৎ, সরল এবং খাঁটি। তাঁর বিচার-বিবেচনায় তিনি ভাসাভাসা হলেও, বিচার করেন আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনি যা ভাবেন তার চেয়ে বেশি নিজেকে ভাবাতে বা ভাবতে চেষ্টা করেন না। তিনি স্বাধীন এবং অন্যদের—এমনকি যাদের ভালবাসেন তাঁদেরও স্বাধীনতাকে সম্মান দিতে জানেন। বিবেকানন্দকে তিনি অনেক ভালবেসেছিলেন। এই স্মৃতি তাঁকে যে-চিরস্থায়ী আনন্দ দিয়েছে, তাতেই তিনি বেঁচে আছেন। এই ভালবাসা, এই স্মৃতি, এই আনন্দ স্বার্থশূন্য। নিজের

পথে তিনি যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন তা ধরে রাখতে, এবং তাকে ছড়িয়ে দিতে তিনি ভালবাসেন। তিনি সেই পতঙ্গদের মতো, মধু খেয়ে যারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে নবজন্মের পরাগ বয়ে নিয়ে যায়।

ফ্রান্সে মিস ম্যাকলিঅডের এমা কাল্‌ভের সঙ্গে সদ্য দেখা হয়েছে ; এমা কাল্‌ভের স্মৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের স্মৃতি মিলিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে তিনি কাল্‌ভেকে তলস্তয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। বিবেকানন্দের এক অতি পরিচ্ছন্ন স্মৃতি এমা কাল্‌ভে জিইয়ে রেখেছেন ; তিনি বলেছেন, কনস্ট্যান্টিনোপলে বিবেকানন্দকে 'রেসারেকসানের' কথা পেরে ইয়াসঁ্যাতের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে শুনেছিলেন। পেরে ইয়াসঁ্যাৎ কিন্তুভাব দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "তলস্তয়ের ধর্মে বুনিয়াদি কিছু নেই।" বিবেকানন্দ নিঃশব্দে এক মুহূর্ত পেরে ইয়াসঁ্যাতের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর মিষ্টি ক'রে বলেছিলেন : "আমাদের কারুর ধর্মেই কি কোনো বুনিয়াদ আছে?" এবং কাল্‌ভে আরও বলেছেন : "পেরে ইয়াসঁ্যাতের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজীর চোখেমুখে সব সময়েই কী যে বেদনার, কী করুণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো, এবং এবং গর্ব ও অহংকারের জন্যে যে-হতভাগিনী স্ত্রী তাঁকে ব্রতচ্যুত করিয়েছিল, তাঁর প্রতি তাঁর কী গোপন অবজ্ঞা ছিল, তা ভুলতে পারা যায় না।"

আমি মিস ম্যাকলিঅডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি ঠিক কেমন ছিল। সঙ্গীতের জ্ঞান সামান্য হওয়ায় তিনি তা আমাকে বলতে পারেননি ; "প্রাণবন্ত, মর্মস্পর্শী, যতো কণ্ঠস্বর শুনেছি সকলের চেয়ে সুন্দর"—এইরকম বর্ণনাতেই তিনি আটকে ছিলেন। এ বিচারের ভার সম্পূর্ণ কাল্‌ভের ; তিনি বলেছেন, তা ছিল "এক পুরুষালি উদাত্ত কণ্ঠস্বর (baryton), তাঁর স্বচ্ছন্দ আন্দোলন ছিল চীনা ঝাঁঝের (gong) মতো।"

জুন, ১৯২৭। মায়াবতীর (ভায়া চম্পাবৎ, জেলা আলমোড়া) 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার (হিমালয়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম মহৎ পত্রিকা) সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ ৩০ মে আমাকে চিঠি লিখেছেন। রামকৃষ্ণের চিন্তা সম্পর্কে আমি যে আগ্রহ দেখাচ্ছি তা তিনি জানেন এবং তিনি আমার ব্যক্তিগত মতামত চেয়েছেন। আমি তাঁকে লিখলাম (২৬ জুন) :

"এক বছর হলো ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের কয়েকটি পাতা রামকৃষ্ণের মহৎ হৃদয়টিকে বাস্তবিক পক্ষে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছে ; এবং এই আলোর রেখা আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে তাঁর জীবন ও চিন্তাকে জানতে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত যে বইগুলো ভারতীয় বন্ধুরা প্রীতিভরে আমাকে পাঠিয়েছেন, কয়েক মাস ধরে আমি ও আমার বোন সেগুলো পড়েছি। গত মাসে মিস ম্যাকলিঅডের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ; এবং দিনের পর দিন একসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দের কথা একটানা আলোচনা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ আমার চোখে যেন আত্মিক শক্তির এক জলন্ত উৎস, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের এক প্রবাহিনী। তাঁরা দু'জনে ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন বিকীরণ করেছেন। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর (génial)। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রতিভার উর্ধ্বে। আমি তাঁদের উদ্দেশে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করতে চাই, যে-গ্রন্থ পাশ্চাত্যের বহুজনের কাছে তাঁদের চেনাবে। কাজটা দীর্ঘ ও অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের সমৃদ্ধ চিন্তায় বহুবিধ উপাদানের ভীড় করেছে; পাশ্চাত্যের বুদ্ধি (ও এমনকি হৃদয়) যে শৃঙ্খলাবোধের দাবী করে, তা থেকে এ চিন্তার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। এই উপাদান-গুলোর একটি অংশ বিশিষ্টরূপে ভারতীয়। অন্য অংশ বিশ্বজনীন। এবং শেষের-টিকেই আমাকে আলাদা করতে হবে। ইউরোপীয় মগজে কিছু কিছু কথার যে-ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হবে এবং ক্রিয়ার যে-ফলাফল উদ্ভূত হতে পারে, তাদের কথা আমাকে সব-সময়েই ভাবতে হবে। কারণ ইউরোপীয়দের কাছে সবটাই ক্রিয়া, বা সবটাই ক্রিয়া হতে হবে। এখানে একটা বিপদ আছে; শ্রীরামকৃষ্ণের ও সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা বিশিষ্টরূপে ছাঁচ অনুযায়ী গড়ার উপযোগী (plastique) এবং যাদের সামনে উপস্থিত হয়, প্রায়ই তাদের বিচিত্র হৃদয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় (রামকৃষ্ণ করেন প্রেমের সহজাত সংস্কারের (instinct) বলে, যা কিছু দেখে তাতেই যে-সহজাত সংস্কার নিজেকে পরিবর্তিত করে; আর বিবেকানন্দ আবেগদীপ্ত প্রতিক্রিয়ার বলে, যে-প্রতিক্রিয়া মনকে কাদামাটির মতো গড়ে তুলতে ও আকার দিতে চায়); এই চিন্তা নিজেকে প্রকাশ করে অতি-বহু-অর্থে এবং সময়ে সময়ে তাদের মনে হয় (কার্যত) পরস্পরবিরোধী। এখন, ইউরোপে ও গোটা পৃথিবীতে আমরা রয়েছি কর্মের এক ঝড় থেকে বেরিয়ে-আসা এক সামাজিক ঝড়ের মুহূর্তে এবং আগের চেয়েও প্রচন্ড কর্মের এক নতুন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বমুহূর্তে—সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথের নির্দেশ চাইছে। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, স্পষ্ট, সহজ নির্দেশ তাদের দিতে হবে, এবং তার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না : কারণ ঘূর্ণিঝড় মোটেই অপেক্ষা করবে না। যে-পথ ধরে মানুষকে এগুতে হবে, সেই পথ যে-রশ্মি আলোকিত করছে সেই রশ্মিকে সত্যের সূর্য থেকে পরিস্রুত হতে দেওয়া সেইজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা আজ যে সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আমার দৃঢ় প্রত্যয়—বিবেকানন্দ যদি এর মধ্যে দিয়ে যেতেন, তিনি এটি প্রবলভাবে অনুভব করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময়ে, এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণের মৃত্যুর সময়ে, জগতের মহাঝড় মানুষকে তার ঘূর্ণিপাকে টান দেয়নি; তখনো নিশীথ রাত্রি, তখন নিঃশব্দে ঝড় ঘনিয়ে আসছে। এখন যারা মরতে চলেছে (আমি আত্মার মৃত্যুর কথা বলছি), তাদের সকলের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে তাদের বাঁচাতে ছুটে যাওয়া হবে কিনা। আমার ও আমার বোনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যে ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরিচিত হই; তাঁর সম্পর্কে দরদ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে শুনি। আমার বিশ্বাস খুব কম মনই তাঁর মতো বিবেকানন্দের মনের এতো কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়েছে। চিঠির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে আনন্দিত হবো, এই আশা রাখবো যে, একদিন সম্ভবত তাঁর সাক্ষাৎ কপালে

জুটে যাবে। আমাদের আরও বলা হয়েছে, হিমালয়ের অদ্বৈতাশ্রমে স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র এবং বিবেকানন্দের ঐকান্তিক ভক্ত বশী সেন নামে এক পণ্ডিত আছেন। আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই। আমি কেমন যেন তাঁর চিন্তা অনুমান করতে পারি (এবং আমার চিন্তা কেমন যেন আমাকে বলে), বিজ্ঞান ঈশ্বরের অন্যতম পথ ; এবং ঠিক ঠিক এরই মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিমুখে পশ্চিম এগিয়ে যাবে আরও নিশ্চয়তা নিয়ে, যদি এ ভালোভাবে পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে যদি বিবেকানন্দের নিজের কথা বলার সুযোগ হয়ে থাকে, তা জানাটা কাজের হবে। প্রিয় স্বামী অশোকানন্দ আপনাকে ও আপনার ভ্রাতাদের আমি প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করি সেই দিব্য ঐক্যের জ্বলন্ত স্পর্শের মধ্যে, রামকৃষ্ণ ছিলেন মানুষের রূপে যার পরম সঙ্গীত (Cantique des Cantiques)—আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রীতি।”

৯ জুলাই, ১৯২৭। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এসেছেন। জেনেভা থেকে তিনি এসেছেন (সেখানে ‘বুদ্ধিজীবী-সহযোগিতার আন্তর্জাতিক কমিটি’র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন) ভিলা অলগায় মধ্যাহ্ন ভোজনে ও অপরাহ্ণ কাটাতে। তাঁর সঙ্গে লেডি বসু, পরনে ভারতীয় পোষাক, তাঁর মধ্যে স্বামীর চেয়ে জাতিগত লক্ষণ অনেক বেশী স্পষ্ট। আমরা মঁত্রো স্টেশনে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁদের আনতে। তিনি ফরাসী বলতে পারেন না, আর আমার বোন আরও একবারের মতো আমাদের মধ্যস্থ হলো।

তিন চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মানুষটি যে প্রাণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উত্তাপ ছড়ালেন তার একটা ধারণা কী ক'রে দিই! মানুষটি ছোটোখাটো, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, কালো ভুরু, রুপোলি চুল ; একটু সেমিটিক রক্ত-মেশা ভূমধ্য সাগরাঞ্চলের মানুষের মতো রোদে-পোড়া গায়ের রং ; ছোটো ছোটো দুটি শুকনো হাতের (প্রতিভাবানের হাত) নখ ছোটো ক'রে কাটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য (আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্চ স্তরের) তারুণ্য এবং কথা বলার, চিন্তা করার, বেঁচে থাকার এক আনন্দ—আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরেকার (১৯১৫) আইনস্টাইনকে।

তাঁর বিচিত্র বিষয়ের আলোচনার হিসাব রাখা কঠিন, তবুও তারা তাঁর প্রায় গোটা নতুন জগতকে ঘিরেই ঘোরে ; এই নতুন জগতের তিনি আবিষ্কর্তা,—যেমন আমি তাঁকে বলেছি, তিনি হচ্ছেন, মনোজীবন, উদ্ভিদ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার ঃ মনের নতুন মহাদেশের ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ত্রিশ বছর হলো হঠাৎ তিনি এই উপলব্ধি করেছিলেন এক কাঠ-বাদাম গাছের (marronier) শরীরে, অসুস্থ অবস্থায় যে-ঘরে তিনি শুয়ে থাকতেন, তার জানলার সামনে সেই গাছের ডালগুলো দুলতো। তারপর থেকে, শুধু তাকে পর্যবেক্ষণ করাতেই নয়, তাঁর নিপুণ মাথা খাটিয়ে বার-করা অসংখ্য যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড-করা গ্রাফের মাধ্যমে

তাকে দিয়ে কথা বলাতে, তাকে দিয়ে বলিয়ে নিতেও তিনি আর থামেননি। প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু জোর ক'রে বলা নয়, আর সেই প্রমাণটি, যাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তাকে দিয়ে না লিখিয়ে নিয়ে নয়। এইখানেই তার প্রতিভার সবচেয়ে অসাধারণত্ব। কিন্তু এর ধারণার জন্যে প্রথমে দরকার হয়েছিল, যা খুঁজতে যাচ্ছেন তার আধা-ধর্মীয় স্বতঃলব্ধ বোধটি (intuition) লাভ করা। এবং এই ধারণা যাতে একটা উপলব্ধি দিতে পারে, তার জন্যে দরকার হয়েছিল মনের মতোই নিপুণ হাতের অধিকারী হওয়া। তিনি বললেন যে, এই কাজের জন্যে আঙুলগুলো থেকে চরম স্পষ্টতা ও পুরোদস্তুর নিশ্চলতা পেতে কমপক্ষে বছর বারো লাগে; কেননা, তিনি যে-যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করেন তারা এক কোটি থেকে দশ কোটি গুণ বড়ো ক'রে দেখায় ব'লে সূক্ষ্মতম কম্পনও স্কেলে ধরা পড়ে যায়। তাছাড়া, এই যন্ত্র তৈরির জন্যে তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে যান না, যান অত্যন্ত সরল ছোটো-খাটো মানুষের কাছে, ছোটোখাটো কারিগরের কাছে; তাদের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দেন, যা লাভ করতে,—উদ্ভিদের গভীরে তাদের মনের (যে-মনকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন) অদৃশ্য গতিবিধি পড়তে, তিনি সফল হতে চান। তাঁর সর্বশেষ আবিষ্কারগুলো উদ্ভিদের উপরে ও মানুষের উপরে ভেষজ-পদার্থের সমান্তরাল ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের না-জানা এক এলাকা উদ্ঘাটিত করেছে: কেননা, মানুষের মনের উপরে একই ফলাফল নির্ণয় করার আগে তিনি এমন পদার্থকে উদ্ভিদের মনের উপরে পরীক্ষা করতে পেরেছেন।

তিনি উদ্ভিদের (প্রায় সুনিশ্চিত) বধিরতার কথা বললেন; এবং তা পুষিয়ে নিতে আলোর সমস্ত ঘাটে (clavier) (যাদের মাত্র একটা অষ্টকই (octave) আমরা উপলব্ধি করি) - প্রতিটি বৈদ্যুতিক ও সৌর স্পন্দনে - তাদের বিস্ময়কর সংবেদনশীলতার কথা বললেন। কীটপতঙ্গের বধিরতা সম্পর্কে ফরেলের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লো। জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের বললেন সাপেরাও বধির। বাঁশি বাজিয়ে সাপুড়েদের খেলা-দেখানো একটা ধাপ্পা; আসলে তার কারণ হচ্ছে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে সাপুড়েরা হাতের ও বুকের কিছু কিছু ভঙ্গি ক'রে সাপের দিকে ঝোঁকে, সাপ এই প্রতিবিম্বগুলোতেই বশীভূত থাকে। লোকদৃষ্টিতে ধরা-পড়া প্রতিটি দৃশ্যগোচর ব্যাপারকে খুব কাছে থেকে আবার দেখার প্রয়োজন আছে, কারণ এগুলো প্রায়ই ঠিক দেখা নয়, ভুল দেখা,—(কিন্তু এগুলো মাথা খাটিয়ে বার করা নয়)।

আমি তাঁকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তিনি বললেন, দু'হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষের রসায়নের দ্বৈত প্রস্থান ছিল (স্বাভাবিকভাবেই নাম ছিল না),—এক প্রস্থান পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে ও যে-মন তাদের কল্পনা ক'রে তাতে আরোপ করতো,—অন্য প্রস্থান অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবেই স্বরূপেই পদার্থের পর্যবেক্ষণ করতো এবং এই তত্ত্বটি নিষ্কাশিত করেছিল: যে-কোনো পদার্থই পরম ভালো বা পরম মন্দ নয়, প্রত্যেকেই ক্ষেত্রানুসারে (এবং মাত্রানুসারে) ভালো অথবা মন্দ। যেমন, গোখরোর মারাত্মক বিষ কোনো কোনো অসুখে শ্বাস-ওঠা রোগীকেও সঞ্জীবিত করতে এবং বাঁচাতে পারে। (জগদীশচন্দ্র

তাই মানেন ব'লে মনে হয়;—কিন্তু এখনো-জানা এই রীতি ইংরেজরা নিষিদ্ধ করেছে, তারা বিষের ব্যবহারই নিষিদ্ধ করেছে।)

আমাকে হালে যে-বইটি পাঠিয়েছেন, এক সময়ে তিনি সেটি হাতে তুলে নিলেন; সেটি তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই: 'প্ল্যান্ট অটোগ্রাফ এ্যান্ড দেয়ার রিলেশান্‌স্‌', তাতে তাঁর আবিষ্কারগুলোর মূল কথার সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। আমাদের বাগান থেকে তুলে আনা কয়েকটি গাছড়া হাতে নিয়ে তার কিছু অংশ ব্যাখ্যা করলেন। সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গৃহপালিত হাঁসমুরগি ও বাগানের সব্জিগাছের (ফ্রেঞ্চ বিন) মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে; তাদের সংবেদনশীলতা (বা প্রতিক্রিয়াগুলো) ভয়ংকরভাবে কমে যায়; এবং লজ্জাবতী ও বাজপাখির সংবেদনশীলতা হয় অত্যন্ত প্রখর। তিনি লজ্জাবতীর একটা ডগার চারটে স্নায়ু দেখালেন, কেমন ক'রে প্রত্যেকে একটা পাতাকে চালাচ্ছে, এবং যে-কোন পাতায় রোদের স্পর্শে সৃষ্টি-হওয়া উপরের ও নীচের সংকোচ-প্রসারণের অবিরাম নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করছে।

তিনি ভারতীয় ধরনে গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ এবং তা মোটেই গোপন করেন না। (জগতের সামনে এখন যে তাঁর আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতেও গোপন করেন না।) তিনি নিঃসন্দেহ যে, জীবন এক এবং গতিশীল; আর আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব ও অজৈব (ব'লে কথিত) পদার্থের সমস্ত রাজত্বের মধ্যে দিয়ে এক রূপ থেকে অন্য রূপে আমাদের নিয়ে যায়। পরিণামে তিনি সমস্ত অস্তিত্বকেই অঙ্গীভূত করেছেন। তিনি বললেন: "আমি যদি উদ্ভিদ না হতাম—তাকে বুঝবার জন্যে যদি আবার উদ্ভিদ না-হয়ে যেতাম, তাহলে তার মন আবিষ্কার করতে পারতাম না।" তারই ফলস্বরূপ মানবতার ঐক্য তাঁর কাছে একটা চোখে-দেখা জিনিস, ব্যক্তিগত নির্বোধ অহংকার যাকে অন্ধ ক'রে রেখেছে। মাত্রা থেকে মাত্রায় মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে, প্রথমে করেছে জীবনের অন্য শ্রেণী (ordre) থেকে, তারপর মানুষের অন্যান্য জাত থেকে, তারপর অন্যান্য ব্যক্তি থেকে এবং অবশেষে তার মধ্যে বানিয়েছে মরুভূমি।

সামাজিক বিপ্লব বা রাজনীতিতে আগ্রহী হবার পক্ষে তিনি বড়ো বেশি বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন। তাঁর চোখে প্রকৃতি তার চিরস্থায়ী পথ অনুসরণ ক'রে চলে, আর ওদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ওঠে আর পড়ে। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী, যারা কলকাঠি নাড়ে তাদের ফাঁদে তিনি ধরা দেন না; বসু বিজ্ঞানমন্দিরে পাঠানো মুসোলিনির ইতালি আসার নিমন্ত্রণ তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'লিগ অব নেশনস'র মিথ্যার মুখোস খুলে দেখতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি; যে সমস্ত বুদ্ধিমান এশিয়াবাসীদের আমি দেখেছি, তাঁদের মতোই তিনি লিগকে নিদারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

বিবেকানন্দকে তিনি খুব ভালো ক'রে জানতেন (এবং রামকৃষ্ণকে দেখেছেন কিন্তু সত্যিকারের জানাশোনা ছিল না)। বিবেকানন্দকে তিনি ভালবাসতেন, বিবেকানন্দও তাঁকে ভালবাসতেন। (শুনে আনন্দ পেলাম) তাঁর মধ্যে জাতীয়তা-

বাদী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন মনে ক'রে এক সময় বিবেকানন্দ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদকে দেখান। যাঁরা বিবেকানন্দকে দেখেছেন, তাঁদের সকলের মতোই জগদীশচন্দ্র সেই মোহিনীশক্তির কথা বললেন, যে-মোহিনীশক্তি জীবন ও বুদ্ধিতে উপচে-ওঠা এই ব্যক্তিত্বটি বিস্তার করতেন। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠার আগেই বড়ো তাড়াতাড়ি তার মূলোচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় অলৌকিক ক্রিয়াসাধক, ভেল্কি-দেখানো ফকির সম্পর্কে,—যারা যুক্তির ও ইচ্ছাশক্তির সংযমকে মোটেই সংশ্লিষ্ট করে না, তাদের সকলের সম্পর্কে, বিবেকানন্দের মতো (এবং আমার বিশ্বাস রামকৃষ্ণের মতোও) তাঁর গভীরতম অবজ্ঞা। থিওসফিস্টদের মনের অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও অলসতা সম্পর্কে (তাঁদের মতোই) তিনি করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেন। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পড়ার পর বসুকে বলতে শুনে আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় ধর্মীয় মহৎ স্বতঃলব্ধ বোধের (যা তুরীয় আনন্দ পর্যন্ত যেতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে সবসময়েই যুক্তির নিয়ন্ত্রণ; এবং সাময়িক ভাবে হলেও, যা কিছু যুক্তিকে বিসর্জন দেওয়ায়, তার প্রতিই তার বিতৃষ্ণা। কিন্তু কেমন ক'রে একই সঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছ যুক্তি ও আন্তর দর্শনকে মেলান, তা এমন এক বিজ্ঞান, যা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইউরোপীয়রাও মোটেই অনুমান করতে পারে না (দেহের একাংশে বা গোটা দেহে সংবেদনশীলতার প্রণালীগুলো (canaux) নিজের ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করার জন্যে যে ক্ষমতা মন আয়ত্ত করতে পারে, বা মনকে আয়ত্ত করতে হয়,—সেই ক্ষমতার কথা জগদীশচন্দ্র আমাদের এক মুহূর্তে বলে দিলেন, এইটি লক্ষ্য করার মতো)।

তাঁর কলিকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরের জন্যে কয়েকখানি বই নাম স্বাক্ষর ক'রে উপহার দিতে অনুরোধ করলেন, আর অনুরোধ করলেন, মনের যে-আত্মীয়তা আমাদের এক করেছে, তার সাক্ষ্য বহন করা একখানা চিঠি দিতে, যা তিনি তরুণদের হাতে পৌঁছে দিতে পারেন।

তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিজ্ঞানমন্দিরকে দিয়ে দিয়েছেন। (তাঁর কোনো সন্তান নেই।) দশ বছর শিক্ষানবিশির সময় তিনি কিছু ছাত্রকে বৃত্তি দেন। তিনি বললেন, তারপর যখন তিনি মনে করেন তারা চালিয়ে যাবার উপযুক্ত, তিনি চান সারা জীবনের জন্যে তাদের এমনভাবে এক পর্যাপ্ত বৃত্তির নিশ্চয়তা দিতে, যাতে বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো বৈষয়িক উদ্বেগ তাদের না থাকে—কিন্তু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিটি আবিষ্কার জগতকে দিতে হবে। কোনোটিরই গোপনতা বা পেটেন্ট রাখা হবে না। কেননা, তিনি বলেন, বিজ্ঞানের তাই একমাত্র ভালো যা সকলকে দেওয়া যায়। যা গোপন করতে হয় তাই মন্দ (বিস্ফোরক পদার্থ, মারণযন্ত্রাদি)।

কৌতূহলজনক এতো কিছুর প্রথম সাক্ষাৎ,—এদের অর্ধেককেই হারিয়ে যেতে দিতে হবে; তবু এদের মধ্যে থেকে সেইটি লিখে রাখতে চাই, প্রকৃতির লড়াই

উদ্ভিদ জগতের সংগ্রাম সম্পর্কে (ব্লবুর্গে জুরা পাহাড়ে 'বুইস'নারদাঁ-র যে-বনকে বা সিয়েনের কাছে যাকে আমি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম) আমার পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আরও ভয়ংকর কিছু কাহিনীর উল্লেখ করলেন ঃ একটা তালগাছ, তার উপর বটগাছের এক বিন্দু বীজ পড়েছে, সেটা একটু একটু ক'রে গাছের উপরে নিজেকে ছড়াচ্ছে, গাছকে ফাঁদে আটকাচ্ছে, ঢেকে ফেলছে, তারপর চারধারে শেকড় চালিয়ে দিয়ে জ্যান্ত গিলে খাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে এই একটি যা মানব-প্রজাতির সমস্ত উৎসর্গিতদের আশ্চর্য প্রতীক হতে পারে ঃ দীর্ঘকালের এক লড়াইয়ের পর মনে হয় শান্তি স্থাপিত হয়, জঙ্গলে বা বাগানের বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য ফিরে আসে। প্রত্যেকে তার দূরত্ব রক্ষা করে, কিংবা মনে হয় পর-পর মিলেমিশে থাকে···কিন্তু তাদের মধ্যে পরদেশী কোনো গাছ লাগানো হোক, সকলে মিলে জোট বাঁধবে। পরদেশী গাছটা বাঁচতে পারবে না, মরে যাবে ; মনে হবে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল···কিন্তু মরে গেলেও তার দেহের সারাংশ শত্রুর মাটিকে উর্বর ক'রে তুলবে। এক বছর, দু' বছর পরে চোখে পড়বে মরা গাছ থেকে জন্ম নিয়ে নতুন গাছ মাথা তুলছে, সেটাই শেকড় বসিয়েছে ; কিন্তু তখনো তার জীবনী-শক্তি দীর্ঘকালের প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, সে-শক্তি হবে পরবর্তী বংশধরদের। সন্তানদের মধ্যে দিয়েই মৃতেরা জন্মলাভ করে।

লেডী বসু বয়স্কা মহিলা, মোটেই সুন্দরী নন, গায়ের রং কালো, মুখখানা বড়োসড়ো, একটু ভারী, কিন্তু মনে হয় (আমি জানি তিনি) ভালমানুষ ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর প্রতি আশ্চর্যরকম অনুগত, প্রথম থেকে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সংগ্রামে তিনি অংশ নিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন ; তিনি কদাচিৎ মুখ খোলেন, —স্বামীই যখন সবসময় কথা বলছেন, তিনি কেমন করেই বা বলতে পারেন ? চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে, এক হাসিমাখা ক্লান্ত ধৈর্যের ভাব ফুটিয়ে তিনি শুনে যান তাঁর বৃদ্ধ শিশুটি ব'লে চলেছেন, একই উৎফুল্ল কাহিনী আবার নতুন ক'রে বলে চলতেও যাঁর ক্লান্তি নেই।

বুঝবার অক্ষমতার বিরুদ্ধে, জাতিগত ও পেশাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্রকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা, তাঁর পেশার সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন। (বিপরীত দিকে তাঁকে সমর্থন করেছেন পদার্থতত্ত্ববিদেরা।) তিনি বলেন ঃ "বর্ণভেদের জন্যে ইউরোপীয়রা আমাদের নিন্দা করে। ইউরোপে পেশাগুলো, গোষ্ঠীগুলোই বর্ণ।" তাঁর অভিযোগ, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানদেরও মনের ভীরুতার এবং প্রকৃতি ও মনের শক্তি সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁর যে আবিষ্কার দেখিয়েছে মানুষের বাইরেও আবেগময় জীবন আছে, তার প্রথম দিকে মহাপণ্ডিত লর্ড কেলভিন তাঁকে বন্ধুভাবে বলেছিলেন ঃ "না এটা সম্ভব নয়, এটা হবে ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার একটা অভাব, তিনি চেয়েছেন মানুষকে বিশেষ অধিকার দিতে।" জগদীশচন্দ্র প্রতিবাদ করেন, ঈশ্বরকে গণ্ডীবদ্ধ করার দাবিটা যেন শ্রদ্ধার অভাব নয়! জগদীশচন্দ্র

লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে, সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিমানেরও বেশির ভাগ সময়েই সহজতম সমাধান মাথায় আসে না, এবং তাঁর ক্ষেত্রে সহজ ও বাস্তব সমাধান বার করা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ তিনি এইটি সবসময়ে মাথায় রাখেন। এই ভাবে হৃদস্পন্দন পরিমাপের জন্যে তৈরি অতি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির মধ্যে থেকে প্রতিটি স্পন্দন আলাদা করার জন্যে তিনি এই নীতি ধরে শুরু করেছেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের উপলব্ধি এড়াবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তারই সঙ্গে যোগ দেওয়া ; এবং এই অতি সহজ পন্থাতেই তিনি এর মধ্যে খাপ-খাওয়ানো (এবং বধিরতা) সম্ভব ক'রে তোলেন।

আমাদের মতো যাদের সবসময়ে চোখ খুলে রাখতে হয়, এবং লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, তাদের মনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়দের একমাত্র ব্রত ছিল অপরের জন্যে লড়াই করা ; এবং এইভাবেই ক্ষত্রিয়রা সমাজের বাকি অংশের শান্তি ও নিরুপদ্রব কর্মের নিশ্চয়তা দিত। (ব্রাহ্মণরা ছিল তাদের চেয়ে উচ্চ বর্গের, তাদের মোটেই অস্ত্র ধরতে হতো না, এবং ব্রাহ্মণরা তাদের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের কাজ করতো।) যে-বীরোচিত ও অনুপ্রাণিত সংস্কারগুলো ভারতবর্ষকে নতুন প্রাণ দিয়েছে, তাদের উদ্ভব ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে নয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে। যে-বুদ্ধের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা, তিনি একজন ক্ষত্রিয়। (আমি নিশ্চিত নই, জগদীশচন্দ্র নিজে ক্ষত্রিয় কিনা।) তিনি শেষ করলেন এই ব'লে যে, জগতে মনের ক্ষত্রিয়দের এই শ্রেণীকে আমাদের নতুন ক'রে গড়ে তুলতে হবে।

জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালো করেই জানেন এবং গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁর বিচারে গান্ধী বড়োই সংকীর্ণ, তিনি শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি বড়োই উদাসীন বা খড়্গহস্ত, মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্যের তাঁর বড়োই অভাব। ঠিক এর বিপরীত, জগদীশচন্দ্র চান, মনের সৃষ্টির সমস্ত শক্তিগুলোকে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করা হোক, এই শক্তিগুলো সর্বজনীন প্রকৃতির স্বর্গীয় পরিকল্পনার অঙ্গ, অপরিহার্য অঙ্গ। তরুণ বংশধরদের মাধ্যমে সৃষ্টির এই অবিশ্রান্ত উৎসার ছাড়া প্রকৃতি ঝিমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়ার ভয় থাকে। শেষ দিন পর্যন্ত তাকে তরুণ থাকতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে নবতারুণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে।

গুরুশিষ্যের নিরন্তর সম্পর্ক থাকায় এই ভারতীয় তরুণদের তিনি ভালো জানেন ; তিনি বললেন. এদের মধ্যে বাঙালী তরুণদের কল্পনাশক্তির আগুন আছে, স্বতঃলব্ধ বোধের প্রতিভা আছে, কিন্তু এদের অভাব দীর্ঘকাল ধরে কাজে রূপায়িত করার ধৈর্যের ; তার কারণ নিঃসন্দেহে দৈহিক ; ভয়ংকর দুর্বলকরা এক জলহাওয়া তাদের শক্তিকে ক্ষয় ক'রে দেয়। ভারতবর্ষের অন্য জাতিগুলো অনেক কম প্রতিভাসম্পন্ন হলেও আরও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে সমর্থ এবং তারা বাঙালীর চেয়ে ভালো কাজের লোক। এখানে কত ইউরেপীয় তরুণ কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করতে চাইছে এবং খুব শিগগিরই তারা সেখানে ঢুকতে

চলেছে। মনের কর্মে সমগ্র মানবতাকে যুক্ত করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ঃ জগদীশচন্দ্রের এই অন্তরতম আকাঙ্ক্ষায় তারা সাড়া দিয়েছে।

১০ জুলাই তারিখেই জেনেভা থেকে জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন ঃ

"প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু,—আপনার সুন্দর বাড়ীটিতে আপনার সঙ্গে দেখা-করা এবং যা কিছু সত্য ও সুন্দর তার সংস্পর্শে আসা এক বিরাট সুখ ; একমাত্র এরাই টিকবে…"

জুলাই, ১৯২৭। আলমোড়ার (হিমালয়) কাছে মায়াবতীর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী আশোকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পত্রালাপ। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমি দলিলগত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। কয়েক মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় আমার বোন আমাকে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা বই পড়ে শোনায়। এখন আমার হাতে এ বিষয়ে প্রচুর নোট! বিষয়টা সুন্দর ও বিরাট, কিন্তু আয়ত্ত করা, বিশেষ ক'রে ইউরোপীয় পাঠকদের জন্যে সংক্ষিপ্ত করা কঠিন। ইউরোপের এই হতভাগ্য ঐতিহাসিকদের উত্তর দেবার জন্যে, আমি ভাবছি, বইয়ের নাম দেবো "জীবন্ত দেবতারা" ; এই ঐতিহাসিকেরা পুঁথির মধ্যে ডুবে থেকে কেবলমাত্র যিশুর দেবত্বই অস্বীকার করে না, এমনকি তাঁর অস্তিত্বের সম্ভাবনাই অস্বীকার করে, অস্বীকার করে এক নর-দেবতার অস্তিত্বকে, বা এক মহান্ দেহধারীর আন্তরিক, স্বাভাবিক—(এবং আমি সাহস ক'রে বলবো, ন্যায়সঙ্গত) দেবত্বারোপকে। এই পুঁথির পোকাগুলো অনুমানও করতে পারে না, আজকের জগতে কী চলছে। ওরা দেবতাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, আর ওরা অতীতের দেবতাদের প্রতি খড়্গহস্ত। ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত। অদ্ভুত জাত! চিরকাল মন জুড়ে আছে একটি মেশায়া, মেশায়াদের জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, মেশায়াদের জন্ম দিয়েছে এবং যখন তাঁরা এসেছেন তাঁদের চিনতে পারেনি, তাঁদের অস্বীকার করেছে উন্মত্তের মতো, তাঁদের হত্যা করেছে, পায়ের নিচে মাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। ভালো ক'রে সুস্থ হয়ে না উঠ'লেও, সব সময়ে হাঁপানিতে কষ্ট পেলেও আমি গ্লাঁ-র আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে একটা দিন কাটাতে চলেছি, সেখানে আমার উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়েছে। —

…এই সম্মিলনীতে বক্তৃতাগুলোর মতোই, এবং তাদের চেয়েও বেশী—দামি হচ্ছে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা ; বক্তৃতাগুলো প্রথম শ্রেণীর, নিয়েহোস্ জার্মান ভাষায় সেগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে চলেছে। আমি এসেছি জগদীশচন্দ্র বসুর

বক্তৃতা শুনতে, সেটা হলো গতকাল সন্ধ্যায়। বক্তৃতাটা সাধারণ বিষয়বস্তুর বাইরে (শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতিদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে) ; কিন্তু বলা চলে বক্তৃতাটার মধ্যে অধিবিদ্যা ঢুকেছে, কেননা এতে শুধুমাত্র মানবীয় ঐক্য নয়, প্রাণিজগতের ঐক্যও হাতেকলমে দেখানো হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন ইংরেজিতে, আর আমার বোন (বৈজ্ঞানিক অংশগুলো গ্যাব্রিয়েল মনো-হেরজনের সাহায্যে) ফরাসীতে সংক্ষেপে তর্জমা করলেন। অসংখ্য প্রজেকসানের মধ্যে দিয়ে জগদীশচন্দ্র এটা ব্যাখ্যা করলেন, প্রজেকসানে বিশেষ ক'রে দেখা গেল যেসব উদ্ভিদকে তিনি পরীক্ষা করেছেন তাদের চিত্রলেখ (তিনি বললেন "হস্তলেখ")। দেখা গেল, তারা স্পন্দিত হচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, জাগছে, মিইয়ে পড়ছে, চমকে উঠছে ; বিষের, ওসুধের, ঘুমের বা উত্তেজিত করার ওসুধের বা সূর্যের উপর দিয়ে নিছক মেঘ চলে যাওয়ার সামান্যতম প্রভাবেরই অধীন হয়ে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ গুণ বড়ো ক'রে দেখানো গাছের কাটিং বা নমুনা— আশ্চর্যজনক অনস্বীকার্য ভাবে জীব-ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে যাদের তুলনা চলে, সুস্পষ্ট দেখিয়ে দিল গোপন স্নায়ুযন্ত্র ও প্রাণরস-সঞ্চালন-পথ। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা উঁচু স্তরের প্রাণীর সংবেদনশীলতার অনুরূপ হলেও, তার চেয়েও নিচু স্তরের কিন্তু নিচু স্তরের প্রাণীর সংবেদনশীলতার চেয়ে উঁচু স্তরের। তাঁর আসল কথার মধ্যে যা নতুন তা এই যে, তাঁর তিরিশ বছর ব্যাপী কঠোর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর এই তিনি স্বীকার করলেন— শাশ্বত ঐক্যে তাঁর ভারতীয় বিশ্বাস তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ; এই বিশ্বাস একই সঙ্গে তাঁর গোপন-করা যাত্রারম্ভের বিন্দু এবং তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের প্রকাশ্য-করা সিদ্ধান্ত। উদ্ভিদ জগতের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের জন্যে আশ্চর্য নৈতিক শিক্ষাও তিনি টেনে বার করেছেন : বিশেষ ভাবে এইটি : যন্ত্রণা হচ্ছে সেই পথ, যার মাধ্যমে সত্তা উন্নীত হয় ও এক উচ্চ স্তরের অস্তিত্বে পৌঁছোয় ; এইটি তিনি অনুরূপভাবে খুঁজে পেয়েছেন আমার 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ'এ, আর এই দিয়েই তিনি আমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এটির সঙ্গে আরও মিল আছে ভিঞ্চির একটি চিন্তার : প্রকৃতির ধ্বংসকরী শক্তিগুলোকে প্রতিরোধের উপায় যদি সত্তার না থাকে এবং এই শক্তিগুলোকে পরিবর্তন করা যদি তার উপরে নির্ভর না করে, তার উপর নির্ভর করে সেগুলোকে অনুভব করার পদ্ধতিকে পরিমিত করা,— তাদের আঘাতকে প্রায় দমনের পর্যায়ে হ্রাস করা, এক কথায় প্রয়োজনের নিয়ম থেকে মুক্ত করা। তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন (তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন প্রাণ ভরে, কোনো কোনো রসালো উক্তিতে নিজেই হাসছিলেন) এক প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ভেঙে পড়ল গ্লাঁ-র মাথায়, আলো মিলিয়ে গেল, বৃষ্টির তোড় আর শিলের সঙ্গে চারধারে বাজ পড়তে লাগল। বক্তৃতার পর রাত ১০টার কাছাকাছি জগদীশচন্দ্র, লেডী বসু ও আমাকে ফিরতে হবে মোটরে লিনিয়েরের মধ্যেকার এক শালেয়, সেখানেই আমরা থাকবো। (আমার বোন, আমি ও বসুরা মিলে স্যানাটোরিয়ামে খেয়ে নিয়েছি)। জলের তোড়ে ডুবে গিয়ে আমাদের গাড়ি আর এগুতে পারলো না ; ঝড়ের রাত্রে রাস্তার উপরেই অন্য গাড়ি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ; সেটা আনা হলো

টেলিফোন ক'রে। সারা রাত ঝড়ে আমাদের কাঠের পাকা বাড়িটার জানালা আর দেয়াল কাঁপতে লাগলো। পর দিনটাও ডুবে রইল বৃষ্টি আর কুয়াশায়। বন্ধুরা আছেন আমাদের পাশের ঘরে, আমার চেয়ে একটুও বেশি তাঁরা ঘুমুতে পারেন নি। সকাল ৯টায় তাঁরা জেনেভা যাত্রা করলেন, সেখান থেকে যাবেন মার্সেই, তারপর ভারতবর্ষে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (এই সম্মেলনে বলেছেন, কিন্তু দেখা গেল, এক দিক থেকে তা বড়োই চটক্‌দার ও ভাসাভাসা) আমাকে জানালেন, স্বামী সারদানন্দ সম্প্রতি মারা গেছেন (সারদানন্দ রামকৃষ্ণের জীবনীকারদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,) এবং রামকৃষ্ণের এখনো-জীবিত প্রত্যক্ষ শিষ্য হচ্ছেন স্বামী শিবানন্দ,* তিনি কলকাতার কাছে বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট। তাঁর বয়স ৭০ বছর, তাই তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলে বেশি দেরি করা উচিত হবে না।

আমি স্বামী শিবানন্দকে লিখলাম (১২ সেপ্টেম্বর)। রামকৃষ্ণের কাছে যন্ত্রণার সমস্যাটি কি ছিল, বিশেষ ক'রে সে-সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে তাঁকে অনুরোধ করলাম।

"'...রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 'সেবার' প্রশ্ন সম্পর্কে কিছুদিন আগে আমি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েছি (পড়ে শুনিয়েছে আমার বোন); সেখানে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁর গুরুর মতবাদ থেকে,—সমস্ত মানুষের মধ্যে দিব্যের প্রতি তাঁর ভক্তি থেকে—তাঁর মহান্ শিষ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন; এবং ওঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, তবু বিবেকানন্দের মধ্যে আরও অপরিহার্য যা ছিল তা হচ্ছে, বিশ্বজনীন যন্ত্রণা সম্পর্কে—এবং যে অশুভের (mal) বিরুদ্ধে লড়তে হবে বা সান্ত্বনা দিতে হবে তার সম্পর্কে— বেদনা-করুণ ও বীরোচিত গভীর এক আচ্ছন্নতা বোধ (obsession)। যা রামকৃষ্ণকে এক পরমানন্দে, অনন্তে বিশ্বাসের এক হাসিতে পূর্ণ ক'রে রাখতো, সেই বিশ্বজনীন দিব্য দর্শন থেকে এটা কি যথেষ্ট স্বতন্ত্র এক কেন্দ্রীয় বোধ নয়? প্রকৃতি ও সমাজের নিষ্ঠুর অবিচার সম্পর্কে, হতভাগ্য, অত্যাচারিত, নির্যাতিতদের সম্পর্কে —তাঁর মনোভাব কী ছিল? তিনি কি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন না? কিংবা এই কর্মে তাঁর মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি কি যথাযথ ভাবে নির্দিষ্ট করেন নি?"

---

* শিবানন্দের আসল নাম তারকনাথ ঘোষাল: প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের (রলাঁ লিখেছেন 'সান্দ্র সেন'--অনু.) নির্দেশিত ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ব্যক্তিক ঈশ্বরকে মানতে তিনি অস্বীকার করতেন, স্বীকার করতেন কেবলমাত্র নিরাকার ঈশ্বরকেই। রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত ও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন হয়েছিল তাঁকে এইটি বোঝানোর জন্যে যে, ঈশ্বর যদি সর্বত্র ও সবকিছুর মধ্যে থাকেন, তাহলে সেই রূপগুলোর মধ্যেও আছেন, যে-রূপগুলোকে মানুষ তাঁর উপরে আরোপ করে। ১০৮২ সালের কাছাকাছি তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং যে বারো জন শিষ্য তার শেষ দিনগুলোয় পরিচর্যা করতেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ তাঁকে সিংহলে পাঠান, সেখানে তিনি বেদান্ত প্রচার করেন ও অনেককে দীক্ষিত করেন। (রম্যাঁ রলাঁর মন্তব্য)

অক্টোবর, ১৯২৭। স্বামী অশোকানন্দের এক দীর্ঘ ও কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি ; চিঠিটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের বর্তমান অবস্থা ও বড়ো বড়ো সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি সম্প্রদায়ের অবস্থান সম্পর্কে। যথাযথ ও প্রমাণপত্র সম্বলিত, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত একটা পুরো পরিচ্ছেদ ; এটাকে আমার গ্রন্থের ভাবী পরিসমাপ্তিতে কাজে লাগাবো।

৪ অক্টোবর আমি স্বামীজীকে উত্তর দিলাম। তাঁর চিন্তার একটি দিক নিয়ে তর্ক তুললাম। তাঁর বিশ্বাস, আজকের দিনে বৈদান্তিক ও পাশ্চাত্যের কোনো কোনো ভাবনা বা প্রবণতার যে আত্মীয়তা দেখা যাচ্ছে, তা ঘটছে একমাত্র বৈদান্তিক ভাবধারার আধুনিক প্রচারের ফলে। আমি তাঁকে বলেছি, আসলে "এই আত্মীয়তা নির্ভর করছে মানবপ্রকৃতির ভিত্তির উপরে এবং সর্বোপরি বিশাল ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অভিন্ন ভিত্তির উপরে"। আমার মনে পড়ে পাস্‌কালের কথা : "যদি আমাকে না পেতে, তুমি আমাকে খুঁজতে না।"

…"কোনো ভারতীয় গ্রন্থে যখনই এমন কোনো উপলব্ধির কথা পড়ি যা আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করে, আমি তাকে নতুন কোনো চিন্তা ব'লে আবিষ্কার করি না, তাকে আমারই নিজের এক লুকিয়ে-থাকা চিন্তা ব'লে চিনি। এতে দিব্যকে, অনন্তকেই খর্ব করা হবে, যদি ভাবি যে তা এক বাছাই-করা জাতের কতিপয় বাছাই-করা মানুষের হাতের একমুঠো বীজ। মানবতার সকল ভূমিতেই অনন্ত নিজেকেই মুঠো মুঠো ছড়িয়েছেন। বীজ অংকুরিত হবার পক্ষে মাটি সর্বত্র মোটেই প্রস্তুত নয়। এখানে, মাথা তোলে এবং ফলপ্রসূ হয়। ওখানে, ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু বীজ সর্বত্রই আছে। এবং, পর্যায়ক্রমে,—যে ঘুমিয়ে ছিল, সে জেগে ওঠে, আর যে জেগে ছিল, সে ঘুমে ঢলে পড়ে। এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে অনন্তের শক্তি চিরকাল গতিশীল। কোনো একটি জাতি, একটি মানুষ তাকে ধারণ করে না। কিন্তু এ হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত জীবনের অগ্নি,—একই অগ্নি। এবং আমরা বাঁচি তারই ইন্ধন জোগাতে।"

তারপরই আমি চেষ্টা করেছি তাঁকে বিভিন্ন উৎসের রূপরেখা দিতে, যেখান থেকে পশ্চিমে সেই দুটি নীতি আসতে পেরেছে—যাদের তিনি নাম দিয়েছেন বৈদান্তিক নীতি : মানুষের দিব্যত্ব ও জীবনের আত্মিকতা। আমি তাদের খুঁজে পাই কোনো এক বিশেষ অতীন্দ্রিয় খ্রীষ্টধর্মে, গ্রীক সংস্কৃতির একটি অংশে (প্রাচ্যের সঙ্গে গ্রীক সংস্কৃতির বন্ধন ছিল)। আমি তাদের খুঁজে পাই 'ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদের এই উদার উৎস' : সঙ্গীতের মধ্যে, এই অধিবিদ্যা এবং এই চিন্তানিরপেক্ষ ধর্মের মধ্যে', 'এই রহস্য-উদ্ঘাটনকারী 'যোগের' মধ্যে'। 'আপনি যদি তা জানতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, অনন্তে অভিনিবিষ্ট হবার এবং সমাহিত হবার কঠোর শিক্ষাও পশ্চিমের আছে। জে. এস. বাখের এক ধর্মসঙ্গীতের সমুদ্রবৎ বিশাল ঐকতানে নিমজ্জিত এমন জার্মান জনতার চেহারা, পরমানন্দের নিঃশব্দ ও জ্বলন্ত তীব্রতায় ভারতবর্ষের সবচেয়ে সর্বগ্রাসী ধর্মীয় ভক্তির সমতুল্য।'

বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে স্পিনোজা থেকে যে-ধারা এসেছিল এবং এক শতাব্দী পরে গ্যয়টের মধ্যে ও ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান ভাববাদীদের যে-ধারা পুরোপুরি কাজ করেছিল, তার কথাও যোগ করেছি…'বলতে পারা যায়, যে ভাবুকেরা ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের কারো কারোর বিশ্বাসের মৌল ভিত্তি ছিল মানুষের দেবত্ব। যে ত্বরান্বিত ক্রিয়া অবজ্ঞাত ও হিংসাত্মক মানুষের জনতাকে উদ্বেলিত করেছিল, তারই দুর্ভাগ্যে ফরাসী বিপ্লব রক্তে ও রৌপ্যে ডুবে গেলেও,—বিশ্বাসের মৌল ভিত্তি অটুট হ'য়ে ছিল একদল সেরা মানুষের মধ্যে। শিশুকালেই আমি আমার অগ্রবর্তীদের হাত থেকে তাকে গ্রহণ করেছি। আমার ক্ষেত্রে আমি একে হস্তান্তরিত করছি। নিগূঢ়, ধ্যানশীল, শ্রেষ্ঠ ইউরোপ শ্রেষ্ঠ এশিয়ার ভগিনী। দু'জনের মধ্যে একই ঈশ্বরের শোনিত প্রবাহিত। কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দ লড়াইগুলো এশিয়া দেখে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী তার ভগিনী যে-লড়াইগুলোয় অংশ নিয়েছে, দেখে না সহস্রবর্ষের পথটি, যে-পথে সে বীজ ছড়িয়েছে তার রক্তের, তার ঈশ্বরের…'

অক্টোবর, ১৯২৭। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে (সোয়েরাবাজা, ডাচ-ইণ্ডিজ) একটি ছাপা চিঠির কপি পেলাম ; মার্কিন মিস মেওর কুৎসামূলক বইয়ের প্রতিবাদে বালি থেকে সেটা তিনি পাঠিয়েছিলেন 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'।

সোমবার, ২৪ অক্টোবর, ১৯২৭। দিলীপ রায় সম্প্রতি কয়েক মাস ইউরোপ ঘুরে ভারতবর্ষে ফিরছেন, এক অপরাহ্নে থেমে গেলেন ভিলন্যভে। তিনি আমার মনে খুবই ভালো ছাপ ফেললেন,—তাঁর কিছুটা হাস্যকর-সরল, কিছুটা বোলচাল-দেওয়া চিঠিপত্র ও প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে যে ছাপ ফেলেছিলেন, তার চেয়ে অনেক ভালো ছাপ। চমৎকার ছেলেটি—বুদ্ধিমান, সরল এবং কথায় ও ব্যবহারে বিনয়ী, শ্রেষ্ঠ অভিজাত ভারতবর্ষের একটা টাইপ। তিনি হালে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং তাঁর কথা আমাকে অনেক শোনালেন। নির্জনবাসে অরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অনুসরণে আছেন, তিনি আশা করেন তা থেকে মনকে নিংড়ে এক নতুন ক্ষমতা পেতে সক্ষম হবেন, সেটা মানুষের মনে দিব্য ও অনন্ত শক্তির একধরনের প্রত্যক্ষ সংক্রমণ, তাতে দেহ উপকৃত হবে, এবং ফলস্বরূপ তা মানব জাতির এক আকস্মিক আমূল পরিবর্তন (mutation) আনতে সক্ষম হবে, (অবশ্য বৃহত্তর সংখ্যাতে তা সাধারণীকৃত হবে না, উপলব্ধ হবে একদল কুলীন মানুষের মধ্যে)…চিরকাল এই অদ্ভুত স্বপ্ন,—এই মুহূর্তে তা জাগছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেইসব মানুষের মনে, যাঁরা একে অন্যকে চেনেন না, যাঁরা খুবই স্বতন্ত্র, যেমন, আনি বেসান্ত, পল রিশার প্রভৃতি। সেই অপেক্ষিত 'মহামানব' পুরোপুরি নিট্শের অর্থে মহামানব নন, (অরবিন্দ কিন্তু নিট্শেকে

জানেন, এবং তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেন)—অর্থাৎ সেই মহামানব নিহত শিকারের উপরে দাঁড়ানো ‘অট্টহাস্য-করা সিংহ’ নন, তিনি মানুষী ধরনের, নতুন ও উন্নত স্তরের শক্তিসম্পন্ন, তিনি এক নতুন ধাপ টপকে যাবেন, সে-ধাপ বর্তমান মানবতা থেকে ততটা দূরে, যতটা দূরে বর্তমান মানবতা সেই পশুভাব থেকে—যা থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার মনে সাড়া পাই না, এই স্বপ্নাচ্ছন্নতা আমাকে টানেও না ; কিন্তু এক দেশ থেকে দূরবর্তী অন্য দেশে এদের বিকাশকে আমি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের মতোই দেখি ; তা থেকে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এ নিঃসন্দেহে মনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক গোপন নিয়মের সাড়া। স্বাভাবিক বাড়, না রুগ্ন গড়ন ? আমি জানি না। কিন্তু সাধারণ নিয়ম। তাহলে তার পরীক্ষার প্রয়োজন। আগুনের উপর টেস্টটিউব, তরল পদার্থ গেঁজে উঠছে, তা থেকে কী বেরিয়ে আসবে ? অরবিন্দ ঘোষ তাঁর গভীর বৈদিক জ্ঞানকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়েছেন ; মনে হয়, তিনি আগে থেকে ফলাফল ঘোষণা না-করেই নিজেই তাঁর অভিজ্ঞতাকে পর্যবেক্ষণ করছেন ; তিনি এর বিপদ জানেন, কারণ শিষ্যদের তার অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন ; তিনি দিলীপ রায়কে বলেছেন, ‘এমন হতে পারে, আমি এর ফলে পাগল হয়ে গেছি।” কিন্তু তিনি শুধু ভাবেন যে, এই অভিজ্ঞতা এমন এক কর্তব্য, যাকে মানবতার খাতিরে তাঁকে কাঁধে নিতে হয়েছে। (ভারতবর্ষের প্রাচীন অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতোই তাঁর পক্ষে আগ্রহশূন্য হওয়াটা দূরের কথা।) ইতিমধ্যেই তিনি বিশ্বাস করছেন, দেহ সম্পর্কে—নিজের দেহ সম্পর্কে তিনি অস্বাভাবিক শক্তি আয়ত্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করছেন, এখন তিনি নিশ্চিত যে পূর্ণবয়সের আগে অর্থাৎ তাঁর চরম অভিজ্ঞতা লাভের আগে দুর্ঘটনায় বা অসুখে মারা যাবেন না। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ নিয়ে আমার পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি আমাদের উৎসাহের অংশীদার হলেন এবং অরবিন্দের পক্ষে রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তের কী মূল্য তাও বললেন। তিনি নিজে রামকৃষ্ণের স্ত্রীকে (তিনি তাঁর কাছে প্রশান্ত মাধুর্যের শুধু এক স্মৃতি রেখে গেছেন) এবং তাঁর অনেক প্রত্যক্ষ শিষ্যদের জানেন। লন্ডনে বাস করা এক ভারতীয়ের কাছে লেখা তলস্তয়ের একখানি চিঠির কপি তিনি আমাকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাতে তলস্তয় বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সঙ্গীত সম্পর্কেও আলোচনা করলাম। আগের চেয়ে দিলীপ রায় অনেক বেশি খোলা-মনের পরিচয় দিলেন। অন্য সময়ে তিনি এই দাবি করাটা তাঁর জাতীয় (জাতীয়তাবাদী) সম্মানের ব্যাপার ব’লে মনে করতেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত অন্য সমস্ত সঙ্গীতের চেয়ে সেরা এবং একমাত্র ভারতীয়রাই তা বুঝতে পারে। এবং আমি তাঁকে নিশ্চয় ক’রে বলেছিলাম যে, ভারতীয় সঙ্গীত প্রাচীন ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে পৃথক হয়েছে একই বিবর্তনের মাত্রার ফলে। এখন যখন তিনি খুবই সাফল্যের সঙ্গে ভিয়েনায় ভারতীয় সঙ্গীত শুনিয়ে আসছেন, তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর দেশের আর্ট থেকে ইউরোপ ততটা অপ্রতিকার্যভাবে দূরবর্তী নয়। এবং তিনি স্বীকার করলেন, নিজের অজ্ঞাতেই

তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের কোনো কোনো উপাদান তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছেন এবং অ-সচেতনভাবে তাঁর সঙ্গীতে তাদের এনে ফেলেছেন। তিনি নিজের লেখা দুটো গান গেয়ে শোনালেন, সেগুলোর অবশ্যই মাধুর্য আছে। তারপরই গাইলেন কালীবিষয়ক একটি প্রাচীন গান, গানটি ১৯ শতকের বা তারও আগের, আর সেটি বড়ই মর্মস্পর্শী : আবেগের এক গ্রন্থিমোচন,—মিনতি জানাচ্ছে, শোকার্ত হয়ে উঠছে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে, চড়া থেকে খাদে নেমে আসছে, বারে বারে মনে হলো শেষ হচ্ছে, বারে বারে তা নতুন ক'রে শুরু হচ্ছে অতৃপ্ত আনন্দের এক তীব্রতা নিয়ে। এই সঙ্গীতে আমি আরব প্রভাব দেখতে পাচ্ছি ; আর সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে ব'লে মনে হয় না।

২৪ নভেম্বর, ১৯২৭। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে বইটি লিখতে চাই, আজ তা গোছাতে শুরু করলাম : আমার নিজের ধর্মীয় ধারণাগুলো খুলে ধরতে এটা একটা সুযোগ হবে।

ডিসেম্বর, ১৯২৭। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে চিঠি লেখালিখি চলছেই। স্বামী অশোকানন্দের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়, তার সঙ্গে আছে তাঁর যথাযথতা, যেটা প্রাচ্যদেশীয় নয়। খুব বেশী দলিলপত্র দিয়ে প্রমাণ-করা খাঁটি নিবন্ধাবলীর মাধ্যমে তিনি শুধু আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই দেননি, সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। এইভাবেই তো আমি ভগিনী ক্রিস্টিনের চিঠি পেয়েছি, চিঠি পেয়েছি পণ্ডিত বশী সেনের, তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক বর্ণনা দিয়ে আমার জন্যে কষ্ট ক'রে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি এক জায়গায় করেছেন।

১১ ডিসেম্বর, ১৯২৭। 'য়ুরোপ' পত্রিকার তরুণ ও সহৃদয় সচিব জাক্ রবেরফ্রাঁসের সঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক পত্রালাপ।…'য়ুরোপ' পত্রিকায় ঘোষণার জন্যে আমার আগামী রচনার শিরোনামা তাঁকে দিলাম : 'নরদেব : রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মবাণী'।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৭। তরুণ বাঙালী লেখক মনীন্দ্রলাল বসু ও তাঁর আরও তরুণ এক বাঙালী কবি বন্ধু এ. এস. রায়* এসেছেন। (তাঁর কিছু লেখা জার্মান ভাষায় বার্লিনের রেইনহার্ড হ্বাগনেরের : 'ঙ্গেলিশ এলজাবলের'-এ ছাপা হয়েছে।)

---

* অন্নদাশংকর রায়। রলাঁ লিখেছেন 'এ. এস. রাজ'।—অনু.

তিনি বেশ ভালো ফরাসী বলেন ; তিনি বললেন : ভারতবর্ষে লোকে বুঝতে শুরু করেছে যে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে জানতে ইংরেজী জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে অন্তত ফরাসী ও জার্মানকে ঢোকানো দরকার। তিনি শিক্ষিত, বিদগ্ধ। আমার কাছে আর্টের বিবেক সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন রাখলেন। আর্ট কি নিজেকে সামাজিক ভাবনার সেবায় নিয়োগ করবে, না কি তা থেকে দূরে থাকবে ? নৈতিকতা সম্পর্কে তার অবস্থান কি হওয়া উচিত ?···ইত্যাদি। আমার কাছে মনে হলো, প্রশ্নগুলো ঠিকভাবে রাখা হলো না। কারণ কিছুই বিসর্জন দেবার নেই। আমি বুঝি, আর্টকে সবসময় আর্টই থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের বস্তুর মধ্যেও তাকে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে, মহান যুগের ভাস্কররা যেমন আসবাবপত্র ও ঘরকন্নার প্রয়োজনের সামান্যতম বস্তুকেও অলংকৃত করাটা অবজ্ঞা করতেন না। মনীন্দ্রলাল বসুও 'জাঁ-ক্রিসতফ'-এ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ পড়ার জন্যে তাঁর পরীক্ষাপ্রস্তুতির মাসগুলো নষ্ট করেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পী রূপকৃষ্ণ পারীতে থাকা-কালে আমাকে একটা সুন্দর জলরঙা ছবি পাঠিয়েছেন (বাগানে দু'টি ময়ূর)।

১৯২৮

জানুয়ারি ১৯২৮। আমাকে বিস্মিত ক'রে, কিছুটা হতাশ ক'রে গান্ধী মীরা বেনকে (আমাদের বান্ধবী মাডলিন স্লেড) দিয়ে উত্তর দিইয়েছেন (মীরাই তাঁর কাছে বের্তোল* ভাইদের কাহিনী পেঁছে দিয়েছিল) যে, তাঁর কাছে বের্তোল ভাইদের খাঁটি অহিংসার যথেষ্ট বিশুদ্ধ টাইপ ব'লে মনে হয়নি, কারণ তাঁর মতে, তাদের যুদ্ধে যোগ দেবার আপত্তির ভিত্তি ছিল, তাদের পাহাড়ী অঞ্চলে পৈত্রিক ভিটার প্রতি আসক্তি।

যাঁরা সেরা মানুষ, তাঁদের মধ্যে সেই একই সংকীর্ণতা,—তাঁরা বিশ্বজনীন শাস্ত্রবাণীকে পরিমাণে গোষ্ঠীর এক কঠোর বিধিবন্ধ নিয়মে নামিয়ে আনেন !

আমি মীরাকে লিখলাম :

"প্রিয় বোন মীরা, বের্তোল* ভাইদের বিষয়ে তুমি যা লিখছো, তাতে আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছি। শিক্ষাহীন, গুরুহীন, সমস্ত মতবাদ ও দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে অজ্ঞ, স্বভাবজাত বিবেক ও পুরনো বাইবেলের সরল বিশ্বাসের একমাত্র আলোকে চালিত এই সরল চাষীরা, এই নিরহংকার বীরেরা, যারা নিজেদের জানে না, তারা যদি অহিংসার পরম অস্বীকৃতির (Non Acceptation) গুরুর ও তাঁর শিষ্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ না করে, তাহলে গান্ধীবাদী মহৎ চিন্তা যে কোনদিন বাকি মানুষের জগতে ঢুকতে পারবে ও সেখানে ফল দিতে পারবে,

---

* বিবেকবান প্রতিবাদী দুই চাষী ভাই। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যদলে যোগ না দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে রয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হতে হয়েছিল অভিযুক্ত হয়ে।

তার কোনো আশাই নেই। আপসবিমুখ শুদ্ধতার জন্যে ভারতবর্ষের এক আশ্রমের চার দেয়ালের মধ্যে তার আটকে থাকার সম্ভাব্য বিপদ থাকবে। অন্যের মনের সঙ্গে মন মেলাতে হলে, তাদের বিচার করতে হলে, তাদের দিক থেকেই করতে হবে, নিজের দিক থেকে নয়। দিব্য আদর্শের প্রসঙ্গ তুললে, সকল হৃদয়ই দুর্বল, অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ। তাদের মূল্য কেবল তাদের আন্তরিকতায়, এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তায় তা তাদের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখতে যদি তাদের ত্রুটি, তাদের বিচ্যুতি আমাদের বাধা ঘটায়, তাহলে আমাদের ত্রুটি, আমাদের বিচ্যুতির সামনে অন্যেরা তাঁকে কী ক'রে দেখবে? যে-গান্ধীকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, তিনিও ভুল করেছেন। তাঁকে বলবো, কত না বার আমি তাঁর পশ্চিমের অখ্যাত অনুগামীদের উদ্বেগ প্রশমিত করার চেষ্টা করেছি; তাঁর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময়কার আচরণ, তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতার সঙ্গে অহিংসার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা তাদের প্রায়ই অস্বস্তিতে ফেলতো! আমি বিশ্বাস করি, চিরকালের জন্যে ধর্মের যে-মহত্তম বাণীটি উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে সেইটিই—যা প্রতিটি মানুষের দিকে পিতার দুই বাহু বাড়িয়ে দেয়। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রীতির সঙ্গে। র. র.।"

২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮। বান্ধবী মীরা বেন প্রতি সপ্তাহে আমার বোনকে আশ্রমের খবর পাঠায়, তার এক চিঠিতে গান্ধীর এক অতি গুরুতর বিপত্তির কথা জানলাম। (চিঠিটা ১০ তারিখের।) ভারতবর্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর এক সফর থেকে ফিরে তিনি মীরা বেনের কোলে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছিলেন; চিকিৎসকরা বলছেন স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় চতুর্গুণ তাঁর রক্তের চাপ। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাটা তাঁর কাছে এরই মধ্যে কঠিন বোধ হচ্ছে। তাছাড়া তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছেন, "মার্চ মাসে, তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার বার্ষিক দিনটিতে,"—"যদি অন্তত অলৌকিক গোছের কিছু না ঘটে"। তিনি অলৌকিকের সম্ভাবনাকে বাতিল করছেন না, অলৌকিকের ধারণাকে অদ্ভুতভাবে বেঁধেছেন (তা না ব'লে) নতুন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে, সেটা চাপাচ্ছেন জেদীর মতো, এবং সেই ব্যবস্থাপনায় বাতিল করা হয়েছে দুধ আর দুধের বিকল্প সব কিছু। (শুধুমাত্র ফল খেয়েই তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন ব'লে মনে করছেন।) তাঁর কাছে এর মূল্য এক মহৎ অভিজ্ঞতার; এবং এটা সফল হলে সুখের বিষয় হবে। এর মধ্যে তিনি দেখবেন তাঁর অস্তিত্বের এক উপযুক্ত পরিণতি। আমি স্বীকার করছি, মানবতার ইতিহাসে যে-মানুষটি এক বিশেষ মুহূর্তে এক নতুন যুগ উদ্ঘাটনের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে আমি অন্য কিছু, অন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু আশা করেছিলাম। কিন্তু আমি কখনোই ভুলবো না যে, সকল সাধু-সন্তের জীবনেরই ইতি হয়েছে কমবেশি ব্যর্থতায়, যে-ব্যর্থতাকে ঢেকে রেখেছে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উপাখ্যান (স্যাঁ-ফ্রাঁসোয়া), এবং মানবতার পক্ষে

যা সবচেয়ে ফলপ্রসূ, সেরা মানুষের পক্ষে তাই সবচেয়ে ট্রাজিক – (যেমন ক্রুশ। গান্ধী তা পাবেন না, যেমন পাননি বিবেকানন্দ)।

মার্চ, ১৯২৮। গান্ধীকে লেখা আমার ২১ জানুয়ারির চিঠির ফলে লাভ হয়েছে তাঁর কাছ থেকে ১৪ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের এক দীর্ঘ চিঠি। তিনি এখনো খুব ভুগলেও, আমার চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে দিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং (মীরাকে দিয়ে) চিঠিটি একই সঙ্গে ফরাসীতে অনুবাদ করিয়েছেন, তাতে সইও করেছেন। আমি লক্ষ্য করছি, প্রশংসার চেয়ে সমালোচনা করলে গান্ধী বেশি খুশি হন: বলা চলে, তাতে এক গোপন ইন্দ্রিয়গত আনন্দের (volupté) স্বাদ পান, দেহযন্ত্রকে জাগিয়ে-তোলা ও চাঙ্গা-করা ধারাস্নানে (douche) যেমনটি হয়। তাছাড়া, ধরিয়ে দিলেও এই একগুঁয়ে বৃদ্ধটি তাঁর ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র স্বীকার করবেন না। তা নিয়ে টক্কর খেলতে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু মূলত, তিনি একটা গোঁয়ারগোবিন্দ (mulet),—এক সাধু গোঁয়ারগোবিন্দ। তাঁকে বোঝাতে পারা যাবে না, তিনিও বোঝাতে পারবেন না। ইউরোপে আসার জন্যে এবং আমাকে দেখতে আসার জন্যে তাঁকে এক হঠাৎ ও অদম্য-ইচ্ছা পেয়ে বসেছে। আমি স্বীকার করছি—পরীক্ষাটিকে ভয়ের চোখে দেখছি, তাঁর পক্ষেও যেমন, অমোর পক্ষেও তেমনি। (আরও বেশি! কারণ আমাকে ভুল বুঝলে আমার কমই আসে যায়; কিন্তু আমি ভুল বুঝতে চাই না।)

“সবরমতী আশ্রম, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮।

প্রিয় বন্ধু—আপনার শেষ চিঠিটি মীরা আমাকে তর্জমা করে দিয়েছে। আপনার বেদনায় আমার মনটা চলে যাচ্ছে আপনার দিকে. বিশেষ করে যাচ্ছে এইজন্যে যে, এই চিঠির ফলে আপনি আমাকে কঠিনহৃদয় ব'লে সন্দেহ করছেন। আমি যা কিছু করি এবং যা কিছু ভাবি তাতে আপনি আমাকে খাঁটি দেখতে চান, আপনার এই আকাঙ্ক্ষার মূল্য আমি উপলব্ধি করি। আমি খুবই চাই আপনার সঙ্গে একমত হই, কিন্তু যদি আপনার আরও হার্দ প্রীতির যোগ্য হতে চাই, তাহলে আমার প্রয়োজন নিজের কাছে খাঁটি থাকা।

প্রথমেই আপনাকে বলা প্রয়োজন যে, মীরার চিঠিতে তার নিজের দৃষ্টিকোণই প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও তার সঙ্গে আমার দৃষ্টিকোণেরও মিল ঘটে গেছে। সেই দুই সৎ চাষীকে সমালোচনা করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় মীরার (যদি তাকে বুঝে থাকি) বা আমার ছিল না। তাদের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে বীরোচিত। যা আমরা তুলে ধরেছিলাম তা হচ্ছে—যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধীর বীরত্ব; এবং আপনার পাঠানো বর্ণনা, ও মীরা আমাকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সেই অনুসারে আমি সেই বিশেষ বীরত্বের টাইপ দেখছি না, যে-বীরত্ব একজন যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী নিজের জীবনে দেখায়। জান্ দার্ক এক বীরাঙ্গনা ছিলেন। লেওনিদাস ও হোরাসিয়াও

তাই ছিলেন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে বীরত্ব ছিল এক ভিন্ন জাতের, নিজের নিজের এলাকায় তা চিরকালই মহৎ ও প্রশংসনীয়। চাষীরা যে সাড়া দিয়েছে তার মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক নিশ্চিত ঘৃণা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধে চরমতম যন্ত্রণাভোগের এক দৃঢ় সংকল্প আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি আমার স্মৃতি ভুল না ক'রে থাকে, এই চাষীবন্ধুরা সরল ও গ্রাম্যজীবনের প্রতিনিধিত্বকারী ও রক্ষাকারী বীর। উগ্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধীদের টাইপের চেয়ে এই বীরেরা কম মূল্যবান নয়। এই সব বীরত্বই আমাদের রক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বীরদের পক্ষে এবং সত্যের পক্ষে আমরা সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারবো যদি আমরা প্রতিটি টাইপকে পৃথকভাবে নিই। এক অদ্ভুত মিলের জন্যে আপনি ১৯১৪ সালের যুদ্ধে আমার অংশগ্রহণের প্রশ্ন আগেই উত্থাপন করেছেন। এটা সঙ্গত প্রশ্ন। আমার 'আত্মজীবনী'-র শেষ পরিচ্ছেদে আমি এর উত্তর দিয়েছি, যেন আমি আপনার প্রশ্ন আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। দয়া ক'রে মন দিয়ে সেটা পড়বেন এবং অবসর মতো আমাকে জানাবেন আমার যুক্তি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন। আপনার অভিমতকে আমি অমূল্য জ্ঞানে স্থান দেবো। সর্বশেষে, আমি ভালো করেই চাই পূর্ণতায় পৌঁছুতে; কিন্তু আমি আমার সীমাবদ্ধতা জানি এবং সেই জানাটা দিনের পর দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কে জানে, কত না পরিস্থিতিতে আমি কঠিন হৃদয় ব'লে অভিযুক্ত হয়েছি; এবং আমি আশ্চর্য হবো না, যদি আরও একবার আমার লেখায় আপনি বদান্যতার অভাব লক্ষ্য ক'রে থাকেন। আমি শুধু আপনাকে বলতে পারি যে, সে-অভাব আমার লেখায় আছে তার বিপরীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সেই প্রচেষ্টা আমার প্রার্থনায় ধরা থাকে। আমি অনুমান করতে পারি, আদি খ্রীষ্টানরা যে শয়তানকে শুধু এক অশুভ নীতি রূপে দেখেননি, দেখছেন মূর্তিমান অমঙ্গলরূপে, তা অযৌক্তিক নয়। মনে হয়, আমরা যা কিছু করি তাতেই শয়তান প্রাধান্য বিচার করে; এবং তার ক্ষমতা থেকে তাকে হটাতে হবে। এইটেই হচ্ছে মানুষের ব্রত। মীরাকে লেখা আপনার চিঠি আপনাকে চাক্ষুষ দেখতে আমাকে আরও আকাঙ্ক্ষী ক'রে তুলেছে; এক দূরগত বাসনার আভাস আছে যে, যদি স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি এবং, তাছাড়া, যদি অন্তরের কণ্ঠস্বর আমাকে ইউরোপের দিকে নির্দেশ দেয়, তাহলে এই বছরেই আমি তা করতে পারবো। আমি সদ্য দুটি আমন্ত্রণ পেয়েছি, সে-দুটো গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করছি; এও হতে পারে যে, আপনাকে দেখার বাসনা আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করবে।

আন্তরিকভাবে আপনার এ. কে. গান্ধী।"

মীরা যোগ করেছে, "আমন্ত্রণ" এসেছে যুদ্ধপ্রতিরোধীদের আন্তর্জাতিক (কংগ্রেস হবে ২৭-২৮ জুলাই, সনটাগসবেরগে, ভিয়েনায়) এবং বিশ্ব-যুব-শান্তি-কংগ্রেস, ১৯২৮ (কংগ্রেস ১৭-২৬ আগস্ট, হল্যান্ডে) থেকে। এ সম্পর্কে গান্ধী আমার মতের অপেক্ষা করছেন। যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে ইউরোপে পৌঁছুবেন মে মাসে কিংবা আরও কিছু পরে জুনের গোড়ায়। এতে তিনি কংগ্রেসের আগে সুইজারল্যান্ডে কিছু সময় থাকতে পারবেন। (এটা বাদ পড়েনি যে, আগে গান্ধী মার্চের শেষে এবং

এপ্রিলে সিঙ্গাপুর ও মালয় ফেডারেশনের দেশগুলোতে যাবেন। আর মানুষটি এখনো অসুস্থ। মীরা লিখেছে ডাক্তাররা তাঁকে বেশিক্ষণ ধরে কথাবার্তা নিষেধ করেছেন···ইউরোপ যাত্রার আগে তাঁর স্বাস্থ্য বাদ সাধতে পারে এমন ভয়ও রয়েছে।)

(শীঘ্রই তাঁকে দেখতে পাবো সেই আনন্দ জানিয়ে) গান্ধীর চিঠির উত্তর দিলাম (৭ মার্চ)ঃ "···১৬ ফেব্রুয়ারি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় ১৯১৪ সালের যুদ্ধে আপনার অংশগ্রহণের প্রশ্নটি যে খুঁটিয়ে দেখেছেন, আমি ও আমার বোন তা পড়েছি। যদি বলি আপনার চিন্তার মধ্যে ঢুকবার ও তা অনুমোদন করার সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, আমি তাতে সমর্থ হইনি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেনঃ যাঁরা দেশ ও জাতির পবিত্রতায় এবং যুদ্ধের প্রয়োজনের অনিবার্যতায় বিশ্বাস ক'রে তাতে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের আমি খুব ভাল ক'রে মেনে নিতে পারি (এবং এমনকি তাঁদের অনুমোদনও করতে পারি।) যাঁরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, চার বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন, আহত হলে ফ্রন্টে ফিরে যাবার জন্যে সুস্থ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে যাঁদের কাছে বেশি পবিত্র আকাঙ্ক্ষা আর কিছু ছিল না, যাঁরা নিঃসন্দেহে হত্যা করেছেন, আমার এমন কিছু বন্ধু আছেন। বেদনার সঙ্গে কিন্তু প্রীতিভরে তাঁদের হাত—ওই রক্তাক্ত হাত আমি ধরেছি; ওই হাতে হাত রেখেছি; এই হতভাগ্যদের (তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে তাঁরা হতভাগ্য!) আমি আলিঙ্গন করেছি। আমি এটাও বুঝতে পারি যে, যাঁরা জাতিতে বিশ্বাস করেন না, যাঁদের কাছে যুদ্ধ আতংক জাগায়, কিন্তু গুলি খেয়ে মরার চেয়ে একে এড়াবার অন্য কোনো পথ যাঁদের নেই, এবং যাঁদের নৈতিক শক্তি নেই, অসংখ্য সহনাগরিকের চোখে অসম্মানজনক এই আত্মত্যাগকে অবলম্বন করার মতো যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, তাঁরা ভেঙ্গে পড়েন এবং যুদ্ধের খাতায় নাম লেখান। আমি তাঁদের করুণা করি, তাঁদের সঙ্গে যন্ত্রণা ভোগ করি, তাঁদের ভর্ৎসনা করার অধিকার আমার নেই। প্রত্যেককেই তার শক্তি অনুযায়ী সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু যখন আপনার মতো মহৎ সাহসী, পরম বিশ্বাসী মানুষ—যিনি আপসহীন ভাবে মানুষ হত্যাকে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে ধিক্কার দেন, তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন—এবং তাও করলেন স্বেচ্ছায়, অংশগ্রহণে বাধ্য না হয়ে, তখন জগতের কোনো কিছুই আমাকে—শুধু মেনে নেওয়াতে নয়, তা বোঝাতেও পারবে না। এবং আপনি যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন (ক্ষমা করবেন!) সেগুলো ভালো ব'লে মনে হয় না; সাহস ক'রে আমি এখনো বলবো যে, যুক্তি না থাকলে, আপনার কাজটা তবু ভালো বুঝতাম! যুক্তিগুলো বিচার করা যাক! আপনি তিনটি বিকল্পের কথা বলেছেনঃ ১ম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসেবে (স্বেচ্ছায় হোক, কি স্বীকার ক'রে-নেওয়া শক্তির জন্যেই হোক), তার রক্ষণাবেক্ষণে উপকৃত হয়ে, সাম্রাজ্যের মধ্যেই আপনার জাতির জন্যে হোমরুলের আশা ক'রে তার অগ্নিপরীক্ষায়, যেমন তার অবিচারে তেমনি তার দুর্ভোগে অংশ নিতে, তার অপরাধ চোখে দেখতে, আপনি নিজেকে বাধ্য ব'লে বিশ্বাস করেছেন; এবং আপনি ভেবেছেন, বীরের মতো গ্রহণ-করা অমঙ্গল থেকে এক মঙ্গলের আবির্ভাব হতে পারবেঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতিরা

আপনার জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করবে, তখন নিজের মালিক হয়ে আপনার জাতি তার ক্ষেত্রে একমাত্র আত্মিক শক্তির জোরেই সাম্রাজ্যের উপরে ন্যায় ও মানবতার নীতি অহিংসাকে চাপাতে পারবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলী তার উত্তর দিয়েছে। যদি শুধু ফল দিয়েই বিচার করা যায়, এই অতি-রাজভক্তিমূলক সুবিধাবাদে কোনো কাজই হয়নি। কিন্তু যদি তা বাস্তব সাফল্যের দিকে, আপনার জাতির স্বাধীনতা স্বীকৃতির দিকে নিয়ে যেতো, হে বন্ধু, আমাকে অকরুণ ভাবে আপনাকে একথা বলার অনুমতি দিন: এই মূল্যে—লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তাক্ত আত্মাহুতিতে অংশগ্রহণের মূল্যে পাওয়া এক স্বাধীনতা হতো ঈশ্বরের কাছে এক অপরাধ। এবং ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী তার রক্ত ললাটে মেখে থাকতো। সেই রক্ত ভগবানের সামনে তাকে অভিশাপ দিতো। ২য়, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের বয়কট; তাকে বাস্তবে পরিণত করা যায় না ব'লে আপনি (সঙ্গত অধিকারেই) মনে করেছেন। ৩য়, ব্যক্তিগত আইনঅমান্য, তার সঙ্গে জড়িত কারাগারের যন্ত্রণা। আপনি এর কথা শুধুই বলেছেন, এখানে দাঁড়িয়ে যাননি। কেন? আমি তা বুঝতে পারি না। যথেষ্ট নাও যদি হয়, তিনটি বিকল্পের মধ্যে একমাত্র এইটি আমার কাছে নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়েছে। এবং অন্য বহু ক্ষেত্রে—সোজাসুজি ইঙ্গিত না না দিয়ে, বিনা বাক্যে, বাস্তব ফলাফল হিসাব না ক'রে—আপনি একে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন একমাত্র বিবেকানুমোদিত পন্থা ব'লে, যে-পন্থার জবাবদিহি শুধু ঈশ্বরের কাছে। "সবচেয়ে বড়ো অপরাধের" সময়ে: কসাইখানায় অসৎ নেতাদের ঠেলে-দেওয়া মানুষগুলোর পরস্পর এই গলাকাটাকাটির সময়ে, আপনি কেন তার প্রয়োগ করেননি? আমি তা বুঝতে পারি না! আমাকে যা পীড়িত করে তা এই যে, রাজনৈতিক নেতারা তাদের জঘন্য অপরাধের কাজে—এশিয়া ও আফ্রিকার যে-হতভাগ্য মানুষগুলোকে তারা শোষণ করে, ইউরোপের মাংসপিণ্ডের চেয়ে কম মূল্যবান বস্তু হিসেবে যাদের ব্যবহার করে, নিজেদের হীন স্বার্থের যুদ্ধের জন্যে, তাদের কামানবন্দুকের খোরাকের জন্যে সেই সব হতভাগ্যদের সংগ্রহের কাজে—আপনার দৃষ্টান্তটি এক অনুমোদন, এক নীরব সম্মতি ব'লে ব্যবহার করতে পারবে,—ব্যবহার করবেই। আমি খোলামনে আপনাকে লিখছি। আশা করি শীঘ্রই এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা পরিষ্কার করতে পারবো। এই স্বপ্নে আমি আনন্দিত যে, ইউরোপ এই বছরেই আপনাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে,—আমিও পাবো।"

মার্চ, ১৯২৮। গান্ধী তবুও ইউরোপে আসার কথা খুবই ভাবছেন। কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে দেখা এবং আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা। আর সবই আনুষঙ্গিক। এই অবস্থায় আমার কিছুটা গর্ব হওয়া উচিত ছিল। এ আরও আমাকে গুরুভার এক দায়িত্বের বোধ জাগিয়ে দিয়েছে; ভয় হয় গান্ধীর মধ্যে আমি যে-আগ্রহ জাগাতে পেরেছি তা একটা ভুল বোঝাবুঝিতেই না দাঁড়িয়ে থাকে। এর অপব্যবহার করাটা আমার কাছে বেদনাদায়ক

হবে। তাঁর "মার্থা ও মেরি" মীরা বেন (মিস স্লেড) আমাকে যা লিখেছে তা এই (১৬ মার্চ, ১৯২৮, সবরমতী আশ্রম):

"আমার প্রিয় ভ্রাতা,—আপনি লেখার পর থেকে, এই চার সপ্তাহ ধরে বাপু (গান্ধী) তাঁর ইউরোপ সফরের বিষয় নিয়ে অনেক ভেবেছেন। এবং এখন তিনি চাইছেন, তিনি মনের মধ্যে যা খুঁজে পেয়েছেন তা আপনাকে ব্যাখ্যা করি। এখনো পর্যন্ত তিনি মনস্থির করতে পারছেন না, এখানে তাঁর কাজ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের আগে এক মুহূর্তের জন্যেও ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে মঙ্গলকর হবে কি না। কত কিছু ভাববার আছে—এবং তারপর, তিনি যদি যাবার সিদ্ধান্তও করেন, শেষ মুহূর্তে সম্ভবত তাঁর সামনে আসবে নৈতিক বাধা—দৈহিক বাধাও। কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে বাপু চান, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি, তাঁর পক্ষে সম্মেলনগুলোর প্রশ্নটি গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ। তিনি বিশেষ ক'রে প্রভাবিত হয়েছেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার গভীর আহ্বানে। আহ্বানটি সবসময়েই ছিল। আপনার সর্বশেষ পত্রালাপের পর থেকে এখন কিন্তু তা হয়ে উঠেছে আদেশমূলক। কথাটা যদি আপনার মনে ধরে, বাপু কিছু সময় আপনার পাশে থাকতে চান, যাতে আপনাদের মধ্যে একেবারে মূলে পর্যন্ত বোঝাপড়া হয়, একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন, এবং সামান্যতম ভুল বোঝাবুঝিও চিরকালের জন্যে দূর হয়ে যেতে পারে। তিনি তাই আপনার মতামত জানতে চাইছেন; এবং যদি কথাটা আপনার পছন্দসই হয়, মে মাসের শেষ দিকে তিনি সুইজারল্যান্ডে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁকে আপনার উপদেশ দেবার সময়, আরও একটা জিনিস ভাববার আছে: বাপু যদি ইউরোপে যান, তিনি নিঃসন্দেহে সব দিক থেকে আমন্ত্রণ পাবেন। অন্য দেশের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁর পছন্দ নয়, বস্তুত তিনি বলেন যে, যদি ইউরোপে যান প্রায় সর্বত্রই তাঁর যেতে ইচ্ছে হবে। তিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সেটা ভালো হবে ব'লে আপনি মনে করেন কি না, এইভাবে তিনি আপনাদের যৌথ স্বার্থের প্রকৃত সাহায্যে আসতে পারবেন কি না? এও হতে পারে যে, বাপুর চিঠির (১৪-২-২৮ তারিখের) যে উত্তর এই মুহূর্তে আসার পথে, তাতে আপনি আমাদের এ বিষয়ে আপনার মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন, এবং তা পড়ে বাপু তখন তখনই একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন এটা আরও নিশ্চিত হোক, তাহলে এই চিঠি পেয়েই দয়া ক'রে একটা তার করবেন। এই চিঠি বাপুকে পড়ে শুনিয়েছি এবং তিনি এ অনুমোদন করেছেন। এখন আর দু'চার কথা লেখারও সময় নেই! কিন্তু কথায় বুঝিয়ে না বললেও আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন আমার মনে কি আছে। সব কিছুই ঈশ্বরের হাতে।

আপনার মীরা।"

আমি তখনই উত্তর দিলাম (৩১ মার্চ) ঃ

“প্রিয় বান্ধবী, – তোমার ১৬ মার্চের চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা আমার সামনে একটা প্রকৃত ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপার দাঁড় করিয়েছে। তুমি জানো গান্ধীকে দেখে আমার কি আনন্দ হবে। কিন্তু গান্ধীর ইউরোপে আসার প্রধান উদ্দেশ্য যদি আমাকে দেখা হয়, তবে আমি বলতে ইতস্তত করবো না ঃ “না ! এটা বাড়া-বাড়ি। এটা ঠিক নয়। আর বাস্তবিক এটা খারাপ হবে, যদি গান্ধী আমার জন্যে ভারতবর্ষে তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ রাখেন।” আবার ভয় হচ্ছে, তুমি আমার সম্পর্কে হয়তো গান্ধীকে এমন ধারণা দিয়ে রেখেছো যা ঠিক ঠিক নয়। আমি হচ্ছি, সকলেই তা জানে—শান্তির আদর্শ ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বমূলক মিলনে গভীর প্রত্যয়ী। যখন প্রয়োজন হয়েছে, তাদের জন্যে, আমার স্বার্থ ও আমার শান্তি বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু একমাত্র শান্তির জন্যে সামাজিক কর্মের জন্যে আমি শপথ নিইনি। একাংশে, আমি আমার মতো ক'রে ধার্মিক প্রকৃতির,—যে-প্রকৃতি স্বাধীন। অন্য অংশে, আমি ইউরোপের একজন বুদ্ধিজীবী, এক শিল্পী—যার মুখ্য প্রচেষ্টা সৃষ্টির দিকে, সমস্ত মানবহৃদয়ের জীবন্ত উপলব্ধির দিকে পরিচালিত। বুঝবো এবং আলোকপাত করবো, —নর ও নারীর, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন জাতের মনকে বেঁধে এক ধরনের খিলান (arche) হয়ে উঠবো – এইটিই আমার মুখ্য ভূমিকা ব'লে মনে করি। সব কিছুকে বুঝতে সব কিছুকে ভালবাসা চাই। আমার ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে একটা দৃষ্টান্ত ঃ গয়েটের প্রতি আমার এক গভীর শ্রদ্ধা, মনে মনে পুজো করার ভাব আছে। গান্ধী কি চিন্তার এই ভঙ্গিটি মেনে নিতে পারেন ? তাই আমার ভয়, গান্ধী যদি আমার জন্যেই ইউরোপে আসেন, আমি যেন এক বিরাট আশাভঙ্গের কারণ না হই ; — আর সেটাই যে-কোনো মূল্যে আমি এড়াতে চাই। কিন্তু আমি জানি যে আসাটা ইউরোপের পক্ষে অসম্ভব উপকারী ও হিতকর হতে পারবে। এবং তা আমার কাছে —আমাদের কাছে, আমার ও আমার বোনের কাছে হবে এক গভীর আনন্দ। খুবই তড়ি-ঘড়ি তোমাকে লিখছি। এর মধ্যে দেখো আমার পরম সত্যের প্রয়োজনকে এবং আমার আকাঙ্ক্ষাকে—যেন গান্ধী পরিচ্ছন্ন বিবেকে সিদ্ধান্ত নেন।”

এপ্রিল, ১৯২৮। যুদ্ধের প্রশ্ন সম্পর্কে গান্ধীকে যে চিঠিগুলো লিখেছি তাতেই তিনি বেশি মগ্ন হয়ে আছেন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তিনি তাঁর ১৯১৪ সালের ধারণা পরিষ্কার করতে মন ঠিক করছেন না ; – ইউরোপে আসবেন কি না সে-সম্পর্কে অনিশ্চিত, আমাকে দেখতে ইচ্ছুক, কিন্তু অপেক্ষা করছেন আমি যেন তাঁকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করি (তা আমি মোটেই করতে পারি না, কারণগুলো আগেই বলেছি)। আমি তাঁকে লিখলাম ঃ

—“…আপনি ভালো করেই বুঝবেন যে, শেষ চিঠিটা লিখতে যা আমাকে তাগিদ দিয়েছিল, তা এক নৈতিক খুঁতখুঁতি ; পাছে কম হয়ে যায় ব'লে আমি তাকে বাড়িয়ে বলার দিকে ঝুঁকেছিলাম। আপনার মতো সরল লোকের জানা আছে,

আসলে যে যা—তার চেয়ে নিজের সম্পর্কে এক পৃথক ধারণা দেওয়ার বিপদে পড়াটা কত বেদনাদায়ক, এমনকি, সে-ধারণা যদি, যে যা—তার চেয়েও উচ্চস্তরের হয়, এবং বিশেষ ক'রে উচ্চস্তরের হয়।

আমি আপনার মতো মানুষ নই, যার আন্তরশক্তি কর্মে রূপ পায়—(যদিও আমার কর্ম চিরকাল আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে), কিন্তু আমার জীবনের সারবস্তু আমার চিন্তার মধ্যে। সত্য চিন্তা করা, স্বাধীন চিন্তা করা আমার পরম আবশ্যকতা, আমার অপরিহার্য প্রয়োজন, আর সেই ভূমিকাই আমার জন্যে নির্দিষ্ট। আমি কখনো এ চেষ্টা থেকে বিরত হইনি। জানার, বোঝার এই আবশ্যকতা,—(ভালো না-বাসলে কেউ বুঝতে পারে না), সত্যের জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ছায়াচ্ছন্ন (কিন্তু আলোছায়াচ্ছন্ন) এক অতি গভীর ধর্মীয় সহজাত সংস্কারের সাড়া জাগিয়েছে, এবং তা সর্বক্ষণই হয়ে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল। ব্যক্তি হিসেবে আমি যতো পরিণতির দিকে যাচ্ছি, ততোই নিজেকে ঈশ্বরে পরিপূর্ণ মনে করছি। বিশেষ ক'রে আমি তাঁকে উপলব্ধি করি সৌন্দর্য ও সত্যের মধ্যে। আমি জানি তিনি এ ছাড়িয়ে। কিন্তু আমি তাঁর স্পর্শ পাই, স্বাদ পাই, তাঁরই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস নিই। এইভাবে, পাশাপাশি হলেও, আমার দিব্যের ক্ষেত্র আপনার ক্ষেত্র থেকে পৃথক। কিন্তু তাদের মালিকানা একই প্রভুর। তারা তাঁর রক্ত ও মাংসের। আপনাকে দেখলে, আপনার কথা শুনলে আমাদের কী আনন্দই না হবে; তবু আমি এই বিশ্বাসই ক'রে চলেছি যে, শুধু এইজন্যেই ইউরোপে এলে সেটা ঠিক ও ভালো হবে না। কিন্তু আপনি ইউরোপীয় যুবশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে এলে সেইটেই হবে ঠিক, সেইটেই হবে ভালো; তাদের প্রয়োজন রয়েছে আপনার সাহায্যের, আপনার উপদেশের, আপনার আলোর। আর যাই ঘটুক না কেন, এইটেই দরকারী, (আপনি ইউরোপে আসুন আর না-আসুন) এইটেই অপরিহার্য যে, যে-জগৎ আপনার কথা শোনে তার জন্যে আপনি পুরোপুরি পরিষ্কার, যথাযথ ও স্পষ্টভাবে আপনার মতবাদ, যুদ্ধ ও না-গ্রহণ (Non-Acceptation) সম্পর্কে আপনার প্রশ্নটি নির্দিষ্ট করবেন। আমাদের দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে। যে-কোনো দিন আমরা চলে যেতে পারি। যাদের আগামী অর্ধশতাব্দীর ভয়ংকর বোঝা বইতে হবে, জগতের সেই যুবশক্তির জন্যে দরকার হচ্ছে এক যথাযথ শেষ ঘোষণাবাণী (testament) রেখে যাবার। আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের সামনে দারুণ অগ্নিপরীক্ষা। আমার আর সন্দেহ নেই যে, এমন এক ধ্বংসের সময়, এমন এক বিশ্বযুদ্ধের কাল ঘনিয়ে আসছে যার কাছে অতীতের যুদ্ধগুলো ছেলেখেলা ব'লে মনে হবে, রাসায়নিক যুদ্ধে কতো যে মানুষ মুছে যাবে। যে-দানবকে আমরা এড়িয়ে যাবো, তার মুখোমুখি যারা পড়বে তাদের জন্যে কোন নৈতিক বর্ম অ্যমরা রেখে যাবো? স্ফিংস রাক্ষসীকে তখন তখনই কোন্ উত্তর দেওয়া হবে? সে তো অপেক্ষা করবে না। নির্দেশ-বাক্যটি (mot d' ordre) কি হবে? আমাদের কথা যেন দ্ব্যর্থবোধক না হয়। দুঃখের কথা, সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে খ্রীষ্টের, যাঁর গ্রন্থের ধর্মবাণীর মধ্যে এমন

এতো বেশি অংশ আছে, যা মূলত স্ববিরোধী না হলেও, দেখতে স্ববিরোধী এবং তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধর্মধ্বজীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যার সুযোগ দেয়। গত যুদ্ধের সময়ে সব দেশে দেখা গিয়েছে কিছু ভণ্ড, কিছু গোঁড়া, লয়েড জর্জের মতো রাষ্ট্রনেতা, বিশপ, প্যাস্টর, ভুয়ো ভক্ত, খাঁটি ভক্ত—যুদ্ধ, প্রতিশোধ ও পুণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রচারে নব-বাইবেলের অমুক-তমুক কথার সাক্ষী মানছে। আগামী সংকটের দিনে গান্ধীর চিন্তায় কোনো সন্দেহ এলে চলবে না। এবং অন্যদিকে নির্দেশের সমস্ত ফলাফল বিচার করতে হবে ও যাদের উপর তা ন্যস্ত করা হবে, তাদের শক্তিও বিচার করতে হবে। সামনে যে অগ্নিপরীক্ষা, সে-সম্পর্কে ইউরোপের তরুণরা সচেতন। আশু বিপদ সম্পর্কে তারা প্রতারিত হতে চায় না ; অনেক 'শান্তিবাদী' এই বিপদকে না-দেখার চেষ্টায় আছে, তাদের মন থেকে একে সরিয়ে রাখছে। যারা এর মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়, তারা জানতে চায় : 'গ্রহণ না-করা কতদূর পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও মানবিক ? শুধু নিজের সম্পর্কেই নয়, যা-কিছু আমাদের ঘিরে আছে, যা-কিছু আমাদের উপরে নির্ভরশীল, তাদের সম্পর্কে কোনো বাদবিচার, কোনো পরোয়া করা চলবে না ? আর বিশ্বস্ত বিবেকে আমরা কি আশ্বাস দিতে পারবো, এই সর্বাঙ্গীন আত্মত্যাগ আগামী কালের মানবতার যন্ত্রণার বোঝা হাল্কা করতে পারবে, না কি, এই আত্মত্যাগ তাদের নিয়তিকে বাধাবন্ধনহীন বর্বরতার হাতে ছেড়ে দেবার ঝুঁকি নেবে ?' তরুণদের মনে যে-সব প্রশ্ন জাগছে এখানে (তাদের কয়েকটি) রাখলাম। আমি কোনো উত্তর এখানে দিচ্ছি না। এ আমার ব্যাপার নয়। আমার গুরুত্ব গৌণ, গুরুত্ব থাকলেও তা আপনার পরে। বিশুদ্ধ চিন্তার মানুষদের (বুদ্ধিগত অর্থে) বর্তমানের উপরে প্রভাব দুর্বল ; একমাত্র কালপ্রবাহেই তাদের দূরদর্শিতার ফল ফলার সুযোগ হবে। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সক্রিয় বিশ্বাসের মানুষ, আপনি শাশ্বত শক্তি ও বর্তমান আন্দোলনগুলোর মধ্যস্থ। আপনি রয়েছেন হালে, এই ঝড়ের মধ্যে এই মুহূর্তে নাবিকদের তরীর গতিনির্দেশ করার ক্ষমতা আপনারই। সেই নির্দেশ দিন! যে-বন্দর ছেড়ে এসেছি তার কথা আর ভাববো না—(১৯১৪ সালের সেই যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা একমত হতে পারবো ব'লে মনে হয় না, আর তা আমাদের আলোচনা জটিল ক'রে তুলছে)—যে-বন্দরে পৌঁছুতে হবে তার কথাই ভাববো, ভাববো ভবিষ্যতের কথা! প্রিয় বন্ধু, আপনাকে এমন খোলাখুলি বলার জন্যে ক্ষমা চাইছি। নৈতিকতায় আমি যে নিচু তা আমি জানি, আপনার পায়ের ধুলো নেবার যোগ্য আমি নই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ইউরোপে যে-উদ্বেগ, যে-সন্দেহ চেপে বসেছে, তা আমার জানা। তারই কণ্ঠস্বর আপনাকে পৌঁছে দিলাম…"

মে, ১৯২৮। আমার বইগুলো সম্পর্কে (বিশেষ ক'রে সেই প্রাচীন 'জাঁ-ক্রিস্তফ' সম্পর্কে) সমস্ত দেশ থেকে প্রায়ই হৃদয়গ্রাহী যে-সব চিঠি পাই, তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে যে একটিকে তুলে দেওয়া আগ্রহজনক মনে করি, সেটি এসেছে

এক তরুণ ভারতীয়ের কাছ থেকে। জাপানী তরুণদের কাছ থেকে প্রথম যে চিঠিগুলো পেতাম, তাদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। (চিঠিটা লেখা ফরাসীতে) ঃ

‘কলকাতা, ১৪ এপ্রিল,—শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু,—আমি বাংলাদেশের এক তরুণ, বয়স মাত্র কুড়ি ; আপনাকে অভিনন্দন জানাবার মতো কয়েকটি কথা লিখতে সাহস করেছি, যদিও ভালো করেই জানি যে, আপনি এরই মধ্যে যে গৌরবে মণ্ডিত হয়ে আছেন, এরা তা বাড়াবার পক্ষে বড়োই অকিঞ্চিৎকর। আপনার গ্রন্থগুলোর গুণ সম্পর্কে তর্ক করার সাহস আমার নেই। কিন্তু আপনার ‘জাঁ-ক্রিস্তফ’ পড়েছি এবং আমি শুধু বলতে পারি, তা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। আমি যেন ক্রিস্তফের মধ্যে নিজের চিন্তাই পড়েছি- এবং আমি দাবি করছি, আপনি যা এঁকেছেন তা আমারই জীবন। সন্দেহ ও প্রেম আমার যে মনটিকে উদ্বেলিত করে তাকে আপনি কেমন ক'রে অনুভব করলেন ? যে দূরত্ব আপনার ও আমার মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে রেখেছে, তার বোধ আমার নেই। মনে হয়, আপনি যেন আমার পাশেই বসে আছেন, আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলছেন। আমার অটো, আমার মিনা, আমার রোজা, সাবিনে, আদা, গ্রাজিয়া, আঁতোয়ানেৎকে এবং সর্বোপরি আমার অলিভিয়েকে মনে জাগে ; মনে জাগে অন্য মুখগুলো, যারা আমার স্মৃতির বিষন্ন জ্যোৎস্নায় তারার মতো ঝকমক করে। কিন্তু সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেন। ‘নতুন দিন’ আমায় আশায় ভরে তুলেছে সোপেনহাওয়ার ও টমাস হার্ডির ‘অন্ধ ইচ্ছা’ আমাদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে, যেমন ক'রে পাহারাদার চালিয়ে নিয়ে যায় আর্তনাদ-করা পশুপালকে। অন্ধ খামখেয়ালির পায়ে আমাদের মাথা নত করতে হয়। হে বন্ধু, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমার ভাবকে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, বিশেষ ক'রে আমার ফরাসী ভাষার জ্ঞান তা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার গ্রন্থগুলো, সর্বোপরি ‘জাঁ-ক্রিস্তফ’-এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানবতাকে আপনি যে সহানুভূতিমাখা সান্ত্বনা পাঠিয়েছেন, তার জন্যে সর্বশেষে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখানে শুনতে পাচ্ছি, আপনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক জীবনী লেখার কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনার ‘বিঠোভেন,’ ‘মাইকেল এঞ্জেলো’ ও ‘তলস্তয়ের’ মতো নিঃসন্দেহে সেটি অতি চমৎকার ভাবে লিখে উঠবেন,…হিরন্ময় ঘোষাল।’

৯ মে, ১৯২৮। ‘রামকৃষ্ণ’ লেখা প্রাথমিকভাবে শেষ হলো (আমার শুরু করা গ্রন্থের ১ম খণ্ড ; ২য় খণ্ড উৎসর্গিত বিবেকানন্দের উদ্দেশে)।

১০ মে, ১৯২৮। বোম্বাইয়ের বিরাট শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই এসেছেন। জেনেভা থেকে মোটরে এসেছেন তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁর শ্যালিকা, তাঁর আট ছেলেমেয়ে,

তাঁদের গুরু এবং দু'জন চাকর ; মোটরে ধরা কষ্টকর। এই খুদে বাহিনীতে লিঅনেৎ ভিলা বোঝাই হয়ে উঠল, উপচে উঠল। বাচ্চাগুলো অবশ্য সুন্দর (৩টি মেয়ে ও ৫টি ছেলে) এবং বাপমায়েরা ভদ্র। সারাভাই রবীন্দ্রনাথ ও এন্ড্রুজের পরিচয়লিপি নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক, গান্ধীর আশ্রম তাঁর বাড়ি থেকে তিন মাইলের মধ্যে, নদীর অপর পাড়ে। এবং তাঁর বড়ো মেয়েকে সামনের বছরে আশ্রমে ঢুকতে হবে শিক্ষার জন্যে। কিন্তু সুতাকলের এই বিরাট মালিক ও পরিচালকটি গান্ধীর নিষেধ জারিতে বিব্রত বোধ করছেন, গান্ধী তাঁকে দোকান বন্ধ করতে, অন্ততপক্ষে বিলাসবস্ত্রে তাঁকে সীমাবন্ধ থাকতে বাধ্য করতে চাইছেন, যাতে খাদিশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না হয়। এবং বুঝতে পারা গেল, একে আমল না দিতে তিনি পুরোপুরি মন ঠিক ক'রে ফেলেছেন। আমাকে দেখতে ইউরোপে গান্ধীর আসার কথা ওখানে সবারই জানা ; সবারই বিশ্বাস যে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। রবীন্দ্রনাথের তরুণী পুত্রবধূ (belle-fille) সম্পর্কে খারাপ খবর, মনে হচ্ছে তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে এবং চিকিৎসার জন্যে সুইজারল্যান্ডে আসছেন।

মে, ১৯২৮। মীরা বেনের ২৭ এপ্রিলের এক চিঠিতে লেখা হয়েছে যে, গান্ধী আমার ৩১ মার্চের চিঠি পেয়েছেন এবং তাতে তিনি ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে তিনি যা ভাবেন তা অবশ্য এই সপ্তাহের 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। তিনি তাই এ বছর ইউরোপে আসা বাতিল করলেন ; কিন্তু এর জন্যে তিনি আমাকে আরও শ্রন্ধা করছেন। আগামী বছর তিনি আসার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, আমাকে দেখতে আসার যে-ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন তার বাইরে এই ইউরোপ সফরের ব্যাপারে তিনি অনিশ্চিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন : তিনি বুঝেছিলেন, যে-বিশ্বজনীন বার্তা তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে, তা এখনো তৈরি নয়, কিংবা, ইউরোপের কাজে লাগার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভারতবর্ষে তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। সে যাই হোক্, তাঁর আসাটা শেষমুহূর্তে বাতিল হয়ে গেছে এক আকস্মিক শোকের আঘাতে : তাঁর অতি প্রিয় সঙ্গী এবং চিন্তার উত্তরাধিকারী পৌত্র মজনলালভাই গান্ধীর মৃত্যুতে। তাঁর পক্ষে এক এ নিদারুণ আঘাত। উত্তেজনায়, অত্যধিক কাজে, অকথ্য গরমে তাঁর আগে-থেকে-এতো-ভেঙে-পড়া স্বাস্থ্যের অগ্নিপরীক্ষা চলছে। তাঁর সুহৃদরা অত্যন্ত চিন্তিত, কিন্তু তাঁর জন্যে কিছুই করতে পারেন না। এখন গান্ধী ঠিক করেছেন গ্রীষ্ম সত্ত্বেও আশ্রম ছেড়ে যাবেন না।

৭ আগস্ট ১৮২৮। দু'জন ভারতীয়ের আগমন ; একজন গান্ধীর অতি-তেজস্বী অনুচরদের অন্যতম, ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা, বিহারের রাজেন্দ্র-

প্রসাদ ; অন্যজন তাঁর পাঞ্জাবের সঙ্গী ভাই বালমুকুন্দ। দুঃখের বিষয় দু'জনেই শুধু ইংরেজী বলেন এবং বোঝেন ; আর আমার বিশ্বস্ত দোভাষী বোনটি অনুপস্থিত ; কেউ কারুর বক্তব্য বোঝাতে পারছি না। দিনের শেষে কুল্লে পেলাম এক "নার্স'কে", তাঁর ইংরেজি জ্ঞান বড়োই কম, ভালো ক'রে না বুঝেই তিনি আমাদের প্রশ্নোত্তর তর্জমা করতে লাগলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের বয়স ৪৩, ধাঁচাটা সুন্দর ধারালো, ছিপছিপে, গর্বিত খাড়া নাক ; সবসময়ে মাথায় আছে লাল উঁচু ফেজ। বালমুকুন্দের পাঞ্জাবের অতিসাধারণ ঘরের, ফ্যাশানবিরুদ্ধ ধাঁচা ; কিন্তু দু'জনেরই আদবকায়দায় বিশিষ্টতা আছে, মিষ্টি ক'রে, সুবিবেচকের মতো কথাবলার কায়দা আছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের কপালে তুলোর ব্যান্ডেজ বাঁধা। তিনি সম্প্রতি গ্রাজে এক ক্ষিপ্ত অস্ট্রিয়ান জাতীয়তাবাদীর ডান্ডায় আহত হয়েছেন ; লোকটি একই ভাবে এক মহিলাকে (শ্রীমতী স্টান্ডেনাঠ্) আহত করেছে, তিনি অতিথিকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগে ভিয়েনার কাছে সোন্‌টাগসবেগে' 'যুদ্ধবিরোধী লিগের আন্তর্জাতিক' কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ; ইউরোপে এই প্রথম তিনি এখানে গান্ধীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং অস্ট্রিয়ান জাতীয়তাবাদীদের এই মারাত্মক উস্কানি তাদের মনের আমুল পরিবর্তনের এক পীড়াদায়ক লক্ষণ ; এই মুহূর্তে তা অস্ট্রিয়ায় কাজ করছে সরকারের চতুর মদতে। প্যানজার্মানিবাদের বিপুল বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে ভিয়েনায় সদ্য শুবার্টের উৎসব হয়েছে, দুই দেশের সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আগেভাগেই অন্তর্ভুক্তিকরণ (Anschluss), অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সংযুক্তিকরণের ঘোষণা করা হয়েছে। এবং বৃহত্তর জার্মানীর এই পুনর্গঠনের ফলে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে ধর্মধ্বজী, রাজতন্ত্রপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা আর একবার সেখানে ঢুকে যাবে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার চতুর ও প্যাঁচালো সরকার যুদ্ধপূর্ব যুগের অস্ট্রিয়ান কূটনীতির কপটতার ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছে, অন্যান্য বুর্জোয়া সরকারগুলোর সঙ্গে মিলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঐকতান জুড়ে দিয়ে প্রতিশোধকামী জাতীয়তাবাদের সমস্ত ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে নিজেকে কাটান দেওয়াতে শিখেছে।

২৯ আগস্ট, ১৯২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে ও ছেলের স্ত্রী প্রতিমা একদিনের জন্যে বির্ হোটেলে ছিলেন। আমাদের সঙ্গে দুপুরে খেতে এলেন। তাঁরা আমাদের জন্যে নানা রকমের উপহার, ভালো কাপড়, পুরনো বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি এনেছেন। তাঁদের ছোট্ট পালিতা কন্যাটি ঠাকুর্দার একটা গান গেয়ে নাচলো। অস্ট্রিয়ায় প্রতিমাকে একটা কঠিন অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে ; গত বারের সফরের সময়কার চেয়ে এবার তাঁকে ভালো মনে হলো। রবীন্দ্রনাথের সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। দু'জনেই প্রীতি জাগিয়ে তোলেন।

৩০ আগস্ট, ১৯২৮। দুপুরে খেতে এবং কিছুটা সময় কাটাতে এসেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ পন্ডিত বশী সেন। মুখখানা উদ্দীপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল, বুদ্ধিতে

উদ্ভাসিত, অত্যন্ত আকর্ষণীয়ঃ নিগ্রো-ইতালীয় টাইপ, কালো চাঁচড় চুল, যেন নৃত্যপর কৃষ্ণ। তিনি বছরের অর্ধেক কাটান হিমালয়ের আলমোড়ায়, অপর অর্ধেক কলকাতায়। একই সঙ্গে তিনি তাঁর ধর্মীয় সত্তা ও ল্যাবরেটরির কাজকর্ম বজায় রেখে চলেন (তিনি জগদীশচন্দ্রের ছয় বছরের ছাত্র)। (সম্প্রতি প্রোটোপ্লাজমের উপরে তাপের প্রভাব সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।) ১৯১৯ সালে বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্যের (এক স্টেশন মাস্টার) হাতে দীক্ষিত হন, তিনিই তাঁর গুরু। একটা সময়ে যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ছেড়ে দেবার লোভ হয়েছিল, তখন যিনি তাঁকে তা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মানন্দঃ কারণ তাঁর নিজস্ব মৌলিক মানসিক শক্তির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে তাঁর আরও পূর্ণাঙ্গ মন ভগবানের অতি কাছে পৌঁছুবে। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি, রামকৃষ্ণের সঙ্গেও না, কিন্তু রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী "শ্রীমা"-কে ভালো ক'রে জানতেন, তাঁর সম্পর্কে কথা বললেন ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে। তিনি বলেন, তাঁকে যাঁরা দেখছেন, শুধুমাত্র তাঁর উপস্থিতি, তাঁর হাসিই তাঁদের দিব্যানন্দে অবগাহন করাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের অন্তরঙ্গ, পশ্চিমের সমস্ত রমণীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বিবেকানন্দের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি। তিনি তাঁকে দিয়ে অন্তত-পক্ষে স্মৃতিকথার টুকরোটাকরা লেখানো মনস্থ করেছেন; এবং সেগুলি সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম তাঁর মূলগত সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে না, সেই কর্ম হচ্ছে একদিন ভগবানের (মনে হয়, রামকৃষ্ণের রূপে) উপলব্ধিতে পৌঁছানো। 'রাজযোগ' যা শেখায়,—সেই "কুণ্ডলিনী"র জাগরণ; তুরীয়ানন্দ "উপলব্ধি"র প্রণালী জানতে বৈজ্ঞানিক যথাযথতার সঙ্গে কম খোঁজাখুঁজি করছেন না। এবং সমস্ত লৌকিক উপাখ্যান বর্জিত ক'রে—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের খাঁটি পরিচয়টি পুনরুজ্জীবিত করার সেই বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয় বস্তুটিও তাঁর মধ্যে আছে। রামকৃষ্ণের জীবনকে রোমান্স ক'রে তোলার জন্যে তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ক্ষমা করেন না। একজন ভারতীয় একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তির দেবত্বে পরম বিশ্বাসী এবং বিনা আপসে সেই ব্যক্তির দৈহিক এমন কি নৈতিক বাস্তবতারও (তাহলে আমাকে বলতে হয়ঃ 'মায়ার') পর্যবেক্ষক হতে পারে। আনন্দোচ্ছ্বাসিত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বশী সেন তাঁর কথা বললেন, যাঁকে তাঁর সবচেয়ে অনুরক্ত শিষ্য ডাকতেন "বুড়ো কর্তা", "দেড়ে",—'পরমহংস' ব'লে। এবং বিবেকানন্দের প্রতিভাকে পুজো করলেও তাঁর স্বভাবের স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি-গুলো হাসতে হাসতে বলে ফেলতেও তাঁর আটকানো না; এই স্বভাবের আচরণ পরের দিন কী হবে তা কেউ—(এমনকি বিবেকানন্দ নিজেও)—আগে থেকে ধরতে পারতেন না। হতবাক ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁকে বলেছিলেনঃ "কিন্তু স্বামীজি, গতকাল আপনি উল্টো কথা বলেছিলেন? তাতে বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেনঃ "নিঃসন্দেহে। গতকাল ছিল গতকাল।" এতো পৃথক হয়েও পরস্পরের পরিপূরক রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ তাঁদের শিষ্যদের মনে এক অখণ্ড একত্ব পরিগ্রহ করেছেন। রামকৃষ্ণ নিজে বলতেনঃ "আমি শক্তিমান, সে শক্তি। আনি মেয়ে-ছেলে (femme), সে ব্যাটাছেলে,

(homme)।" তিনি ছিলেন প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বজননী উপলব্ধির বিকীরণ। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন সক্রিয় শক্তি। তিনি ছিলেন বুদ্ধি—যাকে কিছুই সীমিত করে না, বা স্তব্ধ করে না। তাঁর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ তাঁর মাকে বলেছিলেন ঃ "আমার সকল শিষ্যদের মায়ার হাত থেকে মুক্ত কর্। ওটাকে বাঁধ মায়ার বাঁধনে।" কারণ এ বিপদ ছিল না যে, তিনি মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন, বিপদ ছিল বন্ধন ছিন্ন ক'রে তিনি মানুষকে যেন এড়িয়ে যাবেন। গিরিশ—(তাঁকে বশী সেন জানতেন ভালো ক'রে ঃ তাঁর শেষ অসুখের সময়ে পরিচর্যা করেছেন)—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন ঃ "শুধু দু'জন মায়ার বেড়ি ফসকে গেল ঃ একজন বিবেকানন্দ—কারণ সে লোকটা খুবই বড়ো, অন্যজন সেরা নাগ,—কারণ সে-লোকটা খুব ছোটো (অথবা নিজেকে ছোটো মনে করেন)।" বশী সেন বললেন, সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচালক শিবানন্দের আছে এক স্নিগ্ধতা, এবং প্রশংসনীয় প্রশান্তি ; যেন বুদ্ধের দুই হাত সর্বদা প্রসারিত। এবং তিনি এই রকমটি হয়েছেন যেদিন থেকে সম্প্রদায়ের মাথায় বসেছেন। বরং আগে তিনি কর্কশ ও অসামাজিক ছিলেন। কিন্তু এই বড়ো বড়ো সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব,- তাঁরা যে কাজের যোগ্য তার মধ্যে দিয়েই গড়েপিটে ওঠে।

জুনের শেষ, ১৯২৮। ভিলন্যভে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার দুই খণ্ডের কাজ শুরু করেছি, 'বিবেকানন্দ' লিখছি।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসুর আগমন। (লা কলিনে স্বল্প দিনের এক চিকিৎসা করিয়ে এলেন!) আগের চেয়ে তিনি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। আমার বোন তাঁর কথাগুলো যাতে তর্জমা করতে পারেন তার জন্যে একটু একটু থামতে না হ'লে, এক নিঃশ্বাসে দু'ঘণ্টা কথা ব'লে যেতে থামতেন না। সুন্দর ভারতীয় পোষাকে ধীর স্থির লেডী বসু হাসিমুখে শুনে চললেন, শুধু একটা-দুটো কথা সংশোধন ক'রে দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করলেন। জগদীশচন্দ্রের একথা বলার সঙ্গত কারণ আছে ঃ "কর্মতৎপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশটা ইউরোপীয়কে চ্যালেঞ্জ করি।" তিনি ক্ষত্রিয়বর্ণের এক অতি বড়ো প্রতিনিধি, —বিবেকানন্দও এই একই ক্ষত্রিয়বর্ণের ছিলেন ; (তিনি নিজেই এই সমবর্ণত্বের কথা স্মরণ করেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বিবেকানন্দকে জানতেন এবং তাঁকে খুব ভালোবাসতেন ; তাঁর বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন ঃ "এই যেমন, বিনয়ের ব্যাপারে তাঁর আতিশয্য ছিল না!…" জগদীশচন্দ্রেরও নেই। কিন্তু তাঁর মূল্যের এই চেতনা স্বাভাবিক ও ন্যায্য ; মানুষের স্বতস্ফূর্ততা এই চেতনাকে সহমর্মী ক'রে তোলো। সাদৃশ্যের অপর লক্ষণ ঃ বিবেকানন্দ বলতেন, দারিদ্র ও ত্যাগের সমর্থন করা যেমন খুব ভালো, তেমনি খুব

ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করাটাও ঃ সব কিছুরই সময় আছে ; আজ আমীর, কাল ফকির। জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উচ্ছল সমস্ত শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন, কিন্তু তা নিজের জন্যে নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্যে। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতিতে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই। তিনি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অতি শক্তিশালী মূর্ত প্রকাশ, সেইজন্যে প্রগতির, পিছনে না ফিরে কেবলই – কেবলই সামনে এগিয়ে চলার ঘোষিত প্রবক্তা না হয়ে পারেন না। তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পবিকাশের পক্ষে; বললেন, একে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানী নকল মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে ; জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরি-করা মেকি 'মেড ইন টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে। জাতীয় গর্ব—কিন্তু শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী গর্ব—তাঁর মধ্যে থেকে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর মনের মধ্যে আছে বাঙালী চরিত্রের বীর্যহীনতা এবং, অবশ্যই, তথাকথিত ভীরুতা সম্পর্কে ইংলন্ডের (বিশেষ ক'রে কিপলিঙের) দারুণ অপমান। বাংলাদেশে যে বিপুল দৈহিক ও মানসিক ঘুমন্ত শক্তি আছে তিনি তার সাক্ষ্য দিলেন এবং আমাদের কিছু কিছু দৃষ্টান্তও দিলেন। আমাদের বললেন ঃ "একটা জাতিকে বীর বা ভীরু যা বলা হয়, সে তাই।" (এবং কথাটাও বিবেকানন্দের)। যেদিন থেকে নিজের সাহস সম্পর্কে বাংলাদেশের চেতনা হয়েছে, সেদিনই সে তা পেয়েছে। তিনি আমাদের সাম্প্রতিক কালের (রাজনৈতিককারণে) ফাঁসির আসামীদের কাহিনী বললেন ঃ ফাঁসির হুকুম পাওয়ার পর থেকে ফাঁসি-হওয়া-পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁদের যেন বয়স কমে গেছে, শরীর ভালো হয়ে গেছে। (কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যা যোগ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র তা বললেন না,—তার কারণ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের জেলখানায় দেখেছেন ঃ তা হচ্ছে এই যে, ফাঁসির হুকুম পেয়ে রাজনৈতিক বন্দীরা তাড়াতাড়ি মরতে পারবেন ব'লে উল্লসিত হয়ে ওঠেন ঃ কেন না, তাঁদের পুনর্জন্মের বিশ্বাস থেকে তাঁরা এই আশ্বাস পান যে, আবার জন্ম নেবেন এবং নতুন উদ্যমে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে আবার লড়াই শুরু করবেন।) জগদীশচন্দ্র বললেন, সম্প্রতি ইংলন্ড যখন ভারতবর্ষকে সামরিক নির্যাতনের ভয় দেখিয়েছিল, বন্দুকের গুলি ও গোলার টুকরো লাগলে কী হতে পারে, তা নিয়ে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা হয়েছিল ঃ এবং ভারতীয় জনগণ আগে থেকেই তার স্বাদ পেয়েছিল, যাতে এসবে অভ্যস্ত হতে পারে। তারপর তিনি এক দীর্ঘ কাহিনী ফেঁদে বসলেন ; তিনি এক বাঙালীর* বর্ণনা করলেন, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং তাঁকে দেখালেন জাতির অসীম শক্তির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে। এক ইস্কুলমাস্টার। একদিন তিনি একটা চিতা উপহার পেলেন। কালে সেটির প্রভু হয়ে ওঠার জন্যে তার হালচাল বুঝতে লেগে গেলেন। ভালো লেগে যাওয়ায় তখুনি একটা বাঘ আনালেন এবং সেটা নিয়েও ওই একই রকম করলেন। এদিকে এক মহারাজা** একটি দুর্দান্ত বাঘ ধরে ফেলেছিলেন, কেউ তার

---

* শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।—অনু

** জামনগরের নবাব।—অনু.

কাছে যেতে সাহস করতো না। পশুর উপরে এক বাঙালীর ক্ষমতার কথা জানতে পেরে মহারাজা হাসতে হাসতে তাঁকে বাঘটাকে বাগ মানানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে বসলেন এবং কোনো অস্ত্র না নিয়ে বা ওষুধ ব্যবহার না ক'রে খাঁচায় ঢোকার কথা দিলেন। সেই দিনটি এলো, হাজার হাজার লোক ডাকা হলো। যে মুহূর্তে তিনি খাঁচায় ঢুকতে যাবেন, তাঁর সাহসের তারিফ ক'রে মহারাজা এথেকে নিবৃত্ত হতে ও কথা ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন, এবং খাঁচার দরজা খুলে ফেললেন; জনতা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, কেউ কেউ মূর্ছা গেল। বিশাল ক্রুদ্ধ বাঘটি সঙ্গে সঙ্গে নিজেক গুটিয়ে নিল লাফ দেবার জন্যে। লাফটা আটকাবার পক্ষে বড়োই দেরি হরে গেল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটিমাত্রই কায়দা আছে: থাবার এক ঘায়ে সে শিকারের ঘাড় ভেঙে দেয় এবং একই সময়ে গায়ের উপরে হুড়মুড়িয়ে পড়ে। তিনি লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন, আর যে মুহূর্তে বিশাল বাঘটা তাঁর উপরে এসে পড়ল, নিশ্চিত দৃষ্টিতে পলকে দেখে নিয়ে হাতের কব্জি দিয়ে তাক করলেন এবং উল্টো দিকে এমন জোরে, এমন নির্ভুলভাবে আঘাত করলেন যে থাবাটা ঘুরে গেল, এবং বাঘটা সটান গিয়ে পড়ল খাঁচার শিকের উপরে। আঘাতটা ফসকে যাওয়ায় হতভম্ব হয়ে সে গর্জন ক'রে পিছিয়ে গেল এবং আবার লাফ দিল। সেই একই রকম আতংক-জাগানো লম্ফ ঝম্প আর সেই একই ভাবে খাঁচার উপরে হুড়মুড়িয়ে-পড়া। এই অভাবিত ঘটনায় বাঘটা এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, খাঁচার একেবারে কোণায় গিয়ে বেড়ালের মতো মিউমিউ করতে লাগল। বাজি জেতা হয়ে গেল। তাঁকে বাঘটা উপহার দেওয়া হলো, আর বাঘটাকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষে তিনি নিজেকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একবার বৃষ্টিতে ভিজে খাঁচার শিকগুলো পেছল হয়ে ছিল। তিনি পড়ে গেলেন। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি শুধু অর্ধেকটা উঠতে পারলেন, বাঘের হাঁ-র মধ্যে নিজের বিশাল কনুইটা বাড়িয়ে দিলেন, আর চোয়ালের মধ্যে খোঁটার মতো ঢুকিয়ে দিয়ে এইভাবে পশুটিকে অনড় ক'রে রাখলেন, যতক্ষণ না তাঁর সাহায্য এলো। এর উপরে জগদীশচন্দ্র শোনালেন সেই গল্পটি, এই হারকিউলিস জীবনে তাঁর পেশী ও ঠান্ডা-মাথার কী সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ সবে বিয়ে করেছেন। এক বদমাশ বার ক'রে ফেলল যে তরুণী স্ত্রীটি শিশুকালে একজনের বাগদত্তা হয়েছিলেন, তারপর লোকটি মারা যায়; লোকটা স্বামীকে ডেকে বলল স্ত্রীকে ত্যাগ করতে, নইলে সমাজের সামনে তাকে অভিযুক্ত করবে এবং সামাজিক ব্যবস্থানুসারে সে সমাজচ্যুত হবে। সেই ইস্কুলমাস্টার—সেই জানোয়ার-ঠেঙানো মানুষটি খবর পেয়ে নিজে ব্যবস্থার ভার নিলেন। এক ভোজে তিনি গ্রামের সব ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বেরুনোর একটিমাত্র দরজার সামনে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর অভিযুক্ত স্ত্রীকে দিয়ে পরিবেশন করালেন। জাতের বিধি অনুসারে তাঁর হাত থেকে খাওয়া হলেই তিনি জাতে উঠবেন, এবং কেউ তাঁকে জাত থেকে তাড়াতে পারবে না। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা খেতে অস্বীকার করল। তখন গৃহস্বামী উঠে দাঁড়ালেন, ভীতিপ্রদ ঘুঁসি দিখিয়ে বললেন: "ঠিক আছে।

ওইতো দরজা। যিনি আমার দেওয়া ভাত খাবেন না, তিনি বেরিয়ে আসুন। কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ওখানে পৌঁছুবার আগে আমার ঘুঁসি খেয়ে তবে যেতে হবে।" ব্রাহ্মণরা আবার বসে পড়ল, খেতে রাজী হলো। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়ঃ বিশাল বিশাল বন্যপশুকে বাগ মানানোর কাজে বাংলার এই হারকিউলিস যখন নেমেছিলেন, তখন বলেছিলেনঃ "আমি শুধু চার বছর এই কাজ করবো। তারপর বনে চলে যাবো।" চার বছর পূর্ণ হবার ঠিক দিনটিতে তিনি সব ছেড়েছুড়ে চিরদিনের জন্যে চ'লে গেলেন।

আমি জগদীশচন্দ্রকে 'রাজযোগ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (আমি বিবেকানন্দের লেখা পড়ছি, এবং এই শক্তিশালী ও আন্তরিক বুদ্ধির মানুষটিকে রূপকথাসুলভ কোনো কোনো অতিলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার করতে ও তা শিক্ষা দিতে দেখে বিব্রত বোধ করছি)। আমার মতোই একই বৈজ্ঞানিক কিন্তুভাব নিয়ে জগদীশচন্দ্র এ বিচার করতে পারেন ব'লে মনে হয়; তাঁর বিশ্বাস 'রাজযোগে' বিরাট শক্তিলাভ হয়,—কিন্তু এক বিশেষ সীমার বাইরে নয়। অরবিন্দের উচ্চতর প্রতিভার প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা জানিয়েও বিশ বছরের দীর্ঘ নির্জনবাসে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে যে অলৌকিক ফলের আশা তিনি করছেন, সে-সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যোগের মাধ্যমে যদি এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হতো, তাহলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না তা বোঝা যায় না। আমি ঠিক এইরকমই ভাবি।

তাঁর উচ্ছ্বসিত একালাপের মুখ্য বিষয় হচ্ছে, আর সেইটিই তাঁর কাছে নিরন্তর আনন্দ, সেইটিই স্বাভাবিক—তাঁর বিপুল বৈজ্ঞানিক কর্ম। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস তিনি একটার পর একটা আবিষ্কার ক'রে চলেছেন। এবং তাঁর প্রতিভা এমনই শানিত হয়েছে যে, তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক দীর্ঘ পরম্পরা কোথায় নিয়ে যাবে তার যথাযথ মাত্রা অনুমান করতে, চোখের একবার দেখাই যথেষ্ট। বর্তমানে তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোড় ঘুরিয়েছেন উদ্ভিদের নিরাময় ক্ষমতার গবেষণার দিকে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের আত্মীয়তা উপলব্ধি ও প্রাণীর জীবনের আত্মীয়তা উপলব্ধি ক'রে, উদ্ভিদের মধ্যেই গুপ্তবস্তু ও প্রতিকারের উপায় খুঁজতে যাচ্ছেন; এখনো পর্যন্ত তা খোঁজা হয় শুধু প্রাণীর মধ্যে। উদ্ভিদের মধ্যে তিনি সংক্রামক রোগের বীজের অনুশীলন করছেন, উদ্ভিদ থেকে সিরাম ও টিকা তৈরী করছেন; এবং উদ্ভিজ্জ সংক্রামণ থেকে তিনি বিশেষভাবে হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলীর উপরে সবচেয়ে বিস্ময়কর ভেষজ ফলাফল পেয়ে গেছেন; এইভাবে তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া একটি ব্যাঙের জীবন, এবং তা আরও জোরালো—সঞ্চার করতে পেরেছেন। ভিয়েনায় তাঁর অভিজ্ঞতা হাতেকলমে বড়ো বড়ো চিকিৎসকদের সামনে দেখিয়ে এসেছেন, তাঁরা এতে বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গের সম্পর্কেই তিনি গবেষণা চালিয়ে যাবেন এবং মনে করছেন এর পরেই তিনি ক্যানসারের চিকিৎসা বার ক'রে ফেলবেন। এরই মধ্যে একটি ফল পেয়ে গেছেনঃ উদ্ভিজ্জ টিকা বেশি জোরালো ও বিশুদ্ধ; উদ্ভিদের শক্তি (e'nergie) প্রাণীর

চেয়ে উচ্চ স্তরের, তা সংগ্রহ করা যায় এবং সংগ্রহ করতে হবে। এবং জগদীশচন্দ্র ফিরে আসেন মহাজাগতিক ঐক্যের মূলগত বিশ্বাসে, এই ঐক্যকে প্রমাণ করেন জগতের প্রতিটি কোষে, কোনো কোনো শৃঙ্খলার (ordre) সঙ্গে—যার মধ্যে এ অন্তর্ভুক্ত ; সমস্ত কিছুরই সাধারণ লক্ষণ ঃ সংকোচনতা, সঞ্চারণতা (যদি এক জায়গায় স্পর্শ করা যায়, সর্বত্র তার প্রতিক্রিয়া হয়) এবং ছন্দ। এবং এরা আদিম উৎস— মাটির যতো বেশি কাছাকাছি, এদের শক্তি ততো বেশি সম্পূর্ণ, ততো বেশি বিশুদ্ধ।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। এনড্রুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। তিনি এসেছেন জেনেভার (যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শক্তিসমূহের) এক ধর্মীয় কংগ্রেস থেকে এবং ফিরেছেন ইংলন্ডে। সমস্ত পীড়িতদের পক্ষ সমর্থন ও প্রেমের জন্যে দেশ দেশান্তরে তিনি এক অনন্ত অভিযাত্রী। হিমালয়ে তাঁর পায়ে কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল, গত কয়েক মাস তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে দেখাচ্ছে আগের চেয়ে অনেক সবল। শান্ত ও মধুর কণ্ঠে তিনি কথা বলেন। এবং তিনি যা বলেন, যা দেখেন সবই অসাধারণ। কারণ সর্বত্র তিনি তাই দেখতে যান, যা অন্য কেউ দেখেনি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের (উপদ্বীপের দক্ষিণে কেপ কমোরিনের কাছে) তিরিশ লক্ষ অস্পৃশ্যের এক গোষ্ঠীর কথা বললেন ; গোষ্ঠীটির নাম 'থিয়া', নারায়ণস্বামী নামে এক বিখ্যাত গুরুকে ঘিরে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। এই নারায়ণস্বামী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড়ো (এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন), তিনি বছর কুড়ি ধরে এক উচ্চ মার্গের পবিত্র ধর্ম প্রচার করেছেন। (লেখাপড়ার জন্যে ইউরোপে-আসা নটরাজন নামে তাঁর এক তরুণ শিষ্য ঠিক আজই জেনেভায় তাঁর বার্ষিকী উদযাপন করছেন।) মনে হয়, এই অস্পৃশ্যেরা ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে বসতি-করা বৌদ্ধদের বংশধর, তাদের ধর্মের পতনের পর তারা জাতিচ্যুত হয়েছে ঃ কেন না তাদের সুন্দর ও সুগঠিত টাইপটা উত্তর ভারতের, দক্ষিণের নেগ্রয়েড মানুষগুলো এবং বিশেষ ক'রে, অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত অন্যান্য পারিয়াদের চেয়ে— (তাদেরও তিনি জানেন) —খুবই পৃথক। একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, অস্পৃশ্যেরা চিরকালই গুরু পেয়েছে এবং অস্পৃশ্যদের এই গুরুরা সকল ভারতীয়ের কাছেই সম্মান পান, তাতে জাত সম্পর্কে কুসংস্কার থাকে না ঃ কারণ সন্ন্যাসীরা সমস্ত জাতের ঊর্ধ্বে উঠে যান। পারিয়াদের পক্ষে নিষিদ্ধ পথে ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভের জন্যে সাম্প্রতিক অহিংস আন্দোলনে ত্রিবাঙ্কুরের থিয়াদের সঙ্গে এনড্রুজ এক বছরেরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন। চার মাস ধরে সমস্ত সময় এবং কখনো কখনো বানে-ভাসা নদীর পাড়ে, কোমর-জলে হাতজোড় ক'রে, আবেদন জানিয়ে, ছয় ছয় ঘন্টা পালা ক'রে চৌমাথাগুলোয় তারা দাঁড়িয়ে থাকতো। ব্রাহ্মণরা মেরেছে, দিশি পুলিশে মেরেছে, মারের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে গেছে, তারা কখনো হাত তোলেনি। ক্লান্তিতে, রোগে অনেকে মারা গেছে। এবং অবশেষে তারা জয়লাভ করেছে। এনড্রুজ তাদের সঙ্গে থেকেছেন। গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের

জন্যে পরিচালিত বিগত বছরগুলোর বিভিন্ন অভিযানে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি সমানভাবে অংশ নিয়েছেন, সে গান্ধীপন্থীদের দলভুক্ত হয়েই হোক্, আর রামকৃষ্ণপন্থীদের দলভুক্ত হয়েই হোক্। শেষোক্তদের সচ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠার তিনি খুব প্রশংসা করেন; এদের এখন ভারতবর্ষের সকল অংশেই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ ক'রে যেখানে সামাজিক সাহায্য দেবার আছে। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণপন্থীরা সবসময়ে তাদের ধর্মীয় চর্চাকে কোন মূর্তির উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করে, পক্ষান্তরে গান্ধীপন্থীদের এমন কিছু নেই। কিন্তু এর পাল্টা হিসেবে তারা ধর্মমূলক গান খুব পছন্দ করে। গান্ধীর জনপ্রিয়তা বিপুল। যেখানেই তিনি যান সর্বত্র লোক তাঁর পিছনে ছোটে। এন্ড্রুজ খোলা ময়দানের একটি সভার বর্ণনা দিলেন, গান্ধী মাঝখানে, এন্ড্রুজ তাঁর পাশে। চারধারে গোল হয়ে হাজার হাজার মানুষ গায়ে গায়ে ঘেঁষে। বাইরে যাবার জন্যে এন্ড্রুজকে যখন তাদের পেরিয়ে যেতে হলো, তিনি সোজাসুজি তাঁর পা গুনে গেলেন, যা হলো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ব্যাসার্ধ। এতে যে সংখ্যা পেলেন, তার হিসেবে শ্রোতার সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এন্ড্রুজ আরও যোগ করলেন যে, এইসব জমায়েতে গান্ধীকে নিয়ে যেতে তাঁর কখনো ভালো লাগে না ;কারণ তাঁর সবসময়ে ভয়, চারধারের এই ঠাসাঠাসি-করা ভিড়ে তিনি দম আটকে না মরেন। আমি জানতে চেষ্টা করলাম, সেই বন্ধনটি কী, যা বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীকে বেঁধেছে। তিনি ভালো করেই বললেন যে, গান্ধী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই ঃ ‘‘নরজনদৈবত’, আর্তদেব, দরিদ্রদেব ও পীড়িতদেব ’—মহান্ মন্ত্রটি গ্রহণ করেছেন।

গান্ধীর প্রতি যাঁর বিশ বছরের আনুরক্তি সেই এন্ড্রুজ কখনো তাঁর দুটি কাজ মেনে নিতে পারেননি ঃ যুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের জন্যে তাঁর সৈন্য-সংগ্রহের ভূমিকা ঃ এবং তাঁর বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও পোড়ানোর উপদেশ। দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্পর্কে গান্ধী মেনে নিয়েছিলেন যে, তিনি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন, এবং যে হিংসাকে তিনি নিন্দা করেন তা থেকেই কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে তাঁর সঙ্গে এন্ড্রুজ অন্তহীন আলোচনা চালিয়ে গেলেও গান্ধী তাঁর যুদ্ধের সময়কার আচরণ অস্বীকার করেননি; কারণ নিজের ব্যাপারে দু'জনেই সমান একগুঁয়ে। মোটের উপর আমি এই ব্যাখ্যায় পেঁছেচি যে, গান্ধী হচ্ছেন এক ক্রান্তিকালের অন্যতম নায়ক, অন্য অনেকের মতোই, যিনি অতীতের ভাবাদর্শ ও ভবিষ্যতের ভাবাদর্শ—এই দুই ভাবাদর্শের মধ্যে বিভক্ত, এবং যিনি কেবলমাত্র অত্যন্ত ধীরে, কষ্টেসৃষ্টে, যেন দুঃখের সঙ্গে প্রথমটিকে ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর আইনজ্ঞ হয়ে গড়ে-ওঠাটাও ভুললে চলবে না, তা তাঁর চিন্তার কিছু আভাস দিয়েছে। স্বভাবগত ভাবে তিনি সবসময়েই রাষ্ট্র, আইন, সামরিক শক্তি সম্পর্কে এক সম্ভ্রম পোষণ ক'রে এসেছেন। তিনি বিদ্রোহীর বিপরীত—(বিবেকানন্দের মতো মানুষ, যাঁকে তাঁর বিদ্রোহের সহজ প্রেরণাপ্রসূত গতিকে রুখতে হয়েছে যুক্তি ও ধর্ম দিয়ে—তার বিপরীত)। গান্ধী এক বিরাট বিদ্রোহী শুধু এই কারণে যে, তাঁর নৈতিক ঔদার্য ও তাঁর সততাকে পারিপার্শ্বিকতা বাধ্য করেছে।

এন্ড্রুজ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯04 সালে। অনেক বছর দিল্লিতে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৮ সালে পিয়র্সনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং ১৯১৩ সালে তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান গান্ধীর সঙ্গে মিলতে ও তাঁকে সাহায্য করতে। পিয়র্সন ছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু।

তিনি বললেন, ভারতবর্ষে কমিউনিজম বেশ গেড়ে বসেছে, সবচেয়ে বসেছে উত্তর ভারতে, বাংলা দেশে; এবং কমিউনিজমের টাকা ভারতীয় নেতাদের বেশ দুর্নীতিগ্রস্ত ক'রে দিচ্ছে; নেতারা গরীব এবং অতি সহজেই লোভের খপ্পরে পড়েন। দুঃখের বিষয় ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদেরও তাদের পার্টির জন্যে টাকা নেবার ঝোঁক আছে, এই টাকাটা দেয় কমিউনিজম এক আপাত স্বার্থশূন্যতার আড়ালে, তার সঙ্গে তাদের সমঝোতা করানোর জন্যে। নৈতিক আচার-আচরণ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এন্ড্রুজ দেখতে পাচ্ছেন, খুব শীঘ্রই পুরনো গান্ধীপন্থীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে শুধুমাত্র সহযোগিতা বা অসহযোগিতা নিয়ে নয়; প্রশ্ন উঠবে হিংসা বা অহিংসা সম্পর্কে; এবং এই বিতর্কের ফলাফল সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন। সেইজন্যে তিনি এত আগ্রহী যে, গান্ধী যতো তাড়াতাড়ি পারেন স্পষ্ট ক'রে নির্দিষ্ট ক'রে যেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে—সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে—ঘোষণা রাখেন। এ নয় যে, বর্তমান মুহূর্তে গান্ধীর ব্যক্তিগত মনোভাব সম্পর্কে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহ আছে; কিন্তু এটি দরকার যে, তিনি প্রকাশ্যে সেই মনোভাব কার্যকর করবেন।

তাছাড়া, পন্থা-গ্রহণের ব্যাপারটা যদি না থাকতো, এতদিনে তাঁর সহানুভূতি চলে যেতো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমিউনিজমের প্রতি: কারণ ইংলন্ড থেকে তিনি ফিরছেন লেবার পার্টির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। একই দিনে তিনি তাকে দেখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের বিরুদ্ধে পীড়ননীতি চালানোর জন্যে শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলোর আইন পাশের সপক্ষে, ভারতবর্ষের ভারতীয় দাবিগুলোর বিরুদ্ধে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের সপক্ষে মত দিতে; এবং লেবারপন্থী সংসদ-সদস্যরা কমিশন থেকে তাঁদের অংশগ্রহণ প্রত্যাহার ক'রে নিতে এন্ড্রুজের কাছে অস্বীকার করেছেন। তার প্রতিবাদ হিসেবে এন্ড্রুজকে লেবারপন্থী সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, একই ভাবে তিনি ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করেছেন, যার কংগ্রেসে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। এইভাবে এক দানবিক অন্ধতায় প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি তার শত্রুর জন্যে কাজ করছে: লেবারপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিকরা কমিউনিজমের মদত দিচ্ছে; কমিউনিজম দিচ্ছে ফ্যাসিবাদকে। এইভাবে একটি চক্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, যা ফিরে আসছে সবসময়েই সাম্রাজ্যবাদে ও হিংসায়।

যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এন্ড্রুজ জাপানে গিয়েছিলেন, সেই প্রথম সফরের স্মৃতিচারণা করলেন। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল; সেখানে পেঁছুলে এক বিশাল জনতা প্রতীক্ষায় ছিল, গোটা দেশ তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। কিন্তু জাতীয় অহংকার এবং যুদ্ধের প্রশস্তির কাজে তাঁকে লাগাবে ঠিক করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রচন্ড সাহসে, ক্রোধভরে তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

দুদিনের মধ্যে তাঁর চারপাশে গোটা জাপান ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল 'বিজিত এক জাতির কবি' হিসেবে। তিনি যখন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'জাতীয়তাবাদ' লেখেন, তখন এনড্রুজ তাঁর পাশে ছিলেন। চীনের নতুন প্রজন্মের কাছ থেকেও কবি কম অবজ্ঞাজনক ব্যবহার পাননি, তারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল 'রিয়াল পলিটিক'-এর মতবাদ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নেতাদের উপনিষদের একটি শ্লোক মনে করিয়ে দিয়েছিলেন : 'অধর্মে বৃদ্ধি ঘটে···তার থেকে শত্রুকেও জয় করে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পায়।' এনড্রুজ নিশ্চয় ক'রে বললেন, এ তাদের মনে দাগ কাটেনি। জাপানীরা তাদের উপকথার দুই বীরের প্রশস্তি গেয়ে তাঁকে কয়েক ছত্র লিখে দিতে বলেছিল, বীর দুটি দুজন দুজনকে মারবার আগে সারাদিন ধরে পরস্পর লড়াই করেছিল ; তিনি দুটি ছত্র লিখে দিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল এই :

"সারাদিন ধরে ওরা লড়াই করলো, ওরা এ ওকে মারলো ;
আর লজ্জিত ধরিত্রী তাদের গোপন করতে ঢেকে দিল ঘাসে।"

আমাদের যে-ফরাসী বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভীরু ও বিজ্ঞ সুবিধাবাদের অভিযোগ করতে পারেন, তাঁদের সেই নিঃশংকতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নাই, যে নিঃশংকতায় বিনা দ্বিধায় নিজের জনপ্রিয়তা বিসর্জন দিয়ে দুটি বিরাট জাতির জনমতের বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

এনড্রুজ হিন্দি, উর্দু, বাংলা বলেন এবং প্রায় সব ভারতীয় ভাষাই বুঝতে পারেন।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার কদিন থেকে এসেছেন, সেখানে তিনি স্থানীয় অধিবাসী এবং বিশেষ ক'রে ভারতীয়দের অধিকারের অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। দরদ দিয়ে তিনি বান্টু জাতির কথা বললেন, তারা সুন্দর তারা শিল্পী, তাদের গুণাবলী প্রশংসনীয়। (বিশেষ ক'রে সঙ্গীতে।)—সরকারের দমনমূলক আইন পাশের পরিকল্পনা নেওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের যে আনন্দদায়ক নৈতিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, এনড্রুজ তা নিশ্চয় ক'রে বললেন। নতুন ওলন্দাজ বংশধরদের যে এক ভ্রাতৃত্বমূলক মানবীয় ধর্মের বোধ আছে তা আগের যুগের কাছে অপরিচিত ছিল। প্রথমবার এনড্রুজ যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজির হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন গান্ধী ও পোলককে জেলখানায় দেখবেন ; জাহাজ থেকে নামলে একটি খুবই ছোটোখাটো মানুষ তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ; হঠাৎ দেখলেন পোলক্ আসছেন. তাঁকে তিনি চিনতেন, তাঁকে দেখে বলে উঠলেন : 'এ কী! আপনি ছাড়া পেয়েছেন? কিন্তু তাহলে মিঃ গান্ধী? তিনি কোথায়?' তখন ছোটখাটো মানুষটি তাঁকে বললেন : 'আমিই হচ্ছি মিঃ গান্ধী।' প্রথম দেখার মুগ্ধতার মধ্যে তিনি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ভারতীয় রীতিতে প্রণাম করলেন। এটা একটা কেলেংকারি ব্যাপার হলো।

দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজে শিরোনামা হলো ঃ ‘এক কৃষ্ণাঙ্গের পা মুছিয়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে এক শ্বেতাঙ্গের আগমন !’ এন্‌ড্রুজের মুখের উপর সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুজনের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে পিয়র্সন বাড়িউলিকে বলতে শুনেছিলেন ঃ “এই এন্‌ড্রুজ লোকটাকে চেনেন ? লোকটাকে দেখতে পেলে গলা টিপে মারবো।” হেসে পিয়র্সন উত্তর দিয়েছিলেন ঃ “তিনি আমার বন্ধু।” কিন্তু তিনি এতো তরুণ, এতো সুন্দর, এতো চিত্তহারী ছিলেন যে তাঁর সম্পর্কে কেউ বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেনি। তিনি সদ্বংশের এক পুরনো কোয়েকার পরিবারের লোক। তাঁর নামে শান্তিনিকেতনে একটা হাসপাতাল করা হয়েছে।

বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে আসছিলেন। কলম্বো পর্যন্ত এন্‌ড্রুজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে জাহাজে চাপতে সাহস পাননি। তাঁর স্বাস্থ্যে কুলোয়নি। হৃদযন্ত্র আবার বিগড়াতে শুরু করেছে, হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালি ফুলছে। তার বিপরীত, গান্ধী সামনের বছর আসতে দৃঢ় সংকল্প। গত বছর উড়িষ্যায় যখন দ্বিতীয়বার রক্তচাপের ধাক্কায় পড়েছিলেন, এন্‌ড্রুজ তাঁর পাশে ছিলেন ঃ কয়েকদিন ধরে সবাই ভেবেছিল তিনি মারা যাচ্ছেন, ভারতবর্ষের দুই তারা অদৃশ্য হতে চলেছে।

(ভারতবর্ষের লোকেরা এন্‌ড্রুজের নামের আদ্যাক্ষরগুলোর কেমন ব্যাখ্যা করেছে—সি. এফ. এ.—“ক্রিশ্চয়ান ফাইডাল এ্যাপস্‌ল !” [এটা তিনি আমাদের বলেননি।])

সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। মাদ্রাজের কিলপাংকের এ. এ. পল বহু পুস্তিকার মাধ্যমে আমাকে এক ‘ফেডারেশন অফ্‌ ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ’-এর বিষয়ে জানাচ্ছেন ; ৪-৫ বছর ধরে এটি ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে, এর চেষ্টা হচ্ছে—অন্ততপক্ষে যুবশক্তির একটি সেরা অংশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মিলনকে বাস্তবায়িত করা। বিবেকানন্দের সেই সর্বক্ষণের চিন্তা : কিন্তু যা আমাকে অবাক করে তা এই যে, এই সমস্ত সম্মেলনে যেখানে খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম, থিওসোফি, জৈনধর্ম এবং গান্ধীর প্রতিনিধিরা সমবেত হন, একবারও সেখানে বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয় না এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে নীরবে পাশ কাটানো হয়। (তা ছাড়া, এইটি লক্ষ্যণীয় যে, মনে হয়, এই মিলনের ভিত্তি হচ্ছে এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের মিলিত বিশ্বাসের উপরে, নাম তার যাই হোক্‌ না কেন ; এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে সীমাবদ্ধতা এবং এই দিক থেকে প্রচারের কথাটাও বাতিল করা হয়নি, যদিও একমাত্র গান্ধী অত্যন্ত মহত্বের সঙ্গে এই বিপজ্জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, বলেছেন যে, যার যা বিশ্বাস তাই নিয়ে তাকে থাকতে দেবার মতো চিত্তের প্রসার চাই, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবেও কারুর বিশ্বাসের ঘসামাজা করার চেষ্টা চলবে না ; যার বিশ্বাস, একমাত্র সেই এর বিচারক।)—এ. এ. পল তাঁর পত্রিকায় আমাকে লিখতে বলায়, আমি উত্তর দিলাম (৩০ সেপ্টেম্বর), তা আমি সানন্দে

করবো ; কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, ফেডারেশন আজ পর্যন্ত ভুলে আছে ‘‘সেই দুই মহান্ ভারতীয়কে—যাঁরা সর্বধর্মের মিলনের কথা শুধু ভাবেনইনি, সবচেয়ে বিশাল, সবচেয়ে উদার ও সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে তার উপলব্ধি করেছিলেন এই ভুলে-থাকার মধ্যে এক গভীর অবিচার আছে। যাঁর প্রেম ঈশ্বরের প্রতিটি রূপকে আলিঙ্গন করেছিল—সেই পরমহংসের পবিত্র মুখচ্ছবি, এবং মহান্ শিষ্যের প্রচণ্ড বাণীর সেই অনুরণিত প্রতিধ্বনি মনে জেগে না উঠলে আজ গোটা পৃথিবীতে বিশ্বজনীন ধর্মীয় মিলনের কথা বলাটাই আমার কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হয়। আমি বুঝি, তাঁরা দু'জনেই আপনাদের ফেডারেশনের চেয়ে অনেকে বড়োভাবে ধর্মীয় মিলন, এবং এমনকি, ধর্মীয় মনের মিলনের কল্পনা করেছিলেন ; কারণ তাঁরা সেখানে, স্বাধীন যুক্তি ও বিজ্ঞান—সত্যের সমস্ত আন্তরিক ও নিরাসক্ত অনুসন্ধান সমেত মনের যা কিছু দিব্য—তার প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। এইভাবে আমিও একে একইরকম কল্পনা করি। আমার বিশ্বাস যে, জগতের বর্তমান অবস্থায়, লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভক্ত—যারা ভক্ত হয়েছে শুধু স্বার্থ বা অলস অভ্যাস বশে তাদের থেকে যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে—তাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় ঈশ্বর থাকেন। ঈশ্বর আছেন সেইসব খাঁটি, সৎ, বীরোচিত হৃদয়ে, যারা যে-কোনো শর্তে আকুল হয়ে, নাছোড়বান্দার মতো শিবকে, সুন্দরকে সত্যকে খুঁজে বেড়ায় এবং তাদের সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। তারা ঈশ্বরের নাম দিল কি দিল না তার সামান্যই মূল্য। যার মূল্য তা নাম নয়, ঈশ্বরের শক্তি। সক্রিয় না হয়েও যারা মুখে ঈশ্বরের নাম করে তাদের চেয়ে ঈশ্বরের নাম না দিয়েও যে তাঁর শক্তিতে সক্রিয় হয়, সে তাঁর অনেক কাছাকাছি। আপনাদের সর্বশেষ সম্মেলনে গান্ধীর ঘোষণাবাণীকেই আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। আমি বিশ্বাস করি আমাদের প্রকৃত কর্তব্য এই বিশ্বাসকে অন্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাওয়া নয়, প্রকৃত কর্তব্য অন্তর্জীবনকে গভীরভাবে যাচাই ক'রে নিজেদেরই তার জন্যে প্রতিদিন আরও যোগ্য হয়ে ওঠা এবং এ সম্পর্কে কোনো অযৌক্তিক ও ভেজাল ব্যর্থতার স্থান না দেওয়া। যারা আমাদের প্রচণ্ডতম ও প্রবলতম কর্মের চারপাশে ঘিরে আছে, এইভাবেই আমাদের বিশ্বাসের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আমরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবো। সমস্তরকম প্রচারের প্রতিই আমার অবিশ্বাস। এ নিজেই জানে না যে, মনের এক স্পর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের এ এক ছদ্মবেশী রূপ।”

অক্টোবর, ১৯২৮। বন্ধুরা আমাকে বড়ই ক্লান্ত ক'রে ফেলেছেন। তাঁদের দেখলে আমি খুশি হই, কিন্তু আমার নির্জনতার প্রয়োজন আছে, সেই নির্জনতা অনেক দিন ভঙ্গ করা চলবে না…

…এই সব বিক্ষিপ্ততার মধ্যে শুরু-ক'রে-দেওয়া দীর্ঘ কাজের সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ নয়, তার জন্যে প্রয়োজন পরিপূর্ণ মনসংযোগ। তবুও, রোজ সকালে এক চরম চাপা উত্তেজনায় আমি চিন্তার সূত্রকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা

করছি ; এবং ১২ অক্টোবর 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ'-এর প্রথম খশড়ায় (অসম্পূর্ণ) সর্বশেষ দাঁড়ি দিলাম।

যুগোশ্লাভিয়ার সংসদের (Diète) প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্প্রতি নিহত ক্রোশিয়ান সদস্য ও রাজনৈতিক নেতা স্তেপান রাদিৎচের মেয়ে আমাকে জানাচ্ছেন (১৭ অক্টোবর) যে, তাঁর বাবা আমার 'মহাত্মা গান্ধী' অনুবাদ করিয়েছেন এবং তার ভূমিকা লিখেছেন। 'গান্ধীর ধ্যানধারণা এবং তাঁর সুপরিচিত মতামতের মধ্যে বর্তমান সাদৃশ্যের জন্যেই তিনি এতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে সাধারণ মিল ছিল, তা হচ্ছে সবার উপরে শান্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ।" ক্রোশিয়ায় যে নৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন স্তেপান রাদিৎচ্ সৃষ্টি করেছিলেন তাকেই ইউরোপে পরিচিত করিয়ে দেবার কথাটা আমার কাছে তুলেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় খবরাখবরের জন্যে তিনি নিজেকে আমার কাজে লাগালেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং অন্য কাজের অজুহাত দেখিয়ে রেহাই চাইলাম, যে-কাজে আমি ডুবে আছি। গান্ধীর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করতে শ্রীমতী মিলিসা ভান্দেকরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম।

নভেম্বর, ১৯২৮। পুলিশী বর্বরতার পরে পরেই ১৭ নভেম্বর, ১৯২৮ তারিখে বোম্বাইতে লাজপত রায় মারা গেছেন। ৩০ অক্টোবর তিনি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ব্যাটনের চারটি আঘাত পেয়েছিলেন, তার মধ্যে দুটি আঘাত বুকে হৃদপিন্ডের অংশে। তাতে হৃদপিন্ড ফুলে ওঠে, তাতেই তিনিই মারা যান। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব-মুহূর্তে এই হত্যাকান্ডের ফলাফল অনুমান করা যায়! এই মৃত্যু এক প্রতীক। ২৩ বছর আগে তাঁর খামখেয়ালি গ্রেপ্তারে অভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছিল ; ১৯০৭ সালে তাঁকে দ্বীপান্তরিত করা হয় ; মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে তাঁর থাকা নিষিদ্ধ হয়েছিল ; এই মহান্ দেশ-প্রেমিকটি অবশ্য ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না ক'রে "ডোমিনিয়ন" সরকারীযন্ত্র সংগঠিত করার পক্ষে সবচেয়ে সমর্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ক্ষেত্র উন্মুক্ত ক'রে দিল তাদের সামনে যাদের সঙ্গে আপস করা অসাধ্য। এককাট্টা বৃটিশ সংবাদপত্রগুলো তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি মুখ বন্ধ ক'রে আছে। এটাই প্রমাণ করে তাদের বেসামাল অবস্থা।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লিগের আবেদনে (ভি. চট্টোপাধ্যায়* এবং হ্বিলি মুনজেনবের্গের স্বাক্ষরিত) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নামে নিচের বার্তাটি পাঠালাম (২৬ নভেম্বর, ১৯২৮) ; আগামী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে :

"আজকের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সমবেত ভারতবর্ষকে আমি আমার

---

* বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নমস্কার জানাই। জগৎ তাকে মিলিত হতে দেখছে সেই বিরাট আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে, ১৭৮৯ সালে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করেছিল 'জেনারেল স্টেটস' (Etats Généraux), তারা মানুষের সামনে এক নতুন যুগ খুলে দিয়েছিল। আজকের দিনটি যেন সেই যুগটিকে চিহ্নিত করতে পারে, যা ইতিহাসে বহন করবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নাম—মুক্ত ভারতবর্ষ (India Liberata)!

এই পবিত্র ভূমি, যেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে ধ্যান-ধারণা ও সভ্যতার মহত্তম প্রবাহগুলো, যারা উর্বর করেছে প্রাচীন মহাদেশকে, এক শতাব্দী ধরে নবীভবনের এক অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছে। প্রতিভার এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা; এই পুনরভ্যুদয়ের দিনগুলোয় আমি স্মরণ করতে চাই তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের বিশাল মূর্তিকে, তার সঙ্গে যুক্ত করি সত্য ও প্রেমের বীর প্রচারক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মূর্তিকে, যাঁকে জগৎ শ্রদ্ধা করে; এঁরা ভারতবর্ষের মনের ঐক্যকে আবার গড়েপিটে নিয়েছেন। নিঃশঙ্ক কর্মী ও মহান্ নাগরিকদের এক সপ্তর্ষিমণ্ডল; এঁদের মধ্যে নাম করছি সেই লাজপত রায়ের আজ যাঁর জন্যে ভারতবর্ষ অশ্রুপাত করছে; এঁদের জন্যেই অগ্রগতির যাত্রায় দীর্ঘ পদক্ষেপে পশ্চিমকে ধরে ফেলা জাতির পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

সময় এসেছে শৃঙ্খলিত প্রমেথিউসের মুক্ত স্বাধীন হয়ে হিমালয়ের উপরে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবার।

যাই ঘটুক না কেন, বন্ধনমুক্ত প্রমেথিউস যেন বিশ্বস্ত থাকে নিজের প্রতি, নিজের অতীত, নিজের আদর্শের প্রতি—যাদের জন্যে সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে; বিশ্বস্ত থাকে ন্যায়ের প্রতি, বিশ্বজনীন আত্মার প্রতি—যা তার মধ্যে বহন করছে আত্মব্রহ্মকে; বিশ্বস্ত থাকে তার মানবতার মহান্ ব্রতের প্রতি—যে-ব্রতই হচ্ছে তার বেঁচে থাকার যথার্থ যুক্তি!

দানবীর জাতীয়তাবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধগুলোর পরিচয় পশ্চিমে আমরা এতো বেশি পেয়েছি যে, আশা করতে পারি না ভারতবর্ষ সেই বধ্যচক্রকে (Roue meurtrière) এড়াতে পারবে, যা ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষগুলোর অস্থি চূর্ণ করছে। সে উঠে দাঁড়াক মানব-ভবিষ্যের সেই উচ্চ মঞ্চে, যেখানে সমগ্র মানবতার কল্যাণে তার নিজের জাতির মধ্যে সমস্ত বিশ্বাসের সংহতি, সমস্ত প্রাণ-শক্তির সহযোগিতা, সমস্ত জাতির মিলন বাস্তবে পরিণত হবে!"

ডিসেম্বর, ১৯২৮। আমার ভারতবর্ষের বাণীটি আমি পাঠিয়েছি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লিগের কার্যকরী সমিতির কাছে (কেন্দ্রীয় অফিস বার্লিনে); কার্যকরী সমিতি আমাকে অনুরোধ করেছেন (১৪ ডিসেম্বর) দ্বিতীয় বিশ্বকংগ্রেসে এক সভাপতির সম্মানিতপদ গ্রহণ করতে, কংগ্রেস বসবে পারীতে ১৯২৯ সালের জুলাইয়ের শেষে। আমি অস্বীকার করলাম (২০ ডিসেম্বর):

"সমস্ত অত্যাচারিতের—জাতির এবং ব্যক্তির—স্বার্থের প্রতি আমার সহানুভূতির

কথা আপনারা জানেন। আমার হস্তক্ষেপ যতবারই বিশেষ ক'রে কাজের ব'লে মনে হবে, আমি ততবারই হস্তক্ষেপ করবো। আমি আমার স্বাধীনতা পুরোপুরি রক্ষা করছি এবং এখন থেকে কোনো কমিটিতে আমার নাম লেখাচ্ছি না। যদিও আপনাদের কমিটি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, কোনো সক্রিয় মতবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা বহুবার অস্বীকার করেছেন—আপনাদের নিচের স্তরের কর্মীদের মধ্যে হিংসার মতবাদ অত্যন্ত সুনজরে গৃহীত হয়, এইজন্যে আমি আমার নাম জড়াতে পারি না।

প্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সমস্ত নান্দনিক বা ধর্মীয় বিবেচনার বাইরে হিংসাকে আমি ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক ব'লে বিশ্বাস করি। কারণ একবার যখন এশিয়ায় হিংসার তরঙ্গ উঠবে, তা আপনাদের উপরেও ভেঙ্গে পড়বে। হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির দেশগুলো এ থেকে কোনোই উপকার পাবে না। হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে বাইরের বর্বরতা গিলে খাবে। আমি সমস্ত বর্বরদের বিরুদ্ধে, তারা সাম্রাজ্যবাদী বর্বরই হোক্, আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বর্বরই হোক্। কারণ সমস্ত শিবিরেই তারা আছে। আর তার পরিণাম একই : মানবতার কবর। আপনারা যাঁরা মহৎ কর্মের উদ্যোগ করছেন, দৃষ্টি রাখবেন, এখনো সময় আছে,—দৃষ্টি রাখবেন কবর খোঁড়ার দলকে দূরে রাখতে!"

৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৮। গত কয়েক মাস আমি আর কোনো কিছুতে মনোযোগ দিচ্ছি না। আমার সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে আছে আমার কাজে। ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত আমার ১ম খণ্ড : 'রামকৃষ্ণের জীবন'-এর পাণ্ডুলিপি কপি-করা শেষ হলো ৩১ ডিসেম্বর।

১৯২৯

১৪ জানুয়ারি, ১৯২৯। পি. নটরাজন* নামে এক দক্ষিণ ভারতীয়; আমার বিশ্বাস পারিয়া বংশের; ত্রিবাংকুর রাজ্যের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (directeur d'école); শ্রীনারায়ণ নামে এক বড়ো গুরুর শিষ্য। কয়েকমাস হলো গুরু মারা গেছেন। (এঁরই কথা এনড্রুজ বলেছিলেন।) এই গুরু ছিলেন খুবই বিরল জাতের এক কর্মজ্ঞানী, তাঁর মহৎ বুদ্ধিবৃত্তি ছিল সামাজিক কল্যাণমুখী। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, এবং দীর্ঘদিনের মনঃসংযোগের পর তাঁর ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ২০ লক্ষ বিশ্বস্তের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁরই মতো এই দক্ষিণ ভারতীয়দের বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশি বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ, বা অন্তত বুদ্ধিগত বিশ্বাসের প্রতি প্রবণতা (আমি যা ভেবেছিলাম, তার বিপরীত)। নারায়ণ বাংলাদেশের ভাবালুতা ও ভাববিভোর ভক্তিকে অবিশ্বাস করতেন। তিনি

---

*রলাঁ 'নটরায়ন' বলে উল্লেখ করেছেন। অনু.

দাঁড়িয়েছিলেন যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান নিয়ে। নিজে বক্তা না হলেও, বড়ো সভায় বক্তৃতা না করলেও, তিনি মানুষের উপরে ব্যক্তিগতভাবে ক্রিয়া করতেন, একজন ক'রে মানুষের একান্ত জীবনে ঢুকতেন। নিরন্তর তৎপরতায় তিনি তাদের খুঁজে বেড়াতেন, খাওয়াদাওয়ার পর সন্ধ্যায় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলতেন, তাদের পাশে রাত কাটাতেন, সকাল হলে ফিরে আসতেন। তাঁর ভালোমানুষী, বিচক্ষণতা, প্রীতিপূর্ণ খোসমেজাজ দিয়ে তিনি তাদের কুসংস্কার থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর বিশ্বাসটি ছিল, যাকে মনে হয়, ইতর-যূথের কাছে সবচেয়ে অগম্য ঃ শংকরের অদ্বৈতবাদ। তবুও ঘোরানো পথে একটু একটু ক'রে তিনি সরলতম মানুষদের মনের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিলেন। এই-ভাবে তিনি কিছু কিছু মন্দিরকে সামাজিক সেবাসদনে পরিবর্তন ক'রে ফেলতে পেরেছিলেন, তিনি চাষীদের মূর্তিপূজার নিরর্থকতা থেকে মন ফেরাতে পেরেছিলেন এবং তাদের দিয়ে মূর্তির বদলে বসিয়েছিলেন বেদির উপরে সামান্য একটা আয়না—তার সামনে পূজার ভঙ্গিতে এক নারী ; নিরর্থক ব্যাখ্যা ছাড়াই, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার তাদাত্ম্যের অতি সহজবোধ্য ও চিত্তশালী প্রতীক। সর্বোপরি, তাঁর বিরাট ক্ষমতা ছিল মানুষকে ঢেলে সাজাবার ; তিনি প্রচুর শিষ্য তৈরি করেছিলেন ; নিজে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করতেন না, তাদের বলতে শেখাতেন, তাদের যুক্তি ও মতবাদ যুগিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বিরাট এক কৌতূহলী জনতার সামনে ; জনতা আশা করেছিল এই দুই বিরাট গুরুর মধ্যে মতের লড়াই, আর তারা অবাক হয়েছিল দু'জনের গভীর ধৈর্য ও পারস্পরিক বিনয় দেখে। নারায়ণ গান্ধীকে জানতেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কোনো কোন সময়ে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। যে তরুণ ভারতীয়টি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁর বাবা ভারতবর্ষ মহাপরিক্রমার সময়, আমেরিকা যাবার আগে বিবেকানন্দকে জানতেন। তিনি মাদ্রাজের সেই তরুণদের একজন ছিলেন, যাঁদের মধ্যে থেকে বিবেকানন্দ তাঁর সবচেয়ে উৎসাহী শিষ্যদের পেয়েছিলেন এবং তারপর থেকে তাঁদের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক রাখতেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং তখনকার বিখ্যাত বক্তৃতাগুলো শুনেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণপন্থী হয়েছিলেন, কিন্তু নারায়ণকে অনুসরণ করার জন্য সে-সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন ; নারায়ণের মনের ধরনটা দক্ষিণ ভারতীয়দের মনের সঙ্গে ভালো মানিয়ে নিতে পারে ব'লে তাঁর মনে হয়েছিল। নটরাজন তামিলে কথা বলেন, প্রাচীন ও বর্তমানের মহৎ কাব্যসৃষ্টিতে ভাষাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। জাতটাও অত্যন্ত সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু (অরবিন্দের মতোই) নটরাজন দাবী করেন যে, উত্তরের ভারতীয় জাতি থেকে এই জাতটা মূলত অত্যন্ত পৃথক নয় এবং আর্য ও দ্রাবিড়দের পার্থক্যটা মনগড়া ঃ পশ্চিমধার বরাবর সেই একই জাতি পরম্পরাগত ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে কেপ কমোরিন পর্যন্ত, পরে উঠেছে অন্যদিক দিয়ে ঃ বিতাড়িত আদিম জাতিগুলো জড়ো হয়েছে মধ্যস্থলে। তাঁর নিজের রংটা গাঢ় বাদামী, মুখটা বড়োসড়ো, গাঁট্টাগোট্টা শরীর ; দেখতে ছোটোখাটো, বলশালী, বেশ কুশ্রী, বুদ্ধিমান, বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু

টাইপটা শারীরিক দিক থেকে পাঞ্জাবের কোনো কোন টাইপ থেকে খুব পৃথক নয়। (মানসিক দিকের কথাটা, অন্য ব্যাপার! পাঞ্জাবীদের কথা বলতে গিয়ে নটরাজন তাদের লড়ুয়ে স্বভাবের সংজ্ঞা দিলেন "সীমান্তের জাতি" কথাটি দিয়ে। এটা লক্ষণীয় যে, পাঞ্জাবের আর্যসমাজী মহান্ ধর্ম—এই বীরোচিত বৈদান্তিক মতবাদ মাদ্রাজে এবং দক্ষিণ ভারতে মোটেই অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। পাঞ্জাবী জাতের মতোই এটিকে আমার কাছে বলিষ্ঠ ও বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়।) নটরাজন ইউরোপে এসেছেন শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা শেষ করতে; এবং তিনি কাজ করছেন জেনেভার জে. জে. রুসো ইন্‌স্টিটিউটে। পারীর 'ফাকুল্‌তে দে লেতর'-এ শিক্ষা সম্পর্কে এক গবেষণার জন্যে নাম লিখিয়েছেন। একল্ নুভেল-এর ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে তিনি ভারতীয় গুরুর শিক্ষার আদর্শের সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন; একল্ নুভেল শিক্ষায় শিশুদের উপর বেশী জোর দেয়।

১৫ জানুয়ারি, ১৯২৯।

…'য়ুরোপ' পত্রিকা এবং তার প্রকাশক 'ক্রেমিয়্য প্রকাশনী'কে তার কিম্ভূত ধর্মীয়-চিন্তাবিরোধী মনের জন্যে তিরস্কার করাও মুখবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল; এই সব নিজেকে নতুন ব'লে ঠাওরায়, এটা শুধু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ভোঁতা যুক্তিবাদ ও স্থূলবপু পজিটিভ-বিজ্ঞানবাদের (Scientisme) বাতিল-করা মাল। মনের গভীর ও আবেগদীপ্ত সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে সেই একই এবং বিশেষ ক'রে ধর্মের বাইরে, খাঁটি অর্থে—ধর্মীয় সার্বভৌম অধিকার দাবি করেছিলাম। আমি এক বিদ্রোহের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু শিক্ষাটি গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন বন্ধুর কাছ থেকে চিঠিপত্র পাচ্ছি। সে-সবে নিশ্চয় ক'রে বলা হচ্ছে যে, আমার প্রবন্ধ তাঁদের নিজেদের চিন্তার উত্তর যোগাচ্ছে। মার্তিনে লিখেছেন: "আমার মনে হচ্ছে, আমি আর কোনদিন আপনার এতো কাছাকাছি ছিলাম না…মাস খানেকের বেশি হলো আমি নতুন ক'রে কাব্যের এক কারখানা (chantier) খুলেছি…এটা সম্ভবত সেই রচনা, গত বিশ বছরেরও বেশি কানে যার দূরাগত অস্ফুট স্বর শুনেছি! তাই দেখা যাচেছ, যা কিছু নতুন জিনিস আমি আপনার মধ্যে সদ্য পড়লাম, সবই তাদের মতো ক'রে আমার কবিতায় মূর্তি ধরেছে, এমনকি তার সারাৎসারেও…" (৭ জানুয়ারি)। জাঁ রিশার আমাকে লিখেছেন: "আপনার মুখবন্ধ আমাকে অভিভূত করেছে। প্রতিটি লাইনে আপনাকে বুঝতে পারছি, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, আপনাকে পুরোপুরি খুঁজে পাচ্ছি; এবং আপনার মধ্যে নিজের কথাই শুনতে পাচ্ছি, নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি। একদিন আপনি চিন্তার সেই আন্দোলনে মজা পাবেন, গত দু'বছর ধরে যা কোনো কোনো গভীরতার দিকে আমাকে টানছে। আপনার মনের আন্দোলন থেকে তা যতো পৃথকই হোক না, বুদ্ধিজীবীর সেই

তৃপ্তি থেকে এ অদম্যভাবে বিচ্যুত, যাতে আমাদের সমকালীন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা আহার খুঁজে পান এবং তুষ্ট থাকেন…”—এমনকি রনে আর্ক’ও—কিন্তু অনেকে বিচক্ষণের মতো—আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তাঁরও স্বভাবের বেশ অর্ধেকটাই ধার্মিক, কিন্তু ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি পবিত্র নামগুলো বড়োই ক্লান্তিকর, এবং এগুলোকে বদলাতে হবে! আমি বিশ্বাস করি না যে, তাঁরা যা বলছেন ও যা বিশ্বাস করছেন, আমাদের চিন্তা সেই রকম কাছাকাছি যেন হয়। অভিজ্ঞতা আমাকে বিচক্ষণ করছে—বিশেষ ক’রে করেছে এই ভয়ংকর জাঁ-রিশার সম্পর্কে; তিনি যখন দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভেতরে ঢুকেছেন এবং (এমনই উদ্ধত!) অন্যের চেয়ে অনেক বেশি ঢুকেছেন, তখন তিনি অন্যের চিন্তা থেকে যতো দূরে থাকেন, ততো বেশী দূরে অন্য কখনো থাকেন না। কিন্তু পশ্চিমের অন্তঃকরণে নতুন যে গভীর প্রবাহ জানান দিচ্ছে, এটা অন্ততপক্ষে, তার একটা চিহ্ন। আর আমি এই অনুভব ক’রে খুশী যে, আমি তার মধ্যে অংশ নিচ্ছি এবং তার ঘোষণা করছি। মনের নতুন জীবন তার যে আদল ফুটিয়ে তুলেছে, পারী থেকে আমার অনুপস্থিতি, তার সম্পর্ক হারিয়ে ফেলার চেয়ে, তার অন্তরে আমাকে আরও বেশি ঝাঁপ দিতে ঠেলেছে। আমাদের নিজেদের সম্পর্কে গভীর থেকে এবং কার্যত গভীরতরভাবে দৃঢ়-প্রত্যয়ী হওয়াটা কিন্তু বড়োই ভালো, আর, যা-কিছু আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত, তারা, সমষ্টি-“আমি”-র (—“তার”) অঙ্গীভূত, যা আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইদের এগিয়ে-চলা আত্মার অন্তর্ভুক্ত করে।

১৯২৯। ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত আমার ডায়েরি লেখায় পুরোপুরি ছেদ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার নতুন খণ্ডগুলো (‘রামকৃষ্ণ’ ও ‘বিবেকানন্দ’) কপি করতে ও টাইপ করা কপি সংশোধন করতে পুরোপুরি এই তিনটি মাস লেগে গেছে। …অবশেষে ২২ মে আমি থেমেছি। দু’বছর ধরে জড়ো করা বিপুল পুঁথিপত্রের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়েছি। এরই মধ্যে ‘য়ুরোপ’ পত্রিকা আমার দুই খণ্ডের (বিশেষ ক’রে ‘বিবেকানন্দের জীবন’-এর) পাঁচটি প্রবন্ধের সারাংশ ছেপেছে; এবং ভারতবর্ষের হিমালয় থেকে প্রতি সপ্তাহে স্বামী অশোকানন্দ উদ্বিগ্ন ও উন্নাসিক সনাতনী-নিষ্ঠার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধন পাঠাচ্ছেন : কারণ প্রথম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

জুন, ১৯২৯। আট দিন হলো স্টক প্রকাশনীতে আমার ভারতীয় গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডের (‘বিবেকানন্দ ও বিশ্বজনীন ধর্মবাণী’ সম্পর্কে) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। যে কাজটা করতে দু’বছর লেগেছিল, তা বেশ হয়েছে। প্রথম খণ্ড এখন পারীতে ছাপা হচ্ছে। আর রামকৃষ্ণ-মিশনের অশোকানন্দের সঙ্গে সপ্তাহে

সপ্তাহে পত্রালাপ করছি, এই বইটির ইংরেজী অনুবাদ তিনি আবার খুঁটিয়ে দেখছেন। আমার একথাও বলা উচিত যে, ইউরোপের ঈশ্বরতত্ত্ববিদদের মতোই তাঁদের "আক্ষরিকতার" ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা সমান খুঁতখুঁতে, আর রোমের মতোই তাঁদের নলের মাথার আংটায় (ferule) আমি ভালো খাপ খাবো না।

২৭ অক্টোবর। তরুণ মণিলাল প্যাটেলের আগমন, তিনি জার্মানীতে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রুডলফ্ অটোর কাছে দু'বছর দর্শন পড়েছেন। তাঁর কথা শুনে মনে হলো, ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদে ইউরোপীয়রা আকর্ষণ অনুভব করছে, এখন ইউরোপীয়দের কাছে এ যতটা না অপরিচিত তার চেয়ে অনেক বেশি অপরিচিত আধুনিক ভারতীয়দের কাছে। তিনি গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনের আশ্রমেই কাজ করেছেন এবং দু'জায়গায় তাঁতে বোনা দুটো কাপড় আমাদের জন্যে নিয়ে এসেছেন। ভারতববর্ষে যে ঘটনাবলী ঘটতে চলেছে সেই ব্যাপারটি তাঁর মন খুব জুড়ে আছে এবং তিনি খুব নৈরাশ্য বোধ করছেন। গান্ধী যে-পথে নিয়ে চলেছেন তার বাইরে সম্ভাব্য অন্য কিছু এখন তাঁর চোখে পড়ছে না। মুসোলিনিপন্থী ইতালীয় ভারত-বিদ্যাবিদদের সম্পর্কে এবং ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, তাঁরা এবং তাঁদের দুচে যে ফাঁদ পেতেছিলেন, তা এড়িয়ে যাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা কখনো ক্ষমা করেননি। ইউরোপ থেকে ফেরার পর হিমালয়ে প্রথমবার যখন অধ্যাপক তুচ্চি সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। (আগে দ'জন বন্ধু ছিলেন।) তুচ্চি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁকে নমস্কার করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাছাড়াও, মণিলাল তুচ্চির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর জন্যে ইউরোপে সুপারিশপত্র দিতে অনুরোধ করায়, তুচ্চি তাঁকে বলেছিলেন, যদি এখুনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ইস্কুল তিনি ছেড়ে দেন, শুধু তাহলেই তিনি সুপারিশ করবেন। অপর ভারতবিদ্যাবিদ ইতালীয়টি কম খ্যাপা মুসোলিনিপন্থী ছিলেন না—কিন্তু তাঁকে কম রূঢ় এবং অনেক বেশি মানবিক দেখাতো। মণিলালকে অভিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ ব'লে মযে হলো ; তিনি বললেন, অরবিন্দ ঘোষের সংস্কৃতবিদ্যা খুবই বিতর্কমূলক ; তাঁর ব্যাখ্যাগুলো প্রায়ই জোর ক'রে করা, যদিও তাঁর মনের আলোয় মূল পাঠগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে।

১৭ নভেম্বর, ১৯২৯। আঁদ্রে কার্পেলে এবং তাঁর স্বামী হুগমানের আগমন। (আঁদ্রে কার্পেলের স্বাস্থ্যের জন্যে কয়েকমাস যাবৎ তাঁরা তেরিতে-য় কলিন-এ আছেন।) আঁদ্রে কার্পেলে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ট ইতালি অভিযানের কাহিনী বললেন, তিনি এর সাক্ষী : কারণ কবি আসবেন জেনে তিনি নেপলসে হাজির ছিলেন এবং তাঁর থাকার সময় কিছুটা অংশ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম

অন্তরঙ্গ বন্ধু। যাত্রার আগে, ভারতবর্ষে প্রথমে অধ্যাপক তুচ্চি চেষ্টা করেছিলেন সমস্ত আত্মীয়জন থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন করতে, যাতে তাঁকে একাই ফ্যাসিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থে তাঁর নাম ও গৌরবকে কাজে লাগাতে। এটা ছিল একটা সত্যিকারের ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র করেছিলেন ইতালীয় বুদ্ধিজীবীরা (ফর্মিচি ও তুচ্চির নেতৃত্বে) মুসোলিনির সঙ্গে বোঝাপড়া করেই। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের কেউ নিশ্চিত ছিলেন না ; তিনি বাবার সঙ্গে যেতে চান, তাঁকে এড়াবার জন্যে বাবার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য সৃষ্টি করার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছিল ; কবির অনুগামীদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর মতো নোংরামিতে তুচ্চি নেমেছিলেন—(যে-মানুষটি সবচেয়ে স্বার্থশূন্য এবং যিনি বাবার জন্যে তাঁর গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন)—তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর টাকা পয়সা প্রকৃত তছরূপের অভিযোগও আনা হয়েছিল। চারপাশে কী ঘটে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদাসীন—অত্যধিক মাত্রায় উদাসীন, তবু তিনিও এহেন গুজবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন : এবং এই অপচেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী বাবার সঙ্গেই গিয়েছিলেন—কিন্তু অন্য জাহাজে—কারণ ব্যবস্থাটা এমন করা হয়েছিল যে, ইতালীয় জাহাজটিতে কবির জন্যেই জায়গা ছিল। (দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ইতালি সরকারের তাতে রথীন্দ্রনাথের একটু উদ্বেগ হয়েছিল, মুসোলিনি সম্পর্কে তাঁর নিজের অবিশ্বাস ছিল। কবি কিন্তু এই ভয়কে অযৌক্তিক ব'লে মনে করেছিলেন ; তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে মুসোলিনি সম্মানের যোগ্য এবং ইতালি এক স্বাধীন গণতন্ত্র।) ব্রিন্দিসিতে পেঁছুতে না পেঁছুতে দেখা গেল একটা সরকারী ট্রেন অপেক্ষা করছে, সঙ্গে অধ্যাপক ফর্মিচি, তাঁর উপর ভার ছিল সন্দেহভাজন সঙ্গীদের থেকে দূরে রেখে কবিকে সঙ্গে ক'রে সোজা মুসোলিনির কাছে নিয়ে যাওয়ার। প্ল্যাটফর্মে কার্পেলেদের ফেলে রেখে ট্রেন চলে গেল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গী ইংরেজ এলমহার্স্ট জোর ক'রে তাতে চেপে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কার্পেলেদের দু'দিন পর রোমের আগে আর দেখাই হয়নি। এলমহার্স্টের কাছে পরিস্থিতি মেনে নেওয়া অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিয়েছিলেন, তিনি এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেছিলেন : তিনি সোজা ইংলন্ড রওনা হয়েছিলেন। এই সব অত্যুৎসাহী আপ্যায়নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খারাপ কিছু দেখতে পাননি, এ সব তাঁর কাছে প্রীতিকরই মনে হয়েছে। বিশ্রীভাবে নিজেকে তিনি প্রতারিত হতে ও নিজের নাম ভাঙাতে দিয়েছেন। তাঁকে ফ্যাসিস্ট উৎসবগুলোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, এগুলো তাঁর সম্মানার্থে ডাকা শিশুসমিতিগুলোর উৎসব। আর যেহেতু তিনি ইতালীয় জানতেন না, ফ্যাসিবাদের এই গলা-ফাটানো দেবায়নে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বসে থাকতেন, যেন এ সব তাঁর জন্যেই করা হচ্ছে। এ থেকে বোঝাই যায় যে ইতালীয় ভাষা-জানা যে বন্ধুরা তা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখা হয়েছিল। চারপাশে যা সব বলা হচ্ছিল তাঁর অর্থ রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে ফর্মিচি তার যে মিথ্যা

তর্জমা করছেন, কার্পেলে তা শুনতে পেয়েছিলেন এবং এই রকম, রবীন্দ্রনাথ যখন একটা বাণী ফর্মিচির হাতে দিয়েছিলেন পাঠাবার জন্যে, তিনি একেবারে অন্য কথা পাঠিয়েছিলেন। ছেলে রথীন্দ্রনাথ সত্যিকারের বিদ্রোহ করেছিলেন শুধু সেই দিনই, যেদিন রবীন্দ্রনাথ ইতালি ছাড়ছেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফর্মিচি রবীন্দ্রনাথের কাছে চাইলেন ইতালির জনগণের উদ্দেশ্যে এক বিদায়বাণী। রথীন্দ্রনাথ ফাঁদটা ধরে ফেললেন, বলে ফেললেন ঃ "না। কবি যা বলবেন আমি কথাগুলো যথাযথ লিখে নেবো।" এবং তিনি তা লিখিত ভাবে পাঠালেন। তাতে মূল কথাগুলো বিকৃত হতে একটুও বাধা হয়নি, তবু তাতে তাঁর মনোগত ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকাশ্যে ফ্যাসিবাদের অস্বীকৃতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মুক্ত করায় (ভিলন্যভে থাকার জন্য আংশিকভাবে) যে আশা ভঙ্গ ঘটেছিল, তা সহ্য করার মতো চতুর ফ্যাসিবাদ ছিল না। সে চুপ ক'রে থাকতে পারতো। সে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিল। অসম্মানে ও কুৎসায় রবীন্দ্রনাথকে ঢেকে দিয়েছিল। তাঁকে বলেছিল বিশ্বাসঘাতক, ইতালির নুন খেয়ে তার অপমান করেছেন। এবং তারপর থেকে ইতালির দরজা তাঁর সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ডিসেম্বর, ১৯২৯। ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। জনগণের কাছে আবেদনে গান্ধী মতিলাল নেহরুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। পাশার দান পড়ে গেছে।

১৯৩০

জানুয়ারি, ১৯৩০। ৬ জানুয়ায়ি স্টক প্রকাশন থেকে আমার 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্বজনীন ভগবদ্বাণী প্রকাশিত হলো—এর প্রকাশ মিলে যাচ্ছে ২৯ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসের উদ্বোধনে জহরলাল ও গান্ধীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৩০। প্রকাশকদের কাছে (স্টক এবং রামকৃষ্ণ মিশন) আমার প্রথম খন্ড 'রামকৃষ্ণের জীবন' পাঠালাম। ১৫ ডিসেম্বর (১৯২৯) থেকে 'য়ুরোপে'-এ ধারাবাহিক উদ্ধৃতাংশ ছাপতে শুরু করেছি।

ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে গান্ধী ঘোষণা করেছেন এ বছর ভারতবর্ষ ত্যাগের ইচ্ছা নেই এবং আগে-ঠিক-করা ইউরোপ সফর তিনি বাতিল করলেন। আমি তাঁর যুক্তিগুলো খুবই ভালো বুঝি ঃ এ হচ্ছে যুদ্ধের নিশিপালন। কংগ্রেসের কাছ থেকে গান্ধী সদ্য নির্দেশ পেয়েছেন যে, দাবি-জানানো ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের

সম্মতির জন্যে ইংলন্ডকে এক চরম সীমা বেঁধে দেওয়া হোক্। গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, চরম সীমা পেরিয়ে গেলে—তা পেরুবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর—তিনি তাঁর বাকী জনগণের সঙ্গে যোগ দেবেন, যারা বিনা শর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা চাইছে। তাই এ অত্যাবশ্যক যে, তিনি যেন যুদ্ধের বা প্রতীক্ষার ঘাঁটি না ছেড়ে যান। তবুও আমি তাঁকে লিখেছি (১৭ ফেব্রুয়ারি), যে-সংগ্রাম হতে চলেছে তার সম্পর্কে ইউরোপের ধারণা পরিষ্কার করার জন্যে, তাঁর বদলে এমন এক বা একাধিক ভারতীয়কে পাঠানো দরকার হবে, যাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পৃথিবী ব্যাপী। এটা খুবই স্পষ্ট যে, শুরু হতে না হতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে ঘিরে রাখবে, এবং মিথ্যা সংবাদে জগতের মতামতকে ভাসিয়ে দেবে—ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে তাকে ঘোরাবার জন্যে। এই জন্যে আগ বাড়িয়ে যেতে হবে।

মার্চ, ১৯৩০। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ স্বামী শিবানন্দের একটি চিঠির কপি; তাঁকে আমার ৩ খন্ড পাঠিয়েছিলাম। আমার আগামী সংস্করণের কয়েকটি লাইন (নীচে দাগ দিয়ে) উদ্ধৃতি দেবো; কারণ এতে রামকৃষ্ণের চিন্তা বিশ্বস্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে, লেখার সময় এটাই ছিল আমার চিন্তা।

"স্বামী শিবানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। ২০।২।৩০

প্রিয় শ্রীযুক্ত আর. আর.,

গত ডাকে আপনার লেখা ৩ খন্ড এসেছে। সহস্র ধন্যবাদ···শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সামনে রক্ত মাংসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আপনি তাঁকে বিশ্বস্তভাবে এঁকেছেন,—সম্ভবত তা যদি পুরোপুরি তিনি না হয়েও থাকেন। কিন্তু আপনি যা করেছেন তা জমকালো এবং চমৎকার। আমি ভাবছি, তা অন্তত কাউকে কাউকে খাঁটি খ্রীষ্টান, কাউকে কাউকে খাঁটি হিন্দু এবং কাউকে কাউকে খাঁটি মুসলমান হতে সাহায্য করবে, - এবং আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান—এ কথা বলতে পারার মতো অনুসরণ-যোগ্য পথ তাদের দেখাবে··· স্বাঃ স্বামী শিবানন্দ

এপ্রিল, ১৯৩০। ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কে আমার বইগুলোর ব্যাপারে পাওয়া কৌতূহলী চিঠিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে কনস্ট্যান্টিনোপলের মাদ্রাসার (ফরাসী-আরব উচ্চ মহাবিদ্যালয়) অধ্যাপক জে. এইচ. প্রবস্ত্. ডি. লিট.-এর একখানি চিঠি;—এটি লিখে রাখার মতো। তিনি লিখেছেন যে, আমার ৩টি খন্ডই "উদারপন্থী খ্রীষ্টান ও মুসলমান বন্ধুদের কাছে এক সত্য উদ্ঘাটন। (প্রবস্তের মতোই) তাঁরা গণ্য করেছেন যে, রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের সারগ্রাহিতা (ec'lectisme) উত্তর আফ্রিকার ইউরোপীয়, ইহুদি, আরবদের মধ্যে অতি দীর্ঘস্থায়ী জাতি ও ধর্মের ঘৃণাকে কমাবার মতো উপায়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।" তাঁরা টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াতেও রামকৃষ্ণগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতেও চাইবেন। প্রবস্তের সঙ্গে কাসাব্লাংকা,

রাবাত, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়ার পত্রালাপকারীরা (সরবারী কর্মচারী, দোভাষী, অবসরপ্রাপ্তরা, সংবাদপত্রের লেখকরা) এই সৃষ্টি ঘটাতে ঝুঁকবেন। প্রবস্তু পরামর্শ চেয়েছেন, এবং ব্রেজিলীয় গোষ্ঠীর ঠিকানা চেয়েছেন যাতে রামকৃষ্ণের ধর্মবাণীর পর্তুগীজ তর্জমা জোগাড় করতে পারেন, সেটাই আফ্রিকায় ইংরেজি এবং জার্মানের চেয়ে পড়া অনেক সহজ হবে।

ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি।

এপ্রিল, ১৯৩০। আমার বইতে বিবেকানন্দের মূর্তি নতুন ক'রে দেখতে পেয়ে এমা কাল্‌ভে আমাকে তাঁর মনের ভাব লিখে জানিয়েছেন ; বিবেকানন্দ তাঁর কাছে ছিলেন পরিত্রাতা।

২২ এপ্রিল, ১৯৩০। আঁদ্রে ফিলিপের আগমন ; অর্থনীতি, শ্রমিকসংগঠন ও সমবায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছর তিনি মাস কয়েক ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছেন। গান্ধীকে ভালো ক'রেই দেখেছেন এবং তাঁর মনে এক অত্যন্ত জোরালো ছাপ পড়েছে। (মহাত্মার প্রধান বৈশিষ্ট্য যা তাঁর স্মৃতিতে আছে, তা হচ্ছে ব্যঙ্গপ্রবণতা (I'ironie), তা বিশ্বাস ও নম্রতার কোনো ক্ষতি করে না। —কোনো ব্যাখ্যা না করতে পারলেও, গান্ধীর বশ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সকলেই একমত। (—ফিলিপের স্মৃতিচারণের যা আমার মনে রয়ে গেছে, তা হচ্ছে বিচারের স্বাধীনতা, গান্ধীর আশ্রমের প্রায় ২০০ সদস্যের মধ্যে যা তিনি লক্ষ করেছিলেন। সবাই গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কেউ বলতে দ্বিধা করে না : "এই ব্যাপারে, আমি তাঁর মতো ভাবি না"। আর গান্ধী কোনো বিরুদ্ধ-কথা প্রকাশ ক'রে বললে পছন্দ করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভবিষ্যত নেতাদের এক মহড়া দেবার আখড়া (pépiniere) গড়ে তুলেছেন, তাঁরা একে অন্যকে এবং তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। বড়ো মানুষদের মধ্যে এটি সম্ভবত সবচেয়ে বিরল। এর বিপরীত, রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে শিষ্যরা সবাই হচ্ছেন ছায়া, গুরুর রৌদ্রালোকে সে ছায়ারা মিলিয়ে যায়।)

২২ মে, ১৯৩০। বুয়েনোস-এয়ার্সের বড়ো সংবাদপত্র 'ক্রিতিকা'-র, সংবাদদাতা, এক আর্জেন্টিনীয় সাংবাদিক আরিয়াসের আগমন, তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠানো হচ্ছে সেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন দেখতে-বুঝতে। আমার কাছ আগে তাঁকে পাঠানো হয়েছে এইজন্যে যে, আমি তাকে হালফিল ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ক'রে দেবো। আর বাস্তবিকই, এটা মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয় : কারণ যে-দেশে তিনি যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভিসা পেতে তাঁর কম কষ্ট হয়নি, বার্লিনে ইংরেজ কনসাল তাঁকে বলেছিলেন : "আমাদের এখানে যা ঘটছে, তা দিয়ে আপনার কী হবে? ভারতবর্ষ কিসে

আর্জেন্টিনার আগ্রহ জাগাতে পারে?” লন্ডনে শক্তিশালী পত্রিকাটির ক্ষমতা সমঝে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। আমি তাঁকে কিছু জানাশোনার সূত্র দিলাম, কলকাতায় ও আমেদাবাদে, গান্ধীর আশ্রমের মিস স্লেড ও রিজিনাল্ড রেনল্ডসের কাছে। আমি ভাবছি, কিন্তু এখান থেকে তিনি যখন ভারতবর্ষে পৌঁছুবেন, একটিও গান্ধীপন্থী তখন জেলের বাইরে থাকবে কি না। আন্দোলন সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। জেলখানায় বন্দী গান্ধী এক সম্রাট সেজে বসেছেন তাঁর সিংহাসনে। এক বছর আগেও ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলো দেখাতো যেন তাঁকে মোটেই চেনে না, কিংবা তাঁর সম্পর্কে কথা বলতো বিদ্রূপের সঙ্গে, এখন তাঁর আলোচনা করছে এক বিস্মিত শ্রদ্ধা নিয়ে।

জুন, ১৯৩০। ভারতবর্ষের জন্যে আমার হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে লেখা অনেক চিঠি পাচ্ছি। ‘মঁদ্’-এর মাধ্যমে পাঠানো একটা চিঠির এই জবাব দিলাম (৩ জুন) ঃ

“গান্ধীর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ আন্দোলন জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় ইউরোপের অসংখ্য চিঠি পাচ্ছি। এই জাগরিত আবেগকে আমি বুঝি এবং ‘মঁদ্’-কে আহ্বান করছি স্বাধীনতার দাবি জানানো ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতির প্রকাশকে ঘোষণা করতে। এতে তার অধিকার আছে। এবং তা গ্রহণ করার শক্তি তার আছে। কিন্তু গান্ধী এবং তার স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক। সেটা হবে, এমনকি, গান্ধীর অভিপ্রায়ের বিপরীত। যখন এই শক্তিশালী আন্দোলনের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, গান্ধী কখনো ভাবেননি যে, তিনি ও তাঁর লোকজন এ থেকে অক্ষত বেরিয়ে আসবেন। সুচিন্তিত ভাবেই তিনি জেলখানা ও মৃত্যুর সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি লিখেছিলেন, এমন এক অভিযানের পর “একজন সত্যাগ্রহীও বেঁচে বা মুক্ত থাকবে না”। এটা শুধু কথা নয়। যাদেরই সত্যি সত্যি একটা বিশ্বাস আছে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকে এবং তা এড়াবার চেষ্টা করে না ঃ কারণ তারা জানে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের বিজয় কম দামে কেনা যায় না। ভারতবর্ষ এমনই নিশ্চিত যে, গান্ধীর গ্রেপ্তারের জন্যে প্রতিবাদ নয়,—এই দিনগুলোয় ভারতবর্ষ শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। (‘ইয়ং ইন্ডিয়া,’ ১৫ মে)। এক ট্রাজিক অঙ্কের (Actus tragicus) নিয়তিনির্দেশক বিস্তার আমরা প্রত্যক্ষ করবো যা গান্ধী আগেই দেখেছিলেন, চেয়েছিলেন এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উপসংহারে ভারতবর্ষের বিজয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যতখুশি অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে ঃ তার দিন গোনা-গুনতি। তার শক্তি আর বাহ্বাস্ফোটের বহর দেখে আমরা যেন ভুল না করি! আজ থেকে এক জন্তু কোণঠাসা হয়েছে, সে তার জীবন বাঁচাচ্ছে। এক দানবীয় অবিচারের পাহাড়ের উপরে, লক্ষ লক্ষ মানুষের আমৃত্যু শোষণের উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে ; সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের শক্তির চেতনা ফিরে পেয়েছে। তাদের শুধু কাঁধঝাড়া দিতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার বনিয়াদের উপর ইতিমধ্যেই কাঁপছে। আমরা তাকে গুঁড়িয়ে

পড়তে দেখবো। তার পতনের পথ যেন সমস্ত লুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যই অনুসরণ করতে পারে! এবং মানবতার কাছে আমাদেরও হিসাব-নিকাশ দাখিল করার আছে!

পুনশ্চ ঃ ব্যক্তি হিসেবে ইংরেজের প্রতি (স্বয়ং গান্ধীর মতো) আমার যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার ধিক্কার যে, তাঁকে মোটেই স্পর্শ করে না, সে-কথা বলার কি প্রয়োজন আছে? এক বিরাট সংখ্যক ইংরেজ আমাদের বন্ধু। কেউ কেউ ভারতবর্ষের অতিক্ষত্রোচিত প্রবক্তা। কিন্তু আমাদের সরকারগুলোর অপরাধের পুরো দাম আমাদের দিতে হবে। আমাদের ফরাসীদের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবে না।”

(এই আবেদনের নাম দিয়েছি ঃ “ভারতবর্ষ জিতবে,” প্রকাশিত হয়েছে ১২-১৪ জুনের কাছাকাছি।)

জুন, ১৯৩০। অডেনওয়াল্ডের ‘নববিদ্যালয়ে’র শিক্ষিকা, শ্রীমতী ভি. কেলের প্রায় এক বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে এসেছেন, সেখানে মিস ম্যাকলিঅড তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ৫ জুন তিনি আমাদের সঙ্গে খেলেন এবং তাঁর সফরের কথা আমাদের শোনালেন। কলকাতার কাছে বেলুড়ে তিনি মায়ের বাড়িতে দু'তিন মাস কাটিয়েছেন। যে-মূর্তি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা গান্ধীর মূর্তি। এমনকি যে-রামকৃষ্ণ মিশনে রাজনীতিকে বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়, সেখানেও সমস্ত সন্ন্যাসীরা মহারাজ পর্যন্ত তাঁর চিন্তায় উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল হাস্যমুখে তাঁর কথা বলেন। শ্রীমতী ভি. কেলের অবশ্য কিছুটা হাস্যোদ্দীপক ছোটোখাটো বৈশিষ্ট্যগুলোও দেখতে ও মনে রাখতে জানেন (এবং গান্ধীর ওখানে এগুলোর মোটেই অভাব ছিল না); তিনিও তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েছিলেন ঃ সর্বোপরি হয়েছিলেন তাঁর পরম সরলতায়, তিলমাত্র আড়াল না-দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তের সত্যতায় এবং তাঁর চারপাশের ছোটো থেকে বড়ো প্রতিটি জিনিসের প্রতি মনোযোগী কৌতূহলে। যে সব অঙ্গভঙ্গি হাস্যকর ব'লে গণ্য, তা না-হেসে মেনে নেওয়ানোর গুণ তাঁর আছে ঃ (খাবার আগে সবার সামনে তিনি তাঁর বাঁধানো দাঁত আনিয়ে নেন, শান্তভাবে সেটা পরেন, খাবার পর সেটা খোলেন এবং একটা কাচের গেলাশের জলে সেটা রেখে দেন।) যারা তাঁর চারপাশে থাকে, তারা সকলেই তাঁকে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে এবং তাদেব সঙ্গে তিনি সমপর্যায়ে গল্প করেন, এক অন্তরঙ্গ ভালোমানুষী নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাদের পরামর্শ দেন, তাঁর ওখানে শ্রীমতী ভি. কেলের আমাদের বান্ধবী মীরাকে (মিস স্লেড) দেখেছেন, তার আচার-আচরণ গর্বোদ্ধত, তিনি বললেন “এক রোমান গৃহকর্ত্রী”।

দুই মহান গুরু এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কোনো কোনো উত্তরাধিকারী মঠাধ্যক্ষের (প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দের) স্মৃতি জড়ানো রামকৃষ্ণ মঠ স্মৃতি ও প্রেমের কাব্য দিয়ে

সবার উপরে তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু বর্তমান আবহাওয়া খুবই কম সন্তোষজনক মনে হয়েছে। আবহাওয়া সাধারণ স্তরের এবং অনিশ্চিত। মঠাধ্যক্ষ সন্ত শিবানন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধ, অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ, এক জ্যোতির চক্রে বলয়িত : তাঁকে যারা দেখে তাদের কাছে তাঁর উপস্থিতি এখনো রামকৃষ্ণের এক প্রতিবিম্বের জানান দেয়। কিন্তু তিনি মোটেই সক্রিয় নন, তিনি ধ্যান করেন, তিনি তাঁর স্বপ্নের ঘোরে হাসেন। অন্যদের মধ্যে যাঁর নেতা হবার গুণ আছে ব'লে মনে হয়, তিনি হচ্ছেন ওংকারানন্দ, তিনি তরুণ (বছর ত্রিশেক বয়স), এক কর্মশক্তিপূর্ণ ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অশোকানন্দ বিশেষ ক'রে যাঁর সঙ্গে আমার বই লেখার কাজে সম্পর্কিত হয়েছিলাম—এক বিচ্ছিন্ন মানুষ, সম্প্রদায়ের সাধারণ মানসিকতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে রত ; তাঁর মেজাজটা সংগ্রামীর, এবং তিনি চাইছেন বর্তমানের কর্ম ও চিন্তার সমস্যার সঙ্গে সম্প্রদায়কে বেশি ক'রে জড়াতে। তাছাড়া তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টার অসুবিধার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত। বেলুড়ের পরিমণ্ডল স্থিরবদ্ধ, কিছুটা ভারিক্কী ও শ্বাসরোধকর। এই অবস্থার সহজাত সমস্ত ত্রুটি : আলস্য, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা সমেত সম্প্রদায় পরিচালনার গোঁড়া রীতিনীতির পথে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রীমতী ভি. কেলেরের বর্ণনার মধ্যে থেকে মিস্ ম্যাকলিঅডের মহৎ ভঙ্গির এক ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে ; আদর্শের এই স্খলনে তিনি ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত ; এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গতা তাঁকে যে এক্তিয়ার দিয়েছিল, তারই জোরে উঁচুতে উঠে তিনি সন্ন্যাসীদের কঠোর কথা বলেছিলেন। প্রতিবেশী মুসলমানদের যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্যে তাঁরা বাগানের পাঁচিলে কাচভাঙ্গা বসিয়েছেন, তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে তাঁরা পুলিশ ডাকার কথা বলছেন ব'লে মিস ম্যাকলিঅড চটে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মহান্ চিন্তার অস্বীকৃতি চোখে দেখার তিক্ততা সংগ্রহের জন্যে এক কঠিন অবজ্ঞায় তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁরা নম্র হয়ে চুপ ক'রে ছিলেন ; তাঁরা লজ্জা পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ঢুকেছে। গত বড়োদিনের রীতি অনুযায়ী বাইবেল থেকে পাঠ হয়েছিল ; এবং রামকৃষ্ণের ছবির পাশে (নীচে) শিশুকোলে ম্যাডোনার মূর্তি রাখা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমতী ভি. কেলের শুনতে পেয়েছিলেন, অত্যাচারী ইউরোপীয়দের খ্রীষ্টের প্রতি সম্মানের বিরুদ্ধে তরুণ সন্ন্যাসীরা কাঁপতে কাঁপতে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, আর অন্যরা এটাকে ন্যায়সঙ্গত ব'লে দেখাবার জন্যে আপত্তি জানাচ্ছেন এই ব'লে যে, খ্রীষ্ট এশিয়ার লোক ছিলেন। মানবিক দুর্বলতা দীর্ঘকাল বড়ো মনকে অনুসরণ করতে পারে না। সিঁড়ির নীচে গিয়েই সে আবার পড়ে যায়। চিরকাল—চিরকাল আবার শুরু করতে হয় তাকে তুলে ধরতে। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে যে, বাঁধাধরা কর্মসূচী একে গ্রাস ক'রে ফেলে। কেবলমাত্র লিখিত কথাকেই মানা হয়। তাই এটা অপরিহার্য যে, সাহসী প্রতিষ্ঠাতারা যা চান তা যেন তাঁরা স্পষ্ট ক'রে লিখে রাখেন। সন্ন্যাসীরা বাগানের কাজে মন দেন, কারণ তা লেখা আছে। কিন্তু তা কী রকম হবে তার যেহেতু ব্যবস্থাপত্র নেই, তাঁরা শুধু বাঁধাকপি ফলান। মিস ম্যাকলিঅড তাঁদের কিছু

বীজ ও কাটিং সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেনঃ সেসব কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড ঝক্কি নিতে হয়েছিল। পশ্চিম সম্পর্কে এক বিপুল অজ্ঞতা। তার দোষ ইংলণ্ডের যেমন, তেমনি ভারতবর্ষেরও। যা ইংলণ্ডের নয় ইউরোপের, এমন কোনো কিছুর সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। জার্মানী বা ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় ও শিল্পীজীবনের কিছুরই সঙ্গে পরিচয় নেই, গথিক গির্জা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। আমার বইগুলো তাঁদের কাছে পরিচয়ের এক সঞ্চিত সম্পদ হয়ে থাকবে। কারণ অন্তত পড়লেও তাঁরা গর্ব বোধ করবেন, এরই মধ্যে তাঁরা গর্ববোধ করছেন। (জীবিত বড়ো বড়ো শিষ্যরা এতে গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। মিস ম্যাকলিঅডকে ভগিনী ক্রিস্টিন মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে যে কয়েকটি লাইন লিখেছেন তা পড়াটা আমার কাছে এতো আনন্দেরঃ তিনি আমার প্রথম বই ‘রামকৃষ্ণের জীবন’ পড়তে পেরেছেন এবং তা তাঁর মনে ধরেছে।)

এই বাঁধাধরা কর্মসূচীর মধ্যে তবুও অবশ্য আছে ধর্মীয় কাব্যের মণিমুক্তো — গড়ে-ওঠা একটা গোটা ঝলমলে সন্ত-জীবনকথা, তার নায়ক শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নন, বড়ো বড়ো শিষ্য ও মঠাধ্যক্ষেরা, বিশেষ ক'রে ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু কেউই এইসব ফুলগুলোকে (Fioretti) কুড়িয়ে রাখার কথা ভাবে না। শ্রীমতী ভি. কেলের আমার জন্যে যে কয়েকটা টুক্‌রো-টাক্‌রা নিয়ে এসেছেন তা এই রকম ঃ

সানফ্রানসিস্‌কো থেকে এক তরুণ আমেরিকান এসেছিল বেলুড়ে তীর্থযাত্রায়। বিশ্বাসে ও প্রেমে সে টগবগ করছিল। কলকাতায় পৌঁছুতে না-পৌঁছুতে সে জুতো খুলে ফেললো এবং হাতে একটা লম্বা নারকেলের পাতাশুদ্ধ ডাল নিয়ে খালি পায়ে এলো গান গাইতে গাইতে। যখন মঠের দরজায় এসে ধাক্কা দিলো, ব্রহ্মানন্দ শশব্যস্ত হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তরুণ আগন্তুককে দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত সন্ন্যাসীরা জানাতে চাইলেন তার আসার কথা। ব্রহ্মানন্দ দরজা খুলতে অস্বীকার করলেন। অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তা হলে কি তিনি অন্য সময়ের কথা বোঝাতে চাইছেন? “সন্ধ্যেবেলায়?” “না।” “কালকে?” “না।” শিবানন্দের শরণ নেওয়া হলো, তিনি ছুটে এলেন তার হয়ে ওকালতি করতে। তিনি বললেনঃ ‘ভাই ব্রহ্মানন্দ, এ কী করছো? যারাই আসে তাদের সকলের সঙ্গে তুমি দেখা করো, আর এই বেচারী ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো না? এতো দূর থেকে ও এসেছে, সেটাই ওর আনন্দ; ৮ দিনের বেশী ও থাকতে পারবে না। দরজা খোলো, আমি অনুরোধ করছি।” “না।” “তোমার অসুখ করেছে? ওর বিরুদ্ধে তোমার কি আছে?” কোনো উত্তর নেই। “তুমি কি অন্য দিন দেখা করতে চাও?” “কোন দিনই না।” ‘মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে শিবানন্দ ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। আগন্তুকের এই আশাভঙ্গ ভোলাবার চেষ্টা চললো। দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত নৌকোয় বেড়াবার ব্যবস্থা করা হলো, যাতে রামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তাঁকে দেখানো যায়। ইতিমধ্যে নৌকো যখন গঙ্গার মধ্যে বেলুড় মঠের চত্বরের সামনাসামনি এলো, ব্রহ্মানন্দ চত্বরের দিকে তাঁর ঘরের দরজাটা খুললেন এবং চত্বর থেকে দূরের তরুণটিকে আশীর্বাদ করলেন, তরুণটি দাঁড়িয়ে ছিল

নৌকোর পাটাতনের উপরে। সেই মুহূর্তেই তরুণটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোকে ভাবলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। সবাই কাছে এলো। সে জ্ঞান হারিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে তার অনেক সেবাযত্ন করা হলো। একটুও সুস্থ হলো না। জাহাজে ক'রেই আবার তাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো, সেখানে পৌঁছেই সে মারা গেল। তখন ব্রহ্মানন্দ বললেনঃ "ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে যারা পীড়াপীড়ি করছিল তারা সব অন্ধ! আমি কি ওকে জানতাম না? আমি চেয়েছিলাম ও অন্তত দেশে গিয়ে যেন মরে। যদি দেখা করতাম ও সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। ও ছিল এতো শুদ্ধ, এতো পবিত্র, জীবন থেকে এরই মধ্যে এতো বাঁধন-আলগা। জীবনের সঙ্গে বাঁধা ছিল শুধু একটা সুতোয়।"

আর একটা কাহিনী, অন্য সুরের; যা মনে পড়িয়ে দেয় সন্ত ফ্রাঁসোয়ার কোনো কোনো মজাদার সঙ্গীকেঃ মঠের এক তরুণ ভারতীয় ব্রহ্মচারীর মনে মনে বেশ কিছুটা সংশয় ছিল। সে তার বিশ্বাস এবং সন্ন্যাসীদের গুণের পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। সে বলতে শুনেছিল, সাধুলোকের সান্নিধ্যে কারুর কুচিন্তা থাকতে পারে না। সে ঠিক করেছিল, খাওয়ার ঘরে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসে একমনে সবচেয়ে অশ্লীল চিন্তা করবে, তাই সে শুরু করে দিয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন গা-বমি করতে লাগল যে তা পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে দিল, ভাবল গরমে রগড়ে মন দেওয়া চলছে না। পরদিনও সে খুব বেশী সফল হলো না, তার চিন্তার সূত্র ধরে রাখতে পারল না। অবশেষে তৃতীয় প্রচেষ্টার পর সে তা ছেড়ে দিল এবং একমনে প্রার্থনা করতে লাগল। খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ব্রহ্মানন্দ তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেনঃ "জড়ো-হওয়া এই সৎ মানুষগুলোকে উত্যক্ত করতে তোমার লজ্জা করে না? যখন এই রগড়-করা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চলে এসো!"

অমুক অমুক মহারাজের তাঁদের উপর কতো ভালবাসা—এ কথা সমস্ত সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে বলাবলি করেন যে তাতে শ্রীমতী ভি. কেলের বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা কখনো বলেন নাঃ 'আমি এমন ভালবাসি,' বলেনঃ "আহা! উনি আমাকে কেমন ভালবাসেন!' বিদায় নেবার সময় তাঁদের একজন, তিনি যে স্নেহ দেখিয়ে গেলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'কেন বলুন তো আপনারা কখনো বলেন না যে, আপনারা ভালবাসেন, বলেন' 'আপনাদের ভালবাসেন?" এক মধুর নম্রতায় তরুণ সন্ন্যাসীটি উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'আমরা ভালবাসবার কে? আমরা কিছুই নই। আমাদের জ্যেষ্ঠদেরই শুধু ভালবাসা শোভা পায়।'

শ্রীমতী ভি. কেলের ইউরোপে বিবেকানন্দের রচনাবলী তর্জমা ও প্রকাশ অনুমোদনের ভার পেয়েছেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী ভি. পেলেট রামকৃষ্ণ কথামৃত জার্মানে প্রকাশ করতে চলেছেন।

…গান্ধীর আশ্রমে শ্রীমতী ভি. কেলেরের লক্ষ্য করা একটা ব্যাপারঃ—যারা

ঘিরে আছে তাদের সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার পর,—(সেইসব কথাবার্তায় গান্ধী মনের এক যথাযথ ও প্রীতিপূর্ণ সজীবতা দেখিয়েছেন,)—হঠাৎ তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন; আর সকলে আত্মস্থ হয়ে তাঁর চারপাশে প্রার্থনা করতে লাগল। একমাত্র শ্রীমতী ভি. কেলের দেখতে লাগলেন। গান্ধীর মনঃসংযোগ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গিয়েছিল, এবং বুঝতে পারা যাচ্ছিল তা চরম মনঃসংযোগ: জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে! তারপর, সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং কথাবার্তা শুরু করলেন। কিন্তু শ্রীমতী ভি. কেলের তাঁর চেহারার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণের সমাধি সম্পর্কে আমার লেখা কথাগুলো তাঁর মনে পড়ে গেল; তিনি গান্ধীর বুকের দিকে তাকালেন: বুকটা লাল, যেমন রামকৃষ্ণের দেখার বর্ণনায় আছে। এই দিয়েই তিনি চিনেছিলেন (যেমন রবীন্দ্রনাথের বাবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারে) সমাধির আসাযাওয়া, ঈশ্বরের সান্নিধ্য। যৌগিক মনঃসংযোগে হঠাৎ এই রক্ত জমে ওঠে। আর তা হলে বলা চলে যে, গান্ধীরও নিজের 'যোগ' আছে।

২০ জুন, ১৯৩০ এবং পরের দিনগুলো। কয়েক দিনের জন্যে এসেছেন কাতায়ামা এবং কালিদাস নাগ—দু'জনেই এসেছেন যার যার নিজের দিক থেকে;—কালিদাস নাগ আসছেন ভারতবর্ষ থেকে; বোম্বাই থেকে ভেনিসে এসেছেন; এবং তাঁকে এক বছর ইউরোপ ও আমেরিকায় কাটাতে হবে; তিনি বক্তৃতা দিতে চলেছেন ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, হল্যান্ডে, জার্মানীতে, সুইজারল্যান্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে…

…কালিদাস নাগ আগ্রহে ভরপুর। সাত বছর হলো আমাদের দেখা হয়েছে। তারপর থেকে তিনি ভারতবর্ষে প্রচুর কাজকর্ম করেছেন, দূর প্রাচ্যে সফর করেছেন। তিনি বদলে গেছেন, স্বাভাবিক ভাবেই বয়স বেড়েছে, একটু মুটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মুখের তারুণ্য বজায় আছে; তিনি বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তিনি চাইছেন আমাকে অন্তরঙ্গভাবে দেখতে, কয়েক দিন ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, কারণ ব্যাপারটা এই যে, ভারতবর্ষে আমার বই আর চিন্তার মাধ্যমে আমি বেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি; এবং নাগ হয়ে উঠেছেন আমার প্রতিনিধি, বৌদ্ধিক জগতে আমার 'লেফটেনান্ট' (lieutenant intellectuel)। তাই আমার অনেক চিন্তার ভার তাঁর কাছে নামিয়ে দি। তিনি সবসময়েই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার হালের বই সঙ্গে রাখেন, তাতেই তিনি আহার পান এবং শোনা যায় ভারতবর্ষে তা (এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণে) এক জাতীয় 'সুসমাচার' (Evangile) হয়ে উঠেছে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করলাম, তিনি তাঁর এক অন্তরঙ্গ; আমাদের দুঃখ এই জন্যে যে, ইউরোপে যে আসে সেই তাঁকে দখল ক'রে বসে। নিরন্তর ঘুরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে এক অসুস্থ প্রয়োজন; এক অশান্তি—যা তাঁকে অতিষ্ঠ ক'রে মারছে। দেখে মনে হয়, তার অনেক কারণই আছে। কিন্তু মারা

যাবার আগেই তাঁর দার্শনিক বড়ো ভাই এ সম্পর্কে নাগের সামনে বলেছিলেন : "রবি, এমন ক'রে জগৎ ঘুরে বেড়িয়ে ভালো করছো না। তোমার মতো লোককে নিজের মধ্যে জগতকে পেতে হবে, জগতের মধ্যে নিজেকে খুঁজলে হবে না।'

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর শান্তিনিকেতনের সংসার কী মরুভূমি হয়ে উঠেছে, তা কল্পনা করতে হবে। যে বিরাট পরিবারের মধ্যে তিনি থেকেছেন, তাঁর আনন্দিত জীবনে বাসভবন যে-পরিবারে বোঝাই থাকতো, তা অদৃশ্য। তিনি বলেন : "আর কলকাতায় থাকতে পারি না। আমার কাছে মনে হয় শ্মশানের মতো।" তাঁর আদরের বড়ো মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। অল্প বয়সে ছোটটিকে বিয়ে দিয়েছেন এক অযোগ্য পাত্রে, সে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে হাস্যাস্পদ করছে; আইনগত ভাবে বিচ্ছেদের মাধ্যমেও মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বিধিমতে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে অবিবেচকের কাজ করেছেন, তাতে সে অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিধিমতে মেয়ে সম্পূর্ণ স্বামীর অধিকার; সেটা এমন যে, স্বামী তার কাছ থেকে সম্ভবত সন্তানকে নিয়ে যাবে। তাঁর ছেলে মানুষটি চমৎকার হলেও শান্ত, দুর্বল এবং স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে; তরুণী পুত্রবধূ প্রীতি ও স্নেহের যোগ্যা, তাঁরও একই রকম দুর্বল স্বাস্থ্য; বাড়িতে তিনি কোনো কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন না। শান্তিনিকেতনের বাড়িটা একটা হাট, কোনো ব্যবস্থাপনা নেই, সেখানে সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, এমনকি রবীন্দ্রনাথের শান্তিও সেখানে বজায় রাখা হয় না, নিজের লোকজনদের অত্যন্ত তিক্ত ঝগড়াঝাটি আবহাওয়া বিষিয়ে তোলে; জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে একেবারে ফুরিয়ে-যাওয়া অর্থসম্পত্তি। এর উপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের দিনগুলোর জন্যে নির্ভর করতে পারেন না। ষোলোকলা পূর্ণ হয় যদি তাঁর ছেলে মারা যান, সেটা হবে পরিপূর্ণ বিপর্যয় : বংশ লোপ। গৌরবজনক জীবনের এই পরিণতি এক গভীর বেদনা। রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশে বিচ্ছিন্ন। যুবসম্প্রদায় তাঁর দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। গান্ধী তাঁর কাছ থেকে শুধুমাত্র সমস্ত প্রাণশক্তিই কেড়ে নেননি; তাঁর মহৎ উপন্যাসগুলোও প্রাচীন হয়ে গেছে; 'ঘরে বাইরে'-র মতো বইয়ের মধ্যে আজকের ভারতবর্ষ আর নিজেকে খুঁজে পায় না; এ যে-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখা, তা ইতিমধ্যেই অতীতের বস্তু হয়ে গেছে; তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ নবীকরণ হয়নি। এই ট্রাজিডির সঙ্গে যা যুক্ত হয়েছে তা এই যে, দেশের বাইরে, সারা পৃথিবীতে তিনি আর চিন্তার সমানধর্মী কাউকে খুঁজে পান না। সবচেয়ে নিকটতম জন ছিলাম আমি। একথা প্রায়ই তিনি নাগকে বলেছেন। তিনিই প্রথম আমার 'জাঁ-ক্রিসতফ' ভারতবর্ষে পরিচিত করেছিলেন। প্রথমখন্ড গুলোতেই তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, নাগকে বলেছিলেন, এ আমাদের যুগের মহাকাব্য। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে আদান প্রদান করার। কিন্তু ভাষা আমাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যস্থ ছাড়া আমরা আলাপ করতে পারিনি। আর রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের পক্ষে এটা একটা প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। তিনি যদি সোজাসুজি অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন, (তিনিই বলেছেন,), নিজেকে আর বোঝাতে

পারেন না। ভিলন্যভের সাক্ষাৎকার তাঁর কাছে অবশ্যই একটা বেদনাদায়ক আশাভঙ্গ হয়ে থাকবে। দুই বধির, কেউ কারুর কথা বুঝিয়ে উঠতে পারছে না। জীবিত অন্য কোন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সাজাত্য (affinite) নেই। আমি যখন স্পিট্লার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম, তিনি তাতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁকে জার্মান সংস্করণ 'অলিমপিশের ফ্রুহ্লিং' পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাসনা নিয়ে, বেদনা নিয়ে তিনি পাতা উল্টেছিলেন। জার্মান তাঁর কাছে ফরাসীর চেয়েও বেশি দুর্ভেদ্য। এখন চেষ্টায় আছি কস্তিস্ পালামাস-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক করিয়ে দিতে ; রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের জন্যে যা করেছেন কস্তিস্ পালামাস গ্রীসের জন্যেও তাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মুখের ভাষা দিয়ে তাঁর জাতির কাব্যের নতুন ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আমি নাগকে বলেছি পালামাসের সঙ্গে দেখা করতে এথেন্স যেতে ও রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে। কিন্তু বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিমপর্ব এতো বিষাদাচ্ছন্ন এবং উত্তরোত্তর তা বেড়ে চলার আশংকা। তিনি আছেন এক নির্মম নিঃসঙ্গতার মধ্যে। নিজের দেশের মানুষের মধ্যে তিনি আর সেই প্রতিধ্বনি খুঁজে পান না, যা তাঁকে সৃষ্টি ক'রে চলতে তাগিদ দেয়। মহৎ কবিতা 'বলাকা'-র পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তিনি আর লেখেননি। অন্যমনস্কভাবে তিনি ছবি আঁকা ধরেছেন। এই অন্যমনস্কতা, এই ভোলাটাও তাঁর এক প্রয়োজন। যার জন্যে তিনি প্যারীতে সেই সব ইহসর্বস্ব গোষ্ঠীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বা মেনে নিচ্ছেন যারা মোটেই তাঁর যোগ্য নয়, যাদের জন্যে তাঁর লাভ হচ্ছে আমাদের ফরাসীবন্ধুদের নিন্দাবাদ। এই আপাত ছেলেমানুষীর পিছনে যে ট্রাজিডি গোপন আছে, তা তাঁরা অনুমান করতে পারেন না। বাংলা ভাষায় অনূদিত ভারতবর্ষে প্রকাশিত আমার 'ভোয়াইআজ এঁ্যাতেরিয়্যর'-এর কিছু অংশ যে বেশ দাগ কেটেছে, তার কথা নাগ আমাকে বললেন। একটা আশ্চর্য ঘটনা আমাকে অভিভূত করল। নাগ ছেপেছিলেন একটা ছোটো পরিচ্ছেদ, নামটা আমার বিশ্বাস : "রাতোয়ার"* ; সেখানে আমি কিশোরটির মনোভাব ব্যক্ত করেছি, সে অনুভব করছে কলে ধরা-পড়া ইঁদুরের মতো এ জগতে সে বন্দী এবং তা থেকে সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করছে। কিছু পরে নাগ এক ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীর একটি চিঠি পেয়েছিলেন। (তাতে নামটাও সই নেই। তা বোঝা যাচ্ছে শুধু জেলের একটা নম্বরে আর জেলখানার সরকারী শিলমোহরে।) এই বন্দীটি তাঁকে লিখেছে, এ বর্ণনা তার মনে কী আবেগ সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে কতখানি প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। সে লিখেছে, একটা জেলখানার পীড়নই তাকে সহানুভূতি প্রকাশে প্রবৃত্ত করেনি। গোটা জগতেই সে এই জেলখানাকেই অনুভব করছে। এই উপলক্ষে, ভারতবর্ষ থেকে অনেক চিঠি পাওয়া গেছে।

অরবিন্দ ঘোষের বর্তমান বিবর্তন সম্পর্কে নাগের মোটেই ভালো ধারণা নেই

---

* ভ্রম সংশোধন : যা ভারতীয় বন্দীটিকে নাগকে চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা ছাত্রটির ঘরের মধ্যে শুধু স্পিনোজার···আলোকদর্শন। কারণ 'লে ত্রোয়া একল'-এর পরিচ্ছেদটিই শুধু ভারতবর্ষে ছাপা হয়েছিল। 'রাতোয়ার' নয়। (র র র মন্তব্য)

(আমাদের চেয়ে বেশি নয়)। সবাই জানে (আমরাও জানি), এই মহাগুরু তাঁর পণ্ডিচেরির বাড়িতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকেন ঃ তাঁর শিষ্যদের দেখা-শোনা পুরো-পুরি তাঁর স্ত্রী (sa femme) মীরার (ভূতপূর্বা শ্রীমতী রিশার) হাত ছেড়ে দিয়েছেন ; তাঁদের সামনে দর্শন দেন বছরে মাত্র একবার। বাকি সময় তাঁদের সঙ্গে এবং বাইরের সঙ্গে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। এরই মধ্যে ভারতবর্ষে এমন রসিকতার অভাব ঘটছে না, যা বলছে ঃ "অরবিন্দ অনেক দিন মরে গেছেন। তাঁর হয়ে অন্য কেউ কথা বলে।।"…সবচেয়ে গুরুতর এই যে (আমরা তা লক্ষ্য করেছি), গীতা সম্পর্কে তাঁর নতুন বইতে 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পুরনো কাজ থেকে কোনো অগ্রগতি নেই ; এর ঘাটতি অনেক। এবং নাগ আমাদের জানালেন, মূল পাঠগুলো যত্ন ক'রে বিচার করার পর তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, অরবিন্দ শুধু পুরনো প্রবন্ধগুলোর মূল পাঠই আবার তুলে দিয়েছেন। এ থেকে লোকের ভয় হতে পারে যে, আগে থেকেই তাঁর চিন্তার শক্তি ফুরিয়ে গেছে (épuisement cérébral)। নাগের আশংকা, গত দশ থেকে পনের বছর ধরে গভীর ভাবে যে-যৌগিক সাধনায় তিনি মেতে উঠেছেন, তাতে তাঁর মস্তিষ্কে কোনো সর্বনাশা প্রভাব না পড়ে থাকে। এই যোগের বিপদ জানা আছে ; সাধারণভাবে ভারতবর্ষে অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশেই শুধু এতে ঢোকা হয়। অহংকারের বশেই অরবিন্দ অন্য কোনো নির্দেশ চাননি এবং তিনি অকালেই নিজে গুরু হয়ে বসেছেন। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যে-ব্যক্তি সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ; আর সত্যি বলতে, তিনি এই সাক্ষাৎকারের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলেছেন। কিন্তু নাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তার সঙ্গেও কী বিস্ময়কর সতর্কতা, তাতে সমস্ত রকম গোপন কিন্তুর, এমনকি, বিদ্রূপেরও সম্ভাব্য অবকাশ আছে। এইটেই বেশি মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ মুখোমুখি, কিছুই বলাবলি করেননি। নৈঃশব্দ্য ! আর এই নৈঃশব্দ্যের নিজেরই মহিমা আছে। কিন্তু এতে সমস্ত সন্দেহই ন্যায্য হয়ে ওঠে। কবির মতো রবীন্দ্রনাথ এর স্মৃতি-উদ্বোধক দিকটিই অনুভব করেছিলেন। শিশু ও তরুণ অরবিন্দের যে পুরনো ছবি তাঁর মনে ছিল তাই স্মরণ করাতেই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎ-কারের বর্ণনায় তিনি কিন্তু এই অতীতের অরবিন্দের কথাই শুধু বলেছেন। বর্তমান অরবিন্দকে বিচার করাটা এড়িয়ে গেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে শ্রীমতী ভি. কেলেরের ধারণাই নাগ ঠিক বললেন। দুঃখের বিষয় কার্যত এ গিয়ে পড়েছে মঠধারীর মানসিকতার অতি সাধারণ স্তরে। বড়োই প্রথাগত ভাবে মিশন সংগ্রহ করে "পাকা ফলের" মধ্যে থেকে, তারা তাদের অপার অজ্ঞতা পুষিয়ে নিতে চায় অন্ধের মতো আক্ষরিকভাবে এক সীমাবদ্ধ ধার্মিকতা দিয়ে। অশোকানন্দ এর ব্যতিক্রম, যদিও তিনি তত্ত্বদর্শনের দিকে ঢুকেছেন। আর স্বাভাবিক ভাবেই রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে সর্বশেষ জীবিত বৃদ্ধ ও প্রশান্ত শিবানন্দও তাই করছেন, তিনি অতীতের স্বপ্নে ডুবে আছেন। তাছাড়া, এটা লক্ষ্য করার যে, যাঁরা বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর থেকে নেতৃত্বে এসেছেন সেই বড়ো বড়ো মহারাজেরা, রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যেরা উদাসীন ভাবে আবার ঢলে পড়েছেন তুরীয় আনন্দের

ধ্যানের মধ্যে, দেশের মানুষের সেবার জন্যে যা থেকে বিবেকানন্দ তাঁদের বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁরা বড়োই দূরে সরে গেছেন, সম্প্রদায়ের আচার-আচরণকে নৈরাজ্যের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যেন বুঝতে পারা যায়, আজ সবচেয়ে বড়ো যে-প্রভাব এর মধ্যে বাইরে থেকে পড়েছে, তা হচ্ছে গান্ধীর প্রভাব।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অদম্য চরিত্রের প্রমাণ (ইংরেজি সংবাদপত্রে যা গোপন করা) নাগ আমাদের দিলেন। যে পার্শি'রা ছিল ইংলন্ডের আত্মরক্ষার ভারতীয় দুর্গ-প্রাচীর, তারাও এতে নেমেছে : আর মসজিদে মসজিদে মুসলমান মৌলবীরা গান্ধীর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে তাদের অনুগামীদের নির্দেশ দিচ্ছে। কলকাতা ও বোম্বাইয়ে হিন্দুবিরোধী সংঘর্ষে উস্কানির জন্যে ইংলন্ড মুসলমানদের বৃথাই ঘুষ দিতে চেয়েছে : তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর মেয়েদের কথা ? তারা এগিয়ে চলেছে দলে দলে।

আমার ভোয়াইয়াজ এঁ্যাতেরিয়ার' থেকে নাগকে কয়েকটা পরিচ্ছেদ পড়ে শোনালাম।

৮ জুলাই, ১৯৩০। মহীশূর রাজ্যের তরুণ ভারতীয় এইচ. কে রাজা রাও এসেছেন ; গত দশ মাস তিনি ইউরোপে আছেন, পড়াশোনা করছেন মঁপেলিয়ে-য়, সামনের বছর পারী যাবেন পশ্চিমের অতীন্দ্রিয়বাদীদের উপরে একটা থিসিস তৈরি করতে। আমার 'জাঁ-ক্রিসতফ' থেকে অংশ নিয়ে এক খন্ডে কানাড়ী ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি অনুমতি চাইলেন ; তিনি বললেন,—"'জাঁ-ক্রিসতফ' তাঁর বাইবেল।" স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইংলন্ডের প্রতি কম সদয় এবং সহানুভূতি দেখান ফ্রান্সের প্রতি, সম্ভবত তা খুব বেশী অপক্ষপাতমূলক নয়, ফ্রান্সের প্রকৃত গুণটি তাঁর কাছে মনে হয় "আন্তরিকতা…"—হায়রে !…হাসিখুশি আর সক্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ভরপুর। রামকৃষ্ণের কথামৃত বয়ে নিয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকায় যেতে রাজী। তিনি এমন পরিবার থেকে এসেছেন যেখানে 'যোগের' চর্চা হয় ; নিজেও তিনি 'যোগ' অভ্যাস করেছেন, কিন্তু এই ভেবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, জগতকে এড়ানোর চেয়ে তার মুখোমুখি হওয়াটাই ভালো। গান্ধী ও তাঁর কৌশল সম্পর্কে পূর্ণ উৎসাহ ; তিনি বললেন, এর সাফল্য চীনের উপরে আশু প্রভাব ফেলেছে ; সেখানে স্বদেশীর কথা খুব শোনা যাচ্ছে। এ এক নতুন ব্যাপার : কারণ তিন চার বছর আগেও ভারতীয় আদর্শবাদের প্রতি চীন এক ধরনের বিদ্রূপাত্মকে অবজ্ঞার ভাব দেখাতো ; রবীন্দ্রনাথের এখান থেকে কিছু শিক্ষা হয়েছিল। (মনে হয় চীনে একটা বক্তৃতায় তরুণ বিদ্রূপকারী শ্রোতারা এমন স্থূলভাবে বাধা দিয়েছিল যে, তিনি থেমে গিয়েছিলেন এবং কেঁদে বেরিয়ে এসেছিলেন।)

জুলাই, ১৯৩০। ফাদার আঁরি ব্রেম*-র মতামত আমার কাছে মূল্যবান (কারণ তিনি ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদের সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক, এবং তাঁর গবেষণা আমি

কাজে লাগিয়েছি) ; অবশেষে তিনি আমার ভারতসংক্রান্ত তিন খণ্ডের প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন (৫ জুলাই)। আমার বান্ধবী ও খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমার "অভিভাবিকা" জে. এম. তাঁকে জানেন ; মনে হচ্ছে দেরিতে-পাওয়া এই অতি প্রীতিপদ চিঠির ব্যাপারে তিনি কিছু ক'রে থাকবেন ; চিঠিখানায় ব্রেমঁ বলেছেন, যতই তিনি এই বইগুলো পড়তে পড়তে এগুচ্ছেন, "এরা যে পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করছে এবং যে চিরস্থায়ী সাদৃশ্যবোধ জাগিয়ে তুলছে—তাতে তিনি ততই আনন্দে বিহ্বল হচ্ছেন।" তিনি আরও বলেছেন : "আমার নিজের পড়াশোনায় এ বিরাট সহায়ক হবে।" প্রকৃতপক্ষে, এ যদি কাজে লাগে, আর এইভাবে ক্যাথলিক জগতে ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধার প্রবেশ ঘটাতে পারে, তাহলে আমার সময় নষ্ট হবে না : এটা হবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের আত্মিক সমঝোতার একটা বিরাট পদক্ষেপ।

১২ জুলাই, ১৯৩০। বোম্বাই থেকে কয়েক জন ভারতীয় এসেছেন, আর তাঁদের নিয়ে এসেছেন রানা ; তাঁর দেশে ফেরা নিষিদ্ধ. যুদ্ধের পর থেকে পারীতে আছেন, হীরা-জহরতের ব্যবসা করেন, কিন্তু জাতীয় স্বার্থেই তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর সাহায্য আমি প্রায়ই নিয়ে থাকি। (আমি তাঁকে 'য়ুরোপ' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি, তিনি তার তথ্যাদি যোগান।) তিনি ঠাকুর পরিবারের বন্ধু। (কিন্তু এবার তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা বললেন করুণামিশ্রিত বিদ্রুপের সঙ্গে, যেন এক বুড়ো খোকা, সব কিছুতে নাচানাচি করেন, ভারতবর্ষ আর তাঁর উপরে গুরুতর আস্থা রাখতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি, এ রানার ভুল ; এক বিপর্যয়ের বলি তাঁর জাতির বেদনার মধ্যে তিনি জেগে উঠবেন।)

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের ৭ম শিবির' কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্বোধন করা হচ্ছে শেভ্রজ-এ ; তার অন্যতম তরুণ সংগঠক পিয়ের অর্দনে আমার কাছে কিছু খবরা-খবর চেয়েছেন, তা অহিংস প্রতিরোধের সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কে যতো, তার চেয়ে অনেক বেশি ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ও গান্ধীবাদী আন্দোলন সম্পর্কে। আমি সেসব পাঠালাম (১৭ জুলাই), আর তার সঙ্গে কিছু কঠোর সাবধানবাণী ; তা করতে হয়েছে মারাত্মক মোহবাদ দেখে ; অ-প্রতিরোধের কতিপয় ইউরোপীয় নেতা (বিশেষ ক'রে রুনহান ব্রাউন) তা আঁকড়ে ধরেছেন এবং তরুণদের সামনে তার টোপ ফেলেছেন।

আগষ্ট, ১৯৩০। আমার ভারতবর্ষ সম্পর্কে বইগুলো আমার 'য়ুরোপ'-এর "বন্ধুদের" (এতো সংখ্যাল্প !) চেয়ে এতো কম আর কেউ বোঝেনি। এ তাদের মনের ঠিকানা জানে না। তাছাড়া আমার 'বিঠোভেন'-ও তাই। আমার চিন্তার

ব্যাপারে পুরোপুরি চোখকান বুজে-থাকা এমন এক গোষ্ঠীর মধ্যে কী ক'রে দিন কাটালাম, আর কাজ ক'রে গেলাম, পরে এ এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। (কিন্তু ফ্রান্সে আমার সম্পর্কে সব কিছুরই চোখ-কান বোজা ; আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।)

এর উল্টোদিকে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বইগুলো, ফ্রান্সে সবচেয়ে কৌতুহলজনক প্রতিধ্বনিও জাগাচ্ছে। এদের কবলে পড়ার মতো ব'লে যাদের একেবারেই মনে হয় না, তেমন লোককেও এরা নাড়া দিয়েছে। তাই, এক চিঠি এসেছে…ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত—র কাছ থেকে (১৯ আগস্ট)। এই প্রতিপত্তিশালী মানুষটি আমাকে লিখেছেন ঃ 'মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত যে-অন্ধকারে তিনি জীবন কাটিয়েছেন তারই মধ্যে আলো দেখতে পাচ্ছেন। তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন আমি যেন তাঁকে চালিত করি।

আগস্ট, ১৯৩০। পথচলতি রবীন্দ্রনাথ দিন-পনেরর জন্যে জেনেভায় ; ব'লে পাঠিয়েছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ও আমার বোন জেনেভায় এলাম (২৮ আগস্ট) গ্রীষ্মের প্রথমের কয়েক সপ্তাহ ঝড়বৃষ্টির পর এখন আকাশ পরিষ্কার, দমআটকানো আবহাওয়া ; অর্ধেক ইউরোপে লোকে গরমে সেদ্ধ হচ্ছে—আমরা মিস গ্রেভসের পায়রা-খানায় প্রাতরাশ সেরে নিলাম। সেটা সাত তলার উপরে একটা স্টুডিও, তার কাঁচ-বসানো গম্বুজ থেকে জেনেভা ও তার চারপাশ দেখা যায়। (মিস গ্রেভস বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, আফ্রিকার গোল্ডকোস্টে চলে যাচ্ছেন আজকালের মধ্যে)। তারপরেই আমরা চলে গেলাম রবীন্দ্রনাথের ওখানে, সেখানে রইলাম দু'ঘণ্টা। জেনেভার একটু বাইরে মালভূমির উপরে তাঁর জন্যে একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, বাড়িটা একটা বিরাট বাগানের মধ্যে, সেখানে গ্রীষ্মমণ্ডলের বাঁশের বিশাল ঝাড় গজিয়ে উঠেছে। তিনি সেখানে ঝলমলে আকাশের নীচে নিজের পরিবেশেই আছেন। আর তাতে তিনি নতুন ক'রে সঞ্জীবিত হয়েছেন। প্রথম দর্শনে মনে হলো, তিনি একটু ঝরে গেছেন, বৃদ্ধদের যেমনটি প্রায়ই হয়ে থাকে ; সেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক চালচলন আর নেই ; জামাকাপড়ের নিচে দেহটা রোগারোগা মনে হলো ; কিন্তু মুখখানা ভরাট, রাঙা ; আমাদের সঙ্গে কথা শুরু করার পর থেকেই সুহৃদজনের সামনে নিজেকে উদ্বারিত করার আনন্দে তিনি প্রাণময় হয়ে উঠলেন, নতুন ক'রে তারুণ্য ফিরে পেলেন। তাঁর এতো উঁচু তারে বাঁধা চিরদিনের কন্ঠস্বর বড়ই মিহি হয়ে গেছে ঃ বলা চলে স্বরটা "খাদে বাঁধা" ; অনন্ত-পিতার মতো তাঁর এই শুভ্র মস্তক আর পরগম্বরের মতো শ্বেতশ্মশ্রুর সঙ্গে অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে এই কন্ঠস্বর। আমাদের পেছনে বসে নিপুণভাবে কাজ করছেন, মন দিয়ে শর্টহ্যান্ড নিচ্ছেন দুই সেক্রেটারি ঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সেক্রেটারি চক্রবর্তী* (তাঁর সঙ্গে অনেক বছর আগে আমার পত্রালাপ

---

*অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

হয়েছিল) এবং রাও – তিনি স্ত্রীর সঙ্গে জেনেভায় আস্তানা গেড়েছেন। আলোচনার শেষদিকে এনড্রুজ হাজির হলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের পথের সঙ্গী হয়েছেন, তাঁকে দেখছেন শুনছেন, আর তাঁর ছেলেবৌ রয়ে গেছেন (ছেলে অসুস্থ) বার্মিংহামে।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার বইয়ের কোনো কোনো কথা পড়ার পর (তিনি তা না বললেও তা সুস্পষ্ট) তাঁর মনে যা জেগেছে, স্পষ্টই বোঝা গেল, তার উদ্গার দিয়েই তিনি প্রথম শুরু করলেন। রামমোহন রায় ও তাঁর বাবার কথা তাঁদের এক ধর্মীয় সমন্বয়ের—(কিন্তু একই সময়ে যা তাঁদের ঘোষিত একেশ্বরবাদের) —প্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে তিনি মেনে নিলেন যে, তা সহিষ্ণু ছিল না ; কিন্তু তিনি তার সঙ্গে এই কথা যোগ করলেন (এবং তা আমার সমালোচনার গোপন করা উত্তর) যে, কোনো কোনো অপরিহার্য ক্ষেত্রে, সত্যকে অসহিষ্ণু হতেই হবে ; কোনো কোনো ভ্রান্তি ও চিত্তকলুষিত-করা কোনো কোনো মূর্খতা (folies) সহ্য করা চলে না। সেখান থেকে তিনি চলে এলেন হিন্দু বহুদেববাদের, এবং বিশেষ ক'রে কালী-উপাসনার বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণে। সে-সম্পর্কে তিনি বলে গেলেন আবেগদীপ্ত ঘৃণার এক তীব্রতা নিয়ে (এমনটি তার মধ্যে আর কখনো দেখিনি)। অত্যধিক ভাবপ্রবণ মানসিক গতিশক্তির এই মানুষটির কাছে শৈশবের এমন কোনো ছাপ সারাজীবনের চিন্তাধারাকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যখন বলছিলেন, তাঁর শৈশবের সেই শিহরণ অনুভব করছিলাম ; বলছিলেন, সেই দিনটির কথা, যেদিন কলকাতার বড়ো কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন রক্তের একটা স্রোত চৌকাঠের নীচে উপচে উঠছে, আর পথ-চলতি একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক নিচু হয়ে রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিচ্ছে, তার শিশুর কপালে তিলক দিয়ে দিচ্ছে। সেই একই রকমভাবে ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, এক হতভাগা পুরোহিত একটা বাচ্চা ছাগের পা মুচড়ে ধরে গলায় কোপ বসাবার আগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং বললেন, এই ধরনের রক্তমাখা নিম্নস্তর থেকেই চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে খুনীর হিংস্রতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেশের উপাসনা, রক্তপানের রুচি। এমনকি, অধিবিদ্যা বা প্রতীকের স্তরে নিয়ে গিয়েও এর সঙ্গে কোন আপস তিনি মানেন না। (এটা স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁর চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ।) তিনি এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, কালীর উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হতে পারে না। এই বীভৎস দেবীকে ধ্বংস করতে চাইলেন,—(এই ভয়ঙ্করী মাতা সম্পর্কে নিবেদিতাকে বলা বিবেকানন্দের বিস্ময়কর কথাগুলো নতুন ক'রে পড়া যাক !) তাঁর দেশের লোকের বিরুদ্ধে, স্তুপীকৃত কুসংস্কার তাদের পিষ্ট করছে তার বিরুদ্ধে জ্বলে উঠলেন। তিনি পশ্চিমের যুক্তিবাদী নাস্তিকরণ, স্বাস্থ্যপ্রদ নাস্তিক্যকে আহ্বান জানান ; মনের এই দৈত্যগুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবার জন্যে, যুগযুগান্তের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার জন্যে সাময়িকভাবে এটাই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের বাইরে ব্যতিক্রম হিসেবেও তিনি অধিবিদ্যার মহৎ চিন্তাকে সহ্য করতে পারেন না। তিনি কথা বললেন

পশ্চিমের সেই সব মানুষের মতোই, যারা ব্যবহারিক স্তরেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, যারা সামাজিক ও সকলের মঙ্গলে ফলপ্রদ রূপে কার্যকর ব'লে খাঁটি দর্শনকে মনে করে না, এমনকি খাঁটি ধর্মকেও দেখে না। তিনি একমাত্র এই মূল্যেই মানব ঐক্যকে গ্রহণ করেন। যাঁরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের বাইরে ঢুঁড়ে-বেড়ানো নিঃশঙ্ক মনের এবং বর্তমান ক্রিয়া ও বিবর্তনের মাত্রার সম্ভাবনায় তাঁদের শক্তিকে খাপ-খাওয়ানো যুক্তির ভারসাম্য উপলব্ধি করেন, আমাদের সেইসব ক্যাথলিক তাত্ত্বিকদের চেয়ে এবং এমনকি স্পিনোজার মতো আমাদের ক্ষমতাশালী অধিবিদ্যকদের চেয়েও, তাঁকে তাই দেখা গেলো পশ্চিমের ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন মতাবলম্বীদের অনেক কাছাকাছি।

স্বভাবতই আমি কোনো তর্ক করার চেষ্টা করলাম না, তাঁকে বলতে দেওয়াটাই বড়ো কথা। আমি শুধু সংক্ষেপে পশ্চিমের এক শিশু খ্রীষ্টানের (আমার) বাইবেল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া—এবং বিরূপতা জানিয়েই খুশি রইলাম; সেই প্রতিক্রিয়া ও বিরূপতা আমি পোষণ করেছি বাইবেলের প্রথম পাতা থেকে আবেলের রক্তাক্ত বলিদানের প্রতি জেহোবার পক্ষপাত জাহির করার জন্যে এবং ক্ষেতের প্রথম ফসল তাঁকে নিবেদন করায় কেইনকে অভিশাপ দেবার জন্যে। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাইলাম যে, ভারতবর্ষে কালীর নামে যা কলংকিত, তারই মতো একই রক্তাক্ত উৎস সেরা একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর। আমি আরো বললাম যে, সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে গভীর সহজাত বৃত্তিগুলোকে (উন্মূল করার বদলে) ঊর্ধ্বায়িত করা; আর এইটি দেখতে পাওয়া বড়োই হৃদয়গ্রাহী যে, এই প্রাচীন বাইবেল যা বলির পশুর মেদ-ধূমে ধূমাংকিত, তাই 'সুসমাচারের' (Evangile) এই শ্রেষ্ঠ ফুল: ঈশ্বরের মেষশিশু, নিষ্পাপ বলিপ্রদত্ত খ্রীষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। (আমি নিশ্চিত যে এর অনপেক্ষিত হৃদয়-গ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথের মনে অক্ষুণ্ণ থাকবে।)

বার্লিনে জার্মান তরুণরা সম্প্রতি তাঁকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাতে তিনি বড়োই খুশি; তিনি জানতে চাইলেন, জাতির এই এমন দৈহিক ও নৈতিক প্রাণশক্তি যা তাঁকে অবাক করেছে, তা কি জানে সে কোথায় যাবে, কী তার লক্ষ্য। (এইটিই তার যথার্থ দুর্বল দিক।) ৪ বা ৫ সেপ্টেম্বর তিনি মস্কো রওনা হবেন: এই দেশ আর এই নতুন সমাজব্যবস্থা দেখার জন্যে তিনি কৌতূহলে টগবগ করছেন। তিনি আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলেন, আমি 'ভক্‌স' (Voks) সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে দিলাম ('ভক্‌স'কে লিখলাম, আরও লিখলাম আমার কোনো কোনো বন্ধু, যেমন কবি পাস্তেরনাককে): তাছাড়া ঘরে বসে, মোটরে ক'রে বা যেখানে যেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে সেসব জায়গায় যা কিছু তাঁর নজরে পড়বে না, তা দেখার জন্যে যে তিনি চেষ্টা করবেন না, তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই; (আমি 'ভক্‌স'কে পরামর্শ দিলাম, চাষীদের শিল্পকৃতির সঙ্গে বিশেষ ক'রে যেন তাঁকে পরিচিত করানো হয়।)

কিন্তু মুখ্যত ইদানীং যা তাঁর মন জুড়ে আছে, যাতে তিনি ভরপুর, তা হচ্ছে ছবি আঁকা। দু'এক বছর আগে থেকে হঠাৎ তিনি আঁকতে মন দিয়েছেন। আর

তাতে এমনই আনন্দ পাচ্ছেন যে, তিনি তা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং একের পর এক প্রায় ৫00 ছবি এঁকে ফেলেছেন : তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টি, তাঁর ১৫00 গানের সঙ্গে এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। তিনি বাস্তবের কোনো একটা দিক ফুটিয়ে তুলতে চাননি, এমনকি মনের কোনো স্বপ্নও না। তিনি আঙুলগুলোকে রেখা ও রং নিয়ে খেলা করতে দিয়েছেন। তা যে অনপেক্ষিত সামঞ্জস্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে তাতে অবাক হয়ে গেছেন। এক অতি-সরল উল্লাসে তিনি বলে উঠলেন : 'রংগুলো কী অদ্ভুত…'! তিনি আরও বললেন : 'আমার বাকি সমস্ত শিল্পকর্ম সম্পর্কে এখন আমার আগ্রহ নেই। একমাত্র যার জন্যে আমি গর্বিত : তা আমার ছবি। ছবিগুলো ইউরোপে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তাতে তিনি বুঁদ হয়ে আছেন। এর মধ্যে স্নবারি ও মিথ্যা ভদ্রতার অংশ যে কতখানি তা তিনি ধরে উঠতে পারেননি। সবই তিনি বেদবাক্য ব'লে মেনে নিয়েছেন : পল ভালেরির সাধুবাদ, পারীর কোনো এক সমালোচকের স্তুতি,—যে বলেছে : 'আমি ভালোই জানতাম যে আপনি মহান্; কিন্তু আপনার ছবি দেখার পরই তা উপলব্ধি করতে পারছি।' আর বার্লিনে আর্ট গ্যালারির জন্যে সরকার থেকে তাঁর তিন চারখানা ছবি কেনা হয়েছে। তিনি উল্লসিত। একথা বলতে তাঁর ভয় হলো না : 'জগতে আর যা কিছুই ঘটুক এখন আমার তাতে আগ্রহ নেই। এখন আমি আমার সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেয়েছি। কোনো কিছুর জন্যে উদ্বিগ্ন না-হয়ে স্বাধীনভাবে আমি আমার গানের জীবন শুরু করেছিলাম। যেমন ক'রে শুরু করেছিলাম, তেমন করেই শেষ ক'রে দেবো। পাখি যেমন সূর্যোদয়ে গান করে, তেমনি গান করে সূর্যাস্তে।' আর একথা বলতে বলতে তাঁর মুখখান ঝলমল ক'রে উঠল। যে-সময়ে নিজের জাতির নেতারা কারারুদ্ধ যখন ভারতবর্ষ তার বীরোচিত যন্ত্রণা ভোগ করছে, তখন আমি-আমি ক'রে কেউ আর প্রায় ভাবেই না। তিনি এক অন্য জগতে চলে গেছেন। তাঁর স্বাভাবিক ও সরল মাধুর্যের যেটুকু তিনি বজায় রেখেছেন, তাই তাঁকে ইউরোপীয় সৌন্দর্যবাদের কিম্ভুত শুষ্কতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু খুবই ভয় আছে যে, ওই সৌন্দর্যবাদ তাঁকে না কুক্ষিগত করে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যে তাঁকে কাজে না লাগায়।

আমরা চলে আসার মিনিট পনের আগে ঢুকলেন এন্‌ড্রুজ। আর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গান্ধীর নামটি উচ্চারণ করলেন, রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে এ নামটি শোনার জন্যে বৃথাই অপেক্ষা ক'রেছিলাম, এ নামটি আমাদের আলোচনায় অনুপস্থিত ছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এনড্রুজ ইচ্ছে করেই সাহসের সঙ্গে তাঁর কথা তুললেন, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যরা যাতে তাঁর কথা ভাবতে বাধ্য হন। কিন্তু আস্কারা-পাওয়া বুড়ো খোকার মতো শুধু এই খোঁচা দিয়ে তিনি উত্তর দিলেন : 'এন্‌ড্রুজ গান্ধী ও তাঁর ধ্যানধারণা সম্পর্কে একখানা কেতাব লিখেছেন। এখন তিনি লিখছেন : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ধ্যানধারণা।" তাঁর মনে হচ্ছে, যিনি তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর বন্ধুদের কেড়ে নিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় দফায় জিতলেন। তিনি তাঁর কাছে এর বেশি চান না। তিনি জিতে গেছেন। (তিনি

এই ভাবছেন! কিন্তু ভুল করছেন। ইতিহাস তার পক্ষে বড়োই নির্মম হতে পারে, যা তাঁর প্রাপ্য নয়।)

আতেনে-য় রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। কিন্তু তা দেখতে যাবার সময় নেই।

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আমার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'দি লাইফ অফ রামকৃষ্ণ' রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যার্থে অদ্বৈত আশ্রমের সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়েছে (আগস্ট)।

৩১ আগস্ট, ১৯৩০। এনড্রুজ এলেন প্রাতরাশে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাশিয়া যাবেন না, গান্ধীর বন্ধু ব'লে তিনি সেখানে মোটেই বাঞ্ছিত ব্যক্তি (persona grata) নন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবার কথা ভাবছেন, সেখানে অশ্বেতকায় জাতিগুলোর উপরে জঘন্যতম ব্যবহার করা হচ্ছে (সহানুভূতি ও বেদনার সঙ্গে, বিশেষ ক'রে, বললেন মহৎ বান্টু জাতটি সম্পর্কে, তাদের নিষ্পেষণ ভয়াবহ। সে-দেশ শেষবার ছেড়ে আসার সময় তাদের এক প্রতিনিধিদল বলেছিল ঃ 'আমরা জানি, ভারতীয়দের জন্যে আপনি মরতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের জন্যে মরবেন কি?' কথাটি তাঁর মনের মধ্যে বিবেকের এক দংশনের মতো হয়ে আছে।)

এনড্রুজ বললেন, এই বছর থেকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অনেক কাছাকাছি এসেছেন; তিনি গান্ধীর বিরাটত্ব বুঝতে পেরেছেন; গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের সাক্ষাৎকার দু'জনের পক্ষেই শুভ হয়েছে। ইংলন্ডের সংবাদপত্রে, বিশেষ ক'রে 'স্পেক্টেটর'এ রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেকগুলো চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এনড্রুজ ইংলন্ডের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার এক বেদনাদায়ক ধারণা নিয়ে ফিরছেন, বিশেষ ক'রে ফিরছেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে; ম্যাকডোনাল্ড তবু তাঁর পুরনো বন্ধু (তাঁর সঙ্গেই ম্যাকডোনাল্ড একসময় ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন)। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সঙ্গে খুবই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ব্যাপারে এক চুল ছাড়তে রাজী নন এবং তিনি এনড্রুজকে গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে প্ররোচিত করেছেন। লেবার পার্টি'র লোকদের কাছ থেকে আশা করার কিছু নেই। আরও বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে ঃ কোনো নাম-করা ইংরেজ লেখক ভারতবর্ষের কথা বলছেন না; তাঁরা ভান করছেন, তাঁরা কিছু জানেন না, তাঁদের এতে আগ্রহ নেই; কিন্তু এই ঔদাসীন্য নিঃসন্দেহে সেই আত্মসর্বস্ব যুক্তিগুলোকে স্বীকার না করার মুখোশ, যা ইংজেদের প্রচেষ্টার অবিচারকে অবিচার ব'লে মানা এড়িয়ে যেতে বাধ্য করে। সেদিন ওয়েলস* এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি চিন্তাশক্তির একেবারে অতি-সাধারণত্বের, প্রশ্নের প্রকৃত গুরুত্ব বোঝার অক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে

---

* এইচ জি. ওয়েলস। —অনু

গেছেন। এর বিপরীত, এন্ড্রুজ এবং রেজিনাল্ড রেনল্ডস, প্রায়ই ভারতবর্ষ সম্পর্কে জনসভা করেছেন, অতি স্বল্পসংখ্যক সহানুভূতিশীল ইংরেজকে পেয়েছেন, বিশেষ ক'রে পেয়েছেন কোয়েকারদের মধ্যে থেকে।

বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি যে দু'টি কৌতূহলজনক আলোচনা হয়েছে, এন্ড্রুজ তার কথা বললেন। দ্বিতীয় আলোচনাটি সঙ্গীত নিয়ে। প্রথমটি মানুষের চিন্তার সঙ্গে সত্য ও সৌন্দর্যের সম্পর্ক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এরা একে অন্যের উপর নির্ভর করে। এটা বিস্ময়কর যে, এমন পণ্ডিত হয়েও আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন,—সত্য মানুষ নিরপেক্ষ। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ যখন জিজ্ঞেস করলেন কোন্ যুক্তির উপরে তিনি এই বিশ্বাসকে স্থাপন করেছেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ “কোনো যুক্তির উপরেই নয়। আমি বিশ্বাস করি।” রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন ঃ ‘আমি কিন্তু সবচেয়ে আমার বিশ্বাসকে যুক্তির উপরেই স্থাপন করি।’ আইনস্টাইন হেসে বলেছিলেন ঃ ‘বেশতো, তার কারণ আমি আপনার চেয়ে বেশি ধার্মিক।’ দ্বিতীয়বারের কথাবার্তার সময় এন্ড্রুজ হাজির ছিলেন, প্রথমবারে ছিলেন না। কিন্তু প্রথমবারের কথাবার্তা ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’এ ছাপা হয়েছে।

এন্ড্রুজ একথা সত্যি ব'লে স্বীকার করলেন (নাগ যার বিরুদ্ধকথা বলেছিলেন) যে, রবীন্দ্রনাথের উপরে অরবিন্দ যে ছাপ ফেলেছেন তা অতি-অসাধারণ ঃ তা এতদূর যে তাঁদের সর্বশেষ সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রায় পাল্টে দিয়েছে। এ কথা সত্যি যে, সেই ছাপটা অবশ্য বিশেষ ক'রে ছিল দৈহিক ঃ অরবিন্দের চেহারা, তাঁর দুই চোখের গভীর ও আকর্ষণীয় সৌন্দর্য। কিন্তু তাঁরা বেশ কথাবার্তাও বলেছেন। একথা সত্যি নয় যে, এক সঙ্গে তাঁরা এরকম নীরব ধ্যানাবস্থায় ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি ইংলন্ডে ‘মানুষের ধর্ম” সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে সমগ্র মানবতা হচ্ছে এক সত্তা, যার ঐক্যকে আমরা প্রত্যেকে তার গভীরে অনুভব করি। ব্যক্তিমানুষের ঊর্ধ্বে চিরকাল তিনি পরম সত্তা, ঈশ্বরকে দেখেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এটা বেশ মনে হয়, তিনি যেন শিশুকালে কম ধর্মপ্রবণ ছিলেন বা একেবারেই ধর্মপ্রবণ, ছিলেন না। তাঁর প্রথম মহৎ অভিজ্ঞতা ১৮ বছর বয়সে। ভোরে তিনি বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে সুন্দর গাছগুলো দেখছিলেন। প্রভাতসূর্যের কিরণ পড়েছে তাদের উপরে। সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ওই গাছ ওই আকাশ, যা কিছু জীবন্ত সবকিছু একাত্মবোধের অনুভূতিতে প্রবলভাবে অভিভুত হয়ে পড়লেন। সারাদিন,—তার পরের দিনগুলোতেও—কলকাতার পথ চলতেও এই অলৌকিক অনুভূতি তাঁর মনে জেগে রইল। এই অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে চেয়ে তাঁর বড়ো ভাই যখন পাহাড়ী এলাকায় দার্জিলিংয়ে নিয়ে এলেন, তখন পর্যন্তও তা জেগে রইল। সেখানে প্রকৃতি আরও অসীম সুন্দর, কিন্তু সেখানে তাঁর অনুভূতির নেশাতুরতা কেটে গেল, এক দমকায় নিভে গেল।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মানুষের মধ্যেকার স্বভাবের মুখ্য পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমরা ঐক্যকে অনেক সরাসরি অনুভব করি।" এটা অবশ্যই পরিবেশের ব্যাপার। এনড্রুজ বললেন, যখন তিনি ভারতবর্ষে থাকেন তিনি সব সময়েই এই ঐক্য : ঐক্যের মধ্যে এই আনন্দ ও শান্তির প্রভাব অনুভব করেন। তার জায়গায়, একই অক্ষাংশে গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় গভীর আচ্ছন্ন-করা এক বিষণ্ণতা। কিন্তু তিনি এই পার্থক্যটি আরোপ করেন সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের উপরে, যারা ভারতবর্ষে জন্মেছে মরেছে, ভারতবর্ষের পরিবেশ যাদের মনকে লালিত করেছে।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। ইউরোপে বক্তৃতার একটা বিরাট সফর সেরে কালিদাস নাগ ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি পালামাসদের কথা বললেন, যাঁদের সঙ্গে (বাপ ও মেয়ে) তাঁকে আমি এথেন্স-এ পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। নাগ তাঁদের কাছ থেকে—তাঁদের যোগ্য ও অস্বস্তিকর জীবনের—মহৎ নিঃসঙ্গতার—এক গভীর বিষণ্ণ ছাপ নিয়ে এসেছেন। নোসিকায়াকে শুধুমাত্র গৃহকর্ম নিয়েই থাকতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বার্তাবহ নাগ তাঁদের কাছে এক ঝলক আলো। তাঁরা একসঙ্গে বসে গ্রীক ও বাংলায় কিছু গান পড়েছেন। তাঁদের বাইরে গ্রীসকে নাগের মনে হয়েছে মৃত, প্রাণহীন। বিষয়-চিন্তার বোঝাটা বড়োই ভারী। অধ্যাত্মচিন্তায় পুরোপুরি আগ্রহহীন। বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় তিনি আমার বইগুলোর কথা বলেছেন; সেখানকার তরুণদের বিষণ্ণ ও ট্রাজিক গাম্ভীর্যে তিনি অভিভূত হয়েছেন। লোকে বলে, বুলগেরিয়া কয়েক শতাব্দী ধরে হাসতে ভুলে গেছে। তার বর্তমান তার অতীতের মতোই বিষাদাচ্ছন্ন। আর এই জন্যেই ধর্মীয় ও অধিবিদ্যক চিন্তার প্রতি এতো বেশি আকর্ষণ। পারীতে সিলভ্যাঁ লেভি তাঁর সামনে আমার সম্পর্কে (আরও একবার) বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। আমার 'গান্ধী'র পর—আমার 'বিবেকানন্দ'-এর জন্যে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া, তিনি বিবেকানন্দকে ঘৃণা করেন, যেমন ঘৃণা করেন আমাকে। তিনি বলেছেন : "ওই দুই বাক্যবাগীশ…"—তাঁর কাছে ভারতবর্ষকে হয়ে থাকতে হবে মিউজিয়াম আর পুঁথিপত্রের বস্তু। নব-জীবন পাওয়াটা নিষিদ্ধ! তাঁর অনুমতি ছাড়াই তা সে পাবে…এই শ্রেণীর ইহুদিরা এশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমের (অতিশায়িত) প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দেখাতে গিয়ে হাসির খোরাক জোগায়! নিজেরা যে কতখানি বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে সে-বোধও (যদি কখনো তাদের সে-বোধ থেকে থাকে) এই বিদ্রূপ-কারীরা হারিয়েছে। এর বিপরীত, নাগ ভারতবিদ্যাবিদ মাসঁনুর্সেল ও চীন-বিদ্যাবিদ পেলিও-র কথা সহানুভূতির সঙ্গে বললেন। আমি নাগকে ভোয়াই-য়াজ এঁ্যাতেরিয়্যর' থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনালাম।

(তাঁর কাছ থেকে জানলাম— সংবাদপত্রগুলো তা গোপন করেছে বর্তমানে ২৫ হাজার ভারতীয় জেলে আছে, আর ব্রিটিশ সরকার ও গান্ধীর মধ্যে মধ্যস্থ ছিল

যে মডারেটরা. তারাও জাতীয় স্বাধীনতার একই আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়েছে, তারা গোলটেবিল বৈঠকে যেতে নিষেধ করবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩০—তরুণ ইংরেজ কোয়েকার রেজিনাল্ড রেনল্ডস গান্ধীর গত আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষ থেকে মর্মভেদী, তীব্র খোঁচাদেওয়া প্রচার-পত্র ('ট্রপিকাল বাজেট') পাঠাতেন ; লন্ডন থেকে তিনি আমাকে একটি বিনয়নম্র, সুন্দর চিঠি লিখেছেন (১৫ সেপ্টেম্বর)। তিনি লিখেছেন ইংলন্ডে তাঁর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় এবং দেশের কোয়েকারদের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণার কথা ; এই কোয়েকারদের ভুয়ো, ভীরু ও ধূর্ত শান্তিবাদকে ধিক্কার দিয়েছেন। "তারা সবসময় 'শান্তির' কথা ভাবে ; স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসামরিক প্রতিরোধের চেয়ে তারা, এমনকি, হিংসা ও অবিচারের উপরে স্থাপিত শান্তিকেও বেশী ভালবাসে ; অসামরিক প্রতিরোধ বলতে তাদের মনে জাগে নৈরাজ্য···তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের (আপাত) দৃশ্যগোচর শান্তি কোনো কোনো সময় হিংস্র শান্তি,—তা মনের শান্তিকে কলুষিত করে।" তিনি ইংরেজ তরুণদের "ভেঙ্গে-যাওয়া মোহের" কথাও বলেছেন, এ পর্যন্ত তারা ইংলন্ডের লেবার পার্টির "আদর্শবাদে" বিশ্বাস ক'রে ছিল, এবং তারা দেখছে ইংলন্ডের জনস্বার্থের পক্ষ নিয়ে তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। "তরুণদের বিশ্বাসপ্রবণ উৎসাহকে ধোঁকা দেবার জন্যে আরও একবার ধর্ম ও সামাজিক 'সুসমাচার'কে ব্যবহার করা হচ্ছে…ধর্ম ও রাজনীতির পেশাদাররা আমাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমাদের প্রতারণা করা হয়েছে ; কিন্তু আমরা সংখ্যায় কম আর আমাদের পরিচালক নেই। হিংসা ও অসূয়াসূচক 'মধ্যপন্থার, বিরুদ্ধে আমরা শক্তিহীন। আমার বয়স মাত্র ২৫ বছর। আমার বিশ্বাস আছে এবং অমি ভালোই জানি, আমার বুদ্ধিও আছে ; কিন্তু আমার শক্তির অভাব। কোনো বড়ো নেতার অধীনে কাজ করার জন্যেই আমি জন্মেছি ; আর যে-নেতার অধীনে কাজ করতে চাই, তিনি জেরবাদায় বন্দী। আপনাকে এসব লিখছি এইজন্যে যে, আমি জানি, আপনি পশ্চিমের কেবলমাত্র সেই মানুষদের একজন, যাঁরা সব বোঝেন। আমি জানি, আপনার স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে এবং আপনি যুদ্ধের ঊর্ধ্বেও দেখতে পারেন। আমি মিনতি জানাচ্ছি, আপনি আমাকে কয়েক ছত্র লিখে পাঠান। মনে রাখবেন আমি হচ্ছি এমন একটি শিক্ষার্থী যে তার গুরুকে হারিয়েছে !…"

আর তিনি সই করেছেন, "আপনার অনুগত সন্তান।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সস্নেহে উত্তর দিলাম (১৯ সেপ্টেম্বর) ; তাঁকে লিখলাম যে, শান্তি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা, আমারও তাই। আমি তাঁকে (আমার 'মা-ও ছেলে' উপন্যাসের মাথায়) স্পিনোজার উদ্ধৃত বাণীটি* স্মরণ করিয়ে দিলাম।

* 'যুদ্ধ না-থাকাটাই তো শান্তি নয়, শান্তি মনের শক্তি থেকে জন্ম-নেওয়া গুণ।' ("Pax enim belli privatio, sed virtues est, quae ex anime fortitudine oritur.")

“…‘সাধু ব্যক্তিদের’ ‘শান্তিবাদ’—(‘সাধু ব্যক্তি’ হওয়াটাই বড়ো জিনিস নয়! ‘সাহসী ব্যক্তি’ হওয়াটাই প্রয়োজন)—সমস্ত গুণাবলীর মৃত্যু ঃ—ত‍ঁার প্রথম গুণটি ঃ সক্রিয়শক্তি—চিন্তার সক্রিয়শক্তি হচ্ছে সমস্ত গুণের জননী, তা নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে না, তা নিজের সঙ্গে আন্তরিক হবার স্পর্ধা রাখে, আর ইচ্ছার সক্রিয় শক্তি তাই বলার স্পর্ধা রাখে যাকে সে সত্য ব’লে ভাবে, তাই করার স্পর্ধা রাখে যা সে বলে। নপুংসক ‘শান্তিবাদ’ নিজেকে আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মিথ্যার মুখোশ পরার সুযোগ দিয়েছে, যারা হিংস্রতম যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র সজ্জিত ক’রে নিজেদের লোকের সর্বনাশ করছে! এই মুখোশ অবশ্যই টেনে ছিঁড়তে হবে। ভন্ডামির সঙ্গে কোনো কারবার সম্ভব নয়! খোলাখুলি হিংসা তবুও ভালো। যখন হত্যা করে তখনো এ হিংসা ভন্ডামির চেয়ে সুস্থ।”

(আমি তাঁকে কিছু নির্দেশ দিলাম, কিছু কাজের ধারণা দিলাম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে গান্ধীর নতুন লেখাগুলো অনুসরণ ক’রে ইউরোপের জন্যে এক কর্মের ‘সুসমাচার’ সম্পাদনার কথা।)

“…গান্ধীকে জেলখানার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখা ব্যর্থ হবে; যারা তাঁকে চেনে সর্বত্র তাদের মধ্যে তাঁর আত্মা হাজির আছে, হাজির থাকবে, ঠিক তাঁরই আত্মার মতো—যিনি এমাউসের শিষ্যদের পাশে এসে বসেছিলেন। গোটা জীবন ধরে আপনারা তাঁর জ্যোতির্বলয়ের প্রতিবিম্ব বহন করবেন। তা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করুন!…”

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু চা খেতে এসেছেন; তাঁরা তেরিতে-য় কিলনে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে রওনা হবেন। জগদীশচন্দ্র একটুও পাল্টান নি; তাঁর তরুণ সুলভ প্রাণশক্তি তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু পুরোপুরি মন জুড়ে আছে ভারতবর্ষ ও তার সংগ্রামের চিন্তা, তাতে তিনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। আর কিছুই তিনি ভাবতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সে দু’ঘন্টা আমাদের সঙ্গে রইলেন, আমাদের কথাবার্তার একমাত্র বিষয় হলো এইটেই। নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। আমি স্বীকার করছি, তাঁকে আমার বেশী মনে ধরে। তিনি উদ্বেগ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন; তিনি ভালোই জানেন যে, ভারতবর্ষ জিতবে; কিন্তু তিনি ভাবছেন, অপরিসীম দুঃখভোগের কথা—আজকের দুঃখভোগ, আগামী কালের দুঃখভোগের কথা। তিনি দেখছেন, ইংলন্ডের হাতে ভারতবর্ষ হয়েছে শিক্ষাহীন, নির্মম নির্যাতিত, বাক্‌রুদ্ধ, অন্ধ: তাঁর জিজ্ঞাসা, যাঁদের উপর ত‍ঁার আস্থা আছে, মাত্র সেই দুইজন রাজনৈতিক নেতা ঃ গান্ধী ও (অত্যন্ত অসুস্থ) মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে কী হবে। যে-জাতি নিজেকে স্বাধীন করে, পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, তার অপ্রত্যাশিত সঞ্চিত শক্তি সম্পর্কে ত‍ঁার আস্থা জাগাবার চেষ্টা করলাম; আমি মাজিনির ইতালি, বিপ্লবী ফ্রান্স ও রাশিয়ার বীরোচিত দৃষ্টান্ত ত‍ঁাকে দিলাম…

—বিদায় নিতে গিয়ে তিনি আবেগের সঙ্গে কামনা জানালেন, আমি যেন তাঁর জাতির ও জগতের মঙ্গলের জন্যে অনেক দিন বেঁচে থাকি।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। আবার কালিদাস নাগ। গোটা সপ্তাহ তিনি 'লিগ অফ নেশনস'এ আটকে আছেন, সেখানে তিনি বুদ্ধিজীবী-সহযোগিতার জন্যে কাজ করছেন; রবিবারটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে এসেছেন। কিন্তু সম্ভবত আজকেই এই শেষ বারের মতো। তাঁকে পারীতে ফিরতে হবে এবং সেখানে তিনি আমেরিকার জাহাজ ধরবেন। গোটা শীতকাল যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দেবেন। কার্যত তিনি আমাদের দূত, আমাদের নামে জগৎজোড়া বিচ্ছিন্ন সব বন্ধুদের একসূত্রে বাঁধছেন। তিনি অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের আবেদন জানাতে আমি যেন উদ্যোগী হই—তাতে স্বাক্ষর থাকবে শুধু আইনস্টাইন, পালামাস ও জগদীশচন্দ্র বসুর। আমি আমার 'ভোয়াইয়াজ এঁ্যাতেরিয়্যর'-এর আরও কিছু অংশ পড়ে শোনালাম—শোনালাম সবচেয়ে অন্তরঙ্গ অংশটি, যাতে আমার মা আর দাদুর ব্যাপার আছে। শেষ হলে ভালো মানুষ নাগ আমার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপালেন। ঠিক হলো পাঁচ বছরের মধ্যে আবার আমরা মিলবো। তখন তাঁর স্ত্রী শান্তাকে, তাঁর ছোট্ট মেয়েটি মাদলিন লুসকে নিয়ে·ইউরোপে আসতে হবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। আগামী মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মোৎসব পালনের জন্যে তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবেদন লিখতে ভারতীয় বন্ধুদের অনুরোধ কালিদাস আমাকে পাঠাচ্ছেন। এই প্রতিবেদনে সই করবেন ৪ কি ৫ জন: এ. আইনস্টাইন, স্যর জে. সি. বসু, কস্তিস্‌ পালামাস ও আমি, বিভিন্ন ভাষায় ভারতবর্ষে ছাপা হবে এবং পাঠানো হবে জগতের সেরা লোকদেয় কাছে। আমি একটি লিখলাম (৩০ সেপ্টেম্বর):

“আগামী মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর পূর্ণ হবে। তাঁর জীবনে যাঁদের জীবন আলোকিত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে, মহৎ হয়েছে—জগৎজোড়া তাঁর সেইসব বন্ধুদের এই দিনটিতে তাঁর পাশে সমবেত হতে হবে। আমাদের কাছে তিনি আলোক ও সমন্বয়ের মনের জীবন্ত প্রতীক;—সে-মন এক মুক্ত বিহঙ্গ—ঝড়ের মধ্যে যে ডানা ছড়িয়ে বেড়ায়;—সে এক অনন্তের সঙ্গীত,—উদ্বেলিত ক্ষুব্ধ বাসনা-কামনার সমুদ্রের ঊর্ধ্বে যে সঙ্গীত এরিয়েলের স্বর্ণবীণায় ঝঙ্কৃত হয়। কিন্তু তাঁর সার্বভৌম শিল্প-মানুষের দুঃখদুর্দশা ও স্বাধীনতার জন্যে বিভিন্ন জাতির বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি কখনো আগ্রহ হারায়নি। তিনি হচ্ছেন,—যেমনটি গান্ধী বলেছেন—'মহান্‌ প্রহরী' (আজ জেলের প্রাচীর যদি আমাদের কাছ থেকে গান্ধীকে বিচ্ছিন্ন না-ক'রে রাখতো, তা হলে সম্বর্ধনা জানাতে আমাদের মধ্যে তিনিই হতেন মহান্‌ অগ্রজ)। বেদনাকরুণ সময়গুলোতে তিনি ছিলেন তাঁর জাতির ও জগতের স্বচ্ছ ও নিঃশঙ্কদৃষ্টি সতর্ক-

প্রহরী। বিশ্বাস ও সৌন্দর্যে সুললিত কণ্ঠস্বর যাদের পুষ্ট করেছে, সেইসব হাজার হাজার মানুষের নামে আমরা তাঁর শিল্পী ও পণ্ডিত বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের উৎসবে তাঁদের আত্মিক ফুল ও ফলের ডালি সাজিয়ে আনুন তাঁকে উপহার দিতে। ব্যক্তিগতভাবে কবিকে সম্মান জানানোর কোনো দরকারই নেই। (আমাদের বিশ্বাসের কারণ আছে যে তিনিও তা মোটেই চান না।) কিন্তু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকেই যেন তাঁর বাগানের একটা করে ডাল তাঁকে উপহার দেন ঃ একটা কবিতা, একটা প্রবন্ধ, গ্রন্থের একটা পরিচ্ছেদ, একটা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা, একখানা ছবি, একটি চিন্তা—কারণ আমরা সবাই যা হয়েছি এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছি, তাদের সবারই শেকড় অথবা ডালপালা কাব্য ও প্রেমের বিপুল গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠেছে।"

অক্টোবর, ১৯৩০। গান্ধীর জন্মবার্ষিকীর জন্যে রেজিনাল্ড রেনল্ডস আমাকে কয়েক ছত্র লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁকে এইটি পাঠালাম (১ অক্টোবর) ঃ

"আমাদের কাছে গান্ধী কেবলমাত্র তাঁর বিশাল জাতির সেই বীর পরিচালক নন, যিনি দাবী জানাচ্ছেন তার স্বাধীনতার—এবং যিনি সে-স্বাধীনতা অর্জন করবেন। তিনি আমাদের যুগের অন্ধকার আকাশে ঝলমল-করা নিশ্চিততম, পবিত্রতম আলো। ঝড়ের মধ্যে যখন আমাদের সভ্যতার টাল-মাটাল তরণীর সবকিছু নিয়ে ডুববার ভয়, তখন তিনি তারার মতো আমাদের পথ দেখাচ্ছেন—দেখাচ্ছেন সেই একমাত্র পথ, যা পরিত্রাণের দিকে প্রসারিত। এই পথ আছে আমাদের মধ্যে। এই পথ হচ্ছে চরমতম শক্তি। এ হচ্ছে বীরোচিত না-গ্রহণ। এ হচ্ছে অবিচার ও হিংসার বিরুদ্ধে মাথা-তুলে-দাঁড়ানো স্পর্ধিত আত্মার অস্বীকৃতি। এ হচ্ছে মনের বিপ্লব। এই বিপ্লব সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধায় না। এ সকলকে এক করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ জাগিয়ে তোলে অনন্য-আত্মার অন্তরশায়ী অগ্নি, যা মানবতার উত্থান ঘটিয়েছে নাস্তির মধ্যে থেকে, যেখানে মানুষের উন্মত্ততা মানবতাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তিনি খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টান হতে নতুন ক'রে শিক্ষা দিচ্ছেন—(কারণ তারা আছে শুধু জপতপ নিয়ে), তিনি মুক্ত মনকে মুক্ত হতে নতুন ক'রে শিক্ষা দিচ্ছেন—(কারণ তারা আছে শুধু বৃথা বিতর্ক নিয়ে, যা হীন বশ্যতারই একটা মুখোশ মাত্র)—তিনি প্রতিটি মানুষকে নতুন ক'রে শিক্ষা দিচ্ছেন সকলের মধ্যে সেই একই পিতার সমতুল্য সন্তানকে সম্মান করতে ; সেই একই পিতা—সেই একই 'মহত্তম শ্রেষ্ঠতম ঈশ্বর' (Dei Optimi Maximi)—আলো ও প্রেমের আত্মা, যিনি সৃষ্টির সেই আদিম যুগে, 'যখন গভীর গহ্বর ছিল অন্ধকারে আবৃত'—(আজো তা অন্ধকারে আবৃতই আছে) ঠিক যেমন 'জলরাশির উর্ধ্বে সঞ্চরণ করতেন'।'

অক্টোবর, ১৯৩০। রনজী জি. শাবানি নামে এক শক্তিমান তরুণ সমালোচক তাঁর 'ভারতীয় দৃষ্টিতে সেক্সপিয়র' গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখতে অনুরোধ

করেছেন। কিন্তু কাজটি আমার আগ্রহ জাগালেও, বেশ কড়া সমালোচনা না-ক'রে আমি ভূমিকা লিখতে পারবো না। ইংলন্ড ও তার ভারতবর্ষের নির্বোধ পঠন-পাঠনের বিরুদ্ধে একহাত নিতে গিয়ে শাবানি সেক্‌সপিয়রকে চাবকেছেন। তাঁর অলীক কল্পনা এই যে, পশ্চিমী উপাসনার উপরে চাপানো এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো প্রতিমা। আর তাঁর সমালোচনা একটা ব্যঙ্গ. শক্তির অভাব নেই, কিন্তু ভাসাভাসা ; শুধু সেক্‌সপিয়রের প্রতিভাই নয়, পশ্চিমের প্রতিভা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই জানেন না এবং ভুল জানেন। ইউরোপ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের মনের মহিমা অস্বীকার করেছে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, এবার তার বেলায়, ইউরোপের মনের মহিমাকে দেখতে আপত্তি করছে। দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমার অস্বীকৃতির কারণ জানিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখলাম।

১৯৩১

মে, ১৯৩১। গান্ধী, লেনিন, অহিংসা ও বিপ্লব সংক্রান্ত দ্বৈত প্রশ্ন নিয়ে এদম' প্রিভার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার পরের ব্যাপার। আমার বর্তমান কর্মসূচী এবং ইউরোপের অ-প্রতিবিরোধীদের কাছে কর্মের যে সমস্যাটি উপস্থিত করতে চাই, নিচের এই চিঠিতে (৫ মে) তা স্থির করার চেষ্টা করলাম :

'আপনারা জানেন যে, কয়েক বছর আগে গান্ধী সুইজারল্যান্ডে প্রায় এসেই পড়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নিতে তিনি প্রায় অপেক্ষা করেছিলেন আমার এক উত্তরের : কারণ তাঁর ইচ্ছাটা ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা। এবং আপনারা ভালোই বুঝবেন যে, আমার ইচ্ছাটাও ছিল তাই ! এবং তা সত্ত্বেও আমি বরং আসতে তাঁকে মানা ক'রে দিই। আমি চেয়েছিলাম, তিনি যেন ইউরোপের অ-প্রতিবিরোধী যুবশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আসেন, আসেন তার কথা শুনতে, তাকে নির্দেশ দিতে, শুধুমাত্র আমার সঙ্গে আলাপের জন্যে যেন না আসেন কারণ আমি নিজেকে তাঁর উপযুক্ত মনে করিনি, এবং আমি জানতাম যে, তিনি আমার সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আমাদের উভয়ের বন্ধু 'মীরা বেনের' পোষণ-করা বহু মোহ লালন করছেন। তাঁর যে মহামূল্য জীবন তাঁর জাতি এবং মানবতার সম্পত্তি, তা থেকে কয়েকটা দিনও নেবার অধিকার আমার আছে ব'লে আমি মনে করি না। অন্যদিকে, তাঁর চিন্তা নিয়ে ইউরোপীয় যুবশক্তির চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়াবার ইচ্ছায় তিনি মোটেই লুব্ধ হননি। তাঁর স্বভাবের বিচক্ষণতা পা টিপে টিপে এগোয় এবং না-জেনেও, 'বেশি সাপ্টে ধরলে মুঠোয় ওঠে কম'—এই ফরাসী প্রবাদটির বিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করে ; সেই বিচক্ষণতা নিয়ে, ভারতের সমস্যাবলীর সমাধানের আগে, তিনি ইউরোপের সমস্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করতে সব সময়েই অস্বীকার করেছেন।

এই নয় যে, সেই তখনই,—আজ তা কত বেশি ! ইউরোপের সামনে গান্ধীর দাঁড়াবার এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আমি কিছু কম অনুভব করেছি। আজ

এই নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে নিজেকে আমি বেশি সমর্থ এবং কম অনুপযুক্ত মনে করবো।

গান্ধীর বিশ্বাস ও কর্মের মতবাদ পবিত্র। ভারতবর্ষে তার অভীষ্ট ফলদানের ক্ষমতা যে জয়ী হবে—তা সে দেখিয়ে দিয়েছে। ('য়ুরোপ' পত্রিকায় [১৫ এপ্রিল] আমার সর্বশেষ প্রবন্ধে এইটির উপরে আমি আবার জোর দিয়েছি।)—কিন্তু সেটা একটা 'পরম' কিছু নয় (তিনিও তা মনে করেন না: আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি সেই সব, নিজের অভিজ্ঞতা, এমনকি যে-অভিজ্ঞতা তাঁর মনের সবচেয়ে কাছাকাছি - তাদের সব সময়ের আপেক্ষিক চরিত্র সম্পর্কে, তিনি যা লিখেছেন।) আর ভারতবর্ষও এমন 'পরম' কিছু নয়। আমরা যারা সত্যের আন্তরিক এবং স্বার্থশূন্য সন্ধানী, আমাদের সকলের সামনে আজকের বিরাট প্রশ্ন, ভারতীয় পরীক্ষাটিকে ইউরোপে (এবং পৃথিবী জুড়ে) কেমন ক'রে প্রয়োগ করা যায়।

তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তা হচ্ছে: 'প্রেম—পরার্থ-প্রেম (Amor Caritas)—বিমূর্ত বা ভাবপ্রবণ নয় সক্রিয়। অপরের কল্যাণের জন্যে প্রেম, আপনজনের সেবায় নিজের সত্তার যৌতুক।' এবং অহিংসা এর এক মহিমান্বিত প্রকাশ। গান্ধীর অ-গ্রহণের নীতি, তাঁর সংগঠিত অ-সামরিক প্রতিরোধ মানবতার সামনে তুলে-ধরা কার্যত সুন্দরতম কৌশলগত পন্থা।

এও জানতে হবে যে, তা ইউরোপে, এবং আরও ব্যাপক ভাবে—সেই সব দেশে, ভারতবর্ষের মতো যে-সব দেশে ধর্মীয় চিন্তা এবং হাজার হাজার বছরের সামাজিক জীবনের বিশেষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এ স্বভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে ওঠেনি, বর্তমান কর্তব্যের সমস্ত দাবি মেটাতে পারবে কি না। আমি প্রশ্নটি শুধু তুলে ধরছি মাত্র, আগে থেকে তার কোনো সিদ্ধান্ত করছি না বা উত্তর দিচ্ছি না।

আমি চাইছি অ-প্রতিরোধের আগামী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (এই বিতিকিচ্ছি 'অ-প্রতিরোধ' কথাটিকে যদি আমাদের মাথা থেকে তাড়াতে পারতাম, কিন্তু ওটা তার চিহ্ন রেখে গেছে, এমনকি তখনও যখন আমাদের চিন্তা প্রতিবাদ জানায় এবং সম্পূর্ণ বিপরীত কথা চিৎকার ক'রে বলে: 'শেষ পর্যন্ত আত্মার প্রতিরোধ।') চাইছি এই কংগ্রেসেই, যেন গান্ধীকে ডাকা সম্ভব হয়, নিঃসন্দেহে তিনি তখন ইউরোপে থাকবেন এবং যেন সম্ভব হয় সমস্যাটির আগাগোড়া আলোচনা করা। কিন্তু আমার খুবই ভয় যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রশ্নে অতি-আচ্ছন্নতা (obsession), গান্ধীর ক্লান্তি এবং ইউরোপীয় সমস্যার মধ্যে ঢুকতে তাঁর অনীহা আমার ইচ্ছাপূরণে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

এবং তা সত্ত্বেও!...তা সত্ত্বেও!...এমনকি গান্ধীর পক্ষে এই মুহূর্তে তাঁর দিগন্তকে প্রসারিত করাটা কত কাজের হবে! শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি যা লিখেছেন, তা প্রমাণ করে, নতুন যে পর্যায়ে জগতের রক্তাক্ত পদক্ষেপ, তার প্রায় কিছুই তিনি জানেন না। তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ পিতৃশাসিত (patriarcale) এক শ্রেণীঐক্যে, যা ভ্রাতৃত্বমূলক শুভ ইচ্ছাকে খারিজ করে না; তাঁর কাছে ধনতন্ত্রের চেহারাটা ফুটে ওঠে আমেদাবাদের ওই বড়ো

বড়ো সুতাকল মালিকদের মধ্যে দিয়ে, যারা সজ্জন ও ধর্মভীরু, তাঁর কথা যাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এবং যারা শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তিনি কারবার করেননি এই শক্তি, এই অবয়বহীন হৃদয়হীন 'চাঁদি'র শক্তির সঙ্গে ; পরিচয়-লুকানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো, আন্তর্জাতিক জোটবাঁধা কোম্পানীগুলোর সঙ্গে, অন্ধ দানবদের সঙ্গে, যারা সেই 'যন্ত্রের' চেয়েও অনেক অনেক বেশি ভয়ংকর যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এতো ব্যর্থ তীর নিক্ষেপ করেছেন, কারণ 'চাঁদিই' সেই অদৃশ্য যন্ত্র। এবং সেই 'চাঁদিই' আজ রাষ্ট্রগুলোকে চালাচ্ছে, মত-অমত নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনো এক স্বৈরাচারীর ব্যাপারে—তা সে যতই ভয়াবহ হোক্ বা শ'খানেক ছোটোখাটো রাজার (মন্ত্রী এবং জাতির প্রতিনিধিবৃন্দের) ব্যাপারে, বা এমনকি, রক্তমাংসের একটা জাতির ব্যাপারে কৌশল, আর পরিচয়হীন, নামহীন, মনুষ্যত্বের তিলমাত্র সম্পর্কহীন শক্তিগুলোর ব্যাপারে কৌশল—কি একই হতে পারে ?

এবং অন্যদিকে, বিশুদ্ধ অহিংসার প্রয়োগ সম্পর্কে কত যে প্রশ্ন ওঠে ! তার ব্যক্তিক (personnelle) প্রয়োগ (আমি বুঝি আমাদের দিক থেকে ব্যক্তিগত (individuelle) এবং আমাদের মূল্যে) সমস্যাটির কেবলমাত্র ন্যূনতম দিক। মোটের উপর, আমাদের মতো মানুষের পক্ষে, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করা হয় তার জন্যে, নিজেকে বলি দেওয়া তেমন কঠিন নয় ! কিন্তু এর জন্যে অন্যদের বলি দেওয়া ? তাদের দেওয়াটা কি শুধু হিংসার মাধ্যমে নয় ? আর অহিংসা কি আগে থেকেই হাজার হাজার বলির ইঙ্গিত করে না ? যারা 'ইচ্ছুক,' যারা 'সচেতন' তাদের পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু যাদের মতামত নেওয়া হয়নি, যারা সচেতন নয়, যারা 'নিরীহ' তাদের পক্ষে ? এখানে এটি বিস্তারিত করার অবকাশ নেই ; কিন্তু আমি আপ্টন সিনক্লেয়ারের ('অয়েল' উপন্যাসের) সেই তিনটি মেয়ের কথায় আসছি, যাদের ফুটন্ত কফির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল...কী করতেন, যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন ? আগামী দিনে শাস্তিমূলক পুলিশী-অভিযান হবে ধরে নিয়ে, তার সামনে কী করবেন ? বিরাট হানাহানির বছরগুলোর রূঢ় ও নির্মম সম্ভাব্যতা-গুলো এক মারাত্মক গিরিসঙ্কট যার মধ্যে দিয়ে মানবতাকে আগ বাড়িয়ে যেতে হবে ;—তারই জন্যে ইউরোপের অ-প্রতিরোধীদের হাতে একটা সুদৃঢ় মতবাদ,—সচেতন ভাবে আলোচিত ও পরীক্ষিত হবার পর প্রতিষ্ঠিত মতবাদের দরকার। যদি তাঁদের খেয়াল না থাকে তাহলে তাঁরা হতাশার অতলে তলিয়ে যাবেন, দৈবের হাতে কিছুই ফেলে রাখা হবে না।

সম্ভবত এখন আপনারা বুঝতে পারবেন, অতি নিরুদ্বেগ 'অ-প্রতিরোধীদের' জাগিয়ে তোলার জন্যে পাগলাঘন্টি বাজানো কেন প্রয়োজন মনে করি ! আমি আরও বলবো যে, কিছু ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দশবছর ধরে এক বিতৃষ্ণা একটু একটু ক'রে আমার মনকে অধিকার করেছে ; দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা আরামদায়ক 'অহিংস' মনোভাবে অতি অনায়াসে তৃপ্ত হয়ে আছেন, এবং নিজেদের নিরুপদ্রব বুর্জোয়া সুপ্রতিষ্ঠার তিলমাত্র ক্ষতি না ক'রে, সংবাদপত্রে নিরীহ বিবৃতির নিচে সই দিয়ে হেলা ভরে নিছক মুখের প্রতিবাদ করছেন। আমার পক্ষে যদিও

হিংসার রক্তে হাত রাঙানো অসম্ভব, তবুও সাদা হাতের অধিকারী ভণ্ডদের (phrisiens) মনোভাবের সামনে, নরক থেকে লক্ষকোটি মানুষকে টেনে হিঁচড়ে বের ক'রে আনার জন্যে নিজের জীবন ও কলংক বা অভিশাপের ঝুঁকি নেওয়া লেনিনের মনোভাব—আমার কাছে কতো বেশি পৌরুষব্যঞ্জক মনে হয়; শুধু পৌরুষব্যঞ্জকই নয়, মানবতার সেবার জন্যে বলিদানের আন্তর নীতির সঙ্গে কতো বেশি সত্যিকারের প্রেমপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণও মনে হয়! যদি তিনি ভুল ক'রে থাকেন, তাঁর হৃদয় ভুল করেনি, ভুল করেছে তাঁর চিন্তাবুদ্ধি। কিন্তু এই চিন্তাবুদ্ধি পড়েছিল আশু কর্মের মুখোমুখি। সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সক্রিয় হওয়া নয়, আরও সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল (অক্টোবরের দিনগুলোয় হাজার হাজার শ্রমিকের কাছে যে সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন ক্রাইলেংকো—জন রীডের সুন্দর 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি দ্রষ্টব্য): কারণ তাতে সব চেয়ে খারাপকেই সক্রিয় হতে দেওয়া হতো। বর্তমানের যা দাবি তা হচ্ছে কর্মের হুকুমনামা। তা আলোচনার জন্যে সমবেত হচ্ছেন কি! প্রথমে দরকার সেটি ভালো ক'রে জানা এবং তা দেবার জন্যে ঐকমত্যে পৌঁছনো।'

জুন, ১৯৩১। গতবছর আমার 'রামকৃষ্ণ' পড়ে ব্রাশেলস্-এর এক নার্স* তাঁর আবেগের কথা লিখেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন বেলুড়ের রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে; তিনি লিখেছেন (৩১ মে) যে, তাঁর জীবনে যে স্বপ্নকে অচরিতার্থ মনে করেছিলেন, আমার মধ্যস্থতার কৃপায় তা সফল হয়েছে।... 'আমি সেই দীক্ষা পেয়েছি যা আমাকে তন্ত্রের পথ ধরে মায়ের কাছে নিয়ে গেছে; এই দীক্ষা আমি পেয়েছি স্বয়ং স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে। আমি এইভাবে সেই ঐশ্বর্য পেয়েছি যার জন্যে এতো কেঁদেছি: মন্ত্র ও আমার আধ্যাত্মিক জীবন এর ফলে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে; আর তার সঙ্গে নিরসন হয়ে গেছে আমার সমস্ত সন্দেহ। অসংখ্য পথ ধরে ঈশ্বরে পৌঁছনো যায়। একমাত্র ঈশ্বর যদিও কাম্য, তবু তাঁকে লাভ করতে নিজের পথই অনুসরণ করতে হয়। এইটেই ছিল আমার পথ। এর বাইরে আমি কিছু করতে পারতাম না। প্রতিদিন আমি নিজেকে বেশী শক্তিশালী মনে করছি। একমাত্র এখনই শুধু আমি বেঁচে আছি। স্বাধীন হতে এ কোনো বাধা ঘটায় না। আমি জানি, উপায়গুলো কিছুই নয়, তাদের ছাড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজে লাগাতে হয়। আমার সেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে-অন্তর অবশেষে আনন্দ ও শান্তিকে খুঁজে পেয়েছে।'

(এইভাবে, আমি গান্ধী ও রামকৃষ্ণকে উৎসাহী ইউরোপীয় শিষ্যা দিয়েছি।)

আগস্ট, ১৯৩১। জে. ই. গুজ্ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের এক চিত্তস্পর্শী

---

* রলাঁ এর নাম দেন নি, শুধু বলেছেন 'X'। অনু.

চিঠি (২৫ আগস্ট); তিনি বেডফোর্ডশায়ার, কেম্‌ব্রিজশায়ার, হার্টফোর্ডশায়ার, হান্টিংডনশায়ার, নরফোকের জন্যে 'লিগ অব নেশনস' এর ভ্রাম্যমাণ সচিব। তিনি সেইসব সৎ ইংরেজদের একজন, যাঁরা তাঁদের ভুলগুলো স্বীকার করতে কখনো ইতস্তত করেন না, সে-ভুল যদি একটা গোটা জীবনের ভুলও হয়। তিনি সদ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলো পড়েছেন এবং তাতে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন ১৮৯৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস-এর সদস্য; তিনি কাজ করেছেন যুক্তপ্রদেশে এবং অবসর গ্রহণের পর সেই প্রদেশের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। আমি যে-যুগটির বর্ণনা করেছি, সেই পুরো যুগটির মধ্যে তিনি তাই ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন, ছিলেন "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধকার পর্দার আড়ালে"; এবং আজ তাঁর দুঃখ ও লজ্জা যে, এই মহান্ ঘটনাবলী ও মহান্ মানুষদের পাশেই থেকেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেননি। ১৮৯৮ সালে সেরভিয়ের-দম্পতির সঙ্গে জরিপ বিভাগের কর্মচারী হিসেবে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, এবং আশ্রমের জন্যে মায়াবতীর (মাইপৎ) জমি দখলের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তিনি তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। মায়াবতীতে তিনি সেরভিয়ের-দম্পতি এবং তরুণ সন্ন্যাসীদের দেখেছেন। এক বছরের জন্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর গ্রাহক হয়েছিলেন (এবং এখন নতুন ক'রে গ্রাহক হতে যাচ্ছেন)। আলমোড়ায় তিনি বিবেকানন্দকে দেখেছেন। এছাড়াও, ১৮৯৩ সালে অরবিন্দের মতো (তিনি বলেন: আরভিন্দ্) একই সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একই বাহিনীতে ছিলেন। অরবিন্দ এসেছিলেন কেম্‌ব্রিজ থেকে। গুজ্ অক্সফোর্ড থেকে; এবং তাঁরা যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করেন নি। একথা মনে করতে গুজের লজ্জা হয় যে, অরবিন্দ ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন, পরীক্ষাটা অত্যন্ত কঠিন ছিল (রেকাব ছাড়া উঠতে হতো); এবং এই ব্যর্থতাই সম্ভবত ইংরেজের সেবা থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের ক্ষেত্র নির্ধারিত করেছিল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। 'রাজপুতানা' জাহাজ থেকে গান্ধী আমাকে তার করেছেন, বোম্বাই ছেড়েছেন ২৯ আগস্ট, মার্সেই পৌঁছুবেন ১১ সেপ্টেম্বর; তাঁর ইচ্ছা যেন মার্সেই এবং ক্যালের মধ্যে রেলপথের কোনোখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করা সম্ভব হয়। ভারতের বড়লাটের সঙ্গে টালবাহানা ও আলাপ-আলোচনায় পনেরটা দিন দেরি হয়ে যাওয়ায়, তাঁর হাতে শুধু গোলটেবিল বৈঠক শুরু করার জন্যে সোজাসুজি লন্ডনে পৌঁছুবার সময়টুকুই আছে। তিনি ভিলন্যভে থামতে পারছেন না।

আমরা তাঁকে তার ক'রে জানালাম যে, দিজঁ-তে তাঁর সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করবো এবং দিজঁ থেকে পারী পর্যন্ত একসঙ্গে ট্রেনে আসবো। কিন্তু নতুন এক দীর্ঘ ও প্রীতিপূর্ণ তারবার্তায় তিনি জানালেন, দিজঁ-তে ট্রেন পৌঁছুবে সেই

মাঝরাতের পরে, আর যদি স্বাস্থ্যে কুলোয়, ভালো হয়, যদি আমরা মার্সেইতে আসি, সেখানে জাহাজ পেঁছুনো এবং স্পেশাল বম্বে-এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ার মধ্যে আমরা গল্প করার জন্যে সাত ঘন্টা সময় পাবো। আরও যোগ করেছেন, যাই ঘটুক, আমাকে না দেখে তিনি ইউরোপ ছেড়ে যাবেন না।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। মার্সেই না যেতে পেরে গান্ধীকে বোনের হাত দিয়ে এই চিঠিটা পাঠালাম (১০ সেপ্টেম্বর) ঃ

“প্রিয় বন্ধু, ইউরোপের মাটিতে আপনার পদার্পণে বোনের সঙ্গে গিয়ে আপনাকে নমস্কার করতে না পারাটা আমার কাছে এক বেদনা। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যে কুলোয়নি। ল্যুগানো থেকে ভিলন্যভে এসেছিলাম যখন তখনই মার্সেই যাবো ব'লে। কিন্তু রোদের দেশ থেকে বৃষ্টির দেশ আসতে ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছি ; এবং এই দিনগুলো আমাকে ভিলা অলগায় বন্দী হয়ে থাকতেই হবে। আমি আশা করবো, ভারতবর্ষে ফেরার পথে পরে আপনার এখানে আসা যেন সম্ভব হয়, যাতে এই জীবনেই আমরা দু'জন দু'জনকে দেখতে পাই।

আপনার এই সুন্দর ও দুরূহ দৌত্যে আমার চিন্তা আপনার সঙ্গে চলেছে লণ্ডনে। যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন করেন তাঁদের রাজনৈতিক বিজ্ঞতায় আস্থা রাখতে চাই ; আমি আশা করি, আপনার সঙ্গে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার গুরুত্ব তাঁরা বুঝবেন, তাঁরা মতৈক্যের এই শেষ সুযোগটি হারালে পরে তা আর পাবেন না। আমার কাছে যা অপরিহার্য ব'লে মনে হয় তা এই যে, জনগণের সঙ্গে, ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে জগতের সবচেয়ে অত্যাচারিত জনগণের সঙ্গে আপনার চিন্তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যেন চিরকাল এমন ধরনেরই থাকে, যাতে তারা আপনাকে তাদের সেই খাঁটি ও দৃঢ় মুখপাত্র ব'লে চিরকাল মনে করতে পারে, যিনি তাদের হয়েই কথা বলবেন, যিনি তাদের অধিকার তিলমাত্রও ছেড়ে দেবেন না। আজকের এই অশান্ত সময়ে হিংসাকে আটকাবার সর্বশেষ বাঁধগুলোকে হিংসা যখন ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত, তখন আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাস, আপনার সঙ্গে তাদের নৈতিক বন্ধনই মানবতার মুক্তি। বিদ্রোহী জনতারা যাতে তাদের নিজেদের স্রোতের তোড়ে ভেসে যায়, তারই জন্যে আপনার ও তাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার সমস্ত সুযোগই সে খুঁজবে। ইউরোপের আমরা যারা স্বাধীন ও স্বার্থশূন্য, যারা আজকের এই যুদ্ধের নিশিপালন করছি, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পুনর্নবীকরণ ছাড়া তাদের পক্ষে আশা করার আর কিছুই নেই ; যে ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ জাতিগুলোর দেহ ও মনকে দাবিয়ে রাখে, তাকে হটিয়ে এই পুনর্নবীকরণ শ্রমের এক সার্বভৌম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, এই অনিবার্য বিপ্লব যেন অহিংসা ও প্রেমের মাধ্যমে সাধিত হয়, যেন তা ঘৃণার অন্ধ শক্তিগুলোর কবলে না পড়ে, এই শক্তিগুলো গোটা পৃথিবীতে

ধ্বংসের নিঃশ্বাস ছড়াবে। এই আগামী যুদ্ধে আপনি আমাদের পরিচিত ও পরীক্ষিত সেনাপতি। এবং যুদ্ধের মাঝপথে যদি আপনার মৃত্যুও ঘটে, আপনার দৃষ্টান্ত আমাদের পথনির্দেশক হয়ে থাকবে। আর এইজন্যেই আমাদের বন্ধন যেন কিছুতেই শিথিল না হয়। আসুন, তা আরও দৃঢ় করি! লন্ডনে যখন আপনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিতর্কে নামবেন, আপনি যেন প্রবলভাবে অনুভব করেন জনগণের শক্তিকে, শুধু ভারতবর্ষের নয়,—ইউরোপের জনগণের শক্তিকেও; আপনি সেই শক্তির কণ্ঠস্বর, সর্বোচ্চ বিবেক! শ্রেষ্ঠ ইউরোপ আপনারই সঙ্গে। প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আপনাকে নমস্কার করি।”

১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার, সকাল ৬টার সময় আমার বোন ও প্রিভা-দম্পতি মিলিত হলেন মার্সেই বন্দরে ‘রাজপুতানা’ জাহাজ পৌঁছুনোর সময়, ওই জাহাজে গান্ধী ও সঙ্গীরা এলেন। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের অভূতপূর্ব ভিড় সত্ত্বেও এনড্রুজ ও মিস স্লেডের কৃপায় আমার বোন সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর কাছে পৌঁছুলেন। তিনি পরম স্নেহ প্রকাশ করলেন। সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি সাংবাদিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তাঁদের সৌভাগ্য হলো তাঁর পাশে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংকীর্ণ কেবিনে একই বিছানায় বসে থাকার। আমার বোন (এবং প্রিভা-দম্পতির) মনের মধ্যে গেঁথে আছে এই অতুলনীয় মুহূর্তগুলোর এক দ্বিধাশূন্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ছাপ,—(এবং তা হলেও আমার বোনের মনটা খুঁতখুঁতে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ)। দেখে মনে হয়েছে গান্ধীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অদ্ভুত ভারসাম্য আছে; তিনি প্রশান্ত, মনোযোগী, ফোকলা-দাঁতে নীরবে বা সরবে হাসেন, অতি সরল, খাঁটি, স্বতস্ফূর্ত অথচ চিন্তাশীল, নিজের উপর দখল রাখেন, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ—প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের মনের ভিতরটা, তার আনাচকানাচ পর্যন্ত দেখে নেয়। মর্যাদাপূর্ণ ভাবভঙ্গিতে মীরা বেনও শ্রদ্ধা জাগায়। ভিলন্যভে পড়ে-থাকা অনুপস্থিত বন্ধুর কথা তাঁরা দু'জনেই খুব ভাবছেন, মার্সেই-এর ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গান্ধী তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। (কিন্তু পারীর সংবাদ-পত্রগুলো তাঁর এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং আমার নাম রিপোর্ট থেকে যত্ন করেই মুছে দিয়েছে।) বিকেল ৩টার সময় ক্যালের পথে বোম্বাই-এক্সপ্রেস ছাড়ার আগে গান্ধী আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, তাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে দেখতে আসার।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। সুন্দর সাদা পাগড়ি মাথায় এক ভারতীয় অভিজাত বুদ্ধিজীবীর আগমন; নাম পি. শেষাদ্রি, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ‘লিগ অব নেশনস’ এর সঙ্গে যুক্ত এক তরুণ ডাক্তার এস.

এন. ঘোষ তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই বিশিষ্ট মানুষটি গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ (এবং অবজ্ঞা) প্রায় আর ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখলেন না; গান্ধী সাহিত্যের সামান্যই মূল্য দেন এবং ভারতবর্ষে মনের বর্তমান সমস্ত শক্তিকে তাঁর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব জাতীয় কর্মের খাতে চালিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় মিস্টিকদের প্রতি তাঁর মনোভাবও বিদ্রূপ বর্জিত নয়, অরবিন্দের মতো পরিপক্ক ভাবুকদের প্রতিও নয়। অরবিন্দের আধ্যাত্মিক মনঃসংযোগের যোগাভ্যাস কয়েক-বছর ধরে অত্যন্ত আত্মীকৃত হয়েছে—এই কথাপ্রসঙ্গে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন: "যোগ হচ্ছে মনের ইতির প্রারম্ভ।" (এই ভারতীয়টি আনাতোল ফ্রাঁস পড়েছেন এবং আমার বই থেকে রামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেছেন। [কথাটা তিনিই আমাকে বলেছেন।])—

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। গান্ধীর সম্পর্কে আমার বোন ও প্রিভা-দম্পতির ধারণা। তিনি মানুষটি ছোটোখাটো, মাথার গড়নটা বেশ, টাক নেই কিন্তু পুরো কামানো; কুশ্রী কিন্তু আকর্ষণীয় (শেষে গিয়ে তাঁকে সুন্দর মনে হয়), কপালটা অদৃশ্য, নাক মোটা, নিচের দিকটা ঠলে-ওঠা, খুবই ফোকলা (সাধারণত মুখ বুঁজে থাকেন, যখন হাসেন সামনের ফাঁকটা বেরিয়ে পড়ে; আর প্রিভা-দম্পতির কাছে তো শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, ওই হাসিটিই সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য),—গায়ের রং কম ময়লা, প্রায় ইউরোপীয়ের মতো,—চোখদুটো মোটা চশমার আড়ালে অত্যন্ত জীবন্ত, তারা সরাসরি মুখের দিকে তাকায়, ভেতর পর্যন্ত দেখে নেয়,—খুব দুষ্টুমি ও রসিকতা করেন। তারই সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর, মনোযোগী হয়ে পড়েন,—গলার স্বরটি ভারি সুন্দর, গম্ভীর (তা রবীন্দ্রনাথের মতো উঁচু পর্দায় ওঠে না, কিন্তু ইচ্ছে করেই স্বরটা শান্ত, সমান, ওঠানামাহীন মধ্য পর্দায় রেখে দেন); তিনি শুদ্ধ, নির্ভুল ইংরেজি বলেন, এককথা কখনো দু'বার বলেন না। কথায় জোড়াতালির চিহ্ন নেই; তাঁর প্রতিটি বাক্য সুচিন্তিত এবং যা ভাবেন ঠিক তাই বলেন। তাঁর শরীর মজবুত, বুকখানা বেশ চওড়া আর শক্ত, বাহু দীর্ঘ, হাতদুটো কোমল আর ঠাণ্ডা। কিন্তু হাতের গোছ আর পা দুটো ভীষণ সরু (সম্ভবত ভারতীয় রীতিতে পা মুড়ে বসার জন্যে): তিনি বলেন, দু'বছর ধরে তিনি বসে বসে জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা (যাঁরা তাঁকে ঘিরে থাকেন তাঁদের সকলের মতোই)। কোনো খুঁটিনাটি তাঁর চোখ এড়ায় না।

প্রিভা বললেন: "ভয় ছিল, হয়তো দেখবে এক 'সন্ন্যাসীকে,' এক প্রচারক, এক দিব্যজ্ঞানীকে। দেখলাম এক সক্রেটিসকে। সক্রেটিসের কথাই আমার বেশি মনে হয়েছে। (বিশেষ ক'রে মুখের পাশটা দেখে)।"

না ভেবেও তিনি এমন এমন মারাত্মক কথা বললেন যা দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিতে পারে। সনুচাম নামে এক ইংরেজ নাংবাদিক তাঁর ঘাড়ে মিথ্যে ক'রে এমন এক

আনুগত্যের মনোভাব চাপিয়েছিলেন, যা থেকে তিনি নাকি প্রিন্স অব ওয়েলসের সামনে আভূমি প্রণত হতে পারেন; তাঁকে তিরস্কার ক'রে গান্ধী বলেছিলেন, ঃ "ওই তরুণটির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি…যদি আমার সামনে একটা পিঁপড়েও পড়ে, আমি তাকে সহানভূতির চোখে দেখি, তাকে মাড়িয়ে যাবার কথা ভাবি না; কিন্তু আমি কখনো তার সামনে আভূমি প্রণত হতে যাবো না।" (কথাটা বললেন সবচেয়ে মিষ্টি এবং সবচেয়ে স্বাভাবিক ক'রে।) আমার বোন শুনছিলো, আর তার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে। সলচাম মাথা নিচু ক'রে হজম করলেন।

ইংরেজ কনসালের প্রতিনিধির আপ্যায়নও একটা লক্ষণীয় দৃশ্য ছিল; তিনি এসেছেন প্লেনে লন্ডন থেকে এক মন্ত্রীর চিঠি নিয়ে, মন্ত্রীটি তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাঁর পেঁছুবার জন্যে কী ব্যবস্থা তিনি চান তাই জানতে চেয়েছেন। আগেই ঠিক করা ইন্টারভিউগুলোর পর পালা না-আসা পর্যন্ত গান্ধী তাঁকে বসিয়ে রাখলেন (প্রত্যেকের ইন্টারভিউ পাঁচ মিনিট ক'রে ঃ কোমর থেকে তাঁর ভারী ঘড়িটা কেবলই বার করেছেন সময় ঠিক রাখার জন্যে); যখন তিনি এলেন নমস্কার জানাতে প্রায় উঠলেনই না; যতক্ষণ গান্ধী নিঃশব্দে, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে, ধীরে ধীরে চিঠির প্রতিটি শব্দ ওজন ক'রে ক'রে পড়তে লাগলেন, কেতাদুরস্ত, হাস্যকর, অস্বস্তিতে-পড়া, বাচাল, ক্ষুদে কনসালটি সেখানে উপস্থিত সকলের প্রতি সৌজন্যের ভড়ং দেখিয়ে চললেন; চিঠি পড়া শেষ হলে গান্ধী তাঁর অতিথিকে এই ব'লে বিদায় করলেন যে তিনি এ সম্পর্কে ভাববেন এবং উত্তর দুপুরের আগে জানিয়ে দেবেন।

তাঁর জন্যে ভোজ দেওয়া হবে শুনে গান্ধী তাতে যোগ দিতে খোলাখুলি ভয়ংকর ভাবে অস্বীকার করেছিলেন; ভালো লাগলে পরে দেখা যাবে ব'লে তিনি কেটে পড়েছিলেন; এক ঘন্টা ধরে কেউ জানতে পারেনি তিনি কোথায় কাটালেন; পরে এক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে জানা গেল, তিনি গিয়েছিলেন জাহাজের মধ্যে মার্সেই-এর ডক-শ্রমিকদের খুঁজে বার করতে। তাঁরা কথা বলেছেন হাত-পা নেড়ে, মুখভঙ্গি করে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলে, তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, সাধারণ মানুষের সংসর্গে আসতে পারলে যেমন সব সময়েই তিনি হয়ে থাকেন; আর তারাও বুক ঠুকে বলেছিল ঃ "লোকটা খাঁটি একটা কমিউনিস্ট।"

যে তিন চার ঘন্টা আমার বোনকে পাশে নিয়ে তিনি কেবিনের মধ্যে বসে ছিলেন এবং দর্শনপ্রার্থী বা সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছিলেন,—দেখা যাচ্ছিল দরজাটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে আর জাহাজের কিছু ভারতীয় লস্কর ঢুকে পড়ছে, নিঃশব্দে তাকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস করছে, কাছে আসছে, একটা কথা না ব'লে তাদের হাতের মধ্যে তাঁর হাতটা তুলে নিচ্ছে, হাতটা নিয়ে বুকে ও মুখে ঠেকাচ্ছে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছে; নয়তো সাহস না পেয়ে কেবিনের এক কোণে কয়েক মিনিট মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে তাকিয়ে দেখতে দাঁড়িয়ে থাকছে,—পরে চলে যাচ্ছে। এই রকম প্রায় জন কুড়ি এলো গেলো। এটা কম অভিভূত করেনি।

নভেম্বর, ১৯৩১।—গান্ধীর শিষ্য ও আমার স্নেহের মীরার মাধ্যমে লন্ডনে যে চিঠিটা গান্ধীকে লিখলাম ঃ

“প্রিয় বোন মীরা,—তোমার চিঠির জন্যে প্রীতির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,, চিঠিগুলো আমার মনে ধরেছে। তুমি আমার যে স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছ, তা আমাকে অভিভূত করেছে। সেই রকম তোমার স্মৃতিও আমার কাছে দুর্লভতম স্মৃতি, যা আমার জীবনকে পবিত্র করেছে। আমার এই জীবন বাইরের—ভিতরের প্রতিটি ঝড়ঝাপটায় অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়েছে, অশান্ত হয়েছে। শুধু মনের জোরে আমার পলকা নৌকোটির গতিপথ ঠিক রেখেছি, চারপাশ থেকে আঘাত আসছে, ‘কিছুই না,’ ‘সব কিছু’ ঃ পাসকালের দুই অতল গহ্বরের মাঝখান দিয়ে চালিয়েছি, —সম্ভবত এরাই ‘একের’ দুই রূপ। এই বিয়োগান্তক পাড়ি-ধরাটা শুধু আমার নয়, এ পুরোপুরি মানবতার বয়সী, এই পাড়ি-ধরায় আমি চলেছি সেই তারাগুলোর দিকে যাদের আলো ভেদ করেছে মেঘের স্তর। মহাত্মাজী ছিলেন অন্যতম তারা। আব তুমি আলোর এক রশ্মি, যা আমার দুই চোখকে তাঁর রশ্মিজালের সঙ্গে আবার বেঁধেছে। তোমার কল্যাণেই এদের সঙ্গে আমার স্থায়ী সংযোগ ঘটেছে। তোমার শেষ চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর ইউরোপ সফরের পরিকল্পনার কতটা ছাড়তে হয়েছে। যার জন্যে গান্ধী তড়িঘড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই জরুরী কারণগুলো ভালোই বুঝি। সবসময়েই আমি ওটা আগেভাগে দেখেছি আর ভয় করেছি। যদি তাই হয়, দুঃখের সঙ্গে শুধু তা মাথা পেতে নিতে হবে। অহংসর্বস্ব বিবেচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে বাধা ঘটাতে সর্বোপরি নিজে বিশেষ সতর্ক থাকবো।

তোমার মাধ্যমে আমি শুধু গান্ধীকে অনুভব করাতে চাই, ইউরোপের পক্ষে বর্তমান সময়টি (সামাজিক ও নৈতিক সময়) কত সংকটজনক,—এবং, তারই ফলস্বরূপ জগতের পক্ষেও (এশিয়া, ভারতবর্ষের পক্ষেও) কত সংকটজনক,—এদের ভাগ্য অতিশয় বেশি পরিমাণে ইউরোপের ভাগ্যের দ্বারা নির্ণীত। ইউরোপের মনের সংকট —যে শ্রেষ্ঠ মনগুলো সক্রিয় হতে চায়, কাজ করতে চায় তাদের সংকট এক জটিল সন্ধিক্ষণে। (শান্তির পর থেকে) বারো বছরের টালবাহানা, দ্বিধার পর আমাদের বেশির ভাগই এই আবিষ্কারে পৌঁছুতে বাধ্য হয়েছে ঃ গোটা পশ্চিম জুড়ে (বৃহত্তর অর্থে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এবং এর সঙ্গে আমেরিকাকে যুক্ত ক'রে) যে সামাজিক অবস্থা রয়েছে, তাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। এই সামাজিক অবস্থা মূল পর্যন্ত দূষিত, কেবলই আরও বিষাক্ত অবিচারের জন্ম দেয়। এর আগাগোড়া পরিষ্কার করতে হবে, এর রূপ পাল্টাতে হবে। এই ব্যাপারে অ-প্রতিরোধী, শান্তিবাদী, কোয়েকার ও বিপ্লবী কমিউনিস্টরা একমত। (কেউ তা চেঁচিয়ে বলেন, কেউ বলেন কম জোরে।) কিন্তু যখন চিন্তা থেকে কর্মের সমস্যায় আসা যায়, তখনই মনে বিরাজ করে সবচেয়ে বড়ো বিশৃংখলা। হাজার বছর ধরে কৃত্রিম ভাবে লালিত কুসংস্কার ও সংঘাতের ফলে ইউরোপের জাতিগুলো ভারতবর্ষের জাতিগুলোর চেয়ে বেশি বিভক্ত ; তারা তাদের সামনে অপরিসীম মারাত্মক এক সাধারণ শত্রুকে দেখতে

পাচ্ছে; এবং ভারতবর্ষে তোমরা যে সাধারণ শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে যাচ্ছো, তার চেয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের পক্ষে অনেক কঠিন ঠেকছে। কারণ আমাদের প্রভু প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং নামগোত্রবিহীন। এ কোনো বিদেশী প্রভু নয়, যে একটা জাতির গা বেয়ে শুঁয়োপোকার মতো ওঠে। এ জাতীয় প্রভুও নয়, যার সঙ্গে সামনাসামনি হিসাবনিকাশ করতে পারা যায় এবং করতে হয়। এ ধনতন্ত্রী স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর এক আন্তর্জাতিক (Internationale)—যা গোপনে গোপনে একটা গোটা জাতিগোষ্ঠীরই (এমনকি সরকারী ভাবে যারা শত্রু—যেমন ফ্রান্স ও জার্মানী—তাদেরও) শিল্প ও কারবারের বড়ো বড়ো কর্ণধারদের দলে ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে শিবির ফেলেছে।

গত ২০ থেকে ৩০ বছর এই আন্তর্জাতিক আড়ালে থেকে কাজ করেছে। তার যুদ্ধের আগেকার বছরগুলোর জালজুয়োচুরি নিখুঁতভাবে বার করতে পারা গিয়েছে; এবং যুদ্ধের মধ্যে এক ভয়াবহ পদ্ধতিতে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছে ও নিজেকে জোরদার করেছে; প্রচুর কাগজপত্রে এবং সংসদীয় বিতর্কে, সরকারী স্বীকৃতিতেও তা ফাঁস হয়ে গেছে;—গোপন আর্থনীতিক শক্তিগুলো এই সংসদীয় বিতর্কের গলা টিপে ধরেছে, শ্বাসরুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে (লোরেনের ব্রিয়ে খনি-অঞ্চলে) সৈন্য-বাহিনীর গতিবিধিও তাদের অধীনস্থ হয়েছে। বারো বছর ধরে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপের সরকারগুলো কেবলমাত্র তাদের আড়াল-করা পর্দা এবং ইউরোপীয় সংবাদপত্র প্রায় সবটাই তাদের আজ্ঞাবহ। কেমন ক'রে লড়াই করা হবে? শান্তিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো বুড়িয়ে গেছে, তাদের জন্মই হয়েছে কিনা সন্দেহ; এরা তাদের শক্তি—প্রায় সবটাই মৌখিক, ব্যয় করছে সাক্ষী-গোপালের বিরুদ্ধেঃ কারণ তাদের মুনাফা এবং আধিপত্যের জন্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারবারীরা যেমন যুদ্ধকে কাজে লাগাচ্ছে, তেমনি (পর্যায়ক্রমে) শান্তিকেও কাজে লাগাচ্ছে। অ-প্রতিরোধীরা, বিবেকের নির্দেশে প্রতিবাদীরাই বড়ই বেশি রকমের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কিছু ব্যক্তি মাত্র; সেরা মানুষদের একটা অংশকে বাদ দিলে, তাদের বিবেকের ধর্মীয় মূলও তেমন গভীর নয়; সম্ভবত তারা তাদের চামড়া বাঁচাতে (এবং এ সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে), বা, সেরা ক্ষেত্রে, আত্মাকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু নিজের আত্মাকে বাঁচানোই যথেষ্ট নয়। অপরের আত্মাকে বাঁচাবার জন্যে যদি কার্যকরভাবে সাহায্য না করা হয়, নিজের আত্মাকে বাঁচানো যায় না, তাকে হারাতে হয়। তাদের নিজেদের সংগঠিত করা দরকার কঠোরভাবে, 'সামরিক রীতিতে' যেমন তোমরা করেছ ভারতবর্ষে। তা বহু দূর! তা শুধুই হয়নি। আর এদিকে সময় তাগিদ দিচ্ছে। অন্য সময়ের মতো, ঘটনাবলীর যুগযুগব্যাপী মন্থর বিবর্তনকে বেশী মূল্য দিলে চলবে না। সেই একই ত্বরান্বিত গতি যা ইউরোপের যান্ত্রিকতা ও তার আবিষ্কারগুলোয় ছাপ মেরেছে, জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে। এক সামাজিক সংঘর্ষ, জগতে জগতে এক বিরাট যুদ্ধ, অন্য সময়ে যা পরিপক্ক হয়ে উঠতে কয়েক যুগ বা কয়েক অর্ধ শতাব্দী দেওয়া যেত, ঘনিয়ে উঠেছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে এবং কয়েক বছরে মধ্যে ফোঁড়ার মত

ফেটে পড়বে। যেমন আক্রমণ, প্রতিরোধও তেমনি অতি দ্রুত, এবং প্রয়োজনে বিদ্যুৎগতি হতে হবে।

কী ক'রে এর মুখোমুখি হওয়া যাবে? ইউরোপের বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ, নির্মম ও আশু পন্থা আছে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ ছাড়া ইউরোপের 'অ-প্রতিরোধীদের' আর কিছুই নেই। এবং অনেকেই তা অনুভব করছেন। তাঁরা চিন্তিত, বিপ্লব তাঁদের টেনে নিয়ে গেলে মারাত্মক হবে। তাকে বাধা দেবার উপায় ব্যতিরেকেই তাঁরা এর মধ্যে ঢুকে পড়বেন। এটা মারাত্মক যে, তাঁরা তলিয়ে যাবেন।

আমি এই সংকট সংক্ষেপে তোমার কাছে (তোমার মাধ্যমে গান্ধীর কাছে) আমার চিঠিতে স্পষ্ট করতে চেয়েছি, কারণ যদি মুখোমুখি কথা বলার সময় আমরা না পাই। এরই মধ্যে গান্ধী যে এর স্বতঃলব্ধ উপলব্ধি করেছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। ইউরোপের এই অন্তিম দিনগুলোয়, তিনি যখন মনে মনে প্রবলভাবে এর খুবই কাছাকাছি, এবং ভারতবর্ষের বিরাট আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ার আগে, আমি তাঁকে এই যা লিখলাম, এটা কিন্তু কাজের হতে পারে…"

(শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে আন্তর্জাতিক নারী লিগের সভায় জেনেভায় আমার যে বাণীটি পড়া হয়েছে, সেটি এবং রুনহাম ব্রাউনের প্রশ্নের যে জবাব আমি দিয়েছি, তার অনুলিপি সঙ্গে পাঠালাম। আমি আরও যোগ ক'রে দিলাম: "এগুলো পাঠাচ্ছি এইজন্যে যে, এদের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে, যে-নৈতিক সংকটের কথা আমি বলছি তা কেমন ধরা পড়ছে। সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। একথা বলতে আমি দুঃখিত যে, যুদ্ধবিরোধীদের আন্তর্জাতিক আলোচনা করার বদলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেছে।")

ডিসেম্বর ১৯৩১। দীর্ঘকাল ঘোষণা-করা গান্ধীর সাক্ষাৎ অবশেষে এতদিনে আমাদের সঙ্গে ঘটতে যাচ্ছে। এটা দু' একমাস পিছিয়ে গেছে গোলটেবিল বৈঠকের মন্থরতার জন্যে…মীরার মাধ্যমে লন্ডনের সঙ্গে কত চিঠি ও তার বিনিময়। চিঠি, টেলিফোন, নানা ধরনের অনুরোধের বৃষ্টিও আটকাতে হচ্ছে। সবার বিষয়ই হচ্ছে গান্ধীর ঘোষিত আগমন। এর মধ্যে অদ্ভুত, একেবারে অস্বাভাবিক, এমনকি পাগলামিও আছে। (আমার মাধ্যমে গান্ধীকে এক ইতালীয় মহিলা লিখেছেন, আগামী লটারিতে কোন্ দশটি সংখ্যা জিতবে জেনে নিতে…), সুইস্-জার্মান "নগ্নতাবাদীরা" তাঁকে বগলদাবা করতে চায়…; তা থেকে তাঁকে বাঁচাতে হবে। কত সব মাথা-পাগলা, "ঈশ্বরের সন্তানেরা" শামুকের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। কত সদভিপ্রায়ী যুবক প্রস্তাব দিচ্ছে রাত্রে এসে মহাত্মার জানালার নিচে বাঁশি কিংবা বেহালার হাল্কা সুর বাজাবে। লেমাঁর "দুগ্ধব্যবসায়ী সঙ্ঘ" ডাক ক'রে টেলিফোনে জানাচ্ছে, "ভারতবর্ষের রাজা" এখানে যতদিন থাকবেন, তাঁর 'সরবরাহের" প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ভিলার চারপাশে তাঁবু ফেলছে। লোজানের পুলিশ কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত। "হুজ্জুতে" লোকজনে ভিলন্যভের হোটেলগুলো ভরে

উঠেছে, তারা এসেছে বিদেশী অতিথির জন্যে ওঁৎ পাততে। গান্ধীকে দেখতে ও তাঁর স্কেচ করতে তরুণ জাপানী ভাস্কর তাকাতাকে পারী থেকে আসার খরচ দিতে চেয়েছি।

গান্ধী লন্ডন থেকে বেরুলেন ৫ ডিসেম্বর শনিবার, সন্ধে কাটালেন পারীতে, সেখানে ম্যাজিক-সিটিতে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা দিলেন, রইলেন আমাদের বন্ধু লুইজেৎ গ্যুইয়েসের বাড়ীতে। রবিবার সকালে রওনা হলেন তেরিতে, পৌঁছুলেন সন্ধ্যে ৬টায়। রাত নেমে এসেছে, আবহাওয়াও খারাপ, স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে আনতে যেতে পারিনি। (আমার অতিথি যতদিন থাকছেন তার মধ্যে বড়জোর একবার বাড়ী থেকে বেরুতে পারবো, কেবল যাবার দিন ভিলন্যভ স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিতে।) কিন্তু তাঁকে আনতে এদমঁ প্রিভা সস্ত্রীক গিয়েছেন পারীতে; আর আমার বোন তেরিতে স্টেশনে অপেক্ষা করেছে। ভিলর্বের পর থেকে সুইজারল্যান্ডের আগাগোড়া পথ তিনি অভিনন্দিত হয়েছেন। এখানে ডাক্তার নিহান ও পেরে তাঁদের মোটর গাড়ী তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, যতদিন থাকবেন তত দিনের জন্যে। (কিন্তু তিনি তা সামান্যই ব্যবহার করবেন কিংবা মোটেই করবেন না, তিনি চাইবেন যানবাহনের সরলতম পদ্ধতি,—রেলের তৃতীয় শ্রেণী।

আমাদের ভিলাগুলো বিরঁ পার্কে মাঝে মাঝে, এখন এগুলো অত্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া তরুণদের এক ইংরেজী কলেজের (চিলন কলেজ) অধিকারে। (নির্বাচনে শ্রমিকদল উৎখাত হলে, এই তো সেদিন তারা হৈহল্লা ক'রে উৎসব করেছিল।) গান্ধী এসে পৌঁছুনোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে থেকেই এই তরুণ বাবুরা রাস্তা বরাবর দল বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছেন আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ধরনের বিচিত্র প্রকাশে মেতে উঠেছেন। সুখের বিষয় যে, সুইস জনতায় পার্ক ছেয়ে গেছে আর (ফ্ল্যাশ বাল্ব নিয়ে) যে ফটোগ্রাফাররা দাঁড়িয়ে গেছে, তারাই এই খুদে ইংরেজদের সমঝিয়ে দিচ্ছে; এবং মহাত্মা যখন আসবেন, সব গিয়ে দাঁড়াবে কয়েকটি কণ্ঠে, বেশ ঢাকাঢুকি দেওয়া এক অন্ধকার কোণ থেকে বেশী ভীড় না ক'রেই কণ্ঠগুলো গেয়ে উঠবে—"গড সেভ দ্য কিং। (পরদিন কলেজে তরুণ বাবুরা বকুনি খাবেন এবং এমন পাল্টে যাবেন যে, দেখা যাবে সশ্রদ্ধ কৌতূহল নিয়ে তাঁরা ভিলার চারপাশে ঘুর ঘুর করছেন, এখন তাঁরা ভারতীয় অতিথির গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করছেন। এমনকি তাঁদের প্রিন্সিপাল মিঃ পিম্ আসবেন দর্শনপ্রার্থী হয়ে এবং গান্ধীকে কলেজে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করবেন ঃ গান্ধী সেই বক্তৃতা দেবেন যাবার আগের দিন সন্ধ্যায়।)

ভিলা লিঅনেতের* দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকারে, আমাদের ইলেকট্রিক বাল্বে জোর আলো হচ্ছে না, দেখলাম গান্ধী এসে পৌঁছুলেন—গায়ে সাদা চাদর, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভেজা মাথা, হাঁটু পর্যন্ত পা খালি, রোগা রোগা পা, চশমা পরা ছোটোখাটো মানুষটি, দন্তহীন; হাত জোড় ক'রে মুখ পর্যন্ত তুলে ভারতীয় নমস্কারের ভঙ্গি করতে করতে তিনি হাসলেন—(যতবার দেখা করতে এসেছেন এই লজ্জিত হাসি হেসেছেন; এটাই যেন এক স্বাগত নমস্কার)। ডান হাতে আমাকে

---

* যে ভিলায় মাদলিন রলাঁ থাকতেন।

জড়িয়ে ধরে তিনি আমার কাঁধে গাল রাখলেন ঃ আমার গালে ঠেকল তাঁর ধূসর মাথাটা, একেবারে চাঁচা, খচখচে, ভেজা। এ যেন সন্ত দমিনিক আর সন্ত ফ্রাঁসোয়ার চুম্বন। পিছনে পিছনে মীরা—গর্বিত মুখ, ধরিত্রী দেবীর (Déméter) মতো রাজেন্দ্রাণী-ভঙ্গি,—আর তিনজন ভারতীয়—দুই সেক্রেটারি ঃ মহাদেব দেশাই ও প্যারেলাল, গান্ধীর যুবক পুত্র দেবদাস (তার বয়স ৩০, কিন্তু ২০ বছরও মনে হয় না ঃ মুখখানা গোলগাল, খুশি খুশি)। আমরা দোতালায় এলাম, সেখানে গান্ধীর জন্যে ঘর ঠিক ক'রে রেখেছি, সামনে বারান্দা, তিনটে জানলা, একটা রোন উপত্যকা ও দঁ দু মিদিঁ-র দিকে, অন্য দুটো (জানালা ও কাটা জানলা) ভিলা অলগা ও লেমাঁ হ্রদের দিকে। কয়েকটা কথা লেনদেনের পর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী এবং ভারতীয়রা মেঝের উপরে, বসে পড়লেন বাবু হয়ে, আমি ও আমার বোন বসে রইলাম চেয়ারে, আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো ; সন্ধ্যে ৭টার প্রার্থনা* হলো। রোজকার প্রার্থনায় থাকে পর পর তিনটি গান ঃ প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্রের গান্ধীকৃত হিন্দী তর্জমা (প্রথম 'গীত' থেকে নেওয়া), শেষ হয় রাম-সীতা বিষয়ক একই ভজন দিয়ে ; গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সেটি মীরা গাইল, আর সমবেত সকলে তার ধুয়ো ধরলেন।

দুটো গানের মধ্যে প্রথমটি প্রাচীন গ্রেগোরীয় গানের খুব কাছাকাছি ; দ্বিতীয়টি শ্বাসাঘাত ও নিয়ন্ত্রিত স্বরের নাসিক্যতায় অনেক বেশি কারুকার্য করা, একই জাতের কিন্তু প্রাচীকৃত ; একমাত্র সুশিক্ষিত ভারতীয়ই গাইতে পারে। (মীরা আমাকে বলেছে, এ গাইবার মতো সে হয়ে ওঠেনি।) এই যে মধুর গানগুলো শান্তভাবে রাত্রিতে ছড়িয়ে গেল, তারা থেমে গেল, আর তার পরেই এলো নীরবতা, শেষের নীরবতাই অতি দীর্ঘস্থায়ী—এর পরই নিচু গলায় গান্ধী নির্দেশ দিলেন আলো জালার ; এবং কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। প্রভাবটা ছাপ ফেলার মতো হতে পারে ; কিন্তু গানগুলোর সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে নিতে নিজেকে কেমন পর পর ও সঙ্গ ছাড়া মনে হলো ; হিন্দুই হোক্ কি খ্রীষ্টানই হোক্, এই সব ভক্তিমূলক আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা-গীত মোটেই আমার জন্যে নয়। এরা আমার নিঃসঙ্গ বোধটা বাড়িয়ে দেয়।

পরদিন সকালে দেখা করা ঠিক ক'রে গান্ধীকে খাবার (গোটা চল্লিশ খেজুর, কাঁচা সব্জি ও ছাগলের দুধ) অবসর দিয়ে এলাম। তিনি জেদ ধরলেন দেখা করবেন আমার ভিলা অলগায়, যাতে বাগান পেরিয়ে আমার আসাটা এড়ানো যাবে। মীরা ও ভারতীয়রা আমাদের সঙ্গে খেলেন। (ওঁরাও নিরামিশাষী, কিন্তু কম গোঁড়া। ডিমও নয়, পনীরও নয় ঃ শুধু রান্না তরকারি আর ম্যাকারনি।) আসা থেকে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের টেলিফোন অবিশ্রান্ত বেজেই যাবে আর মারীকে** অনেক সামলাতে হবে।

পর দিন সোমবার, এবং গান্ধীর 'মৌন দিবস'। তিনি কথা বলেন না এবং হেসে বলেন, অন্যের যা শোনানোর ইচ্ছে তা তাঁর উপরে চাপানোর পক্ষে এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময়। তাঁকে উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকতে হবে। (একটা স্বাতন্ত্র্য

---

* গান্ধী আর-একবার তাঁর লোকজনের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ভোর ৩টায়।

** রলাঁর সহকারিণী। ১৯৩৪ সালে রলাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়।—অনু.

আছে ঃ লিখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে তাঁর নিষেধ নেই।) কাটায় কাটায় সকাল ১০ টায় তিনি আমার দরজায় হাজির। প্রায় ৮ ঘণ্টা ব্যতিক্রম হিসেবেই তিনি ঘুমিয়েছেন। (লণ্ডনে তিনি ও তাঁর লোকজন শুধু তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘুমুতে পারতেন, রাত একটায় ফিরতেন আর ভোর তিনটেয় উঠতে হতো প্রার্থনার জন্যে। তাঁরাও—তিনি সবচেয়ে কম—স্পষ্টত অত্যন্ত ক্লান্ত। তাছাড়া লণ্ডনের নভেম্বরের কুয়াশায় গান্ধী জোর সর্দি বাধিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর শক্ত ধাতের জন্যে বৈঠক আর সভাসমিতির কোনো কিছু পরিবর্তন না করেই খুব দ্রুত সেরে উঠতে পেরেছেন।) তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, টুকরো হঠাৎ-হাসির জানান দিয়ে; আমার টেবিলের পাশে তাঁকে বসালাম বড়ো ইজি-চেয়ারটায়, টেবিলে কনুই রেখে তাঁর দিকে ঝুঁকে বসলাম ঘোরানো-চেয়ারে। সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডেল থেকে খালি পা দুটো বার ক'রে বাবু হয়ে বসলেন তাঁর চাদরে ঢেকে। তাঁর চশমাটা বড়ো, কাঁচদুটো অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক'রে কাটা একই সঙ্গে কাছের ও দূরের জিনিস দেখার জন্যে। রোদে-পোড়া গায়ের রং কালোর চেয়ে বরং বেশি তামাটে। মাথার খুলির পার্শ্বরেখা সামনের দিকে এগুনো, এবং এই ভাবটা আরো বেড়েছে সামনের দাঁতগুলো না থাকায়, তাতে মুখটা ছুঁচলো দেখাচ্ছে ইঁদুরের মতো, নিচের ঠোঁটটা বেশ পুরু, সামনে বাড়ানো,—আর উপরের ঠোঁট আধপাকা খোঁচাখোঁচা গোঁফে ঢাকা। নাকটা খাড়া, একটু ভিতরে বসা, ডগাটা ভোঁতা, নাকের ফুটো দুটো বড়ো। কান দুটো খাড়াখাড়া (trés ecartées)। কপালটা চওড়া ও সুগঠিত; কথা বলার সময় কুঞ্চিত হয়; কিন্তু গালদুটো ও মুখের বাকি অংশ বেশ শক্ত, আমাদের ইউরোপীয়দের মতো কুঞ্চনরেখা নেই। প্রথম দর্শনে তাঁকে পলকা ব'লে ভুল হয় ঃ কিন্তু মানুষটি শক্ত। লম্বা রোগা দুই হাতে চাদরের উপরটা চেপে আছেন হাতদুটো একেবারে হাড়, শিরা-উপশিরা বার-করা, পেশীগুলো ঠেলে-আসা, ফোলা-ফোলা। হাত দুটো অবিরত নাড়িয়ে চলার (অনুমান করা যায় চাদরের নিচে পা দুটোও তাই) এতো শান্ত (কিন্তু জীবন্ত) এবং সব সময়ে এমন আত্মকর্তৃত্ববান মানুষটির স্নায়ু-সংবেদনতা (nervosité) প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। (মীরা পরে আমার ধারণা সত্য বলেছে। সে বলেছে, এ তাঁর দেহের স্নায়বিক অতি-সংবেদনশীলতা (hyperesthésie), যাকে তাঁর চিত্ত দমন করে। সে যখন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করে, খুব যত্ন ও সতর্কতা নিয়েই করে, তার আঙুলের নিচে তেলের মধ্যেকার সামান্যতম কণার ঘসাতেও গান্ধী চাপা ব্যথায় একটু শিউরে ওঠেন।) আলোচনার সময়ে বসে রইলো আমার বোন, সে তাঁর কথা তর্জমা করছে (কেননা গান্ধী শুধুই ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারেন), মীরা বসেছে আমাদের পায়ের কাছে কার্পেটের উপরে, গান্ধীর দুই সেক্রেটারি নোট নিচ্ছেন, (আর দ্বিতীয় আলোচনা থেকে, মারীও আমার তরফ থেকে কথাবার্তার নোট নেবেন)।

আগেই যেমন বলেছি, প্রথম দিন একলা আমিই কথা বলবো। আমি বিস্তারিত ভাবে গান্ধীর কাছে ইউরোপ মহাদেশের, বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের নৈতিক ও সামাজিক

অবস্থাটা স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরলাম। সংক্ষেপে ফিরে গেলাম ১৯০০-১৯১৪ সালের পর্বে, যাতে ব্যাখ্যা করতে পারি, যুদ্ধের মধ্যে ও পরে, তথাকথিত (রাজনৈতিক) বাস্তববাদী ও আদর্শবাদীদের কাছ থেকে কী দ্বৈত ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে, এবং ক্লেমাঁসো ও উইলসনের চরম দ্বৈত পরাজয় কিসের প্রতীক। এখান থেকেই এসেছে পরবর্তী বংশধরদের তিক্ত বিরূপতা। রাজনীতির গোপন-করা আসল মুখটা আমি চিনিয়ে দিলাম, যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকেই তার সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জাগতে শুরু করেছিল ঃ—অর্থ, বড়ো বড়ো দুঃসাহসিক ও শিল্প-কর্ণধার (জাহারফ, ডেটেরডিং), আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থা ও যৌথকারবার এবং মতামতের ব্যাপারে কেনা-সংবাদপত্রের মাধ্যমে, দিনের পর দিন রাষ্ট্রগুলোর উপরে মুঠো-শক্ত-করা তাদের একাধিপত্য। তাদের কিছু জ্বলন্ত দৃষ্টান্তও দিলাম ঃ লৌহশিল্প সমিতি যুদ্ধের সময়ে ব্রিয়েই-এর ব্যাপার, ইস্পাত কারখানা, তেল ও পেট্রোলের কোম্পানীগুলো···ব্যবসার আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমে উন্মত্ত ও উত্তেজিতকরা মারমুখী জঘন্যতম সব জাতীয়তাবাদ। যে দুষ্ট ক্ষত পশ্চিমকে ও আমেরিকাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যে দুষ্ট ক্ষত বাকী জগতকে খাবার জন্যে লক্ষ্য স্থির করেছে, আজ কোন প্রতিরোধ তার সামনে দাঁড়াতে পারে তা বিচার ক'রে দেখালাম। নিজেকে বাঁচাবার কোনো উপায় গণতন্ত্রগুলোর নেই ; অর্থ তাদের অস্থিমজ্জায় দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে, কিনে নিয়েছে, বিভক্ত করেছে, নিবীর্য করেছে। ফ্যাসিবাদগুলোও (তাদের প্রতিক্রিয়াতেও স্পষ্ট) এই অর্থের হাতের খেলনা মাত্র · খ্রীষ্টান প্রতিরোধ, না গান্ধীবাদী প্রতিরোধ ? যদি তাদের কেউ সংগঠিত করতে চায় তাহলে যুদ্ধই একমাত্র ব্যাপার ভাবলে চলবে না। পশ্চিমে যুদ্ধ সবচেয়ে কম বিপদ হয়ে উঠেছে। চোরেদের স্বার্থ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে অন্য কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া। বাকী জগতে শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগাতে হবে ; এক আশু বিপদ—কাছ থেকে যার আঁচ লাগছে, যেমন নিজেদের দেশের মধ্যে যুদ্ধ—তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধার ব্যাপারের চেয়ে, এতে সাফল্য লাভ করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। অন্য জাতির মূল্যে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে শান্তি বজায় থাকুক, এতেই স্বার্থপরের উৎসাহ। সত্যিকারের কার্যকর একমাত্র প্রতিরোধ হবে কারখানাগুলোর অস্ত্রাগারগুলোর, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ। এই অক্টোপাস, এই নাম-গোত্রহীন অর্থের প্রতিরোধে সে-ই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অগ্রনায়ক। তার আছে সংখ্যা, অটুট বীর্য, একই অবিচার তাকে পিষ্ট করে, আর আছে নৈতিক শক্তি যা একমাত্র জগতে তার সেই স্বার্থ ও অধিকারের বোধ এনে দেয়, যে-স্বার্থ ও অধিকার পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। আরও বলবো, যান্ত্রিকতার অগ্রগতি এক সেরা শ্রমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছে, যারা সত্যি সত্যি উচ্চস্তরের, যাদের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে দেহ ও মনের দ্বৈত ক্রিয়া। এরাই সেই সৈন্যবাহিনী, যে-সৈন্যবাহিনী ধনতন্ত্র-দানবের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকে যে-প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, সে-প্রশ্ন কৌশলের। লক্ষ্য পরিষ্কার ঃ বিজয় হতে হবে সাধারণ মানুষের, খেটে-খাওয়া মানুষের। সেইটেই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বিধান। কোন্ পন্থায় এতে

পৌঁছনো যাবে? হিংসায়, না অহিংসায়? সেইটেই হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা যা দিয়ে লাভ হবে ন্যায়সঙ্গত বিধান। অহিংসা কি এতে সমর্থ হবে? হবে, যদি তাকে প্রয়োগ করা যায় বিনা আপসে চরম অর্থে, ভারতবর্ষে আপনি (আপনি গান্ধী) যার প্রতিভু। কিন্তু আপনিও তা প্রয়োগ করতে পারতেন না, যদি ভারতবর্ষে এরই মধ্যে একে গ্রহণ করার জন্যে তৈরি একটা পরিবেশ, বহু শতাব্দী ধরে অহিংসায় অভ্যস্ত একটা ধর্মপ্রাণ জাতিকে না পেতেন। ইউরোপে অনুরূপ কিছুই নেই। এ্যাংলো-স্যাকসন, চেক ও শ্লাভ দেশগুলোয় আছে কিছু ছাড়াছাড়া অহিংসার ক্ষুদ্র দ্বীপ, ল্যাটিন দেশগুলোয় তা প্রায় অস্তিত্বহীন। ধর্মীয় মনোভাব এর কারণ নয়। পাশ্চাত্যে সে-মনোভাব খুবই আছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্র তার চরিত্র যুদ্ধং দেহি.—'যোদ্ধৃ ধর্ম'। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো ধর্মরাষ্ট্রগুলোর হাতে বিকৃত হয়েছে, আর তাছাড়া তাদের মূল পাঠও খুব যথাযথ নয়; যুদ্ধের সময়ে এ নিয়ে কলংকজনক বাগবিতণ্ডা হয়েছিল। সর্বোপরি পশ্চিমের মন হচ্ছে ব্যবহারিক জাতের, তার দৃষ্টি ছোটো, স্বল্প মেয়াদী। একজন পশ্চিমের লোক যখন প্রগতির কথা বলে প্রায় কখনোই সে দূরবর্তীকে বোঝায় না, বোঝায় এক আগামী কালকে। আগামীকালের বিজয়কে লাভ করতে তার এক উপযুক্ত কৌশল দরকার। কিন্তু এখন কোন্ প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার কারবার? প্রতিপক্ষ এক পূর্ণাবয়ব রাক্ষস, আগামীকাল মানব জাতটাকেই সে গিলে খাবে। তাড়াতাড়ি কাজে লাগতে হবে। এ এক 'ডুয়েল'। আঘাত আটকাতে হবে এবং এগিয়ে আঘাত করতে হবে। অহিংসা কি তা পারবে? লাজপত রায় আমাদের বলেছিলেন: 'আমি ভারতবর্ষে অহিংসার প্রবক্তা, কারণ আমি নিশ্চিত যে এর মধ্যে দিয়েই আমাদের জয় আসবে। কিন্তু ইউরোপে আমি এর প্রয়োগ করবো না।' এ সম্পর্কে গান্ধী কী ভাবেন? যাই হোক্ না কেন, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই: ১৯১৭ সালে সর্বহারা শ্রমিকেরা অতি অকথ্য যন্ত্রণার মধ্যে থেকে এক নতুন জগতের পত্তন করেছে, সে-জগৎ ভীষণ ভাবে সশস্ত্র। এই অস্ত্রসজ্জা একটা প্রয়োজন, পুরনো জগৎ তা চাপিয়ে দিয়েছে। রাশিয়াতে চার পাঁচটি বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ, নিরন্তর ষড়যন্ত্র, অর্থশক্তির নারকীয় অপকৌশল—সবাই চায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আত্মরক্ষা করছে। পশ্চিমের আমরা কি করতে পারি? দুই শিবিরের মাঝখানে হাত গুটিয়ে থাকবো? সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে হাত গুটিয়ে থাকতে বলবো? আমাদের মনোভাব এই যে. তার ধ্বংসে জগতের মানুষের আশাই ধ্ববংস হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে চালিত সমস্ত কাজকে বাধা দিতে আমাদের শ্রমিক শক্তি দিয়ে ধর্মঘট করবো? তাই করবো। তখন তো, (এটা দেখা ভালো) অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ। আপনি বলবেন: পশ্চিমের সর্বহারারা আত্মত্যাগ করুক না কেন। কিসের জন্যে আত্মত্যাগ? তার জন্যে এদের দরকার এক দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস এদের নেই। এদের বিশ্বাস এক আদর্শে, সামাজিক সুবিচারের এক দিব্য আদর্শে। সেটা সামান্য নয়। এবং জড়বাদের নামে যখন কেউ এর কুৎসার চেষ্টা করে, আমি প্রতিবাদ জানাই:

এ সবচেয়ে বীরত্বমণ্ডিত আত্মত্যাগের উৎস। কিন্তু এই আত্মত্যাগ নিজে থেকে অহিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমি আবার বলছি, প্রশ্নটা উঠছে এক ব্যবহারিক কর্মনীতির সমস্যা রূপেঃ কর্মনীতিকে হতে হবে সবচেয়ে ফলপ্রদ ও সবচেয়ে ত্বরিত। যদি মানুষের বা অন্য কোনো কিছুর বাধা মাঝখানে দাঁড়ায়, তবে তাদের গুঁড়িয়ে দিতে হবে—দয়াও দেখানো হবে না, ক্রোধও দেখানো হবে না। এবং আমি গান্ধীকে সোভিয়েত ন্যায়বিচারের নৈতিক নির্লিপ্ততার (impassibilité morale) চরিত্রটি দেখালাম। এ কখনো (নীতিগত ভাবে) এক প্রতিশোধস্পৃহা নয়। জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তিকে এ চূর্ণ করে। যদি সে আর বিপজ্জনক না হয়—তার অপরাধ যাই হোক্ না কেন এ প্রতিশোধ নেয় না, তাকে হত্যা করে না, তার ক্ষতি করার ক্ষমতা লুপ্ত ক'রে দিয়েই এ খুশি থাকে, এবং যদি সম্ভব হয়, কাজে লাগার মতো হয়ে-ওঠার জন্যে তাকে সুযোগ দেয়। লেনিনের মতো মানুষের কোনো ব্যক্তিগত ঘৃণা ছিল না। এবং তাঁর ছিল মানবতার মঙ্গলের জন্যে প্রচণ্ড আবেগ। যে-পন্থাকে তিনি সবচেয়ে ফলপ্রদ ও সবচেয়ে কর্মশক্তিপূর্ণ মনে করেছিলেন, তাই দিয়েই তিনি মানবতার সেবা করেছেন। অহিংসার মতবাদ অনুসারে এই কৌশলের বিরোধিতা করাটা, শুধুমাত্র একটা আদর্শকে বিরোধিতা করা নয়, (সেটাই যথেষ্ট হবে না), এই আদর্শের ফলের মূল্যের বিরোধিতা করা।

গান্ধীকে যা বললাম এই হচ্ছে তার সারাংশ (এর মধ্যে ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মুখবন্ধ প্রায় বাদ দেওয়া হয়েছে), আর এর জন্যে লাগল দেড় ঘণ্টার কাছাকাছি। গান্ধী আমার কথা খুবই মন দিয়ে শুনছিলেন, আমার দিকে প্রায় তাকাচ্ছিলেনই না, মুখ ঘুরিয়ে (তার ফলে তাঁর মুখের সব ভাব লক্ষ্য করতে পারছিলাম) বরং আমার বোনের দিকে তাকাচ্ছিলেন; আমার বোন আমার প্রতিটি বাক্য তর্জমা করছিল, কিন্তু মুখ্য বক্তব্যগুলোর সময়ে গান্ধী বুদ্ধিদীপ্ত ও একাগ্র দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন; এবং একাধিকবার নিজের সম্মতি জানাতে জোরে জোরে মাথা নাড়ছিলেন, যেমনঃ রাশিয়ার যে-মানুষেরা মানবতার মঙ্গলের জন্যে আত্মত্যাগ করে তাদের তথাকথিত "জড়বাদকে" সমর্থন ক'রে আমি যখন বলছিলাম, এর মধ্যে আমি পশ্চিমের ছদ্ম-আদর্শবাদীদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের এক আদর্শবাদ দেখতে পাই, পশ্চিমের ছদ্ম-আদর্শবাদীদের আদর্শবাদ শুধু মুখেই, তার জন্যে তারা কোনো আত্মত্যাগ করে না।

যখন শেষ করলাম, গান্ধী চিরকুটে লিখে জানালেন, আমি যা বলেছি তা নিয়ে আজ তিনি ভাববেন, আগামীকাল উত্তর দেবেন। ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্ট কমিউনিস্টরা, মনাৎ-গোষ্ঠী তাঁর জন্যে যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন তা তাঁকে দিলাম; তিনি বললেন উত্তর দেবেন। আরও বললাম, ভিলন্যভ ছাড়ার পর তাঁর পরিকল্পিত ইতালি সফর সম্পর্কে বলতাম, কিন্তু তা অন্য দিন করা যাবে। তিনি নোট বইতে লিখলেন, সম্ভব হলে, তিনি এখুনি শুনতে প্রস্তুত। পাঁচ মিনিটের ছোট্ট বিরতি; সেই সময়ে গান্ধী খেলেন জামিরের (citron) রস

দেওয়া এক বাটি গরম জল (প্রতিদিন বেলা ১১টায় এটা তাঁর অভ্যাস) ; আর আমি খেলাম এক কাপ লেবু-চা (infusion de tilleul)। তারপরই শুরু করলাম বোঝাতে, ফ্যাসিস্ট ইতালিতে কী বিপদ তাঁর অপেক্ষায় আছে, অবশ্য সরাসরি আক্রমণের নয় ! কিন্তু তার বিপরীত কায়দা ক'রে কুক্ষিগত করার (যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্যে করা হয়েছিল) ঃ কারণ আজ আর এমন বেশি নির্মম ডিক্টেটরবাদ নেই, যে খাঁটি ও বিশুদ্ধ আদর্শবাদীর আড়ালে ভন্ডামী ঢেকে রাখে না। কয়েকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে (মাত্তেওত্তি, আমেনদোলা) দিয়ে আমি ফ্যাসিবাদের আসল মুখটা দেখিয়ে দিলাম। গান্ধী ভারতবর্ষের ইতালীয় কনসাল স্কার্পার মাধ্যমে রোমের কিছু বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর যেমন 'ইনস্তিতুতো দি কুলতুরা'-র আমন্ত্রণ পেয়েছেন, এর সভাপতি ভূতপূর্ব মন্ত্রী জেন্তিলে ; এই জেন্তিলে থেকে শুরু ক'রে কতিপয় ব্যক্তির মুখোশ খুলে ধরলাম। এই ফ্যাসিস্ট ইতালির বিপক্ষে দাঁড় করালাম হাজার হাজার অত্যাচারিত, মিথ্যা ও নীরবতায় বাধ্য ইতালীয়কে, যাঁরা এই নৈতিক অধঃপতনে তিক্ততার সঙ্গে যন্ত্রণা ভোগ করছেন ; আমি দেখালাম, তাঁদের পীড়নকারীদের মধ্যে গান্ধীর উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে কী দুর্বহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। গান্ধী কিছুই করতে পারবেন না, ইতালির সংবাদপত্রগুলো পুরোপুরি ফ্যাসিবাদের হাতে, তাঁর উপস্থিতি ভাঙিয়ে কাজে লাগাতে পারবে ব'লে তারা দৃঢ় নিশ্চিত, ইতালিতে কোনো প্রত্যুত্তর দেবার সম্ভাবনা তাঁর নেই। আমি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিলাম ; রবীন্দ্রনাথ কোনো কিছু সন্দেহ না ক'রে ফ্যাসিস্ট অনুষ্ঠান ও ফ্যাসিবাদের প্রশস্তির সভাসমিতিতে ভালো মানুষের মতো বসে থাকতেন, ভাবতেন এসব প্রশস্তি তাঁকেই করা হচ্ছে ; এবং তাঁর থাকার সময়, যা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নয় তার সব কিছু থেকে, তাঁকে পুরোপুরি দূরে রাখা হয়েছিল। গান্ধী শুনলেন, লিখে নিলেন ; এবং বেলা বারোটার কিছু পরে আমাদের আলোচনার ইতি হলো। তিনি লিঅনেৎ ভিলায় ফিরে গেলেন, পথে ফটোগ্রাফারদের হামলার মুখে পড়লেন, তারা দিন কাটাচ্ছে ভিলাগুলোকে ঘিরে, বাগানের মধ্যে আর চতুর্দিকের পার্কে।

আমি লিখতে ভুলেছি, আলোচনা যখন সবে শেষ হয়েছে, কেমন ক'রে যেন আমার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন মিস মুরিয়েল লিস্টার, লন্ডনে গান্ধী যাঁর অতিথি ছিলেন···এই ইংরেজ মহিলাটি বুদ্ধিমতী ও তেজী, লন্ডনে দরিদ্র শ্রেণী নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁর হাবভাব রূঢ় ও উদ্ধত। আমার ঘরে জোর ক'রে ঢুকে পড়ার খেয়ালটা উপেক্ষা করতাম, যদি তিনি পেছনে পেছনে আরও অন্য দর্শকদেরও নিয়ে না আসতেন ; যদি সময় থাকতে চিনতে পারতাম, তাদের মধ্যে একজনকে আমি ঢুকতে দিতাম না ঃ লোকটি ইভান্স – এক বিরাটবপু ইংরেজ পুলিশ, এক সহকর্মীর সঙ্গে তার উপরে ভার জাহাজে না-ওঠা পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে থাকার। গান্ধী তাকে দেখার ভান করলেন এবং তাকে বন্ধু ব'লে পরিচয় দিলেন। (এটা অতি-সারল্য (naiveté), না ঔদাসীন্য ! গান্ধীর মধ্যে

অতি-সারল্য ব'লে কিছু নেই, এখন জানতে পেরে দ্বিতীয়টির দিকেই ঝুঁকেছি।) কিন্তু এটা বিপজ্জনক। এই পুলিশরা বলছে ওদের উপর গান্ধীর নিরাপত্তার ভার। কিন্তু আসলে, ওরা নজর রাখছে। ওরা তাঁর কাজকর্ম ও দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করছে। আর মোটা ইভান্স তো সামান্যই গোপন করল যে, সে এদমঁ প্রিভাকে জিজ্ঞেস করেছিল কী নিয়ে আমার আর গান্ধীর আলোচনা চলছে। ভালো মানুষ প্রিভা অকপটে উত্তর দিয়েছেন যে, আমি রাশিয়া নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করছি। (তার ফল হবে এই যে, কয়েকদিন পরে, ফ্যইএ দাভি দ্য ম'ত্র্য' গান্ধীকে প্রলোভিত করার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সুইজারল্যান্ডকে সতর্ক ক'রে দিয়ে তাঁকে দেখাবে যেন "বলশেভিক রম্যাঁ রলাঁর বাড়ি" এসেছেন এবং মস্কোর কমিউনিজমের হাতে বীর সুইসদের ভালো করে তুলে দেবার জন্যে নিরস্ত্র করার কাজ করছেন।)

সোমবার খুব বৃষ্টি, সেই বিকেলের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আর সেই মুহূর্তে গান্ধী বেরিয়ে পড়লেন ভিলার বাইরে তাঁকে ধরতে মীরাকে বেশ বেগ পেতে হলোঃ কারণ তিনি জোরে হাঁটেন। তাঁরা ভিলন্যভ ঘুরে বেড়ালেন ছোটো সেতুটা পর্যন্ত, সেখান থেকে রাস্তাটা আলাদা হয়ে হ্রদের পার দিয়ে গেছে নলখাগড়ার বনের মধ্যে দিয়ে। এখানে ওখানে ফটোগ্রাফাররা তাদের ক্যামেরা তাক করল। ভিলন্যভের লোকজন যেসব কথা বলাবলি করতে লাগলো তা কম সুখপ্রদ। মারী শুনতে পেয়েছেনঃ "লোকটা কুচ্ছিৎ।" এমন সব লোক আছে যারা নিজেকে দেখাতে খুব ভালোবাসে।" (সুইস ও ইংরেজ) পুলিশ দূরে দূরে তাঁকে অনুসরণ করছে। টেলিফোন আর থামছেই না। সন্ধ্যাবেলায় প্রিভা দু'তিন ঘন্টার জন্যে আমাদের এখানে এসেছিলেন কয়েকটা উত্তর দিতে, টেলিফোন তিনি নামাতেই পারেননি। লোজানের কাছে তার স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ব'লে জেনেভা অভিযোগ করেছে, তারাও গান্ধীর ভাগ চায়। বৃহস্পতিবার সেখানে মিটিং ডাকা হয়েছে। প্রিভা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনেছেনঃ গান্ধীর জন্যে তিনি ভীত, তাঁর ভয় বিরূপ জনতার। কিন্তু ঠিক এইটেই গান্ধীর আগ্রহ জাগাতে পারে; আপত্তির উত্তর দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ।

মঙ্গলবার ৮টা থেকে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে আবার আলোচনা হলো। সবার আগে তিনি ইতালির প্রশ্নটি নিয়ে বলতে চান। তিনি বললেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন স্কার্পা, লোকটি বিদগ্ধ, ভারতীয়দের জানেন, ভারতবর্ষের উপরে কাজ করেছেন। ভারতবর্ষে স্কার্পার সুনাম আছে। এই সুনামের ভিত্তি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁর তথাকথিত সহানুভূতি। কিন্তু গান্ধীর বেশি সন্দেহবাতিক। তাঁর বিশ্বাস যে, স্কার্পা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থেই কাজ করছেন। ভারতবর্ষে আগেই তিনি ইতালি যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন…

"ইতালি যাবার, মুসোলিনিকে দেখার বাসনা আমার আছে।" (মারী যে নোট নিয়েছেন তাই এখানে তুলে নিচ্ছিঃ) "আমার ইচ্ছে মানুষকে দেখা, তাদের কাছে শক্তির বাণী নিয়ে যাওয়া। তারা যদি তা গ্রহণ না করে, আমার

কিছু আসে যায় না ; তা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আমি পোপকেও দেখতে চাই। তিনি আমাকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন ; তাঁর সঙ্গে দেখা করলে, আমি ভারতীয় রোমান ক্যাথলিকদের ভালো ক'রে কাজে লাগাতে পারবো ; আমি তো তাদের ধর্মীয় নেতার সঙ্গে দেখা করবো, যেমন মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ক'রে থাকি। অনেক ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, মুসলমান বিশপ-মৌলবীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। জানি তাদের মধ্যে খারাপ আছে, কিন্তু ভালো লোকও আছে। ইতালির কথা ভুলে বসেছিলাম, কিন্তু স্কার্পা ভোলেননি, এই দেখুন তাঁর সর্বশেষ চিঠি। আমার জাহাজে ওঠার জন্যে লয়েড কোম্পানী সেদিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাহাজ ছাড়া পিছিয়ে রাখবে, যাতে আমি ব্রিন্দিসি যেতে পারি। কিন্তু আমি অনুগ্রহ চাই না। ইতালির সীমান্তের পর থেকে স্কার্পা আমার জন্যে দুটো প্রথম শ্রেণীর কামরা দেবেন বলেছেন। আমি চাইবো তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে। কিন্তু এই নিয়ে আমি ঝামেলা করতে চাই না। স্কার্পা জানতে চাইছেন, কবে আমি সীমান্তে পৌঁছুবো। তিনি লিখেছেন, যে সময়টুকু আমি থাকতে চাইছি, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির জন্যে তা বড়োই সংক্ষিপ্ত। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এই সফর ব্যক্তিগত, বেসরকারী, নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। কিন্তু সেটা তো শুধু কথার কথা : পেছনে আছে ইতালি সরকার : স্কার্পা তার যন্ত্র। কিন্তু মিলান ও রোমে অনেকে আছেন যাঁরা আমাকে দেখতে চান। স্কার্পা চান আমি মিলানে পৌঁছুই ৯ তারিখে, রোমে ১১ তারিখে, ইতালি ছাড়ি ১৩ তারিখে। কিন্তু এখানে থাকার মেয়াদ আমি কমাতে চাই না ; ইতালিতে শুধু একটা দিন দেবো। ইতালি-ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের স্ত্রী শ্রীমতী তোয়েপ্‌লিজ চাইছেন আমি তাঁর বাড়িতে থাকি। জেন্তিলে যার সভাপতি, সেই 'ইন্‌স্তিতুতো দি কুলতুরা' রোমে এক সংবর্ধনার আয়োজন করবে। কাউন্টেস কার্নেভালি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। বলা হয়েছে, যদি কোনো বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান দেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তার করতে। আমার নিজের ইচ্ছে রোমে একদিন থাকি ; কোনো প্রকাশ্য সংবর্ধনা সভায় যাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু এই 'ইন্‌স্তিতুতো' খুব নামকরা, সেখানে দু'একটা কথা বলতে সানন্দেই যাবো। যদি পোপ আমাকে দেখতে চান, আমি যাবো। আমার মনে হয় না যে, মুসোলিনি দেখা করতে চাইবেন ; যদি চান, দ্বিধা করবো না, সেখানেও যাবো। কিন্তু গোপনে নয়। গোপনে কারুর সঙ্গে আমি দেখা করি না। এই আমার অবস্থা। এখন আপনি বলুন !"

ইতালির পরিস্থিতি—ভয়ংকর ও জটিল পরিস্থিতির কথা আবার বললাম। সবচেয়ে গুণীজ্ঞানীরাও লজ্জাজনক ভাবে ক্ষমতার সেবাদাস হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু বৌদ্ধশাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত, মুসোলিনির সভাসদ অধ্যাপক ফর্মিচির দৃষ্টান্ত মনে করিয়ে দিলাম, তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফাঁদে ফেলেছিলে। তোয়েপ্‌লিজদের প্রসঙ্গে বললাম, তোয়েপ্‌লিজের তিব্বত-পর্যটক মেয়ের সঙ্গে ভালোই সম্পর্ক ছিল। অনেক স্তুতিবাচক কথা লিখে তাঁর বই আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে বন্ধু

ও খ্রীষ্টের পাশে এক দয়ালু ঈশ্বরের মতো ক'রে মুসোলিনির প্রশস্তি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। আমি তাঁকে এক কড়া চিঠি দিয়েছিলাম; তিনি আর তার উত্তরও দিলেন না, পরের বইটাও অন্তত পাঠালেন না। আমি জেন্তিলেকে তুলে ধরলাম—বিরাট দার্শনিক, ক্রোচের ছাত্র, রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা, চন্ডনীতিকে উচ্চ চিন্তার সঙ্গে মেলাবার জন্যে সূক্ষ্ম বাক্‌জাল বিস্তার করেন। তাঁর নামে জানোত্তি-বিআংকোর কথা মনে পড়ে যায়, জেন্তিলের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল। এই ধর্মাত্মা—যিনি দক্ষিণ ইতালির দুর্গতের সেবার রত নিয়েছিলেন, তাঁর চিত্র দিলাম; আমি শোনালাম, ফ্যাসিবাদ কেমন ক'রে তাঁকে ও তাঁর সেবার প্রতিষ্ঠানটিকে কুক্ষিগত করতে, প্রতিটি সদস্যকে ফ্যাসিস্ট শপথবাক্য গ্রহণে বাধ্য করতে চেয়েছিল ঃ জানোত্তি জেন্তিলেকে (তখন তিনি মন্ত্রী) খুঁজে বার করেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তাহলে আপনারা চান এই সব মানুষের বিবেক নিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে, তাদের আত্মাকে হারাতে?"—আর জেন্তিলে বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন ঃ "আপনি তো বাইবেলের কথা জানেন ঃ 'বাঁচতে হলে আগে নিজের আত্মাকে হারাতে হবে'।"
—"ইন্‌স্তিতুতো দি কুলতুরা'-য় অনেক গুণীজ্ঞানী আছেন, কিন্তু তাঁরা বিবেক-বর্জিত এবং বিপজ্জনক ঃ কারণ তাঁরা মিথ্যেকথা বলেন। এ বিপদ কী ক'রে এড়াবেন? আপনার নিজের বিপদ নয়, মিঃ গান্ধী, সেটা প্রশ্নই নয়। আপনি যা কিছুর প্রতিভু, বিপদ তার দিক থেকে। হাজার হাজার অত্যাচারিত, নীরবতায় পর্যবসিত ইতালীয়ের কাছে আপনি যার প্রতিভু, তার কথা যেন ভাবেন ঃ যে-শাসন তাদের পিষে মারছে তার প্রতি আপনার আপাত-সম্মতির পরিণামে তাদের মনোবল ভাঙবে, তার ভয় যেন রাখেন! বাইবেলের এই কথাটিও যেন মনে রাখেন ঃ 'ছোটদের যে মর্মপীড়া জাগায় সে দুর্ভাগা!'…আপনাকে পুরোপুরি এই ধারণা দিতে হবে যে, অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আপনার কোনোই যোগাযোগ নেই! ইতালি সরকারের কোনো কিছু নিলে চলবে না, রেলের টিকিট নিজে কাটুন, যার সম্পর্কে নিশ্চিত নন তার আতিথ্য নেবেন না…যাতে পুরোপুরি স্বাধীন থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন। যদি পোপকে দেখতে চান, ভ্যাটিকান দেখতে চান, ! দেখুন! কিন্তু সরকারী যা কিছু এড়িয়ে চলুন!"

গান্ধী ঃ "স্কার্পা চিঠিতে যা লিখেছেন (আমন্ত্রণটা সরকারী নয়, তাঁর নামে) তা অক্ষরে অক্ষরে নিতে হবে। আমন্ত্রণটা আমি নেবো। ('ইন্‌স্তিতুতোয়' বক্তৃতা করতে স্কার্পার আমন্ত্রণ।) কিন্তু আমি শর্ত দেবো যে, আমার যা খুশি তাই সবার সামনে বলবো।"

র. রলাঁ ঃ 'তাহলে, চেয়ে পাঠান যে, আপনি যা বলবেন তা লিখে নেওয়ার জন্যে বিদেশী সাংবাদিকরা থাকবেন। সেই বিদেশী সাংবাদিকরাও অবশ্য ফ্যাসিস্ট হতে পারেন।…আপনি যা বলবেন তা চেপে যাওয়া হবে না বা বিকৃত করা হবে না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বড়ই কঠিন।"

গান্ধী ঃ "আগে থেকে তোড়জোড় করা আমার স্বভাবের বিরোধী।"

র. রলাঁ ঃ "আপনার চার পাশ ফাঁকা ক'রে দেওয়া হবে, আপনাকে কোণ-

ঠাসা করা হবে। আপনাকে ঘিরে থাকবে শুধুই ফ্যাসিস্টরা ; এমনকি বিদেশী সাংবাদিকরাও…”

গান্ধী : ”সে-খেয়াল আমার আছে ; কিন্তু বেড়া ভাঙতে তাতে আমার আটকাবে না…আমি শর্ত ক’রে নেবো স্বাধীনভাবে বলার ; নিরপেক্ষ কোনো কিছু বলবো না। আমি যা ভাবি তাই বলবো। এই তো মনে হচ্ছে এখন। অন্য কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। এই সফর আমি নিজে যেচে নিইনি, আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে ; মনে হচ্ছে, এই আবহাওয়াতেও বলতে পারবো।”

র. বলাঁ : “আমারও বিশ্বাস নয় যে আপনাকে বলতে বাধা দেওয়া হবে ; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আপনার বক্তৃতা কাগজে চেপে দেওয়া হবে, নয়তো বিকৃত করা হবে।” (আমি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার কথা শোনালাম।)

গান্ধী : ‘ধরুন, তা ছাপা হলো না, বা বিকৃত করা হলো। ইংলন্ডেও ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান’-এ ছাড়া তাই করা হয়েছে ; অন্যেরা তো তা একেবারেই বয়কট করেছে। পারীতে যা বলেছি, তাও বিকৃত করা হয়েছে ; আর ‘ফিগারো’-তে নোংরা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি যা বলেছি এবং বলবো, তা ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’য় অক্ষরে অক্ষরে সব ছাপা হবে।”

র. রলাঁ : “কিন্তু ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে এই বিকৃত করার জনে যা খারাপ হয়েছে, তা গেছে আপনার বিরুদ্ধে। তার জায়গায় ইতালিতে যা হতে পারে, তা যাবে ইতালীয়দের বিরুদ্ধে। লোকে বলবে : ‘মহাত্মা আছেন নিপীড়নকারীর সঙ্গে নিপীড়িতের বিরুদ্ধে।’—অন্য বিপদ ; আপনি বলবেন ইংরেজিতে, ইতালীয়তে তর্জমা করা হবে। কে দেখবে ? অর্থ পাল্টে দিতে পারে। সর্টহ্যান্ডে লিখে নিতে বলার দরকার হবে।”

গান্ধী : “যদি মনে করি বলাটা আমার কর্তব্য, নিজেকে ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে আমি বলবো। ব্যাপারটা আমি দেখতে পাচ্ছি ; আমি জানি না কেমন ক’রে, কিন্তু যে-কোনো ভাবেই হোক, সেটা সম্ভব হবে। খুঁটিনাটির ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।”

র. বলাঁ : : ‘ আপনি যখন বলবেন, সব সময় মীরা ও দেশাইয়ের সেখানে থাকা দরকার হবে।”

গান্ধী : “কখনোই গোপন বৈঠক হবে না। এ সবের পর, একই লক্ষ্যের স্বার্থে, আমার রোমে যাওয়া উচিত হবে, কি হবে না, ভেবে দেখা যাক ! কোনো কোনো সময় একটা কাজ সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয় না, তার ফল পেতে দেরী হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফলটা হতে পারে যে, আমার কথা বিকৃত করা হলো ; কিন্তু কোনো ভাল কাজের দূরবর্তী ফল ভালো হতেই হবে। আমি ভাবছি, ঝুঁকিটা নেওয়াই উচিত, কেননা আমি নিশ্চিত যে লোভের ফাঁদে পা দেবো না। আর এর বাইরে তো আগে থেকে কিছুই ঠিক করতে পারি না। তবু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”

র. রলাঁ : “ভালো ফল তো অসম্ভব, কারণ যাদের দরকার তাদের সঙ্গে তো আপনার যোগাযোগই সম্ভব হবে না। আপনি থাকবেন শুধু কর্তৃপক্ষের বাছাই

করা দুষ্কৃতির সহযোগী জেন্তিলে, ফর্মিচি এবং একই জাতের লোকের সঙ্গে (tutti quanti); যারা মনে মনে ভণ্ড, বাইরে বুদ্ধিজীবীর মুখোশ পরা। কোথায়, কখন, কেমন ক'রে অন্যদের দেখবেন? এবং শেষোক্তরা ভাববেন আপনি এসেছেন অত্যাচারীদের প্রশস্তি জানাতে।"

গান্ধী: "রোমে থামার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহলে আপনার সঠিক মতামত দিন।"

র. রলাঁ: "আমি হলে শর্ত তুলতাম। নইলে, আমার ভয়, আপনি না এক প্রতারণার শিকার হন। মিষ্টিভাবে, ভদ্রভাবে নয়, ওখানে আপনাকে নির্মমভাবে কঠোর পন্থা গ্রহণ করতে হবে। আপনি যা বলবেন, সবাই উত্তরে বলবে: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ…' (যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'হিংসা তাঁর আতঙ্ক' তার উত্তরে মুসোলিনি বলেছিলেন—'আমারও তাই!'…), আর ভাববে তার উল্টোটি…ভালো হয় যদি জানোত্তি-বিআংকোর সঙ্গে দেখা করতে পারেন…যদি বলেন তো আমার বন্ধু জেনারেল মরিসকে একটা তার পাঠাতে পারি, যাতে তাঁর বাড়ীতে থাকতে পারেন। তিনি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোক, তাঁর উচ্চপদ ও কাজকর্মের জন্যে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আছে; এবং আপনাকে পাহারা দিতে, রক্ষা করতে তাঁর মতো কেউ ভালো পারবে না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ অনেক উঁচু, ইতালিতে যা ঘটছে তাতে তিনি গভীরভাবে আহত। রাজাকে ঘিরে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী একটি গোষ্ঠী আছে এবং কোনো কোনো অতি উচ্চপদের লোককে ফ্যাসিবাদ ছুঁতে সাহস পায় না। তেমন পদের লোক হচ্ছেন জেনারেল মরিস, তিনি ইতালীয় বিমানবহরের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার পরিচালনা করেন।"

গান্ধী রাজী হলেন, কারণ তিনি এখনো স্কার্পার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। ইতালি সম্পর্কে, 'ইনস্তিতুতো দি কুলতুরা' সম্পর্কে আরও কিছুক্ষণ কথা হলো; কথা হলো সন্ত ফ্রাঁসোয়ার এক শিষ্যা সম্পর্কে, তিনি থাকেন সিয়েনের কাছে, কয়েক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে গান্ধীর চিঠিপত্র চলছে এবং তিনি গান্ধীর আশ্রমের নিয়মবিধি মেনে চলছেন। তিনি চান চলতি পথে গান্ধীর সঙ্গে দেখা হোক্; কিন্তু সিয়েন রোম থেকে বড়ই বিচ্ছিন্ন। ঠিক হলো আমি জেনারেল মরিসকে তার করবো।

গান্ধী: "এ আলোচনা শেষ। আমাদের অন্য আলোচনা চলুক। আপনি আর কী নিয়ে বলতে চান।"

র. রলাঁ: "গতকাল আমি একাই বলে গেছি। এবার সে-সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।'

গান্ধী: "গতকাল আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি দেখছিলাম আপনার কী প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা, আর বুঝেছিলাম, আপনার সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কী বিপুল পরিশ্রমই না আপনি করেছেন। অন্য দিকে, আমি তৈরি হয়েছি ভিন্ন পদ্ধতিতে। আমার জীবনে যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সে-সব ইতিহাস থেকে পাইনি; আমার গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা অতি সামান্য। আমার পদ্ধতি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, আমার সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। স্বীকার করি, এতে

নিশ্চয়ই বিভ্রান্তির বিপদ আছে। আমি এমন কিছু পাগলকে জানি যাঁরা কিছু বিশেষ জিনিসে বিশ্বাস করেন, তা থেকে তাঁদের ছাড়ানো অসম্ভব, সেগুলোই তাঁদের অভিজ্ঞতা। এমন এক পাগলের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমারেখাটা সংকীর্ণ। তা সত্ত্বেও, আমার অভিজ্ঞতার উপরে আস্থা না রেখে তো পারি না। প্রাচীন কালের ঋষিরা স্বতঃলব্ধ বোধের উপরে ভিত্তি করে অভিজ্ঞতার উল্লেখ ক'রে গেছেন। সবাই বিশ্বাস করে, সেগুলো ঠিক এবং সে-সব ইতিহাসে পরীক্ষিত হয়েছে। আমি নিজেকে স্তোক দিই যে, সে-সবের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা কম ভিত্তিহীন নয়।

কাল যা বলছিলেন, শুনতে শুনতে ভাবছিলাম ঃ কেমন ক'রে পাল্টা পথ নেওয়া হবে? আর নিজেকে বলেছিলাম ঃ আমি বলতে পারি না যে এমনটাই আমার বিশ্বাস (তার অর্থ বিশ্বাসের মতো বিশ্বাস)। আপনি যে সমস্যাগুলো আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেগুলো ভয়ংকর। অহিংসা যখন ভারতবর্ষে ফলপ্রদ কাজ করছে ও করবে, এমন হতে পারে ইউরোপে তা বন্ধ্যা হবে। কিন্তু তা আমাকে বিব্রত করে না। আমি বিশ্বাস করি, অহিংসা এক সর্বজনীন প্রয়োগ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, ইয়োরোপকে আমিই এই বাণী দিতে পারি। অনেক আন্তরিক ইংরেজ ও বিদেশীর সঙ্গেও কথা বলেছি; তাঁদের বলেছি ঃ নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ না বিশ্বাস পাচ্ছেন, এক চুলও নড়বেন না। কিন্তু গোটা জগতও যদি একে বিশ্বাস না করে, আমি বিশ্বাস করবই। গতকালের আলোচনা অনুসারে, বিপত্তিগুলো বোঝার পর, আমার বিশ্বাস অটুট যে, একমাত্র অহিংসাই ইউরোপকে বাঁচাতে পারে। নইলে তার সর্বনাশ। রাশিয়ায় যা কিছু ঘটছে তা একটা ধাঁধাঁ। রাশিয়া সম্পর্কে কম বলেছি, কিন্তু তার অভিজ্ঞতার চরম সাফল্যে আমার গভীর অবিশ্বাস আছে। আমার কাছে মনে হয়, এ অহিংসার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। মনে হচ্ছে, এ সফল হচ্ছে, কিন্তু এর সাফল্যের পেছনে রয়েছে (হিংসার) বলপ্রয়োগ। এই সংকীর্ণ পথে সমাজকে ধরে রাখার পক্ষে তা কতদিন কার্যকর হবে তা জানি না। যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয়রা রাশিয়ার প্রভাবে পড়ছে, তারা চরম অসহিষ্ণুতার দিকে চলে যাচ্ছে। তার ফল হচ্ছে এই যে, তারা সন্ত্রাসবাদের এক রীতিনীতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি। আমার চেনা ইংরেজ (এবং আমেরিকানরাও) যাঁরা রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই অপক্ষপাতী ব'লে মনে হয়েছে; তাঁদের কেউ কেউ তার সম্পর্কে ভালো কথা বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন মন্দ কথা; তাঁদের মধ্যে লর্ড লোথিয়ান এবং বার্নাড শ'র সঙ্গে কথা বলেছি। এই বলপ্রয়োগ সমাজকে ইচ্ছে মতো রূপ দিতে পারবে কিনা, পারলেও কতদূর পর্যন্ত পারবে,—সে-সম্পর্কে লর্ড লোথিয়ান নিশ্চিত নন। বার্নার্ড শ উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন; কিন্তু তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এই উৎসাহ দেখতে পাইনি। তাছাড়া এ সম্পর্কে তার সঙ্গে বেশি কথা বলিনি ঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এতে বেশি ছিল যে, আমরা সবচেয়ে বেশি কথা বলেছি তাই নিয়ে। ইউরোপে আমি যা দেখেছি, তারপর বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইউরোপ অহিংসাকে এড়াতে পারে না। সুখের বিষয়, বিরাট সংগঠনের প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন শুধু একটিমাত্র মানুষের, যিনি হবেন বিশ্বাসের, অহিংসার মূর্তিমান প্রকাশ। যতদিন না তিনি আবির্ভূত হন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আশা করতে হবে, পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।"

রঁ. রলাঁ: "রুন্‌হাম ব্রাউনকে (আইনস্টাইনের বিবৃতি প্রসঙ্গে) লেখা আমার একটা চিঠির এক কপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। তাতে বলেছিলাম: একজন নেতাকে নিয়ে অহিংসা যদি একটা বিশাল ভিত্তির উপরে সংগঠিত হয়, তাহলে সময়ে এ জয়ী হতে পারবে! কিন্তু ইউরোপের কাছে সকলের আগে হচ্ছে সময়ের প্রশ্ন। আমরা এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, এখানে হিংসার শক্তির পায়ের নিচে মানুষের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবার বিশদাশংকা রয়েছে, তার জাগার কোনো সম্ভাবনা থাকছে না। এই হিংসা গোটা জগতের উপরে চেপে আছে…অহিংসার অর্থে একটা জাতির আমূল পরিবর্তন যদি সম্ভবত হয়, তবে তা দ্রুত হতে পারে না। খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হতে এক শতাব্দী লেগেছিল। এখুনি যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তো বিশ বছরেরর মধ্যে সব ফস্‌কে যাবে। তাহলে ইউরোপে অহিংসা কোন্ রূপ নেবে?"

গান্ধী: "প্যারীতে আমি এইরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি…জগতটা আসলে পৌত্তলিক! খ্রীষ্টান ধর্মও পৌত্তলিকতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না! ইউরোপের চোখে দেখার, ছুঁয়ে দেখার, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার বস্তু চাই। সিদ্ধান্ত নেবার আগে অহিংসা ও তার সাফল্যের চাক্ষুষ প্রমাণ চাই…আর সে-প্রমাণ তো ভারতবর্ষ দিচ্ছে। যদি ভারতবর্ষ সফল হয়, সব সহজ হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, তার জন্যে বিশ বছর লাগবে না। যদি ভারতবর্ষ সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে পারে, তাহলে জগৎ তার প্রমাণ পাবে এবং আমার বিশ্বাস সমস্ত ইউরোপীয়রা দেখবে যে, এটা সহজ। যা দরকার, তা করতে ইংল্যান্ড বাধ্য হবে। কিন্তু ভারবর্ষে যদি হিংসা আত্মপ্রকাশ করে, অথবা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এবং তা সবকিছুকে বিশৃংখলার মধ্যে ঠেলে দেয়, আমার বিশ্বাসই আমার সান্ত্বনা হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত অহিংসা ভালো ফলই দিয়েছে। নিঃসন্দেহে তা ইংরেজ জনমতের উপরে প্রভাব ফেলেছে (এখনো যথেষ্ট নয়!)। সারা জগৎ দেখতে পারছে, যদি অহিংসা না থাকতো, গোলটেবিল বৈঠক হতোই না। বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরোক্ষ ফল অসংখ্য; এবং যখন আমরা আগুন আর যন্ত্রণার পরীক্ষা পেরিয়ে যাবো, সেটা অত্যন্ত সহজ হবে। হতে পারে যে, আমি ভুল করছি। যদি সফল নাও হই, আমি আমার বিশ্বাস হারাবো না এবং যে সামান্য সংখ্যক লোক আমার প্রতি অনুগত, তাদের শুদ্ধিকরণের ব্রত নেবো। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে ছ'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ভারতবর্ষে ১৯২২ সাল থেকে গতবছর পর্যন্ত আমি তো যুদ্ধেই নামতে পারিনি। কিন্তু যে-ভাবেই হোক্ না কেন, বাণী আসে, এসেছে এবং আসবে। আমার বিশ্বাস, যখন প্রয়োজন হবে, আপনারা যুদ্ধে নামতে সমর্থ হবেন। কিন্তু আমি আপনাদের কিছুই বলতে দিতে পারি না। ইউরোপের পরিস্থিতি বড়ই জটপাকানো…

র. রলাঁঃ ‘ভারতীয় না-গ্রহণ (Non-Acceptance) নীতির দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। অধিকন্তু ইউরোপেও বহুকাল থেকে অহিংসার সংঘবদ্ধ অভিজ্ঞতা আছেঃ তার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ১৮৬০ সালের পোল্যান্ডের অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের ইউরোপীয়দের অসুবিধা দ্বিগুণ কি তিনগুণঃ জাতীয় প্রশ্ন, সামাজিক প্রশ্ন। যে জাতিরা ১৯১৯ সালের চুক্তির জন্যে ভুগছে, তারা না-গ্রহণ নীতির কথা শুনবে ও বুঝবে। কিন্তু সামাজিক পীড়নের ক্ষেত্রে না-গ্রহণ নীতির কৌশলের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল, কিংবা যথেষ্ট নয়। আপনারা ভারতীয়রা খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন এবং পাচ্ছেনঃ কিন্তু বলকান দেশগুলোয় ও পোল্যান্ডে যে অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়, তা আপনাদের ক্ষেত্রেও করা হয় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। ইউরোপ ও এশিয়ার (জাপান) কোনো কোনো দেশে শিশু ও নারীকে খাটিয়ে যে শোষণ করা হয়, তা ভীতিপ্রদ। এই নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে যেতে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে এদের সংগঠিত হতে দেখলে কি তিরস্কার করা সম্ভব? জার ও ধনতন্ত্রের অত্যাচারের অধীনে রাশিয়ার অবস্থাটা ভেবে দেখবেন। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান যদি তাকে আক্রমণ করতে আসে, আজ কি বলতে পারা যাবে যে, সে প্রতিরোধ করবে না? বরং সেটা ভালো হবে, পশ্চিমে আমাদের এখানে রাশিয়াকে বাঁচানোর জন্যে ইউরোপীয় সর্বহারাদেরই না-গ্রহণ নীতি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরোপে সামাজিক প্রশ্ন জাতীয় প্রশ্নের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। মূলত, ধনতন্ত্র ও সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে ধাক্কাটা একই আন্তর্জাতিক অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। আজ দু'টি আন্তর্জাতিকতাঃ একটি অপরটির বিরুদ্ধে।’

গান্ধীঃ (যা তিনি নিজে দেখেননি বা যার পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি নিজে করেননি, মনে হলো, এমন জিনিসের ব্যাপারে তাঁর নজর সীমাবদ্ধ এবং উত্তর দেন পাশ কাটিয়ে)ঃ ‘ইংলন্ডে বেকারের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদেব আর মজুরদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো। আমি মজুরদের বলেছি, এর প্রতিকার ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই। তারা চায় পুঁজি তাদের প্রয়োজন মেটাবে; কিন্তু পুঁজি অননুকূল নয়; শুধু তার বাজার নেই। যদি ধনীদের সমস্ত পুঁজি বেকার মজুরদের দিয়ে দেওয়া হয়, বেশিদিন তাতে চলবে না। আমি তাদের বলেছিঃ নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করো, কুটিরশিল্পে হাত দাও। ওয়েলস দেশে অত্যন্ত সামান্য আকারে এই ধরণের কিছু পরীক্ষা হয়েছে; কিছু কিছু খনিমজুর এই পুরনো বৃত্তিতে ফিরে গেছে এবং দেখেছে যে, এতেই তাদের মুক্তি নির্ভর করছে। সাহায্যের উপরে নির্ভর ক'রে কারুর বাঁচা উচিত নয়।’

র. রলাঁঃ ‘ইংলন্ডের অনেক সুবিধা। অন্যত্র অবস্থা পৃথক। (আমাদের পঞ্চম আলোচনায় এই প্রশ্নে ফিরে আসবো)—কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্য আর এক বিপদ আছে, সেটা হচ্ছে, এক মধ্য-শ্রেণীর অস্তিত্ব, সেই শ্রেণী নিচুতলার পীড়িতদের মূল্যে বেঁচে থাকে। বিজয়ের পর আমাদের ফরাসীদের বলা হয়েছিলঃ

'এবার কড়ি গুনবে জার্মানী।' এখন, পশ্চিমের জাতিগুলোর কাছে বলা হচ্ছে ঃ 'কড়ি গুনবে পৃথিবী, – এশিয়া—আফ্রিকা।' আগামী যুদ্ধের জন্যে অশ্বেতকায়দের সৈন্যবাহিনী তৈরি হচ্ছে। এ হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের সুবিধাভোগী জাতিতে ফিরে যাওয়া, যারা তাদের সমস্ত বোঝা শৃংখলিত জাতিগুলোর ঘাড়ে নামিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমার ফ্রান্সের লোকেরা এখনো জগতের দুর্দশার উপরে ভিত্তিকরা আরাম উপভোগ করছে। এমনকি আমাদের সবচেয়ে উদারচেতা বুদ্ধিজীবীও বেশি তাকিয়ে না-দেখতে ভালবাসেন; এই অবস্থায় তাঁদের অনেক মুনাফা; তাঁরা চান না যে প্রকৃত ব্যবস্থা—বলপ্রয়োগের ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ে।'

গান্ধী ঃ 'যারা শোষিত তাদের হাতে কি প্রতিকার নেই? তারা যদি শোষকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে?'

র· রলাঁ ঃ 'যে-সব মানুষের ধর্ম নেই – তাদের পক্ষে অসম্ভব। মোটা বেতনের জন্যে শ্রমিকদের লোভ হবে তাদের অন্য দেশের ভাইদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে। একটা দারিদ্র্যের, নিরাসক্তির, ত্যাগের ধর্মবাণী চাই, যা সকলের কাছে সর্বপ্রথম প্রচার করতে হবে। প্রেমের এক ধর্মবাণী। কিন্তু দারিদ্র্য ও ত্যাগের বাণী বিজিত ও পীড়িতদের চেয়ে বিজেতা ও পীড়নকারীদের কাছে প্রচার করা বড়োই কঠিন।'

গান্ধী একমত হলেন এবং এখানেই থামলো আমাদের লিপিবদ্ধ আলোচনা। ওঠার সময় মীরা ও দেশাইয়ের হাতে দিলাম মনাৎ-গোষ্ঠীর ফরাসী বিপ্লবী সিন্ডিক্যালিস্টদের তোলা প্রশ্নগুলো; অনুরোধ জানালাম, তাঁরা যেন এগুলো তর্জমা ক'রে গান্ধীকে দেন এবং তাঁর উত্তর লিখে নেন।

আলোচনার সময়, জাপানী ভাস্কর তাকাতা অন্য সকলের সঙ্গে চুপচাপ অগোচরে বসে ছিলেন, তিনি মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ছিলেন।

বিকেলে গান্ধী গেলেন লোজানে, সেখানে প্রিভা ও সেরেজোল সভার আয়োজন করেছেন। নিহান ও পেরে তাঁর জন্যে যে গাড়ী দিয়েছিলেন, তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করলেন। তিনি চাইলেন ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে। কিন্তু পৌঁছুলে ভিড় এড়াবার জন্যে লোজানের আগের স্টেশন প্যাচুলিতে ট্রেন থামানো হলো, সেখান থেকে মোটরে যাওয়া হলো সভাস্থলে।

পর পর তিনটি সভা ঃ বিকেলে ৪টায়, ৬টায় ও ৭টা কি ৮টায়। শুধু দ্বিতীয় সভাটি প্রকাশ্য; তা সুইস বেতারে প্রচার করা হলো। খাবার ঘরে ব'সে (কারণ মারীর সঙ্গে একা বাড়ীতে আছি; সবাই গেছে লোজানে) পরিষ্কার শুনতে পেলাম। গান্ধীর স্বর শোনাল আশ্চর্য রকম পরিষ্কার, শান্ত, অতি স্পষ্ট উচ্চারণ (কন্ঠস্বর কিছুটা পুরুষালি); বাক্‌যন্ত্রের জোর যে কতখানি, কাছে-থেকে শোনার চেয়ে আরও ভালো ক'রে বুঝলাম। এই ভাবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারেন, এক সেকেন্ডের জন্যে কন্ঠস্বরের একটু ক্লান্তি হয় না। প্রিভার গলাও খুব ভালো শোনা গেল, তিনি ইংরেজি থেকে ফরাসীতে তর্জমা ক'রে গেলেন;

শ্রোতার প্রতিক্রিয়াও বোঝা গেল, উচ্ছ্বসিত হাততালি পড়ল; গান্ধীর কোনো কোনো শ্লেষাত্মক উত্তরে অনেকে হাসল। দুঃখের বিষয় তিনটের মধ্যে প্রথমটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়, সেটা আমি শুনতে পারিনি, মাঝরাতের কাছাকাছি ফিরে আমার বোন তার গল্প করেছে। বেলা চারটের সভাটি ছিল ঘরোয়া: সেখানে গান্ধী ও তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুধু সেরেজোল ও তাঁর ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিসের নেতারা, সুইজারল্যাণ্ডের বিবেকবান প্রতিবাদীদের একজন নেতাও। মুখ্য আলোচনা হয়েছিল, 'অহিংসার তত্ত্ব ও প্রয়োগ'কে কেন্দ্র ক'রে; 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' দেশাইয়ের পাঠানো 'ইউরোপের চিঠি'-তে তার সারমর্ম জানা যাবে। আইনস্টাইনের প্রতিপাদ্য এবং গান্ধীর দৃষ্টিকোণের বিরোধিতার সঙ্গে সংপৃক্ত যা তার সম্পর্কেই (যা আমি নিজে আলোচনা করেছি) এখানে শুধু বলছি। "অহিংসাকে কেমন ক'রে ফলপ্রদভাবে বাস্তবরূপ দেওয়া যায়? শুধুই অস্ত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার ক'রে? মানুষকে আইনস্টাইন আহ্বান করেছেন, যেন কেউ যুদ্ধে অংশ না নেয়..."গান্ধী রসিকতার সঙ্গে উত্তর দিলেন: 'অতবড় লোক সম্পর্কে যদি বলতে অনুমতি দেন তো সত্যি সত্যি বলি, আইনস্টাইন আমার কাছ থেকে এই পদ্ধতিটি চুরি করেছেন। কিন্তু আপনারা যদি চান যে আমি জিনিসটার গভীরে যাই, তাহলে বলবো যে, নিছক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করাটাই যথেষ্ট হবে না; সময় এলে যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করাটা তো অমঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গোটা সময় কার্যত চলে যাবার পরে সক্রিয় হওয়া। যে-অমঙ্গল গভীরতর, যুদ্ধে যোগ দেওয়াটা তার একটা লক্ষণ মাত্র। যারা যুদ্ধে যোগ দিতে নাম লেখায় না তারাও একইরকম অপরাধের অংশীদার, যদি তারা অন্যান্যভাবে রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। পুরুষ বা নারী—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে যে যুদ্ধের জন্যে সংগঠিত রাষ্ট্রকে সমর্থন করে, সে পাপে অংশগ্রহণ করে। বৃদ্ধ হোক্, যুবক হোক্, প্রতিটি মানুষই পাপে অংশ নেয়, যদি সে এই রাষ্ট্রকে খাজনা দিয়ে টিকিয়ে রাখে। এই জন্যেই যুদ্ধের সময়ে নিজেকে বলতাম, সৈন্যবাহিনী দিয়ে বাঁচানো খাদ্য যতো খাবো, সৈন্য না হয়েও ততো রাষ্ট্রের প্রতি অন্য কর্তব্য পালন করবো,—এর চেয়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানো ও গুলি খেয়ে মরে যাওয়াও ভালো...আর এই জন্যেই যারা যুদ্ধে যোগদান বন্ধ করতে চায়, তা করতে হবে রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সমস্ত সহযোগিতা প্রত্যাহার ক'রে। রাষ্ট্রকে ধরে রাখে যে গোটা ব্যবস্থা, তার সঙ্গে অসহযোগের চেয়ে, যুদ্ধে যোগদানের অস্বীকৃতি অনেক বেশী ভাসা-ভাসা। কিন্তু তখন বিরোধিতা এতো তীব্র, এতো কার্যকরী হবে যে, শুধু মাত্র জেলে যাওয়াই নয়, রাস্তায় মরার ঝুঁকিও থাকবে।'

অত্যন্ত বিচলিত সেরেজোল (কারণ এই বিশ্বস্ত মানুষটি সৎ নাগরিক ও সৎ বিবেকবান প্রতিবাদীর খাপ না-খাওয়া কর্তব্যের মধ্যে মিল ঘটাতে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন) প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে, রাষ্ট্রের সবকিছুই খারাপ নয় এবং যা কিছু নাগরিকেরা ভালো এবং উপকার করে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করা চলে। গান্ধী দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন: 'এবারে আপনি মানবস্বভাবের সবচেয়ে অনুভূতি-

প্রবণ দিকটি তুলে ধরেছেন। অ-সহযোগিতার স্রষ্টা ব'লেই এই প্রশ্নের সামনে আমাকে পড়তে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এমন কোনো রাষ্ট্র নেই—নেরো বা মুসোলিনির পরিচালিত রাষ্ট্রও নয়—যার মধ্যে কিছু ভালো জিনিস নেই। কিন্তু যে-মুহূর্তে ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেবো, আমাদের সমস্ত বর্জন করতে হবে। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো রাস্তা আছে, এমন সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে যা একেবারে বিরাট প্রাসাদ ; কিন্তু এরা সেই ব্যবস্থার অঙ্গ, যা জাতিকে পিষে মারে। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমি রাখবো না। এরা হচ্ছে রূপকথার সেই সাপের মতো, যার মাথায় মণি, কিন্তু দাঁতে বিষ। এইভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব জাতির শক্তিকে পিষে মেরেছে, তার বুদ্ধি স্তব্ধ করেছে। আর তাই আমি সমস্ত সুবিধা—চাকরি, আইনআদালত, খেতাব ইত্যাদি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত করেছি...অনুসরণযোগ্য রাজনীতি বিভিন্ন দেশে পৃথক হবে, কিন্তু আত্মবিসর্জন ও ত্যাগ তার অপরিহার্য দিকই থাকবে। আইনস্টাইন যা বলেছেন, তার ঘটনা ঘটবে বছরে শুধু একবারই, আর তাও এক অতি সামান্য সংখ্যক লোককে নিয়ে। কিন্তু আমার অভিমত আপনাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগিতা করা।"

সেরেজোল তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। যুক্তি দেখালেন যে, স্বাধীন জাতি ও পরাধীন জাতির মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। যে-রাষ্ট্র বিদেশী, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের গভীর সংঘাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে-রাষ্ট্রকে নির্বাচিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে সুইসরা কী ক'রে সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? গান্ধী উত্তর দিলেন : নিঃসন্দেহে এক পার্থক্য আছে। পরাধীন জাতি হিসেবে পরাধীনতার জোয়ালে নাড়া দিয়ে আমি তাকে সবচেয়ে ভালো সাহায্যই করতে পারি। কিন্তু এখানে আপনারা জিজ্ঞেস করেছেন, সামরিক মনোবৃত্তির হাত থেকে কী ক'রে সবচেয়ে ভালো ক'রে মুক্ত হবেন। আপনারা সুযোগসুবিধা ভোগ করেন এই শর্তে যে, রাষ্ট্রের জন্যে আপনারা যুদ্ধে যোগ দেবেন। এখন আপনাদের রাষ্ট্রকে যুদ্ধের মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে হবে। আপনাদের সুযোগসুবিধা বর্জন দিয়ে শুরু করুন, ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাবেন না, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবেন না, চাকরি করবেন না, মাইনে নেবেন না, পোষ্টাপিস, সরকারী যানবাহন কাজে লাগাবেন না ! ইত্যাদি। খাজনা বন্ধ করাটা খুবই সহজ। এটা আসবে বেশ অনেক পরে। এখানে পৌঁছুতে ভারতবর্ষে আমাদের দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

তাঁর এই স্বার্থহীন উক্তিগুলো সেরেজোল ও তাঁর ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিসের শিষ্যদের গভীরভাবে বিচলিত করলো ও মনের মধ্যে ঢুকলো। ওখানে বসেই এগুলোর সঙ্গে ঐক্যমত্য জানাতে মনস্থির ক'রে উঠতে পারলেন না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এই মহৎ ও আন্তরিক মানুষদের বিবেক এক বেদনাদায়ক পীড়নের কবলে পড়বে। তৃতীয় সভার প্রথমে (প্রকাশ্য হলেও দ্বিতীয়টার চেয়ে কম প্রকাশ্য, কারণ সভাটি সংরক্ষিত ছিল বিবেকবান প্রতিবাদীদের ছোটো দলটির জন্যে) সেরেজোল তা দেখিয়ে দিলেন একথা স্বীকার ক'রে যে, গান্ধী তাদের প্রচেষ্টার দুর্বলতাটা অনুভব করিয়ে দিয়েছেন

এবং সিভিল সার্ভিসে তাঁর স্থানাধিকারিণী উদার হৃদয়া এলেন মতাস্তিয়ে—গান্ধীর সামনে তাঁরা লজ্জা পাচ্ছেন—তা এক মর্মস্পর্শী বিনয়ে প্রকাশ করলেন : তাঁদের সকলকে ও সব-কিছুকে ভয়, আর গান্ধী কোনো কিছুকেই ভয় করেন না। সেরেজোল আরও বললেন : “আমরা পেয়েছি আমাদের সত্যটি, আর যা প্রকৃত সত্য তাকে পেয়েছেন আপনি।”

লোজানে তৃতীয় সভাটা হয়েছিল এক গির্জায়। সেখানে সমস্ত বিবেকবান প্রতিবাদী আর সেরেজোলের “সৈনিকেরা” হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সুইস্‌ মৈত্রীসঙ্গীতে গেয়েছিলেন। এই সভায় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় : ‘ঈশ্বরকে আপনি সত্য বলে দেখেন কেন ?” এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর গভীর চিন্তাও ব্যক্ত করেন।

গান্ধী : “আমার প্রথম যৌবনে শিখেছিলাম, হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রায় হাজার খানেক নাম আছে ! কিন্তু এই হাজার খানেক নামও মোটেই যথেষ্ট নয়। আমার বিশ্বাস, যতো প্রাণী আছে ঈশ্বরেরও ততো নাম, আর এই জন্যেই তিনি নামহীন। আর যেহেতু তার অসংখ্য রূপ, তাঁকে আমরা রূপহীনও ভাবতে পারি। যেহেতু আমরা অনেক ভাষায় কথা বলি তাঁকে ভাবতে পারি বাণীহীন ব’লে। যখন ইসলাম ধর্ম পড়তে গেলাম, দেখলাম যে ইসলাম ধর্মেও ঈশ্বরের অনেক নাম। যাঁরা বলেন ঈশ্বরই প্রেম, তাঁদের সঙ্গে বলবো : ঈশ্বরই প্রেম। কিন্তু একেবারে ভিতর থেকে আমি ভাবি, যদিও ঈশ্বর প্রেম, তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি সত্য। মানুষের ভাষায় যদি তাঁর সবচেয়ে সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমার কাছে ঈশ্বরই সত্য। কিন্তু দু’বছর হলো আমি আরও এক পা এগিয়ে গেছি, আমি বলেছি সত্যই ঈশ্বর। প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সত্যের যে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তার পরে এই সিদ্ধাতে পৌঁছেছি। আমি তখন দেখেছি যে, প্রেমের মাধ্যমেই সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছুনো যায়। কিন্তু আমি জানতাম, ইংরেজি ভাষায় প্রেমের অনেক অর্থ আছে এবং মানুষের প্রেম লালসার অর্থে এক অপস্তরের বস্তুও হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি এও জেনেছিলাম যে, অহিংসার অর্থে প্রেমের পক্ষে সংসারে সামান্য সংখ্যক বিশ্বস্তরাই শুধু আছেন। কিন্তু আমি কখনো সত্য কথাটির মধ্যে দ্বৈত অর্থ দেখিনি। এমনকি নাস্তিকেরাও সত্যের প্রয়োজন বা শক্তিতে সন্দেহ করেন নি। সত্যের আবিষ্কারের নেশায় নাস্তিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে ইতস্তত করেন নি ; এবং তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের যুক্তি আছে। আর এই যুক্তিতেই আমি দেখেছি যে, ‘ঈশ্বরই সত্য’ বলার চেয়ে বরং আমার বলা উচিৎ : ‘সত্যই ঈশ্বর’। আমার মনে পড়ে চার্লস ব্র্যাডলাফের নামটা : তিনি নিজেকে নাস্তিক বলা পছন্দ করতেন ; কিন্তু তাঁকে যেমনটি জেনেছি, কখনো তাঁকে নাস্তিক ব’লে মনে করতে পারবো না। আমি তাঁকে বলবো ঈশ্বর-ভীত মানুষ, যদিও জানি তিনি এ নামকরণ অস্বীকার করবেন…তাঁর সমালোচনার হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছি এই কথা ব’লে যে, সত্যই ঈশ্বর, ঠিক যেমন ক’রে আমি অনেক তরুণের সমালোচনার হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছি। আমি আরও বলি যে, কতো লাখো জন ঈশ্বরের নাম নিজের কাজে লাগিয়েছে এবং তাঁর নামে নৃশংসতা করেছে। এও নয়

যে, সত্যের নামে অতিজ্ঞানীরাও প্রায়ই নিষ্ঠুরতা করেন না। আমি জানি, বিজ্ঞান ও সত্যের নামে কাটা-ছেঁড়া ক'রে পশুদের উপরে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। যে ভাবেই ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হোক্, এই পথে তাই কিছু সংখ্যক বিঘ্ন আছে। কিন্তু মানুষের মন সীমিত। আমাদের আয়ত্তের ক্ষমতার বাইরে কোনো সত্বা (Etre) বা সত্বকে (Entité) ধরবার চেষ্টা করলে এই সীমার মধ্যে কাজ করতে হয়, আর হিন্দু দর্শনে আর একটা কথা পাই: 'কেবল ঈশ্বরই আছেন, অন্য আর কিছু নেই! জোর দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা এই সত্যটিই আপনারা পাবেন ইসলামের কলমায়। সংস্কৃত সত্য কথাটির আক্ষরিক হচ্ছে: 'যা আছে,—সৎ'। এই যুক্তি ও আরও অনেক যুক্তির জোরে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে. 'সত্যই ঈশ্বর'—এই সংজ্ঞাটিই আমাকে সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তি দেয়। সত্যকে যখন ঈশ্বররূপে খুঁজতে চান, তখন একমাত্র অব্যর্থ পন্থা প্রেম,—তার অর্থ, অহিংসা। আর শেষ পর্যন্ত আমি যেহেতু বিশ্বাস করি পন্থা ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আমি বলতে দ্বিধা করবো না যে, ঈশ্বরই প্রেম।"

আলোচনা চলার দাবি ওঠে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়:

"কিন্তু তাহলে সত্য কি?"

গান্ধী উত্তর দেন: "প্রশ্নটা শক্ত,—কিন্তু, আমার পক্ষে আমি তার সমাধান করেছি এই ব'লে যে, অন্তরের কণ্ঠ যা বলে তাই সত্য। আপনারা প্রশ্ন করবেন: কিন্তু পৃথক পৃথক মানুষ কেমন পৃথক ও বিপরীত সত্যকে ভাবে না কি?—বেশতো, আমরা দেখি মানুষের মন সংখ্যাহীন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কাজ করে, এবং সকলের পক্ষে মনের বিবর্তন একই রকম নয়। এ থেকে এইটেই আসে যে, একজনের পক্ষে যা সত্য, সকলের পক্ষে তা সত্য নাও হতে পারে, যাঁদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে বিশেষ কিছু শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে ঠিক যেমন কিছু অপরিহার্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও অভিজ্ঞতা লাভের গুণ পেতে গেলে, এক কঠোর প্রাথমিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। আর এই জন্যে, অন্তরের কঠোর কথা বলার আগে প্রত্যেককে তার যথাযথ সীমার জ্ঞান উপলব্ধি করতে হবে। অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি ক'রে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে যে, ঈশ্বররূপে সত্যের ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁরা করতে চাইবেন, তাঁদের কয়েকটা ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, যেমন সত্যের ব্রত, ব্রহ্মচর্যের ব্রত,—কারণ সত্য ও ঈশ্বরের জন্যে আমাদের প্রেমকে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে ভাগ ক'রে নেওয়া সম্ভব নয়,—অহিংসার ব্রত, দারিদ্র্যের ব্রত ও ত্যাগের ব্রত। যদি আপনার এই পাঁচটি ব্রত মেনে না নেন, তাহলে সত্যের অভিজ্ঞতার পথে মোটেই পা দিতে পারেন না। আরও অন্য কিছু শর্ত নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সব আপনাদের বলতে পারছি না। এইটে বলাই যথেষ্ট যে, যাঁরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, বিবেকের স্বর শুনতে পাচ্ছেন ব'লে প্রত্যেকের দাবি করাটা খাটে না। আর যেহেতু কোনোরকম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে না গিয়েই প্রত্যেকে কার্যত বিবেকের অধিকার ফলাতে চায়, এবং বিভ্রান্ত জগতে

এতো স্বীকৃত অসত্যের অস্তিত্ব—পুরোপুরি সত্যকার দৈন্যের সঙ্গে আমি আপনাদের যা বলতে পারি, তা এই যে, প্রচুর যাঁদের দৈন্যবোধ জন্মায়নি তাঁদের কাছে সত্য ধরা পড়তে পারে না। যদি সত্যের মহাসাগরে সাঁতার দিতে চান তো নিজেকে শূন্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। এই মনোমুগ্ধকর পথ সম্পর্কে আর বেশীদূর এগুতে পারছি না...”

লোজানের প্রথম সভায় ঘোষিত উক্তিগুলো ছিল বেশ গুরুতর,—কারণ এগুলো রাষ্ট্রকে চরম অমান্য করার আবেদন। এই উক্তিগুলোয় সরকারী সংবাদপত্রগুলো গান্ধীর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতো এবং তাঁর বহিষ্কারের বিপদটা উস্কে দিতে পারতো। কিন্তু যেহেতু এগুলো বলা হয়েছিল ঘরোয়া সভায়, সাধারণ লোকে এসব জানতেই পারেনি, সরকারী কর্মচারীরা এসব না জানাটাই বেশি সমীচীন মনে করেছিল।

কিন্তু একথা দ্বিতীয় সভায় বলা কিছু কিছু কথা সম্পর্কে বলা চলে না, সেটি ছিল প্রকাশ্য সভা (যার বিবরণ আমি শুনেছি)—এবং সেখানে ‘ল্য জুর্নাল দ্য জেনেভ’ ও ‘ত্রিবুন দ্য লোজান’—এই দুইটি সুইস-ফরাসী পত্রিকার জালিয়াতির বিরুদ্ধে গান্ধী কশাঘাত করেন। একটিতে পারীর সভায় বলা গান্ধীর কথাগুলো সত্যের একেবারে বিপরীত চেহারা দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছিল। অন্যটিতে গান্ধীর চিন্তায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আরোপ করা হয়েছিল যে, কিছুকাল অ-হিংস কৌশল চালাবার পর হিংসা প্রয়োগের কথা গান্ধী আগেই ভেবে রেখেছেন ও মেনে নিয়েছেন। দুটি সংবাদপত্রই প্রাণপণে দেখাবার চেষ্টা করেছে যে, গান্ধী একজন জাতীয়তাবাদী, যিনি আসল কথা গোপন রাখছেন, যাতে, চাই বা না-চাই, তথাকথিত নিরপেক্ষ সুইস যুদ্ধবাদীদের ভন্ড জাতীয়তাবাদের খাতায় তাঁর নাম তোলা যায়। গান্ধী স্পষ্ট ক’রে বলেছেন যে, এটা অসদভিপ্রায়ে “বানানো,” তিনি (জেনেভার) সংবাদপত্রের সম্পাদকের সরল বিশ্বাসে সন্দেহ করছেন না, কিন্তু তাঁর কর্তব্য হবে তাঁর সংবাদদাতাকে অবিশ্বস্ত ব’লে গণ্য করা, তাকে দিয়ে মিথ্যাটি প্রত্যাহার করানো। এতে লোজানের জনসাধারণ প্রচন্ড হাততালি দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সশব্দে দরজা ঠেলে।

যে সুইস সংবাদপত্রগুলো এ পর্যন্ত গান্ধী সম্পর্কে রেখেঢেকে চলছিল, তারা যে পরদিনই মনোভাব পাল্টাবে সেটা আশা করাই গিয়েছিল। পাল্টালেও কিন্তু তা রইল মাত্রারাখা এক বিদ্রূপাত্মক সুরের মধ্যে : কারণ ঝগড়াটার ছোঁয়া লেগেছিল শুধু দুটো বিশেষ সংবাদপত্রের গায়ে। আর সবকিছু অবশ্যই তার সংকেত হয়ে ছিল পরদিন বৃহস্পতিবারের জেনেভার প্রকাশ্য সভার জন্যে। কিন্তু আগে থেকেই ভাববো কেন!

শুক্রবার, ৯ ডিসেম্বর—সকালবেলাটা গান্ধী ঠিক ক’রে রেখেছিলেন যাদের সঙ্গে দেখা করবেন কথা দিয়েছিলেন, তাদের জন্যে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, রবিবার সন্ধ্যায় গান্ধী এলে, আমাদের সাক্ষাৎ ও প্রার্থনার পর সাংবাদিকদের আসতে দিয়েছিলেন, তারা সংখ্যায় জন বারো এবং তারা সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়

দিয়েছিল ; তারা কেউই বুদ্ধিমানের মতো একটা প্রশ্নও তুলতে পারে নি।) কিন্তু সাড়ে এগারোটার সময় আমার বাড়ীতে এসে ফটোগ্রাফারের (মঁত্র্য-র আর. শ্লেমের) সামনে দাঁড়াবেন, সে-সম্মতি আদায় ক'রে রেখেছিলাম ;—এমন সম্মতি প্রায় কখনোই তিনি দেন না···আর তারপরেই তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসলাম।

বিকেলবেলায় গান্ধী চাইছিলেন মীরার সঙ্গে 'এইগ্‌ল'-এর মাথায় সেপেই-তে যেতে, সেখানে তিনি এক বৃদ্ধা চাষীর সঙ্গে দেখা করতে চান, তাকে মীরা আগে থেকেই চেনে, সে ভারতীয় চাষীর মতো সুতো কাটে। একসঙ্গে তারা গান্ধীর সম্পর্কে আলোচনা করেছে। তাই মোটর ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলো, তাতে লাভ হলো সেই-সঙ্গেই গান্ধীকে লেজাতে আনা গেল যাতে ডাঃ ভোতিয়ে-এর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যাবাসটি দেখতে পারেন*...যে-রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয়েছে, তাছাড়া, গান্ধী বুদ্ধিজীবীদের স্বাস্থ্যাবাস সম্পর্কে বেশ সামান্যই গুরুত্ব দিলেন ব'লে মনে হলো : (একমাত্র মন্তব্য করলেন পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কে)। কিন্তু বৃদ্ধা চাষীর সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তিনি তার তাঁত বোনা দেখলেন গল্প করার জন্যে তার সামনেই বসে পড়লেন। পাশের ঘরে দুটো ছাগল আর দুটো গরু। তাঁর মনে হলো যেন ভারতবর্ষে আছেন, বললেন যে সবই একরকম। বৃদ্ধাটি এই আসাটা ভাবতে পারেনি, সেও মুগ্ধ হলো, কিন্তু অবাক হলো না। দুই প্রাণের বন্ধুর মতো দু'জনে হাসাহাসি, গল্পগুজব করলেন।

পাঁচটার আগে ফিরে গান্ধী আমাকে দেখতে এলেন। কিন্তু আমি একটু ক্লান্ত ; এবং এটাও স্বীকার করা দরকার যে, সেই দিনটায় আমার এই ধারণা হয়েছে, গান্ধীর পথটা এতো পরিষ্কার ছকা, আর—অনেক বিষয়ে—আমার থেকে এতো ভিন্ন যে, আমাদের একসঙ্গে আলোচনার বিশেষ কিছুই নেই : প্রত্যেকেই ঠিক ঠিক জানি, কে কোন্ পথে যাবো ; আর গান্ধীর পথটা তাঁর পক্ষে ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে নিখুঁত ; সেটা অন্যরকম হোক তা আমি চাই না ; আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁকে এইজন্যে পছন্দ করি। কিন্তু প্রথম দিনটিতে যেমন করেছিলাম, সেই আমার হাতে তাঁর হাত দুটো রাখা, সেই চোখে চোখ রেখে দুজনে হাসা, তিনি তখন হাসবেন—সেই থামা-থামা হাসি, মুখটা হাঁ-করা, পোষা লক্ষ্মী কুকুরটা যেমন ক'রে হাঁপায়,—এর বাইরে দু'জনের আর কী বা বলার আছে · সে যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় আমার কথা বলার মেজাজ ছিল না। আমাদের পাঁচটি আলোচনার মধ্যে ৯ তারিখেরটাই সবচেয়ে কম হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

আমার বোন আলোচনা শুরু করলো এই প্রশ্ন দিয়ে, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন এবং তাঁকে আন্তরিক মনে করেন কিনা।

---

* একটি ছোটো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা : গান্ধী চলে যাবার এক সপ্তাহ পরে স্বাস্থ্যাবাসের পরিচালক ডাঃ ভোতিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে স্বাস্থ্যাবাসের "দর্শকদের মন্তব্যের খাতার" (Livre d'or) বিষয়ে টেলিফোন করেছিলেন. সেটা গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি যাতে কিছু লিখে দেন। সেই খাতাটি সম্পর্কে অতিথিকে আমরা বলতে শুনিনি। অবশেষে সেটি খুঁজে পেলাম, ভিলার এক কোণে পড়ে আছে. গান্ধী তাতে একটা কথাও লেখেন নি। (র. র-র মন্তব্য)

গান্ধী ঃ "মনে করি, আবার মনে করি না। তিনি আন্তরিক এই অর্থে যে, তিনি যা বলেন তাতে বিশ্বস্ত থাকতে চান। কিন্তু তাঁর জানা উচিত, আর তিনি জানেনও যে, তা বলার অর্থ ইংলন্ডের পক্ষে (ভারতবর্ষের উপরে) কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হারানো ; তবুও তিনি ব'লে চলেছেন দায়িত্ব আছেই ; আর এই ভাবেই তিনি চান যে, যা নেই, তা সবাই সত্যি ব'লে বিশ্বাস করবে। আর অন্য অর্থে তাঁকে আমার মনে হয়েছে আন্তরিকতাহীন ; তিনি আলোচনার সময় খোলা-মন নন ; প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো নয়। কিন্তু আমি অবিচার করতে চাই না ; তাঁর ঘাড়ে বিপুল দায়িত্ব ; আর সেটা কঠিন ; তিনি কাজের চাপে ক্লান্ত, আর তিনি দেখছেন যে, আমিও সহজ বান্দা নই। তিনি বুঝেছেন আমি লড়াকু ; কিন্তু আমার আর্জিগুলো এতো উঁচুতারে বাঁধা যে, তিনি জানেন না, কী কায়দায় আমাকে হারাবেন। তাই তিনি খোলাখুলি হতে পারেন না। আন্তরিকতার অভাবের চেয়ে এ ববং তাঁর দুর্বলতা। তাঁকে আমি অনেক কাল আগে থেকেই জানি। তাঁর অন্য সময়ের ঘোষণা অনুকূল ছিল ; কিন্তু তখন সেটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কারণ তখন তাঁর দায়িত্ব ছিল না।"

র. রলাঁ ঃ 'গোলটেবিল বৈঠকে আপনার শেষ বক্তৃতাটি কোনো কোনো মহলকে বিচলিত করেছে ; পারী ও বুলগেরিয়ার সংবাদপত্রগুলো আপনার 'কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখানোর' কথা বলেছে।' (আমি প্রবন্ধটির অংশ পড়ে শোনালাম।)

গান্ধী ঃ 'এটা আমার শেষ বক্তৃতা নয়, এটা দিয়েছিলাম বাণিজ্যিক ব্যাপারে পার্থক্য করা সম্পর্কে 'ফেডারেল স্ট্রাকচার' কমিটিতে। আমার বন্ধুরাও এতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যা বলেছি, সংবাদপত্রগুলো তার চেয়ে অনেক দূর চলে গেছি ব'লে দেখাচ্ছে। আমি বলেছি যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর কোনো পার্থক্য করি না, পার্থক্য করি শুধু অন্য (সামাজিক) ক্ষেত্রে ; আমি বলেছি, কোনো চালু স্বার্থই সংকুচিত হবে না, যদি না তা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হয় বা অবৈধ স্বার্থ হয়। যখন জাতীয় কংগ্রেস সরকারের শাসনভার নেবে, যদি কোনো স্বার্থ অবৈধ হয়, বা এমনকি বৈধ হয়েও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হয়, তা হলে তা রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করবে। এটা প্রযুক্ত হবে যেমন ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে, তেমনি ইউরোপীয় স্বার্থ সম্পর্কেও। আর সেটা কোনো সরকারী নির্দেশে হবে না, এই নির্দেশ পেতে হবে জাতীয় সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে। যদি কাউকে সম্পত্তিচ্যুত করতে হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে যে, এই স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল।'

তারপর আলোচনা হলো, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে। বাংলাদেশের নতুন অর্ডিনান্স সম্পর্কে 'আমি ম্যাকডোনাল্ডকে বলেছি (গান্ধী বলছেন) ওটা আমাকে মহাবিপ্লবের আগের কথাই মনে করিয়ে দেয়।'

র রলাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও ভারতবর্ষের স্থানীয় ক্ষমতার মধ্যে (লন্ডন ও বড়লাটের মধ্যে) সংঘর্ষ হয় কিনা। এমনকি ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানীয়

ক্ষমতার প্রতিনিধিদের মধ্যেও তা হয় কিনা, যেমন জাপানে হয়ে থাকে, সেখানে যুদ্ধবাদী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধেও সক্রিয় হয়।

গান্ধী: 'ভারত সরকার ও তার কর্মচারীদের মধ্যে মতবিরোধ প্রায়ই হয়। তাই বিশেষ ক'রে খাজনাআদায়কারীরা উদার নির্দেশগুলো ধর্তব্য ব'লে মনে করে না; অবশ্য এমন ধরনের নির্দেশ কালেভদ্রে আসে; কিন্তু যখন আসে অধস্তনেরা কার্যক্ষেত্রে সে-নির্দেশ কড়া ক'রে ফেলে; তার শৃংখলা মেনে চলার ভাব দেখায় (সাধারণভাবে, তারা শৃংখলা ভাঙ্গে যখন কালেভদ্রে উদার নির্দেশ আসে); আর কেন্দ্রীয় সরকার এর বিরুদ্ধে লড়তে অক্ষম; কারণ অধস্তনদের বরখাস্ত করলে গোটা শাসনযন্ত্রই ভেঙ্গে পড়বে।'

র. রলাঁ: গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের কথা তুললেন, ইউরোপে লোকে তাদের উপরে গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের (occulte) ক্ষমতা আরোপ করে।

গান্ধী উত্তর দিলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ইংরেজদের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস: 'এ যেন একটা সাপ, গোটা জাতটাকে জড়িয়ে ধরেছে।'

গত গ্রীষ্মে আমি যে-এক প্রাক্তন ইংরেজ আই. সি. এস.-এর চিঠি পেয়েছিলাম তার কথা বললাম, তিনি অতি স্বল্পকালের জন্যে অরবিন্দ ঘোষের সহকর্মী ছিলেন। যে সব মহৎ ব্যক্তিদের কথা (বিবেকানন্দ প্রভৃতি) আমি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে বলেছি, তাঁদের পাশাপাশিই ত্রিশ বছর ধরে তিনি থেকেছেন; তাঁদের প্রতি কোনো দৃষ্টিই দেন নি। এখন অবসর নিয়ে এবং আমার গ্রন্থগুলো পড়ে এইভাবে তাঁর জীবন নষ্ট করার বিড়ম্বনার কথা ভদ্র ও সরলভাবে প্রকাশ করেছেন।

তারপর গান্ধী আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তাঁর উদ্বেগ, আমাকে এমনভাবে অতিমাত্রায় গরমকরা ঘরের মধ্যে আটকা দেখে। (সম্প্রতি সামান্য ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা ধরায় গায়ে এখনো জ্বর আছে।) তাঁর মতে আমার পক্ষে ভিলন্যভের জলহাওয়া খুবই খারাপ। (এখানে এখন বছরের সবচেয়ে বিশ্রী সময়; কোনো কোনো সন্ধ্যায় এখানে আলোর যে মহিমা তা না-দেখেই উনি চলে যাবেন।) আমাকে পরামর্শ দিলেন ভারতবর্ষে আসতে, আশ্বাস দিলেন সেখানে আমি ভালো বোধ করবোই। আমি বুঝিয়ে বললাম, আমার কাজ, আমার কর্তব্য ইউরোপে আমাকে বেঁধে রেখেছে, এখানে আমি প্রায় একা, এখানে আমার কাজের দায়িত্ব নেবার মতো কেউ নেই, কোনো সহায়কও নেই; কারণ যুদ্ধ আমার ও অন্যান্য ফরাসীদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে।

তখন গান্ধী আমাকে বললেন: 'তাহলে সুইজারল্যান্ডেই অন্য কোথাও, অন্যভাবে থাকতে হবে, প্রাকৃতিক চিকিৎসা করতে হবে। হাওয়া, রোদ।' ডাক্তারদের সম্পর্কে গান্ধীর অবিশ্বাস তেমনই বজায় আছে; কিন্তু তিনি বুঝতেও পারবেন না, ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েন্‌জা আর তার পরেকার দুর্ঘটনাগুলোর বলি হওয়ায় আমার দেহযন্ত্রের কী ভাঙচুর হয়েছে। সেসব তাঁকে জানাবার জন্যে আমিও তাঁর সময় নষ্ট করলাম না। অন্য বিষয়ে চলে গেলাম।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ও পৃথিবীর যুবশক্তির

পার্থক্য সম্পর্কে জানেন কি না। আমি তাঁকে সে-পার্থক্য বর্ণনা করার চেষ্টা করলাম। আজ জার্মান যুবশক্তি এক পরম আপোক্ষকতার রাজ্যে রয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, এরই মধ্যে থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বটি বেরিয়ে আসবে। এর উল্টোদিকে, জার্মান যুবশক্তির চোখে ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে সমাজ-কাঠামো পাকাপোক্ত, রক্ষণশীলতা একগুঁয়ে এবং যে-দেশ নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত। যুদ্ধ, বিপ্লব, ফ্যাসিবাদ ঃ সমস্ত রকম পরিবর্তনের জন্যে জার্মান যুবশক্তি প্রস্তুত ; সেখানে সবকিছু সম্ভব। ফ্রান্স সম্পর্কে তার মধ্যে এক অত্যন্ত তীব্র জ্বালা, তাকে মনে হয় একটা জগদ্দল পাষাণ, অতীতের এক ডান্ডাবেড়ি। ইউরোপের এই তরল অবস্থা যে-কোনো রূপ নিতে পারে। বর্তমান চীনেও এই একই রকম, সেখানে যুবশক্তিও দ্রবনের স্তরে...ইত্যাদি। গান্ধী মন দিয়ে শুনলেন, উত্তরে শুধু বললেন ঃ 'তাই বটে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আর ভারতবর্ষে ?'

গান্ধী ঃ 'একই রকম (তার অর্থ, সেখানেও এই অবস্থারই প্রকাশ)। কিন্তু না-গ্রহণের আন্দোলন যুবশক্তিকে কমবেশি নৈতিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। হয়তো আত্মত্যাগ, বীরত্বের কাজে টেনে আনা যায়নি ; কিন্তু এ অন্তত নির্বোধ আচরণ করতে বাধা দিচ্ছে।'

র. রলাঁ ঃ 'ভারতবর্ষে আপনাদের উদ্দেশ্য সকলের কাছেই স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আপনাদের আদর্শ সর্বজনীন, কিন্তু নৈতিক ভাবে, কি বৈষয়িক ভাবে, কোনো কাজই জার্মানী খুঁজে পাচ্ছে না ; স্কুল কলেজ থেকে যে জার্মান তরুণেরা বেরোয় তাদের সামনে দেখে শূন্যতা ঃ নৈতিক ও বৈষয়িক চরম বেকারি। এই জন্যেই ইউরোপে তারাই বড়ো প্রভাব স্বীকার করার পক্ষে উপযুক্ত। এটা বড়োই দুঃখের ব্যাপার যে, তাদের সঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। জার্মানির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে কি ? সেখানে হাজার হাজার আত্মিক শক্তি বিনা কাজে বসে আছে। ল্যাটিন দেশগুলোতে কাঠামোগুলো টিকে আছে ; তারাই মনগুলোকে ধরে রেখেছে। সেখানে এই মুহূর্তে আপনার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুবই কম।'

গান্ধী তাঁর এক জার্মান বন্ধুর (শিষ্যের ?) কথা বললেন, ভারতবর্ষে তিনি তাঁর ওখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি জার্মানীর এক মুখ্য যুব আন্দোলনে আছেন। তিনি বললেন, যেসব জার্মানরা তাঁর কাছে আশ্রমে আসেন, তাঁরা নম্রভাবে আশ্রমে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে নেন, অন্য ইউরোপীয়দের মেনে চলতে অসুবিধে হয়। তিনি বললেন, জার্মানী যেতে তাঁর বেশ ইচ্ছে রয়েছে ; কিন্তু তাঁর সময় নেই।

র. রলাঁ জার্মানীর বর্তমান হতাশার উপর জোর দিলেন। যুবশক্তি ও জাতির প্রয়োজনে সাহিত্য সাড়া দিচ্ছে না। জাতির যে অবশিষ্টাংশ কষ্ট পায় ও লড়াই করে, বুদ্ধিজীবীরা সব সময়েই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এক আলাদা শ্রেণী হয়ে আছে। আমি বললাম, (আমার মধ্যেই এরা সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সমর্থক খুঁজে পাচ্ছে।)--এশিয়ার সংঘাতে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যে অংশ নেবে তার

সম্পর্কেও এশিয়াকে ভাবতে হবে; আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম যে, ভারতবর্ষ ইউরোপকে শুধু ইংলন্ডের মধ্যে দিয়েই চেনে।

গান্ধী এ সম্পর্কে একমত হলেন। তিনি বললেন, ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে দিয়ে দ্রুত চলার পথে তাঁর ভারতীয় সঙ্গীরা অবাক হয়েছেন, তাঁদের চোখে পড়েছে ইংলন্ড ইউরোপ থেকে কতো আলাদা!

গান্ধীর সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, তাই ছ'টা বাজতেই আলোচনা থেমে গেল। কিন্তু ভিলা লিঅনেতে গান্ধীর ঘরে হবার বদলে,—গান্ধী চাইলেন প্রার্থনা হোক্ ভিলা অলগার নিচের তলায়—ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে বাগানটা যাতে পেরুতে না হয়। তিনি ফিরে এলেন সাতটায়, সঙ্গে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বন্ধু ও শিষ্যদের একটা দল। সবাই বসল মেঝেয় জোড়াসন হয়ে (শুধু আমি, আমার বোন ও মারী বসে রইলাম ডিভানে): গান্ধী বসলেন বইয়ের তাকে হেলান দিয়ে, আজোরসের টেরাকোট্টাগুলোর নিচে; মীরা প্রায় আমার হাঁটু ঘেঁষে; অন্যরা ঠাসাঠাসি ক'রে কিংবা আসবাবপত্রের নিচে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। গান শুরু হয়ে গেল। তারপর গান্ধী ফিরে গেলেন ভিলা লিঅনেতে, আর সবাই গেল যে-যার কাজে। মঙ্গলবার বেলা দুটো নাগাদ রোমে জেনারেল মরিসকে তাড়াতাড়ি তার করলাম, এক রাতের জন্যে গান্ধী ও তাঁর দুই শিষ্যকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিতে সম্মত আছেন কিনা। উত্তরের জন্যে ৩০ ঘন্টা অপেক্ষা ক'রে রইলাম, ভয় শুরু হলো, আমার তার ফ্যাসিস্ট সেন্সারে নিশ্চয়ই আটক ক'রে থাকবে। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যে ৮টায় মরিসের 'সকৃতজ্ঞ' সম্মতি এলো। (পরে জেনেছিলাম, প্রথমে তাঁকে রোমের উচ্চমহল থেকে জানতে হয়েছিল, গান্ধীর এই আগমন বাঞ্ছিত কিনা এবং তাতে কোনো অবাঞ্ছিত কিছু হবে কিনা। সোফিয়া বের্তোলিনি আমাকে লিখেছেন, পুরোপুরি সন্তোষজনক খবরই পাওয়া গিয়েছিল।)

সেদিন সন্ধ্যায় গান্ধীর প্রথম সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গেও অল্প সময়ের জন্যে আলোচনা হলো, কিন্তু বেশ হার্দ আলোচনা। লোকটি সুন্দর। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স, লম্বা, সুগঠিত, বুদ্ধিমান চেহারা। আমার বোন তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছে। আমি জেনেছি, গান্ধীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের জন্যে তিনি ওকালতি ছেড়েছেন এবং তিনি যে সুখ খুঁজে পেয়েছেন, কখনো তা মিথ্যে হয়নি। মীরার কাছ থেকে এও জেনেছি —এবং তিনিও সে-কথা আবার বললেন, আমার লেখা ও আমার চিন্তা তাঁর জীবনে কতোখানি স্থান পেয়েছে। সে তাঁর সৌভাগ্য, মীরা যখন আশ্রমে এলো: কারণ তাঁরা একসঙ্গে আমার কথা আলোচনা করতে পারতেন; আর দেশাই মীরাকে অনুরোধ করেছিলেন ফরাসী শেখাবার, যাতে তিনি আমার মূল বই পড়তে পারেন। কিন্তু গান্ধী যখন তা শুনলেন, তাঁদের দু'জনকেই এর জন্যে কড়া ধমক দিলেন,—বললেন (যুক্তিযুক্ত ভাবেই) যে, এই সময়ে প্রশ্নটা সাহিত্য পড়ার নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বার্থে পুরোপুরি আত্মোনিয়োগ করার। দেশাই অবশ্য এই জন্যেই ফরাসী শেখায় ঢিলে

দেননি ঃ কারণ তিনি আমাকে বললেন, আমার মূল লেখা ইংরেজি তর্জমায় কোথায় কতখানি বদলায় তা বিচার করার মতো যথেষ্ট ফরাসী জ্ঞান তাঁর আছে ; আর তিনি আমার কাছে ফরাসী 'জাঁ-ক্রিস্তফ', আর সেই সঙ্গে 'তলস্তয়ের জীবন' চাইলেন ঃ তাঁর ধারণা, ভারতবর্ষে ফিরলে শিগ্গিরই তাঁকে জেলে পুরবে ; তখন তিনি বইগুলো পড়ার সময় পাবেন। আমার প্রতি তাঁর যে সহৃদয় কৃতজ্ঞতা, তা প্রকাশ পেল মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধার ভারতীয় ভঙ্গিতে। তিনি ও প্যারেলাল বহু বছর ধরে এই সাক্ষাতের ব্যাপারে মনমরা হয়ে ছিলেন, আগেই দু'দুবার সাক্ষাৎ হবার কথা হয়েছিল, আর দু'বারই হতে পারেনি ; তিনি বললেন, তার কাছে মনে হয় এ যেন স্বপ্ন – গান্ধীর চারপাশের সবাই খেটে খেটে সারা। গুরু যখন ঘুমোন, দেশাই ও প্যারেলাল প্রায়ই অনেক রাত জেগে থাকেন, দিনের টুকেরাখা সবকিছুর প্রতিলিপি করেন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় ছাপার জন্যে দেশাইকেই সে-সব সম্পাদনা করতে হয়।

বৃহস্পতিবার, ১০ ডিসেম্বর, জেনেভার ভিক্টোরিয়া হলে সভা হলো। গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারিদের নিয়ে আমার বোন চলে গেছে সেই সকালে ঃ কারণ সভা শুরু হবে সাড়ে বারোটায়। মীরা রয়েছে আমার কাছে। সে খেলো, আর একসঙ্গে বসে বেশ আলোচনা করা গেল। (সে দিনটা কাটালো জামাকাপড় কেচে, সেগুলো বাগানে দড়িতে মেলে দিল, যাত্রার জন্যে বাক্সপ্যাঁটরা গোছালো।)

সে আমাকে অন্তরঙ্গভাবে সবরমতী আশ্রমের জীবনের কথা বলতে লাগল। গান্ধীকে যারা ঘিরে আছে, তাদের সকলের মতোই গান্ধীর প্রতি তার আবেগভরা শ্রদ্ধা। সে বলল ঃ কিন্তু এই কুসুমকোমল মানুষটি বজ্রাদপি কঠোরও হতে পারেন, বিশেষ ক'রে হন, যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের প্রতি। তারা তাঁর বেশী প্রিয় বলেই তাদের কাছে দাবিও অনেক বেশী। তাদের উপর তাঁর কড়া নিয়ন্ত্রণ, তাদের কথা ও কাজের বাইরে তা তাদের চিন্তাতেও বিস্তৃত। তিনি সবচেয়ে আরও নির্মম তাদের কুচিন্তার ক্ষেত্রে ; আর তা তাঁর কাছে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না ঃ তিনি মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন, বলার আগেই যেন মনের ভিতর থেকে টেনে বার করেন। সবাই ভয় পায় ; কিন্তু সবাই তা মন থেকেও চায় ; এই যে অদম্য শৃঙ্খলা তাদের নিজেদের উপরে চাপাতে বাধ্য করা-হয়, এ তাদের পক্ষে উপকারক হয়ে ওঠে। আশ্রমে অসুবিধাও কম নেই, সেখানে এতো লোক, এতো স্বতন্ত্র পরিবার একত্র হয়েছে। সবসময়ে গুঁতোগুঁতি, খুটোখুটি লেগেই আছে, যা একমাত্র "বাপুর" দৃঢ় ও শান্ত কর্তৃত্বই ঠান্ডা করতে, মানুষের যোগ্য ক'রে তুলতে পারে। তাছাড়া, সকলেই স্বীকৃত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ; আর আশ্রমের সাধারণ আবহাওয়ার পবিত্রতার তুলনা নেই। গান্ধীর পরিবার সম্পর্কে সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। চারটি ছেলের মধ্যে একটি সরাসরি বিগড়ে গেছে। অন্যটি দেবদাস, যে এখানে আছে, ভালো ছেলে, কিন্তু অত্যন্ত লঘুচিত্ত, বাবার ব্রতের গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তৃতীয়টি এখনো খুব ছোটো। চতুর্থটি (এটি বড়ো না মেজো ?) দক্ষিণ আফ্রিকার ফনিক্সে গান্ধীর আদর্শে বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করছে ; কিন্তু

সেও উচ্চস্তরের ব'লে মনে হয় না। শ্রীমতী গান্ধী সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু কখনো পুরোপুরি তাঁর কাজে অংশ নেন নি, (অবশ্য, কয়েক মাস ধরে মনে হচ্ছে তিনি যেন অসহযোগের প্রচারে যোগ দিচ্ছেন, যেমন দু'তিনটি সভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন,—তাঁর পক্ষে যা প্রায় অবিশ্বাস্য)। সবার আগে তিনি অন্তঃপুরের রমণী, আশ্রমের এই প্রকাশ্য জীবনে সান্ত্বনা পান না, সেখানে সব কিছুই সবার জন্যে খোলা। (দিন রাত গান্ধীকে সেখানে মহারাজার চেয়ে কম দেখায় না ; কিন্তু তিনি এর কিছুই জাহির করেন না ; দেখান যেন একলাই আছেন। কখনো কখনো মীরা তাঁকে প্রশ্ন করেছে, এই একটানা ভিড়ের মধ্যে তিনি ধ্যানের সময় কোথায় পান। তিনি উত্তর দিয়েছেন, ধ্যানের,—শতাবধি শ্রোতার মধ্যে বসে তা অভ্যাসের—এইটেই শ্রেষ্ঠ স্থান, আর তিনি তা পুরোপুরি করতে শিখেছেন।) তাই সান্ত্বনার অভাবে শ্রীমতী গান্ধী রান্নাঘরে নিজেকে আটকে রাখেন ; মনে করেন, অন্তত সেখানে তাঁর রাজত্ব। বিদেশী মহিলাদের আসাটা তিনি সুনজরে দেখেন না ; তাঁর পাশে মীরার গোড়ার দিকটা কষ্টসাধ্য ছিল। নিজের রান্না করতে মীরা যখন রান্নাঘরে আসতো, তিনি তার জন্যে কায়দা ক'রে এমন সবকিছু ফেলে রাখতেন যাতে তার মন খারাপ হয়, আর সে আশ্রম ছেড়ে পালায়। এমন হয়েছিল যে গান্ধীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ; অবশেষে গান্ধী মীরাকে বলেনঃ "এটা অসহ্য। তোমার ঘরের মধ্যেই এক পাশে রান্নার জায়গা করো !" কিন্তু মীরা কোন আক্রোশ (rancune) পুষে রাখে নি ; সে বলে, শ্রীমতী গান্ধীর উপর রাগ ক'রে থাকা অসম্ভবঃ তিনি একটা শিশু। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর মেজাজ পাল্টায় ; সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেওয়ার পর হঠাৎ ইচ্ছের পেয়ে বসে সবকিছু চালাবার, ধমকাধমকি করার। তাঁকে খুশিমতো বলতে দেওয়া হয় ; আর খেয়ালটা যেমন আসে তেমনই চলে যায়। তিনি কম বিশিষ্টা, কম শ্রদ্ধেয়া রমণী নন ; এখন যখন তিনি মীরার আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এক সঙ্গে তাঁরা ভাব ক'রে ফেলেছেন। মীরাকে আশ্রমের সব কাজই করতে হয়েছে, শুরু হয়েছে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজঃ পায়খানা পরিষ্কার করা দিয়ে (সে বলল, কাজটা সামান্য নয়)। সবসময়ে এই কাজ দিয়েই গান্ধী শিষ্যদের পরীক্ষা শুরু করেন ; প্যারেলালকেও এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মীরার আবেগবিহ্বল মমতা (affection) সম্পর্কেও গান্ধী কঠোরভাবে সজাগ ছিলেন, মাসের পর মাস দূরে থাকতে আর কঠিন কাজ করতে তাকে বাধ্য করেছেন। প্রায়ই একলা সে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছে, চাষীদের তুলো পেঁজা বা বোনার নিয়মকানুন শিখিয়েছে। যা আশ্চর্য তা এই যে, একদিন, একঘন্টার জন্যেও কখনো তার উদ্বেগ, বিরক্তি হয়নি বা মন-কেমন করেনি। তার কাছে ধরা পড়েছে যে, ভারতবর্ষই আগে-থেকে-নির্দিষ্ট-করা তার দেশ। (সবাই জানে, এই ব্যাপারটাকে সে তার জন্মসূত্রের উপরে চাপায় ; ইংরেজের সঙ্গে রাশিয়ায় তার এক জিপ্সি প্রপিতামহীর বিয়ের মধ্যে দিয়ে সেই সূত্র পৌঁছোয় এই অদ্ভুত জিপ্সি জাতে, যাদের মূল বাসস্থান ভারতবর্ষেই ছিল ব'লে মনে হয়।)

ভারতীয় চাষীদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের চাষীদের মধ্যে, সবসময়েই মনে হয় সে যেন নিজের ঘরে আছে ; এই মানুষগুলোর ভদ্রতা, তাদের হৃদয়ের বিশিষ্টতা, সংসারের একজনের মতোই সমান চোখে দেখে তার সঙ্গে তাদের যে ত্রুটিহীন অন্তরঙ্গতা – তার প্রশংসার ভাষা তার জানা নেই ; আর এই নিরক্ষর মানুষগুলো অপূর্ব কাব্যিক গানে ভরপুর, সেইসব গানে কতো শতাব্দীর প্রাজ্ঞতা বিধৃত ! মীরার কথায় মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি কম, সে তাদের দেখে (অন্যে যাই বলুক) বেশ স্বতন্ত্র জাত ব'লে, এমন কি তাদের দেহ-বৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র ; গান্ধীর মতোই তার সেখানে অনেক ভালো মুসলমান বন্ধু আছেন, কিন্তু সাধারণভাবে আবহাওয়াটা কম নিশ্চিত ও কম পবিত্র। মীরা আবার ফিরে গেলো আশ্রমের বাসিন্দাদের প্রসঙ্গে, বাসিন্দারা মানুষের মধ্যেই মাত্র সীমাবদ্ধ নয় ; সেখানে জঙ্গলের সকলেরই প্রবেশাধিকার। আর যখন সে দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করতে লাগলো, মনে হলো যেন চোখের সামনে শকুন্তলার তপোবন দেখছি ! কোনো প্রাণী, কোনো কীটকে মারা চলবে না, তাই তারা চারপাশে, আশ্রমের ভিতরে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। মীরার ঘরের মধ্যে সবরকম আকারের পিঁপড়ে সার বেঁধে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তার সঙ্গেই খাবারের ভাগ বসাচ্ছে ; টিকটিকি আর বড়ো বড়ো মাকড়সা দেয়ালে ছুটে বেড়াচ্ছে ; সর্বত্র সাপ ঘুরে বেড়ায় ; তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অত্যন্ত বিষাক্ত। কিন্তু মনে হয় যেন জন্তু ও মানুষের মধ্যে এক গোপন চুক্তি আছে ; তারা জানে মানুষ তাদের কোনো ক্ষতি করবে না, আর তারাও মানুষের কোনো ক্ষতি করবে না। অজান্তে সাপের ঘাড়ে পা দিয়ে ফেলার আশংকা সবসময়ে থাকে ; আর সেও অধৈর্যের মুহূর্তে তার মারাত্মক অসন্তোষের প্রমাণ দিয়ে ফেলতে পারে। মীরাও তাই রাত্রে ঘুরতে সবসময়ে লণ্ঠন হাতে নেয়। প্রায়ই তার দরজার সামনে মারাত্মক জাতের একটা সাপ লম্বা হয়ে থাকতো, কিন্তু সেটা কখনো তাকে কিছু করেনি, আর দুর্ঘটনাও ঘটে খুব কম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সতর্কতা হিসেবে গান্ধী তাঁর আশ্রমের দাওয়াইখানায় সাপের বিষের প্রতিষেধক সিরামের ব্যবস্থা করেছেন কিনা। মীরা বললো, না ; যদিও গান্ধী আশ্রমের অন্যদের, বা বিদেশীদের এই ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন নি। নিজে তিনি যা সুপারিশ করেন তা ক্ষতস্থানে ছোট্ট একটু অস্ত্রোপচার - আড়াআড়ি একটু বড়ো ক'রে কেটে, সেখানে একটা ওষুধ লাগানো (মীরা ওষুধটার নাম বলে নি ঃ একটা লাল মতো জিনিস), তার উপরে মাটির প্রলেপ ও একটা ব্যান্ডেজ। কিন্তু মীরা একথাও বললো যে, কোনো কোনো জাতের সাপের পক্ষে (নিঃসন্দেহে গোখরো) ওটা যথেষ্ট কার্যকরী নয়, সে-সব সাপের কামড়ে দশ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। এতে তার উদ্বেগ আছে ব'লে মনে হলো না, কিন্তু মনে হয়, সে গান্ধীর অন্যান্য শিষ্যদের মতোই বলে ঃ "সবই ঈশ্বরের কৃপা ! আর সবই তাঁর রক্ষায়। যা হয়, সবই তাঁর ইচ্ছা।"

জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে এই যৌথ জীবনের অন্যান্য দিকগুলো যা আমাদের কাছে বড়োই কৌতুকজনক, তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে পাখিদের আত্মীয়তা। তারা সবসময়ে গান্ধী বা মীরার কাঁধে, মাথায় বসছে, আর তারা চমৎকার সব জাতের। মীরা অতি

সরলভাবে এই মর্মস্পর্শী মন্তব্যটি করলো যে, ইউরোপে ফিরে আসার পর থেকে কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর অভাবে (বিশেষ ক'রে বড়ো বড়ো শহরে) তার বুকের ভিতরটা ঠান্ডা মেরে যাচ্ছে, বুকটা খালি খালি লাগছে; তার মনে হয়, ইউরোপের উপর দিয়ে এক বিরাট মহামারী চলে গিয়েছিল, যে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণী পৃথিবীকে প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর ক'রে রাখতো, তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল। (আমি তাকে বলতে ভুলে গেছি, এখানে আমার বাড়ির দেয়াল ও ছাদে লক্ষ লক্ষ উঁইয়ের বাসা ছিল, তারা বাড়িটাকে প্রায় খেয়ে ফেলেছিল; যদি গত বছর কড়িকাঠগুলো না বদলানো হতো, তাহলে আমার মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়তো।) সে যাই হোক্, ভারতবর্ষে ফিরবে বলে মীরার আনন্দ। ইংলন্ডে ফিরলে, (মা মারা গেছেন কয়েক মাস হলো, —একা, তার থেকে দূরে) আকর্ষণ জেগে ওঠার বদলে, ভীষণভাবে মনে হয়েছে তার জন্মভূমি তার কাছে কতখানি বিদেশ হয়ে গেছে। গোপন উদ্বেগ জেগেছিল এখানেই না থেকে যেতে হয়, এখানেই না মরতে হয়। আমাদের পরস্পরের পরিচয়ের প্রথম দিন-গুলোর কথায়, আমারই মাধ্যমে সে গান্ধীকে আবিষ্কার করেছিল, সেইসব কথায় ফিরে গেলাম। আমার সম্পর্কে তার মনে কোমলতা-মাখা এক গভীর কৃতজ্ঞতা; আর অবশেষে—(খবর এলো গান্ধী ফিরে এসেছেন), যখন সে বিদায় নিল, আমার কাঁধে তার কপাল রেখে, আমার আপত্তি সত্ত্বেও, সে আমার হাত চুমু খেলো। (আমি জানি এ আমার উদ্দেশে নয়, তার পথ ও তার গুরু খুঁজে দিতে আমি যে দৈবের নিমিত্ত হয়েছি, এ তারই উদ্দেশে।)

সেই সময়ে মিটিং চলছিল জেনেভায়। ভিক্টোরিয়া হলে বিপুল জনতা। জেনেভার বড়ো বড়ো ধনী (শত্রুভাবাপন্ন), 'জুর্নাল দ্য জেনেভ' ও 'লিগ অফ নেশনস' সামনের সারিগুলো দখল করেছিল। নিচের সারিগুলোয় ও হলের মধ্যে উৎসাহী শ্রোতা ও সমাজতন্ত্রীরা গিসগিস করছিল। দুই শিবির মুখোমুখি; প্রতিপক্ষ ওঁৎ পেতে ছিল, ফাঁদ পেতে ছিলঃ চিরাচরিত সহজ ও শান্ত ভাবে গান্ধী তাদের বাছা বাছা প্রশ্নের চাঁচাছোলা, বসিয়ে-দেওয়া জবাব দিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সভার কোনো বৃত্তান্ত মোটেই দেবো না,* এটায় আমি যাইনি, এমনকি রেডিওতেও শুনিনি; কারণ, এবারে সুইস রেডিও বন্ধ ছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল, লোজানের সভার রেডিও-প্রচারে কিছু কিছু বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটায় এই সভার রেডিও-প্রচার হবে না। স্পষ্টতই এটা 'জুর্নাল দ্য জেনেভ'-এর দাবি। কিন্তু সুইস বুর্জোয়ারা যদি ভেবে থাকে এই পন্থাতেই গান্ধীর বিপজ্জনক কণ্ঠকে রোধ করা যাবে, তাহলে তারা ভুল করছে; আর লোজানের পরেও গান্ধী জেনেভায় এমন প্রকাশ্য অবিচলিত স্পর্ধার বাণী শোনাবেন এবং হাজার হাজার লোক যারা শুনেছে, তাদের মধ্যে তা এমন সাড়া জাগাবে—এ তারা আগে বুঝে উঠতে পারে নি। (জেনেভায় গান্ধীকে বলার অনুমতি দেবার জন্যে পরে নিশ্চয়ই তারা হাত কামড়েছে।) তাই তিনি কী বলেছেন, সে-সব এখানে দেবার চেষ্টা করবো নাঃ কারণ যারা এই সভার আয়োজন করেছিল সেই

---

* বিবরণ প্রকাশিত হয় 'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে মহিলা আন্তর্জাতিক লিগের' পত্রিকায়, জানুয়ারি, ১৯৩২, জেনেভা।

'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য মহিলা আন্তর্জাতিক লিগ' এর প্রতিলিপি করিয়ে রাখার ঠিক ঠিক উদ্যোগ নিয়েছে ; আমি তার একটি কপি জোগাড় ক'রে নেবো।

আমার বোন যা বলেছে, সেইমত যা ধারণা হয়েছে, তাই শুধু এখানে লিখে রাখবো। ভূমিকা না ক'রে গান্ধী সামনাসামনি নেমে পড়লেন ধনতন্ত্রবাদ ও সমরবাদ —এই দুটি জলন্ত প্রশ্ন নিয়ে ; তা টেনে আনলেন সেই প্রসঙ্গ, যাকে সুইস বুর্জোয়ারা নিরপেক্ষ ও যুদ্ধ-সজ্জিত জাতির "পবিত্র অলঙ্ঘনীয়" ("মৃগয়া ক্ষেত্র") ব'লে চালাবার চেষ্টা করে। একদিকে, — তিনি বললেন, শ্রমিকশ্রেণী তার শক্তিকে জানেনি ; যদি জানতো, গোটা ধনতন্ত্র ও তার উপরে গড়া দুনিয়া উল্টে দেবার পক্ষে সে উঠে দাঁড়ালেই যথেষ্ট হতো ; কারণ দুনিয়ায় একমাত্র সে-ই প্রকৃত শক্তি। অন্যদিকে, তিনি বললেন, সবরকম সমরবাদ, সবরকম সমরবাহিনীই নিন্দনীয়, অন্যের চেয়ে তা আরও বেশি নিন্দনীয় তার ক্ষেত্রে, যে বলে সে নিরপেক্ষ, অন্য দেশ আক্রমণের চিন্তা যে করে না। ফাঁদে ফেলার জন্যে যখন প্রশ্ন করা হলো : "যদি কোনো বিদেশী সৈন্যবাহিনী অন্য দেশকে আক্রমণের জন্যে সুইজারল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে নিজের সৈন্যবাহিনী খাড়া ক'রে তাকে বাধা দেওয়াটা কি সুইজারল্যান্ডের কর্তব্য হবে না ?" তিনি উত্তর দিলেন : "নিশ্চয়ই আপনাদের কর্তব্য হবে তাকে বাধা দেওয়া। কিন্তু তাকে রোখার একমাত্র সত্য পন্থা হবে আপনাদের জাতির নিরস্ত্র পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রাচীর খাড়া ক'রে। তাদের মাড়িয়ে যেতে কোনো সৈন্যবাহিনীর সাহস হবে না। আর যদি একবার করে, দ্বিতীয়বার করবে না ; কারণ জগতের জাগ্রত বিবেক তাকে পযুর্দস্ত করবে : এইভাবে আপনাদের আত্মত্যাগের ফল পাবেন।"

'লিগ অফ নেশনস'-এর কথাও বললেন অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্যে (যেন তিনি এর অস্তিত্বেরই কথাই জানেন না) ; তার জায়গায় তিনি সুপারিশ করলেন 'ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস'-এর মতো প্রতিষ্ঠানের, তা হবে সেরেজোলের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আরও সম্পূর্ণ, তা বিশ্বের সমস্ত দুর্দশার দিকে নজর দেবে।

হলের একাংশ ফাঁদে-ফেলা প্রশ্নগুলোর সময় হাততালি দিয়ে উল্লাস জানিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীর শান্ত ও অকাট্য উত্তরে অন্য অংশের উল্লাসধ্বনিতে তার পাল্টা দেওয়া হলো। শত্রুভাবের কোনো চিহ্ন প্রকাশ্য হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। কিন্তু জেনেভার বড়ো বড়ো বুর্জোয়া বেরিয়ে এসেছিল অবর্ণনীয় ক্রুদ্ধ অবস্থায় ; এবং তার অনেক প্রতিধ্বনি কানে এসেছে। এটা খুবই সুখের বিষয় যে, গান্ধীর সুইজারল্যান্ড ছেড়ে যাবার আগের দিন সভাটা হয়েছে। এটাই সম্ভব ছিল যে, এখানে তাঁর থাকার মেয়াদ বাড়ালে, তাঁকে বহিষ্কারের জন্যে দাবি উঠতো। যাই হোক না কেন, তাঁর অন্য প্রকাশ্য সভা নিষিদ্ধ হতোই। পরদিন ফরাসী ভাষার সংবাদপত্রগুলো ভয়ংকর সব সম্পাদকীয় লিখল। তখনো পর্যন্ত 'ল্য কুরুয়ে দ্য ম্যঁদ্র' তাঁর সঙ্গে, সেইসঙ্গে আমার সঙ্গেও, মানিয়ে চলার কথাটাই ভাবছিল, সে তার প্রথম সম্পাদকীয়তে লিখল যে, গত পাঁচ দিনে সুইজারল্যান্ডে গান্ধী যা কিছু করলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তিনি সুইজারল্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছেন। আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো যে,

অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে (কেন নয়?) তিনি অন্যের যন্ত্র হয়েছেন, সুইজ্যারল্যাণ্ডে তিনি এসেছেন তাকে নিরস্ত্র ও ধ্বংস করতে, যাতে পরিণামে নিরস্ত্র জাতিকে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের মুখে ফেলে দেওয়া যায়। গান্ধী "বলশেভিক রম্যাঁ রলাঁর" বাড়িতে উঠেছেন। এই ঘটনার মধ্যে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কৌশলের আরোও একটি প্রমাণ খুঁজে পেতে দেরি হলো না।

এই বক্তৃতার সময়টুকুই শুধু গান্ধী জেনেভায় ছিলেন। কারুর সঙ্গে কথা না ব'লে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আলবের তমা (Albert Thomas) ও গুগ্লিয়েলমো ফের্‌রেরো (জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) কথা বলার স্থান ও সময় জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন; ওঁদের দু'জনের অনুরোধের উত্তরে কোনোরকম ভনিতা না-করেই বলে দিয়েছিলেন,—ফের্‌রেরো দেখা করতে পারেন গ্ল্যাঁ ও লোজানের মাঝখানে ট্রেনে, আর আলবের তমা লোজান ও মঁত্র্য-র মাঝখানে। ফের্‌রেরো (ও তাঁর স্ত্রী জিনা ফের্‌রেরো-লমরসো) বয়স্ক ও সম্মানিত, এতে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন; প্রিভার মৃদু আপত্তির উত্তরে গান্ধী নির্বিকার ভাব দেখিয়েছেন; প্রকৃত পক্ষে, তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে আসেননি; কিন্তু শ্রীমতী জিনা ফের্‌রেরো কয়েকদিন পরে আমাকে একটা চিঠিতে মার্জনা চেয়েছেন এই ব'লে যে, গান্ধীর চলে যাবার পরই শুধু সম্মতির কথা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে। আর আলবের তমা তো বৃথাই স্টেশনে দেখা করবার চেষ্টা করেছেন, কাঁদো-কাঁদো হয়ে তিনি আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন, ভিলন্যভে সন্ধ্যার সময় দেখা করার প্রার্থনা জানিয়ে: তাতে গান্ধীর অনুপস্থিতিতে আমি নিজের দায়িত্বেই সম্মতি দিয়েছি। পরে গান্ধী লণ্ডনে ও মীরা আমাকে যে গল্প করেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা লিখে রাখাটা দোষের নয়। তমা দেখা করতে এলে গান্ধী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "সুইজারল্যাণ্ডে রম্যাঁ রলাঁর কাছে যান কি?" বিব্রত তমা উত্তর দিয়েছিলেন: "না।" গান্ধী বলেছিলেন: "ইস! এ তো আমি পছন্দ করি না!...না না, একেবারেই পছন্দ করি না!..." দর্শনপ্রার্থীকে এইভাবে বারবার ব'লে বিব্রত ক'রে গান্ধী মজা দেখেছিলেন; আবার বলেছিলেন: "আমি চাই যে আপনি ভিলন্যভে যাবেন রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে।" (আমাকে বলতে বলতে গান্ধী দুষ্টুমির হাসি হাসলেন। সত্যি বলতে, তমা দেখা করুন, এতে আমারই কোনো আগ্রহ নেই...)

ফিরতে না ফিরতেই (ফিরেছেন চিরাচরিত ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে) গান্ধী বিশ্রামের জন্যে সময় নষ্ট না ক'রে আমার এখানে চলে এলেন; পোনে পাঁচটা থেকে ছটা বাজার পর পর্যন্ত আমরা নতুন আলোচনায় বসলাম।

আমি তাঁকে বললাম: "লোজানে এক প্রশ্নের উত্তরে আপনার: 'সত্যই ঈশ্বর' কথাটি নিয়ে ভাবছি; যা কিছু আপনি লিখেছেন ও বলেছেন—যা শিশুকাল থেকে আপনার কাছে এক স্বাভাবিক বোধ হয়ে আছে (পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহ ও অহিংসা তা নয়!...),—তা নিয়েও ভেবেছি। আমি আমার বিবেকের পরীক্ষা করেছি। শিশুকাল থেকেই আমি আমার নিজের মধ্যে জেনেছি যে, নিজের সম্পর্কে সত্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, এ না থাকলে সব নষ্ট হয়ে যায়, তার উপরে কোনো কিছু

গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু সত্য যেমন নিজের সম্পর্কে, সত্য তেমনি অপরের সম্পর্কেও। প্রাদেশিক ছোট্ট শহরের যে দম-আটকানো আবহাওয়ায় আমি বাস করতাম, সেখানে এই দ্বিতীয় সত্যটি প্রকাশ করা আমার কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হতো, সর্বত্র পীড়াদায়ক জবরদস্তি,—পরিবারের, গীর্জার, ইস্কুলের, সমাজের জবরদস্তি। আমি ছিলাম শারীরিক দিক থেকে দুর্বল একটা ছোটো ছেলে, এতে যন্ত্রণা বোধ করতাম; কিন্তু অন্য সবাই এ মেনে নিতো ব'লে, আমি বিশ্বাস করতে চেষ্টা করতাম যে, এটা এইরকমই। আমাকে যে ধর্মীয় অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার শেখানো হতো তা বিশ্বাস করতে না-পারার জন্যে কষ্ট পেতাম; দেখতে পেতাম অন্যেরা বিশ্বাস করছে, আর কল্পনা করতে পারতাম না যে, তারা মিথ্যে বলছে (বা নিজেদের ধাপ্পা দিচ্ছে)। ১৪-১৫ বছরের সময় পারীতে অবস্থা দাঁড়ালো আরও বেশী খারাপ ঃ সেখানে লড়াই জীবনের সঙ্গে, পরীক্ষার সঙ্গে, ইস্কুলের সঙ্গে ঃ এমনকি বুদ্ধিগত ব্যাপারেও বহু ক্ষেত্রে সেখানে সত্যচিন্তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তখন সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এক সরকারী আধ্যাত্মিকতার রাজত্ব ছিল, পরীক্ষাগুলোতেও তা মেনে চলার ভান করতে হতো। আমি ভালোবাসতাম দর্শন, ইচ্ছে ছিল তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেবো; কিন্তু 'একল নর্মাল স্যুপেরীয়র'-এ আমি সে ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিলাম, এই জন্যে যে, রচনায় ও বক্তব্যে আমাকে মিথ্যে বলতেই হতো—যা আমি পারতাম না।* অবশেষে আমি যখন স্বাধীন হতে শুরু করলাম, (সে-স্বাধীনতা আমি চড়াদরে কিনেছি, প্রায় বারো বছরের এক পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার দামে), তখন এক নতুন যে-বিপত্তির সামনে এসে দাঁড়ালাম, তা অন্যগুলোর চেয়েও খারাপ ঃ আমি দেখলাম, যে-সত্য আমার কাছে মঙ্গল ও প্রয়োজনীয়, তাই বহুর ক্ষেত্রে অমঙ্গল করতে পারে। আর এটাই ছিল আমার সব চেয়ে বড়ো বিপত্তি। পরে দেখেছি যে তলস্তয়ও এ জানতেন, এবং এ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। সারাজীবন তিনি সত্য ও প্রেমের মধ্যে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়েছেন ঃ কখনো এই দুয়ের ভারসাম্য ঘটাতে পারেননি ঃ আর প্রায়শই তাঁর ভাবপ্রবণ স্বভাব (বিশেষ ক'রে তাঁর জীবনে) সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে তাঁকে আধাআধি টেনে নিয়ে গিয়েছে। আমার ক্ষেত্রে আমি শিল্পগত এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছি ঃ আমি যাকে সত্য ব'লে বুঝেছি, তাকে পৌরুষের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানোর পক্ষে যারা বড়োই দুর্বল, তাদের আঘাত না-ক'রে বা তাদের উন্মাদ না-ক'রে, কেমন ক'রে তাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারি? প্রাচীনেরা এটা করতেন খুব সহজে, তাঁরা দীক্ষিতদের শ্রেণী তৈরি করতেন, তাঁরাই হতেন পরিপূর্ণ সত্যের একমাত্র ভাণ্ডারী। কিন্তু আজকের গণতান্ত্রিক সমাজে এমনধারা শ্রেণীবিভাগ চলে না। আমি কখনো আমার সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি; আর, এ যাতে বিপজ্জনক না-হয়—আমার এই শংকা, আংশিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে আমার এই আবিষ্কারে যে, 'অপ্রিয়' সত্য লোকে বোঝে না বা শোনে না ঃ লোকে যে

---

* একল নর্মাল সুপেরিয়র'-এর পরীক্ষায় রলাঁ দু'বার (১৮৮৪, ১৮৮৫) ফেল করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ "যে সময়টা আমি সেকস্‌পিয়র ও উগোকে নিয়ে নষ্ট করেনি, তা আমার জীবনে যোগ হয়েছে।" অনু.

যার মতো ক'রে নেয়। কিন্তু এই আবিষ্কারের মধ্যে আনন্দ নেই। আর যে বলে তার দ্বারা যদি নাও হয়, যারা শোনে (বা শোনে না) তাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা-করা এই রকম সত্যেও আনন্দ নেই। এটা যদি সত্য হয় যে 'সত্যই ঈশ্বর,' তাহলে মনে হয়, ঈশ্বরের একটা অতি-বিশিষ্ট গুণ আনন্দেরই তাতে অভাব ঘটে। কারণ—এবং আমি জোর দিয়ে বলবো—আনন্দবর্জিত কোনো ঈশ্বরের কল্পনা আমি করতে পারি না। আমি বিঠোভেনে 'দুঃখের মধ্যে দিয়ে আনন্দ'কে (Durch Leiden Freude) বড়ো ক'রে দেখিয়েছি, তাতে যদি কেউ আমাকে দুঃখের বাণীপ্রচারক ব'লে মনে করে, তাহলে আমার ও বিঠোভেনের চিন্তাকে ভুল বুঝবে : দুঃখ লক্ষ্য হতে পারে না, সেটা শুধু একটা পথ ; আর সেই পথটা চেপে বসে আছে, তা খুঁজে নিতে হয় না। যে আনন্দকে সত্য আমার কাছে প্রমাণ করতে পারেনি, তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি সৌন্দর্যের মধ্যে। আর এইখানে দেখি তলস্তয়ের সঙ্গে আমার বিরোধ : আমি সুস্থ সৌন্দর্যের উপরে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করি। আমি বুঝি : সত্য আর্ট ও সুস্থ সৌন্দর্য। মহৎ আর্টের সারবস্তু হচ্ছে সামঞ্জস্য ; মহৎ আর্ট দেয় শান্তি, স্বাস্থ্য, চিত্তের ভারসাম্য। একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে আর্ট এদের জানান দেয় : কারণ এদের উভয়েরই আনন্দের অধিকার আছে। সৌন্দর্যের প্রকাশ বহুবিধ রূপে : সুন্দর রেখায়, সুন্দর শব্দে, বর্ণে ইত্যাদিতে। সব কিছুর গভীরেই আন্তর শৃঙ্খলা, গোপন সামঞ্জস্য, যার সারবস্তু হচ্ছে নৈতিক। এরই মধ্যে দিয়ে চিত্ত পরিস্রুত হয়, উন্নীত হয়। আর্ট হাজার হাজার চিত্তের আহার। বিশেষ ক'রে কোনো কোনো অতি-পরিশীলিত জাতি (প্রকৃতি বা আর্টের) সৌন্দর্যের অভাবে রিক্ত হয়ে পড়বে। যে সব বিভিন্ন পথ সামঞ্জস্য, ও শান্তিতে গিয়ে পৌঁছোয়, তারা সবই ভালো। কোনো পথই বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, আর সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তারা পরস্পর যুক্ত হতে পারে : ঐতিহাসিক ভাবে এইটেই হয়ে থাকে জাতির মহান্ মুহূর্তে, তখন আন্তর শক্তিগুলো একই সঙ্গমে এসে মেলে : গোটা জাতির জন্যে একসঙ্গে মেলে ধর্মের গ্রন্থ, সৌন্দর্যের গ্রন্থ, স্বপ্নের গ্রন্থ।"

(আমার এই পুরো বিবৃতির দুটি অপ্রত্যাশিত লক্ষ্য : যন্ত্রণা ঈশ্বরের তুষ্টিকর—গান্ধীর নামে চালানো এই চিন্তাটিকে একদিকে আক্রমণ করা, আর অন্যদিকে সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক সমুচ্চ প্রেমের অধিকারকে তুলে ধরা ; কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে, গান্ধীর চিন্তায় এই অধিকারকে উপেক্ষা করা হয় ; তুলে ধরা যে, সুস্থ মানুষেরা সৌন্দর্যের পক্ষে।)

গান্ধী উত্তরে বললেন : "আমার কাছে সত্যের সংজ্ঞা বিশ্বজনীন। সত্য অনেক রূপে প্রকাশ পেতে পারে। যে আর্ট সত্যের সঙ্গে 'বেমানান' (সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়) তা আর্ট নয়। আমি আর্টকে সত্য থেকে পৃথক কোনো বস্তু ব লে শ্রেণীভাগ করছি না। 'আর্টের জন্যে আর্ট'—এই নীতির আমি বিরোধী। আমার কাছে আর্টের ভিত্তি সত্যের উপরে হতেই হবে। যে সব ভালো ভালো জিনিস আর্টের নামে চলে, তারা সত্যকে প্রকাশ করার বদলে যদি অসত্যকে প্রকাশ করে, আমি তাদের বাতিল ক'রে দিই। আমি এই নীতিকে বিশ্বাস করি : 'আর্ট আনন্দ দেয় ও 'মঙ্গল'

করে'—কিন্তু যে-শর্তের কথা বলেছি, সেই শর্তে। আর্টে সত্যের কথা বলতে আমি একথা বলছি না যে, আর্ট হবে বাহ্যিক বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ। তা হবে জীবন্ত বস্তু যা চিত্তে আনবে জীবন্ত আনন্দ, তাকে অবশ্যই চিত্তকে উন্নীত করতে হবে। কোনো শিল্পকর্ম যদি তা করতে না পারে, তবে তার মূল্য নেই। সত্য যদি আনন্দ না আনে, তাহলে সে-সত্য আপনার ভিতরের জিনিস নয়…"

পরে তিনি সকালে গাওয়া হয় এমন একটা হিন্দু ধর্মগীতের কথা বললেন, এবং বললেন এই গুহ্য মন্ত্রটির কথা: ',সৎ-চিৎ-আনন্দ"। "সৎ": "সত্য"। "চিৎ": "যা বেঁচে থাকে" ("ce qui vit") এবং "সত্যকার জ্ঞান" (সত্যের উপলব্ধিশূন্য জ্ঞান নয়)। "আনন্দ": "অনির্বচনীয় আহ্লাদ"। এই ধারণায় আনন্দ থেকে সত্য অবিচ্ছিন্ন। "তবুও সত্যের অনুসরণে যন্ত্রণাবরণ করতে হবে; কত আশাভঙ্গ, কতো ক্লান্তি, কতো অসংখ্য দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে; কিন্তু সব সত্ত্বেও, তা থেকে আপনি পাবেন আনন্দ ও সুখ। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আছে রিশানন্দের (?) কাহিনী, তিনি ছিলেন মূর্তিমান সত্য; তাঁর যন্ত্রণাময় জীবন এক শাশ্বত আনন্দের জীবন।"

তিনি একটি পারস্য উপাখ্যানও উল্লেখ করলেন. তাতে প্রেমিকা শিরীন সত্যের প্রতিভূ। তার কাছে পৌঁছুতে প্রেমিককে এক অনুপযোগী অস্ত্র দিয়ে পাহাড় কাটতেই হবে; তাতে তার অনেক বছর লাগছে; কিন্তু তার অভিযোগ নেই: চেষ্টাটাই আনন্দ; আর সে জানে যে, সে পরিণামে শিরীনকে পাবে।

রম্যাঁ রলাঁ: "আমি এটা বুঝি, আর এই রকমই ভাবি। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের বিপত্তিগুলোই একমাত্র নয়, যাদের কথা আপনাকে বলেছি; এই সব বিপত্তি আমি মেনে নিই, এঁদের ভালবাসি। আমি অন্য ধরণের যন্ত্রণার কথা ভাবছি, তা হচ্ছে দায়িত্বের যন্ত্রণা। নিজের ক্ষেত্রে যে চিন্তাশীল সত্যকে ভয় পায় না, তিনিই শঙ্কিত হন, যাদের এ বিচলিত করে, তাদের ক্ষেত্রে সত্যের প্রভাবে। কোপারনিকাস থেকে শুরু ক'রে, পরবর্তী চিন্তাবিদদের বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছে। সত্য চিরকাল এগিয়ে চলেছে, আর সবাই তার সঙ্গে চলতে পারে না, হাঁপিয়ে পড়ে, মানসিক যন্ত্রণা পায়। বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই এই সংক্রামিত সত্য প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন। আমি এই যন্ত্রণার কথাই বলছি, নিজের যন্ত্রণার কথা নয়।"

গান্ধী: "তবুও আমি বলবো যে, এর একটা গোপন আনন্দ নিশ্চয় আছে, কেননা এ ওই জিনিসের প্রয়োজন। যাঁরা এই পীড়নের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের লেখায় (কালিদাস?) এইজন্যেই দেখতে পাই, যারা সত্যসন্ধানী তাঁরা 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূসি কুসুমানি চ'।"*

---

* রলাঁ লিখেছেন: 'পদ্মের মতো কোমল ও গ্রানাইটের মতো কঠিন। উদ্ধৃতিচিহ্নও দেননি। কিন্তু এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে গান্ধীজী এই উদ্ধৃতিটিই দিয়ে থাকবেন; কারণ উক্তিটি কালিদাসের ব'লে লেখার সময় রলাঁ অনুমান করেছেন বা প্রশ্ন রাখছেন।—অনু.

আমি গান্ধীকে গ্যায়টের দুটো বক্তব্য পড়ে শোনালাম, তাঁর সঙ্গে এদের মিল আছে ঃ

"উপকারী ভুলের চেয়ে আমি ক্ষতিকারক সত্যকেই পছন্দ করি ঃ হয়তো যে-বেদনার জন্ম দেয়, সত্য তার নিরাময় করে।" (কবিতাবলী)

"ক্ষতিকর সত্য উপকার করে, কারণ এর ক্ষতি সাময়িক, এবং এই সত্য তার পরেই নিয়ে যায় অন্য সব সত্যের দিকে, যারা সবসময়েই উপকারী হয়ে উঠে ; আর উপকারী ভুল ক্ষতিকারক, কারণ এর উপকার সাময়িক এবং এই ভুল বিপথে নিয়ে যায় অন্য সব ভুলের দিকে, যারা সবসময়েই ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।" (মাদাম দ্য স্টেইনকে লেখা, ১৭৮৭)

এবং আমার গ্যয়টে থেকেই ঃ

"নৈতিক সমস্ত বিধি, সমস্ত নির্দেশ গিয়ে মেলে সেই এক ঃ সত্যে।' (ভি মুলেরকে লেখা, ১৮১৯)

গান্ধী শুনলেন, খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন।

র রলাঁ ঃ "আমি আপনার সঙ্গে এক মত ; কিন্তু অমি বলি ঃ 'এ প্রায়ই কঠিন।"

গান্ধী ঃ "এই কঠিনতার মধ্যেই থাকে আনন্দ।"

(মীরা ও দেশাই মুচকি হেসে বোঝাতে চাইলেন যে "বাপু" এই আনন্দেরই অভ্যাস করেন ; এবং গান্ধী হেসে ফেলে স্বীকার করলেন, বললেন যে, একই সঙ্গে তিনি হতে পারেন (তার সম্পর্কে লোকে বলে) ' মেষের মত কোমল" (ভারতবর্ষে "গরুর মতো") ও "বাঘের মতো কঠোর"।

র. রলাঁ ঃ "সব সময়েই আত্মবলি দেওয়ার ব্যাপার আছে। নেতার জন্যে দুঃখ নেই। দুঃখ দুর্বলদের জন্যে, যারা নেতাকে অনুসরণ করে।"

এর পরে আলোচনা করলাম, আর্টে সত্য ও তার বহু রূপ নিয়ে। আমি এই বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আর্টকে পৌঁছুতে হবে সর্বসাধারণের কাছে। আর ক্যাথেড্রালগুলোর কথা বলতে গিয়ে বললাম, সে-যুগে ইউরোপ ভারতবর্ষের চিন্তার অনেক কাছাকাছি ছিল ; গান্ধী সে সম্পর্কে সায় দিলেন। বললাম ঃ "প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকদের হাতেই সেই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ; তাঁরাই মহান্ কবির দল।" এবং আমি সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কারগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম, তারা আমাদের বিশ্বের আবরণ ভেদ করেছে, অন্যান্য বিশ্বের সন্ধান পেয়েছে, যা ছায়াপথের ওপারে ভাসছে।

বছর পঞ্চাশ আগে আমার যৌবনের জড়বাদ বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিজয়কে যুক্ত করতো। আর আজ দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানই জড়কে শক্তির কাছে, তা থেকে এক অধ্যাত্ম-নীতির কাছে, নিয়ে এসেছে। যতো ওলট-পালটই ঘটাক না কেন, আমরা বাস করছি এক মহান যুগে। যারা সুস্থ দেহে ও দৃঢ় মনে বাঁচতে পারবে তারাই সুখী!

গান্ধী সায় দিলেন, তাঁর দুই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর আলতো

ভাবে ছুয়ে যাওয়া হলো বিজ্ঞানের মহিমার উল্টোপিঠ - বিবমিষা-উদ্রেককারী প্রাণঘাতী আবিষ্কারগুলো, মারণাস্ত্র, শ্বাসরোধকারী গ্যাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

গান্ধী (আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে): "এরা সব নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে। যদি এমন যুদ্ধ, এমনধারা ধ্বংস বিনা প্রতিরোধে ঘটে, তাহলে তার পরেই এমন অনুষ্ঠিত আতংকের সামনে পড়ে শুরু হবে পেছনে-হাঁটা। বিনা প্রতিরোধে এগুনো, এবং, এইভাবে বলতে গেলে, শূন্যতার মধ্যে লড়াই করা মনুষের স্বভাবে নেই। হিংসার প্রত্যুত্তর না দিয়ে কোন জাতির যদি সহ্য করার মতো বীরত্ব থাকে, তাহলে তা হবে দেবার মতো সবচেয়ে জোরালো শিক্ষা। কিন্তু তার জন্যে দরকার চরম বিশ্বাস।"

র. রলাঁ: কোন কিছুর আধাআধি করা উচিত নয়, মন্দের ক্ষেত্রেও নয়, ভালোর ক্ষেত্রেও নয়।"

গান্ধী ক্রিস্টোফার কলম্বাসের বিশ্বাসের কথা বললেন। সে-বিশ্বাস না থাকলে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না।···

এক ঘন্টা পরে ভিলা অলগার নিচের বসার ঘরে সন্ধ্যার প্রার্থনা হলো (আমাদের এখানে শেষ প্রার্থনা)। অন্ধকারে গান হওয়ার পর, ছোট জমায়েতটিকে গান্ধী জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরই অনুরোধে আমি উপর তলায় যাচ্ছি তাঁকে বিঠোভেনের একটা অংশ বাজিয়ে শোনাতে, কিন্তু দোতলার ঘরটি খুবই ছোটো বলে তিনি যাচ্ছেন আমার সঙ্গে (আর আমার বোন ও মীরাও যাবে); অন্য সবাই নীচে থাকবেন। তাই হলো। আমি তাঁকে ৫ম সিম্ফনির 'আন্দান্তে' (audante) বাজিয়ে শোনালাম। যা বিঠোভেনের, তার সম্পর্কেই গান্ধী সুস্পষ্ট আগ্রহ দেখালেন, কেননা তিনি জানেন যে, মীরা আর আমার পরিচয়ের মাধ্যম ছিলো বিঠোভেন এবং তারই সূত্রে মীরার জন্যে বিঠোভেনের কাছে তিনি ঋণী। তাছাড়া তাঁর শিষ্য ও সেক্রেটারিরা—বিশেষ করে প্যারেলাল বিঠোভেনের প্রতি ভক্তিতে গদগদ (তাঁরা বড় জোর শুনতে পেরেছেন গ্রামোফোনে, নয়তো পড়েছেন আমার বইতে)। বাজানোর পর, আমি গিয়ে বসলাম যে-ডিভানে গান্ধী বসেছিলেন এবং অল্প কথায় তাঁকে ব্যাখ্যা করলাম চিত্তের সংঘাত ও বিজয়, যা তাঁকে বোঝাবার জন্যে বই থেকে পড়ে শুনিয়েছি। মীরা অত্যন্ত অভিভূত: কারণ ইউরোপকে বিদায় জানাবার পর থেকে সে আর কখনো বিঠোভেন শুনতে পায়নি। (গান্ধীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কেমন লাগলো, একই সঙ্গে একটু দুষ্টুমির অকপট হাসি হেসে তিনি বললেন: "আপনারা যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ভালো হবে!")

তারপরই গান্ধীর অনুরোধে আমি ফিরে গেলাম পিয়ানোর কাছে; আমি 'অর্ফে'-র 'সাঁজে-লিজে'-র দৃশ্য, অর্কেস্ট্রার প্রথম অংশ ও বাঁশির সুর বাজিয়ে শোনালাম। কিন্তু নতুন ক'রে ধরার সময় ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ে প্রিভা এলেন, গান্ধীকে নিয়ে যাবেন ইংরেজি কলেজে (চিলন), সেখানে আধঘন্টার জন্যে বক্তৃতা দিতে গান্ধী রাজী হয়েছেন। সিঁড়ির নিচে তাঁর দেখা হয়েছে আলবের

তমার সঙ্গে এবং তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। আধঘণ্টা পরে গান্ধী ফিরে এলেন (শুনলাম, তরুণ ইংরেজদের সঙ্গে কথাবার্তা খুব ভালো ভাবেই হয়েছে, ছোকরাগুলো গান্ধীকে বুদ্ধিমানের মতোই প্রশ্নাদি করেছে)। ভিলন্যভের ইস্কুলগুলোর ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ের দল আর 'কয়্যার' দল এলো (রাত ৯টার দিকে) ভিলা লিঅনেতের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে তাঁকে 'ভোরাই' শোনাতে। তারা গেয়ে শোনালো সুইস 'রাখালিয়া গান' (Ranz des vaches'), আর মুগ্ধ ভারতীয়দের মনে হলো ওরা বুঝি রাখালই। (আমরা তাদের ভুল ভাঙালাম না; ভিলন্যভের গাইয়েদেরও তা জানতে দিলাম নাঃ তারা জানে না যে ভারতবর্ষে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বর্গীয় রাখাল।)

এদিকে প্যারেলালের সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। ভিলন্যভ থেকে জেনেভা যাবার সময় আমার বোন একই কামরায় ছিল, সে অতিগম্ভীর এই তরুণটির মনে ভরসা জুগিয়েছিল; মন খোলা তাঁর পক্ষে কঠিন, দেখে অনুমান করা কঠিন, কী এক স্পন্দিত ও বেদনার্ত হৃদয় তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন। (বিষণ্ণভাবে তিনি নিজেই বলেছেনঃ "আমি কাউকে কাছে টানতে পারি না, আমি দূরে ঠেলে দিই...")। তিনি এতে এতো কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন যে, আমার বোনকে গোটা জীবনের কাহিনী শুনিয়েছিলেন; এখনও তাই হলো, তিনি খোলা মনে সব বলে গেলেনঃ শৈশবে অতি স্নেহে তাঁকে মানুষ করেছিলেন এক কাকা। যখন তিনি গান্ধীকে দেহমন সমর্পণ করে অনুসরণ করার জন্যে চাকরি-বাকরির আশা জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যৎ চুরমার ক'রে দিলেন, তাঁর কাকার বুক ভেঙে গিয়েছিল। (কিন্তু অনেক বছর দূরে দূরে থাকার পর অবশেষে কাকা বুঝতে পেরেছেন ব'লে আমার বিশ্বাস।) প্যারেলাল আমাকে এও বললেন (আমার বোন তর্জমা করে গেল), আমার বইগুলো তাঁর কাছে কতখানি ছিল। প্রথমে, আমার 'তলস্তয়ের জীবন', তার কয়েকটি বাক্যই তাঁর সবকিছুর নিষ্পত্তি ঘটিয়েছিলঃ তারা ছিল যেন আলোর ঝলক। তারপর, 'জাঁ-ক্রিস্তফ' ও 'বিঠোভেন'। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে, গান্ধীর এই তরুণ শিষ্যদের আর্টের প্রতি কতখানি টানঃ আরও বেশী সুন্দর, আর্টের সমস্ত আনন্দ থেকে নিজেদের এমন বঞ্চিত রাখা; কিন্তু আর্টের শিখা চিরকাল তাঁদের মধ্যে জ্বলছে। এই তরুণদের দেবো ব'লে, আমার লাইব্রেরী থেকে মীরা কয়েক খানা বই বাছাই করলোঃ প্যারেলালকে দিলাম ইংরেজি 'গ্যয়টে ও বিঠোভেন'; দেবদাসকে ইংরেজি 'তলস্তয়ের জীবন'। মীরাকে দিলাম ফরাসী রাজসংস্করণ 'বিঠোভেনঃ সৃজনশীল যুগ'। প্যারেলালের সঙ্গে কথাবার্তার সময় বসেছিলেন তাকাতা, তাঁকে দিলাম নতুন ফরাসী সংস্করণ 'গ্যয়টে ও বিঠোভেন'।

শুক্রবার, ১১ ডিসেম্বর যাবার দিন। ৯টার পর সকাল সকাল গান্ধী এলেন আমার বাড়িতে। প্রীতিপূর্ণ সর্বশেষ আলোচনা হলো; তা দামী ও বিচিত্র।

প্রথমে কথা হলো ইতালি নিয়ে। গান্ধী তার করেছেন স্কার্পাকে, তাতে স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি পুরোপুরি স্বাধীন ভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে তাঁর

মতামত ব্যক্ত করবেন এই শর্তেই শুধু 'ইনস্তিতুতো দি কুলতুরা'-র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। কয়েক ঘণ্টা পরে, যেন আকস্মিকভাবেই, তাঁর কাছে জেন্তিলের তার এসে হাজির (এই সম্মিলনীতে জেন্তিলের সভাপতিত্ব করার কথা); যে দুদিন গান্ধী রোমে থাকবেন ঠিক সেই দুদিন অনিবার্য কারণে তিনি থাকতে পারবেন না ব'লে ক্ষমা চেয়েছেন। ওরা বুঝতে পেরেছে, ফ্যাসিবাদের স্বার্থে গান্ধীর নাম ভাঙানো সম্ভব হবে না, তাঁর কথাবার্তা উপকার করার চেয়ে বেশি বিপদ ঘটাবে।

আমি শেষ করলাম গান্ধীকে ফ্যাসিবাদে আনুগত্যের সেই শপথের কথা জানিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যে-শপথ নিতে ফ্যাসিবাদ বাধ্য করেছে। এবং অধ্যাপকদের মধ্যে জন বারো যে-শপথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছেপেছেন; তাঁরা ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান প্রধাম নাম করা বৈজ্ঞানিক। ভ্যাটিকানের কথাও বললাম, আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গত (jésuitique) কিছু আপত্তি জানিয়ে এখন সেই আনুগত্যের শপথ মেনে নিয়েছে।

তারপরেই আমার বোন অক্সফোর্ডের গল্প করলো, সে অক্সফোর্ডকে ভালো ক'রে জানে, তাকে ভালবাসে। গান্ধী তাঁর অক্সফোর্ড দেখার গল্প করলেন…"চমৎকার তরুণের দল", রক্ষণশীল কিন্তু উদার; তারা তাঁর লড়াইয়ে নিশ্চিত সহায়ক হবে। তিনি বললেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সৌন্দর্য, বাড়িঘর, শিল্প কর্ম তাঁর চোখে ম্লান হয়ে গেছে জগতের শোষণের কথা ভেবে, এই বিকশিত সমৃদ্ধি এসেছে সেখান থেকে।

ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মজুরদের গান্ধীর খুব ভালো লেগেছে, তাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে হয়েছে : "তারা বেশ একটা নিরাসক্তির ভাব দেখিয়ে কথা বলেছে। তারা মনে করতে পারতো যে আমি তাদের শত্রু কারণ আমার অসহযোগের আন্দোলনই তাদের ধ্বংস করেছে। কিন্তু আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছি যে, তাদের ধ্বংসের মূল কারণ ভারতবর্ষের বয়কট নয় : জাগতিক অনেক কারণ। আমরা বিদায় নিয়েছি সম্পূর্ণ হৃদ্যতার সঙ্গে। মালিকরাও ছিলেন 'অত্যন্ত ভদ্র' ('very nice')। সর্বত্র এক বন্ধুত্বের পরিবেশ।

লন্ডনে মিস লেস্টার আমাকে গরীবদের এলাকা, 'বস্তিগুলো' দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই গরীবদেরও তো আমার বিত্তবান মনে হলো; তাদের আসবাবপত্রের দামই হবে ৫০ পাউন্ড (!!) কারুর কারুর পিয়ানোও আছে।" (মিস লেস্টার সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে; তাঁর ব্রিটিশ গর্ব অত্যন্ত প্রবল, তিনি গান্ধীকে প্রকৃত দুর্দশার রূপটি গোপন করেছেন, ঠিক যেমনটি চিকাগোয় 'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে নারী লিগে'র মার্কিন সদস্যরা বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে বহিরাগতদের এলাকাগুলো গোপন রেখেছিলেন, এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ (শ্রীমতী জুভ, শ্রীমতী দুশেন) চোখ এড়িয়ে, তা খুঁজে বার করার জন্যে বেরিয়ে পড়লে, তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছিলেন, যেন আহত হয়েছেন।)

র. রলাঁ : এই 'বস্তিগুলোর' বর্ণনায় আমি বিস্মিত হলাম (কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম না); আমি তার বিপরীতে তুলে ধরলাম, প্যারীর

দুর্দশার রূপটি ; বহু সন্তানের পরিবারদের 'ওভ্রর্ দ্য ম্যুল্যাঁ ভের্' যে সাহায্য করে, এ সম্পর্কে তাদের যথাযথ ছাপা বিবরণ তুলে ধরলাম। ভীতিকর লক্ষণগুলো উল্লেখ করলাম। কয়েক বছর আগে পারীর শহরতলিতে এক তরুণ প্রোটেস্টান্ট ছাত্র অদক্ষ শ্রমিকদের সম্পর্কে এক সমীক্ষা করেছিল, ছ'মাস তাদের সঙ্গেই থেকেছিল, তার সমীক্ষা তথ্যও কাজে লাগালাম। দেখালাম, দুর্দশার অতলতা কতখানি, এর চেয়েও অতলে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের নামা সম্ভব ব'লে তো আমার বিশ্বাস হয় না।

গান্ধী ওয়েলসের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করলেন, তাঁর কাছে অবস্থা খুবই খারাপ মনে হয়েছে।

রম্যাঁ রল্যাঁ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ও সেখানকার মার্কিন শ্রমিক ও অসহায় বহিরাগতদের মধ্যে সৃষ্টি-হওয়া বিরোধিতার কথা বললেন, ঠিক যেমনটি সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে ; তাঁর ধারণা হচ্ছে, ইউরোপ যেন সুবিধাভোগী শ্রমিকদের একটি শ্রেণী গড়ে তোলার দিকে এগুচ্ছে, তার সঙ্গে থাকবে এক ধরণের বলি-দেওয়া সর্বহারা কঠিন ও বিরক্তিকর কাজগুলোর জন্যে। এই সর্বহারাদের সংগ্রহ করা হবে বিদেশী এবং বিশেষ ক'রে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিজিত জাতিগুলোর মধ্যে থেকে, পরিণামে সৃষ্টি হবে ক্রীতদাসের একটা শ্রেণী, যেমন হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যের সময়ে, যখন রোমের সাধারণ নাগরিক তাদের শ্রমসাধ্য কাজ, এমন কি যুদ্ধের আত্মরক্ষাও, দুনিয়ার বাকি সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি 'প্যান-ইউরোপ'-এর কথাও বললাম, তাকেও রেয়াৎ করলাম না।

তারপরে, মনাৎ-এর 'রেভল্যুসিঅ' প্রলেতারিয়েন' যে প্রশ্নগুলো আমাকে দিয়েছে তার উত্তর দিতে গান্ধীকে অনুরোধ করলাম। গান্ধী উত্তর দিলেন (মারী ও প্যারেলাল তা লিখে নিলেন):

প্রথম প্রশ্ন: "আপনার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি যে, বিদেশীর জোয়ালে-আটকা জাতির পক্ষে, সর্বপ্রথম বিজেতার হাত থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনেই সকল শ্রেণীর এক সাময়িক ঐক্য একটি মাত্র জাতীয় সম্মিলিত প্রতিপক্ষ গড়ে তোলার বাধ্য-বাধকতা আছে। কিন্তু ঘটনা দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। দেশী বুর্জোয়া, দেশী ধনতন্ত্র বেড়ে উঠেছে। পার্শিকুলের প্রতি আপনার সদুপদেশ (২৩ মার্চ, ১৯২১), অন্য জায়গার মতো আপনাদের ওখানেও, এক সংখ্যাল্পের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়াটা আটকাতে পারেনি। ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরে অবশ্যম্ভাবী লড়াই হবে দেশী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। তখনও কি আপনি মালিকদের 'স্বার্থ মনে রাখার' কথা শ্রমিকদের বলে চলবেন ?"

গান্ধী উত্তর: "আমি ইউরোপীয় ও দেশী ক্যাপিটালিস্টদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করি না। কারখানার শ্রমিক ও কারখানার মালিকদের মধ্যে লড়াইটাকে আমার লেখায় দেখাই জাতীয় লড়াইয়ের বাইরে। একথা সত্যি, আমি মনে করি না যে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার শত্রুতামূলক বিরোধিতাটা (antagonisme)

অনিবার্য। যতো কঠিনই হোক, আমি মনে করি তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা পুরোপুরি সম্ভব। কিন্তু যদি এটা প্রমাণ হতো যে, একটা বিশেষ শিল্পে এমন ধারা সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব নয়, তাহলে আমি শ্রমশক্তিকে (তার অর্থ সংগঠিত শ্রমিকদের) এতো দূর ঠেলে দিতেও ইতস্তত করতাম না, যার পরিণাম হতো ধনতন্ত্রের ধ্বংস বা শ্রমশক্তির হাতে ধনতন্ত্রের সবকিছু তুলে দেওয়া। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও, সত্যাগ্রহ পুঁজিকে কোণঠাসা করতো, সেটা এমন হতো যে, যেদিনই তার ধ্বংস অনিবার্য মনে করা যেতো, সেদিনই সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতো। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও আমি পুঁজির স্বার্থ দেখতাম না যদি প্রমাণ হতো সে জনস্বার্থের বিরোধী। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আমি পুঁজির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে এবং তার ফলে আজকের এই কঠিন সমস্যাকে আরও কঠিন ক'রে তুলতে চাইনে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন : "আমাদের পশ্চিমের দেশগুলোর সঙ্গে আপনি হালে আবার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ইংলন্ডে আপনি শ্রমিকদের— বরং বলা ভালো, বেকারদের সঙ্গে—ধনতন্ত্রে যারা শিকার তাদের সঙ্গে মিশেছেন। আপনাদের মতো, তাদের ক্ষেত্রে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিপক্ষ গড়ে তোলার আবশ্যকতা নেই। এই বেদনাময় মুহূর্তে পাশ্চাত্যের সর্বহারাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে, আপনি কি তাদের শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যে নিন্দা করবেন ?"

গান্ধীর উত্তর : "দেখেশুনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইংলন্ডের ব্যাপারে যদি হয়, বেকারদের ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বেশি যুক্তি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ক্যাপিটালিস্টরা যদি তাদের সঙ্গতির শেষ সীমায় এসে পৌঁছোয়, এবং আজ তাদের সব মূলধন শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিয়ে নিজেরা শ্রমিকের স্তরে নেমে আসে, সে-ত্যাগে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো লাভই হবে না। বর্তমানে সত্যিকারের প্রতিকার, যা ইংলন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—তা হচ্ছে গোটা জীবনকে পুনর্গঠিত করা। যেহেতু জগতের বাণিজ্য এখন ইংলন্ডের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়েছে আমেরিকা, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য জাতি, ইংলন্ডের বর্তমান বেশির ভাগ শিল্পেই তার মূলধন আর প্রয়োজন মাফিক খাটানো সম্ভব নয়। এরকম ক্ষেত্রে, বেকারদের প্রথমত জীবনধারণের মান পাল্টাতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত, তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে কোনো কোনো কুটিরশিল্পে (হস্তশিল্পে) বা ফিরে যেতে হবে কৃষিতে। এই সব পুনর্ব্যবস্থায় ক্যাপিটালিস্টদের প্রায় কোনো ভূমিকাই নেবার নেই। ক্যাপিটালিস্টরা বেকারদের কোনো উপকারেই আসবে না—তা সে তারা পরহিতব্রতীই হয়ে উঠুক, কি তাদের মূলধন বিদেশে চালান করুক।"

রম্যাঁ রলাঁ : "অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ইংলন্ডের এখনো একটা সুবিধা ভোগকরা দ্বৈপায়নতার আরাম আছে। ইংলন্ডের দৃষ্টান্ত থেকে ইউরোপ মহাদেশের পক্ষে সিদ্ধান্তে টানা চলে না। দেখাই তো যাচ্ছে, ইংলন্ড তার বেকারদের যেভাবে দেখছে, তাতে ইউরোপের বুর্জোয়াদের উদ্বেগ ও ক্রোধ জেগেছে। জার্মানীতে 'বেকার ভাতা'র ('dole') কথাই নেই, সেখানে সবচেয়ে কম মাইনে দিয়ে বেকারদের শোষণের

ব্যাপার। শোষণকারীদের কাছে যারা দরকারী ব'লে মনে হয় না (এবং সেটা বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও), তাদের ক্ষেত্রে শোষণকারীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা শুকিয়ে মরুক! যুদ্ধের পর থেকে গোটা ইউরোপে এবং বিশেষ ক'রে, জার্মান দেশগুলোতে মানুষের জীবন সম্পর্কে এক চরম অবজ্ঞা। শান্তিচুক্তির পর থেকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় হাজার হাজার, সম্ভবত লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে, পুষ্টির অভাবে, দুঃখদারিদ্র্যে মারা গেছে, এবং মারা গেছে নিঃশব্দে। গভীর সংকটের পর এই শীতে এমন সপ্তাহ যায় না, যে সপ্তাহে দারিদ্র্যে, বেকারি, হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে না। কম মাইনে দিয়ে শোষণের মধ্যে দয়ামায়া নেই। যদি দেশের লোক কম মাইনেতে রাজী না হয়, তাহলে বিদেশী মজুরদের নেওয়া হবে। ইউরোপ মহাদেশের অবস্থা ইংলন্ডের অবস্থার চেয়ে পৃথক। বেকার ভাতার যে দুষিত দৃষ্টান্ত ইংলন্ড জগতের সামনে রাখছে তার বিরুদ্ধে এবং শ্রমতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো ফেটে পড়ছে।"

গান্ধী (পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে) ঃ "যদিও তা সত্ত্বেও এমন অবস্থা হয়, যেখানে অনেক বেশি মাইনে দেবার সাধ্য থাকলেও ক্যাপিটালিস্টরাই শ্রমশক্তির দুর্দশা ও উদ্বৃত্তের সুযোগ নিতে চেষ্টা করছে, তাহলে শ্রমিকদের হাতে তো নিঃসন্দেহে তৈরি সমাধান আছেই। যদি শ্রমিকদের মধ্যে খাঁটি ঐক্য থাকে, আমি নিশ্চিত যে, শ্রমিকরা তাদের নিজেদের শর্ত মানাতে পারবে। নিজেদের শর্ত ছাড়া অন্য শর্তে তারা কাজ করবে না বললেই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। আর তারা যদি বিদেশী শ্রমিকদের ঢুকতে না-দেবার মতো যথেষ্ট সংগঠিত হয়, তাহলে মালিকরা অবশ্যই নত হবে।"

রম্যাঁ রলাঁ ঃ "আপনি বলছেন, শ্রমিকদের মধ্যে যদি খাঁটি ঐক্য থাকে, তাহলে মালিকদের ওপরে তারা এক হাত নিতে পারে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার দিকটাও ভাবতে হবে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, শ্রমিকরা সে-ঐক্য গড়তে পারে না; কারণ ক্যাপিটালিস্টরা ষড়যন্ত্র করে; তারা বিভেদ ছড়ায়; 'অ-সচেতন অল্পবয়সীদের' কিনে নেয়। সেক্ষেত্রে, সচেতন ও সক্রিয় সংখ্যাল্প শ্রমিকরা যারা পরিস্থিতি বোঝে, এই ঐক্য ঘটানোর ব্যাপারে বৃহত্তর অংশকে বাধ্য করানোর অধিকারে বিশ্বাস করে। আর বল প্রয়োগে বাধ্য সর্বহারাদের বৃহত্তর অংশের স্বার্থে এইটেই হচ্ছে সচেতন সর্বহারার একনায়কত্ব (dictature du prolétariat)।"

গান্ধী ঃ "আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ এর অর্থ হবে, শ্রমিকরা মূলধন কেড়ে নিতে চায়; আর মূলধন কেড়ে নেওয়াটা এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার সবচেয়ে খারাপ পদ্ধতি। যদি শ্রমিকের সামনে খারাপ দৃষ্টান্ত রাখেন তাহলে সে কখনো নিজের শক্তি উপলব্ধি করবে না। ভারতবর্ষে আমি অতি স্বল্প সংখ্যক মজুর নিয়ে শুরু করেছিলাম। আমেদাবাদের কাপড়-কলের শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল মতবিরোধে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; কিন্তু আমি লোহার মতো শক্ত ছিলাম; শ্রমিকদের চালাবার জন্যে এবং সকলরকম হিংসাকে বাধা দেবার জন্যে নিয়ম-কানুন বেঁধেছিলাম; তার ফল হয়েছে এই যে, এখন এই ইউনিয়নের মধ্যে ৬৬,০০০ শ্রমিক, যাদের বেশির ভাগই নিরক্ষর; কিন্তু তারা বোঝে, তাদের ভাগ্য, তাদের নিরাপত্তা তাদেরই হাতে। আমি তাদের এই

বিশ্বাস জন্মাতে চাইনি যে, তারা শক্তিহীন ও পরনির্ভর ; তাদের শেখাই যে, তারাই আসল ক্যাপিটালিস্ট, কারণ ধাতুর মুদ্রাটাই মূলধন নয়, মূলধন হচ্ছে শ্রমের ইচ্ছা, শ্রমের সামর্থ্য। তাদের এই মূলধন সীমাহীন। বর্তমানে, চোখে পড়ছে বিশৃঙ্খলা ; এও চোখে পড়ছে যে, শ্রম মূলধনের হাতে শোষিত হবার বিপদের মুখে পড়েছে। কিন্তু আমি তাদের শ্রমের মর্যাদাবোধ শিখিয়েই চলবো। এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করবো ; কিন্তু হিংসার উপরে ভিত্তি করা কোনো একনায়কত্বের চিন্তা আমি মেনে নেবো না। এই পদ্ধতিতে (বলপ্রয়োগে) সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন বোম্বাইয়ে দেখেছি। এবং সেখানে শ্রমিকরা হেরে গেছে। কিন্তু যদি তারা আমার পরামর্শ মতো কাজ করতো, তাহলে মালিকদের উপরে এক হাত নিতে পারতো। এ নইলে ওরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে, বোম্বাইয়ে তার যেমন বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বোম্বাইয়ের শ্রমিক খুনোখুনিতে পৌঁছোয়নি ; পাশাপাশি আমাদের আমেদাবাদের অহিংসার দৃষ্টান্ত তাদের ধরে রেখেছে। বোম্বাইয়ে কমিউনিস্টদের একটা ছোটো গোষ্ঠী আছে, তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ঘাড় ভাঙে। এখনো পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। অন্তত, আমি ভারতবর্ষ ছাড়ার সময় পর্যন্ত নয়। তারপর কী হয়েছে তার কথা ভালো জানি না। শ্রমিকদের আমি শুধু এই শিক্ষাই দিই ঃ তারা একটা কারখানাতেই বাঁধা থাকুক, এটা প্রয়োজনীয় নয়। আমেদাবাদের শ্রমিকদের আমরা কারখানা থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হবার শিক্ষা দেবারই চেষ্টা করেছি। যা তাদের ন্যায্য পাওনা তা না পেলে, সুতো কেটে বা পাথর ভেঙে যে সামান্য লাভই হোক, তাতেই তারা সুখী হোক ! দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিককে অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। কারখানার অসম্মানজনক মাইনে মেনে নেওয়ার চেয়ে কম উপার্জনের কোনো স্বাধীন কাজে চলে যাওয়া অনেক ভালো। শ্রমিকদের স্বাধীন হয়ে উঠতে হবে এবং যখন শ্রমশক্তির উদ্বৃত্ত হবে না, তখন তাদের শর্ত মানাবার মতো সমর্থ হতে হবে। 'অ-সচেতন অল্পবয়সী' শ্রমিকদের সম্পর্কে আমরা বিদেশী শ্রমিক সম্পর্কিত বিধান প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবো। সব কিছুর মতোই শ্রমেরও বিবর্তনের প্রণালী আছে ; তার মধ্যে হিংসার আমদানি ক'রে আমি সেটাকে বাধা দিতে চাই না।"

রম্যাঁ রলাঁ (এই বিষয়ে আর চাপাচাপি করলেন না, শুধু অ-হিংসার রীতিপদ্ধতি প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করতে চাইলেন) ঃ

"মানুষের মধ্যে অনেক সময় নিষ্ঠুরতা ও অপরাধ ঘটার কারণ হচ্ছে, অসুস্থ ও বিকারগ্রস্থ মানসিক অবস্থা। সকল সমাজে এমন সব মানুষ আছে যারা অপরের ক্ষতি করে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাদের শুশ্রূষা করা দরকার। এমন ধরনের রোগী বা পাগলের সামনে পড়লে অহিংসপন্থীরা কোন্ মনোভাব গ্রহণ করবেন, যাতে তাদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানো যায় ? বিনা হিংসায় এ ক্ষেত্রে কী ক'রে করবেন ?"

গান্ধী ঃ "আমি তাদের আটকে রাখবো। এবং তাকে আমি হিংসা বলবো না। আমার ভাই যদি পাগল হয়, আমি তার হাতে শেকল দিয়ে রাখবো, যাতে মন্দ কিছু না করতে পারে। কিন্তু আমি তার উপর হিংসা প্রয়োগ করবো না, কারণ হিংসা

প্রয়োগের মনোভাবই সেখানে থাকবে না। আর আমার ভাইও উপলব্ধি করবে না যে, তার উপর হিংসা প্রয়োগ করা হচ্ছে। তার বিপরীত, যখন তার মাথা ঠিক হবে, তাকে আটকে রাখার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবে। মাথা খারাপ থাকার সময় সে যে বাধা দেবে, তা আমি ধর্তব্য বলেই মনে করবো না, কারণ আমার কাজের প্রেরণার পেছনে থাকবে নিভেজাল (অবিমিশ্র) প্রেম। আমার কাজের পেছনে আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই ; এমনকি তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছাটাও নেই। আমি জানি, তার হাত বাঁধতে গিয়ে আমার যদি তার হাতে মার খাবার আশংকা থাকে আমি তা আটকাতে পারবো না। আমি তাকে বাঁধবো যাতে সে মনের ভারসাম্য ফিরে পায়। যদি তার হাত বাঁধি, তা নিজেকে বাঁচবার জন্যে নয় ; তার মার খেয়ে যদি তাকে বাঁচাতে পারি তো মারই খাবো। যে আড়-পাগলদের কথা বললেন, তাদের ক্ষেত্রেও আমি এই রকমই করবো। আমি হাসপাতালে রাখবো কিন্তু জেলখানার কড়া পাহারায় নয়, সেবাশুশ্রূষায় ঘিরে ; আমি তাদের সেই সব বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চিকিৎসা করাবো, যাঁরা এই সব রোগ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তাদের চিকিৎসার পদ্ধতি জানেন। কিন্তু এসবই তো শুধু লক্ষণের চিকিৎসা। আমি আরও গভীরে যাবো এবং মূলের চিকিৎসার চেষ্টা করবো। বর্তমান সমাজই এই জাতের অপরাধীদের জন্ম দেয়। আমার মতে, মূল কারণ হচ্ছে, লাভের আশায় ঘোড়দৌড়, এই প্রতিযোগিতা, এই জোর ক'রে এক করানো ('দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া')। এই জন্যেই আমি সমাজকেই ঢেলে সাজবো। বিশেষ বিশেষ ও দৃষ্টির অগোচর কারণগুলো আবিষ্কার করার জন্যে বিশেষজ্ঞদের ভার দেবো। আর তারপর চেষ্টা হবে শুধু অসুস্থ মানসিক অবস্থার অপরাধের চিকিৎসার নয়, সমস্ত ধরণের অপরাধের চিকিৎসার।"

তারপর আমি গান্ধীর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলাম। সেগুলো তাঁকে করার জন্যে আমাকে ভার দিয়েছেন এরিখ শ্রাম নামে অফেনবাখের এক জার্মান ধর্মশিক্ষক।

প্রথম প্রশ্ন : "ঈশ্বরকে কী নামে ডাকবেন ? তিনি কি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, না কোনো শক্তি, যিনি জগতের উপর প্রভুত্ব করেন ?"

গান্ধীর উত্তর : "ঈশ্বর কোনো ব্যক্তি নন। তিনি অপরিবর্তনীয় নিয়ম। আর এক্ষেত্রে এই নিয়ম ও নিয়মের কর্তা এক। সাধারণ অভিজ্ঞতায়, নিয়ম বলতে আমরা পুথির নিয়ম বুঝি। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন নিয়মের কথা বলি, আমি বলি জীবন্ত নিয়মের কথা। এই-ই ঈশ্বর। আর এই নিয়ম বদলায় না। এ শাশ্বত। এ কোনো ব্যক্তিক ঈশ্বর নন, যিনি অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরেন। ঈশ্বর হচ্ছেন এক শাশ্বত নীতি। আর এই জন্যেই আমি বলি, সত্যই ঈশ্বর।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন : "খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে আপনারং ধারণা কি ?

এর উত্তর গান্ধী আগেই লোজানে দিয়েছেন ; তিনি আবার তাঁর সূত্র আওড়ালেন : "খ্রীষ্টধর্ম ভালো, কিন্তু খ্রীষ্টানরা খারাপ।"

তৃতীয় প্রশ্ন :" বিশ্বজনীন মানবতার এমন এক প্রতিষ্ঠানে গান্ধী অংশ নিতে সম্মত হবেন কি, যে-প্রতিষ্ঠান ভাবে যে, জগৎ একটা বিরাট গুহ্য ব্যাপার, আর আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে ক্ষুদ্র-কণ্ঠ কথা বলে, তার কথাই শুধু শুনতে হবে ?"

গান্ধীর উত্তর ঃ “এমন বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অংশ নেবার অনুরোধ আমাকে প্রায়ই করা হয়। আমি সবসময়েই উত্তর দিই ঃ না! কারণ আমি প্রায়ই দেখে থাকি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লোকেরা হয় অল্পবুদ্ধি সাধুলোক, নয়তো ভন্ড পন্ডিত, যারা শ্রদ্ধেয় ভেক্ ধরে ফাটকা খেলে। লন্ডনে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার নাম ‘বিশ্ব অহিংসা লিগ’। তার কর্তা এক প্যাস্টর ও তাঁর স্ত্রী। আমার সামনের টেবিলটায় যেটুকু অহিংসা আছে, আমি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি অহিংসা নেই। নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করেন। এই লিগে আমার নাম দিতে অস্বীকার করেছি। তাঁরা যে এক-পাতা কাগজ ছাপেন, তাতে আমার নাম-সইটাও দিইনি। আমি তাঁদের বলেছি যে জীবিকার্জনের জন্যে তাঁদের অবশ্যই অন্য পন্থা খুঁজে বার করতে হবে। (শ্রামের) এই প্রশ্নটিতে যদি এই বোঝায় যে, প্রশ্নকর্তা এমন ধরনেরই একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা যাতে আমি অংশ নিতে রাজী হবো কি না, তাহলে আমার উত্তর হবে ঃ না!”

আলোচনার শেষে, জেনেভার সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার ম্যাক্স কেটেল আমার ঘরের মধ্যে বসে-থাকা ছোট্টো জমায়েতটার ফটো তোলার অনুমতি পেলেন। তিনি ভিলন্যভে গান্ধী ও মীরার অনেকগুলো চলাফেরা-অবস্থায় (হাঁটছেন কিংবা ভিলার বাগানে) চমৎকার ফটো তুলেছিলেন; (তাঁর যে ফটোগুলো পরে ছাপা হয়, তার একটিতে আমার তিনটে হাত ঃ আমার দুই হাত আর আমার আড়ালে-পড়ে যাওয়া মীরার একটা হাত ঃ সে-হাতে আবার তার ঘড়িটা…কিন্তু গান্ধীর বেশভুষার মধ্যে যার এতো বড়ো স্থান সেই ঘড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না, কারণ, খালি গায়ে থাকেন, কোমরে জড়ানো ধুতির সঙ্গে এইটেই তাঁর ভূষা; এখানে, তিনি ঘড়িটাকে চাদরের নিচে হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন; কখনো হাতছাড়া করেন না; তিনি কাঁটায় কাঁটায় চলার মানুষ।)

অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশী প্রীতিপূর্ণভাবে আমরা বিদায় নিলাম; কারণ এই আমাদের শেষ আলোচনা। ঠান্ডা পড়েছে, আকাশ পরিষ্কার। স্টেশন পর্যন্ত পেঁাছে না দিয়ে আমার অতিথিদের চলে যেতে দিতে চাই না। পনের দিন পর এই আমি প্রথম বেরুলাম।

গাড়িতে গেলো অসংখ্য মালপত্র, আর গেলেন মেয়েরা। গান্ধী চললেন চিরাচরিত পায়ে হেঁটে। রাস্তায় তিনি থামলেন; বির্ রাস্তা আর বড় সড়কের কোণে রেললাইনের উপরে ঝোলানো ক্ষুদে একটা শালে-য় একটা ছোটোখাটো বিকৃত-অঙ্গ লোক পানীয়ের (মদের নয়!) দোকান চালায়, তাকে খুশী করার জন্যে তার দোকানে ঢুকলেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক বিরাট জনতা আমাদের চারধারে ঘিরে রেখেছে। জনতা কৌতুহলী, কিন্তু রুচিসম্পন্ন। এক বৃদ্ধা এসে গান্ধীর হাত ধরল, তাঁদের দুজনে কথা হলো, কেউ কারুর কথা বুঝলেন না, কথা হলো শুধু চোখে চোখে। গান্ধীর মাথা সর্বক্ষণই খালি, রোগা রোগা পা দুটো আবরণহীন; কিন্তু টোগার মতো ওভারকোটটা বেশ ক’রে ঢাকাঢুকি দিয়ে আছেন। দঁ দ্যু মিদি, আর রোদে ঝলমল বরফ-ঢাকা চুড়োগুলো দোরিতে তাঁর সর্বশেষ

নমস্কার জানালো। ট্রেন এলো। ভারতীয়দের ও দলবলের জন্যে রেল কোম্পানী একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ ক'রে রেখেছে (কারণ তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলেছেন মিলান পর্যন্ত,—সম্ভবত রোম পর্যন্ত—জনাকয়েক বিশ্বস্ত ব্যক্তি : এদমঁ প্রিভা ও তাঁর স্ত্রী; মিস লেস্টার; লুইজেত্ গীইএস; গ্রাজের এক অস্ট্রিয়ান মহিলা, যে-আসে তাঁকেই যিনি তাঁর একটা বই দেখান, তাতে কয়েক বছর আগে গান্ধী দয়া পরবশ হয়ে কয়েকটা কথা লিখে দিয়েছিলেন; আর আছে অবশ্যম্ভাবী ইংরেজ ও সুইস পুলিশ, ইউরোপ পরিক্রমার পথে এই বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে তারা চোখের আড়াল করছে না, এবং এক বিদ্রূপাত্মক বন্ধুতায় গান্ধী তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন : কারণ তাঁর সম্পর্কে করারই বা কী আছে, যেহেতু তিনি কথা বলেন এবং বলতে চান উঁচু গলায়? কোনো কিছু গোপনের ধারেকাছেও তিনি নেই, সবাই শুনলেই তিনি খুশী…)।

ট্রেনের উঁচু পাদানিতে সারসের মতো ঠ্যাং দুটো সানন্দে তোলার মুহূর্তে আমাকে আর একবার আলিঙ্গন করলেন, আর আমিও শেষবারের মতো, খোঁচা-খোঁচা-চুল-নেড়া-মাথায় গাল ঠেকালাম। তারপর মীরা ও অন্যদের স্নেহালিঙ্গন। চলতি ট্রেনের দরজা থেকে ঝুঁকে মীরা, যতক্ষণ না ট্রেন দৃষ্টির আড়াল হলো, আমাদের সঙ্গে হাত নেড়ে গেল। আমি ভিলায় ফিরে এলাম নিহান-এর মোটরে।

(রোম থেকে) মাদাম প্রিভা ও (ব্রিন্দিসি থেকে) মীরার (ফ্যাসিস্ট সেন্সারের ভয়ে বুদ্ধিমানের মতো লেখা) চিঠি থেকে, তারপরে সুইজারল্যান্ড হয়ে ফিরে যাবার পথে মিস লেস্টারের কাছ থেকে আরও স্বাধীনভাবে যে সব খবর পেয়েছি—তা থেকে যা জানতে পেরেছি তা এই :

মিলানে এক বিশাল জনতা গান্ধীর আমার অপেক্ষায় ছিল, তারা তাঁকে গভীর প্রীতির সঙ্গে সম্বর্ধনা জানায়। এটা বেশ মনে হয়, ফ্যাসিস্ট দঙ্গলগুলোর চেয়ে এই জনতা স্বতন্ত্রই ছিল, ফ্যাসিস্ট দঙ্গলগুলো "এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে" দাঁড়িয়ে ছিল। ইতালি ঘুরতে গান্ধীর জন্যে প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা রাখা হয়েছিল; এবং এই প্রথমবার নিয়ম ভেঙ্গে (কিন্তু কেন?) তাতে তিনি চড়েন। রোমেও একই রকম সম্প্রীতির বন্যা। জেনারেল মরিস তাঁর মোটরে গান্ধী, মীরা ও দেশাইকে নিয়ে এলেন তাঁর মন্তেমারিও ভিলায়। অন্যরা গেলেন হোটেলে। জেনারেল মরিসের আতিথেয়তায় গান্ধী ও ভারতীয়রা মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং সাধারণভাবে (সব ভারতীয়ের মতোই) তাঁদের মনে হলো ইতালিতে যেন নিজেদের বাড়ি-ঘরেই আছেন। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়া আমার বান্ধবী সোফিয়া বের্তোলিনি সেই ভিলায় তাঁদের সঙ্গে কাটানো একটি সন্ধ্যার বিবরণ পাঠিয়েছেন; সেই শান্ত ভিলাটি চারধারে পাইনের ছায়ায় ঢাকা, সেখান থেকে চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, অনেক দূরে সুষম সাবিনে পর্বতমালা যেন ছবির ফ্রেমের মতো ঘিরে রয়েছে। (চল্লিশ বছরের দূরত্বেরও সে-দৃশ্য আমার চোখে তাজা…)। তখন উপাসনায় সময়। আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে ফায়ারপ্লেসে জলপাই কাঠের আগুনে।

রীতিবিরুদ্ধভাবে ঢুকলেন এক যুবতী রাজকুমারী। সবসময়ের মতোই, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সবার মনেই জীবন্ত ও গভীর ছাপ পড়ল। গান্ধী অত্যন্ত হাসিখুশি, অত্যন্ত দুষ্টুমি-প্রবণ। মুসোলিনি তাঁকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আর যেহেতু সেই ইচ্ছার ভাগীদার গান্ধীও—(এই সাধু ব্যক্তিটি মনের মধ্যে একটা ছোটো দৈত্যকে পুষে রাখেন ঃ সে কৌতূহল-দৈত্য—সেটা আমি বুঝি, আমিও সেই দৈত্যকে পুষি—বা সেই আমাকে পোষে, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিই ; আমি চেয়েছিলাম গান্ধী যেন এ ক্ষেত্রে তাকে বাধা দেন), তিনি মীরা, দেশাই ও জেনারেল মরিসকে নিয়ে গেলেন দুচের কাছে। মুসোলিনি সৌজন্য দেখালেন, ঘরের মাঝ অবধি এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং তাঁকে ও মীরাকে বসতে বললেন, কিন্তু দেশাই ও বৃদ্ধ জেনারেলকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ;—জেনারেল মিষ্টি ক'রে বলেছেন, "তাঁর কর্তৃত্ব ভালো ক'রে জাহির করার জন্যে"। মিনিট কুড়ি মতো কথাবার্তা হলো ; সেখানে কী কথা হলো তা জানি না ; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, শান্তভাবে গান্ধী তাঁর 'অপ্রিয় সত্যগুলো" জোর দিয়ে বলে গেছেন ; আর সম্ভবত দুচে মুখগোমড়া ক'রে তাতে সায় দিয়ে গেছেন। মিস লেস্টারের ঠাট্টাভরা চিঠি থেকে যা জেনেছি তা হচ্ছে এই যে, পরে যখন মুসোলিনির চোখ নিয়ে কথা হচ্ছিল, গান্ধীর চোখদুটো দুষ্টুমিতে জ্বলজ্বল করছিল। তিনি বলেছেন ঃ "মুসোলিনির চোখ দুটো বেড়ালের মতো। সব সময়েই ঘুরছে…" মিস লেস্টার জিজ্ঞেস করেছেন ঃ "সেটা কী রকম ? এই রকম (চোখ দুটো উপর থেকে নিচে ঘুরিয়ে), না এই রকম (কষ্ট ক'রে চোখ দুটো ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে) ?"—"এই রকম, এই রকম…" হাসতে হাসতে গান্ধী বলেছেন (তিনি চোখ ঘুরিয়ে শেষের রকমটি দেখিয়ে দিয়েছেন, সবসময়েই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চঞ্চল, সে-দৃষ্টি সব কিছুর উপর নজর রাখছে)। তিনি আরও বলেছেন ঃ "মোটের উপর তাঁর মধ্যে খুব বেশী দয়া-টয়া আছে ব'লে মনে হয় না। তবে বলতেই হবে, আমার সঙ্গে তিনি চমৎকার ব্যবহার করেছেন। আর যখন আমি বললাম যে, পোপ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, তখন তাঁর মুখ বিদ্বেষভরা সন্তুষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।"

পোপকে না-পেয়ে গান্ধী তাঁর দরজায় গিয়ে ঘা দিলেন ; ভ্যাটিকানের দরজা খোলালেন আর সেখানে ঘুরলেন টুরিস্টের মতো, যা তাঁর সঙ্গে মোটেই মেলে না (তাঁকে যতটা চিনেছি ব'লে জানি…তাঁকে রোমে দেখতে পেলাম না ব'লে বেশ দুঃখ হচ্ছে ঃ সেখানে তিনি নিশ্চয়ই কিছুটা ছুটি-কাটানো ছাত্রের মতো ব'নে গিয়েছিলেন)। তিনি আর্ট গ্যালারি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন ; তিনি নিজেই বলেছেন যে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর এক ছবির (? সামনে দাঁড়াতে এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। শ্রীমতী মন্তেসোরির দুটো ইস্কুলও তিনি দেখেছেন (সংবাদপত্রে বলেছে "বালিল্লা") ; আর তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টির নতুন সেক্রেটারি স্তারাচের সঙ্গে দেখা ক'রে ভুল করেছেন। ঠিক যা ভেবেছি, তাঁর রোম হয়ে যাওয়াটা ফ্যাসিস্টরা কাজে লাগিয়েছে। মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর দেখা করা এবং ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো দেখার উপরে সংবাদপত্রগুলোর মন্তব্যে জোর দেওয়া হচ্ছে ;

‘লিল্যুসত্রাশিঅঁ’-র একটা ফটো নিশ্চয়ই কৌশল ক'রে তোলা, তাতে দেখাচ্ছে ফ্যাসিস্ট যুবকরা মার্চ ক'রে যাচ্ছে, তিনি তা দেখছেন; দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যাওয়া দেখছেন এবং হয়তো পথ চলতে গিয়ে নিছকই তাকিয়ে দেখেছেন। তাছাড়া, ইতালির সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত সৌজন্য দেখালেও তাঁর মন্তব্য থেকে, তাঁর নামের সমস্ত প্রসঙ্গ থেকে যত্ন ক'রে "অহিংসা" শব্দটি মুছে দিয়েছে, আর সম্পূর্ণ উল্টো ক'রে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো ও হিংসাত্মক কথাবার্তা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছে, পোর্ট সৈয়দে পৌঁছেই তাঁকে টেলিগ্রামে তাঁর প্রতিবাদ করতে হয়েছে। ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের এতে মন ভেঙ্গে গেছে। কিছু কিছু সৎ ব্যক্তি আমাকে চিঠি লিখেছেন, জানতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা কী; আর পারীর দেশত্যাগী ইতালীয়দের মুখপত্র ‘লিবের্তা’ তার সাপ্তাহিকে গান্ধী-মুসোলিনির সাক্ষাৎকার একটি তিক্ত বাক্যেই শেষ করেছে, যোগ করেছে একটিমাত্র শব্দ: "ছেলেমানুষি?"।

কিন্তু ব্যাপারটা ছেলেমানুষির নয়। এখন আমি গান্ধীকে বেশ ভালো ক'রে দেখেই নিশ্চিত হয়েছি যে, বোকা বনার লোক তিনি নন; রাজনীতির কোনো ছলাকলাই তাঁর চোখ এড়ায় না। কিন্তু সেটার বিরোধিতা করেন তাঁর শান্ত ও শ্লেষাত্মক ঔদাসীন্য দিয়ে, যাই ঘটুক, সে-ঔদাসীন্য নিজের পথেই চলে। যখন রোমের পথে তাঁকে এগুতে দেখলাম, আমার কোনো সময়েই কোনো উদ্বেগ হয়নি। কেউ তাঁকে "কায়দা" করতে পারে না, কেউ ‘কায়দা করতে’ পারবে না!...কিন্তু ব্যাপারটা একমাত্র তাঁকে নিয়েই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে সেইসব নিহত ইতালীয়দের নিয়ে, যাঁদের জল্লাদকে তিনি দেখতে গেছেন! সে-কথা আমি তাঁকে খুবই পরিষ্কার ক'রে বলেছিলাম। আরও বেশি কিছু না করার জন্যে নিজেকে আমি দোষারোপ করি। দু'জন দু'জনের মতামত খুলে বলার পর গান্ধী যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন: ‘তাহলে, আপনিই ঠিক ক'রে দিন!’ তখন আমার বলা উচিত ছিল: ‘বেশতো, আপনি সেখানে যাবেন না। কোনো মূল্যেই মাত্তেওত্তি ও আমেনদোলার ঘাতকের করমর্দন করা উচিত হবে না।’ যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা। প্রশ্নটি সম্পর্কে সমস্ত কিছু চোখের উপরে তুলে ধরার পর শুধু তাঁর উপরেই সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁর হয়ে আমারই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। ‘কৌতূহল দৈত্যটিকে’ খুব বেশি ধর্তব্য ব'লে মনে করিনি।

বাকি যা কিছু অপ্রীতিকর ধারণা তা সাময়িক; কাজ করতে করতে অভ্যস্ত পন্থায় গান্ধী তা মুছে ফেলতে জানেন।

জেনারেল মরিসের ১৪ ডিসেম্বর সোমবারের, এক টেলিগ্রামে জানলাম গান্ধী রোম থেকে ব্রিন্দিসি রওনা হয়েছেন এবং তিনি প্রিভা-দম্পতিকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাচ্ছেন।

গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার আরও কিছু ভুলে-যাওয়া কথা। শেষদিন সকালে আমাদের আলোচনা হয়েছিল বহু বিষয় নিয়ে। অন্য সব আলোচনা থেকে এই আলোচনাতেই গান্ধী অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলেন।

অন্যসব বিষয়ের মধ্যে কথা হয়েছিল অস্পৃশ্যদের প্রশ্নটি নিয়ে। গান্ধী মনে করেন, মূলে এটি ছিল অহিংসার এক বিকৃত প্রয়োগ। গুরুতর অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে নারীপুরুষকে জাতিচ্যুত করা হতো। কিন্তু এই শাস্তি সামাজিক অধোগতির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর চেয়েও বেশি বর্বর হয়ে উঠেছে। (এবং আমি এর কাছাকাছি মনে করি পশ্চিমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নিষ্ঠুর ভণ্ডামিকে, মৃত্যুরও বাড়া এই শাস্তিতে অপরাধীদের চার-দেয়ালের মধ্যে নিঃসঙ্গ ক'রে রাখা হয় এবং তাদের পাগল ক'রে তোলা হয়।)

"অস্পৃশ্যদের" চেয়েও আরও খারাপ জাত আছে, তাদের ছোঁয়াটাই অশুচি। আর আছে—যাদের বলা চলে—'অদৃশ্যরা' যাদের চোখে দেখাও নিষেধ। তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়ঃ সারা ভারতবর্ষে ২০০ কি ৩০০। স্বাভাবিক ভাবেই গান্ধী ও তাঁর লোকজন এই জঘন্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে অনেক কিছু করেছেন এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছেন। শুধু নির্যাতনকারীদের সঙ্গে নয় অনেক সময় তাঁদের নির্যাতিতের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়, তারা হতাশ হয়ে হীনদশাতেই মুখ গুঁজে থাকে। এমন সব অস্পৃশ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তাঁকে যে কী কষ্ট করতে হয়েছে, গান্ধী তার গল্প করলেন; তারা পালিয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে, লুকিয়ে পড়েছে, দাঁতে কুটো নিয়ে উপুড় হয়ে ধুলোয় গড়াগড়িও দিয়েছে। অন্যদিকে যে সব মুক্তি-পাওয়া অস্পৃশ্যরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানে তাদের জন্যে এক প্রতিষ্ঠান পৃথক দাবি করছে, তাদের সঙ্গেও গান্ধী একমত নন। এই তথাকথিত সুবিধাকে তিনি এক কলংক টিকিয়ে রাখার জেদ ব'লে মনে করেন; তিনি দাবি করেন, জাত ও জাতের বাইরের সমস্ত পার্থক্য ঘোচানো সমস্ত ভারতীয়ের সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কেও আমি গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলাম। গান্ধীর রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, কিন্তু তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। আফ্রিকা থেকে প্রথমবার ভারতবর্ষে ফিরে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর আশ্রমেও গিয়েছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দ সেখানে ছিলেন না এবং তাঁদের কখনো দেখা হয়নি। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন খুবই শ্রদ্ধেয়; মিশনকে সব সময়েই নিজের কাজে সহযোগী হিসেবে পেয়েছেন; কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ভাবে সীমাবদ্ধঃ—বিশেষ ক'রে সেবাশুশ্রূষার কর্মে (রোগীর সেবা ইত্যাদি), এই কর্মে গোটা ভারতবর্ষে মিশন অনেক মঙ্গল করেছে; কিন্তু রামকৃষ্ণের চিত্তের ঔদার্য বজায় রাখা থেকে অনেক দূরে; সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম থেকে খুব ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে।

ফরাসী ভাষায় ছোটো এক সুইস ধর্মীয়-সংবাদপত্র 'ল্য সম্যর ভোদোয়া'-র (১৯ ডিসেম্বর) লেজ্যাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যাবাসে গান্ধীর আলোচনা সম্পর্কে কিছু সংবাদও দেখছি; তা বাদ পড়ে গেছে—তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রোগ সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন।

গান্ধী উত্তর দিয়েছেনঃ 'লোকে রোগকে বড়ো বেশি আমল দেয়। বিপদ-

সঙ্কুল এই জীবনে রোগের বিপদের সামনে দাঁড়াবার সাহস থাকা উচিত। রোগ হলে খুব কম চিকিৎসা করা উচিত। অনেক স্বাস্থ্যাবাস তৈরি করা হবে? না। দেহের ব্যাধিতে আক্রান্ত পৃথিবীর সমস্ত রোগীর সেবার জন্যে এতো স্বাস্থ্যাবাস তৈরি করতে সমস্ত কোটিপতিদের সম্পদেও কুলোবে না। তাই যারা স্বাস্থ্যাবাসে সেবার জন্যে আসতে পারে, তাদের ভাবা উচিত যারা তা পারে না তাদের কথা; এবং যে সেবার ব্যবস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বঞ্চিত, তা তাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে দরকার বরং সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত সুস্থ ও মিতব্যয়ী জীবন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি জগৎ জুড়ে তুলে ধরা। তাছাড়া, রোগ চিরকালই থাকবে; এবং দেহের কিছু কিছু কষ্ট মানুষ বেশ সহ্য করতে, পারে; যা তার সহ্য করা উচিত নয় তা হচ্ছে মনের ব্যাধি।' তিনি আরও বলেছেন, মনের শক্তি দেশের রোগ তাড়াবার মতো শক্তি রাখে। রোগকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। সুস্থ মনই সুস্থ দেহ তৈরি করে। গত তিরিশ বছর ধরে এইটি নিয়েই তিনি পরীক্ষা করেছেন।

তিনি কায়িক শ্রম সম্পর্কেও বলেছেন; বলেছেন, নিজের শ্রমে অর্জিত অন্ন যে খায় না, সে অন্ন চুরি করে।

অবশেষে, পারীর 'রেভল্যুসিঅঁ প্রলেতারিয়েন' (মনাৎ, লুজেঁ প্রভৃতির বিপ্লবী সিন্ডিক্যালিস্ট পত্রিকা) পারীর ম্যাজিক সিটির বক্তৃতা ও ২৩টি প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে দে· গেরঁ্যার লেখা রিপোর্ট নিরপেক্ষভাবে ডিসেম্বর সংখ্যায় ছেপেছে। তিনি লিখেছেন: 'দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরের সময়ে গান্ধী মুহূর্তের জন্যেও বেকায়দায় পড়েননি। মনে হলো, যতো প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তিনি অনেক আগেই সে-সব জেনে বসে আছেন। তিনি সব সময়েই অবিচলিত, শান্ত, সুশৃংখল, তাঁর মধ্যে নেতার মতোই জ্ঞান, এবং তাছাড়াও বিজ্ঞতা, চতুর চাষীর সূক্ষ্মতা; তিনি যেন সব কিছুরই উত্তর জানেন।'

আর 'ল্যুমানিতে'-র কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত কমিউনিস্টদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এই বিপ্লবীরা গান্ধীর কৌশলের মূল্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশের বদলে চুপ ক'রে আছেন, তার পরীক্ষার কী ফলাফল হয় তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পথচলতি ব্রিন্দিসি,—পরে সমুদ্র পথে 'পিলসুনা' জাহাজ থেকে লেখা মীরার চিঠিগুলোয় দেখতে পাচ্ছি, আমি রাশিয়া সম্পর্কে গান্ধীকে যা বলেছি, তাই নিয়ে তিনি ভেবে চলেছেন। আমার রোমের বন্ধুরা—জেনারেল মরিস, সোফিয়া বের্তোলিনি, সম্প্রতি এক আলবের্তিনির ('কারিয়েরে দেল্লা সেরা' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকের পুত্র) সঙ্গে বিবাহিতা তলস্তয়ের নাতনীও এই নিয়ে ভাবছেন। আমি কী ভাবছি, সে-সম্পর্কে তাঁরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছেন। এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেই আমার মত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন, গান্ধী মীরাকে অনুরোধ করেছেন, সে যেন আমাকে বলে আমার মতামত ঠিক কী তা তাঁকে লিখে জানাই।

বিদায়ের দিন সকালে গান্ধীকে একটা উপহার দিয়েছিলাম,—তিনি ঠাট্টা ক'রে অনুযোগ করেছিলেন ঃ 'সবাইকেই আপনি উপহার দিয়েছেন ঃ শুধু আমিই কিছু পেলাম না।' আমি তাঁকে বলেছিলাম ঃ 'আপনাকে আমি কী উপহার দিতে পারি? আপনি তো কিছুই রাখেন না। যদি কোনো দামী উপহার হয়, আপনি ফেলে দেবেন, নয়তো আপনার কাজের জন্যে বেচে দেবেন।' (এইভাবেই তিনি একটা সোনার মেডেল আমার এখানে ফেলে রেখে গেছেন, তাতে 'পালেয় ম'দিআল' প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার অৎলে তাঁর নাম খোদাই ক'রে দিয়েছেন। আমি তাঁকে (রাশিয়ার) পালেখ্-এর আঁকা সুন্দর একটা কাঠের কৌটো দিয়েছিলাম, তাতে এক রাখাল ঘাসে-ঢাকা মাঠের মধ্যে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে তিনি ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'এটা দিয়ে আমি কী করবো?' একজন বলেছিল ঃ 'যখন সর্দি লাগবে তখন এতে বড়ি রাখবেন।' 'তাহলে তো দেখতে হবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন আমার সর্দিই লাগে!'

২৮ ডিসেম্বর গান্ধী বোম্বাই পৌঁচেছেন।

১৯৩২

মীরাকে আমি বছরের প্রথম চিঠিটি লিখলাম (১ জানুয়ারি, ১৯৩২)। রাশিয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের (রোমে গান্ধী, গান্ধীর লোকজন ও আমার বন্ধুদের মধ্যে যে প্রশ্ন উঠেছে) শুধু যা প্রাসঙ্গিক তাই এখানে তুলে রাখছি ঃ কারণ আরও একবার আমার অবস্থানটি ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট করতে চাই ঃ '...ইউরোপের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা (ইউরোপের যে-ব্যবস্থা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়েছে) এবং সোভিয়েত শ্রমিক রাষ্ট্রের শক্তিশালী বিস্তার একসঙ্গে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। প্রথম ব্যবস্থাটির মূলগত ও প্রাণঘাতী অনৈতিকতার অবশ্যই অবসান চাই। এরই উপর মানব সমাজের জীবন অথবা মরণ নির্ভর করছে। আজকের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হতে শ্রমিক শ্রেণীর ও শ্রমিক শ্রেণীর গৃহীত ক্ষমতা প্রয়োগের যে বিভিন্ন পদ্ধতির ডাক দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে যদিও তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সুস্থ ও নিঃস্বার্থ মনের কাছে আজকের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসের জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না...

...অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী (যেমন যন্ত্রবাদ ও শিল্পায়ন), বা কৌশলের প্রশ্নাবলী (যেমন জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে গৃহীত অহিংসা বা হিংসার প্রশ্ন)—আলাদা ক'রে আলোচনা করতে হবে; একটি চিঠির বা একটা-দুটো বৈঠকের সংক্ষিপ্ত সীমার মধ্যে তা সম্ভব নয়। যন্ত্রবাদ ও শিল্পায়ন প্রসঙ্গে আমি মনে করি, ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থায় চরকার কুটির শিল্প যেমন সম্পর্কিত হতে পারে, যন্ত্রবাদ ও শিল্পায়নও তেমনি রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্প্রতি প্রকাশিত বরিস পিলনিয়াকের 'তাজিকিস্থান,—সপ্তম রিপাবলিক' সম্পর্কে লেখা বইটি যদি

পড়তে, তাহলে দেখতে যে মরুভূমিকে (২000 থেকে ৩000 বছর ধরে যা একই রকম ছিল) জয় করার জন্যে, ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে উর্বরা জমিতে রূপান্তরিত করার জন্যে যদি শক্তিশালী যন্ত্রকে ব্যবহার করা না-হতো, তাহলে মানুষের হাত চিরকাল শক্তিহীন হয়েই থাকতো। এক্ষেত্রে যন্ত্র মৃত্যুকে ধ্বংস করেছে, জীবনকে উৎসারিত করেছে। যন্ত্র নিজে অনৈতিকও নয় নৈতিকও নয়। এ একটা শক্তি। কী জন্যে যন্ত্রকে ব্যবহার করা হবে তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

ভারতীয় কর্মপন্থার বেদনাদায়ক সমস্যা নিয়ে বাপু যখন এই মুহূর্তে পুরোপুরি পড়েছেন, তখন এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে লেখার জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রো…'

৪ জানুয়ারি, ১৯৩২। গান্ধী বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তাঁকে পুনা জেলে পাঠানো হয়েছে।

আমরা মীরার কাছ থেকে এই টেলিগ্রামটি পেলাম (সোমবার সকাল, ৪ জানুয়ারি):

'বোম্বাই, ৪/১, ১০-১৫ মিঃ,

সরকার কর্তৃক সমস্ত শান্তিপ্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত ; আজ সকালে বাপু গ্রেপ্তার ও পুনায় নীত। মনোবল অক্ষুণ্ণ, স্বাস্থ্য ভালো, বল্লভভাইও (প্যাটেল) গ্রেপ্তার। সব ভালো। ভালবাসা।—মীরা।'

'দি ইন্ডিয়ান নিউজ'-কে (ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইউরোপীয়রা লন্ডন থেকে যে পত্রিকাটি বার করেন,—বার্ট্রান্ড রাসেল, ফেনার ব্রকওয়ে, লরেন্স হাউসমান, হ্যারল্ড ল্যাস্কির সঙ্গে আমি যার সহযোগিতা করি) আহ্বান জানালাম, গান্ধীর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ ক'রে যে-অবৈধ ও নির্মম পন্থায় বড়োলাট দিল্লি চুক্তির নির্ধারিত বিধি ভঙ্গ করেছেন ও সারা ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন—তার বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ গড়ে তুলতে। (৫ জানুয়ারি)

পরের কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীবাদী আন্দোলনের ও কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতারাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কার্যত গোটা ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারি হয়েছে। রক্ষণশীল পার্টির সাম্প্রতিক বিজয়ে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেনের বিশ্বাসঘাতকতায় অতি উত্তেজিত জরাগ্রস্ত ইংলন্ডের এই শেষ লাফঝাঁপ।

১১ সেপ্টেম্বর মার্সেই-এ জাহাজ থেকে নামবার পর গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি আমার বোন অত্যন্ত যথাযথভাবে লিখেছে। সেই ছবিটি এখানে তুলে রাখছি, যা দিয়ে আমার ছবি সম্পূর্ণ হবে:

“গান্ধী বসে আছেন তাঁর খাটে (স্নানঘরের গায়ে লাগানো দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে)। একটা সাদা চাদরে ভালো ক'রে ঢেকে আছেন, চাদরের নিচে একটা পা

আর একটার উপরে অর্ধেক আড়াআড়ি ক'রে রাখা ; মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে একটা রোগা পা চাদরের নিচে থেকে ঢুকছে বেরুচ্চে। হাতদুটো রোগা, সরু ও ঠান্ডা, হাতের গোছাদুটো প্রায় মাংসহীন। তাঁর রং বরং ফর্সা। গোল মাথাটা কামানো, শুধু মাথার মাঝখানে চোখে-না-পড়ার মতো এক গোছা আধপাকা চুল ; নাকটা লম্বা, ডগার দিকে মোটা, দাঁত না-থাকায় উপরের ঠোঁটের গোঁফের উপর ঝুলে পড়েছে (সামনের দিকটা বিরাট ফোক্‌লা, যখন সামনে তাকিয়ে হাসেন তার বেশির ভাগই দেখিয়ে দেন) ; চোখদুটো জীবন্ত, কিন্তু ধাতব ফ্রেমের চশমার আড়ালে ঢাকা। তাঁরা চেহারা আকর্ষণও করে না, বিশ্রীও লাগে না, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, এ সব ধর্তব্যই নয়, তিনি ঠিক এই যেমনটি আছেন, সেইটেই যেন ভালো ঃ বাইরেরটা দেখতেই সময় যেতো···

কী ভাবে তাঁকে সম্বোধন করবো না বুঝতে পেরে তাঁকে বললাম ঃ “আপনাকে কি বাপু ব'লে ডাকতে পারি ? অবশ্য সে-ডাকের পক্ষে আমার বয়স অনেক বেশি, কিন্তু...’ দাক্ষিণ্য ভরে মিষ্টি হেসে তিনি বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানলেন, হাতটা রোগা কিন্তু বেশ জোর আছে ; কয়েক মুহূর্তে আমার মাথাটা তাঁর বুকে চেপে রাখলেন। এতে আমি গভীরভাবে অভিভুত হলাম···

(মার্সেই-এর ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দেবার সময়) তিনি বেশ তৎপরতার সঙ্গে টেবিলের উপরে উঠে বেতের চেয়ারে বসে নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন, লোকে যেমন বলতো, গলার স্বর মোটেই ক্ষীণ নয়,—কারণ সে স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল তিনি তাঁর শক্তি বুঝেসুজে ব্যয় করতে শিখেছেন···

প্রিভা দেবদাসকে (গান্ধীর ছেলে) জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর বাবা তাঁর ও আশ্রমের অন্যান্য যুবকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন কি না। “তিনি আমাদের সকলকেই নিজের ছেলের মতো দেখেন।” “তাঁর বিরুদ্ধে কি কখনো সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করেছেন ?” অনেকক্ষণ ভেবে দেবদাসের মনে পড়ল ঃ হ্যাঁ, একবার। আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম ; তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন বলেছি ; আমি বলেছিলাম, তাঁকে আমার ভয় করে। তখন, আমাকে শাস্তি না দিয়ে, তিনি নিজের গালে জোরে জোরে চড় মেরে নিজেকে শাস্তি দিলেন।”

লিঅনেৎ ভিলায় গান্ধীর আহার বিধি সম্পর্কে কয়েকটি কথা

১· সকাল ৬টা বা ৭টা নাগাদ ঃ

বড়ো এক গেলাস গরম ছাগলের দুধ (বেশ কয়েকবার জ্বাল দেওয়া) এবং (কিছু আগে) চারটে কমলালেবুর রস।

২· সকাল দশটায় ঃ

লেবু ও মধু বা দার্চিনির গুঁড়ো মেশানো গরম জল।

৩· দুপুর বারোটা থেকে ১টা নাগাদ ঃ

একটা বড়ো গোছা আঙুর (কখনো কখনো আরও বেশি), বড়ো এক গেলাস ছাগলের গরম দুধ, খেজুর (৩০ থেকে ৪০ টি)।

৪. সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা নাগাদ ঃ

ছোটো ছোটো বেশ কয়েক প্লেট কুচি কুচি ক'রে কাটা কাঁচা সব্জি, যেমন ঃ পাতাশুদ্ধ সেলেরি—এই সব্জিটির উপরে গান্ধী খুব গুরুত্ব দেন – শালগম (অনেকগুলো), অনেকগুলো নুন মেশানো কাঁচা টম্যাটো এবং কুচি কুচি ক'রে কাটা দুটো বড়ো আপেল।

মীরা সবসময়েই বাদামের, মাখন ও মধুর শিশি বয়ে বেড়ায়। (তাছাড়া সব সময়েই সে আখরোট ভাঙে, বাদাম ভাঙে – এগুলো গান্ধীর মুখরোচক।)

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, চাল-গম জাতীয়—ভাত, পাঁউরুটি বা গমের কোনো কিছুর অনুপস্থিতি। (চিরকাল কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা গান্ধীর ধাতের সঙ্গে এটা মেলে।)

ভিলনাভে ও সুইজারল্যান্ডে গান্ধীর থাকার বর্ণনা তাঁর সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালের ৫৩ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। (লিখেছেন মহাদেব দেশাই।)

মিশরে পৌঁছুবার কিছু আগে 'পিলস্না' জাহাজের ২০ ডিসেম্বর লেখা গান্ধীর চিঠিটা পেয়েছি ১ জানুয়ারি। চিঠি পড়ে ভয় হচ্ছে, ইতালিতে ফ্যাসিস্টদের হাতে গান্ধী যেন বোকা বনেছেন এবং যে বন্ধুদের হাতে আমি তাঁকে তুলে দিয়েছিলাম, তাঁকে যেন তাঁরা ভালো ক'রে আগলান নি।

"প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা, আমার অনুরোধ আপনি তলস্তয়ের মেয়েকে (আসলে নাতনীকে, রোমে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল) চিঠি লিখবেন এবং বলশেভিকবাদ সম্পর্কে তাঁর কৌতুহল মেটাবেন। জেনারেল মরিস ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সকলের সঙ্গে অসাধারণ ভালো ব্যবহার করেছেন, তাঁর বাড়িতে ঢুকেই আমাদের পরিবারের লোকই মনে হয়েছে। আমার কাছে মুসোলিনি এক ধাঁধাঁ। তিনি যে সব সংস্কার করেছেন তার অনেক কিছুই আমাকে আকৃষ্ট করেছেন। মনে হয় চাষীদের জন্যে তিনি অনেক কিছুই করেছেন। সত্যি বলতে, সেখানে লৌহমুষ্ঠি আছে। কিন্তু পশ্চিমী সমাজের ভিত্তিই যেহেতু বল (হিংসা), সেইহেতু মুসোলিনির সংস্কারগুলো নিরপেক্ষভাবে বিচারের যোগ্য। গরীবদের জন্যে তাঁর উদ্বেগ, বৃহৎ নগরীকরণের বিরোধিতা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামঞ্জস্যের জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা, বিশেষ দৃষ্টি দাবি করে ব'লে আমার মনে হয়েছে। আপনি এ ব্যাপারে আলোকপাত করলে বাধিত হবো। আমার নিজের মূলগত সন্দেহ যেখানে, তা হলো এই যে, এই সংস্কারগুলোর পেছনে জোরজবরদস্তি আছে। কিন্তু এমনটা তো সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেই আছে। আমি যাতে বিস্মিত তা হচ্ছে এই যে, মুসোলিনির কঠোরতার পেছনে রয়েছে তাঁর জনগণের সেবার বাসনা। তাঁর কড়া কড়া বক্তৃতাগুলোর পেছনেও নিজের জনগণের প্রতি এক আন্তরিকতা ও প্রদীপ্ত প্রেমের শাঁস (noyau) রয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। এও মনে হয়েছে যে, ইতালির বেশিরভাগ মানুষ

মুসোলিনির লৌহশাসনই পছন্দ করে। আমি চাই না যে, আপনি কষ্ট ক'রে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। আমার অনুরোধ, আপনি সময় নিন! একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সম্পর্কে এখুনিই আমি কিছু লিখতে যাচ্ছি না। আমি শুধু এই প্রশ্নগুলো আপনার মতো এমন একজনের সামনে রাখছি, যিনি আমার চেয়ে এ সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। এখন আমি ভাবছি যে, আপনি যদি জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ঠান্ডার সময়ে আসেন, আপনি সহজেই জলহাওয়া সইতে পারবেন এবং সম্ভবত তাতে আপনার ভালোই হবে। আপনি নিশ্চয়ই প্লেনে আসতে পারেন, কিন্তু আমার উপদেশ এই যে, বরং সমুদ্রপথে আসুন। যদি আপনি এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেন, তাহলে একটা কর্মসূচি আপনাকে পাঠানো যেতে পারে।

গভীর ভালবাসার সঙ্গে, আপনার

'পিলস্‌না' জাহাজ, ২০.১.৩১। এম. কে. গান্ধী।"

(মীরা আরও দুটো অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ চিঠিতে ভিলন্যভে কাটানোর দিনগুলোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতবর্ষে আমাদের আসার পরিকল্পনা করে, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আমার যথার্থ মনোভাব সম্পর্কেও প্রশ্ন রেখেছে। প্রশ্নটি তাদের কাছে তুলেছেন রোমে আমার বন্ধুরা—সোফিয়া বের্তোলিনি, মরিসরা ও তলস্তয়ের নাতনী [তাতিয়ানা সুখোতিনার মেয়ে, সম্প্রতি বিয়ে করেছেন ইতালীয় সংবাদপত্র জগতের এক কেষ্টবিষ্টুকে]। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতীয় ছোটো দলটির মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে। তাই গান্ধী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাকে জিজ্ঞেস করাটাই ভালো হবে।)

গান্ধীর গ্রেপ্তারের আগে মীরাকে লেখা চিঠিতে আমি আমার মনোভাব স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েছি।

...ইতালি ও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমি গান্ধীর উত্তর লিখতে শুরু করেছিলাম, —এমন সময় তাঁর নতুন গ্রেপ্তারের সংবাদ এলো। শুরু করা চিঠিটা ফেলে রেখেছি এই কথা ভেবে যে, পরিস্থিতি এখন এমনই গুরুতর যে, ভারতবর্ষের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলে না। ৭ জানুয়ারি আমি শুধু গান্ধীকে একটি ছোটো চিঠি লিখলাম, তার দুটো কপি করলাম (একটা পাঠালাম মীরাকে, অন্যটি সবরমতীতে এদম* প্রিভাকে); ভারতবর্ষের স্বার্থের বিজয় যা আজ মানবতার বিজয় হয়ে উঠেছে, তার প্রতি আমাদের সক্রিয় সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার নিশ্চয়তা সেই চিঠিতে গান্ধীকে জানালাম। পুনশ্চতে ইতালি সংক্রান্ত ব্যাপারে এইটুকু যোগ করেই খুশী রইলাম যে, সেখানে তিনি যে-কদিন ছিলেন—সবশুদ্ধ চার দিন (তার মধ্যে দু'দিন ট্রেনের কামরায়)—বিচার করার অধিকার অর্জনের ও তার সম্ভাবনার পক্ষে তা সত্যি সত্যি যথেষ্ট ছিল না। তাঁর গৃহস্বামী আমার রোমের বন্ধুরাই যদি তাঁকে এসব জানিয়ে থাকেন, আমি তাতে বড়োই দুঃখ পাবো ঃ কারণ গত গ্রীষ্মে নিরপেক্ষ জায়গা লুগানোয় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁরা অন্য রকম মনোভাবই প্রকাশ করেছিলেন, সেই মনোভাবে ছিল ফ্যাসিস্ট শাসন ও দুচের প্রতি কোনো রকম কিন্তুহীন এক চরম প্রচন্ডতা ও তিক্ততা। রোমে

যদি তাঁরা অন্যরকম অর্থের কিছু ব'লে থাকেন, তাহলে আমাকে এটাই মেনে নিতে হবে যে, তাঁরা ভয় পেয়েছেন বা তাঁদেরও এরকম করতে বাধ্য করা হয়েছে। লিখেছি, আমার পাঠানো জিনিস জেলখানায় গান্ধীর হাতে পেঁছুবে তা ভাবতে পারি কিনা; আর যদি তা তাঁর পড়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ও বিশেষ ক'রে গান্ধী যে প্রশ্নগুলোর ইঙ্গিত দিয়েছেন সে-সম্পর্কে তথ্যবহুল লেখা তাঁকে সানন্দে পাঠাতে পারি।

আমি 'লিবের্তা'-কে (বিদেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ইতালীয়দের প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র) লিখলাম, সম্ভব হ'লে ইংরেজিতে লেখা এই ধরনের তথ্যসম্বলিত লেখা আমাকে পাঠান, সম্ভব না হলে জানান কোথায় পাওয়া যাবে।

জানুয়ারি, ১৯৩২। ভারতবর্ষে এখন সামরিক আইন জারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা (আজ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত) আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে (মহাদেব দেশাইয়ের কাছ থেকে ও পরে তিনি গ্রেপ্তার হলে তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে) ঠিক ঠিক ও সরাসরি খবর পাচ্ছি। তা আমার 'ভারতবর্ষের সংবাদ'-এর (courrier de l'Inde) একটি প্রবন্ধের কাজে লাগিয়েছি, 'ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের যুদ্ধঘোষণা'*—এই শিরোনামা দিয়ে সেটা পাঠিয়েছি 'য়ুরোপ' পত্রিকায় (২৫ জানুয়ারি)।

এক ইংরেজ (সেলার এডিসন) আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে ইউরোপীয় জনমত জাগিয়ে তুলবার জন্যে—(কোথায় ওয়েলস ও বার্নার্ড শ'র কণ্ঠস্বর? আহা! ই. ডি. মরেলের মৃত্যু কী শূন্যতাই না সৃষ্টি করেছে!)—তাঁকে লিখলাম:

"আজকের দিনে, বর্তমান সমাজকে টিকিয়ে রাখাটা যারা অসহ্য মনে করে, যারা তাকে বদলাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—'হয় তার পরিবর্তন, নয় মৃত্যু!' সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহের বিরাট পরীক্ষাটি একমাত্র সুযোগ, হিংসাকে আহ্বান না জানিয়ে এই রূপান্তর ঘটাতে জগতকে যা সে এনে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিংসার ফলে, এর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভারতবর্ষের অসামর্থ্যের ফলে, যদি এ ব্যর্থ হয়, যদি এ ধ্বংস হয়, তাহলে হিংসা ছাড়া মানুষের ইতিহাসে অন্য কোনো সমাধানই থাকবে না; আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই সেটা নির্ধারিত ক'রে দেবে। হয় গান্ধী, নয় লেনিন! যে-ভাবেই হোক না কেন, সামাজিক সুবিচারকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের দৃশ্যাবলী আরও ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। আর এই জন্যেই যাদের হৃদয়ে আছে সামাজিক সুসঙ্গতির বোধ, খ্রীষ্ট-বাণীর শান্তির ভাবনা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের ভারতবর্ষকে সাহায্য করতেই হবে। কারণ সত্যাগ্রহী ভারতবর্ষ যদি এই যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়, তাহলে স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ

---

*পরিশিষ্টে প্রবন্ধটি দেওয়া হয়েছে।

খ্রীষ্টই চরম বর্শাঘাত পাবেন। আর এবারে তাঁর আর পুনরুত্থান ঘটবে না। তাহলে এক অ-খ্রীষ্টানকেই (জন্মগত ভাবে খ্রীষ্টান হলেও, মনে আর আমি বেশি খ্রীষ্টান নই) খ্রীষ্টানদের তাঁর কথা মনে করিয়ে দিতে হবে?"

লন্ডনের ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ার 'ইন্ডিয়ান নিউজ'-এ প্রকাশিত—ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২। রোমের হেলবিগ আকাশ ফুড়ে নামলেন (আক্ষরিক ভাবে তাই ঃ এসেছেন প্লেনে)। আসছেন রোম থেকে, বললেন, শুধু আমাকে দেখতেই এসেছেন। (আর কার্যত, তিনি অন্য কারুর সঙ্গে দেখাও করলেন না, পরদিন সকালেই মিলানে ফিরে গেলেন।) তাঁর আসার উদ্দেশ্য আমার কাছে হেঁয়ালি। একসঙ্গে বসে আলোচনার প্রথম কিছুক্ষণ তিনি রহস্যময় ভাষায় এই আশার কথা বললেন যে, অবশেষে ইতালির বর্তমান পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি চরম পরিণতির দিকে পেঁছুতে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এক মার্শাল কাভিল্লাকে নিয়ে, 'তিনি আমাদের শক্তি, আমাদের খুঁটি, যার উপর আমরা নির্ভর ক'রে আছি,' এবং তিনি শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু এই প্রবল কর্তৃত্বের মানুষটি রাজতন্ত্রী, রাজার প্রতি শপথবাক্যে তাঁর হাত বাঁধা ; রাজা যখন বলবেন একমাত্র তখনই তিনি এগুবেন। আর যখন 'মহাপ্রভু' অদৃশ্য হবেন, একমাত্র তখনই রাজা এই অনুমতি দিতে পারেন। সেদিনটি এসে গেছে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তাহলে ব্যাপারটা কী? মুসোলিনি খুব বেশি অসুস্থ?' তা মোটেই নয়। আমার অতিথি মুসোলিনির পুরোনো সিফিলিস আর পেটের আলসারের কথা তুললেন, জোর চিকিৎসা করায় তা বোধহয় সেরে গেছে···তাহলে?·· ভাই আনালদোর সাম্প্রতিক মৃত্যু মুসোলিনিকে বেশি প্রভাবিত করেছে ব'লে মনে হয়· কিন্তু আর কী?...খোলাখুলি কথা এখানেই থেমে গেল। আমি কি খুব কম আগ্রহ দেখালাম নাকি অপ্রত্যাশিত হাবাগবা ভাব প্রকাশ করলাম?···নাকি, শুধু আমার অতিথির আর বেশি কিছুই বলার ছিল না?···তা বলতে পারি না। আসল ঘটনা হচ্ছে, এই ব্যাপার সম্পর্কে তিনি আর কিছু বললেন না। (কিন্তু তবুও, তিনি চার ঘন্টা রইলেন।) আমরা কম বিপজ্জনক—রোম হয়ে গান্ধীর যাওয়ার কথায় চলে এলাম।

হেলবিগ জেনারেল মরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মরিসের সঙ্গেই গত গ্রীষ্মে লুগানোয় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। পালাজ্জো ফারনেসেয় আমার ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর পরিবারকে আমি জানি ঃ তাঁর বাবা জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক, মা রুশ পিয়ানোবাদিকা। তিনি জন্মসূত্রে ইতালীয় নাগরিক এবং ইতালীয় বিমানবাহিনীর কর্নেল ছিলেন, তাই তিনি মরিসের অধীনে বা তাঁর সহকর্মী। কয়েক বছর আগে এক বিপুল অংকের টাকার তছরুপের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তিনি রাজার কাছে বাঞ্ছিত ব্যক্তি (persona grata) বলেই মনে হয় ; কিন্তু দুচের চক্রে অপরিচিত,

দুচের সঙ্গে তিনি মাত্র একবারই কারবার করেছিলেন। হেলবিগ লম্বা, মোটা, লাল-চুলো, দেখতে যেন এক রুশ জেনারেল। এ বিশ্বাসের কারণ আছে যে রসায়নে (?) তাঁর বিশেষ যোগ্যতা আছে। তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন, খুব বড়াই-করার স্বভাব (কিন্তু বিজ্ঞ); কিছুদিন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক চক্কর বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। (লোকটাকে সবার সামনে হাজির করার মতো।)

গান্ধীর পথযাত্রার কাহিনী, তিনি আমাদের যেমনটি বললেন তা এই ঃ

রোমে গান্ধী তাঁর অতিথি হবেন ব'লে একটু অবিবেচকের মতোই আমি জেনারেল মরিসকে টেলিগ্রাম করেছিলাম; আমার টেলিগ্রাম খুলেই প্রথমে মরিস এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছিলেন (মনে হয় টেলিগ্রাম এনেছিল একটা টিকটিকি)। তিনি এও জানতেন না, গান্ধী ইতালিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (persona non grata) ব'লে গণ্য হবেন কিনা ঃ (তিনি জানতেন না যে গান্ধীকে বগলদাবা করার জন্যে সরকারীভাবে গান্ধীর কাছে আমন্ত্রণ গিয়েছে, আর ঠিক এই জন্যেই আমি তাঁর শরণ নিয়েছি)। এককথায়, সৎ মানুষটিকে আমি এমন এক দারুণ কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম, যা কল্পনাও করিনি। তিনি গেলেন হেলবিগের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কী করা যায়? হেলবিগ বললেন, তাঁর কর্তার পরামর্শ নিন। মরিস তা করলেন। কর্তা তাঁকে উত্তর দিলেন 'মহাপ্রভুর' সঙ্গে আলোচনার পর পরের দিন। পরদিন সকালে রাষ্ট্রপরিষদের বৈঠক। 'মহাপ্রভু' সম্মতি দিলেন। এই জন্যেই আমার উত্তর দিতে ৩০ ঘন্টা দেরি।

গান্ধী তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় মিলানে পেঁছুলেন রাত্রে। স্টেশন মাস্টার নমস্কার জানাতে এলেন; তাঁকে বললেন যে তাঁর থাকাকালীন সব সময়ের জন্যে তিনি সরকারের অতিথি। প্রথম শ্রেণীর কামরা—বা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা যেটা তাঁর খুশি, তাঁর জন্যে দেওয়া হলো। গান্ধী বেছে নিলেন প্রথম শ্রেণী, 'কারণ তাঁকে তো পয়সা দিতে হবে না'। (হেলবিগ এইভাবেই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিলেন, তাঁর কাছে এইটেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আসলে, গান্ধীর এতে পছন্দ-অপছন্দের উপায় ছিল না; কিন্তু তিনি আমাদের বলেছিলেন, তিনি কোনো আপত্তি তুলবেন না, কারণ এটা তাঁর ব্যাপার নয় ঃ ইতালি সরকারের যা ইচ্ছে তাই সে করুক! এটার কোন গুরুত্ব নেই।) তাঁকে শুধু একটা জমকালো কামরাই দেওয়া হলো না (সাধারণ প্রথম শ্রেণীর কামরা সেটা মোটেই নয়), গোটা ট্রেনটাই হলো স্পেশাল ট্রেন, আর সেটা সাধারণ এক্সপ্রেসের চেয়ে কুড়ি মিনিট আগে রোমে এসে পেঁছুল। মরিস ও হেলবিগ সাধারণ টাইম-টেবল মাথায় রেখেছিলেন, পেঁছে দেখলেন দেরি হয়ে গেছে। আর গান্ধীকে তাঁদের হাতছাড়া করার জন্যে ফ্যাসিস্ট খেঁকশিয়ালরা এইটেই চেয়েছিল। গান্ধী এসে দাঁড়িয়েছিলেন কামরার দরজার সামনে, দু'জন মহিলা এসে বললেন, তাঁরা এসেছেন গান্ধীকে মোটরে ক'রে জনৈক ব্যক্তির প্রাসাদে নিয়ে যেতে...জনৈক ব্যক্তিটি ভারতবর্ষস্থ ইতালীয় কনসাল স্কার্পার বন্ধু, যে স্কার্পা ছিলেন এইসব ব্যাপারের নাটের গুরু। গান্ধী ছাড়া অন্য কেউ হলে,—মরিসের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে,—

রাজী হয়ে যেতেন। কিন্তু সেয়ানা বৃদ্ধটি রাজী হলেন না। আমি অবিশ্বাস চুকিয়ে দিয়েছিলাম; তিনি তাঁর কামরার এক কোণে ডেঁটে বসে রইলেন; তিনি বললেন, রোমে তিনি রম্যাঁ রলাঁর বন্ধু জেনারেল মরিসের বাড়িতেই থাকবেন, মরিস আসার আগে তিনি কামরা থেকে নামছেন না। এতে স্টেশনের কাজকর্মে কম ফ্যাসাদ হয়নি: কারণ অন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটাকে সরিয়ে দিতে কেউ সাহস করছিল না, আর পরের ট্রেনগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল।

অবশেষে হেলবিগের সঙ্গে মরিস হাজির হলেন। তিনি গান্ধী, মীরা ও ইংরেজ পুলিশকে গাড়িতে তুললেন। অন্য মোটরে অপর ভারতীয়দের নিয়ে চললেন হেলবিগ। কিন্তু পুলিশের ভিড়ের চাপে তাঁর গাড়ি মরিসের গাড়ির থেকে আলাদা হয়ে গেলো। সে-গাড়িকে তিনি ধরতে পারলেন একমাত্র মন্তেমারিও-র গোড়ায় গিয়ে; টিলায় উঠতে উঠতে দেখতে পেলেন মরিসের গাড়ির পেছনে আরও চার-পাঁচখানা গাড়ি। হেলবিগ চাইলেন এইসব সাংবাদিক ও অবিবেচকদের হাত থেকে বন্ধুর ভিলাটা বাঁচাতে। তিনি এমন কায়দা করলেন যাতে ব্যবধান কমে গেল, আর তখুনি মরিসের গাড়ির পেছনে অন্য গাড়িগুলোর সামনে নিজের গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন। মরিসের ভিলাটা বড়ো রাস্তার উপরে নয়। বেশ সরু একটা গলি-রাস্তা দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়, একটাই মাত্র গাড়ি সে-রাস্তায় চলতে পারে। তিনি গাড়ি থামাতে না থামাতেই গলির মুখটা আটকে গেল। পেছনে চেঁচামেচি। হেলবিগ একটুও নড়লেন না। হুংকার দিয়ে পুলিশের একটা দল তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি এগুতে মনস্থ করলেন; কিন্তু এইভাবেই তিনি মরিসকে এগিয়ে যেতে দিতে পারলেন। পেঁছুতে না-পেঁছুতেই দেখলেন পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক পুলিশ অফিসার টেলিফোনের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসল। অন্য একজন রইল ঘরের দরজায়। এইভাবে গান্ধীর থাকাকালীন একটা কথাও পুলিশের অজানা থাকেনি। পরে একসময় গান্ধী বাগানের মধ্যে হেলবিগকে একপাশে টেনে নিয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে—তেমন জোরের সঙ্গে গান্ধীকে কথা বলতে শুধু একবারই তিনি শুনেছেন—বলেছিলেন: ‘এবার আমাকে সবকিছু বলতেই হবে।’ হেলবিগ বলতে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন গান্ধীর কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী মরিস মরিয়ার মতো অঙ্গভঙ্গি করছেন। তিনি বুঝলেন কথা বলা সম্ভব নয়। ভিলার চারধারে প্রসারিত গ্রামাঞ্চলের বিপুল বিস্তৃত দৃশ্য দেখিয়ে গান্ধীকে বলতে লাগলেন: ‘দেখুন কী সুন্দর এই আকাশ, এই মনোরম প্রকৃতি। এ এখনো আমাদের...এ যদি আমাদের হারাতে হয়, তাহলে সেটা বড়োই বেদনাদায়ক হবে...’—জেনারেল বৃদ্ধ, হৃদরোগী; স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভালো নয়, তাঁর দিকেও কিছুটা নজর রাখতে হয়; স্ত্রীকে বিপদে ফেলতে বা নিজের মাথায় ‘মহাপ্রভুর’ বজ্রাঘাত নিয়ে তাঁকে মারাত্মক আঘাত দিতে ভয়ে কাঁপেন। তাই, মুখ বন্ধ। তাঁদের বাড়িতে থাকার গোটা সময়টাতেই গান্ধী কিছুই শুনতে পারেননি, কিছুই শোনেননি।

রোমে কাটানো ৩৬ ঘন্টার কর্মসূচি হেলবিগ খুঁটিয়ে বর্ণনা করলেন। গান্ধীর

প্রথম বাসনা ভ্যাটিকান দেখা (এবং আমি কল্পনা করি ভ্যাটিকানের প্রভুকেও দেখা, যিনি দেখা করার কোনো চেষ্টাই করেননি)। ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের ডিরেক্টারের সঙ্গে কথা ব'লে দেখার সময় ঠিক হলো বিকেলবেলায়। একই সময়ে স্কার্পা জানিয়ে দিলেন, তিনি গান্ধীকে নিয়ে যাবেন মন্তেসোরির এক ইস্কুলে, সেখান থেকে কাউন্টেস কার্নেভালির বাড়িতে…তারপর, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, দুচের ওখানে। উত্তর দেবার কিছুই নেই। গান্ধীও কৌতূহলী সন্দেহ নেই, তিনি রাজী হলেন। হেলবিগ তাঁকে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিক্সটিনে। সেখানে গম্বুজের ভেতরের ছাদ দেখালেন, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্কো দেখালেন, বত্তিচেল্লির ছবি ইত্যাদি দেখালেন। গান্ধী হাসলেন, ঘাড় নাড়লেন ঃ এ তাঁর উপর কোনো প্রভাব ফেলল না। যখন তাঁকে বলা হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই কক্ষেই পোপদের নির্বাচন হয়েছে, একমাত্র তখনই আগ্রহান্বিত হলেন ব'লে মনে হয়। বেরিয়ে আসার সময় তাঁর চোখে পড়ল বেদীর উপর ১৪শ কি ১৫শ শতাব্দীর একটা অত্যন্ত আড়ষ্ট কাঠিন ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি ; এই একটিমাত্র জিনিস তাঁকে অভিভূত করল। ভাস্কর্যের মিউজিয়ামে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সক্রেটিসের সামনে, তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তারপরই সিলেনের একটি মূর্তি দেখিয়ে বললেন ঃ 'সক্রেটিস' ! (তিনি ভুল করেননি।) নীলনদ ও তার উৎসগুলোতেও তিনি আগ্রহ দেখালেন। (সম্ভবত 'লাউকুনে'ও আগ্রহ দেখিয়েছেন ঃ হেলবিগ সে-কথা বললেন না ; কিন্তু 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় এই দেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে দেশাই হাস্যকর ভাবে এর উল্লেখ করেছেন ঃ শোনা তথ্যগুলো বেচারী ভারতীয়েরা এমন গুলিয়ে ফেলেছেন যে, গোটাটাকেই এক গ্রীক ভাস্কর ও তার দুই পুত্রের সৃষ্টি ব'লে দেশাই উল্লেখ করেছেন !)

তারপর, হেলবিগ তাঁকে জানিকুলে নিয়ে এলেন রোমের উপরে সূর্যাস্ত দেখাতে। তারপর যা হলো, সেখানে তিনি ছিলেন না। কিন্তু তিনি জেনেছেন যে কাউন্টেস কার্নেভালি তাঁর বাড়িতে ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রের বাছাইকরা লোকদের জড়ো করেছিলেন ; 'জিওর্নালে দিতালিয়া'-র সম্পাদক একটা ইংরেজি কথাও জানেন না, গান্ধী যা বলতে পারেন তার কিছুই তাঁর বোঝার কথা নয়, কিন্তু পরদিন তিনি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করলেন না, তাতে গান্ধীর উপর অতি-ফ্যাসিস্ট মনোভাব (শুধু তাই নয়, হিংসার ন্যায্যতা) আরোপ করলেন। এই প্রবন্ধটি নিয়ে খুব সোরগোল উঠেছিল এবং এটিকে গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের ত্রুটি হয়নি। এটির সম্পর্কে গান্ধী জানতে পেরেছিলেন একমাত্র জাহাজে উঠে, অথবা মিশরে পৌঁছে, সেখান থেকে টেলিগ্রাম ক'রে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ গোটাগুটিই রেখে দিয়েছিলেন।

যদি ভুল না ক'রে থাকি (এই সাক্ষাৎকারের সময় সম্পর্কে ভুল হওয়া সম্ভব) —তারপরেই গান্ধী মুসোলিনির ওখানে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মীরা, মরিস ও দেশাই। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মুসোলিনি ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে বসতে বলেছিলেন, মীরাকেও বসতে বলেছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ জেনারেল ও

দেশাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, মনেও হলো না যেন তাঁদের তিনি দেখেছেন। এক সময়, (আমার বিশ্বাস) গান্ধী জেনারেল মরিসকে দেখিয়ে দিলে মুসোলিনি এক কাঠখোট্টা নির্লিপ্ত ভঙ্গি ক'রে বলেছিলেন: 'জানি, জানি…' হেলবিগের বর্ণনা অনুসারে, মুসোলিনি অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো সতর্ক থাকেন, একমাত্র তিনিই যতো প্রশ্ন ক'রে চলেন, নিজেকে প্রকাশ করাটা এড়িয়ে যান।

পরদিন খুব সকালে স্কার্পা এলেন তাঁকে 'বালিল্লায়' নিয়ে যাওয়ার জন্যে, সেখানে ১২-১৩ বছরের কিশোররা এলো ছোটো ছোটো বন্দুক নিয়ে, তাঁর সম্মানে বন্দুক ফোটালো! (গান্ধী শিশুদের খুব ভালবাসেন, সম্ভবত এটাকে শুধু রগড় বলেই ঠাওরালেন।) তারপর, পার্টির চাঁইদের এক জমায়েতে। সেখানে মধ্যমণি ফ্যাসিস্ট নেতা স্তারাচে। মনে হয়, আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর মধ্যেই; মৃদু হেসে এই মহাশয়েরা—ভারতীয়দের পক্ষে—অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কে বেশ একমতই হয়েছেন; কিন্তু ইউরোপের পক্ষে-স্বভাবতই তা অন্য ব্যাপার।

এই দিনটার কর্মসূচির ঠিক ঠিক বর্ণনা দিতে পারবো না, ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। শুধু এইটুকু জানি যে গান্ধীকে সমাজসেবার (গরীব ও বৃদ্ধদের হাসপাতালে) ও যন্ত্রশিক্ষার কিছু আদর্শ প্রতিষ্ঠান দেখানো হয়েছিল,—তাঁকে অদ্ভুতভাবে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছিল: কারণ তাঁর বিশ্বাস হতে পারে সেটি হাজার হাজার এমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি, অথচ হেলবিগের মতে, ওটি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

…স্কার্পা তাঁর ভারতীয় হার্তিটিকে আবার টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পূর্বোক্ত কাউন্টেস কার্নেভালির বাড়িতে। হেলবিগের কথা বিশ্বাস করলে, এবারে কাউন্টেস তাঁর নারীজনোচিত নির্বুদ্ধিতা ও স্নবারির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাছাড়া, আরও একবার এই সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল, কারণ, জানানো হলো যুবতী রাজকুমারী মারী মরিসের বাড়িতে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই যুবতীটির বয়স ১৯ হলেও বুদ্ধিচাতুর্য ১৫ বছরের মতো, নিজের দেশের একটা স্মারক চিহ্ন গান্ধীকে দেবার জন্যে মর্মস্পর্শী সারল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন; আর তার জন্যেই, নামের মহিমায়, তিনি বেছে এনেছিলেন কিছু 'ভারতবর্ষের ডুমুর"; ইতালীয় ভাষায় ওগুলোকে বলা হয় কাঁটা-ওয়ালা ক্যাকটাস-ফল, ভারতবর্ষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। উটের কর্কশ জিভের উপযোগী এই ফলগুলোকে তিনি তাই একটা ছোটো ঝুড়ি বোঝাই ক'রে ফিতে দিয়ে বেঁধে এনেছিলেন। হেলবিগ বললেন, গান্ধী ঝুড়ি খুলে সেগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন, সে একটা দেখার মতো দৃশ্য।

গান্ধীর শেষ স্মৃতি এবং সবচেয়ে সজীব যে স্মৃতিটি হেলবিগ মনে ক'রে রেখেছেন তা হচ্ছে, সর্বশেষ সন্ধ্যায় রোমের স্টেশনে বিদায়ের মুহূর্তটি। ট্রেন-ছাড়ার মিনিট বারো আগে গান্ধী কামরার মধ্যে জানলার ধারে গিয়ে বসলেন। শতাধিক সাধারণ শ্রেণীর লোক কামরার চারধারে জড়ো হয়েছিল; তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হেলবিগ তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। লাতিন জাতের লোকের জনতা

হলে যা হয়, বিনা সংযমে প্রথম প্রথম তারা গান্ধীর কুশ্রীতা নিয়ে বলাবলি করছিল। “ব্রুত্তো” (brutto) কথাটি মুখে মুখে ফিরছিল। তারা এগিয়ে আসছিল, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। বিপুল প্রদীপ্ত হাসি নিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন। আর এই হাসির দীপ্তিই একটু একটু ক'রে জিতে গেল। একজনও রুখতে পারল না। অবশেষে সবাইকে তিনি জয় ক'রে ফেললেন। দশটা মিনিটই এর পক্ষে যথেষ্ট,—এবং এর জন্যে তাদের মধ্যে একটা কথা বিনিময়ও করতে হলো না। হেলবিগ বললেন, জনতার উপরে গান্ধীর বশীকরণ ক্ষমতার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তিনি এরই মধ্যে দেখতে পেয়েছেন।

স্কার্পা…ছিলেন কলম্বোর ইতালীয় কনসাল, পরে বোম্বাইয়ে কনসাল-জেনারেল, এর জন্যে কনসালের পেশার মধ্যে দিয়ে তাঁকে আসতে হয়নি, এবং সেখানে ভারতবর্ষে খুব চতুরতার সঙ্গে গান্ধীবাদী আন্দোলন সমর্থন করতেন, যাতে ইংলন্ডের পর ইতালি তার বাণিজ্যিক উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২। 'য়ুরোপ' পত্রিকার জন্যে আমি আমার 'ভারতবর্ষের সংবাদ' এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলাম ('রাজা আটকেছেন' শিরোনামায়*)।

৩ মার্চ, ১৯৩২।…এদমঁ প্রিভা ও তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষ থেকে ফিরে দেখা করতে এসেছেন। রোদে ও সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁদের রং তামাটে হয়ে গেছে। দু'মাস ধরে ভবঘুরের মতো ভারতবর্ষ ঢুঁড়ে বেড়িয়ে যা তাঁরা দেখেছেন, যা শুনেছেন তাতে তাঁরা টইটুম্বুর হয়ে আছেন। বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নামার আট-দশ দিনের মধ্যেই গান্ধী গ্রেপ্তার হয়ে যান; যারা কংগ্রেসের পক্ষে, তাদের কাছে সুপারিশ ক'রে তিনি শুধু প্রিভাদের জন্যে ছাড়পত্রের মতো কয়েকটা কথা কোনো রকমে লিখে দেবার সময়টুকুই পেয়েছিলেন। কিন্তু এই কয়েকটি সরল সাদাসিদে লাইনই সর্বত্র যাদুর মতো কাজ করেছে; তাঁদের সামনে সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে, সমস্ত রকম সাহায্য পাইয়ে দিয়েছে; আর লক্ষণীয় এই যে, ব্রিটিশ সরকার ও তার পুলিশের উপরেও এই কয়েকটি লাইন ছাপ ফেলেছে। তাঁদের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত পরিষ্কার; না রেখে-ঢেকে তাঁরা তা বড়োলাট লর্ড উইলিংডনকেও বলেছেন; বড়োলাট তাঁদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছেন, তাঁদের কথায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলেছেন: “গোটা ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন গান্ধীর পক্ষে।” মুসলমান, পার্শি বা হিন্দু নির্বিশেষে। আর বড়োলাটের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আজ সবচেয়ে বেশি চটেছে মডারেটরা, কাল পর্যন্ত তারা ছিল ইংলন্ডের সমর্থক। লর্ড উইলিংডনকে দেখে তাদের যে-ধারণা হয়েছে, লোকে যেমনটি বলে (আমিও বলেছি)

---

* পরিশিষ্টে প্রবন্ধটি দেওয়া হয়েছে।

তেমন দুর্বল লোকের ধারণা নয়, কিন্তু ধারণাটা এক সংকীর্ণবুদ্ধি অপদার্থের ; টাইপটা বোঝাতে প্রিভা বললেন, "একটা ঝানু শিকারী" ; নিজের নষ্টভাগ্য ফেরাবার জন্যে তাঁকে ওখানে বসানো হয়েছে, তাঁর মধ্যে ইংলণ্ডের জমিদারের সমস্ত সংস্কারই আছে। তিনি গান্ধীকে ঘৃণা করেন, তাঁকে মনে করেন বদমাশ, বিশ্বাসঘাতক ; তাঁর স্থির বিশ্বাস, বা নিজেকে বিশ্বাস করাতে চান, তিনি গান্ধীকে চূর্ণ করবেন, চূর্ণ করবেন তাঁর লোকজনদের। এই হাস্যকর সরল স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে যা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়, তাই তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব এমারসনকে কাঁপিয়ে তুলেছে ; এমারসন লোকটা বুদ্ধিমান, যে বিরাট ভুল হয়ে গেছে, তা তিনি বোঝেন ব'লে মনে হয়, আর তা শুধরে নেবার জন্যে খেটে মরছেন। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, (গান্ধীপন্থী) কংগ্রেসই ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি, কিন্তু তা এঁরা স্বীকার করতে পারেন না, এঁরা কর্তৃত্ব ছাড়তে পারেন না : সেটা হবে ইংলণ্ডের মিত্রদের, পোষ্য রাজন্যবর্গের এবং মক্কেলদের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করা। কিন্তু মালব্যের মতোই এমারসন ভালো করেই দেখতে পাচ্ছেন, সেইদিনটি আসছে যেদিন গান্ধীই হবেন দেশের আসল নেতা। এক পা চলতে গেলে প্রিভাদের পেছনে পুলিশ লেগেছে, নয়াদিল্লিতে তাঁর সম্পর্কে পুরো একটা ফাইলও ছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, পুলিশ ক্ষমা চেয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে পেটের দায়েই তারা এই কাজ করছে। অন্যদিকে, নিরস্ত্র জনতার উপরে পুলিশের লাঠিচার্জ দেখে, যে-লাঠিচার্জে সরাসরি মুখেব উপরে হাত-ঘুরিয়ে-মারা লাঠির আঘাত জনতা সহ্য করে নির্বিকারে, যতক্ষণ না মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—(গায়ের উপরে লোহা-বাঁধানো লাটির আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ এখনো প্রিভাদের কানে লেগে আছে) তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, একমাত্র ইংরেজ পুলিশই এমন বর্বর কাণ্ডে মেতে ওঠে ; দেশী পুলিশ লোক-দেখায়, আর বেশির ভাগ সময়েই তারা মারে ভীরুদের—যারা পালায়, যারা শান্তভাবে মুখোমুখি প্রতিরোধ করে তাদের মারে না। যে দেশীয় বাহিনীকে ইংলণ্ড ঘুষ দিয়ে বশে রেখেছে, এটা তার মধ্যে দল-বদলের একটা ইঙ্গিত, হঠাৎ যা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। প্রিভারা এটাও বুঝতে পেরেছেন, সারাদেশ জুড়ে যেখানে সংবাদপত্রের খবর নিষিদ্ধ, সেখানে কী দ্রুত ঘটনাবলী জানতে পারা যায় ; সেটা কেমন ক'রে ঘটে তা কেউ জানে না : আধ-ঘণ্টার মধ্যে গোটা সহরকে তাঁদের উপস্থিতির খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ; গুপ্তচর পরিবৃত সহরের একেবারে মাঝখানে গোপন সভাসমিতিতে তাঁরা যোগ দিতে পেরেছেন, পুলিশের নাকের ডগায় সেসব সভা ডেকেছেন প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা। তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ; রবীন্দ্রনাথ খেপে গেছেন। তাঁর আর কিছুই রাখঢাক নেই। তাঁর বিদ্রোহ প্রচণ্ডতায় গান্ধীবাদীদেরও ছাড়িয়ে যায়। তিনি আর ইংরেজ নাগরিক থাকতে চান না, প্রিভাকে অনুরোধ করেছেন, এক্ষুনি যেন তিনি ব্যবস্থা করেন যাতে তিনি সুইস নাগরিক হতে পারেন! বেলুড় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি বৃদ্ধ শিবানন্দকে দেখেছেন, তিনি আর নড়তে-চড়তে পারেন না, কথা প্রায় বলেনই না, কিন্তু প্রিভার কাছ থেকে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সুখবরগুলো শুনছিলেন তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। প্রিভার মারফতে তিনি আমাকে

নমস্কার জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র লোকে আমাকে জানে, আমাকে ভালবাসে ; যা আশ্চর্যের ব্যাপার তা এই যে, গান্ধী সম্পর্কিত আমার বইটির চেয়ে লোকে আমার রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বইগুলোই বেশি উল্লেখ করে।

গান্ধীর ইতালি হয়ে যাবার তথ্যাদিও প্রিভা আমাকে দিলেন,—দেমেত্রিও হেলাবিগের দেওয়া যে তথ্যাদি লিখেছি, এতে তারই সমর্থন মিলছে। এটা খুবই সত্যি যে, গান্ধী যে-ট্রেনে গিয়েছিলেন অত্যন্ত কূট চালেই সেটি নির্দিষ্ট সময়ের চল্লিশ মিনিট আগে রোমে পেঁচোছিলো ; আর এই চল্লিশ মিনিট ধ'রে '—'কে'র দলবল তাঁকে সমুদ্রের ধারে এক ভিলায় নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িতে তুলতে ভুজুংভাজোং দেয়, সেখানে মিথ্যায় হাত-পাকানো ফ্যাসিস্টদের হাতে তাঁকে পুরোপুরি তুলে দেওয়া হতো। এটাও সত্যি যে, ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রগুলো গান্ধীর সাক্ষাৎকারের মিথ্যা বিবরণ ছেপেছিল ; যেখানে-যেখানে তিনি অহিংসার যাথার্থ্যের জোর দিয়েছিলেন সেখানে-সেখানে 'অ' শব্দটিই চেপে গিয়েছিল ; আর আলেকজান্দ্রিয়ায় পেঁছুলে জাহাজে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ইংরেজ মন্ত্রী এবং সামুয়েল হোরের এক প্রতিনিধি ; তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, লোকে যে বলছে ইতালিতে তিনি হিংসার কথা বলেছেন, তা সত্যি কিনা ; আর গান্ধীর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এই ফ্যাসিস্ট বয়ানই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দমননীতি চালাবার অজুহাত যুগিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, (আর প্রিভাও এ সম্পর্কে মীরা ও দেশাইয়ের কাছে তিক্তভাবে অনুযোগ করেছিলেন) গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারি প্রিভার নজর এড়িয়ে এক সকালে বেরিয়ে পড়েছিলেন ; তাঁরা পরে প্রিভাকে একথা বলাটা বেশ চেপে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা স্কার্পাকে বিভিন্ন আপত্তিকর জায়গায়, যেমন সেই বালিল্লার পত্রিকায়, তাঁদের নিয়ে যেতে দিয়েছিলেন, ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্র থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ফটো তুলে নিয়েছিল : সন্দেহ নেই যে, গান্ধী ও তাঁর ভারতীয় সঙ্গীরা এর গুরুত্ব দেননি : কিন্তু তাঁদের ত্রুটি হয়েছিল প্রিভাকে কথাটা গোপন করা (তাঁরা তাহলে বুঝেছিলেন যে, প্রিভা তাঁদের বকবেন)। প্রিভা বললেন, জেনারেল মরিসের মন্তেমারিওর ভিলায় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মনে হতো যেন সামরিক শিবিরে ঢুকছেন ; এক ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সৈন্য ঢোকার সমস্ত পথ পাহারা দিচ্ছে। পোপের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গান্ধীর সরাসরি অনুরোধ গিয়েছিল, আর পোপ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অজুহাত দেখিয়েছিলেন রবিবারে তিনি দেখা করেন না, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর কাজ আছে। এরজন্যে গান্ধী তাঁর ক্ষোভ গোপন করেননি। জানি না ওয়াকিবহাল কে তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, পোপ দেখা করবেন ; এবং তাঁর রোম সফরের আংশিক কারণ ছিল এইটিই। ব্যাপার কী ঘটেছিল ? মনে হয়, গোলটেবিল বৈঠকের ক্যাথলিক প্রতিনিধিরা ভ্যাটিকানকে ব'লে থাকবে যে, গান্ধী ভারতবর্ষের মিশনারিদের বিরুদ্ধে বলেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা সঙ্গত হবে না। এতে মুসোলিনিই সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। সাক্ষাৎকারের সময়ে মুসোলিনি গান্ধীকে প্রশ্ন করার প্রায় অবকাশই দেননি। তিনিই সব সময় প্রশ্ন ক'রে গেছেন, ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক

অবস্থার খবরাখবর নিয়েছেন। এটা স্পষ্টই যে, ইতালীয়দের লক্ষ্য হচ্ছে, গান্ধীবাদী আন্দোলন—যার সাফল্য তাঁরা ধরেই নিয়েছে—যখন সফল হবে, তখন ভারতবর্ষে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান দখল করবে। ইতালির আকর্ষণ গান্ধীর উপরে (রবীন্দ্রনাথের মতোই) যে প্রভাব ফেলেছে তা জোরালো। গান্ধীর মনে হয়েছে একই গোত্রের এক দেশে তিনি এসেছেন। তিনি বলেছেন, রোম থেকে ব্রিন্দিসি পর্যন্ত গোটা রাস্তাটা—দৃশ্যাবলী ও ঘরবাড়ির গড়ন—তাঁকে ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আর এই মিলটা কত ঠিক, তা প্রিভারা যাচাই ক'রে এসেছেন।

মার্চ, ১৯৩২। ভারতবর্ষ থেকে ফেরার পর প্রিভার সঙ্গে আলোচনার পরবর্তী অংশ। (তাঁর স্মৃতি থেকে এলোমেলোভাবে নেওয়া।)

শ্রীমতী গান্ধী ভদ্রমহিলা ছোটোখাটো, খুবই ছোটোখাটো, একেবারে ক্ষুদ্রকায়া—ফটো দেখে মোটেই ঠিক ঠিক ধারণা হয় না—যতটা দেখায় ততটা বৃদ্ধা তিনি নন; খুব মিষ্টি স্বভাব, একটু ছেলেমানুষ; কোথায় যাবেন কী করবেন—এ ধরনের ভাব; এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বন্ধুজন ও অন্যান্যরা তাঁকে একেবারেই সমীহ ক'রে চলেন না (ব্যতিক্রম গান্ধী, তিনি তাঁর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়); যারাই তাঁকে কিছু সহানুভূতি দেখায় তিনি তাদের কাছে আসেন আশ্রয় নিতে : যেমন, এক রাতে তিনি ঢুকলেন প্রিভাদের ঘরে, অনুযোগের স্বরে বললেন : "কোথায় যে যাই। সব জায়গায় সব ঘরই ভর্তি।" এক কোণে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে শুয়ে ছোট্টো মেয়ের মতো দু-এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর জাগলেন অবাক হয়ে। বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানালেন এবং নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। গান্ধী যখন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে যতো দুঃখকষ্ট দিয়েছেন তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

গান্ধীর বড়ো ছেলে :—সে একেবারেই ব'য়ে গেছে, বয়স ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে, চুলে পাক ধরেছে, মুখখানা বেশ সুশ্রী—যেমনটি আমি ভেবেছিলাম, বাপের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তেমন কোনো বুর্জোয়া বিদ্রোহী নয়, এক ছন্নছাড়া লোক—মন্দই হোক আর ভালই হোক, কোনো পথেই সে চলতে অক্ষম, একটা ছেড়ে আর একটা ধরছে, কোথাও লেগে থাকছে না, মেয়েছেলের পিছনে ঘুরছে, অন্যের ঘাড়ে খাচ্ছে, ধারদেনা ক'রে বেড়াচ্ছে, এসে অন্নভিক্ষা করছে; পাজী নয়, কিন্তু দুর্বল। গান্ধীর গোটা পরিবার ও বন্ধুজন তার সম্পর্কে অত্যন্ত নির্মম, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। একমাত্র গান্ধী তার প্রতি সদয়, সে ভালো আছে কিনা, খেলো কিনা খোঁজ নেন। প্রিভা দেখেছেন, গান্ধী তার সঙ্গে সস্নেহে কথা বলছেন, সে-কথার মধ্যে দোষারোপের একটি কথাও নেই। অন্য তিনটি ছেলেই অত্যন্ত অনুগত, মেজোটি আফ্রিকায়। ছোটো দেবদাসকে আমরা ভিলন্যভে দেখেছি, (আর কে বিশ্বাস করতে পারে?) সে একজন বড়ো বক্তা, ভারতীয় জনতার উপরে যাঁরা বক্তৃতায় সবচেয়ে প্রভাব ফেলেন, তাঁদেরই একজন।

মীরা কর্তৃত্বপরায়ণা, গোঁড়া, সবসময়েই তার প্রবণতা গান্ধীর কাজকে চরমের দিকে ঠেলে দেবার, অহিংসার মধ্যেও মূলত সে চণ্ডস্বভাবা ;—এবং তার গুরুর বাণী যদি হিংসা হতো, তাহলে সেই হিংসায় সে নিঃসন্দেহে কতো না চণ্ডস্বভাবা হয়ে উঠতো। একমাত্র ওই গুরুকেই (সম্ভবত তাঁর সঙ্গে আমাকেও) সে মানে এবং বিনম্রচিত্তে ভক্তি করে। প্রিভা বলেছেন, বোম্বাইয়ে পুলিশ যখন গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, মীরার চোখদুটো ধকধক ক'রে জ্বলছিল, সে পুলিশদের উদ্দেশে অপমানকর ভাষা প্রয়োগ করেছিল। গান্ধীর প্রথম সেক্রেটারি ও ডানহাত মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই থাকে। অত্যন্ত আত্মাভিমানী, উঁচুদরের চিন্তাবিদ এই ব্রাহ্মণটি ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ান, মীরা যখন (নিজের কর্তৃত্বে) তাঁকে হুকুম করে : 'আপনি এটা করুন।'—"ওটা করুন।" 'না! আমি করবো না।' 'আপনাকে করতে হবে।' 'না ঃ' দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে তিনি বেরিয়ে যান। কিছু পরেই তিনি ফিরে আসেন, ক্রোধের জন্যে অনুতাপ করেন। (জাহাজে এমন দৃশ্য প্রিভা বসে দেখেছেন।) মীরা কিন্তু অনুতাপ করে না। মীরা থাকে ঘাড় উঁচু ক'রে, কঠিন ও উদ্ধত হয়ে। একমাত্র গান্ধীর সমালোচনাই এই গরবিনীকে ভাঙতে পারে। গান্ধী তাকে চেনেন। আর তিনি তার সম্পর্কেও বড়ো নির্মম—অবশ্য তাঁর নিজের ভঙ্গিতে ; প্রিভা দেখেছিলেন গান্ধী মীরাকে জোর ধমকাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর গলা চড়ছে না, 'এক বুড়ী পিসীর মতো' একঘেয়ে একটানা স্বরে একটার পর একটা আপত্তি জানিয়ে চলেছেন। আর তার ফলে মীরা একেবারে ধ্বসে গিয়েছিল। প্রিভারা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মীরা কিন্তু বলেছিল : 'উনি ঠিকই করেছেন। এটা আমার প্রাপ্য ছিল।' (এইরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল সংস্কৃত পড়া নিয়ে : গান্ধী তাকে বলেছিলেন সংস্কৃত পড়তে ; বাজে অজুহাত দেখিয়ে মীরা পড়তে অবহেলা করেছিল। গান্ধী তার সংশোধনের অতীত আলসেমির জন্যে ধমকে ছিলেন। আসলে, মীরা মোটেই চিন্তাশীলা নয়। বইয়ের উপর তার কোনো আগ্রহ নেই। সম্ভবত, তাই বিনা শংকায় গান্ধী পড়ার সুপারিশ করেছিলেন। দেশাই ও প্যারেলালের বেশি প্রবণতা শুধু বুদ্ধিচর্চা ও শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত বই পড়ার দিকে, হাতে-কলমে কাজের দিকে ঠেলে দেবার জন্যে, তাদের বেলায় এই সব নিয়ে থাকাটা গান্ধী নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন।)

প্রিভা দেখেছেন, বোম্বাইয়ে বাঁশের খুঁটির উপরে খাড়া-করা একটা নড়বড়ে মঞ্চ থেকে গোটা ছয়েক মাইকের সাহায্যে (লক্ষাধিক মানুষের) এক বিরাট জনতার সামনে ওই একই 'বুড়ী পিসীর' স্বরে গান্ধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ওই উপরে মঞ্চে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন, এইটুকু দেখাচ্ছে, হাত-পা নড়ছে না,—অতিদ্রুত তাঁর জরুরী কথাগুলোর লাটাই খুলে যাচ্ছেন, কোনো একটা কথার স্বর অন্যটার চেয়ে বেশি চড়া নয়। আর বিশাল জনতার অখণ্ড নীরবতা। পায়ের নিচে উদ্বেলিত এই জনসমুদ্রের মধ্যে মেয়েদের জন্যে একটা জায়গা ঘিরে রাখা আছে, তা করতে হয়েছে গুঁতোগুঁতির হাত থেকে তাদের আড়াল ক'রে রাখার জন্যে। ঘটনা ঘটল এই যে, শতাধিক গান্ধীবিরোধী অস্পৃশ্য বিক্ষোভ দেখাতে

চেয়েছিল। রেস-কোর্সের একেবারে শেষদিকে ঢেউ কেঁপে উঠল, পরেই মেয়েদের ঘেরটা দুলে উঠল—সেটা বুঝতে-না-বুঝতে তখনই দেখা গেল নিঃশব্দে পরপর চার-পাঁচটি ঢেউয়ের মতো তরুণদের (কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের) সারি আলাদা হয়ে গেল, তারা গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে হাতে হাত ধ'রে দাঁড়াল ; একটা কথা না ব'লে তারা ছুটল ভিড়ের মধ্যে গলিয়ে গিয়ে ঘেরের সামনে বেষ্টনী গড়ে তুলতে ; আর কয়েক মিনিটের মধ্যে চার-পাঁচটি মানুষের ঢেউ হৈ-চৈ না ক'রে মারমুখোদের হটিয়ে দিল। সব থেমে গেল। বোম্বাইয়ের পার্টির শৃঙ্খলা বিস্ময়কর। গত এক বছরে এই দিক থেকে লব্ধ অগ্রগতি পার্টির সদস্যদেরও অবাক ক'রে দিয়েছে।

গ্রেপ্তার হবার আগের শেষ কদিন গান্ধীর মনোভাবঃ সবসময়েই অতিনিখুঁত প্রশান্ত। সবচেয়ে দুঃসংবাদের দিনগুলোতে, তাঁর চারপাশের সবাই যখন উত্তেজিত, তিনি ছিলেন হাসিমুখে ; প্রিভাদের খোঁজখবর নিয়েছেন, তাঁদের ঘোরার যে পরিকল্পনা তিনি ছকে দিয়েছিলেন তা ভালো ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে চেয়েছেন। একমাত্র যখন তিনি বড়োলাটের চিঠি পেয়েছিলেন আর তার যখন উত্তর লিখেছিলেন ঠিক সেই সময়টুকুই, তিনি পুরোপুরি আত্মস্থ হয়ে ছিলেন। তার এক মিনিট আগেও নয়, পরেও নয়। বড়োলাটের দ্বিতীয় উত্তর পাবার পর থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে গ্রেপ্তার হবেন ; আর সবাই তার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ; তিনি পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে রাখছিলেনঃ বন্ধুজনেরা পালা ক'রে রাত জেগে নজর রাখছিলেন কখন পুলিশ আসে। একটা রাত কেটে গেল, পুলিশের ভুল হয়েছিল, তিনি যখন বোম্বাইয়ে আছেন, তারা গান্ধীর অপেক্ষায় ছিল বোম্বাই থেকে আমেদাবাদের রাস্তায়। দ্বিতীয় রাতে প্রিভারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জেগে উঠলেন দরজা ধাক্কাধাক্কিতেঃ পুলিশ এসে গেছে। তড়িঘড়ি তারা উঠে এলো বোম্বাইয়ের বাড়ির চত্বরে। সেখানে তাঁকে পেল বন্ধুজনের মধ্যেঃ পুলিশ-কর্তা তৈরি হয়ে নেবার জন্যে তাঁকে সময় দিলেন আধ-ঘন্টা। (সেটা ছিল তার মৌনদিবস, তা শেষ হয়েছে রাত বারোটায়। যে সময়টুকু দেওয়া হলো তা পুলিশ-কর্তা আঙুল দিয়ে ঘড়িতে দেখিয়ে দিলেন। দরজায় কড়া পাহারা। যারা ছিলেন তাঁরা সবাই আকুল হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীমতী গান্ধী কাঁদতে লাগলেন, মীরা যেন তলিয়ে গেল (তারপরই শক্ত হয়ে উঠল পুলিশকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে), ভারতীয় রীতিতে সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন। একমাত্র গান্ধীই হাসিখুশি রইলেন ; শোকাবেগ থামানোর জন্যে যে শিষ্য বা শিষ্যাই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন তারই কাঁধে জোর একটা চাপড় মারতে লাগলেন, (তাঁর আচরণটি প্রিভা এইভাবেই বর্ণনা করেছেন, এর কোনো ভারতীয় রীতিগত অর্থ থাকতে পারে)। সেটা প্রীতিপূর্ণ চাপড়ানি নয়, – চাষার হাতের কড়া থাপ্পড়ের মতো, সেটা বিশেষ ক'রে মীরাকে ধরাশায়ী করার পক্ষে এক রামচাপড়। তিনি হেসেই চলেছেন! প্রিভাদের দেখতে পেলেন, প্রিভারা ছিলেন তাঁর কাছ থেকে কয়েক সার দূরে, তিনি সকলের মাথার উপর দিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে হাসতে হাসতে তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুখের ভাবে যেন বলতে চাইলেনঃ

"আরে! আপনারাও এখানে, দেখেছেন তো, সব দেখেছেন? আরও অনেককিছু দেখবেন।…' যিনি সবচাইতে কাঁদছিলেন (অপ্রত্যাশিত!) তিনি বড়ো এক ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক (যাঁকে গান্ধী মাদলেনের সামনে মার্সাইয়ে কড়া ধাতানি দিয়েছিলেন; কিন্তু তখনই মাদলেন এই সাংবাদিকটির মধ্যে উপযুক্ত নম্রতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছিল; আর প্রিভা বললেন, তারপর থেকে তিনি গান্ধীর পার্টি'র জন্যে কাজ করেই যাচ্ছিলেন, বড়োলাটের উত্তরের আসল বয়ান এসে পৌঁছুবার ২৪ ঘন্টা আগে তিনি গান্ধীকে উত্তরের বয়ান আনিয়ে দিয়েছিলেন)। পুলিশ পাহারায় একটা গাড়িতে গান্ধী চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে প্রিভা ঝুঁকে দেখছিলেন একটা জানলা দিয়ে, জানলার সামনে বোম্বাইয়ের এক বিরাট বিস্তৃত রাস্তা। সেই রাতটা ছিল ঝকঝকে ও কনকনে ঠান্ডা (প্রিভা জোর দিয়েছেন রাতের এই কনকনে ঠান্ডা ভাবটার উপরে, দিনের অসহ্য উত্তাপের সঙ্গে তার প্রতি-তুলনা করেছেন); প্রতিটি বাড়ি অন্ধকার। হঠাৎ—(এক ধুলোর ঝড়ের মতো যে অসাধারণ ও রহস্যময় দ্রুততায় সংবাদ মুখে মুখে ছড়ায়, এ তার এক উদাহরণ) প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি তলায় আলো জ্বলে উঠতে লাগল; প্রতিটি জানলা খুলে যেতে লাগল; প্রতিটি জানলা থেকে জাতীয় পতাকা নড়তে লাগল; আর, রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অগণিত বাহুর এক অরণ্য মাটি ফুঁড়ে উঠল, অগণিত মাথা, ধ্বনি উঠল "গান্ধীজীকি জয়!"

(প্রিভা বললেন, পৌঁছুনোর পর প্রথম দিনেরাতে রাস্তায়, বাড়ির সামনে লোকের ভিড়ের সে কী নিরবচ্ছিন্ন এক চিৎকার-চেঁচামেচি: সমবেত কণ্ঠে মন্দিরে প্রার্থনার মতো, বা জলস্রোতের শব্দের মতো, কিন্তু বড়োই তীক্ষ্ণ। তাতে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন। সবচেয়ে ভিতরের ঘরেও এই নিরবচ্ছিন্ন চিৎকার কথাবার্তা ও চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে সেঁদিয়ে ভরাট ক'রে তুলতো। লক্ষ লক্ষ শব্দের পরম্পরা। প্রতিটি আগন্তুক যে ঢুকবে,—সেই আগন্তুকই দরজার গোড়া থেকেই চিৎকার ক'রে নমস্কার জানাবে; আর রাস্তা থেকে ভিড়ের উত্তর আসবে, গানের ধুয়োর মতো, কখনো তার ঘাটতি হবে না।)

সরকারের কোনো অন্যায় বা কোনো গ্রেপ্তারের সংবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে, প্রতিবাদ জানাতে প্রায় দুদিন অন্তরই বোম্বাইয়ের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। প্রিভা ভেবে অবাক হন, এমন দেশে কী ক'রে ব্যবসাবাণিজ্য চলে!

আশ্রম যাত্রা: গান্ধীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যাশিষ্যার ছোটো দলটি আশ্রমে ফিরে চলল, দলের নেতৃত্ব নিলেন মহাদেব দেশাই; প্রিভারা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। গত রাতে শীতের মধ্যে পুলিশের অপেক্ষায় থেকে প্রিভার গলায় ভীষণ ব্যথা, সঙ্গে জ্বর। ডাক্তার বিধান দিয়েছে একগাদা এ্যাসপিরিন খাবার, যাতে খুব ঘাম হয়; প্রিভার উদ্বেগ তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় রাতে চলতে চলতে কী ক'রে এই বিধান কার্যকর করবেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁকে বললেন: "তাতে কী? আপনার ঘাম হবে, আপনি সার্ট পাল্টে নেবেন। আপনি ভারতীয় রীতিনীতি এখনো জানেন নি।" (সবার সামনেই লোকে জামা-কাপড় ছাড়ে, স্নান করে।) তৃতীয় শ্রেণীতে রাতটা বড়োই

কষ্টকর হয়েছিল। (আর তবুও তো প্রিভারা সুখপোষাকী নন: গান্ধীর সঙ্গে ব্রিন্দিসি থেকে বোম্বাই এসেছেন জাহাজের ডেকে।) ভারতীয়রা গাদাগাদি হয়ে থাকতে অভ্যস্ত; চিবুকের নিচে হাঁটু দুটো মুড়ে জড়োসড়ো হয়ে তারা ঘুমোয় গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো। দেশাই শুয়েছিলেন কামরার বাংকে। ভীষণ ঠান্ডা পড়েছিল। পথ যেন ফুরোতেই চায় না। সকালে অবশেষে আমেদাবাদে পেঁছুলেন (স্টেশন থেকে আশ্রমের পথটার প্রথম স্মৃতি যা প্রিভার মনে আছে, তা হচ্ছে অবর্ণনীয় ধুলো, আর বিশাল বিশাল বাঁদর—দূরে থেকে মনে হয় কুকুর, তারা আর্তনাদ করতে করতে পথের দু'ধারের গাছগুলো বেয়ে বেয়ে উঠছে। তিনি আশ্রমের বর্ণনা দিলেন: বিশেষ খাতির হিসেবে তাঁর ও তার স্ত্রীর জন্যে একটা ঘর পেয়েছিলেন গান্ধীর সঙ্গে এক গুরুতর ব্যক্তিগত আলোচনার পর; সেই আলোচনায় গান্ধী প্রিভার কথা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন, যতদিন ইভকে নিয়ে প্রভুর বেষ্টনীতে থাকবেন তিনি যেন…তিনি যেন সহ…তিনি যেন নিষিদ্ধবৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করেন; প্রভু কিন্তু চারটি নিষিদ্ধ ফলের বীজ পুঁততে কুণ্ঠিত হননি! বিশেষ খাতিরের লোকের মতো ব্যবহার পেলেও (এবং সুইজারল্যান্ডে তিনি সমস্ত আরামবর্জিত হয়ে থাকলেও), এটা বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, গৃহ বলতে যা বোঝায় তার জন্যে আরও কিছু দরকার। বিছানার উপব দিয়ে বিশাল বিশাল গিরগিটি হেঁটে যাচ্ছে, ড্যাবাড্যাবা চোখে তাকাচ্ছে। মাকড়সার কথা না তোলাই ভালো। ঘরের মধ্যে কাঠবেড়ালি ঘুরছে। এক রাত্রে ভালো ক'রে বন্ধ না-করা দরজা ঠেলে এসে এক বিরাট বাঁদর জিনিসপত্র হাতড়াতে শুরু ক'রে দিল। কপাল জোরে, তখন সাপের সময় নয়, তারাও সব অভ্যস্ত অতিথি। কিন্তু বন্দোবস্তের চরম (যদি আমার বলা চলে) হচ্ছে পায়খানা। (আর বর্ণনা শুনে তো আমি হতবুদ্ধি! কারণ জানতাম গান্ধী এটির ওপরে কী গুরুত্ব দেন: কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলে এটিই তিনি প্রথম দেখবেন এবং কঠোর সমালোচনা করবেন: বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গেলে। তাহলে রবীন্দ্রনাথের ও-বস্তুটি কী হতে পারে? আর কবি কোন্ সিংহাসনে বসেন?) সে যাক, আশ্রমের পায়খানা অবশ্য বাগানের শেষ প্রান্তে, ছিটকিনিবিহীন দরজা ভালো ক'রে বন্ধ হয় না, কয়েকখানা পোকায়-খাওয়া তক্তা পাতা, শরীরের ভারে মচমচ্ করে, আর তক্তাগুলো শূন্যে, ঝোলানো দুটো পাত্রের উপরে—একটা সামনের জন্যে, অন্যটা পেছনের জন্যে, যাতে মূল্যবান বস্তুগুলোকে আলাদা ক'রে রাখা যায়। এই উর্ধ্বারোহনের জন্যে অনেক আর্টের দরকার। প্রিভা কখনো তাতে সফল হননি। কাজকর্ম হয়ে যাবার পরে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই ঔদরিক রাবুলের 'পশ্চাদ্দেশের-গদি' আশা করার উপায় নেই। এক টুকরো কাগজ নেই। কাগজ নিষিদ্ধ, সম্ভবত জঞ্জাল এড়াবার জন্যে, যাতে বাছাই করা তৈরি জিনিসগুলোর অকৃত্রিমতা বজায় থাকে। তার পরিবর্তে, দিনের এই কৃত্যাটি সেরে বেরিয়ে আসার পর সবাই এক পাশে গিয়ে স্নান সেরে নেয়। আর যেহেতু অতিথিদের সম্মানে মীরা আশ্রমের এক সম্মানিত শিক্ষকের উপরে জল গরমের ভার দিয়েছিল, সেইজন্যেই দিনের মধ্যে একাধিক বার নতুন ক'রে পদযাত্রা সত্যি সত্যি করা যায় না! না, না, কিছুতেই আশ্রম আর আমার পশ্চাদ্দেশ দেখবে না…এ

তৈরি হয়েছে কোষ্ঠ-কাঠিন লোকদের জন্যে। (গান্ধীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য আছে, আর সেটা তিনি গোটা জগতের সামনে ঘোষণা করেন। আমরা এও জানি, অনেক দিন ধরেই, ওখানেই তাঁর বেশ কিছু অতি উচ্চ (বা গভীর) প্রেরণা এসেছে। 'যেখানে ইচ্ছে হয়, সেখানেই মনের হাওয়া বয়' (Spiritus flat ubi vult)……হে পাঠক, কলা-র (Colas) ছোটো ছেলেটির অশ্রদ্ধায় রুষ্ট হবেন না! আমি নিশ্চিত নই গান্ধী নিজেই হাসবেন কি না… কিন্তু মীরা হাসবে না!) আর যেহেতু আশ্রমের এই নড়বড়ে প্রসঙ্গে এসে গেলাম,— এই সুযোগে সেই ন্যক্কারজনক ব্যাপারটা লিখে রাখছি (এবার কিন্তু হাসছি না।) ভারতের কোনো কোনো জায়গায় জেলের কর্তারা যার মধ্যে তাদের কয়েদিদের ফেলে; কয়েদিরা প্রায়ই সম্মানী লোক। প্রতিদিন সকালে এক নির্দিষ্ট সময়ে, সবাইকে এক সঙ্গে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয় একই জায়গায়, এবং বিধান অনুসারে হুকুম দেওয়া হয় পেট খালি করার। তা তারা পারুক, আর নাই পারুক, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একবারই মাত্র তাদের সুযোগ বরাদ্দ। এর মাঝখানে পশ্চাদ্দেশে হাওয়া লাগাবার হুকুম কারুর নেই। লাইন বরাবর হেঁটে-যাওয়া কর্পোরালের হুকুমনামায় এই সামরিক ব্যায়াম ভারতীয়দের আত্মাভিমানের পক্ষে সবচেয়ে জ্বালাকর অসম্মান। নিষ্ঠুরতার চেয়েও এই বীভৎসতা সম্পর্কেই তারা বেশি আক্রোশ পুষে রাখে, আর তাতেই জেলের মধ্যে তারা প্রায়ই ভেঙে পড়ে। (এই একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমরা বড়ো কম খবর রাখি। এইসব ভারতীয়দের অন্তহীন ধৈর্য, তাদের হৃদয়ের মহত্ব—যা তাদের যন্ত্রণার লজ্জাসরমকে পাহারা দিয়ে রাখে, এবং ইউরোপীয় সাংবাদিকদের অপরাধী সুলভ উপেক্ষা, ভারতবর্ষের কোনো কোনো জেলখানার বর্বরতার কথা জানতে দেয়নি।) দু'তিন বছর আগে যে রাজেন্দ্র প্রসাদকে দেখেছিলাম শিরদাঁড়া-খাড়া-করা, ছিপছিপে, অতি সুন্দর, অতি গর্বিত চেহারা, প্রিভার চোখে তাঁকে ঠেকেছে নুয়ে-পড়া, ভেঙে-পড়া, মৃত্যু-পথযাত্রী। প্রিভা বললেন: "সেরা ভারতীয়দের প্রতি, এইসব মহৎ মানুষদের প্রতি আচরণের নিষ্ঠুরতাই ইংলণ্ডের সবচেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ।" আর এইকথাই আমি জহ্লাদদের কপালে খোদাই ক'রে দিলাম।

১৭ এপ্রিল, ১৯৩২। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধি আমাকে দেখতে এসেছেন: দেওয়ান চমনলাল শ্রমিক প্রতিনিধি ও স্বরাজ্য পার্টির এক তরুণ নেতা; সম্মুখম চেট্টি মালিক প্রতিনিধি ও ভারতীয় লেজিসলেটিভ চেম্বারের সহ-সভাপতি; ডঃ পি. পি. পিল্লাই—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ব্যুরোর দিল্লির স্থানীয় সেক্রেটারি। তাঁদের সঙ্গে আছেন রাও, কয়েক বছর ধরে তিনি জেনেভাতেই আছেন…—তাঁদের কথা অনুসারে, তাঁরা তাঁরই কাছে তীর্থযাত্রায় এসেছেন, যিনি ইউরোপে ভারতীয় স্বার্থের 'মিশনারি'। তাঁদের হাতে রয়েছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও বিখ্যাত মানুষদের জীবন নিয়ে লেখা আমার বইগুলো! আমার যদি ভুল না হয়, তাঁরা সকলেই পাঞ্জাবের লোক; লাজপত রায় ও ভারতের অন্যান্য নেতা-

ব্যক্তিদের তাঁরা ভালো করেই জানেন। তাঁদের কেউই এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি ; কিন্তু মনে করছেন ভারতবর্ষে ফিরলেই হবেন, বাস্তব বুদ্ধি দিয়েই তাঁদের দেশের মানুষ এবং ঘটনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা আছে ; কিন্তু বুঝতে পারা গেল, তাতে গান্ধীর ক্রিয়াকর্ম সমালোচনা করতে তাঁদের একটুও আটকালো না ; আমার বিশ্বাস, সমর্থনে তাঁরা বরং জহরলাল নেহেরুর দিকেই ঝুঁকেছেন ; নেহেরুও গান্ধীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন ; কিন্তু অনিবার্যভাবে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে গান্ধীর সঙ্গে বিরোধিতায় পড়বেন, কারণ চিন্তাধারায় তিনি অনেক অগ্রসর। তাছাড়া গান্ধী যে তাঁর প্রভাবে পড়তে পারেন না, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করলেন না ; কারণ, আমারই মতো, তাঁরা গান্ধীর স্বভাবগত নবীকরণের বিস্ময়কর ক্ষমতা—তাঁর তরুণজনোচিত নমনীয়তার কথা জানেন, তা কখনো নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা নয়, তা এক নিরন্তর বিবর্তন। তাঁরা পণ্ডিত মালব্য সম্পর্কে খুব বেশি সদয় নন। তাঁকে তারা মনে করেন বড়ো বেশি ভীতু এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী, যদিও গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর থেকে কথাবার্তায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য ও নিঃশংক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। (আমার দিক থেকে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং আমার 'ভারতবর্ষের সংবাদ'-এ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।)

লণ্ডন থেকে ফেরার পথে প্রিভাদের সঙ্গে ট্রেনে তাঁদের দেখা হয়েছে এবং প্রিভাদের সঙ্গেই তাঁরা এসেছেন। ভারতবর্ষে যে সফর ক'রে এলেন, সে-সম্পর্কে এদম্ প্রিভা লণ্ডনে অনেকগুলো বক্তৃতা দিয়েছেন। সংক্ষেপে প্রিভা আমাদের সেসবও জানিয়েছেন। সর্বত্র তাঁকে প্রাচীন ইংরেজদের বিপুল সৌজন্য দেখানো হয়েছে, এমনকি শত্রুরাও দেখিয়েছে ঃ পুরোপুরি খোলাখুলি কেউ তাদের কিছু বলেন তা তারা পছন্দ করে—(তবে কি না, তাতে সমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধা বজায় থাকা চাই ;—আর এই কাজের পক্ষে প্রিভা হচ্ছেন আদর্শ ব্যক্তি ঃ যা তিনি ভাবেন, বলেন শান্তভাবে, ভদ্রভাবে ; আর তাঁর মুখের অতি বেদনাদায়ক সত্যও গর্বিত প্রতিপক্ষকে একটুও আহত করে না।) কমন্স সভায় উল্লেখযোগ্য ভাবে এক দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল, সেখানে শ্রোতা ছিল ৪০ জন অতি-রক্ষণশীল সদস্য, তার জায়গায় ৪ কি ৫ জন সমাজতন্ত্রী (সেই চিরকালের একই নিয়ম, গোটা ইউরোপ জুড়ে যা সমাজতন্ত্রী দলের অধঃপতনের সত্যতাই প্রতিপাদন করছে ; ক্ষমতা অধিকারের পূর্বাহ্নে বা ক্ষমতা অধিকারের অভিলাষী এবং ক্ষমতা লাভের জন্যে সমস্ত আপসের জন্যে প্রস্তুত, পশ্চাতের যন্ত্র হিসেবে তৈরি এই সমাজতন্ত্রী দল, এক জাতীয়তাবাদী, সামরিক, উগ্রদেশপ্রেমিক মন নিজেই অনাবৃত ক'রে ফেলেছে ও সত্য থেকে দূরে পালাচ্ছে। তাদের জায়গায় পুরনো রক্ষণশীলেরা নিজেদের নীতি সম্পর্কে অনেক বেশি স্থিরনিশ্চিত ও সরকারের উত্থান-পতনে অভ্যস্ত ; তারা সব শুনতে প্রস্তুত।) ২০-২১ মিনিট বলার পর প্রিভা আক্রান্ত হয়েছিলেন রক্ষণশীল শ্রোতাদের অস্বস্তিকর প্রশ্নবাণে। বিশেষ ক'রে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ "আপনার মতে, আমরা ভারতবর্ষকে হারিয়েছি ?" আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "ইয়েস স্যার।" তাঁর উত্তরে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি, ক্লাস হলে

যেমনটি ঘটতো। কিন্তু তখন উঠেছিলেন লর্ড পোর্টল্যান্ড (যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে) এবং গম্ভীর ভাবে তাঁকে বলেছিলেন : "সরকারের দীর্ঘকালের উত্তরাধিকারে আমরা ভারতবর্ষের প্রয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছি, আপনি কি মনে করেন, একজন পথচলতি বিদেশী দর্শকের চেয়ে—সে-দর্শকের যতো মূল্য, যতো আন্তরিকতাই থাকুন না কেন—আমরা ভারতবর্ষের প্রয়োজন ভালো বুঝি না? আর প্রিভা শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : "নো স্যার। কারণ আপনারা কখনো সত্যিকারের ভারতবর্ষকে দেখেননি, আপনাদের ব্রিটিশচক্রের বাইরে কখনো আপনারা বেরোননি। আপনারা কখনো তৃতীয় শ্রেণীতে চড়েননি···ইত্যাদি।" আর মহানুভব লর্ডরা গম্ভীর ভাবে শুনেছেন, চিন্তা করেছেন, অবশ্য মোটেই সায় দেননি; কিন্তু সোজাসুজি ছড়ানো কথা, তাঁদের মধ্যে সোজাসুজিই রক্ষিত হয়েছে, অংকুরিত হয়েছে। প্রিভা প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন মাত্র একবার, তা কোয়েকারদের সংগঠিত এক সম্মেলনে; আর যদিও সেখানে গান্ধীর প্রতি সহানুভূতির পরিবেশ দেখতে পেয়েছেন, বলতে গিয়ে এটাও তিনি খুব ভালো ক'রে অনুভব করেছেন যে, অ-প্রতিরোধের, শান্তিবাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দিকটি ইংরেজ জনতাকে সামান্যই স্পর্শ করেছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীতে, এ্যাংলিকান চার্চের উচ্চপদ ব্যক্তিদের মধ্যেই তিনি এইসব চিন্তার ছাপ দেখতে পেয়েছেন; না জেনেও যিনি মহৎ খ্রীষ্টান, সেই গান্ধীর প্রতি ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁদের অপরাধের মনোভাবটি (meaculpa) তাঁরা খোলাখুলিই তাঁকে জানিয়েছেন; তাঁরা কথা দিয়েছেন সত্বর তাঁরা গান্ধীর প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। তাঁরা তাঁকে বলেছেন, তাছাড়া, তাঁরা সদ্য সদ্য ভারতের ইংরেজ মিশনারিদের কাছ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন (ওয়েস্টমিনস্টারের ডীন), প্রিভা যে তথ্যাদি দিলেন তার সঙ্গে তার সর্বাংশে মিল আছে। প্রিভা লয়েড জর্জের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন, তাঁর বিস্ময়কর প্রাণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হয়েছেন। লয়েড জর্জ তাঁর মিষ্টি ভরাট গলায় যত বলেছেন, তার চেয়ে অনেক কম শুনেছেন। গান্ধীর সম্পর্কে তিনি অনন্যসাধারণ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : "মিঃ গান্ধী সোজা পথের লোক, বিশ্বস্ত ও অসাধারণ বুদ্ধিমান; তিনি ঠিকই করছেন; আমি যদি ক্ষমতায় থাকতাম, তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা আমার পক্ষে সহজ হতো; এমন ধাতুর তৈরি প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক করেও সুখ···আহা! এমনটির সাক্ষাৎ যদি আয়ারল্যান্ডে পেতাম!···আমি তাঁর নৈতিক গুণাবলীর কথা বলছি না...(আর তিনি যেন বলতে চাইলেন : "ওতে আমার আগ্রহ নেই।")···কিন্তু তিনি মানুষটি খাঁটি ও বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিবিদ···আমি যদি সরকারের মাথা হতাম, বল্ডুইনকে তাঁর কাছে পাঠাতাম। তাঁরা একসঙ্গে বসে প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারতেন।"—বড়োলাট লর্ড উইলিংডনের কথা উঠলে তিনি প্রিভাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : "কতক্ষণ তাঁর সঙ্গে আপনি ছিলেন?"—"পঁয়তাল্লিশ মিনিট।" (খুব শান্তভাবে) : "তাঁর মাথায় ঘিলু ব'লে যে কিছু নেই, একথা বুঝতে কি পনের মিনিটই যথেষ্ট ছিল না?" আর তারপরেই গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন : তিনি আমার বন্ধুর দলেই।" সুইজারল্যান্ডে, ফ্রান্সে এবং ব্রিন্দিসি পর্যন্ত যে-সব হৃষ্টপুষ্ট পুলিস গান্ধীর সঙ্গে ছিল, প্রিভা শেষ

দিন লন্ডনে তাদের সঙ্গে ডিনার খেয়েছিলেন। বেশ প্রীতির সঙ্গেই তারা তাঁর কথা বলেছিল। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল ; 'ওল্ড বয়'। তাদের খাতির-যত্নের জন্যে ধন্যবাদ স্বরূপ (তারা তাঁর খাসকামরায় ভৃত্য হয়ে পড়েছিল) প্রত্যেকেই গান্ধীর কাছ থেকে একটা ক'রে ঘড়ি উপহার পেয়েছে ; উপর-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে-ঘড়ি তারা রাখতে পারে কি না আর তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারে কি না। তাদের বলা হয়েছে, ঘড়ি রাখা চলবে, কিন্তু তাঁকে সোজাসুজি চিঠি লেখা চলবে না। গান্ধী যে-জেলে আটক আছেন, তার কর্তার মাধ্যমে ইংলন্ডের পুলিশই তার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। চুপচাপ থাকার জন্যে যে অভদ্রতার মধ্যে তারা পড়তে বাধ্য হয়েছে, তাই নিয়েই ভেবে মরছে। তারা প্রিভাকে অনুরোধ করেছে তিনি যেন গান্ধীকে এসব জানিয়ে দেন। তারা তাঁকে চুপি চুপি বলেছে : "আর শিগ্‌গিরই 'ওল্ড বয়' এখানে ফিরে আসবেন আর এক নতুন গোলটেবিল বৈঠকে বসতে।"

প্রিভা লন্ডন ছাড়ার পর থেকে আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজের (বিশেষ ক'রে 'ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ার' পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যেকার) কাছ থেকে বহু চিঠি পাচ্ছি ; প্রিভা ইংলন্ড হয়ে যাবার ফলে যে মঙ্গল হয়েছে, তাঁর যথাযথ, খোলাখুলি ও মাপা কথাবার্তায় সেখানে যে-বীজ বুনে এসেছেন, তাতে সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন (তাতে আমিও উপকৃত হয়েছি)। আর তাঁরা চাইছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তিনি যেন আবার ফিরে আসেন, ইংলন্ডের সমস্ত প্রদেশগুলোয় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে প্রতিপক্ষদের মধ্যে ইংরেজরাই সবচেয়ে সোজাসুজি জাত। সবচেয়ে খারাপ যা তারা করে বা করতে দেয়, তা হয় কল্পনাশক্তির দৈন্যের ফলে। যথাযথ ও নিশ্চিত, নাছোড়বান্দা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করার আগে, যা তারা চোখে দেখে না, তার কথা কল্পনাও করতে পারে না। 'টাইমস্' ও 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর যে-সব বড়ো বড়ো সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রিভা কথা বলেছেন, তাঁরাও ভারতবর্ষের ঘটনাবলী, ভারতীয়দের মানসিক অবস্থা ও হিংসা প্রয়োগের "উপলব্ধি" করেননি। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রিভা একটা 'লাঠি' তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন (মাথায় লোহার ভারি একটা তাল বসানো লম্বা ধরনের সেই একটা গুঁতোমারার জিনিস) এবং বক্তৃতার সভাগুলোয় সেটাকে দেখিয়ে বেড়িয়েছিলেন। দর্শকেরা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। ভারতবর্ষের ইংরেজ পুলিশ এই জিনিস ব্যবহার করে, হাতজোড়-করা শান্ত ও নিঃশব্দ জনতার মুখে-চোখে প্রাণপণে এই দিয়ে মারে—একথা ভাবতেও তারা আতংকিত হয়ে উঠেছে।

এপ্রিল, ১৯৩২। 'য়ুরোপ'-এ আমি তৃতীয়* 'ভারতবর্ষের সংবাদ' পাঠালাম।

মঁপেলিয়ে-র স্কচ ও ভারতীয়দের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক স্যর প্যাট্রিক গেডেসের মৃত্যু হয়েছে মঁপেলিয়ে-য় (১৭ এপ্রিল)। তিনি ছিলেন স্যর জগদীশচন্দ্র

---

* প্রবন্ধের পূর্ণ বয়ান পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

বসু ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির একজন বড়ো বন্ধু। তাঁর কলেজটি ছিল ফ্রান্সে ভারতীয় চিন্তার একটা কেন্দ্র, একটা খাঁটি আশ্রম। বহুকাল আগে সেই এডিনবরায় তাঁর সঙ্গে আমার বোনের পরিচয়; আমাদের যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্র ও প্রকাশিত বইপত্রের মধ্যে দিয়ে।

আগস্ট, ১৯৩২। এক অতি বিস্ময়কর চিঠি। যুগের নৈতিক দলিল হিসেবে এটাকে লিখে রাখতেই হবে…যিনি লিখছেন, তিনি শুধু নামের আদ্যাক্ষরগুলো দিয়েছেন (কিংবা "Deo Soli Gloria" ল্যাটিন কথাগুলির আদ্যাক্ষরই হবে) একটি অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রবল প্রবাহের কালে, কেমন ক'রে সকল পথই রোমে—অর্থাৎ আজকের দিনে, মস্কোয় গিয়ে পৌঁছোয়। স্রোতের তোড়ে ভেসে-যাওয়া মন নিজেকে বোঝায় যে, যা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে তা সে-ই বাছাই ক'রে নিয়েছে, আর ভেসে থাকার জন্যে যে-কোনো পন্থা আঁকড়ে ধরে।…তিনি একবছর আগে আমাকে আর একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলেন। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন বেলজিয়ামের এক হাসপাতালের নার্স; ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলো তিনি পড়েছিলেন। শুধুমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত সহমর্মিতা নিয়ে নয়, এক ঐকান্তিক অনুরাগ নিয়ে তিনি আমাকে তাঁর মনের কথা বলেছিলেন; মনে হয়েছিল, অনেক দিন ধরে যেন তাঁর মন পথ হাতড়াচ্ছিল : মুখ্যত তিনি তান্ত্রিক যোগের পথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন এবং তাঁর চিন্তা এমনই গুরুতর ছিল যে তাতে দ্ব্যর্থবোধক কোনো ব্যাখ্যার স্থান ছিল না। মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আর আমিও তাই ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তাঁর সাড়াশব্দ ছিল না। তিনি আমাকে লিখছেন ২০ আগস্ট নাগাদ।

"…এক বছরের কিছু আগে, আমার পূর্ব-ইতিহাসের কোনো জিনিস মহাদেবীর দীক্ষিতা ও স্বামী শিবানন্দের শিষ্যা হবার সেই অদ্ভুত ভবিতব্যের প্রতি আমাকে অনুরক্ত ক'রে থাকতে পারে, আপনারই অনুরোধে, আমি তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার চিঠিটা অত্যন্ত খারাপ লেখা হয়েছিল, কারণ তখন আমি শারীরিক ও মানসিক এক গভীর ধকলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিন মাসের অসুস্থতার পর তার জের মিটেছিল। সেই চিঠির শেষে আমি আপনাকে লিখেছিলাম : 'আমার সামনে এখন সব কিছুই করার রইল।' তখন আমি দেখতে পাইনি যে আমার জন্যে শান্তি এতো কাছে, দেখতেও পাইনি, আমার ভবিতব্য কী হবে এবং যা আমার একমাত্র বাসনা—সত্তার (Réalité) সঙ্গে সেই মিলন কোন্ রূপের মধ্যে উপলব্ধি করবো। আর সেই মিলনে পৌঁছুবার জন্যে ও আমার পথ বেছে নেবার জন্যেই, সবার আগে আমার প্রয়োজন হয়েছিল,—রুচি, অরুচি, ছোটোখাট সমস্ত খেয়ালখুশি—যারা প্রকৃত বস্তু থেকে আমার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের সঙ্গে আমার 'আমির' প্রতিরোধকে জয় করার। আর

সেই জন্যেই—আন্তর নিয়মানুবর্তিতার কর্মে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—আমার দীক্ষা গ্রহণের প্রথম বছরটি ছিল এক নিদারুণ সংগ্রামের পর্ব, তা আমাকে দৈহিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল, কিন্তু আমাকে জয় এনে দিয়েছিল। আমার আন্তর প্রতিরোধের অবসান হয়েছিল, আমার ও বাস্তব সত্তার মধ্যেকার বিরোধিতা ঘুচে গিয়েছিল। তখন আমার বৃত্তির স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করেছিলাম এবং এইটিই দেখেছিলাম : দশ বছরেরও বেশি আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা, আমার ধ্যান, আমার অনুসন্ধান, আমার সংগ্রাম আমার বিশ বছরের বিশ্বাসে আমাকে সোজাসুজি পেঁছে দিয়েছিল ;—এ সেই বিশ্বাস, যাকে তখনও পর্যন্ত অজানা সমস্ত কিছুর সামনে সন্দেহ করেছি, কিন্তু যাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করিনি ; সেই বিশ্বাসটি হচ্ছে—কমিউনিজম।

কমিউনিজমের মধ্যে আমি শুধুমাত্র 'ধর্মকে', আমাদের যুগের নিয়মকে দেখিনি, —বিশ্বজনীন শৃংখলার সম্পূর্ণীকরণকে, ঐক্যের উপলব্ধির একমাত্র বনিয়াদকে দেখেছি এবং সবার উপরে এর মধ্যে আমি মহা জাগতিক শক্তির ধ্বংস ও সৃষ্টির দ্বৈতরূপের বিপুল প্রকাশকে দেখেছি। আমি মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করেছিলাম : হিন্দু গোঁড়ামি থেকে মার্ক্সীয় গোঁড়ামিতে ঝাঁপ দেওয়াটা একটা বড়ো ঝাঁপ। কিন্তু তা কি ভিন্নরূপে, অনন্য সত্তার (l'Unique Réalité) একই অনুসন্ধান ও একই স্বীকৃতি নয় ? জগতে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে সত্তার কাজে লাগার জন্যে সত্তার ক্ষয়িষ্ণু রূপগুলোকে কি ত্যাগ করবো না ? আর যতো অদ্ভুতই ঠেকুক না কেন, এই ভাবেই কমিউনিজমের মধ্যে আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ ও উপলব্ধিকে খুঁজে পেয়েছি। আর এই একই ভাবে আমি খুঁজে পেয়েছি শান্তি ও আনন্দ, সত্তার সঙ্গে সংযোগের, বিশ্বজনীন জীবনে আমার 'আমিকে' আত্মীভূত-করণের বিপুল আনন্দ। এখন আমার সব সন্দেহ, আমার সব উদ্বেগ চিরকালের জন্যে মিটে গেছে। আমার জীবনের, আমার 'আমির' কোনোই গুরুত্ব নেই। আমি সর্বহারার বিপ্লবের সেই বিশাল আন্দোলনের শুধুমাত্র একটি অণু, যার নেতৃত্বে রয়েছে লেনিনের পার্টি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমার বর্তমান বিবর্তনে সবচেয়ে প্রভাব ফেলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মনন বা ভক্তির ধ্যানের ব্যক্তিগত সুখ থেকে—নিজের জন্যে সমস্ত অনুসন্ধান থেকে—তিনিই আমাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমি জগতের স্থূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন, জনগণের সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, একমাত্র ভক্তি, যার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এইভাবেই তিনি আমাকে পেঁছে দিয়েছেন অন্য এক জনের কাছে, যাঁকে এই জীবনে গুরু বলে মানতে পারি,—যিনি 'আমাদের মহান নেতা'—যাঁরনাম স্তালিন।

আপনি নিঃসন্দেহে মনে মনে ভাবছেন, আমার সেই ধর্মীয় প্রত্যয়গুলোর কী হলো। সেখানেও আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমি শুধু তাঁরই শিক্ষাকে অনুসরণ করেছি। অভিজ্ঞতা-লব্ধ না হলে কোনো কিছুই বিশ্বাস করা উচিত নয়—এই কথাই কি তিনি নিরন্তর ব'লে চলেন নি। যতদিন না ধর্মীয় শিক্ষা মানব জনসাধারণের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়; এই অন্ধ

বিশ্বাস যা কারুর কারুর ক্ষেত্রে অত্যাচারের একটি পন্থা—জনগণের পক্ষে কুসংস্কার, আফিং—তার পরিবর্তে নাস্তিকতা জনগণের পক্ষে কি ততদিন বাঞ্ছনীয় নয় ?

যদি এইসব জিনিসের একই সত্তা থাকে, তা হলে একদিন নিশ্চয়ই সকলের দ্বারাই প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হবে। কিন্তু আমার যা অপরিহার্য, তা হচ্ছে এক অনন্য সত্তায় বিশ্বাস – সমগ্র জীবনে প্রকাশিত – চেতনা ও মহা জাগতিক শক্তি—এবং সেই ঐক্যের সঙ্গে সচেতন মিলনের অনুসন্ধান (প্রকৃতপক্ষে সেই মিলন বরং সেই তাদাত্ম্য চিরকালই আছে।)—কোনো ধর্ম, কোনো রহস্যবাদের চেয়ে বলশেভিকদের মহৎ সামাজিক কর্মের মধ্যেই আর এইটিই সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করেছি।

আর অন্যসব – আত্মার অমরত্ব, মরণোত্তর জীবন, আবার দেহধারণ, অলৌকিক অবস্থা ও ক্ষমতা, ইত্যাদি এরা সবই প্রকল্প (hypothèse), এখনো প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়নি, একদিন হবে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব আমার একমাত্র বিশ্বাস, আমার একমাত্র ধর্ম—ঐক্যের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে না, কিছুমাত্র আঘাত করে না।

এই ভেবে আমি আপনাকে লিখছি যে, এক দিকে শাক্তদীক্ষার আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা,– অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব—কোন্ কার্যকর সিদ্ধান্ত আমাকে পরিচালিত করেছে, তা দেখার জন্যে এ আপনার কিছু আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ যুগের সঙ্গে ও বর্তমান সমস্যাগুলোর সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাকে খাপ খাওয়াতে নিজেকে খাঁটিভাবে বাধ্য করেই আমি আমার পুরনো কমরেডদের সঙ্গে মিলেছি। আর তা ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণী কি মানবতার সমস্ত মহৎ স্বপ্নের সত্যিকার উত্তরাধিকারী নয় ? অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সঙ্গে ডি. এস জি।”

আগস্টের শেষ ১৯৩২। শ্রীমতী ক্লেমাঁত মারেনি (সোফিয়ার বোন) বড়ো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লুগানোয় কয়েকদিন পার্ক-হোটেলে আছেন। আর, তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে আমার লাভ হলো, গান্ধীর রোম হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পূর্ণ করা গোলো। আমার পছন্দমাফিক গান্ধীর গৃহস্বামী হবার জন্যে, আমি যতো ভয় করেছিলাম, মরিস ততো উদ্বিগ্ন হননি। সতর্কতা হিসেবে তিনি তাঁর সমর-মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আর তিনিও তাঁর দিক থেকে আলোচনা করেছিলেন মুসোলিনির সঙ্গে, মুসোলিনি এতে আপত্তি করেননি,—আমার সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘অমন বড়ো লেখক সম্পর্কে আমার কোনোই বিরূপ মনোভাব নেই,’ এবং এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বরং তাঁকে খুশীই মনে হয়েছিল। এমনকি কন্‌সাল স্কার্পা (যুক্তিসঙ্গতভাবেই গান্ধী যাঁকে অবিশ্বাস করেছিলেন) শ্রীমতী মারেনিকে বলেছিলেন, আমি যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম তাতে সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ঃ কারণ গান্ধী রোমে এলে তাঁর সম্পর্কে কেমন ব্যবহার সঙ্গত হতো, তা জানা ছিল না। অন্যদিকে, রোমের জনসাধারণের মধ্যে রক্তমাংসের গান্ধী যে গভীর আন্তরিক, বোধগম্য উৎসাহ জাগিয়েছিলেন, শ্রীমতী মারেনি (হেলবিগের

কথার মতোই) সেই উৎসাহের হতবাক্ করা আনন্দের পুনরাবৃত্তি ক'রে গেলেন। যখন গান্ধী চলে গেলেন, স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তিনি ছিলেন, তিনি শুনেছেন, সাধারণ মানুষ তাঁকে সন্ত ফ্রাঁসোয়া দা'সিজের সঙ্গে তুলনা করছে, কিংবা বলছে, এক 'যিশুখ্রীষ্ট নবকলেবর ধারণ করেছেন, এ এক অলৌকিক ব্যাপার…' ('Jesu Christo redivivo, senza miracoli…'

সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। লুগানোয় ছয় সপ্তাহ। ভিলন্যভে ফিরলাম ১ সেপ্টেম্বর। চলার পথে থামলাম…এক রাতের জন্যে বের্নে। সর্বশেষে থামা ফেডারেল মন্ত্রী '—'কে দেখার জন্যে। যে অসন্তোষ তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ করলেন না, তা করলেন গান্ধীর বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সরকার অস্পৃশ্যদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের আইনটি যদি প্রত্যাহার না করে (এই আইন, তাদের রক্ষা করার' ভন্ড অজুহাতে, জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে চিরকালের মতো অস্পৃশ্য ক'রে রাখতে চলেছে), তাহলে ২০ সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমরণ অনশনের যে সিদ্ধান্ত গান্ধী সম্প্রতি নিয়েছেন, তা '—'এর মনে জাগিয়েছে ক্ষোভ, অস্বস্তি, বিরক্তি, যা তিনি গোপন করতে পারলেন না। বোঝা গেল, এটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না… 'না, না, এটা ঠিক হলো না!…' সরকারী এই লোকটি বলশেভিকদের সঙ্গে (বিরুদ্ধে) অনেক বেশি সহজ হতে পারেন। গান্ধীর অহিংসা তাঁর বোধশক্তির বাইরে। কোন উপায়ে তাকে আটকানো যায়?…তিনি বললেন: 'কিন্তু পরিণামে তা তো হিংসাই!…' আমি বললাম: 'তা তো বটেই!…অ-গ্রহণ সব সময়েই ছিল এক হিংসা। কিন্তু সেটাই সবার চেয়ে মানবিক ও বীরোচিত। সে আগুনের অংশ…' ফ্রান্সে ও সুইজারল্যান্ডে রাজনীতি-করা (বা রাজনীতিতে নাকগলানো) মানুষগুলোর মধ্যে আমি প্রায়শই এই বিরক্তিমাখা তিক্ততা অনুভব করেছি…এঁরা গান্ধীর চেয়ে স্তালিনকে অনেক সহজে তারিফ করবেন—যদি স্তালিন তাঁদের পক্ষে থাকেন। আর সেটা ভালোই দেখা যাচ্ছে মুসোলিনি সম্পর্কে তাঁদের গোপন সৌজন্যে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। গান্ধী মরতে চলেছেন—(ভারতবর্ষের সংবাদে এরই মধ্যে তাঁর অবস্থা সংকটজনক ব'লে বর্ণনা করা হচ্ছে, অনশনের কয়েকটা দিন কেটেছে, এ সময়েও তিনি রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করতে চাননি)—এই চিন্তাই আমার মনে হানা দিচ্ছে, আর হানা দিচ্ছে ইউরোপীয় "আদর্শবাদীদের" নির্বোধ ঔদাসীন্য; অহিংসার এই সর্বশেষ বীরের বিলুপ্তি ও পরাজয় ঘটলে জগতের ভবিষ্যৎ ও তাঁদের ধ্যানধারণার পক্ষে তার অর্থ কী হবে, তা তাঁরা "উপলব্ধি" করছেন না। ইউরোপে গান্ধীকে সাহায্য করতে কেউ আঙুলও নাড়াচ্ছেন না। বালখিল্য কোয়েকাররা ২৪ ঘন্টার এক হাস্যকর অনশন ছাড়া ফলপ্রদ অন্য কিছু খুঁজে পাননি! লন্ডনে যিনি

সত্যি সত্যি সক্রিয়, তিনি সি. এফ. এনড্রুজ। তিনিই একমাত্র লোক যাঁর কথা ইংরেজ সরকার শুনতে পারে। শ্রীমতী কাঞ্জিন্স নামে এক ইংরেজ থিওসফিস্ট প্রায় বিশবছর ধরে ভারতবর্ষে ছিলেন, তিনি জেনেভায় ৬ অক্টোবর (সেটা বড়োই দেরি) ভারতবর্ষের জন্যে অন্তর্জাতিক দিবস পালনের আয়োজন করছেন। এতে অংশগ্রহণের জন্যে কোনো নামকরা ফরাসীকে পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ অসুস্থ, কেউ কেউ স্বার্থপরের মতো ভাবছেন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যাঁর উপর নির্ভর করা গিয়েছিল সেই এ্যালবার্ট শ্‌ভেইট্‌জেরও অস্বীকার করেছেন (কিন্তু তাঁর কাজের চাপ খুব, আর আমার মতোই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে); আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁকে জোর দিয়ে লিখতে; আমি তাঁকে লিখলাম (২৩ সেপ্টেম্বর):

"·· ব্যাপারটা ব্যক্তি-গান্ধীর নয়। ব্যাপারটা ভারতবর্ষেরও নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে, গান্ধী যে কারণটির প্রতিনিধিত্ব করেন—তার; এবং তার অভিজ্ঞতা · তা সে বিজয়ী হোক বা পরাজিত হোক—এক শতাব্দী বা তারও বেশি ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত করতে পারে: ব্যাপারটা হচ্ছে অহিংসার। অনেক বছর ধরে আমি জগতের—এবং বিশেষ ক'রে রাশিয়ার ও এশিয়ার—সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছি। ভারতবর্ষের 'সত্যাগ্রহ' কী ক্রোধ এবং কী আশা জাগিয়ে তুলেছে, তা আমি জানি। আমি জানি যে, ইস্রায়েলের এক বিচারকের পরিচালনায় একটা জাতির এই বীরোচিত ও ধৈর্যশীল অভিজ্ঞতাই হচ্ছে একমাত্র বাঁধ,—সর্বশেষ বাঁধ, যা সঞ্চিত হিংসার বিপুল স্রোতকে এখনো আটকে রেখেছে। কারণ সামাজিক পরিবর্তন, বা আরও ভালো, হঠাৎ পরিবর্তন, যা মারাত্মক ও জরুরি, বিনা ঘৃণায় তা সম্পন্ন করার পক্ষে এইটেই একমাত্র শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র। গান্ধী না থাকলে, এই স্রোত গোটা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবে! আর আমিই সকলের আগে চিৎকার ক'রে বলবো: "ভাসিয়ে দে!" কারণ আজকের সামাজিক অবস্থাকে, যে-কোনো মূল্যে, ঝেঁটিয়ে ফেলতে হবে। তা ফেলা হবেও···"

তাই আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তিনি যদি আসতে না পারেন, যেন একটা বাণী অন্তত পাঠান "সেই মানুষটির জন্যে, যিনি সম্ভবত মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সময়ের শান্তির সর্বশেষ আশাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন"।

কিন্তু এ্যালবার্ট শ্‌ভেইট্‌জের গুন্সবাখ (২৪ সেপ্টেম্বর) থেকে উত্তর দিয়েছেন:

"প্রিয় বন্ধু আপনি যা লিখেছেন তাতে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি, আর অভিভূত হয়েছি এইজন্যেও যে, আপনার স্বাস্থ্যের এই অবস্থাতেও আপনি আমাকে লেখার কষ্ট স্বীকার করেছেন...আপনি তো জানেন, জগতের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগ আমার পক্ষে কী ভারী বোঝা হয়ে আছে। সেজন্যে আমি যে কী যন্ত্রণা ভোগ করছি তা আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না—কিন্তু আমার পক্ষে জেনেভায় যাওয়াটা একেবারেই সম্ভব নয়...আমি আমার শেষ প্রান্তে পেঁাচেছি এবং আমার কাজেই মনঃসংযোগ ক'রে থাকতে হবে, কারণ অতিসত্বর আমাকে আফ্রিকায় রওনা হতে হবে। আর এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার 'মিণ্টিক ডের এর্‌ফুর্শ'ট্‌ ভর্‌ ডেম লেবেন' বইটি না শেষ করতে পারি, ভয় হচ্ছে, তা আর কখনো শেষ করতে

পারবো না···কারণ লাঁবারেনে-য় গেলে ওখানকার কাজ চেপে ধরবে। এইজন্যেই শরৎকালটা কোথাও নড়বো না ব'লে নিজের উপরে এক নিয়ম চাপিয়েছি···কোনো সম্মেলনে যাবো না ব'লে সমস্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি, আর যদি তার ব্যতিক্রম ঘটাই তাহলে গুরুতর নিন্দার ভাজন হবো। জীবনের প্রতি সম্মানের যে-ধারণা —তাকেই জীবন্ত ক'রে তোলা আমার কর্তব্য ; এই কর্তব্যকে এমন নিশ্চিতভাবে জানি যে, এই কাজকে আমি সবার উপরে স্থান দিই···আর আশা রাখি, মরার আগে তা আমি শেষ ক'রে যাবো। কারণ এই যে ধারণাকে আমি এক নতুন আধ্যাত্মিকতার বীজ ব'লে মানি, তাকে জীবন্ত ক'রে তোলার আগে আমি মরে যেতে পারি, এই ভয় আমার মনে হানা দিয়ে ফিরছে। এই জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন···বিশ্বাস করুন, আপনি আমাকে যা করতে অনুরোধ করেছেন, যদি সম্ভব হতো, আমি তা করতাম · আমি কোনো বাণী পাঠালাম না, কারণ সম্মেলনের আবহাওয়া না-জানায় আমি কী বাণী দেবো তা স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারছি না। আমি এমনই জগতের বাইরে দিন কাটাচ্ছি। মনে হয় যেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মৌনব্রত নিয়ে আছি ··আর আমার তার প্রয়োজনও আছে···আফ্রিকা রওনা হবার আগে আপনাকে আবার দেখার ইচ্ছে আছে···প্রায়ই আপনার কথা ভাবি···আন্তরিক ভাবে আপনার একান্ত অনুগত—

এ্যালবার্ট শুহ্বেইট্‌জের।”

(কী দুঃখের ! আর দুঃখ যতো শুহ্বেইট্‌জেরের, ততো গান্ধীরও, শুহ্বেইট্‌জেরের মতো গান্ধীরও বিশ্বাস ঃ কাজের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত “জীবনের প্রতি সম্মানের” ধারণাটি···)

২৬ তারিখের সন্ধ্যায়, সৌভাগ্যক্রমে, লন্ডন থেকে এনড্রুজের এই টেলিগ্রামটি এসে পৌঁছুল ঃ

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মহাত্মার জীবন রক্ষা পেয়েছে। এনড্রুজ।”

অহিংসা জয়ী হয়েছে।

আমরা গান্ধীকে তার করলাম (২৭ তারিখ, সকাল) ঃ “আপনার আত্মার মহান্ বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।”

(যাক তবু ঠিক সময়েই ! ভারতবর্ষের সংবাদাদি ছিল ভীতিজনক। আর ইংরেজ মন্ত্রীদের বাতিকের ফলে তাঁদের উত্তরটা এক ঘন্টা এগিয়ে দেওয়াও হয়নি। কাজকর্মে মন দেওয়ার আগে তাদের প্রয়োজন ছিল নিরুদ্বেগ বিশ্রামে ‘উইক-এন্ড’-টা কাটানো। আমি যদি ইংলন্ড আক্রমণ করি, তাহলে শনিবারের রাতটা বেছে নেবো। সোমবার পর্যন্ত গোটা সরকারটাই থাকবে মাঠে।)

১ অক্টোবর, ১৯৩২ তারিখে পুরোপুরি হাতে-লেখা গান্ধীর এই চিঠিটি পেলাম (খামের উপরে তারিখ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, সন্ধ্যা ৬টা) ঃ

“প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা,

আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পূর্বাহ্ণে আমি আপনাকে জানাতে চাই, আপনার ও আপনার বোনের সঙ্গে যে-দিনগুলো কাটিয়েছি—তাদের আমি কতোখানি মূল্যবান মনে করি। মহাদেব দেশাই আমার সঙ্গে আছেন। আমরা প্রায়ই আপনাদের কথা স্মরণ করি।

সুচিন্তিত পদক্ষেপটি সম্পর্কে আপনি কী মনে করছেন, ভেবে পাচ্ছি না। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, বিবেকের আদিষ্ট কণ্ঠস্বর মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে…”

(১৩ সেপ্টেম্বর গান্ধী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর আমরণ (বা জয় না হওয়া পর্যন্ত) অনশন শুরু করার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন…তাই এই মাঝের সপ্তাহটি আলাদা ক'রে রাখতে হয়েছিল শান্তভাবে বন্ধুজনের কাছ থেকে ছুটি নেওয়ার জন্যে।)

৬ অক্টোবর জেনেভায় শ্রীমতী কাজিন্স ও সি. এফ. এন্ড্রুজ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভারত-দিবসের জন্যে এই ‘বাণীটি’ পাঠালাম, এটা পড়ে শোনালো আমার বোন ঃ

“ভারতবর্ষের খ্রীষ্ট।

ভারতবর্ষের স্বার্থ কেবলমাত্র এক বিশাল জাতির—মানবতার এক মহাদেশের—আমাদের ইউরোপের ভাষা ও চিন্তার সেই এক সাধারণ উৎসের স্বার্থ নয়, যে-উৎস থেকে আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতাগুলোর শক্তিশালী মহীরুহের সহস্রবর্ষের শিকড়ের উদ্গম হয়েছে। তার ভবিতব্য, তার পুনর্জাগরণ, তার স্বাধীনতার বাসনায় আমাদের আগ্রহ কেবলমাত্র সন্তানোচিত নয়। কতো জাতিই তো আজ ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহে কম্পিত হচ্ছে এবং তাদের ভবিতব্যের হাল নিজেদের হাতে তুলে নেবার অধিকারের দাবী জানাচ্ছে! বলা চলে, সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে যেখানে হাতপা-বাঁধা প্রাচীন জাতিগুলো নিদ্রামগ্ন, সেখানে সেখানে যেন এক হাওয়ার ঝাপ্টা লেগেছে, এক আহ্বান জেগেছে ঃ ‘লাজারেস, ওঠো!’

ভারতবর্ষের এই জাগরণ—যা-কিছু অন্যান্য জাতিগুলো থেকে আমাদের কাছে অসাধারণ ব'লে মনে হয়, রাজনৈতিক সমস্ত যুক্তি ও আবেগের বাইরে যা কিছু তার স্বার্থকে শুধু আমাদের স্বার্থ ক'রে তুলেছে, যে-স্বার্থ মানবতারই স্বার্থ হয়ে উঠেছে,—তা কিন্তু তার অনুসরণ করা বিরাট এক জাতির স্বাধিকার বা ভারতীয় জাতি-সমূহের যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যটি নয়; তা হচ্ছে সেই পন্থা, যে-পন্থায় সে এই লক্ষ্যকে

অনুসরণ করছে ; তা হচ্ছে তার কর্মের মানসিকতা ; তা হচ্ছে তার ব্রত ; তা হচ্ছে সেই পবিত্র মানুষটি, যিনি এর অবতার। তা হচ্ছে অহিংসার গান্ধী,—সত্যাগ্রহের বীর ও সন্ত গান্ধী।

তিনি এসেছেন জগতের সবচেয়ে অন্ধকার যুগে, যে-যুগে পশ্চিমী সভ্যতাকে পায়ের উপরে দাঁড়-করিয়ে-রাখা নীতিগুলোর ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা ইউরোপের পা টলমল করছে ; অতি-উন্নত বিজ্ঞানের কৃপায় পাওয়া ধ্বংসের সমস্ত উপায়গুলো কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে পাশবিক হিংসার আদিম বৃত্তির হাতে সে আত্মসমর্পণ করেছে। চার বছরের এক নৃশংস যুদ্ধের ঠিক পরেই এবং একটা নয়—আরও দশটা সেই সম্মিলিত যুদ্ধের পূর্বাহ্নে—যে-যুদ্ধে মাথা গোঁজার মতো একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও থাকবে না, এই সমুদ্যত ভয়াবহ বিপদের মাঝখানে, ঠিক যেন আছড়ে প'ড়ে মানবতাকে গ্রাস করতে উদ্যত এক লোহিত সমুদ্রের উত্তাল দুই ঢেউয়ের মাঝখানে—বসে আছেন ভারতবর্ষের শীর্ণকায় যোগী, দ্বিতীয় বুদ্ধ : তিনি একা এবং তাঁর আমৃত্যু শান্ত, কঠিন একমাত্র অ-গ্রহণ নীতি দিয়েই পশু-শক্তিগুলোর সম্ভ্রম অর্জন করেছেন ; এই বৃদ্ধের শুধুমাত্র আমৃত্যু অনশনের হুমকিই সবচেয়ে গর্বোদ্ধত সাম্রাজ্যকে নতজানু করেছে এবং বহু বছরের লড়াইতে যে-জয় সম্ভব হয় না, সেই জয় অর্জন করেছে। কারণ অস্ত্র হাতে জয়, মৃত্যুর সঙ্গেই আক্রোশের বীজ বপন করে, যে-আক্রোশকে শান্ত করা অসাধ্য। গোটা ইউরোপের সামনে—এই সেন্ট-টমাসের সামনে, যার শুধু কাজেই বিশ্বাস - এই সর্বপ্রথম কাজের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টান্তটি উপস্থিত হলো, যে-দৃষ্টান্তকে গান্ধী নিজে নাম দিয়েছেন 'আত্মত্যাগের তরবারি'। এই সর্বপ্রথম জগতের ও নিজের দেশের লোকের সামনে গান্ধী সেই অভিজ্ঞতাকে জয়যুক্ত ক'রে তুললেন, তত্ত্বগত ভাবে যা তিনি ১৯২০ সাল থেকে ঘোষণা ক'রে আসছিলেন ; এক বৃহৎ আকারে তিনি সেই ঋষিদের অভিজ্ঞতাকেই নতুন ক'রে প্রয়োগ করলেন, যাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অহিংসার নিয়ম আবিষ্কার ক'রে রাশ-ছেঁড়া হিংসার মধ্যে, তাঁরা ছিলেন নিউটনের চেয়েও বড়ো প্রতিভাধর, তাঁরা ছিলেন ওয়েলিংটনের চেয়েও বড়ো যোদ্ধা। তাঁরা নিজেরাই অস্ত্র ব্যবহার ক'রে অস্ত্রের নিরর্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন ; আর তাঁরা এক ক্লান্ত জগতকে শিক্ষা দিয়েছিলেন গতিশীল রূপের অন্তরালে অহিংসার 'সর্বচূর্ণকারী ফলাফল' ; সেই গতিশীল রূপটি বলতে চায় : 'স্বৈরাচারীর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে সমগ্র আত্মার যন্ত্রণা।' তিনি আরও বলেন, 'এই মৌল বিশ্বাস অনুসারে সক্রিয় হ'লে মাত্র একজন মানুষই নিজের সম্মান, নিজের ধর্ম, নিজের আত্মা,' এবং জাতির আত্মাকে, তার স্বাধীনতাকে 'রক্ষা করতে অন্যায়কারী একটা গোটা সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্ব জানাতে পারে এবং তারপরে ঘটাতে পারে সাম্রাজ্যের পতন বা তার পুনরুজ্জীবন।' ('ইয়ং ইন্ডিয়া,' ১১ আগস্ট, ১৯২০, পৃঃ ১০৭, ফরাসী সংস্করণ।)

প্রমাণ করা হয়ে গেছে। প্রমাণটা কোনো একটা রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রই অন্যায় ও ভুলের একই বোঝা বইছে। প্রমাণ করেছেন,

সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্যে এক খ্রীষ্ট। কিন্তু বাঁচার জন্যে চাই বাঁচার ইচ্ছা। সে-ইচ্ছা কি জগতের হবে? ধ্বংসের বন্যাকে আটকে রেখেছিল যে শেষ কটি বাঁধ, সে-গুলো যখন ভেঙে পড়ছে তখনও কি ইচ্ছা জাগতে পারবে? স্থিতাবস্থা বজায় রাখা চলতে পারে এই মোহে, সে যেন নিজেকে ধোঁকা না দেয়! সক্রিয় হতে হবে। এই দূষিত সমাজকে বদলাতেই হবে, এ টিকে আছে একমাত্র অবিচারের জোরে। সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা, দুই পথই চাইছে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করতে ঃ হিংসা ও অহিংসা। দুটোই বিপ্লব। বেছে নিন!'

১২ অক্টোবর, ১৯৩২। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিজয়ানন্দ এসেছেন ব্রিসাগো থেকে, আমার জন্যে সর্বাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের নমস্কার নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে খেলেন। সম্প্রতি তিনি কয়েক সপ্তাহ জার্মানীতে কাটিয়ে এসেছেন, সেখানে কিছু যোগের উপদেশ দিয়েছেন; এখন যাচ্ছেন বুয়েনস-এয়ারুসে সেখানে এক বছর থাকতে হবে ঃ সেখানে একটা ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম তাঁকে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আমার মনে ভালো ছাপ ফেলতে পারলেন না। লোকটি তরুণ ৩৫ বছর বয়স, অত্যন্ত বাদামী রং, গাঁট্টাগোট্টা, প্রাণবন্ত, ধারালো, অসহিষ্ণু, রগচটা, বিরোধীকে চূর্ণ করতে টেবিলের উপর ঘুঁসি মারেন, যুক্তির বদলে অযৌক্তিক তুলনা ও বড়োই স্থূল ও গতানুগতিক চিত্রকল্প দিয়ে খুশি থাকেন, খুশির সঙ্গেই আবার তাতে ফিরে ফিরে আসেন, তার সঙ্গে থাকে হাত-পা নেড়ে সেইসব ব্যঙ্গভরে অনুকরণ-করা অঙ্গভঙ্গি; তিনি জাহির করেন, তিনি নস্যাৎ করেন, বিশেষ ক'রে নস্যাৎ করেন উদ্ধত ভাবে; তিনি গর্বিত নিশ্চিন্ততায় আত্মহারা যে, সত্যকে তিনি ও তাঁদের লোকজন—বিশেষ ক'রে তিনিই—জানেন। বৃষস্কন্ধ, অতিপুষ্ট, অত্যন্ত আত্মসন্তুষ্ট, সংকীর্ণ ও রুদ্ধচিত্ত, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতি-সচেতন মফঃস্বলের পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে। এই অতি-পরিচিত টাইপটার আমাদের জন্যে ইউরোপে আসার কোনো মানে হয় না। আর এইসব গর্বোদ্ধত ও চন্ড প্রকৃতির লোক দিয়ে যদি দ্বিতীয় পুরুষ গড়ে উঠে থাকে, তাহলে রামকৃষ্ণ বৃথাই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বহু বার আমি তাঁকে কড়া কথা না ব'লে পারিনি। প্রথমে বলেছি তাঁর (নিজের মধ্যে একাত্মতার) 'উপলব্ধির' অহংসর্বস্ব মোহ সম্পর্কে, যা তাঁকে সামাজিক কর্ম থেকে রেহাই দিয়েছে অথবা যা এইসব কর্তব্যকে তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তির ব্যর্থ তৃপ্তির চেয়ে হীনতর ক'রে দিয়েছে। যে-শিষ্যরা গুরুদের বাণী বহ্বাড়ম্বরে বিষাক্ত ক'রে তোলে তাদেরই এই দঙ্গল সমাজসেবার সেই আবেগকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলার উপক্রম করেছে, যে-আবেগ বিবেকানন্দকে পুড়িয়ে মারতো। যে অসৎ পাদ্রীরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের মতোই বিজয়ানন্দ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তিনিই—স্বামীজীই সমাজসেবায় নামতে পারেন, কারণ তিনি ছিলেন তিনিই, কারণ তিনি ছিলেন অভেদের (Identite´) উপলব্ধি। কিন্তু মূলত সেইটিই আসল। আর তা সবকিছুকে অব্যাহতি দেয়।

সেটাই যথেষ্ট সামাজিক কর্ম ; কোনো কিছু না ক'রে যিনি 'নিজেকে উপলব্ধি করেন', তাই দিয়েই জগতের উপরে সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবে ক্রিয়া করেন।' এই ছদ্ম-এলিত ধর্মীয় আত্মসর্বস্বতা এবং যাঁরা জগতের দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন, সেই সব নন্দনশাস্ত্রবিদদের আত্মসর্বস্বতার মধ্যে আমি বেশি পার্থক্য দেখি না।

এঁরা যে একই রকম সুবিধাভোগী এবং অত্যাচারিত শ্রেণীর শোষক, এমন তীব্র ভাবে তা আমি কখনো অনুভব করিনি। আমার আতিথেয়তার কর্তব্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় ব্যাপারে আমার কঠিন ভৎসনা গোপন ক'রে রাখতে পারলাম না, যখন শুনতে পেলাম এক প্রচণ্ড অবজ্ঞায়, এক অপমানকর আনন্দে তিনি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে লাগলেন। তিনি যদি রবীন্দ্রনাথকে মোটেই ভালো না বাসেন, তবে সেটা তাঁর ব্যাপার, -যদিও আমি রবীন্দ্রনাথের হয়ে তাঁর প্রতি দেশের লোকের নিদারুণ অবিচারের তিক্ততা অনুভব করলাম। কিন্তু এই মহান্ জীবনের, এই নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে যখন অবজ্ঞাভরে— প্রায় ঘৃণাভরে তাঁকে হেসে উঠতে ও বলতে শুনলাম: 'তিনি যন্ত্রণা বোধ করতে পারেন না। যন্ত্রণা কী তা তিনি জানেনই না।' (যন্ত্রণা কী তা জানেন এই ঔদরিক, ধূমপায়ী, আত্মসর্বস্ব ও আত্মসন্তুষ্ট তরুণ সাধুবাবাটি?)—তখন তাঁকে বললাম: 'অন্যের যন্ত্রণা বিচার করার অধিকার কারুর নেই, কেউ তা পারে না। একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন। আপনি তরুণ। আপনি কঠোর, আপনার মনের দরজা বন্ধ।' তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলেন। কিন্তু কিছুই তাঁকে পাল্টাতে পারবে না। তিনি সামান্যই পড়াশোনা করেছেন। তিনি লেখাপড়া করেছিলেন বিজ্ঞান নিয়ে (তাঁর মধ্যে অভাব দেখে, কেউ তা সন্দেহও করতে পারবে না); যখন সম্প্রদায়ে ঢোকেন তখন রসায়নের ছাত্র ছিলেন; এবং পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতে পারেন কিনা শিবানন্দকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিয়েছিলেন: 'না! একটা বেছে নিতে হবে।' তিনি বেছে নিয়েছিলেন, এবং তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। একমাত্র পূর্ণ সত্যকে তিনিই লাভ করেছেন। যে পণ্ডিতজনেরা সত্যকে খুঁজতে জীবনপাত করছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর এক পিঠ-চাপড়ানো অবজ্ঞা: তাঁদের নম্রতার মহিমা ও আত্মত্যাগের সেই মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই, অপরের যে আবিষ্কার বিজ্ঞানকে এক পা এগিয়ে নিয়ে যায়, তার সামনে নিজের আবিষ্কারের গর্বকে বিসর্জন দিতেও যে মানসিকতা সর্বদা প্রস্তুত। বিজ্ঞানের প্রতি ও বৈজ্ঞানিকদের প্রতি তাঁর এক পিঠ-চাপড়ানো অবজ্ঞা। কেবলই রসিয়ে রসিয়ে রামকৃষ্ণের নাম দিয়ে কী একটা বড়োই ভোঁতা রসিকতা বার বার ক'রে চললেন (কিন্তু প্রথম দিকে দম্ভ ছিল না): নাক-ধরার দুটো পন্থা আছে; একটা সোজাসুজি, অন্যটা হচ্ছে মাথার পেছন দিয়ে হাত ঘুরিয়ে অন্য দিক দিয়ে নাক-ধরা। মানুষের মনের সমস্ত অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের বিপুল প্রচেষ্টা সব কিছুই তাঁর কাছে এই হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সাধুটি কিন্তু প্রথম দফাতেই নাক ধরেছেন! বেশতো, ধ'রে থাকুন তাহলে! আর নাক মুছুন! ইউরোপীয় মনের মহিমা সম্পর্কে এবং তার মধ্যে

দিব্য যে অন্য কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন সে-সম্পর্কে—তাঁর কোনো ধারণাই নেই। 'লাক্সিঅ' ফ্র'সেইজ'-এর এক গির্জা-প্রেমিকের মতোই তিনি সংকীর্ণচেতা। পরিবর্তন ক'রেও লাভ নেই! আর আমি নিজেকে বলি, এই ভারতবর্ষ যদি জয়লাভ করে, তাহলে ইউরোপ হাড়েহাড়ে টের পাবে। চোখের বদলে চোখ! রাজনীতি সম্পর্কে আপাত-ঔদাসীন্যের নিচে লুকানো থাকে মনের গভীরে বাসা-বাঁধা এক জাতীয়তাবাদ। কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমন শ্রদ্ধা রামকৃষ্ণপন্থীরাও গান্ধীকে ক'রে থাকেন। কিন্তু এই স্বামীজীটি বললেন, তার কারণ 'তিনি সর্বস্বত্যাগের অবতার, আর সর্বস্ব-ত্যাগই গোটা ভারতবর্ষের মর্মকথা'। সর্বক্ষেত্রে এ বিজয়ানন্দের মর্মকথা নয়। আর আমার আশংকা যে, মধ্যযুগে আমাদের জনগণকে যারা পীড়ন করতো, পশ্চিমের সেই মঠধারী-সম্প্রদায়ের অনুরূপ ঘটনার পরিণামের দিকেই না এ ঠেলে নিয়ে যায়। মুক্তির কোনো মন্ত্রই বাঁচাতে পারে না। সবচেয়ে পুরোপুরি 'আগ্রহহীনতার' আধিপত্যের জন্যে স্বৈরাচার ও স্বার্থপরতা চিরকালই নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত ক'রে চলবে। আর গুরুরাও যেন তাঁদের কথাবার্তা সাবধানে বলেন! যে খেয়াল-খুশির উক্তির মধ্যে গভীর সত্যের শস্যকণা থাকে, তাকে প্রায়ই গ্রহণ করা হয় শস্যকণা ছাড়াই খড়ের গাদা ব'লে, সে খড়ের গাদা বিপজ্জনক, কখনো কখনো মারাত্মক। একদিন স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেনঃ 'আমি সব ক্ষমা করতে পারি। যে খুন করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। যে ধর্ষণ করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। যে গণহত্যা করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যে মিথ্যা কথা বলে তাকে ক্ষমা করতে পারি না। কারণ মিথ্যা হচ্ছে চেতনার মৃত্যু।' আর আমি এটা বুঝতে পারি। আমিও এইভাবেই ভাবি। কিন্তু যে তরুণ সাধুবাবারা শোনেন, আমার ভয় হয়, তাঁরা মিথ্যার অ-ক্ষমার চেয়ে অন্যান্য অপরাধের বিপজ্জনক ক্ষমাগুলোকেই না ভালো ক'রে আঁকড়ে থাকেন।

বিদায় নেবার সময় বিজয়ানন্দ একটু লজ্জিত হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, আমাকে তিনি জ্ঞানালোক দিতে পারেননি। যা কিছু বলে থাকবেন, তার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু কালই তিনি আবার শুরু করবেন।

তিনি বললেন এখনো রামকৃষ্ণের অনেক প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারা বেঁচে আছেন (যদিও গত বছর তাঁর জীবনীকার, অন্যতম মুখ্য দ্রষ্টার মৃত্যু হয়েছে)। কিন্তু প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মহান্ গোষ্ঠী শিবানন্দের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, আর তা নতুন ক'রে হবেই ব'লে মনে হয় না। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণের বেশির ভাগ শিষ্যদের মতোই শিবানন্দ এক স্বতঃস্ফূর্ততা ও এক শিশুজনোচিত প্রফুল্লতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের উপরে তাঁর জোরালো কর্তৃত্ব নেই, সে-কর্তৃত্ব ছিল তাঁর পূর্বসূরী ও সঙ্গী ব্রহ্মানন্দের; বিজয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য এবং মৃত্যুর সময় ব্রহ্মানন্দ তাঁকেই নির্বাচন ক'রে গেছেন। ('হে ভ্রাতঃ, এই সন্তানদের তোমার হস্তেই সমর্পণ করিতেছি।')

১৩-১৪ অক্টোবর, ১৯৩২। তরুণ ফাদার এলুইন রাত কাটালেন ভিলা লিঅনেতে আর পরের দিনটা কাটালেন আমাদের সঙ্গে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বিবরণীতে

(দ্রষ্টব্য: 'য়ুরোপ' পত্রিকা) এই সাহসী ইংরেজ মিশনারির কথা আমি বলেছি; তিনি গান্ধীর বন্ধু হয়ে উঠেছেন, ভারতবর্ষের দরিদ্রতমদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দেবার জন্যে শপথ নিয়েছেন, এই দরিদ্রতমেরা হচ্ছে উপদ্বীপের মধ্য-পশ্চিমের বিশাল বিশাল বনের ধারে ধারে বাসকারী জাতিগোষ্ঠীগুলো; সেখানে তিনি তাঁর ছোটো আশ্রমটি তৈরি করেছেন, নিজের হাতে তাঁর তরুণ সঙ্গী শাম রাওয়ের সাহায্যে কাদামাটি দিয়ে গড়ে তুলেছেন (দেখতে ছোটোখাটো অস্পৃশ্য শাম রাওকে আমরা দেখেছি গান্ধীর যাওয়ার সময়, দেখেছি আনন্দে জ্বলজ্বলে করা সুন্দর দুটি চোখ)। এলুইনকে দেখলে মনে হয় ছেলে-ছোকরা, ল্যাগবেগে, এইমাত্র যেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন; মনেও হয় না তিরিশ ছুঁয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, বিনয়ী, স্নেহপ্রবণ, হাস্যময়, মুক্তমতি—সবকিছু বুঝবার চেষ্টা করেন, যুক্তি দিলে তাঁর নিজের মত পাল্টাতে প্রস্তুত, সত্যকে সেবা করার উদগ্র ও সাধু ইচ্ছায় অহংকারের তিলমাত্র ছায়াপাত না ক'রে যুক্তি কুড়িয়ে বেড়ান। এই যে বীর্যবান ও স্বার্থশূন্য নম্রতা, যা সত্যের উপাসনা করে, কিন্তু যা চায় শুধু দূর থেকে সত্যের পদচিহ্ন ধ'রে চলতে, প্রতিদিন পায়ে পায়ে সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে,—এর সঙ্গে কতোই না পার্থক্য আমার গত পরশুর সেই রামকৃষ্ণপন্থী অতিথির প্রচন্ড ও সংকীর্ণমনা আত্মজাহিরের; তিনি মনে করেন তিনি ও তাঁর দলের লোকই সত্যের ধারক!

যে-মুহূর্তে গান্ধীর প্রতি তাঁর সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর বিশপ ও এ্যাংলিক্যান চার্চের কঠোর নিন্দার ভাজন হয়েছেন। তা আরও ছাড়িয়ে গেছে। ইঙ্গ-ভারতীয় পুলিশ তাঁর উপর চোখ রেখেছে, তাঁর বাড়িতে এসেছিল খানাতল্লাসি করতে; সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি না হয়ে তাঁর নির্জন বাসে কোনো কারুর সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা ভারতবর্ষকে পুলিশের একটা দুর্ভেদ্য জালে ঘিরে ফেলা হয়েছে, প্রায় সব পুলিশই ভারতীয়, না-খেয়ে-মরা গরীব হতভাগ্য; পয়সা দিলে তাদের দিয়ে সব কিছু করানো যায়, কিন্তু তারা তা নিজেরাই লজ্জায় স্বীকার করে এবং গোপনে প্রায়ই গান্ধীর প্রতি তাদের সহানুভূতি জানায়। প্রতিটি গ্রামেই একটা ক'রে পুলিশ; এবং ক্ষুদ্রতম গ্রামের মোড়লকেও কে এলো কে গেলো তার সমস্ত খবরাখবর দিতে হয়। কেউ ভাবতেও পারবে না গুপ্তচরের এই বিশাল বাহিনী পুষতে টাকার কী বিশাল অংক তলিয়ে যায়। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশা মোচনের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে কিছুই করা হয় না। যে চাষীদের মধ্যে এলুইন বাস করছেন, যাদের কিছুই নেই, তারাও ট্যাক্সের ভারে ভেঙে পড়েছে। ভারতবর্ষকে আমদানি-করা আফিংয়ে অভ্যস্ত হতে বাধ্য করবে এবং বিষ-বিক্রি থেকে পাওয়া মুনাফাকে একমাত্র অর্থসংগতি ব'লে রেখে দেবে, যা ব্যয় করা হবে ভারতবর্ষের সরকারী শিক্ষায়,—ভারত-সরকারের শয়তানসুলভ ভন্ডামী এই নারকীয় ব্যবস্থা খুঁজে বার করেছে। এইভাবে, যে একটা চায়, অন্যটা তাকে মেনে নিতেই হয়। ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার সেখানে ঢোকার অনুমতি জোগাড় করতে এলুইনের বহু কষ্ট

করতে হয়েছে। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে একমাত্র এই শর্তে যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি কিছু লিখতে পারবেন না এবং সমস্ত রকম রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন। এতে সম্মত হবার আগে তিনি অনেক ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু ওঁর নিজের ব্রত যা তাঁর কাছে ঠেকেছে সেই দরিদ্র মানুষদের জন্যে—যাদের তিনি বেছে নিয়েছেন, যারা তাঁকে বেছে নিয়েছে—নিজেকে উৎসর্গ করা,—তাই তাঁকে টলিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন ইতালিতে কাটিয়ে আগামী মাসে তিনি রওনা হবেন ভারতবর্ষে; ইতালিতে তিনি থাকবেন এক ফ্রানসিসকান মঠে, সেখানে দুই মঠবাসিনী গান্ধীর ভাবধারায় গভীরভাবে নাড়া খেয়েছেন (তাঁদের উপরওয়ালারা তা বিগর্হিত ব'লে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু পোপ তাঁর অধীনে তাঁদের নিরাপত্তা মঞ্জুর করেছেন)। যে অর্ধসভ্য মানুষদের মধ্যে এলুইন তাঁর আশ্রম গড়েছেন, তারা প্রাণীপূজা করে, তারা হিন্দুধর্ম ও তার বর্ণ-ব্যবস্থার বাইরে। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যাদের নাম দেওয়া হয় 'বর্ণ-বহির্ভূত,' অস্পৃশ্য, তারাও বর্ণ-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত : তারা সমাজের পরিত্যক্ত, কিন্তু চিরকালই সমাজের সঙ্গে বাঁধা, সমাজের হাতে কলংকের ছাপ-মারা। যে সব জাত হিন্দুধর্মের বাইরে তাদের ক্ষেত্রে এ একই রকম নয়। তাদের সমস্ত রকম স্বাধীনতাই দেওয়া আছে। আর হিন্দুধর্মের 'বর্ণ-বহির্ভূতদের', অস্পৃশ্যদেরও এদের মধ্যে গ্রহণ করা হয়।) এলুইন তাদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর হাসতে হাসতে এলুইন বললেন, ভারতবর্ষে বিরলতম বস্তু হচ্ছে নির্জনতা, একমাত্র 'বনে' গিয়ে কখনো একা না হ'লে কোনো ইউরোপীয় এতে মোটেই অভ্যস্ত হতে পারে না। এক টিলার উপরে অবস্থিত ছোট্ট আশ্রমটি থেকে, গ্রাম থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে, জঙ্গল থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এলুইন দেখতে পান ভালুক চলে যাচ্ছে, বাঘ গর্জন করছে; এমনও হয় যে, শাম রাও দেখতে পায় তার বিছানার মধ্যে ছোটো ছোটো লাল রঙের সাপ, তাদের বিষ মারাত্মক। কিন্তু এ মনে হয় না যে, এই প্রতিবেশিত্ব তাঁদের মুখে উদ্বেগের কোনো ছায়া ফেলে; ছেলে-ছোকরার মতো হেসে হেসে এলুইন এইসব ব'লে গেলেন। এইসব সৎ অসভ্য ও বন্য প্রতিবেশীদের আবার ফিরে পাবার জন্যে যাচ্ছেন ব'লে তিনি খুশী। অবশ্য ইংলণ্ডে তাঁর পরিবার আছে, পরিবারকে তিনি ভালবাসেন; সম্প্রতি বাড়িতে গিয়ে আমার বোন পরিবারটিকে দেখে এসেছে : মা, কয়েকটি বোন ও ভাই। উভয় পক্ষ থেকেই তাঁর ব্রতকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের যে-সব রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর দেখার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে এলুইন বললেন, লর্ড আরউইন বর্তমান বড়োলাটের মতো প্রচণ্ড রকমের গান্ধীবিরোধী হয়ে উঠেছেন। একমাত্র লর্ড স্যাংকে-র মধ্যেই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানগম্যি ও ভারতবর্ষের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু লর্ড স্যাংকে ইংলণ্ডের গোটা রাজনীতি সম্পর্কে—এমনকি রাজনীতি সম্পর্কেই গভীরভাবে আশাহত হয়েছেন, এবং বলেছেন, তিনি ভারতীয় ব্যাপারের ফয়সালার জন্যেই শুধু অপেক্ষা ক'রে আছেন, তারপর পুরোপুরি বিদায় নেবেন।

গান্ধী সম্পর্কে, গান্ধীর মহান্‌ "পরীক্ষার" বৈজ্ঞানিক চরিত্র সম্পর্কে আমরা আমাদের মতামত যাচাই করলাম ; সেই পরীক্ষার ফলাফল এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু তা বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ; মতামত যাচাই করলাম বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের মনের সঙ্গে তাঁর মনের আত্মীয়তার, ইত্যাদি ।

এলুইন কৃষ্ণের পবিত্র দেশের সেইসব ব্রাহ্মণদের কথা বললেন, যাঁরা মার্কস পড়েন —(আর সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, তাঁরা তরুণরা নন, বুদ্ধি-পাকা বয়স্ক লোকজন)।

অক্টোবর, ১৯৩২। গান্ধীর নতুন চিঠি,— লিখেছেন ৩০ সেপ্টেম্বর, অনশনভঙ্গের চার দিন পর।

"প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনাদের প্রীতিপূর্ণ বার্তা পেয়েছিলাম। আমার কঠোর যন্ত্রণার সময় আপনারা সবসময় আমার কাছে ছিলেন। ঈশ্বরের করুণা অনন্ত এবং মহান্‌ নাটকের সর্বক্ষণ তারই পরিচয় পেয়েছি।

প্রীতির সঙ্গে বাপু

চিঠি শেষ করার সময় মীরার চিঠি পেলাম। সে ছিল এক আনন্দহীন উদ্বেগের মধ্যে। কিন্তু সে এক কন্টক-শয্যা বেছে নিয়েছে এবং তার উপরেই বীরের মতো শুয়ে আছে।

৩০. ৯. ৩২ এম. কে. জি।"

আমি গান্ধীকে লিখলাম (২২ অক্টোবর) :

"যে প্রিয়বন্ধুকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি,— ১৬ ও ৩০ সেপ্টেম্বরে লেখা আপনার দুটি চিঠিই আমরা পেয়েছি। এমন সময়েও আমাদের কথা ভেবেছেন জেনে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! সেই দিনগুলোয় চিন্তায় ও মনে আমরা আপনার পাশেই ছিলাম ; আর আপনাকে একথা বলা বাহুল্য যে আমাদের চিন্তায় এক উদ্বেগ ছিল। কিন্তু আমি জানতাম, আপনি ঠিকই করছেন। আমি জানতাম, আপনার আত্মত্যাগ কেবল বিরাট ছিল না, তা ছিল ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়। জাতির এই মুহূর্তে এটাই ছিল আপনার ব্রত। অস্পৃশ্যদের এই স্বার্থের চেয়ে অন্য কোনো স্বার্থের জন্যেই এমন প্রচন্ড বলের প্রয়োজন ছিল না। এক অতীত সামাজিক ব্যবস্থার বলিদের বিরুদ্ধে পূর্ব-অনুষ্ঠিত আচরণের এই সংশোধনের সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ ভাই, যাদের সমাজ থেকে বহিভূর্ত করা হয়েছে, তাদের সমাজের বুকে ফিরে আসার সঙ্গে — জড়িত হয়ে আছে ভারতবর্ষের সম্মান, তার নৈতিক ঐক্য — যা সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের আবশ্যিক মূলাধার, এমনকি জড়িত হয়ে আছে তার বেঁচে থাকার অধিকার। এমন একটি কারণের জয়ে গোটা মানবতাই আগ্রহী। আপনি যে ''মহান্‌ পরীক্ষা" ক'রে চলেছেন তার ফলাফলে গোটা মানবতাই আগ্রহী। আর কেউই—এমনকি

আপনিও—আগে থেকে এর ফলাফল জানতে পারেন না। যতক্ষণ এই মহান্ পরীক্ষা সত্যের খাঁটি নিয়মানুসারে, বিজ্ঞানের মতোই—আত্মপ্রকাশ ক'রে চলবে, এর প্রতি বিশ্বাস রেখে, আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে পারি। কিন্তু তার ফলাফলের উপরে নির্ভর করবে জগতের ভবিতব্য, তার কর্মের নির্দেশ। এবং এই পরীক্ষা—এই সত্যাগ্রহের সাফল্যই একমাত্র হিংসার সমুদ্যত বন্যা থেকে মানবতাকে বাঁচাতে পারে। আমরা প্রার্থনা করছি! সত্যিকারের প্রার্থনা হচ্ছে তাই, যা—আপনার মতোই—করা হয় সক্রিয় হয়ে।'

২৩ অক্টোবর, ১৯৩২। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এম. এইচ. সৈয়দের আগমন। তাঁর নিজের ভাষায় জাতিতে (race) মুসলমান, অন্তরে হিন্দু। বৃত্তিতে দার্শনিক; হিন্দু প্রজ্ঞার প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যেই মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। মুখখানা সুন্দর ধরনের, বুদ্ধিদীপ্ত ও সুগঠিত। বেশ ভালো ফরাসী বলেন। দু'এক বছর ইউরোপে কাটিয়েছেন। পশ্চিম সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করলেন, তা মোটেই অনুকূল নয়, আর তা ফ্রান্স সম্পর্কে বিশেষ ক'রে উগ্র—(মনে হয়, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ আছে; ফরাসী সহকর্মীদের শ্রদ্ধার অথবা আত্ম-সন্তুষ্টি তাঁর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছে: বের্গস* তাঁর চিঠির উত্তর দেওয়া প্রয়োজনও মনে করেননি; আর সিলভ্যাঁ লেভি তাঁর এক চাপা ক্রোধ জাগিয়ে তোলেন: এই মহৎ ভাষাবিজ্ঞানীটি সম্পর্কে প্রায় সমস্ত ভারতীয়ের মতোই তাঁকে মারাত্মক ব্যঙ্গের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম—মোটেই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়! শুধু কথা, তাও ভাসা-ভাসা, মোটেই ভেতরে ঢোকে না। মাসনুর্সেলকে তিনি বেশি পছন্দ করেন, কিন্তু তিনি মনে করেন তাঁর ভার কম...)—সাধারণভাবে, তাঁর মধ্যে ভারতীয় মনের শ্রেষ্ঠত্বের, মনের গভীরে বাসা-বাঁধা সেই জাতীয়তাবাদের সেই গভীর, মনের মধ্যে গাঁথা, প্রশ্নাতীত, সৌজন্যের খাতিরেও কদাচিত আড়াল-দেওয়া একই মনোভাব দেখতে পেলাম; এই জাতীয়তাবাদ গোটা ভারতবর্ষের, নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন এশিয়ার এখন কঠোর চালনা-শক্তি হয়ে উঠেছে। কিছুই আর নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না—ইউরোপ সম্পর্কে না, ভারতবর্ষের নিজের সম্পর্কেও না; ইউরোপের মারাত্মক বিভ্রান্ত পথে চলারই ভয় দেখাচ্ছে ভারতবর্ষ। সৈয়দ যখন দেখলেন ইউরোপের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশে আমি সায় দিচ্ছি না, তখন সুর নামিয়ে ফেললেন এবং হলফ ক'রে বললেন, তাঁর মন সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত জাতির ঊর্ধ্বে। নিজের দেশবাসীর সমালোচনা করতে গিয়েও এক নৈরাশ্যজনক রুক্ষতা দেখালেন। তিনি সত্যিকার কালচারের অভাবের কথা বললেন, যাঁরা উচ্চশ্রেণী ব'লে কথিত এবং ইউরোপীয় মনের জন্যে কক্ষচ্যুত, তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই অভাব; নিজেদের জাতের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রকে দেখে এ বিচার করার সুযোগ তাঁর ঘটেছে। দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি তাঁর অনেক বেশি শ্রদ্ধা, তাদের মুখেমুখে-চলে-আসা এক প্রাচীন কালচার আছে। তিনি কিছুটা একগুঁয়ে

ধরনের এক "আদর্শবাদী" বুদ্ধিজীবী, আধুনিক বিজ্ঞানের বিপুল প্রচেষ্টা এবং তার "যান্ত্রিক," 'জড়বাদী' চেহারা—সব কিছুকে অবিশ্বাস করেন। এহেন প্রকারটিকে ফ্রান্সে আমার খুবই জানা! পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের অধ্যাপক ও ধর্মগুরুদের সমস্ত তাত্ত্বিক কচকচির চেয়ে, যে যুবশক্তি জড়বাদের জন্যে গর্ববোধ করে—তাদের মধ্যেই যে প্রায়ই অনেক বেশি খাঁটি ও সক্রিয় আদর্শবাদ আছে, এই প্রকারটি তা দেখতে পায় না।

সৈয়দ পড়ান দর্শন ও উর্দু সাহিত্য, এবং তিনি এই ভাষার দার্শনিকদের একটি সংকলন প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, বহুশত বৎসরের একটা উজ্জ্বল দীপ্তি, ভারতবর্ষে যার গুরুত্ব ইউরোপের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অজানা—যাকে আমরা প্রায় সবটা সংক্ষিপ্তসার ক'রে নিই ঝকমকে বাঙালী মনে।

১ নভেম্বর, ১৯৩২। পরপর সবাই আসছেন। এসেছেন ডাঃ আনসারি: ভারতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা, মুসলিম জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব সভাপতি, গান্ধীর ব্যক্তিগত বন্ধু, বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, শেষবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দিল্লীতে নয় মাসের জন্যে। ইউরোপে এসেছেন গুরুতর হৃদ্‌দৌর্বল্য সারাতে, এবং আবার ফিরে যাবেন নতুন করে গ্রেপ্তার হতে। সত্যিকারের নেতা। পাকা মাথা, সমস্ত তথ্য ও সংখ্যা তাতে সুশৃংখল ও যথাযথ ভাবে সাজানো। বহু বছর ধ'রে ভারতবর্ষের মুসলমানদের আন্দোলনের রাশ ধ'রে আছেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি (তিনি ছিলেন তরুণ জহরলালের যৌবনের এবং ইংলন্ডে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী)। মুখখানা দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনো রাজনীতি-করা মানুষের বা আলজেরিয়ানের মতো। কপাল চওড়া ও একটু উঁচু। নাকটা উপর থেকে আলতো ভাবে বেঁকে এসেছে, পাক-ধরা চওড়া গোঁফ, কানে একগোছা কালো চুল। ফরাসী বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না। আমার জন্যে ফুল এনেছেন এবং প্রাচ্য রীতিতে আমার হাতে চুমু খেলেন।

অকাট্য কয়েকটি বাক্যে তিনি যা প্রতিপাদন করলেন, তাতেই ব্রিটিশ রাজনীতির লজ্জাকর মিথ্যাকে ধ্বসিয়ে দিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যা ৮ কোটি থেকে ৮ কোটি ৫০ লক্ষের কাছাকাছি, তার মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বাংলায়, ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাঞ্জাবে, বাদবাকি এখানে ওখানে ছড়ানো। বাংলায় শতকরা ৯০ ভাগই (গান্ধীপন্থী) কংগ্রেসের পক্ষে, (সেখানে তারা জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ)। পাঞ্জাবে শতকরা ৫১ ভাগের কিছু কম। আর অন্যান্যদের বেশির ভাগই জাতীয়তাবাদী—কংগ্রেসপন্থী নাও যদি হয়—কংগ্রেসপন্থীদের মিত্র। হিন্দু আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার দাবির কারসাজিটা তাই স্থূল। গোলটেবিল বৈঠকে কোনো প্রতিনিধিই গুরুত্বপূর্ণ ন্যূনতম ভগ্নাংশেরও প্রতিনিধিত্ব করেন না। আগা খান (মহম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্রের দিক থেকে সেই অবিশ্বাস্য বংশধরটি)

যে-সম্প্রদায়ের ঘাড়ে খাচ্ছেন তার সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ হাজারের বেশি হবে না ; এই ধর্মগোষ্ঠীটি এসেছে আগা খানের মতোই ইরান থেকে ; আগা খান পারসী বলেন। বিশ্রী হিন্দুস্থানী বলেন ; পশ্চিমের জুয়ার আড্ডা ও ঘোড়দৌড়ের মাঠের এই নির্লজ্জ নিয়মিত মক্কেলটির প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে হীন ও সবচেয়ে অমর্যাদাকর কুসংস্কারের উপরে। গোলটেবিল বৈঠকের আগে যে মর্মস্পর্শী আলোচনা হয়েছিল তাতে গান্ধী আরউইনের হাতে খেলেছেন। আরউইন জানতেন কী ক'রে তাঁর আস্থা অর্জন করতে হয় ; তিনি গান্ধীকে রাজী করিয়েছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করাটাই যথেষ্ট, অন্য প্রতিনিধিদের সম্পর্কে তাঁর যা ইচ্ছে হবে তাই তিনি করবেন, তাঁরা তাঁর পরামর্শদাতার পদমর্যাদায় যাবেন। এই কপট ভালমানুষিতে বিশ্বাস ক'রে—অবিশ্বাসী আনসারির সমস্ত সাবধানবাণী সত্ত্বেও—করাচী কংগ্রেসে নিজেকেই একমাত্র প্রতিনিধি করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপরে সঙ্গে সঙ্গেই আরউইন তাঁর সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছিলেন। বৃথাই গান্ধী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, ডাঃ আনসারি, শ্রীমতী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্য তাঁর সঙ্গে থাকুন। তা গ্রাহ্য করাই হয়নি। আর তাই, যারা ইংলন্ডের সৃষ্টি, এ ব্যাপারে যারা বংশবদ হাতের পুতুল, তাদের মধ্যে গান্ধী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আরউইনকে বুঝতে পুরোপুরি ভুল হয়েছিল, বর্তমান বড়োলাটের চেয়ে তিনি তিলমাত্র কম ভারতীয় বিদ্বেষী নন, শুধু তিনি বেশি বুদ্ধিমান।

আনসারি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে বল্গাহীন অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন, তিনি তাঁকে দেখালেন এক কপট, অবিশ্বস্ত স্কচ্ ব'লে। যৌবনে তিনি তাঁকে এমনটিই জানতেন, তখনই তাঁর স্বভাবটা ছিল "প্যাঁচালো," "একপেশে"। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকল পক্ষের সঙ্গেই দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষায় কথা বলে, তা একের পর একের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

সম্প্রতি গল্পকথা-হয়ে-ওঠা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের নেতা আব্দুল গফ্ফর খানকে তিনি ভালো করেই জানেন্। আনসারি যার সভাপতি সেই মুসলিম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ; অনেক মাস তাঁরা একসঙ্গে জেলে ছিলেন। তাঁর বর্ণনা দিলেন এক বিশাল চেহারার মানুষ ব'লে, তাঁর একটা হাতই তাঁর (আনসারির) দুটো হাতের চেয়ে বড়ো হবে,—বুদ্ধিগত দিক থেকে খুব বেশি সুশিক্ষিত নন, কিন্তু এক অসাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর দেশের লোকের উপর প্রবল প্রভাব। গান্ধীর অহিংসার তিনি উদগ্র অনুবর্তী, কিন্তু তা শুধু তিনি রাজনীতি হিসেবেই প্রয়োগ করেন না, প্রয়োগ করেন গভীরতম বিশ্বাস হিসেবে, আর সেই বিশ্বাস ছড়িয়েছেন পাঠানদের মধ্যে, তাঁরই মতো পালোয়ান যোদ্ধাদের মধ্যে। পাঠানদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটনোর জন্যে ইংলন্ড সব কিছু করেছে। পুলিশের উস্কানিদাতায় সীমান্তপ্রদেশ ছেয়ে ফেলেছে। গোটা জাতের উপরেই নিষ্ঠুর পীড়ন চালিয়েছে ; আর আনসারি নিজে যে তদন্ত করেছেন তাতে দেখতে পেয়েছেন, (যারা বন্দী, যারা সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে না-পারায়,) ফাদার এলুইনের তদন্ত হয়েছে খুবই নরম গোছের।

আমার প্রশ্নের উত্তরে আনসারি বললেন যে, ভারতবর্ষের সর্বময় কর্তা বড়োলাট নন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা—তিনটি প্রদেশের লাটসাহেবরাই (সবচেয়ে নিকৃষ্ট কলকাতার লাটটি) নিজের নিজের অঞ্চলের, "প্রেসিডেন্সির"—কর্তা বড়োলাটের মাধ্যমে না গিয়ে সোজাসুজি ইংলন্ডের স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু এইভাবে ক্ষমতা ভাগ করায় প্রায়ই সরকারী নির্দেশে তালগোল পাকায়, এতে ভারতবর্ষের লাভ হয়নি। তিন কর্তা আর বড়োলাটের মধ্যে পাল্লা চলে কে কতো বেশি মুচড়ে আদায় করতে পারে।

জয়লাভ সম্পর্কে আনসারিকে অত্যন্ত দৃঢ়-নিশ্চিত মনে হলো। সমস্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর যে হাজার হাজার দেশবাসী অবিচল হয়ে আছে, তিনি তাদের অটল দৃঢ়তার কথা বললেন—(শরৎকালে তিনি দেশছাড়ার সময়েই, গ্রেপ্তার হয়েছিল ৯০ হাজারের বেশি ভারতীয়, তখন কিন্তু সরকার দাবি করেছিল গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজারের বেশি নয়)। আনসারি বলেলেন, যারা গান্ধীর সঙ্গে লড়ছে, তাদের তিনি কী জিনিস ক'রে তুলেছেন, তা কল্পনা করা যায় না। তিনি তাদের সমস্ত ভয়, সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত সন্দেহ দূর ক'রে দিয়েছেন। এইসব বন্দীদের মনোবল বীরোচিত, অচঞ্চল। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশেও তাদের দৈহিক ভারসাম্য ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। ডাক্তার হওয়ার জন্যে আনসারি কায়দা ক'রে জেলের মধ্যে নেহেরুকে দেখে আসতে পেরেছেন, প্লুরিসির একটা চিহ্ন সত্ত্বেও, তিনি তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালই দেখে এসেছেন। আমি যখন তাঁকে ভারতীয় যুবশক্তি সম্পর্কে ডঃ সৈয়দের ধারণার কথা—তাদের "আদর্শবাদের" অভাবের কথা বললাম, তিনি কাঁধ দুটো ঝাঁকালেন। তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ শিক্ষাবিতরণকারী এইসব পণ্ডিতজনের চিরকালের সেই ভুল-বোঝা (ফ্রান্সে এবং প্রতিটি দেশেই এদের আমি চিনি), তাঁদের কাছে আদর্শবাদ বলতে বোঝায় শুধু বন্ধ্যা চিন্তা এবং সমস্ত রকম কর্মই বিশ্বাসঘাতকতা [দ্রষ্টব্য—বন্দা (Benda)]। আমার আশা আছে, সমস্ত দেশের নতুন বংশধরেরা এই জ্যান্তো-মড়াগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করবে।

ডিসেম্বর, ১৯৩২। অস্পৃশ্যদের এক মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্যে গান্ধী আবার অনশনের কথা বলছেন ; আমি তাঁকে তার ক'রে জানালাম যে, একটা গৌণ ব্যাপারের জন্যে তাঁর গত অক্টোবরের বীরোচিত কর্মের পুনরাবৃত্তিতে ইউরোপের মতামত আগের মতো অনুকূল হবে না।

ডিসেম্বর, ১৯৩২। (বাইলোরাশিয়ার আকাদেমির) অধ্যাপক কিরুচিন আমাকে গান্ধী সম্পর্কে লিখেছেন,...(তিনি পড়াশোনা করেন, আমার বইগুলোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে, "এক নতুন ধর্মের সংগঠক ও জনসাধারণকে, ভারতীয়

জাতিকে ধাপ্পা-দেওয়া এই গান্ধীর আমি এক ভক্ত," এবং তিনি জানতে চেয়েছেন তাঁর সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্কটা কী), তাঁকে উত্তর দিলাম (২৭ ডিসেম্বর) :

"গান্ধী সম্পর্কে আমার চিন্তার ধরনটা আপনি জানেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ড হয়ে যাওয়ার সময় যখন তিনি আমার বাড়িতে ৫ দিন ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে যে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল, তারপর থেকে সেই ধরনটা সংশোধন করতে হয়নি। তাঁর ধ্যানধারণা সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে সমস্যাই হোক না কেন, প্রকৃত মানুষটি ও তাঁর চরিত্র অবশ্যই শ্রদ্ধা জাগাবে। তাঁর বিশ্বস্ততা ও তাঁর আন্তরিকতা সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তিনি নিজে ভুল করতে পারেন। কিন্তু জেনে শুনে তিনি কাউকে কখনো প্রবঞ্চনা করবেন না। আর তাঁর সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে সবসময় এই অপরিহার্য বাস্তব ঘটনাটি মনে রাখতে হবে : তাঁর নিরন্তর বিবর্তন হচ্ছে। তাঁর মধ্যে জমাট-বাঁধা কিছুই নেই, একবার করেই চিরকালের জন্যে থেমে-যাওয়া নেই। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ঘাটতি তিনি খুবই মেনে নেন এবং তা সংশোধন করতে, তা পূরণ করতে তিনি সব সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু তা ঘটনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যতটা ততটা পুঁথিপত্রের মাধ্যমে নয়। এইটিই চিরকাল তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষার ও কর্মের রীতি : প্রত্যক্ষ সামাজিক পরীক্ষা, বার বার সেটা করা এবং সেটার সত্যতা প্রতিপাদন করা, এক পা এক পা ক'রে এগুনো, প্রতি পদক্ষেপে নিজের গণ্ডিকে বাড়ানো। এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মনের পরিবর্তন-সংশোধন হবে। প্রতীক-দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি তাঁর স্বীকৃতি অনুসারেই এই রূপান্তরণটির উল্লেখ করছি : 'ঈশ্বরই সত্য' এই যে আদর্শগত মন্ত্রটি তাঁর কাছে প্রিয় ছিল, তা গত পাঁচ বছরে হয়ে দাঁড়িয়েছে —'সত্যই ঈশ্বর,' আর এইটিই তাঁর বর্তমান আদর্শ-বাণী (devise)। একই মন্ত্রকে এই উল্টে-নেওয়াটার চরিত্র এখনো খুবই বিমূর্ত ও (দৃশ্যত) পরম হয়ে থাকলেও, এটা অতি গুরুতর দিগ্দর্শনের একটা পরিবর্তনের কম ইঙ্গিত করে না এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমস্ত সত্যকে গ্রহণ করার দরজা খুলে যায়। তাছাড়া, আপনি যদি তাঁর আত্মজীবনী'র আমার লেখা ভূমিকাটি পড়তেন (রিয়েডেরের ফরাসী সংস্করণের পৃঃ ১২-১৩), তাহলে গান্ধীর উদ্ধৃতিতেই তাঁর এই 'অভিজ্ঞতাগুলোয়' চিরকাল আরোপিত আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী চরিত্রটি সেখানেই দেখতে পেতেন : 'আমার অভিজ্ঞতার কোনো ধাপেই পূর্ণাঙ্গতার দাবি করা থেকে আমি দূরে থাকি, জ্ঞানীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে দাবি করেন তার বেশি আমি আর কিছুই করি না।' যদিও তার মধ্যে সমস্ত রকম যথাযথতা, মনোযোগ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা আছে, তবু তিনি কখনো বলবেন না যে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলোই চূড়ান্ত ; বরং যেসব সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তাদের সম্পর্কে সব সময়ে মন খোলা রাখেন…

তাঁর সঙ্গে আলোচনায় তাঁকে আমার এই রকমটিই মনে হয়েছে : তিনি বিনয়ী এবং সুদৃঢ়, সামাজিক কর্মের এক মহৎ উপপাদ্যকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছেন এবং খুঁটিয়ে-দেখা তথ্যের উপরে ভিত্তি ক'রে একটা থেকে আর একটা অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে চলেছেন, কিন্তু অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে

আহরণ করতে এবং তাদের যাচাই ক'রে তাদের অনুসারেই নিজের কর্মপন্থা পরিবর্তন-সংশোধন করতে তিনি সবসময়েই প্রস্তুত। যদি তাঁর জীবন (জীবনটাকে তিনি যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারেননি) আরও দশ বছর দীর্ঘায়িত হয়, আমার বিশ্বাস যে, তাঁকে দেখা যাবে, সমাজ-ব্যবস্থায় সামনের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ করছেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর তিনি ভারতীয় ধনতন্ত্রীসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই পরিচালনা করবেন। যাঁদের কাছে এই বিবর্তন অপ্রত্যাশিত ঠেকবে, তাঁরা তাঁকে জানার কষ্ট স্বীকার করেননি। তাঁর বর্তমান রণকৌশল ইংলন্ডের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষের যুক্তমোর্চার ভাঙন যদিও এড়িয়ে যাচ্ছে, তবুও তিনি ভারতীয় ধনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ও ভয়-দেখানো ভাষায় ইতিমধ্যেই (এমনকি ইংলন্ডে, গোলটেবিল বৈঠকে) যথেষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

আমার যদি সময় হয়, গান্ধী সম্পর্কে আমার ১৯২২ সালের লেখা বইটা পূর্ণাঙ্গ করবো। দশ বছরে গান্ধীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি বেড়েছে। এবং আমি (তাঁর মতোই) মনে করি, তা শুধু পথের মাঝখানে। তাঁর নিজের উক্তি অনুসারে, তিনি হচ্ছেন 'সত্যের এক দীন (এবং নাছোড়বান্দা) সন্ধানী,' যিনি কখনো পথ ছেড়ে দেন না। ভ্রাত্রোচিত প্রীতির সঙ্গে।'

ডিসেম্বর, ১৯৩২। মনে হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা অস্পৃশ্যদের অপরিহার্য স্বার্থের কারণে নতুন অনশন শুরু করতে গান্ধীকে বাধ্য ক'রে তুলছে, আর এবারে এটা হবে তাঁর মৃত্যু। এই নতুন পরীক্ষায় গান্ধীর অত্যন্ত ভেঙ্গেপড়া স্বাস্থ্যে আর কুলোবে না।

১৯৩৩

জানুয়ারি, ১৯৩৩। আমার বোনকে লেখা গান্ধীর চিঠি; ভিলন্যভে তাঁর আসার বার্ষিকী উপলক্ষে চিঠিটা লেখা :

'জারবেদা কেন্দ্রীয় কারাগার
৬ জানুয়ারি, ১৯৩৩'

প্রিয় মাদলিন,—আপনার সংক্ষিপ্ত চিঠিটা পেয়ে এক বিপুল আনন্দ লাভ করেছি, বিশেষ ক'রে তা যেন আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলনের অমূল্য দিনগুলো মনে পড়িয়ে দিয়েছে। সেটা ছিল যেন নিজেদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ। অনশনের পরেকার ঘটনাবলী যদি একটা বিস্ময়কর কিছু হ'য়ে থাকে, আর সে-ঘটনাবলী বিস্ময়কর কিছুই, তা ছিল বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরেরই কাজ। আমি ছিলাম তাঁর হাতের শুধু এক তুচ্ছ যন্ত্র মাত্র। এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি আমিই কোনো কিছু করছি। সোজা কথায়, তা আমি পারতামও না; কিন্তু

যখন বলেছি যে, ঈশ্বরই আমার মধ্যে সক্রিয় হয়েছিলেন, যতদূর আনতে পেরেছি সেটা আক্ষরিকভাবেই সত্য। দেবদাসকে পাঠানো আপনার দাদার একটা টেলিগ্রাম থেকে কিন্তু লক্ষ্য করেছি যে, পরিকল্পিত দ্বিতীয় অনশন সম্পর্কে ইউরোপে কেউ বুঝতে পারেনি। এতে আমি অবাক হইনি। এই গোটা ধারণাটাকেই মনে হয় এতো নতুন; এবং তবুও আমার কাছে মনে হয় যে, এটা সত্যের এক আন্তরিক সন্ধানের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। অনশন ছাড়া প্রার্থনা সম্ভব নয়, আর যে অনশন প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, তা দেহের উপর এক অত্যাচার তা কারুর মঙ্গল করে না। সত্যিকারের অনশন এক তীব্র আত্মিক প্রচেষ্টা,—এক আত্মিক সংগ্রাম। এ এক প্রায়শ্চিত্ত, ব্যক্তিগত শুদ্ধির প্রণালী। এই রকম অনশন থেকে জন্ম নেয় এক নিঃশব্দ ও অদৃশ্য শক্তি, যদি তার বলিষ্ঠতা ও পবিত্রতা পর্যাপ্ত হয়, তাহলে তা সমগ্র মানবতাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে। একটা ছোটো মাপে আমি এর অদৃশ্য ও পরিব্যাপ্ত প্রভাব দেখেছি, কিন্তু এটা যে এক প্রবল শক্তি তা জানার পক্ষে তার মহিমা পর্যাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানে পা বাড়ানো অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যদি দোলাচলচিত্ত হতাম তাহলে নিজের প্রতি, আমার সঙ্গী কেলাপ্পনের প্রতি ও হরিজনদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করতাম। অবশ্য এই মুহূর্তে তা অনির্দিষ্ট ভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। হতে পারে যে, এখনো স্পষ্ট নই। স্পষ্ট হওয়াটা কঠিন। কিন্তু এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, কালে প্রমাণ হবে, এই পদক্ষেপটি সঠিক ছিল, আর যাই হোক না কেন, সেটা ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা আহ্বান, যাতে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না। যদি অন্য আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে, আপনাকে অনুরোধ করছি, লিখে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আপনার দাদাকে কী বিশেষণে ডাকবো তা অনেক ভেবে বার করেছি। আপনার কাছে তাঁর কথা বলতে তাঁকে 'মিস্টার রলাঁ' বা 'আপনার দাদা' বলাটা বড়ই গতানুগতিক ও ভদ্রতাপূর্ণ শোনায়। শুধু 'ভাই' ব'লে ডাকায় বড়োই ঘনিষ্ঠতার ব্যাপার হয়ে যাবে এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে ঠিক যে রকম সম্পর্ক তা এতে বোঝা যাবে না। যে দুটি শব্দ মনে জেগেছে তা হচ্ছে 'ঋষি' অথবা 'মুনি'। এ দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ হলেও, অর্থের দিক থেকে ঠিক এক নয়। তাই, তাঁর ও আপনার সম্মতি সাপেক্ষে, এখন থেকে তাঁকে 'ঋষি' ব'লে ডাকবো। আশা করি এই চিঠি যখন পৌঁছুবে, তিনি সর্বাঙ্গীন কুশলেই থাকবেন। আমার আশংকা যে, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভালো থাকুক তা আশা করতে কেউ সাহস করে না। তার পুরো সুযোগ দিতেও তিনি চান না। তা চাইতে গেলেই বলতে হবে, তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষতি ক'রে তাঁকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোযোগ দিতে হবে, আর ঋষির কাছে যা ঐতিহাসিক তা আত্মিকও বটে, নইলে তিনি আর ঋষি থাকেন না। দয়া ক'রে ঋষিকে বলবেন, এই প্রথম আমি তাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বইগুলো পড়লাম। পড়ে বিপুল আনন্দ পেলাম এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ভালবাসা যে কতখানি তা আগের চেয়ে আরো পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ করতে পারলাম।'

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। দুটি তরুণ ফরাসীর আগমন,—দুটি তরুণ ভদ্র সন্তান, দেখতে-শুনতে বাবুগোছের, মেয়েলি ; এরা মনে করছে, রবীন্দ্রনাথের এক ব্রতের ভার নিয়ে আমার কাছে এসেছে : নাম—দানিয়েলু ও (র. র. অন্য নামের জায়গাটি ফাঁকা রেখেছেন)।

এরা যুদ্ধোত্তর ধনী যুবকদের টাইপ। বাপের খুঁটির জোর-ওয়ালা এই ছেলেরা (এদের মধ্যে দানিয়েলুর বাবা প্রতিটি বড়ো বুর্জোয়া-গোষ্ঠীর মধ্যেই কর্মকর্তা ছিলেন, আছেন, থাকবেন). এই কেতাদুরস্তরা, এই 'মেয়েলি-ধরনেরা' এক রোমাঞ্চকর জীবন বানিয়ে নিয়েছে, যা করতে যুদ্ধ-পূর্ব যুগের খুব কম ফরাসী তরুণই সাহস পেতো, এরা মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছিল ; অফেগানিস্থানে কিছুদিন ছিল, মনে হয়, আগে থেকেই সেখানে রাজার সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল ; এর বর্বর অবস্থা, নির্মম নিষ্ঠুরতা, শাস্তিদানের বর্ণনা করলো (এরা তার ফিল্মে তুলে এনেছে) ; বেরুনোর সময় এদের রাত্রে পালাতে হয়েছিল। কূটনৈতিক ছাড়পত্র নিয়ে এরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারের মধ্যে ঢুকেছিল ; ভারতবর্ষ দেখেছে ; এবং প্রতিতুলনায় ভারতবর্ষকে মনে হয়েছে মাধুর্যের—অতি-মাধুর্যের এক স্বর্গ ! বিশেষ ক'রে শান্তিনিকেতন ও বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এদের পাগল করেছে। এই মহান্ কর্মকাণ্ডটিকে বাঁচাবার জন্যে এরা কোমর বেঁধেছে, এই কর্মকাণ্ড বিপদের মুখে পড়েছে ; এবং রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে এরা চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেশের সরকারকে এর ব্যাপারে আগ্রহী ক'রে তুলতে। এদের কাছে টাকা কোনো প্রশ্নই নয় এবং সেটা এরাই বলল : টাকার খোঁজ এদের হাতেই আছে, দরকার মতো টাকা এরা নিজেরাই জোগাড় করতে পারে। যা এরা প্রয়োজন মনে করে তা এই যে, শান্তিনিকেতনে একটা ক'রে অধ্যাপকের পদ বানিয়ে দেবার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে টেনে আনতে হবে। আর, বস্তুত, নিছক জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও এ সম্পর্কে যে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এরা এসেছে আমার কিছু পরামর্শ নিতে এবং সে পরামর্শ আমি তাদের দিলাম। (মুসোলিনির অহমিকা এবং তালঠোকা বালখিল্য, অজাতশ্মশ্রু স্প্যানিশ রিপাবলিকের অহমিকার দিকে আমি এদের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম)। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ইউরোপের ব্যক্তিদের একটা নামের তালিকা এরা আমাকে দিল ; অনারারি কমিটিতে তাঁদের নাম দেওয়ার জন্যে এরা তাঁদের কাছে যাওয়া মনস্থ করেছে। হাসির ব্যাপার এই যে, তালিকার অর্ধেক নামই কবরের গায়ে লেখা : ব্লাজকো ইবানেজ, রেমন্ড, ন্যানসেন,* ইত্যাদি। আর এই চালু ছোকরাগুলোর সে-সম্পর্কে তিলমাত্র ধারণাও নেই ! স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যাঁদের নাম এই তালিকায় রেখেছে এইসব খ্যাতনামাদের একটা লাইনও কখনো এরা পড়েনি, সেই নুট হামসুন, বয়ার, পিরানদেল্লো ইত্যাদিরও পড়েনি। কিন্তু এরা নাকি মধ্য-এশিয়ার দুর্গম অঞ্চল এবং যাদুঘর ও খোঁড়াখুঁড়ি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেবে। এদের চেহারা ও পোষাক-আশাক দেখে যা সত্যি ব'লে মনে হয়, তা এর উল্টোটাই। বড় পোষাকের দোকানে সাজানো মানুষ-

---

* ব্লাজকে ইবানেজের মৃত্যু ১৯২৮ ; ন্যানসেনের মৃত্যু ১৯৩০।— অনু.

পুতুলের মতো এই ফ্যাসান-দুরস্তরা নাকি মানুষ ও প্রকৃতির বিপদের ঝুঁকি মাথায় করেছে। এবং, এরা এমনকি, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের ভয়ের সতর্কতা সম্পর্কেও অবজ্ঞার ভান করল। সমস্ত অঞ্চলেই এরা ঘুরেছে, পোষাক-আশাকের কিছুই পাল্টায়নি, রোদের জন্যে হ্যাটও নাকি মাথায় দেয়নি। ব্যতিক্রম হিসেবে, একজন লেখকের নাম এরা লোকের মুখে শুনেছে ঃ তিনি মালরো।…

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। সন্ধ্যা ৭ টার দিকে এলেন বার্লিন থেকে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ত্রাণ'-এর সম্পাদক জিবার্তি। তাঁর আসার উদ্দেশ্য—তিনি যে নতুন প্রচার-অভিযান চালাতে চান, তাতে আমাকে পেতে চান…আর তার অজুহাত হচ্ছে, ভারতবর্ষে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের প্রতি কলংকজনক দন্ডাজ্ঞা। (প্রচার করা ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ না করলেও, ৪ বছর আটকে রাখার পর প্রায় ৪৫ জন ইংরেজ ও ভারতীয় ট্রেডইউনিয়ন নেতা ও কমিউনিস্টকে ১০, ১৫, ২৫ বছরের জন্যে—একজনকে যাবজ্জীবন,—দন্ড দিয়ে আন্দামানে আটক রাখা হয়েছে।)…

…আমার কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়, তা করতে নীতিগতভাবে তৈরি (যদিও ঘাড়ে-চেপে-থাকা এতো কাজের ফলে আমার শক্তি ভয়ংকর ভাবে টলে গেছে)…যে কারণে আমার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, সেই কারণটি জরুরি এবং তার জন্যে আমার উপর দাবিটা ন্যায্য। তা সত্ত্বেও আমি আমার শর্ত আরোপ করলাম ঃ যে আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে তাকে গান্ধী ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে ব'লে যেন গণ্য করা না হয়। আমার সঙ্গে খোলাখুলি হওয়া ভালো। কারণ যখনই বুঝবো যে আমি ঠকেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করবো। জিবার্তি আমাকে আশ্বাস দিলেন (এবং সেটা আন্তরিকই মনে হলো) যে, এ ব্যাপারে গান্ধীর বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য রাখার অভিপ্রায় নেই…আর এমনকি যদি এটা সত্যি হয়, (আমি যা তাঁকে বললাম) মীরাট বন্দীদের জন্যে গান্ধী প্রকৃত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, তাহলে এর সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের যুক্ত হওয়ার চেয়েও এর পক্ষে সেটাই চমৎকার হবে!…গান্ধীকে নিয়ে আর বেশি কথা চালালাম না…এটাই চোখে পড়ে যে, জিবার্তি ও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে হাস্যকর ভাবে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের দলে ফেলেছেন—মুহূর্তের মধ্যে তিনি গড় গড় ক'রে ব'লে চললেন কী প্রবন্ধ লিখতে হবে, লোকে চায় আমি কী লিখি। কিন্তু আমি যে গুম হয়ে গেলাম তা স্পষ্টই চোখে পড়ল, আর তিনি তোড়ের মুখে বাধা পেয়ে থেমে গেলেন… না, কমরেড, না, ওসব চলবে না! আমার যা বলার, তা আমি বলবোই, কিন্তু দুনিয়ার কেউ আমাকে তার নির্দেশ দিতে পারবে না…

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। মীরাটের দন্ডপ্রাপ্তদের অনুকূলে আমার আবেদন জিবার্তিকে পাঠালাম*…

---

* পরিশিষ্টে পূর্ণ বয়ান দেওয়া হয়েছে।

মার্চ, ১৯৩৩। হাউস অফ্ কমন্সের কমিউনিস্ট সদস্য শারপুরজি সাকলাতওয়ালা লন্ডন থেকে আমাকে লিখছেন, এবং মার্কিন সেনেটর বোরার সঙ্গে তার লেখালেখি-করা চিঠিপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মস্কো-বিচার সম্পর্কে বলতে মার্কিন সরকার তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে (অতি স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ সরকারের চাপে)। তিনি আমার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন; যদিও আমার কাজের অক্ষমতা সম্পর্কে কোনো মোহ গ'ড়ে তুলিনি, তাঁর হয়ে বোরাকে চিঠি দিলাম (৭ মার্চ)।

মার্চ, ১৯৩৩। এল. আই. সি. পি.-র (শান্তির যোদ্ধা) সাধারণ সম্পাদক এ. বোশে আমার পত্রের** প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন এবং কয়েকটি অনুপূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর পত্রটি সহানুভূতিপূর্ণ, স্পষ্ট ও খোলাখুলি। ভালমঁ থেকে আমি তার উত্তর দিলাম (১৮ মার্চ):

“...৩য়. আপনি লিখেছেন: ‘গান্ধী প্রমাণ করেছেন যে, অহিংসা হিংসার ক্ষমতা জাহির করাটা মঞ্জুর করে না’। হিংসা বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন? শত্রুর হিংসা? তা ভারতীয় অহিংস জনগণের উপরে নিজের ক্ষমতা জাহির করছে এবং করছে পাশবিকভাবেই, বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে ও বিক্ষিপ্ত প্রদেশগুলোয়, এক অবরোধের অবস্থা বাকি দুনিয়া ও সংবাদপত্রের হস্তকারিতা থেকে যাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে (যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পেশোয়ার)। গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর এদমঁ প্রিভা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, দুর্ব্যবহার ও ন্যক্কারজনক জেলখানার নিয়মকানুনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আদর্শবাদী—যা কখনো হয়নি এমন একটা গোটা পুরুষের স্বাস্থ্য ও সমস্ত শারীরিক শক্তি ধ্বংস ক'রে দেবে, এটা চোখে দেখাও এক চরম বেদনা। স্বাভাবিকভাবেই গান্ধী ও তাঁর ধারেকাছের লোকজনদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তলস্তয়বাদীদের নিপীড়নকারী জারদের আমলে যেমন তলস্তয় অব্যাহতি পেয়েছিলেন। (আর তবুও তো সবচেয়ে নিষ্ঠুর নিপীড়নকারীদের মধ্যে ইংরেজরা পড়ে না। এই মুহূর্তে তারা অনেক বেশী মাত্রা রেখে চলেছে।) হিংসা বলতে কি আপনি ভারতবর্ষের হিংসা, যার ক্ষমতা জাহিরে গান্ধী বাধা দিচ্ছেন—তার কথা বলছেন? পরিস্থিতি ভালো ক'রে জানুন! গান্ধী কখনো ভারতবর্ষের উপরে অহিংসা চাপিয়ে দেননি। তাঁর সত্যাগ্রহের নিজের সৈন্যবাহিনী আছে, তিনি সেই সৈন্যবাহিনীর নেতা, তার পরমতম আত্মিক পরিচালক: এই সৈন্যবাহিনীর উপরেই তিনি নৈতিক নিয়ম চাপিয়েছেন। আর যে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা অহিংস নয়, সেই জাতীয় কংগ্রেসই গান্ধীকে এই মহান্ পরীক্ষার ক্ষমতা দিয়েছে, এর সঙ্গে যুক্ত হবার দায়িত্ব নিয়েছে—কিছু কালের জন্যে, এবং পরীক্ষা সিদ্ধ হোক বা না হোক, ফলাফল গান্ধী যতদিন না ঘোষণা করবেন

** বিবেকবান প্রতিবাদী, বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্পর্কে এ. বোশে-কে লেখা চিঠি।

ততদিন পর্যন্ত। যদি পরীক্ষায় ফল না হয়, কংগ্রেস ও গান্ধী যার যার পথে চলবেন। রাজনৈতিক কর্ম থেকে গান্ধী সরে যাবেন, নিজের ও তাঁর শিষ্যদের জন্যে তাঁর নীতি ধ'রে রাখবেন, আর কংগ্রেস অন্য অস্ত্রের সন্ধান করবে। পরীক্ষা কিন্তু এখনো হয়ে যায়নি। সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের উপরে। আর সেটা হচ্ছে সুবিধাজনক অবস্থায়, সঙ্গে আছে এক নেতা, এবং বহুশতাব্দী ধ'রে অহিংসার মতবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ী এক বিপুল জাতি। ইউরোপে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই নই। ইউরোপে অহিংস প্রতিরোধের এক আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনাগুলো কতখানি ? খুঁটিয়ে সেসব বিচার করুন ! বর্তমান মুহূর্তে রণনীতির দিক থেকে তাদের আমি ভয়ংকরভাবে দুর্বল মনে করি…"

এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৯ এপ্রিল গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে অস্পৃশ্যদের স্বার্থের জন্যে দিন-আষ্টেকের মধ্যে ৩ সপ্তাহের জন্যে আবার অনশন করবেন। (মনে হয় এই অনশনের লক্ষ্য ব্রিটিশ সরকারের চেয়েও বেশি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণরা, তারা হিন্দু সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার বিরোধিতা করছে।) অনশন আবার শুরু করার অসমীচীনতা সম্পর্কে আমি যা ভাবি তা বেশ কয়েক মাস আগে তাঁকে লিখে জানিয়েছিলাম এবং গান্ধী অন্যকে দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন ; যে সব যুক্তি তাঁকে অনশন শুরু করতে বাধ্য করছে তাদের কথা তাঁর একগুঁয়ে মিষ্টতার সঙ্গে উত্তরে জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, কেউ ভাবেনি যে, তা অক্টোবরের আগেই ঘটবে ; আর আশা করা গিয়েছিল, এরই মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রাহ্মণদের মনোভাবের একটা পরিবর্তন ঘটবে। সে-আশা ক'রে আর লাভ নেই ; এই বিপজ্জনক কাণ্ডটা ঘটতে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই ; এর ফলাফল আমাদের কাছে যতটা বিরাট মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভবত আরও অনেক বিরাট হবে।

মে, ১৯৩৩। অস্পৃশ্যদের স্বার্থে গান্ধী ৮ মে ২১ দিনের জন্যে তাঁর অনশন শুরু করেছেন (বা আবার শুরু করেছেন)। ৯ মে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছে ; যদি মারা যান, আগে থেকেই হাত ধুয়ে বসে থাকার জন্য এই সতর্কতা। বীরোচিত সৌজন্যে প্রতিদানে গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে আইন-অমান্য আন্দোলন ছয় সপ্তাহের জন্যে মুলতুবি রাখতে অনুরোধ করেছেন।

জুন, ১৯৩৩। মাদাম এ. মার্শা আমাকে একটা চিঠি দিলেন, সেটা তাঁকে লিখেছেন রোমের কাউন্টেস হেত্তি আন্তোনিনি। তিনি দু'জন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞকে আমার সঙ্গে পরিচিত করাতে চান, তাঁদের একজন বোম্বাইয়ের সঙ্গীত আকাদেমির ডিরেক্টার ওংকার ঠাকুর। ভারতবর্ষ ছাড়ার সময় গান্ধী তাঁদের বলেছিলেন ঃ

ইউরোপে দু'জন লোকের সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে : তাঁরা হচ্ছেন মুসোলিনী ও রম্যাঁ রলাঁ। মুসোলিনিকে দুনিয়ার সবাই জানে, এমনকি রাস্তায় পুঁচকে ছেলেটা পর্যন্ত। কিন্তু বিদগ্ধ মানুষের কাছে সর্বত্র রম্যাঁ রলাঁ পরিচিত।" এই কথা তাঁরা মুসোলিনিকেও বলেছেন, মুসোলিনির সামনে অনেকগুলো বাজনা বাজিয়েছেন, বাজনাগুলি তাঁর আগ্রহ জাগিয়েছে। কিন্তু এই তুলনার গৌরবে পুলকিত হলাম না, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলাম। আমার অনেক কাজ, ছুটিতে বেরুনোর আগে 'বিমুগ্ধ আত্মা' শেষ করতে হবে। (খসড়া শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ডিক্টেশন ও পরিমার্জনার জন্যে দরকার হবে বেজায় খাটুনি।)

জুন ১৯৩৩। গান্ধীর অনশনের বারো দিনের দিন (বিনা বিপত্তিতে ২১ দিনে এখন অনশন সাঙ্গ হয়েছে) মহাদেব দেশাই লিখেছেন যে, আমার চিঠি গান্ধীর হাতে পৌঁচেছে এবং এটায় তাঁদের খুবই ভালো হয়েছে, বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, এবার গান্ধীর অনশন রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ তাঁর প্রায় সমস্ত সুহৃদের আপত্তির মুখে পড়েছে। মূলত আমিও তা সমর্থন করিনি ; কিন্তু আমি জানি, এ নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা : তাঁর কাছে এই কাজটা যতটা শুদ্ধির ব্যাপার ও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ, তার চেয়ে অনেক কম একটা রাজনৈতিক কর্মের (বা প্রতিবাদের) ধরন। ওখানকার খবর থেকে যতটা এ সম্পর্কে বিচার করতে পারছি, এটা অবশ্যই একটা কঠিন পরীক্ষা ছিল। যে গান্ধী তাঁর নৈরাশ্য প্রকাশ করেন না, সেই গান্ধী তাঁর নিজের ও দেড় বছর ধ'রে বন্দী-থাকা তাঁর শ্রদ্ধেয় শিষ্যদের আত্মত্যাগের এতো কম ফল দেখে নিশ্চয়ই বেদনা বোধ করেছেন। আমার কাছে মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে বলেছেন : "আমি যদি ভুল ক'রে থাকি আমাকে যদি তোমার দরকার না থাকে, আমাকে ফিরিয়ে নাও !" কারণ ২১ দিনের দিন অনশন ভঙ্গের পর তাঁর প্রথম বলা কথার একটি হচ্ছে এই : "ঈশ্বর যেহেতু আমাকে ফিরিয়ে নেননি, তার অর্থই হচ্ছে এখনো লড়াইয়ের জন্যে আমাকে তাঁর প্রয়োজন আছে। আর, আরও উৎসাহের সঙ্গে আমি লড়াইয়ে নামছি।"

জুনের শেষ, ১৯৩৩। বাঙালী গায়ক ও লেখক দিলীপকুমার রায় কয়েক বছর ধ'রে পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে আছেন এবং তাঁর প্রভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, সম্ভবত তাঁর প্রভাবে ততটা করেননি (কারণ অরবিন্দ এক গুপ্ত সূর্যের মতো, তিনি তাঁর ঠিকরানো আলোই শুধু দেখতে দেন), যতটা করেছেন তাঁর চন্দ্র, মিরিয়াম, মীরা, "শ্রীমা"-র প্রভাবে ; এই চৌকশ, বুদ্ধিমতী মহিলা তাঁকে কব্জা করতে ও তাঁকে চালাতে জানেন, কার্যত তাঁর আশ্রম ইনিই চালান। ৩০০ কপি ছাপার ছাপ-মারা ও মীরার সই করা : "শ্রীমার সঙ্গে আলাপচারী" নামে একখন্ড চমৎকার ফরাসী বই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এতে মহিলাটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অরবিন্দের স্বতঃ-

উপলব্ধিমূলক বা অতীন্দ্রিয় ধ্যানধারণা প্রকাশ করেছেন। এবং আমার ধারণা যে, দিলীপকুমারের মধ্যবর্তিতায় তিনি আমাকে বঁড়শিতে গাঁথতে চান।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম, প্রশংসা করলাম এবং এই কথাও লিখলাম (২৮ জুন):

“...নতুন জীবনকে অনেক পরে উদ্ভাসিত করার জন্যে ভগবানের বুকে ঠাঁই নেওয়াটা আমাদের মতো পশ্চিমের মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এখুনি ছুটতে হবে অত্যাচারিতের—মানুষ ও জাতির সাহায্যে, তারা অপেক্ষা করতে পারে না। এক মুহূর্তের জন্যেও বর্তমান কর্ম থেকে মনকে সরিয়ে নেবার অধিকার আমরা স্বীকার করি না। ‘এক’ সবকিছু আলিঙ্গন ক’রে আছেন এবং যে-অসংখ্য স্রোত বয়ে চলেছে তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করেন, এ জানা ও উপলব্ধি করা আমার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের পক্ষে বৃথা: আমার পারানির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, এই স্রোতে যারা ডুবছে তাদের বাঁচানো, নয়তো তাদের সঙ্গে ডুবে মরা। ‘আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর’: বিবেকানন্দের এই কথাটিই আমার অস্থিমজ্জায় লেখা আছে, যদিও আমি জানি যে, সত্তার প্রাচুর্য সীমাহীনরূপে দুঃখদুর্দশা ও একটি দিনের সংগ্রামকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু এ সুসম্পন্ন করতে সত্তার পক্ষে আছে অনন্ত কাল; আর আর্ত-পীড়িতদের আছে শুধুমাত্র একটি দিন। যাদের সবচেয়ে কম আছে, বেশির অধিকার তাদেরই...”

জুলাই, ১৯৩৩। লন্ডনের ‘নো মোর ওয়ার মুভমেন্ট’-এর সাধারণ সম্পাদক রেজিনাল্ড এ. রেনল্ডস্ আমাকে লিখছেন (৯ জুলাই) যে, তিনি এই আন্দোলনে গান্ধীর মূলনীতি—যা মনের শক্তি থেকে জন্ম নেয় (ex animi fortitudine oritur) সঞ্চারিত করতে চান, এবং যতদূর পারেন বিরোধিতা করতে চান বন্ধ্যা “শান্তিবাদকে,” “যাকে লেনিন নাম দিয়েছেন বুর্জোয়া হতাশা”। কিন্তু তার অনেক বিপত্তি। ১৫ জুলাই জাতীয় কমিটির এক বৈঠক বসবে; এবং এই বৈঠকে বি. এ. ডব্লিউ. ই.-র (যুদ্ধবিরোধী ব্রিটিশ কাউন্সিল যা ১৯৩২ সালে আমস্টারডাম কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা গঠন করেছেন, যাতে রেনল্ডসও অংশগ্রহণ করেছিলেন) সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব নেবার চেষ্টা হবে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ ক’রে একটা চিঠি লিখে আমি যেন তাঁকে সমর্থন দিই, তিনি এই অনুরোধ করেছেন।

অসুখে ভুগলেও স্পিয়েজ থেকে (১২ জুলাই) আমি তাঁকে লিখলাম:

“আমার মনে হয়, বন্ধ্যা তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসাটা আর দেরি করা চলে না। কর্মের জগতে প্রশ্নটা আর (হায়রে!) পরম অহিংসা ও পরম হিংসার মধ্যে দাঁড়াচ্ছে না,—দাঁড়াচ্ছে ঘটনা ও মানুষের উপরে জাহির করা সবচেয়ে বেশি বা সবচেয়ে কম হিংসার মধ্যে। এমনকি ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহও এক প্রচ্ছন্ন হিংসা থেকে মুক্ত নয়, যার ফলাফল সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে কম ভীতিজনক নয়। একটা গোটা জাতির বিরাট “অস্বীকার” একটা হাওয়া-দেওয়ার-যন্ত্র তৈরি করে: যে-হাওয়া সে দেয় তা বিরোধীকে

বাঁচিয়ে রাখে। আমি আরও বলবো যে, আমাদের মতো যাঁরা গান্ধীকে কাছে থেকে জানেন (যখন লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনের কিছু আগে, 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় যেসব আলোচনা হয়েছিল) তাঁরা মহাত্মার সক্রিয় চিন্তার বিবর্তনটি অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। প্রায় বারো বছর আগে চৌরিচৌরায় কিছু হিংসাত্মক ব্যাপার ঘটায় তিনি তাঁর গোটা আন্দোলনই তুলে নিয়েছিলেন। আর এখন নতুন আন্দোলন শুরু করার মুহূর্তে তাঁকে কতো ভয় দেখানো হয়েছে যে, তা আবার না নতুন চৌরিচৌরা সৃষ্টি করে; তিনি কর্ণপাত করেননি, বলেছেন যে, এবার তিনি তাঁর অনেক সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে সমস্ত রকম হিংসাকে এড়িয়ে চলার আশা রাখেন, আর হিংসা যদি ঘটেও, তাহলেও তাতে তাঁর কাজ থামবে না : কারণ তিনি সচেতন যে, তিনি ও তাঁর লোকজন যদি মোটেই সক্রিয় না হন, তাহলে যার প্রকাশ ঘটবে তার চেয়ে এরা হবে কম খারাপ, কম হিংসাত্মক : কারণ সক্রিয় না হলে, হিংসার একমাত্র পশুশক্তির কাছেই ক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া হবে।

কর্মের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে ও যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তাদের ফলাফলকে পৌরুষভরে দেখার সাহস চাই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যদি কার্যকর ভাবে লড়তে চাই, তাহলে বিবেকের এক সেরা-অংশের ব্যক্তিগত আপত্তি কোনো মতেই যথেষ্ট হবে না। প্রথম পদক্ষেপ থেকেই কর্মের মধ্যে পড়তে হবে, জবরদস্তির ব্যাপার এসে যাবে, সেই জবরদস্তি খাটাতে হবে যুদ্ধশিল্পের উপরে এবং পরিবহন ব্যবস্থার উপরে। সর্বকিছুর আগে যুদ্ধকে নিরস্ত্র করতে হবে, তার হাত ভেঙে দিতে হবে। কল-কারখানা, ডক ও পরিবহণ শ্রমিকদের বড়ো বড়ো ধর্মঘট ছাড়া সম্ভব নয়। আর, যুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধের জন্যে শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে সামিল করা হয়। তাই তাদের অস্বীকৃতির ফল হয়ে দাঁড়াবে এক অভ্যুত্থান, এক সামরিক বিদ্রোহ, তা ভেঙে পড়বে এক নির্মম নিপীড়নের আঘাতে। আপনারা কি এই মোহ লালন করেন যে, বিনা প্রতিরোধে সেই শ্রমিকেরা নিজেদের গুঁড়িয়ে যেতে দেবে? যদি মেনেও নিই যে, ধর্মীয় আদর্শ হবে হাত জোড় ক'রে, (বা ক্রুশে হাত রেখে) প্রাচীন থেবান বাহিনীর মতো নিজেদের কচুকাটা হতে দেওয়া, এই বীরোচিত আত্মবিসর্জনের বিশ্বাস তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করার মতো বড়ো ব'লে কি আপনারা নিজেদের মনে করেন? যদি পারেন, তাই তাঁদের কাছে প্রচার করুন, আর তাদের অংশীদার হোন! কিন্তু যদি এক সংখ্যালঘু বিশ্বাসীদের মধ্যেই শুধু তা ছড়াতে সক্ষম হন, আপনারা কি দাবি করতে পারেন যে, অন্য হাজার হাজার যারা বিশ্বাস করে না, তারা হিংসা দিয়ে হিংসার উত্তর দেবে না, এবং আপনারা তাদের অস্বীকার করতে পারবেন? এক্ষেত্রে এইসব ধর্মঘটের ও যৌথ অস্বীকারের আন্দোলনের পথ কখনো খুলে না দেওয়াটাই সবচেয়ে সৎ : কেননা একবার পথ খুলে দিলে তার ফলাফল নিয়ে ভুগতে হবে; আপনারা চান বা না চান তার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে,—এইরকমই চিরকাল গান্ধী করেছেন।

দুটোর মধ্যে একটা করুন, হয়, ভালো ক'রে বলুন যে, ঈশ্বরের রাজ্য এ জগতে নয়, এবং কর্ম থেকে অবসর নিন, আপনাদের স্বপ্নেই সব সমর্পণ করুন, নয় তো,

যদি এই জগতেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহলে কর্মের আবশ্যকতা মেনে নিন! যুদ্ধ হচ্ছে সর্বধ্বংসী সহস্রমুণ্ড অজগর (hydre), আজ আমাদের মানবতার অস্তিত্বকেই ভয় দেখাচ্ছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াই আজ সবচেয়ে জরুরি সামাজিক প্রয়োজন। কোনো সৎ ও বীর্যবানই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিবর্তিত, অহিংস ও হিংস—সমস্ত ধরনের উপাদানের সমাবেশ ছাড়া এই লড়াই করাটা সম্ভব নয়। তাদের সংগঠিত করতে হবে। যাঁরা সেরা, যাঁদের সবচেয়ে বেশি বিবর্তন হয়েছে, তাঁরা অন্যদের পরিচালনার প্রয়াস করুন! কিন্তু সমগ্র মানব-সভ্যতার যৌথ শত্রুর বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের খোলাখুলি দায়িত্ব নেবার যোগ্য পৌরুষ আমাদের থাকতে হবে। মানবতার মুক্তির জন্যে লড়তে গিয়ে যারাই নিজেদের আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাদের সকলের সঙ্গেই মৈত্রীবন্ধনে আমরা বাধা।"

জুলাই, ১৯৩৩। এই গ্রীষ্মে চিকাগোয়—ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় কংগ্রেস বসবে (প্রথম কংগ্রেসে বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন)। আমাকে অনেক অনুরোধ করা হয়েছে ওখানে বক্তৃতা দিতে, নয়তো, অন্তত একটা বাণী পাঠাতে। 'ওয়ার্লড ফেলোশিপ অফ্ ফেইথস'-এর জাতীয় সভাপতি বিশপ ফ্রানসিস জে. এস. কনেলকে (স্পিয়েজ থেকে, ২৪ জুলাই) যেটি পাঠালাম সেটি, এই :

"নর-দেব খ্রীষ্ট বলেছিলেন : "আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।' এই মহৎ বাণীটি এক বিশ্বাসের গর্ভ থেকে এক নদীর মতো দুকূল প্লাবিত করছে। এ মূল্যবান সকল বিশ্বাসের সকল মানুষের পক্ষে - এবং বিশ্বাসহীনের পক্ষে (বা যারা বিশ্বাসহীন ব'লে মনে করে : কারণ তাহলে কে বাঁচতো, যদি সে বিশ্সাসের জোরে না খাড়া থাকতো ?) সত্য ও জীবন অজ্ঞাত-ঈশ্বর, যার মধ্যে আমরা আছি, আমরা সঞ্চরণ করছি, হাওয়ার মধ্যে জলের মধ্যে পাখিরা আর মাছেরা যেমন সঞ্চরণ করে। সতা ও জীবনই আমাদের মৌল পদার্থ (élément)। আমরা তার 'ভিতর'। তার বাইরে আমরা থাকতে পারতাম না। সত্য ও জীবন আমাদের অনন্ত সত্ত্ব। এবং আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব হচ্ছে চৈতন্যের আনুপাতিক, যে-চৈতন্য সত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পুঞ্জিত করে। আমাদের হয়ে-ওঠার, সত্তার রক্ষণ ও বর্ধনের সমস্ত আশা-আকাংক্ষা ঝোঁকে এই চৈতন্যকে বাড়িয়ে তুলতে এবং গভীর ক'রে তুলতে, সবসময়েই আরও বেশি বেশি ক'রে সেই সত্য ও জীবনের সঙ্গে আমাদের অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে, যা হচ্ছে জীবন্ত পরিবেশ, যার বাইরে. আমরা জলের বাইরে মাছের মতোই শুকিয়ে মরতাম। আর ঠিক যেমনভাবে নদীর মধ্যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি প্রাণীতে তরঙ্গের প্রতিটি কম্পন প্রচারিত হয়, আমরাও তেমনি আমাদের রক্তেমাংসে আমাদের গোটা বিশ্বের নিকট ও দূর স্পন্দন অনুভব করি। আমাদের মধ্যে মহত্তম নর-দেব তিনিই হবেন, তিনি নিজেকে বুকে তার সব কিছুকে আলিঙ্গন করবেন।

কিন্তু মৌল পদার্থ—আমাদের নদী—বয়ে চলেছে। স্রোতের মুখে নিস্পন্দ হয়ে এক ধরনের মাছ যেমন স্বপ্ন দেখে, তেমনি ধ্যানযোগে এর মধ্যে আত্মীভূত হলে যথেষ্ট হবে না। জীবন এগিয়ে চলেছে। সত্য একটা প্রবাহ। কোনো কিছু স্থাণু নয়! কোনো কিছু বন্ধ-স্থির নয়! নদীর ঢাল ও প্রবাহের সঙ্গে তাদাত্ম্য ঘটাতে হবে। এই প্রবাহকে বরণ ক'রে নিতে হবে, আর নিজের সঙ্গে জীবন্তদের এর মধ্যে টেনে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সক্রিয় হতে হবে। সত্য ও জীবনের সেই শক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে, যা জগতকে সামনে বয়ে নিয়ে যায়।

প্রবাহ কোথায় যায়? যায় মহাসাগরের দিকে, যায় জীবন্ত একের দিকে।

আমি প্রায়শই, আমার রচনায় আগাগোড়া, নদী ও সাগরের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছি। আমার 'আম আঁশাঁতে'-র ['বিমুগ্ধ আত্মা'] পরিবারের নাম 'রিভিয়ের'। আর আমার জাঁ-ক্রিসতফ রাইন নদী, পথ বেয়ে চলেছে সাগরের দিকে।) আমার কাছে ওরা রূপক নয়। ওরা আমার অন্তরের নদীর কণ্ঠ।

সমস্তই চলেছে একের দিকে। আমাদের সত্তার সমস্ত নদী। আমাদের সমস্ত লাফ-ঝাঁপ, আমাদের সমস্ত প্রয়াস, আমাদের সমস্ত লড়াই, আমাদের সমস্ত নিরাশা, এক মহাপ্রবাহের ঘূর্ণিপাক। সমস্ত কিছুরই লক্ষ্য মহাসাগরীয় ঐক্যের দিকে, চলমান জনসংঘট্টের ঐক্যতানের দিকে, যে ঐক্যতানে সুসমন্বিত হয়ে ওঠে অযুত লক্ষ সত্তা।

কিন্তু এই ঐকতানসিদ্ধ করাটা কেবল একক অহংসর্বস্ব স্বতঃলব্ধ জ্ঞানে সম্ভব নয়, তা এক বিচ্ছিন্ন চেতন্যকেই মুক্তি দিতে পারে। তা হবে শুধুমাত্র সমস্ত জীবন্তের মধ্যে আলাপনের মাধ্যমে। আর আমাদের প্রত্যেককে এইটেই চাইতে হবে এবং তা বাস্তব ক'রে তোলার জন্যে কাজ করতে হবে।

এটা বলা সত্য নয়ঃ "যে চিন্তা করে, সে সক্রিয় হয়।" বরং বলা উচিতঃ "যে চিন্তা করে, তাকে সক্রিয় হতে হবে।"

ক্রিয়া ছাড়া কোনো চিন্তাই বাস্তব, সম্পূর্ণ জীবন্ত নয়! ক্রিয়া ছাড়া সে কেবল ছায়ামাত্র, রক্তশূন্য। আর যে সক্রিয় হয় তার চিন্তাকে, চিন্তায় যেমন তেমনি তার ক্রিয়ায়, সবসময়েই ঝুঁকতে হবে বিশ্বজনীনের দিকে, সত্যের দিকে ও জীবনের দিকে, এককের দিকে নয়, সমস্ত সত্তার দিকে; যে যতো বেশি জীবন্ত, সে জীবনকে ততো বেশি আলিঙ্গন করে; আমাদের সম্পদ অপরের সম্পদ হয়ে ওঠা পর্যন্ত বাড়তেই থাকে। আর যারা বেশি জীবন্ত তাদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের সত্ত্ব দিয়ে কম জীবন্তদের লালন করা, দুর্বল ও পীড়িত, অত্যাচারিত, আর্তদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। বিবেকানন্দের মহিমান্বিত ঘোষণাঃ 'আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর।' আমাদের প্রাণশক্তির কাছে সঙ্গত আহ্বান। ঈশ্বর বিতর্কিত হন সেইসব ব্যক্তি ও মানুষের লড়াইয়ের মধ্যে, যারা সঞ্জীবনী আলো, হাওয়ায় বঞ্চিত এবং যাদের সেসব জয় করতে হবে।

যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করুন সেই লক্ষ লক্ষ জনের মধ্যে, যাদের নিপীড়িত করছে সামাজিক অবিচার ও অসাম্য! কারণ তারাই হচ্ছে নিপীড়িত সত্য ও জীবন, যারা জীবন্তের ঐক্যের আকুল কামনা করছে।"

নভেম্বর, ১৯৩৩। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র* তরুণ ভারতীয় কমিউনিস্ট, গত ৭ বছর ইউরোপে আছেন) এক চিঠি পেয়েছি, চিঠির তারিখ —পারী, ১৬ নভেম্বর ঃ

"প্রিয় ম'. রলাঁ,—সেদিন আঁদ্রে জিদের সঙ্গে ইউরোপের পরিস্থিতি, কমিউনিজম ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার এক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে, আমাদের আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রসঙ্গ উঠেছিল গান্ধী ও গান্ধীবাদের। আমি ম'. জিদকে জানিয়েছিলাম যে, আমার ও বহু ভারতীয় তরুণের মতে ম'. রলাঁর গান্ধী সংক্রান্ত বইটি ভারতবর্ষের চরম স্বার্থের ক্ষতি করেছে। গান্ধী সম্পর্কে আমার যে বইটি শীঘ্রই ফরাসী ভাষায় বেরুচ্ছে, যাতে আমি গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে আপনার মনোভাবের সমালোচনা করেছি, তার কথাও ম'. জিদকে জানিয়েছিলাম; ম'. জিদ অবাক ক'রে দিয়ে বলেছিলেন যে, গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে আপনি আপনার পুরনো মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। ভারতবর্ষের জন্যে যে কাজ ইউরোপে করণীয় ব'লে আমি দীর্ঘকাল মনে ক'রে আসছি, এ সেই প্রসঙ্গেই আমাকে অত্যন্ত আশাবাদী ক'রে তুলেছে এবং আপনাকে এই চিঠি লেখার সাহস জুগিয়েছে। যতো সংক্ষেপে সম্ভব, গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে আপনার মনোভাবের বিরুদ্ধে আমার আপত্তিগুলোর যুক্তি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে চাই। জীবন সম্পর্কে তার মনোভাবে গান্ধীবাদ মূলগতভাবে নঞর্থক, তা অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌন বা শিল্পগত যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন। আমি ইউরোপের লোককে গান্ধীবাদকে এক মিস্টিক আদিমতাবাদ ব'লে বর্ণনা করতে শুনি। এই ব্যাখ্যা আমি মানতে পারি না, কারণ, আমার মতে, সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রকাশে সত্যিকারের মিস্টিকতা প্রত্যক্ষ, সরল ও গীতিকাব্যোচিত। এমনটির দাবি গান্ধীবাদ করতে পারে না। কমিউনিস্ট হলেও, আমি লেনিনকে একজন বড়ো মিস্টিক ব'লে না ভেবে পারি না, যেমন তাঁর মিস্টিক গুণাবলী ছিল—আশ্চর্যজনকভাবে প্রত্যক্ষ হবার, বাহ্য ব্যাপারের জটিল গোলকধাঁধা পেরিয়ে বাস্তবের অভিমুখীন হ্রস্বতম পথ উপলব্ধি করার এবং এক সত্যিকারের সরলতার অধিকারী হবার। গান্ধী মিস্টিক নন, তিনি নিছকই আদিম।

কী পরিতাপের বিষয় যে, গান্ধীর প্রতি আপনার প্রচণ্ড উৎসাহে আপনি এমন এক মতবিশ্বাসের সর্বাংশে গুণকীর্তন করেছেন ও তার প্রতি আপনার সমর্থন জানিয়েছেন; আমাদের যুগের ঐতিহাসিক কর্ম ও মানবতার পরম মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে যদি তার মূল্যায়ন করতেন, আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে, আপনি তার পুরোপুরি নিন্দা করতেন। গান্ধীবাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ক'রে আপনার বিরক্তি জাগানো আমার কাম্য নয়, আমি শুধু একটা জিনিসের দিকে কেবল মাত্র আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ 'অহিংসার' মাধ্যমে গান্ধী বহু লোকের মনে অত্যন্ত মারাত্মক এক মোহের সৃষ্টি করেছেন। খুব কম লোকেই বুঝতে পেরেছেন যে,

---

* সম্পর্কটির বিষয়ে রলাঁর ভুল ধারণা। সর্বত্র রলাঁ সৌম্যেন্দ্রনাথকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছেন।—অনু

গান্ধীর 'অহিংসা' একটা আবরণ, যা চরম সামাজিক হিংসাকে ঢেকে রেখেছে। গান্ধী সম্পর্কে আমার বইতে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নটি ধরতে গিয়ে কী ক'রে তিনি চড়ায় আটকেছেন। তাই সংগ্রামী শান্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও, আমার মতে, যার প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র কমিউনিজম,—অহিংসার সমস্ত প্রেমিকদের গান্ধীর 'অহিংসাকে' নিন্দা করা উচিত।

যতো অদ্ভুতই ঠেকুক, গান্ধীবাদ ও হিটলারবাদের বিস্ময়কর সাদৃশ্যে আমি অবাক হয়ে গেছি। হিটলার চান 'বিশুদ্ধ' নর্ডিক সংস্কৃতি ; সেইরকমই গান্ধী চান 'আধ্যাত্মিক' ভারতীয় সংস্কৃতি দিয়ে 'অনাধ্যাত্মিক' পশ্চিমী সংস্কৃতিকে স্থানচ্যুত করতে। হিটলার ইহুদি ও জার্মানদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন, পৃথক পরিস্থিতিতে, গান্ধী মিশ্র বিয়ে ও হিন্দু-মুসলমানের পঙ্‌ক্তি-ভোজনের বিরুদ্ধে লিখেছেন। হিটলার বই পুড়িয়েছেন, আর গান্ধী পুড়িয়েছেন কাপড়। দুই বহ্ন্যুৎসবেরই শেকড় রয়েছে অযৌক্তিক ও চূড়ান্ত আদিম ও অসামাজিক রোমান্টিক মনের মাটিতে। অহিংসার প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও গান্ধীবাদের ভিতরের কথাটা ডাঁহা হিংসা ; আর গান্ধীবাদের মতোই হিটলারবাদের ভিত্তি জাতিবাদের উপরে।

গান্ধীবাদকে সমর্থন করতে গিয়ে আপনি পশ্চিমের তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মযুদ্ধকেই শক্তিশালী করেছেন। এই পশ্চিমী সভ্যতাকে এই নামে অভিহিত করা যায় কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে, কারণ আজ একমাত্র এই সভ্যতাই টিকে আছে। অন্য সভ্যতাগুলো তাদের আভ্যন্তর জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এবং এই সভ্যতাগুলো যে সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে রেখেছিল, আমাদের যুগ তা ভেঙে ফেলেছে। আধুনিক সভ্যতার মহত্তম দৃশ্যগোচর অবয়বগুলো —যার একটা হচ্ছে কমিউনিজম—গান্ধীর মানসিক দিগন্তের পুরোপুরি বাইরে।

ভারতবর্ষে আমাদের কাজ হচ্ছে, সব দিক থেকে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালানো। ভারতবর্ষ যদি জগতের অন্য সব দেশের পাশে দাঁড়াতে চায় এবং আমাদের যুগের যা ঐতিহাসিক ব্রত, সেই এক শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের দিকে এগুতে চায়, তবে গান্ধীবাদকে পুরোপুরি চূর্ণ করতে হবে। আপনার সাহায্যের উপর নির্ভর করছি, আর আমরা আশা করছি—ক্ষুধার্ত, পায়ে-মাড়ানো যে-ভারতবর্ষ সংগ্রাম করছে, যে-ভারতবর্ষ স্বপ্ন দেখছে, তাকে আপনি বুঝবেন। গান্ধীবাদের চশমা দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখলে, দেখতে পাওয়া যাবে সে যেন একটা শব, নয়তো জীবন্ত-বাস্তবতাশূন্য একটা বিমূর্ত ধারণা। আমরা যেসব বাস্তব কাজে হাত দিয়েছি, তাদের একটা হচ্ছে হিটলারবাদ-সংক্রান্ত 'ব্রাউন বুক' জাতের একটা বই প্রকাশ করা। সম্ভবত আমাদের বইটিকে বলা চলবে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির 'ব্ল্যাক বুক'। আঁদ্রে জিদ আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বইটি বেরুলে তিনি তার সম্পর্কে কিছু লিখবেন এবং সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে আপনাকে লিখতে তিনি আমাকে বলেছেন। আপনি যদি দয়া ক'রে এই বইটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিতে রাজী হন, তাহলে ইউরোপের ও আমেরিকার পাঠকদের কাছে এই বইয়ের গুরুত্ব ভীষণভাবে বেড়ে যাবে।

অন্য আর একটি প্রশ্নে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। ভারতবর্ষে বিশেষ ক'রে কলকাতায়, প্রচণ্ড নাজী প্রচার চলছে। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলো হিটলারের গুণকীর্তন ক'রে তাঁকে আকাশে তুলছে; তাঁর পথ অনুসরণ করার জন্যে যুবশক্তিকে ঠেলছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠুন, এটা আমাদের মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আপনার সাহায্য হবে অমূল্য। আপনি যদি কবিকে লিখতে ও হিটলারবাদের কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে জার্মানীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর অতি-বেদনাদায়ক নীরবতা ভঙ্গ করার ব্যাপারে তা তাঁকে তাগিদ দিতে পারে। এক্ষেত্রে, তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে আমাদের স্বার্থেরই সহায়ক হবে না, তা নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মোর্চাকেই শক্তিশালী করবে। তাই সশ্রদ্ধভাবে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, এই প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন। আমি ৭ বছর ইউরোপে আছি। দীর্ঘকাল রাশিয়ায় ছিলাম। আগামী মাসের গোড়ায় ভারতবর্ষে ফিরবো। আমার ক্ষোভ এই যে, আপনাকে দেখতে এবং এই চিঠিতে যা উত্থাপন করেছি সে-সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বিবিধ বাধা অন্তরায় হয়েছে।

এই দীর্ঘ চিঠি লিখে আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা করার জন্যে, আমার অনুরোধ, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার সহযোগিতা চাইবার আগে আপনার কাছে আমার মতামত পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে আমাকে এইটেই করতে হয়েছে।

শ্রদ্ধার সঙ্গে... সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

(মতান্ধ তরুণের এই চিঠিতে অবশ্য বুদ্ধিদীপ্ত ও আন্তরিক মনের পরিচয় আছে। কিন্তু সামাজিক সংগ্রামে ব্রতী পার্টিগুলোর বুকে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন না-করা পর্যন্ত পারস্পরিক লড়াইয়ের এই বর্তমান বেপরোয়া ব্যগ্রতা কী শোচনীয়! গত কয়েক বছর ধ'রে এটা এমন এক সাধারণীকৃত ব্যাপার যে, সন্দেহ জাগে, সংকটময় খোলস-ছাড়ানোর বা বিরাট পরিবর্তনের এই মুহূর্তে এটা মানব-বিবর্তনের একটা গোপন নিয়ম কি না। নিজস্ব উপাদানগুলোর আকস্মিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে প্রাণশক্তিপূর্ণ সংগ্রামী পার্টিগুলোর এক বিলুপ্তি আমরা বসে বসে দেখছি ঃ তিনটে আন্তর্জাতিকেও কুলোচ্ছে না (আধাদের তো ধরছিই না)! ত্রৎস্কির চার নম্বর ফাঁদার দরকার হলো! সমাজতন্ত্রবাদ তিন-চার টুকরো হয়ে গেছে। ফ্যাসিস্টবিরোধীরা একে অন্যকে খাচ্ছে। আর এদিকে, স্বদেশের মুক্তির জন্যে সবচেয়ে অনুরক্ত ভারতীয়রা সেই ভারতীয় বীরের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড লড়াই চালাচ্ছে, তিনি ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যিনি সর্বাগ্রগণ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছেন! এমন যে মতিচ্ছন্নতা—যা আত্মহত্যার কাছাকাছি—তা শত্রুর শিবিরে, ফ্যাসিস্টদের মধ্যে দেখা গেলেও, তার মাত্রা খুবই সামান্য। জাতিগত বদ্ধমূল সংস্কার, নেতাদের ব্যক্তিত্ব ও জাতির বিরোধী স্বার্থের জন্যে মূলগতভাবে তারা যতোই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হোক না কেন, ঐক্যহীন গণতন্ত্রগুলোর বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধার ব্যাপারে তাদের

রাজনৈতিক বিজ্ঞতা আছে। 'জিউস যাদের সর্বনাশ করতে চান, তাদের মতিচ্ছন্ন ক'রে দেন' (Quos vult perdere Jupiter dementat) : এই পুরনো নীতি-বাক্যটি সত্যি। যে রাজনৈতিক মতিচ্ছন্নতা একটা পার্টিকে আঘাত করে, তার ধ্বংসের ইঙ্গিতের চেয়ে কারণ হিসেবে তা কম। তা অসুখের একটা লক্ষণ।)

আমি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উত্তর দিলাম (১৪ নভেম্বর, ১৯৩৩) : 'প্রিয় শ্রী এস. ঠাকুর,—গান্ধী সম্পর্কে আমার মতামত একটুও পাল্টায়নি। যাঁরা আপনাকে এ খবর দিচ্ছেন, তাঁরা আমাকে সামান্যই জানেন। গান্ধী সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম বইটি লেখার পর থেকে এক ব্যক্তিগত প্রীতি : কারণ আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে শিখেছি ; ভিলন্যভে আমার বাড়িতে তিনি কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন ; আমি শুধু তাঁর চরিত্রের পরম বিশুদ্ধতাই উপলব্ধি করিনি, তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মের বোধও উপলব্ধি করতে পেরেছি, এবং বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করেছি এক চিন্তার সেই জীবন্ত আন্তরিকতা, যা প্রত্যক্ষ ও সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যের খুবই কাছাকাছি পৌঁছুবার জন্যে সব সময়ে চেষ্টা করে এবং যার বিবর্তনের কখনো বিরতি ঘটে না। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, ভারতবর্ষে ফিরে আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন এবং তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করুন : আপনি যে ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে থাকবেন, তা থেকে (বই থেকে নয়) লাভবান হতে তিনি খুবই পটু ; আর আপনিই বা কেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবেন না? যে দিক থেকেই হোক দু'জনে মুখোমুখি হবার উপকারিতা থাকবেই। তাঁর সম্পর্কে যা আমাকে লিখেছেন তার মধ্যে (বিশেষ ক'রে, হিটলারের সঙ্গে তাঁর অন্যায়কর ও ক্ষতিকারক সাধর্ম্য দেখানোর মধ্যে) আপনার মনগড়া অনেক দোষারোপ আছে ; ৭ কি ৮ বছর আগে তাদের যাথার্থ্য যদি কিছু থেকেও থাকে, আজ তা আর একেবারেই নেই। আপনি অনেক দিন নিজের দেশের বাইরে আছেন ; আর গান্ধী সম্পর্কে আপনার কিছু কিছু অভিমত গান্ধীর চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাত কি আট বছর পিছিয়ে আছে।

…"তাই যদি আমি মনে করি যে, গান্ধীর বর্তমান চিন্তাধারা আপনি ভালো ক'রে জানেন না, তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আমার চিন্তাধারাও কিছুমাত্র জানেন না। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে আছি ব'লে ঘোষণা করতে আমি অন্যান্য লেখকদের মতো পরবর্তী বছরগুলো পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকিনি। রুশ বিপ্লবকে অভিবাদন জানাতে (পুরো যুদ্ধের মধ্যে, সেই ১৯১৭ সালে, প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে) আমি ছিলাম ইউরোপের প্রথমদের মধ্যে একজন। তারপর থেকে তার বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে পক্ষ সমর্থন করতে কখনো থামিনি। এর ফলে আমি অনেক ফরাসীর বন্ধুত্ব হারিয়েছি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় লাভ করেছি অসংখ্য বন্ধুত্ব—তাদের মধ্যে ছিল গোর্কির বন্ধুত্ব। আমার অনুরোধ, আপনি লেনিনগ্রাদের 'ভোরিমা' প্রকাশনীর ১৯৩২ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকীর জন্যে 'নতুন জগতের পক্ষ সমর্থনে' শিরোনামার আমার বইটি চেয়ে পাঠাবেন।

সেটি ১৯২০ সালের পর থেকে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাবলীর একটি সংকলন, এবং তার সবগুলোই সোভিয়েত ও তার বিশাল নির্মানকাণ্ডের সমর্থনে সংগ্রাম। সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি—যার আমি সাম্মানিক সদস্য—প্রকাশিত লেনিনের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত গ্রন্থে এই মহামানব সম্পর্কে সদ্য যে প্রবন্ধটি লিখেছি, আগামী জানুয়ারি মাসে তাও আপনি পড়তে পারবেন।"

আজকের লড়াইতে আমি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছি, এবং কাঁচা বয়সের আপস-বিরোধী মনোভাবের জন্য যে ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে আপনার বুঝে ওঠা কষ্টকর, তা হচ্ছে এই যে, আমি দুই বিপ্লবের মধ্যেঃ গান্ধী ও লেনিনের বিপ্লবের মধ্যে যোগসূত্র হতে চাই, যাতে পুরনো জগতকে উল্টে দেবার জন্যে এবং নতুন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তনের জন্যে বর্তমান মুহূর্তে উভয়েই গাঁটছড়া বাঁধতে পারে।

…যা কোনো ভাবে গান্ধীর বিরুদ্ধে যাবে, এমন বইতে আমার সহযোগিতার আশা তাই আপনার করা উচিত নয়। আর আমি নিশ্চিত যে, যেমনটি বলেছেন, গান্ধীর বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযান ফ্রান্সে চালালে, আপনি ভারতবর্ষের ভীষণ ক্ষতি করবেন, কমিউনিজমেরও লাভ হবে নাঃ কারণ যে সব বিশেষ ট্রাজিক সর্বগ্রাসী চিন্তাভাবনা আজ পশ্চিমকে জর্জরিত করছে, তার মধ্যেও ভারতবর্ষের স্বার্থ ও তার স্বাধীনতার জন্যে সে এখনো যদি কিছুটা আগ্রহ দেখিয়ে থাকে, তবে তার জন্যে ভারতবর্ষ গান্ধীর জনপ্রিয়তার ও মহান্ চরিত্রের বলে সঙ্গতভাবেই উদ্রিক্ত শ্রদ্ধার কাছে ঋণী।

… 'আমার এই ভূমিকাটি আমি পশ্চিমে ও রাশিয়ায় প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করেছি। ১৯৩২ সালে আমস্টারডামে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হয়েছিল, যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বারব্যুসের সঙ্গে আমি ছিলাম একজন, সেই কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমি অহিংসা (বিবেকবান প্রতিবাদীরা ও গান্ধী-বাদীরা) ও সংগঠিত বিপ্লবী হিংসার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত শক্তিকে—যারা আন্তরিকভাবে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সমস্ত দলকে, প্রত্যেককে নিজস্ব কৌশলের অধিকার দিয়ে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গির, লড়াইয়ের এই পরিকল্পনাটির কংগ্রেসের স্বীকৃতি লাভ করাতে আমি সমর্থ হয়েছিলাম। ইউরোপের বর্তমান সংকটের অবস্থায়, যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিরোধ (তা যাই হোক না কেন) এবং ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ অত্যন্ত অপ্রতুল-ভাবে সংগঠিত (হিংস-প্রতিরোধ বা অহিংস-প্রতিরোধ যারই ব্যাপার হোক), তখন তাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে পরস্পরকে ধ্বংস করার সত্যিকারের সময় এটা নয়। সমশত্রুর চরম বিপদাশংকার বিরুদ্ধে, অন্তত অস্থায়ীভাবে সাময়িকভাবে হলেও, এদের অবশ্যই হাত মেলাতে হবে।"…

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আপনি সম্ভবত জানেন যে, গত ইতালি সফর থেকে আসার পর যখন কবির সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন ইতালীয় ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর অকপট আকর্ষণ (attrait candide) টলিয়ে দিতে আমিই অংশ নিয়েছিলাম এবং আমিই তাঁকে মুসোলিনির রাজত্বের অপরাধগুলোকে চিনিয়ে দিয়েছিলাম। হিটলারী

শাসনের বিরুদ্ধে আমার ছাপা লেখা ও নাজীদের বিরুদ্ধে আমার সওয়াল পাঠিয়ে জার্মান ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমি যা ভাবি, তা সময় মতো তাঁকে লিখতে আমার মোটেই ত্রুটি হবে না।

প্রিয় শ্রীঠাকুর, আমার হার্দ মনোভাবকে বিশ্বাস করুন। র. র.।

পুনশ্চ: গান্ধীর আপাত-অহিংসা যে 'চরম সামাজিক হিংসাকে' (আপনার উক্তি অনুসারে) ঢেকে রেখেছে, সেটি আমার জানা নেই। আমার অনেক লেখাতেই ('ইয়ং ইন্ডিয়া'র ভূমিকা, ১৯২৪, স্টক,—গান্ধীর 'আত্মজীবনী'র মুখবন্ধ, রিয়েডের, ১৯৩১) আমি এই চরিত্রটির উপরে জোর দিয়েছি। আমি লিখেছি:—'নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদীদের ভেড়ার জাতের সঙ্গে কর্মের এই সুতীব্র অনুভূতিকে কখনো গুলিয়ে ফেলতে পারাটা কী অর্থহীন!...গান্ধী মানবশক্তিকে এতো দূর পর্যন্ত টানছেন, যেন মনে হয় সুতো ছিঁড়ে যাবে...বীরোচিত অ-গ্রহণ এবং যারা সমস্ত স্বৈরতন্ত্রের ও সমস্ত প্রতিক্রিয়ার 'কংক্রিট-সিমেন্ট, সেই শাশ্বত গ্রহণবাদীদের দাসোচিত নিরুপদ্রবতার মধ্যে যে দূরত্ব, তার চেয়ে কম দূরত্ব গান্ধীর অহিংসা ও বিপ্লবীদের হিংসার মধ্যে...'

অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ, শক্তিমান ও সক্রিয় 'মহত্তম' মিস্টিকতার বিষয়ে আপনার মতোই আমি ভাবি; লেনিন ও বড়ো বড়ো বলশেভিকদের কাছে তা অজানা। তাছাড়া, এটাই সম্ভব, আপনার ধারণা তাঁদের কম মনঃপুত হবে, এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তারা এর প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু তাঁদের ভালোবাসার এটাই আমার কাছে আরও একটা কারণ।"

কোনো খবর না দিয়ে ২৪ নভেম্বর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারী থেকে হঠাৎ ভিলন্যভে চলে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটা আলোচনা হলো, প্রথমে বোনের বাড়িতে ও তার মধ্যবর্তিতায়, পরে আমার বাড়িতে মারীর মধ্যবর্তিতায়। (তিনি ইংরেজি, জার্মান, রুশ বলতে পারেন, ফরাসী পারেন না; তা সত্ত্বেও একটু ফরাসী বুঝতে পারেন।)

তিনি তরুণ, মনে হয় না ২২ কি ২৪ বছরের বেশি (সম্ভবত তাঁর বয়স তিরিশের কাছাকাছিই হবে)! মুখখানা সুন্দর, তা থেকে ঠাকুর পরিবারের সম্ভ্রান্ত চেহারা ও বিরল বংশধারাকেও চেনা যায়, খাড়া ও লম্বা নাক, অতি কোমল মসৃণ দুটি সুন্দর চোখ, এক কঠিন ও উদ্ধত মাধুর্য। নিখুঁত সৌজন্যবোধ, সব সময় গলার স্বরের মাত্রা বজায় রাখে। কখনো উত্তেজিত হয় না, কিন্তু তার প্রশান্তি ও স্মিত হাসি এক অদম্য আপসবিরোধী মনোভাবকে ঢেকে রাখে, যার সমর্থনে যুক্তি দেবার কমই কষ্ট স্বীকার করা হয়..."*Alma sdegnosa*".

গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা সামগ্রিক, যদিও তা তিনি প্রকাশ করলেন শান্ত ভাষায়, কণ্ঠস্বর না চড়িয়ে। এই বিমুখতা বিশেষ ক'রে আরও অমার্জনীয় এই জন্যে যে, প্রথমে তিনি গান্ধীরই গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, এবং তাঁর মোহভঙ্গের জন্যে তিনি

গান্ধীকে ক্ষমা করেন না। এই বিমুখতা রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কিত ব্যাপারের চেয়েও অনেক বেশী দূরে চলে যায়; এ গিয়ে পৌঁছোয় গোটা মানুষটায়, তিনি যাকে বলেন, তাঁর 'জগৎ সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণায়" ("Weltanschauung"), তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিক নীতিবোধে, তাঁর জীবনের ধারণায়, তাঁর ব্রহ্মচর্যে, তাঁর মঠ-জীবনের আদর্শে তাঁর মধ্যে যা যা অতীতমুখী ব'লে মনে হয় তার সব কিছুতেই; "আখড়াধারী" এবং জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী নাম দিয়ে এদের তিনি কলংকচিহ্নিত করলেন। মূলত, এই অবজ্ঞার নিচে বিশিষ্টতাহীন, বিপুল শিক্ষা-দীক্ষাহীন, "গীতিকাব্যোচিত" ও অধিবিদ্যাগত ঊর্ধ্বায়নহীন অন্য জাতের এক পেটি-বুর্জোয়া সম্পর্কে ঠাকুর পরিবারের তাচ্ছিল্যপূর্ণ আভিজাত্যবাদই ফাঁস হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারণেই, সৌম্যেন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেন, কারণ তিনি "কমিউনিস্ট," কিংবা "কমিউনিস্ট" হতে চান। কিন্তু কী অদ্ভুত কমিউনিজম লুকিয়ে আছে (তাঁর নিজের চোখে নিঃসন্দেহে) মস্কো থেকে ভালো ক'রে শেখা ফর্মুলাগুলোর নিচে! আর মস্কোর লোকজনদের কমিউনিজমের সঙ্গে তিনি অবশ্যই কেমন যেন কম সহমর্মিতা বোধ করেন! (আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তিরও বেশি কিছু বার ক'রে নিলাম!) তিনি যা বললেন তাতে, তাঁর সত্যিকার অপরিহার্য প্রয়োজন—যা গীতিকাব্যোচিত ও অধিবিদ্যাগত এবং সংগ্রামী কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁর সামাজিক কর্তব্য—যার ভাগ তিনি নিয়েছেন ও সাহসের সঙ্গে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—এদের মধ্যে লড়াই বেধেছিল। কিন্তু দুই দৃষ্টিকোণই গান্ধীর বিরুদ্ধে অবজ্ঞাপূর্ণ ও প্রচন্ড বিরোধিতায় হাত মিলিয়েছে। একদিক থেকে, তিনি গান্ধীর মিস্টিক অকিঞ্চিৎকরতার উপরে (বা, অভিজাতের চোখে যা সবচেয়ে খারাপ মামুলিত্বের উপরে) জোর দেন। গান্ধী ভারতবর্ষের যে নবজাগরণ ঘটিয়েছেন, তার কথা বলা হলে, উদ্ধতভাবে তিনি জবাব দিলেন যে, এই নবজাগণের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়; এবং এই কৃতিত্ব বর্তায় রামমোহন রায়ের উপরে (এখানে খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের কথারই প্রতিধ্বনিটি চিনতে পারলাম) ও মহান্ ভারতীয়দের এক বংশধারার উপরে (তাঁর মতোই তাঁদের আমি ভালো করেই জানি), যাঁরা সকলেই ছিলেন আগেভাগেই "গান্ধীবাদবিরোধী" (স্পষ্টতই তিনি চলতে চান মতাদর্শে, মিস্টিক ও মননবাদী নিখিল-মানবতাবাদে)। গান্ধীর প্রকাশ্য জীবনের ৩০ বছরের কার্যকরী কর্মের বিপরীতে, এবং নিজের দৃষ্টান্তে ও শক্তিতে তিনি ভারতবর্ষের জনগণকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত তাদের মর্যাদা, তাদের শক্তির চেতনা সঞ্চারিত করেছেন—এই অকাট্য সত্যের বিপরীতে, মুষ্টিমেয় সুবিধা-ভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই মতাদর্শ আমাদের কী দিতে পেরেছে! এটা স্বীকার করতে অনিচ্ছুকভাবেই সৌম্যেন্দ্রনাথ সায় দিতে বাধ্য হলেন; কিন্তু তা শুধু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলার জন্যে যে, হিটলার যা করেছেন, গান্ধী তার চেয়ে বেশি কিছু করেননি; এবং নিজের কাজের জন্যে গর্ববোধ করার অধিকার তাঁর মতো মুসোলিনিরও আছে। আবেগচালিত অবিচার তাঁকে এতো দূর পর্যন্ত অন্ধ ক'রে রেখেছে যে, তিনি মহাত্মা আর ফ্যাসিস্ট ফ্যুরার্ ও দুচের মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখতে চান না।

তিনি বললেন, গান্ধী হচ্ছেন সবচেয়ে নির্ভেজাল ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার দূতে, স্বাধীনতায় পৌঁছে দেওয়া দূরে থাক, তিনি ভারতবর্ষকে নিয়ে যাবেন অতীতের অন্ধকারে। অহিংসা সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি গান্ধীর আছে, একথা পর্যন্ত তিনি মানতে চাইলেন না, তিনি বললেন সত্যিকারের অহিংসার মধ্যে থাকতে হবে সমাজের সমস্ত হিংসার মূলোচ্ছেদন ; কিন্তু তিনি বললেন না, হিংসা ব্যতিরিক্ত কোন পন্থায় অহিংসা তার মূলোচ্ছেদ করবে, একথাও বললেন না, তার মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে অহিংসা সেখানে তার হিংসার পন্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে কিনা। আমার জোর ধারণা যে, তাঁর বিপ্লবী মিষ্টিকতা তরুণ সেন্ট-জাস্টের মতো (তাঁর মতোই এমন সুন্দর, এমন অশান্ত, এমন শুদ্ধ) গিলোটিনের খড়্গাঘাতের সঙ্গে এগিয়ে-চলা এক অ-হিংসার কল্পনা করে।

আলোচনা যখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সামাজিক কৃত্যের ক্ষেত্রে চলে এলো, যে-ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তিনি আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন—(কিন্তু আমি তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারি না) তিনি নালিশ জানালেন যে, গান্ধী ভারতীয় বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্টদের যন্ত্র ; আর এটা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁর আছে ; কারণ তাঁর চোখের সামনেই, আমেদাবাদে, তাঁর আশ্রমের কাছেই শিল্প-শ্রমিকের হাড়-ভাঙা শোষণের এক টিপিক্যাল দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং এই অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি আঘাত হানেননি ; যারা শোষিত তাদের কাছে তিনি ধৈর্য ধ'রে ও নালিশ না-ক'রে কাজের কথা প্রচার ক'রে চলেন ;—সামাজিক কোনো পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা, তিনি চান শ্রেণী ও জাত টিকে থাক ; অস্পৃশ্যদের জন্যে তাঁর আন্দোলন শুধু একটা তুচ্ছ খেলা, কারণ এক জাত থেকে অন্য জাতে অস্পৃশ্যতা আছেই, এবং আছে একই জাতের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে, জাতের বিধান অনুযায়ী যাদের ঘাটতি আছে (সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন : "এই যেমন, আমি, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে নিজের জাতের মধ্যেই হবো এক যথার্থ অস্পৃশ্য")...কিন্তু তিনি বলেন না, তিনি দেখতে চান না যে, যথার্থ অস্পৃশ্যতা—বর্ণ-বহির্ভূত অস্পৃশ্যতা ধর্মীয় অমানুষিকতার একটা চরম মাত্রা, যা বর্ণ-বহির্ভূত শ্রমজীবীর জল, হাওয়া ও জীবন পর্যন্ত অস্বীকার করতে ছোটে,—আর ফলিত কর্মের মানুষের মতোই, যেমনটি তাঁর করা উচিত, গান্ধী প্রথমে ছোটেন সবচেয়ে জরুরিটির পেছনে। সৌম্যেন্দ্রনাথের নেতার এই "হয় সব, নয় কিছুই না"-তত্ত্ববাগীশদের কাছে তাহলে তাঁদের কর্মপন্থাটা কী ? একেবারে অকপটে সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন : "ভারতবর্ষে আমরা কমিউনিস্টরা তো চরমতম সংখ্যালঘু।" তাহলে ? তাঁরা কী করতে চান ? তিনি উত্তর দিলেন : "তবু শুরু করা দরকার !" একমত ! এটাই তো হয়েছে, এটাই তো গান্ধী ক'রে আসছেন ৩০ বছর ধরে, প্রতিটি দিন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে এক সাময়িক মৈত্রীবন্ধনের ধারণায় এই মতান্ধ তরুণটিকে নিয়ে আসাটা অসম্ভব ব্যাপার ! একটি মাত্র ফ্রন্টে তাঁর পুরোপুরি আপত্তি। আমি যে তাঁকে পরামর্শ দিলাম গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার এবং তাঁর বিশ্বস্ততার উপরে ও সত্যের জন্যে তাঁর যে আন্তরিক অনুসন্ধান বিবর্তিত হতে অস্বীকার করে না—তার উপরে

আস্থা রেখে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার—তাতেও তিনি আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন : "আমাদের দিক থেকে পরীক্ষা হয়ে গেছে।" শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিবাদে তিনি কোন্‌ মনোভাব অবলম্বন করবেন—এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের সর্টহ্যান্ডে নেওয়া গান্ধীর যে উত্তরটি আমার সামনে, সেটি তাঁকে পড়ে শোনানোও বৃথা ; তাতে গান্ধী বলেছেন, যখনই মালিকের অন্যায় ধরা পড়বে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি শোষিত শ্রমিকদের পক্ষে এসে দাঁড়াবেন এবং মালিককে চূর্ণ করার জন্যে তিনি শ্রমিককে নেতৃত্ব দেবেন, এমনকি জাতীয় আন্দোলনের জন্যে যুক্তফ্রন্টের সুযোগের স্বার্থেও থামবেন না। সৌম্যেন্দ্রনাথ শুনে গেলেন (এই রকম শুনে গেলেন ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীর ভীতি-প্রদর্শন করা অন্যান্য ঘোষণাবলী), কিন্তু কথাগুলো শেষ হতে না হতেই, তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন সেসব শোনেনইনি।

তিনি যে 'ব্ল্যাক বুক' প্রকাশ করতে চান এবং যাতে গান্ধীকে আক্রমণ করবেন, তাতে সহযোগিতা করতে আমি অস্বীকার করলাম (তিনি জেদ করলেন না।) কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে একটি বাণীর প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিতে রাজী হলাম। আমার স্থির বিশ্বাস তাঁর বন্ধুরা ও তিনি এটাকে গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন (এবং আমি কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলোতে গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারের প্রকাশ্য নিন্দা ক'রে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবো)। তাঁর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথকে লিখতেও রাজী হলাম ; কারণ তিনি যা বললেন তা যদি যথাযথ হয়, তাহলে এ ভাবতে বেদনা বোধ হয় যে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ জার্মান কন্‌সালের হাতে বোকা বনেছেন ; লোকটা নিশ্চয়ই হিটলারি রাজত্বের পক্ষে ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের পক্ষে তাঁর কাছে গেয়ে থাকবে,—আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে থাকবেন। হিটলার-জার্মানীর অত্যন্ত হৈ-চৈ-করা এক প্রকার-যন্ত্র আছে এবং তা প্রচন্ড কৌশলী। (তাছাড়া, সে শুধু মুসোলিনির দৃষ্টান্তই অনুসরণ করছে।) শান্তিনিকেতনের যে কর্মকান্ড বিপদগ্রস্ত, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে টাকা সেধেছে এবং একটা আমন্ত্রণ জানানোর ফন্দি আঁটছে, সেই আমন্ত্রণ এই বৃদ্ধ শিশু, বর্তমানে শ্রদ্ধা-ভক্তির কাঙাল (actuellement affame' d'hommages) রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলের জন্যেই জার্মানীতে আসতে হয়তো গ্রহণ ক'রে ফেলবেন। এই ভাবেই, হিটলারবাদ মহান্‌ "আর্য" আদর্শবাদের ঢালের আড়াল নেবে। এটা স্পষ্টই যে, দেরি না-ক'রে আমার সক্রিয় হওয়া উচিত—যদিও আমার কথার ফলে কমই আস্থা আছে! প্রথমে একবার, আমি রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ভাঙিয়ে ছিলাম (পেরু ইত্যাদি...) দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরতন্ত্রগুলো ফাঁদ হিসেবে যে নিমন্ত্রণ তাঁকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বার, তাঁর ফ্যাসিস্ট ইতালীয় বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙতে আমি তাঁকে বাধ্য করেছিলাম, এই ভাবে সেই সব সৌহার্দ ও সেই সব আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিলাম। হিটলারবাদীদের ছুঁড়ে-দেওয়া জাল আটকাতে গিয়ে আমি আনন্দ-মাটি-করার (trouble-fete) সেই চিরন্তন ভূমিকাই নিয়েছি। এতে আমার নিজের উপরেই রাগ হয়।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ৭ বছর যাবৎ ইউরোপে আছেন ; সময় কেটেছে বিশেষ ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নে, জার্মানীতে, এবং স্বাস্থ্যের জন্যে (কারণ তিনি যক্ষ্মাক্রান্ত) ইতালিতে। গত ২ এপ্রিল তিরল হয়ে ইতালি থেকে জার্মানিতে ফিরলে কুফ্স্টেইনে নাজীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে মিউনিকে বন্দী ক'রে রাখে। হিটলারের জীবননাশের চেষ্টার অভিযোগে তাঁকে প্রায় গুলি ক'রে মারা হচ্ছিল। ঠিক এই ক'দিন হলো পারী থেকে (বুরো দে'দিশিঅঁ) ছাপা একটি ছোটো পুস্তিকায় তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ পড়েছি; পুস্তিকাটির নাম ঃ 'ডাসাউয়ের খুনিদের শিবিরে,' লিখেছেন রেইখস্টাগের ডেপুটি হান্স বেইমলার, ভয়াবহ দৈহিক নির্যাতনের পর তিনি পালিয়ে আসতে পেরেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ বেইমলারের বর্ণনা সত্য ব'লে আমাকে বললেন, তাঁর সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ কথাবার্তা বলতে পেরেছিলেন এবং তাঁর হাড়গোড়ভাঙ্গা দেহটি দেখেছেন। তাই এটা একটা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, হিটলারবাদীদের অপরাধ সম্পর্কিত অন্যান্য এতো লেখার সঙ্গে এটাও যোগ হলো। বেইমলার তাঁর পুস্তিকায় বিশেষ ক'রে দেখিয়েছেন, ডাসাউয়ের নাজী জহ্লাদরা নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে হতভাগ্য বন্দীদের কেমন ক'রে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয় ; তারা বন্দীদের দড়িও জুগিয়ে দেয় ; তাদের বলে ঃ "এইভাবে তোর ভবলীলা সাঙ্গ হবেই।" আর দিন রাত তারা মানুষকে নির্যাতন করতে থাকে, যন্ত্রণার শেষ সীমায় পেঁ'ছে সে গলায় ফাঁস জড়ায়। এই ঘটনাও সৌম্যেন্দ্রনাথ সত্য বললেন। তাঁর এক বন্ধু এইভাবেই আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছেন।

কমিউনিজমের এই তরুণ অভিজাত ব্রাহ্মণটি সম্পর্কে কেমন বেশ আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, ইউরোপের কম কমিউনিস্টই তাঁর মনোমত। মুনজেনবের্গ আর জিবার্তি'র নাম শুনলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠেন। স্তালিনকে পছন্দ করেন না (স্তালিনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে)। তিনি স্তালিনের তীব্র নিন্দা করলেন লেলিনের পেটোয়া হুকুমবরদার হবার জন্যে এবং সেই "কোরানের" নামে বলশেভিক চিন্তাকে চূর্ণ করার জন্যে ; (তাঁর কিছু কথায় স্তালিনের রাজনীতির "বুর্জোয়া" মানসিকতার প্রতি তাচ্ছিল্যও ফুটে বেরুল।) এই অসহিষ্ণুটি ঢালাও ভাবে মস্কোর কমিউনিজমের তাত্ত্বিকদের অসহিষ্ণুতার জন্যে বিলাপ করলেন। তিনি বুখারিনের খুব কাছাকাছি ; আর পরম প্রীতিভরে বিশেষ ক'রে বললেন গোর্কি'র কথা (মনে হয়, শুধু ইতালিতেই সোরেন্তে-য় তিনি তাঁকে দেখেছেন, যখন গোর্কি কাপ্রিতে ছিলেন।) ফ্রান্সে যাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও একই রকম তাচ্ছিল্য দেখালেন। পারীতে তিনি একটি ভারতীয়-কমিউনিস্ট পত্রিকা বার করতে যাচ্ছেন। এতে সহযোগিতার জন্যে ইলিয়া এরেনবুর্গকে অনুরোধ করার আমার প্রস্তাবে তিনি দুঃখিত হলেন। এরেনবুর্গকে তাঁর "ভেজাল" ব'লে মনে হয় এবং তিনি তাঁর বিরক্তি জাগান। তিনি খুবই সামান্য কয়েকটি নামের প্রতি সদয় ঃ আঁদ্রে জিদ, বারবুস, আমি। সত্যি দরকার পড়লে, মালরো। (হায়রে ! চেনার ক্ষমতা কী তাঁর এতোই নির্ভুল ?)

ভারতীয় কমিউনিস্ট রায়* গত কয়েক বছর মস্কোয় ছিলেন, এবং তারপর থেকে

---

* মানবেন্দ্রনাথ রায়।—অনু।

তিনি বেপাত্তা ; তাঁর সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন যে, তিনি দক্ষিণপন্থী বিরোধিতায় চলে গেছেন, তারপর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট প্রচারের জন্যে মস্কোর কাছ থেকে পাওয়া বিরাট অংকের টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছেন নিজের জন্যে। ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই তা জানে, রায় সেখানেই ফিরে গেছেন। এই যে ঘটনাটিকে তিনি "ভয়াবহ" (schrecklich) ব'লে বিশেষিত করলেন, তা বুঝে ওঠা বড়োই কঠিন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ৬ ডিসেম্বর ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। আশংকা করছেন, জাহাজ থেকে নামা মাত্রই তিনি গ্রেপ্তার হবেন, তাঁকে জেলে পোরা হবে। এই ক্ষীণ-স্বাস্থ্য, রুগ্ন যুবকের পক্ষে ভারতবর্ষের জেলখানা মারাত্মক বিপদ হয়ে উঠতে পারে। তিনি তা জানেন, কিন্তু বললেন : "আমাকে যেতেই হবে।"

এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি এক উদারহৃদয় তরুণ আদর্শবাদী, অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিজের বিশ্বাসের জন্যে পরিপূর্ণ আত্মত্যাগে প্রস্তুত। এই সুন্দর বুদ্ধিমান শক্তি মহত্তম ও পবিত্রতম ভারতীয়ের বিরুদ্ধে গোঁ ধরে আছে, এইটি দেখাই শুধু আরও বেদনাদায়ক। বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে ভেসে-যাওয়া ব্যক্তির মনের মারাত্মক পাগলামি।

২৮ নভেম্বর, ১৯৩৩। পারী ছাড়ার আগে সৌম্যেন্দ্রনাথকে আমি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের তরুণদের প্রতি একটি আবেদন পাঠালাম। এবং তার সঙ্গে এই কথাকটি জুড়ে দিলাম :

"ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইতে আমি নিজেকে যুক্ত করতে সবচেয়ে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কোনো ভাবেই, আপনারা আমার নাম গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে, বা ব্যবহার করতে দিতে পারবেন না। আমি তাঁর বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধা আছি, এবং ভারতবর্ষ ও জগতের জন্যে তাঁর ব্রতের মহিমায় আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে।"

* * *

ভারতবর্ষের তরুণেরা, প্রিয় সাথীরা ! আপনাদের জাতির প্রতি আমার গভীর অনুরক্তির কথা এবং আপনাদের জাতির স্বাধীনতার স্বার্থে আমার কাজ করার বাসনার কথা আপনারা জানেন। আপনাদের সামনে এক আবেদন রাখতে চাই !

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমি সোচ্চার। ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমন, তেমনি আপনাদের দেশের উপরেও এ আজ তার থাবা বাড়িয়েছে। আপনারা এর বিড়াল-তপস্বী আকর্ষণে ধরা দেবেন না ! আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার, প্রগতির পথে একটা জাতির স্বাধীন অগ্রগতির এমন বেশি মারাত্মক শত্রু আর কিছুই নেই। এ নিজেকে মিথ্যার মুখোশে ঢেকে রাখে, সেই মুখোশকে প্রতিটি জাতির মুখের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। আত্মগর্ব, ভুল-বোঝানো আদর্শবাদ, জাতের সহজ প্রবৃত্তি, জাতীয়তাবাদ —জাতিগুলোর সামনে প্রতিটি মিঠে সুরই সে খুব ভালো ক'রে বাজাতে জানে ; এমনকি সময়ে সময়ে সে নিপীড়িত জনগণের সমর্থক ও রক্ষক ব'লে নিজেকে দেখাবারও স্পর্ধা রাখে। আসলে, এ হচ্ছে সর্বত্র ধনতন্ত্রী ও সমরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার,

অতীতের অন্ধকার ও শ্বাসরোধী শক্তিগুলোর গলা-ফাটানো যন্ত্র। শুধু জনসাধারণের নয়, মনের দিক থেকে কুলীনদেরও বিতৃষ্ণা না জাগিয়ে নির্লজ্জ মুখে দেখা দিতে পারে না ব'লেই প্রতিক্রিয়ার এই অন্ধকার শক্তিগুলো পেছনে আড়াল নেবার জন্যে তাদের সামনে এগিয়ে দেয় বাকপটু ও শক্তিমান গলা-ফাটানো নেতাদের—মুসোলিনিদের আর হিটলারদের; তারা জাতির নামে কাজের দাবি করে এবং তাদের ধৃষ্টতা আছে জাতিকে আত্মসাৎ করার ও দাস ক'রে তোলার জন্যে নিজেদের জাতির মূর্তি ব'লে দেখাবার।

আমি চিৎকার ক'রে আপনাদের বলছি ঃ সাবধান! কারণ আমি জানি অর্থের, সংবাদপত্রের, বাক্‌বিভূতির, সরকার ও বেসরকারী কূটনীতির কোন্ সব উপায়ে, তাদের কৌশল ও নির্লজ্জ প্রচার যুবশক্তিকে মাতাল করার এবং অন্ধ জাতিগুলোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করে! আপনারা জানেন না, আপনারা দেখতে পান না, পশ্চিমে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি, কোন্ শোচনীয় নিপীড়ন, কোন্ অপরাধের উপরে ইউরোপে তাদের আধিপত্য কায়েম হয়ে আছে। আপনারা চোখ খুলুন, জেগে থাকুন, আর যারা ঘুমুচ্ছে তাদের জাগিয়ে তুলুন। রুখে দাঁড়ান! এই মুহূর্তে জগতের জাতিগুলোর মাথার উপর সাম্রাজ্যবাদী ডিক্টেটরবাদের জাল ঝুলছে। বিপদগ্রস্ত জাতিগুলো হাত বাড়িয়ে দিক! কখনো ভুলবেন না যে, আপনাদের দেশের স্বাধীনতা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে না ঃ এরা একসঙ্গে বাঁধা। আজ যে লড়াই শুরু হয়েছে তা একটা জাতির নয়, তা সমস্ত জাতির। এখন থেকে প্রতিটি লড়াই-ই আন্তর্জাতিক স্তরের। 'এক সকলের জন্যে! সকলে একের জন্যে!' পুরনো এই সুইস আদর্শ-বাণীটি সংকীর্ণভাবে একমাত্র সুইস প্রজাতন্ত্রের উপরে প্রযুক্ত হলেও, এটা গোটা জগতের প্রতিই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকে, আমাদের প্রতিটি জাতি—সকল জাতির জন্যে, সমস্ত নিপীড়িত জাতির জন্যে! নিপীড়িত জাতি ও শ্রেণী, এক হও!

তাদের অগ্রবাহিনী আপনাদের—তরুণদের উপরেই সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের সমবেত করার ভার!

রম্যাঁ রলাঁ

২৭ নভেম্বর, ১৯৩৩।"
('আক্তিভিতে' পত্রিকায় প্রকাশিত—অক্টো./নভে., ১৯৩৩)

২৮ নভেম্বর। যা ভয় করেছিলাম, ভিলন্যভে আসার পথে বরফ-কুয়াশার সময়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছেন। পারীতে ফিরে তাঁকে বেশ কয়েকদিনের জন্যে বিছানা নিতে হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর তিনি লিখছেন, আমার আবেদনটি পেয়েছেন ঃ

"... ভারতবর্ষের তরুণদের উদ্দেশে আপনি যে আবেদনটি আমাকে পাঠিয়েছেন

তার জন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ। যাতে এটি 'আক্‌তিভিতে'র ছাপা হয় এবং 'ল্যু'-তে উল্লিখিত হয়, আমি তার ব্যবস্থা করেছি। পরে, ওটির ইংরেজি তর্জমা করেছি এবং মূল ফরাসী ও ইংরেজি তর্জমা 'ফ্লাই-শিটের' আকারে ছাপাচ্ছি, যাতে সেগুলো ভারতবর্ষে, ইংলন্ডে ও অন্যান্য দেশে হাজার হাজার পাঠাতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার আবেদন ভারতীয় যুবশক্তির আন্দোলনে বিরাট কাজ করবে। আমার বন্ধু বে. লকাশ আমাকে দেখতে এসেছিলেন, আমি তাঁকে আবেদনটি দেখিয়েছি। তিনি একটি চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছেন: সেটা হচ্ছে যে, পারীর ফ্যাসিবিরোধী সভাগুলোয় আমরা এগুলো ছড়াবো। ছড়াবার জন্যে তাই আমরা বেশ কয়েক হাজার কপি ছাপছি। আমার ভারতবর্ষে ফেরার আগে অনেক কাজ করার আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সেসব সমাধা করা আমার ভগ্নস্বাস্থ্য অসম্ভব ক'রে তুলেছে। এখন আমার যাওয়া ২৬ দিন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এর ফলে 'ব্ল্যাকবুক' প্রকাশের প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে আমি সুযোগ পেয়ে যাবো।

স্বল্প সময়ের মধ্যে যেসব জিনিস আমরা আলোচনা করেছিলাম, ভিলন্যভ থেকে ফেরার পর, গত কয়েকদিন ধরে সেসব আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। যতবার আপনার কথাটা মনে পড়েছে: 'গান্ধীর প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততার (fide‘lite‘) জন্যে আমি এতে অংশ নিতে পারি না,'—ততবারই মনে ভেবেছি 'ব্যক্তিগত' বিশ্বস্ততা মোটের উপর সেই অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক মনোভাব কি না, যা মানব সমাজের এতো বিপর্যয় ঘটিয়েছে। মুসোলিনি প্রতিটি ফ্যাসিস্টকে তাঁর নিজের প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততার শপথ নিতে বাধ্য করেন। হিটলারও এই রকমই করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কখনো তার সদস্যদের লেনিনের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিতে বাধ্য করে না, শুধুমাত্র কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পার্টি আমাদের নির্দেশ দেয়। ভারতবর্ষের 'গুরুবাদে' যেমন, সম্ভবত আর কোথাও ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততার ভয়াবহ প্রভাব এতো স্পষ্ট নয়। এর বিরুদ্ধে আমার গোটা মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। আমি স্তালিনেরও বিরুদ্ধে, এই একই কারণে যে, তিনি নিজের প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি করেন। তাই, আমার মনে পড়ছে, বহুবার আমি গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছি। আমার মতে, কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ পরস্পরকে বাতিল করে। একই সঙ্গে গান্ধীবাদের পক্ষে এবং কমিউনিজমের পক্ষে হওয়া যায় না, কারণ একথা অসম্ভব যে, পরিণামে 'অহিংস' ধনতন্ত্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী গান্ধীবাদ থেকেই ভারতীয় ফ্যাসিবাদ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। গান্ধীবাদ কোনো মতেই আমাদের সামাজিক জীবনের কোনো স্তরের কোনো সমস্যা সমাধানের ধারেকাছেও পৌঁছে দেবে না। গান্ধীবাদ দিয়ে হিংসার মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনার কথা না বলায়, গান্ধীবাদী অহিংসার মতবাদ হিংসার সমস্যা থেকে হাজার মাইল দূরে। এমন একটি হাঁ-ধর্মী চিন্তা দেখতে পাই না যা গান্ধীবাদ আমাদের দিতে পেরেছে। তার ভয়ঙ্কর রোমান্টিক আবেদন, মিথ্যা রোমান্টিকতায় আরও একবার নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারবো না,

তা এক নতুন উষার মিথ্যা আশা দেয়। বিরল, অতিবিরল মানুষদের একজন, যিনি এই বিশৃংখলার বাইরে জগতকে নিয়ে যেতে পারতেন, বৌদ্ধিক উপলব্ধির এবং দূরদৃষ্টির ও ত্রুটির ফলে তিনি আমাদের কাছে এমন নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন,—এসব ভেবে প্রায়ই এক গভীর বেদনা অনুভব করি, এমন কথা যখন বলি, আমার অনুরোধ, আপনি তা বিশ্বাস করবেন। গান্ধীবাদ বাদ দিলে গান্ধী আমাদের নিখুঁত এক কমরেড হয়ে উঠবেন। কিন্তু হায় রে! আমার ভয়, তা তাঁর কাছে বড়ো বেশি প্রত্যাশা এবং সত্য হওয়ার পক্ষে বড়ো বেশি সুন্দর এক চিন্তা···সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে এমন দাক্ষিণ্যভরে আপনি যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করছি। আমাদের কাজের পক্ষে এই সহযোগিতা অমূল্য ও উপযোগী। আমরা যতটা পারি, গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়েই যাবো, আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার ক্ষেত্রে, আমি চেষ্টা করবো তাঁকে এক উঁচু ও নৈর্ব্যক্তিক স্তরে রাখতে' এমন উঁচুতে, যেখান থেকে সমস্ত কর্ম ও সমস্ত চিন্তার সমালোচনা করা যাবে। আমি বিশ্বাস করি, একদিন এমন সময় আসবে, যখন আপনিও গান্ধীবাদের—নির্ভেজাল ও নিছক জাতীয়তাবাদী, ধনতন্ত্রবাদী ও পশ্চাদমুখী এই আন্দোলনের সমালোচনায় আমাদের সঙ্গে সামিল হবেন। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো···আহা! যদি ভিলন্যভে উপস্থিত হবার, ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকতো। দু'এক বছরের মধ্যেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অধৈর্যভরে আমি প্রতীক্ষা করবো, তখন ইউরোপে আসার আমার সংকল্প আছে। আমাদের আলোচনাটি আমি আদ্যোপান্ত লিখেছি এবং শীঘ্রই তার অনুলিপি পাঠাচ্ছি। আমি পুরোপুরি বিশ্বস্তভাবে আলোচনাটি আবার হাজির করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যদি কোনো জায়গায় কিছু বাদ দিয়ে থাকি, অথবা সময়ে সময়ে আমি যথাযথ ভাবে বুঝতে না পেরে থাকি, আপনি সবটা পড়ে, যেখানে যেখানে খুশি সর্বত্র প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে আমাকে ওটা ফেরত পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো। যদি সম্ভব হয়, ওটাকে আমার গান্ধী-সংক্রান্ত বইটিতে স্থান দেবার চেষ্টা করবো···

স. ঠ.

পুনশ্চঃ আমি যখন ভারতবর্ষে ফিরে যাবো, ভারতীয় আন্দোলনের খবরাখবর সম্পর্কে আপনকে ওয়াকিবহাল রাখার সুযোগ নেবো। ভারতায় আন্দোলন বলতে আমি বলতে চাই ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন। ভারতবর্ষের একেবারে হালের খবর বলছে, জাতীয় কংগ্রেস চারটি গোষ্ঠীতে পুরোপুরি ভাগ হয়ে গেছে : প্রথমটি, নির্ভেজাল ব্যক্তিসন্ত্রাসবাদ; দ্বিতীয়, ফ্যাসিস্ট প্রবণতা; তৃতীয়, ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক ফরমুলা, জহরলাল নেহেরু-গোষ্ঠী; চতুর্থ, সেইসব উপাদান, যারা কমিউনিস্টদের কাছাকাছি ক্রমশই আসছে। আমি সদ্য এই খবরগুলো পেয়েছি, আর এতে আমাদের ভবিষ্যৎ লড়াই সম্পর্কে আমার মন আশায় ভরে উঠছে।"

(হোটেল রিভিয়েরা, ৫৫ রু্য দে আকাশিয়া, পারী ১৭,
৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৩)

(দুঃখ হয়, দুঃখের মধ্যে হাসি পায়—এই যে-আন্তরিক তরুণটি, যিনি নিজের দেশকে মুক্ত দেখার বাসনায় জ্বলছেন, তিনি উল্লাস প্রকাশ করছেন এই কথা জেনে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ‘পুরোপুরি ভাগ হয়ে গেছে,’— সেই কংগ্রেস, যে-কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জয় করার জন্যে এতো নির্যাতনের মূল্যে ‘লড়াই করছে’। আর তিনি ‘ভারতীয় আন্দোলন’ বলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ ক’রে দিয়েছেন : ‘ভারতীয় আন্দোলন বলতে আমি বলতে চাই ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন !’…ওরে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, মাথাগরম, মাথামোটার দল, সংকীর্ণতাবাদীর দল…

৬ ডিসেম্বর আমি তাঁকে লিখলাম (তাতে কিছু প্রীতিপূর্ণ কথা, তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ) :

‘…গান্ধীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে : ‘আনুগত্য’ (loyauté) কথাটির আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার এক মারাত্মক ত্রুটি সংশোধনের অনুমতি চাইছি। মুসোলিনি যে আনুগত্য দাবি করেন, এই ‘আনুগত্য’কে আপনি তার পাশাপাশি পর্যন্ত নিয়ে গেছেন ! আপনার প্রকাশভঙ্গিতে সংযত না হয়ে, কলমের মুখে তড়িঘড়ি যদি এটা না-ক’রে থাকেন, তাহলে এমন পাশাপাশি-দেখানোটা আমার পক্ষে একটা মারাত্মক আঘাত হবে। গান্ধী আমার কাছে কখনো কিছু চাননি, আমার কাছে তিনি কিছুই প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন যে আমি এক স্বাধীন-চেতা। আমিই তাঁকে দিয়েছি, আমার বন্ধুত্ব, আমার সম্মান ও আমার শ্রদ্ধা। ‘আনুগত্যহীনতা’ (déloyauté) বলি তার সেই কাজকে, যা ‘তাঁর’ বন্ধুত্বের (যে-বন্ধুত্ব সে দান করে একতরফা ভাবে) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে-আনুগত্যহীনতা নিজের প্রতি। আমি আপনার ধারণা নিয়ে মোটেই বিতর্ক তুলছি না। ও ধারণা মোটেই আমার নয়। আমার ধ্যানধারণার কাছে আমার বন্ধুদের আমি কখনো বিসর্জন দিইনি। আমার ধ্যানধারণার শত্রুদের মধ্যেও আমার বন্ধুরা আছেন। তাঁরা সোজাসুজি ও আন্তরিক থাকলে, এবং শ্রদ্ধার ভাজন হয়ে থাকলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এ যুগের অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে আমি গান্ধীকে বেশি শ্রদ্ধা করি।”

র. র.

(সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষমা চেয়ে আমার উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে যা কিছু লিখেছি তা ভালো ক’রে না বুঝেই। আসলে, এই বিতর্কে এক বিপত্তি এই যে, তিনি ফরাসী মোটেই যথেষ্ট বুঝতে পারেন না, এবং তা সত্ত্বেও, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তা বুঝতে পারেন। তিনি মনে করেন যে, মুসোলিনির সঙ্গে তুলনাটা আমি আমার গায়ে টেনে নিয়েছি।—এদিকে, এটা তো স্পষ্টই, তাঁর প্রথম চিঠি অনুসারে,—মুসোলিনী যাদের শপথ নিতে বাধ্য করেন, তাদের একজনের মতোই ক্ষতিকারক ভূমিকা আমি পালন করবো। তাছাড়া মুসোলিনির সঙ্গে গান্ধীকে পাশাপাশি দেখানোটা তিনি মোটেই প্রত্যাহার করেন না : তিনি দু’জনকে দেখেন একই রকম ‘আন্তরিক’,—অথবা একই রকম কম আন্তরিক।)

এই উত্তরের মাঝখানে এসে হাজির হলো, আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল—ফরাসীতে তর্জমা করা তার কপি। এটাই তো আমি প্রত্যাশা করতে পেরেছিলাম। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে বস্তুনিষ্ঠ ও আন্তরিক হবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু অবচেতনভাবে তিনি এটা ফেঁদেছেন সাড়ম্বরে তাঁর প্রতিপাদ্যের জয় ঘটিয়ে দিতে, আর আমাকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন গোবেচারী শ্রোতার ভূমিকায়, যে ফিসফিস করে সঙ্গে সঙ্গে কচু-কাটা হ'য়ে-যাওয়া ভীতু ভীতু আপত্তি তোলে। আমার তরুণ আলাপকারীর আসল কথাগুলোতে কোনো হাত না দিয়ে গোটা ব্যাপারটাই নতুন ক'রে লিখতে হবে, কিন্তু তাতে আমার কথাগুলোকে নতুন ক'রে দাঁড় করাতে হবে। নতুন ক'রে কথোপকথনটি লিখে আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে দিলাম এই চিঠিটি :

"৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৩

প্রিয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—আপনার ভিলন্যভের সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি পেয়েছি। কোনো আলোচনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে আবার বর্ণনা করার মতো কঠিন আর কিছুই নেই, বিশেষ ক'রে তা যখন লেখেন এমন কেউ যিনি কাজের মধ্যে উদগ্রভাবে জড়িয়ে আছেন এবং কোনো বড়ো ভাবধারায় অভিভূত হয়ে আছেন।—আপনি বস্তুনিষ্ঠ হবার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন! কিন্তু এর ফলাফলটা একটা কম বিতর্ক নয়, যা মনে পাড়িয়ে দেয় সেই বিতর্ককে, অতীতে ক্যাথলিক গির্জায় যার অভিনয় হতো, আর তাতে দু'জন পাদ্রী দাঁড়াতো, একজন ঈশ্বরের উকিলের ভূমিকায়, অপরজন শয়তানের উকিলের ভূমিকায়। স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরের উকিলের পক্ষে ভালো ভালো সব যুক্তি থাকতো। আর শয়তানের উকিল মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে হারার মতো যুক্তি দিতো।

ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে দেখলেও আমাদের আলোচনাটা কিছুটা সেই কবির লড়াইয়ের (tournoi de langues) মতো দেখাচ্ছে, যেখানে বিজয়ীকে তৈরি ক'রে রাখা হয় আগে থেকেই, আর জয় হয় বিনা বাধায়। আপনি না চাইলেও, অন্তর থেকেই, আপনি আমাকে তার ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন, প্রত্যাঘাত না ক'রে যে আঘাত খায়, চোখে না-পড়ার মতো এবং এড়িয়ে যাবার মতো কায়দায় পালিয়ে বাঁচে। এই বিতর্কে আমি আমার সঠিক অবস্থানটি আবার দাঁড় করাতে বাধ্য হয়েছি। আপনার ফরাসী তর্জমার কপির সঙ্গে, নতুন ক'রে আমার লেখা আলোচনার একটা কপি পাঠালাম। আপনি নিজে যেসব বলেছেন তার একটি শব্দের গায়েও আমি হাত দিইনি। কিন্তু আমরে গোটা 'ভূমিকাটি' নতুন ক'রে লিখতে হয়েছে।

অপরিচিত কোনো চিন্তাকে ঠিক ঠিক ধরতে পারার স্পষ্টই বড়ো অসুবিধা থাকে, যখন তা প্রকাশ করা হয় এমন এক ভাষায়, যা অন্যে ভালো ক'রে বোঝে না, যেমন আপনার ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষা। আরও বলি, এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমার মতো কোনো ফরাসী বলে শুধুই ইঙ্গিতে ('a demi-mot) এবং তা কোনো বিদেশীর চোখ-কান এড়িয়ে যায়। আপনার প্রতিটি বক্তব্যের প্রত্যুত্তর না দিতে

আমার সৌজন্যও আমাকে বাধ্য করেছিল, যদিও আমি আপনার মতো ভাবিনি এবং আপনার যুক্তিগুলো আমার মনঃপূত হয়নি। আমি আপনার অনমনীয় প্রত্যয় অনুভব করেছিলাম, এবং প্রতিটি পাল্টা-যুক্তিতে পুনরাবৃত্তি না ক'রে আমার প্রত্যয়ের কথা একবার বলাই যথেষ্ট মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনি যেহেতু আমাদের আলোচনা ছাপছেন, আপনার মতে, যা গান্ধীর বিরুদ্ধে আপনার পার্টির একটা হাতিয়ার হবে, আমি তাই আমার প্রত্যয় অতি পরিচ্ছন্ন ক'রে, স্পষ্ট আলোয়, আবার দাঁড় করাতে বাধ্য হয়েছি।

এইভাবে সংশোধন করা যে-বয়ানটা আপনাকে পাঠাচ্ছি, সেটাই একমাত্র যাকে আমি প্রকাশের অধিকার দিচ্ছি। অন্যটির মধ্যেকার আমার সংক্রান্ত জিনিসগুলোর প্রকৃত যাথার্থ্য আমি স্বীকার করি না।

আপনি যেহেতু এই আলোচনা ইউরোপ ও ভারতবর্ষের কাগজপত্রে ব্যবহার করবেন, আমি তাই আমার খসড়াটা ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে আমার বন্ধুদের কাছে পাঠাবারও অধিকার রাখছি। এই বিতর্কে আমার অবস্থান নিয়ে যদি কোন তর্কও ওঠে, আপনার সঙ্গে লেনদেন-করা চিঠিপত্রের উদ্ধৃতাংশ দিয়ে যাথার্থ্য নির্দেশ করতে পারবো।

আমি জানি, আপনি একজন সোজা-সরল ও আন্তরিক স্বভাবের মানুষ। আপনাকে দেখে ও আপনার কথা শুনে আমি এ উপলব্ধি করেছি ; এবং আপনার প্রতি আমার প্রীতিপূর্ণ এক আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মেছে, মতবাদগত ও সামাজিক ধ্যানধারণার পার্থক্য আমার ব্যক্তি-সংক্রান্ত গুণাবধারণ ক্ষুণ্ন করে না। ভারতবর্ষের সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে ভাগ হয়ে থাকছি, তাতে দুঃখিত হলেও আপনি তাই আমার হার্দ সহানুভূতির মনোভাবে আস্থা রাখবেন, এই আমার অনুরোধ। আমরা যে মিত্র হতে পারলাম না, তা শুধু আমার উপরেই নির্ভর করে না। আর যাই হোক না কেন, সময় যখন আসবে—(আপনার অথবা আমার দূরদর্শিতা বাস্তব হয়ে উঠুক)—আমরা একসঙ্গে, একই বাহিনীতে লড়াই করবো,— অবশ্য যদি তখনো বেঁচে থাকি।

(আমাদের ২৪ ও ২৫ নভেম্বরের আলোচনার যে বয়ানটি* আমি লিখেছি, সেটার আবার অনুলিপি এখানে করলাম না। এই খামের মধ্যে পাণ্ডুলিপিতেই সেটা পাওয়া যাবে।* আমি কেটে দিলাম শুধু অনুলিপির গোড়ার কয়েকটি লাইন, আর দুই দিনের মাঝখানের ঢুকে-পড়া একটা অংশ, যে-অংশে সৌম্যেন্দ্রনাথ বরফ-কুয়াশার দুটি বিষণ্ন দিনের মূর্তি বর্ণনা করেছেন, যে বরফ-কুয়াশায় ভিলন্যভ ও পাহাড়গুলো ঢাকা ছিল।)

এরপর, সৌম্যেন্দ্রনাথ আমার বয়ানটির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন, তিনি ওটিকে গোটাগুটি মেনে নিয়েছেন এবং এখানে কিংবা বাইরে ছাপবার চেষ্টা করছেন। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধায় হার্দ কথাবার্তার লেনদেন হলো এবং তাঁর অনুরোধ মতো কয়েকটা ফটো পাঠিয়ে দিলাম।

---

* বয়ানটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৯৩৪

জানুয়ারি, ১৯৩৪। আর 'আকাতিভিতে' পত্রিকা ৭-৮ জানুয়ারি, ১৯৩৪ তারিখের সংখ্যায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপটি ছেপেছে (সঙ্গে ছেপেছে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে আমার আবেদনটি)।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪। টি. সি. খান্ডওয়ালা নামে গুজরাটের এক বৃদ্ধ ভারতীয় এসেছেন, তিনি বললেন, তিনি "ব্রাহ্ম-সমাজের অযাজক ধর্ম-প্রচারক" ("lay missionary of the Brahma Samaj") এবং পেশায় চিকিৎসক। তিনি বললেন, আমাদের বন্ধু কালিদাস নাগ ও এ. এ. পল (অধুনা মৃত) তাঁকে জানেন, এমনকি গান্ধীও তাঁকে জানেন, কিন্তু কথাবার্তায় তিনি গান্ধীর চিন্তা সম্পর্কে অদ্ভুত অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন : কারণ গান্ধীর জেনেভার বক্তৃতার কথা যখন উঠল, যাতে তিনি জাতীয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে বলেছেন—খান্ডওয়ালা ব'লে উঠলেন : "আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা হবে না! এটা একটু বাড়াবাড়ি !···আরও বেশি যা তা এই যে, একজন ভারতীয় এতে অবাক হলো। আজ পাঁচ বছর হলো তিনি ভারতবর্ষের বাইরে বাইরে—ইউরোপ ও আমেরিকায় আছেন। তবু ভারতবর্ষে গান্ধীর সত্যাগ্রহের কথা না শোনার পক্ষে তা এমন কিছু বেশি নয়!

ফেব্রুয়ারির শেষ, ১৯৩৪। ভিলা অলগায় ফিরে আসার পর দুই আমেরিকানের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার : জারা ওয়াট্‌কিন—পাসাডেনার সিভিল এঞ্জিনিয়র, এবং ইউজেন লিয়ন—নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক। তাঁরা আসছেন ব'লে জানিয়েছিলেন মস্কো থেকে, তারপরে, বার্লিন থেকে, আর অবশেষে ভিয়েনা থেকে ; তাঁরা ভিয়েনা ছেড়েছেন রক্তাক্ত সংগ্রামের* পরদিন। তাঁদের বয়স বড়ো জোর বছর পঁয়ত্রিশ। আমি অটলভাবে সেই মহাসংগ্রামের যুগের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, যে-যুগ অনাবৃত হয়েছে এবং যে-যুগ গোটা দুনিয়াকে আলিঙ্গন করবে। এই দ্রুত অতিক্রান্ত যুগে—মানবতার এই সব থার্মাপিলিতে—মাত্র দুটি ভঙ্গিকে (attitude) আমি সত্যিকারের পৌরুষব্যঞ্জক ভঙ্গি ব'লে ভেবে থাকি :—ধর্মীয় ভঙ্গি (অপবিত্র এই নামের পক্ষে সত্যিকারের উপযুক্ত,) গান্ধীর অহিংসা অ-গ্রহণের ভঙ্গি, কোনো আদর্শের জন্যে

---

* ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমিকদের বিক্ষোভ দমনে ডলফাসের নির্দেশে সৈন্যবাহিনী ভিয়েনার শ্রমিক এলাকাগুলো আক্রমণ করে। শ্রমিকরা অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করে। পাঁচদিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলে! এর তিন মাস পরে ডলফাস ফ্যাসিষ্ট গঠনতন্ত্র পার্লামেন্টে অনুমোদন করিয়ে নেন। ২রা এপ্রিল, ১৯৩৪ তারিখে উল্লিখিত গান্ধীর চিঠিতে ভিয়েনার এই ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি 'অষ্ট্রিয়ার ফ্যাসিজম' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন (দ্রষ্টব্য : 'শিল্পীর নবজন্ম,' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯-১৮২)।—অনু.

পুরোপুরি আত্মবিসর্জন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব থেকে উচ্চতর ও দূরতর,—এই বিশ্বাস ও শহীদদের মাধ্যমে যা নিজে সিদ্ধ হবে ; এবং বিপ্লবী ভঙ্গি, যা বর্তমানের কর্মকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বর্তমানের সমস্ত প্রয়োজনকে স্বীকার করে। যে কর্ম সক্রিয় হয় না বা যা দু'পা গিয়েই পিছিয়ে আসে, কিংবা মানুষের সেই প্রেম, যা আত্মবিসর্জনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছোয় না, এদের কারুর জন্যেই এই দুটির মাঝখানে মোটেই স্থান নেই ! যে স্বাধীনতা সংগ্রামের উপরে আধিপত্য করে এবং যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচার করে, সক্রিয়-উদ্যোগী মনের পক্ষে সেই স্বাধীনতা বজায় রাখতে এ মোটেই বাধা ঘটায় না। কিন্তু সংগ্রামকে বিচার করাটা যেন সক্রিয়-উদ্যোগী মনদের তাতে অংশ গ্রহণ করতে বাধা না ঘটায়। স্পষ্ট ও স্বাধীন চিন্তা করতে হবে। ঋজু ও অটল ভাবে সক্রিয় হতে হবে। একটা হচ্ছে বর্তমান ও জরুরি। অন্যটি অনন্তকালীন।

মার্চের প্রথম, ১৯৩৪। ভারতীয় বন্ধুদের অনুরোধে আন্তর্জাতিক রেডক্রশকে চিঠি দিলাম, যাতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে ভারতীয় ত্রাণ-সমিতিগুলোর সঙ্গে সোজাসুজি তাঁরা যোগাযোগ করেন ; এই ভূমিকম্প প্রায় গোটা উত্তর ভারতবর্ষকে বিধ্বস্ত করেছে এবং এর কেন্দ্র হচ্ছে—(নামের জায়গা ফাঁকা)। (ভারতীয় ত্রাণ-সমিতিগুলোর প্রধান হচ্ছেন পাটনায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ !) —আমার অনুরোধ পারীতে রেডক্রশের আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সভাপতি সেনেটর জিওভানি চিরাওলোর কাছে পাঠানো হয়েছে।

এপ্রিল, ১৯৩৪। এক আমেরিকান ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছেন, তিনি সম্প্রতি গান্ধীকে দেখে এসেছেন, আমার বোনকে গোপন কথাটি (confidence) জানিয়েছেন যে, গান্ধী তাঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব নিয়ে খুব ভাবছেন এবং তাঁর আশংকা হচ্ছে যে, আমি না পাল্টে গিয়ে থাকি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলোচনা ওখানে নিঃসন্দেহে কিছু হল্লা তুলেছে : এবং এটা সম্ভব যে, কেউ তা গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে, সৌম্যেন্দ্রনাথ এর মধ্যে নেই ; কারণ অন্যদিক থেকে আমি জানি, তাঁর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন যে, গান্ধীর প্রতি আমার আস্থা তিনি টলাতে সফল হননি।

পিয়ের সেরেজোল শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছেন, গান্ধীকে লেখা নিচের চিঠিটা তাঁর হাত দিয়ে পাঠাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম :

“পরম প্রিয় বন্ধু,

ভারতবর্ষ থেকে ফেরা জনৈক আমেরিকান বন্ধুর কাছ থেকে বেদনার সঙ্গে জানতে পারলাম যে, আপননার সম্পর্কে আমার মনোভাব নাকি পাল্টেছে ভেবে আপনি শংকিত। তা মোটেই নয়। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনাকে ভালবাসি।

আমার বন্ধুত্বে আমি বিশ্বস্ত আছি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সম্ভবত আপনি তা জানেন। এই তরুণটি আপনার ভাবধারার অত্যন্ত বিরোধী; কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর বিরোধিতার মধ্যে আছে আপনার প্রতি তাঁর অনেকখানি পুরনো ভালোবাসা; এবং ভারতবর্ষের যন্ত্রণায় যিনি প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাঁর বেদনাদায়ক আন্তরিকতাকে আপনিই সকলের আগে শ্রদ্ধা ও করুণা করবেন। আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনার যে বর্ণনাটি তিনি ছেপেছেন, তাতে তিনি বিশ্বস্তভাবেই দেখিয়েছেন যে, আপনার প্রতি আমার আস্থা অপরিবর্তিতই আছে। আমার ইচ্ছা যে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হোক: সৌম্যেন্দ্রনাথ মহৎ শক্তির অধিকারী, আদর্শবাদী ও খাঁটি, সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে ও তাঁকে ফিরে পেতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর আপত্তি (পাছে আপনি তাঁকে পাকড়াও ক'রে ফেলেন সম্ভবত তারই স্বীকার না করা ভয়)।

একথা বলার পর, আপনাকে আমার অবশ্যই বলা উচিত (ভিলন্যভে আগেই যেমন আপনাকে বলেছি), ইউরোপে বর্তমান কর্মের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় সে-সম্পর্কে, আপনার চিন্তার কিছু কিছু ব্যাপার সম্পর্কে—আমার চিন্তার অমিল আছে।

সত্যাগ্রহের যে-মহান্ পরীক্ষা আপনি চালাচ্ছেন, এবং যার ফলাফল এখনো অনিশ্চিত, আশা হচ্ছে, ভারতবর্ষে তার জয় হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে তার জয় হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের ঘাড়ে যা চেপে বসেছিল, সেই সবচেয়ে মারাত্মক বিপদই বর্তমান ইউরোপকে আজ ভয়াবহ ভীতি প্রদর্শন করছে। অর্থশক্তি এবং বুর্জোয়া ও সামরিক প্রতিক্রিয়ার এক সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিকের সমস্ত সংগঠিত শক্তি—ফ্যাসিবাদগুলো যাদের যন্ত্রমাত্র—বহু শতাব্দীর জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাগুলোকে গলা টিপে মারার উপক্রম করছে ব'লে বোধ হচ্ছে; বহু শতাব্দীর বীরোচিত ও সহিষ্ণু প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই স্বাধীনতাগুলো অর্জিত হয়েছিল। জার্মানী ও ইতালিই একমাত্র দেশ নয়, যারা প্রতিক্রিয়ার হাতে চলে গেছে। হাঙ্গারি, পোল্যান্ড, প্রতিটি বলকান দেশ পদানত। কামানের মুখে অস্ট্রিয়ার শ্রমিক জনতাকে সদ্য চূর্ণ করা হয়েছে। ফ্রান্স ও ইংলন্ড ফ্যাসিস্ট প্লেগে আক্রান্ত; পারীতে মারাত্মক অভ্যুত্থান সংগঠিত হচ্ছে।

…একমাত্র (রাশিয়ার) সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রগুলোর মহিমান্বিত সংঘ অটুটভাবে গড়ে উঠেছে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও আরও ন্যায়পরায়ণ এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা ও নির্মানকান্ডের জন্যে, যেখানে ক্ষমতা অর্পিত হবে মুক্ত ও শিক্ষিত শ্রমিকদের হাতে।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, ইউরোপের যদি 'ফ্যাসিস্টিকরণ' হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানের সঙ্গে হাত মেলাবে, এবং যদি সম্ভব হয়, হাত মেলাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গেও, যাতে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায়; এই সোভিয়েত রাশিয়া শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের জন্যেই সেই

সমস্ত শক্তির স্থায়ী বিপদাশংকা হয়ে আছে, যারা বেঁচে আছে শ্রমের অন্যায় শোষণের উপরে।

আমরা ইউরোপীয়রা—যারা স্বাধীন, যারা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের আপস-বিরোধী বিরুদ্ধবাদী—আমাদের তাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষা করা, সামাজিক নির্মানকান্ডের সমস্ত আশাভরসার সে অপরিহার্য ভিত্তি।

কী ক'রে রক্ষা সম্ভব? সত্যাগ্রহ দিয়ে? নিষ্ক্রিয়া দিয়ে, হিংসাকে অস্বীকার ক'রে? এই কৌশল, এই মনের জন্যে ইউরোপের জনসাধারণ একটুও প্রস্তুত হয়নি। কোনো কোনো দেশে, এখানে ওখানে 'বিবেকবান প্রতিবাদীদের' ছোটো ছোটো কেন্দ্র আছে; কিন্তু তাদের বিবেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রায়ই যৌথকর্মের সমস্ত রকম সংগঠনে আপত্তি করে, সেরেজোল যেমন করেছেন, একটি 'ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস' সংগঠনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার মতো মহৎ প্রচেষ্টা এখনো ব্যতিক্রম। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রতিবাদীরা' আত্মবিসর্জন দিয়ে নিজেদের আত্মাকে বাঁচাতে পারেন। অন্যের আত্মা ও জীবনকে বাঁচাবার জন্যে তাঁরা বেশি মাথা ঘামান না। এমন হতে পারে যে, কয়েক শতাব্দী পরে তাঁদের আত্মবিসর্জন ফলপ্রসূ হবে, ভবিষ্যতের চোখে জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেবে, যেমনটি ঘটেছিল প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মের শহীদদের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজকের এই ট্র্যাজিক মুহূর্তে অনিবার্য ভবিতব্যের কিছুই সে রদবদল করতে পারে না, সেই ভবিতব্য দুই পরস্পরবিরোধী জগতকে মুখোমুখি সংঘর্ষে দাঁড় করিয়েছে:—আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেবায় ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব—এবং সর্বহারার বিপ্লব। আমাদের পক্ষ বেছে নিতে হবে।

...আমি পক্ষ বেছে নিয়েছি। নিজের হাতে সংগঠিত করা ও শোষণকারীর জোয়াল থেকে মুক্ত শ্রমিকের দুনিয়ার পক্ষে আমি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, আপনিও তার পক্ষে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ক্ষেত্রে, আমি কখনো হিংসার প্রয়োগ করবো না, আক্রমণ করতেও না, নিজেকে বাঁচাতেও না (অন্তত আমার মনোগত ইচ্ছা এই। যদি তা না পারি, তা হবে আমার দুর্বলতা, আর আমি তার নিন্দা করবো)। কিন্তু নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে যারা হিংসার আশ্রয় নেয়, অহিংসায় ও সমগ্র আদর্শে, পূর্বস্বীকৃত সমগ্র 'দিব্যে' তাদের যদি আস্থা না থাকে, তাদের নিন্দা করতে আমি অস্বীকার করি। ঈশ্বরে, অনন্তে বিশ্বাস থাকলে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া বেশ সহজ, খুবই সহজ! ইউরোপের তিনভাগ লোকের দুই ভাগই (এবং তারা কোনো মতেই কম শ্রদ্ধার পাত্র নয়) ঈশ্বরে এবং অনন্তত্ব ব'লে আখ্যাত কোনো কিছুতেই সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছে। একমাত্র যে-ভাব তাদের এখনো উদ্দীপ্ত করতে পারে, তা হচ্ছে তাদের মানব-সংহতির মনোভাব, তাদের আবেগদীপ্ত আশা যে, অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের আজকের লড়াই তাদের সন্তানসন্ততিদের ও তাদের ভাইদের মুক্ত করতে পারবে, নিজেদের মৃত্যু দিয়ে উন্নততর জগতের গোড়াপত্তন করবে। এই রকম বিশ্বাস করাটা কম কথা নয়। এই বিশ্বাস তারা কাজে লাগাক, তা তাদের কাছে দাবি করা চলে। যে বিশ্বাস তারা করে না, তা কাজে লাগানোর দাবি তাদের কাছে করা চলে

না। যা সত্য ও যা কর্তব্য, তা হচ্ছে নিজের কাছে খাঁটি হওয়া, নিজের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে মিলনের প্রচেষ্টা—তাতে সাহসী ও স্বার্থশূন্য হওয়া। ভিয়েনার যে শ্রমিকেরা প্রাণ দিয়েও ছদ্ম-খ্রীষ্টান ফ্যাসিবাদের কামানের গোলার বিরুদ্ধে তাদের সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্বাসকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, তারা কর্তব্য অনুসারে খাঁটি ভাবেই কাজ করেছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কর্তব্য এবং ইউরোপে যারা একই সমাজ-আদর্শে বিশ্বাসী তাদের কর্তব্য, জীবনের মূল্যে, হাতে যে পন্থা আছে তা দিয়েই, এই আদর্শকে বাঁচানোর জন্যে রুখে দাঁড়াতে তাদের বাধ্য করছে। অহিংসরা দাঁড়াক অহিংসা নিয়ে। অন্যরা দাঁড়াক সশস্ত্র লড়াইতে। কোনো ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়তাকে মেনে নেওয়া হবে না। যে পাপ ভীরুর মতো জেঁকে বসে তার স্বীকৃতিকে আপনি ও আমি—কেউই মেনে নেবো না। আপনি সত্যাগ্রহ দিয়ে লড়াই করছেন। সর্বহারা বিপ্লবের অন্য অস্ত্র আছে। কিন্তু পৃথক কর্মের ক্ষেত্রে যা শুরু হয়ে গেছে তা একই লড়াই। আপনার ক্ষেত্রে আপনি সুখী (এমনকি আপনার ক্ষেত্রে যদি বর্তমানে এক ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রও হয়!) পিয়ের সেরেজোল আপনাকে তা জানাবেন।

আমার দিক থেকে আমার কাজ হচ্ছে—(এটা আমার নিজের ব্রত), তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর এক বন্ধন স্থাপিত করা, যারা পৃথক পৃথক অস্ত্রে, একই আদর্শের জন্যে বিশ্বস্তভাবে লড়াই করছে।

আপনাকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রেম ও শ্রদ্ধার,—দূর ও নিকট,—সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

র. র.।"

এপ্রিল, ১৯৩৪। ক্রিস্তিআঁ সেনেশাল সম্প্রতি আমাকে এক মহৎ সর্বশেষ অনুরাগের গল্প করেছেন, পেগ্যীর* সেই অনুরাগ ছিল শ্রীমতী—র প্রতি। এখন, নির্ভুলভাবে সেই শ্রীমতী—র একটা চিঠি পেলাম।

…(৫ মার্চ, ১৯৩৪) 'মহাশয়,—শান্তি সম্পর্কে উদাসীন নারীদের উদ্দেশে আপনার আন্তরিক, অতিসঙ্গত তিরস্কার, বিবেককে জাগাবার জন্যে আপনার সনির্বন্ধ মিনতি—কতবার আমি পড়েছি। আমার প্রাচীন সংগ্রামী শান্তিবাদী মনে তা নিয়ে আমি ভেবেছি, এবং আমাদের সকলের এক বিরাট প্রচেষ্টার জরুরি প্রয়োজন আমি অনুভব করেছি। আমার বাবার প্রেরণায়, পেগ্যীর প্রেরণায় আমি এই আবেদন করতে মনস্থ করেছি…আমাদের লিগের মাতা ও শিক্ষিকারা সমস্ত দল মত ও বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর কাছে আবেদন জানাচ্ছে,

---

* শার্ল পেগ্যী (.৮৭৩-১৯১৪)। কবি ও সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদ। রলাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রথম মহাযুদ্ধে মার্ন-এর যুদ্ধের প্রথম দিনেই নিহত হন। যুদ্ধের আগে সমাজতন্ত্রের দীক্ষাগুরু জঁা-জোরেসের হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধের শুরুতে বন্ধু পেগ্যীর মৃত্যু তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে পেগ্যীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু বন্ধুত্বের স্মৃতি আজীবন অম্লান ছিল। তিনি পেগ্যীর জীবনী লেখেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে তা ছাপা দেখে যান। ১৯৫৫ সালে রলাঁ-পেগ্যী পত্রালাপ: 'এক ফরাসী বন্ধুত্ব' নামে প্রকাশিত হয়। —অনু.

গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসারে সমস্ত প্রকার স্বার্থত্যাগের জন্যে যদি তারা উঠে দাঁড়ায়, তবে তারাই সব পারে। আপনি ‘সমাবেশের’ ঘোষণাবাণী প্রচার করেছেন, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে পারবেন ;—মোটের উপর আমরা নিশ্চিত এবং সেইরকমই কৃতজ্ঞ, আপনি আপনার ঐকান্তিক আগ্রহ, আপনার কর্তৃত্ব, আপনার উদ্বুদ্ধ-করা, স্বমতে-টানার দক্ষতার অমূল্য সমর্থন আমাদের দেবেন !…’

এই চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা ছাপা : ‘শান্তির জন্যে ! বিশ্বের সমস্ত আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশে’ মাতা ও নারীদের আবেদন !”

“উদ্বেগের সঙ্গে” এই আবেদন পাঠানো হয়েছে সমস্ত বিশ্বাসের “আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশে—পোপ, বিশপ, প্যাস্টর, রাব্বি, সমস্ত জাতির ও সমস্ত দর্শনের মানবগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক নেতা—সকলের উদ্দেশে, যাঁদেরই আত্মার সেবায় নিযুক্ত কোনো বিশ্বাস বা আদর্শ আছে। ‘জনমত জাগানোর জন্যে তাঁরা সম্প্রতি যা কিছু করছেন, তা বুঝতে অক্ষম হয়ে, অতল গহ্বরের কিনারা থেকে, আমরা তাঁদের চিৎকার ক’রে বলছি : জগত বিপদের মুখে ! আমাদের—নারীদের কখনো বোধগম্য হবে না যে, মৃত্যুর আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো জীবনের আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে ভয় দেখাবে। এই আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর উপরেই আমাদের স্বাস্থ্য ন্যস্ত করছি : নিরুদ্বেগ ও আনন্দমুখর শিশুদের নামে, উৎকণ্ঠার সঙ্গে যাঁরা শিশুদের বড়ো হতে দেখছেন সেইসব মাতাদের নামে, এক সর্বসম্মত উদ্যমে আমরা তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—তাঁদের সকলের মধ্যে পবিত্র ঐক্যের দৃষ্টান্ত দেখান,—তাঁরা তা পারেন, তাঁদের তা পারতে হবে, এবং বিরতিহীন মহিমান্বিত সংগ্রাম চালিয়ে যান, যাতে দায়িত্বশীল সরকারগুলোর কাছ থেকে (কথা) আদায় করা যায় যে, সকলেই অস্ত্র সম্বরণ করবে।’

শান্তির জন্যে মাতা ও শিক্ষিকাদের আন্তর্জাতিক লিগে সঙ্ঘবদ্ধ
৮০,০০০ মাতা ও নারীর পক্ষে।

আমি তাঁর উত্তর দিলাম (১৭ এপ্রিল) :

‘প্রিয় মহাশয়া,—মনে ভাববেন না যে, আপনার পত্রের ঔদার্যে আমি নিরাসক্ত, এতো দেরিতে সেই পত্রের উত্তর দিচ্ছি ব’লে ক্ষমা চাইছি। পত্রটি আমাকে অভিভূত কয়েছে। কিন্তু আপনাদের লিগের আবেদন আমার কাছে ফলপ্রদ ব’লে মনে হচ্ছে না। প্রথমত, ‘সমস্ত মতের ধর্মীয় নেতাদের’ আমি মূলধন করতে পারি না,—তাঁদের কাছে, অতীতে, ভরসা দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু আমি চাইনি, কিন্তু গত বিশ বছরের অগ্নিপরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে জগতের সামনে তাঁরা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যারই ‘সেবা’ তাঁরা করে থাকুন, ‘আত্মার’ (অথবা যা আরও বেশি ভালো হতো : মানবতার) সেবা তাঁরা করেননি ; তাঁরা সব কিছুর আগে বাঁধা ছিলেন তাঁদের সুযোগ-সুবিধা ও তাঁদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারে, যারা ঈশ্বরকে খাপ খাইয়ে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, এবং সেটাই মুখ্য—নেকড়ে আর ভেড়ার মধ্যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে ‘পবিত্র ঐক্যের’ কথা বলা অর্থহীন,—যেমনটি

আজকের বাস্তব জগৎ আমাদের চোখের সামনে হাজির করছে। গোটা বর্তমান সমাজ দাঁড়িয়ে আছে এক বিপুল অন্যায় অবিচারের স্তূপের উপরে' তাদের বেশির ভাগই 'পবিত্রীকৃত'; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এই স্তূপ ধ্বসে যাচ্ছে, মাটি যেমন ক'রে ভূমিকম্পে ধ্বসে যায়। ভেড়ার মতো করুণ ও ক্ষীণ কন্ঠে 'ঐক্যকে' ডাকলে কী লাভ হবে? যার যা নাম, সেই নামই তাকে দিতে হবে। ঐক্যবন্ধ হতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, যাদের জন্যে আমরা সকলেই, কমবেশি, সমবেতভাবে দায়ী। এবং তাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভয় পেলে চলবে না!—এমনকি (বিশেষ ক'রে) তারা যদি আমাদের স্বদেশ, আমাদের শ্রেণী, মনের সুযোগ-সুবিধা—যা আমাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে (বা আমরা যাতে আরোপিত হয়েছি), বিভিন্ন সংস্কার—যেখানে আমরা উন্নীত হয়েছি এবং যেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া কঠিন—এসব কিছুর লাভের জন্যেও হয়।

আমার কিছু ভয় (ভয়ের কিছু জোরালো কারণ) আছে যে, কেবলমাত্র সমস্ত মতের ধর্মীয় নেতারা' নন, 'মানবগোষ্ঠীসমূহের আধ্যাত্মিক নেতারাও (তাঁরা কারা?)' আপনাদের নামমাত্র সাহায্যও করবেন কিনা না: যাঁদের নাম নেতা, তাঁদের নামই সুযোগ-সুবিধা, ; যাদের নাম সুযোগ-সুবিধা, তাদের নামই চোখে-বাঁধা রঙীন ঠুলি; আর তাঁদের সংখ্যা খুবই কম, যাঁদের প্রবণতা ঠুলি ছিঁড়ে ফেলার দিকে, যাতে দেখতে পান কোন্ অত্যাচারিত মানবতার মূল্যস্বরূপ এইসব সুযোগ-সুবিধা তাঁদের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। আমি একটি মাত্র 'পবিত্র ঐক্যকে চিনি,—তা হচ্ছে সমগ্র জগতের অত্যাচারিতদের সঙ্গে ঐক্য—'আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর': বলেছিলেন ভারতবর্ষের বিবেকানন্দ,—আর তা ইউরোপের খ্রীষ্টও বলেছিলেন স্পষ্টাকারে—আর এই একই মন নিয়ে, কিন্তু পৃথক পৃথক অস্ত্রে লড়াই করেছেন গান্ধীরা ও লেনিনরা। আমি তাঁদের বাহিনীর এক যোদ্ধা।'

[১ম সংস্করণে উহ্য রাখা এই কটি ব্যক্তির নাম, ২য় সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে:

ডিসেম্বর, ১৯২৬। (পৃঃ ১৭৬-৭৮) "সেই ব্যক্তি," "সেই অধ্যাপক"—"তুচ্চি," 'অধ্যাপক তুচ্চি'।

আগস্ট ১৯৩০। (পৃঃ ২৭৬) 'ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত—র কাছ থেকে'—'পারী ও হল্যান্ডের ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার এ, উদ-র কাছ থেকে'।

জুন, ১৯৩১। (পৃঃ ২৯৪) 'এক নার্স'—'এক নার্স দেনিজ এস, গীজো।'

সেপ্টেম্বর ১৯৩২। (পৃঃ ৩৯৫) 'ফেডারেল মন্ত্রী—কে'—'ফেডারেল মন্ত্রী আয়েবেরল্যাঁকে।']

১৯ এপ্রিল, ১৯৩৪। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের আগমন। (আমার 'বিবেকানন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে "মায়ার" প্রসঙ্গে আমি তাঁর উল্লেখ করেছি।) প্রাচ্যবিদ্যার জন্যে রোমে সদ্য যে নতুন ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে, তা উদ্বোধন করতে ইতালি সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এখন তিনি চলেছেন হিটলারের জার্মানীতে চার পাঁচটি শহরে বক্তৃতা দিতে। আজকাল ভারতবর্ষের অনেক উমেদার হয়েছে, যারা তার প্রতি প্রেম-কটাক্ষ হানছে। সে-কথা মহেন্দ্রনাথ সরকারকে বলাতে তিনি হাসলেন, উত্তরে বললেন যে, এই প্রেমপ্রার্থীদের কেউই তাকে লুব্ধ করতে পারেনি। মোটাসোটা বেঁটেখাটো মানুষটি, "বাবু" টাইপ, ভাবভঙ্গি অন্যমনস্ক, কিন্তু চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত এবং কথার ব্যাপারে প্রাণবন্ত ও ক্লান্তিকর। নিজের কথা বলার চেয়ে নিজেকে বোঝানোর দিকে আগ্রহ অনেক কম। নিজের মনের কথা বলছেন তো বলছেনই। আর তাঁর চিন্তার সবকিছু গিয়ে পৌঁছোয় সব কিছু ফিরে আসে বৈদান্তিক অধিবিদ্যায় শংকরে। তিনি দাবি করলেন, অদ্বৈতবাদের মহদ্‌গুরুদের কাছে পরম সবসময়ে আশাবাদী কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং বৈদান্তিক চিন্তাকে যিনি নৈরাশ্যবাদী মনে করেন, তিনি অদ্বৈতবাদকে মোটেই জানেন না। (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভারতীয় মুসলমান অধ্যাপক এম. এইচ. সৈয়দের কাছ থেকে পাওয়া "ভারতীয় চিন্তায় আশাবাদ" নামে এক সাম্প্রতিক গবেষণা-প্রবন্ধের সঙ্গে এ কথার মিল আছে। কিন্তু আমি ভাবতেই অভ্যস্ত যে, এই ব্যাখ্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের গত তিরিশ বছরের নবজাগরণের সম্পর্ক আছে।) ভারতবর্ষের জীবিত দার্শনিকদের মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে সম্মান দেন অরবিন্দ ঘোষকে, স্পষ্ট ও যথাযথভাবে এই জন্যে যে, পরম ও ক্রিয়াকে—সব কিছুকে আলিঙ্গন করতে ও একটার সঙ্গে অন্যটাকে বাঁধতে অরবিন্দ চেষ্টা করেন। অরবিন্দের উপর তাঁর একটা বক্তৃতার কপি আমাকে দিলেন। ভারতবর্ষে দর্শনশিক্ষা সম্পর্কে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তার জন্যে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) চার বছর লাগে। সেখানে ভারতীয়-ইউরোপীয় দার্শনিকদের সম্পর্কে এবং যে সব পন্ডিতেরা গবেষণার মধ্যে দিয়ে কোনো প্রকল্প বা কোনো মহাজাগতিক রীতির বিষয় বলতে পেরেছেন ব'লে মনে হয়—তাঁদের সম্পর্কে সেখানে পড়ানো হয়। সবচেয়ে সাম্প্রতিক নামগুলোও বেশ পরিচিত (বিশেষ ক'রে এ্যাংলো-স্যাকসন লেখকদের নাম)। মহেন্দ্রনাথ সরকারের ফ্রান্সে শুধু বের্গসঁর সঙ্গেই কিছু সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হয়, তাছাড়াও তাঁর কাছে মনে হয়েছে বের্গসঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কে পরিচয়টা শুধুই ভাসাভাসা। আমাদের প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কম, তাঁর মতে তাঁরা শুধুই ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি বললেন জেনেভা হয়ে যাচ্ছেন শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই; তিনি নিশ্চিত ক'রে বললেন যে, ভারতবর্ষে আমার বইগুলো বহুপঠিত। রাজনীতির ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক (আর আমিও তা বুঝতে পারলাম)। রাজনীতির দিকে তাঁকে ঠেললাম না। জার্মানী থেকে ফেরার পর মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের কথা আছে।

মে, ১৯৩৪। নোভোসিবির্স্ক'র সাইবেরীয় লেখক জি. ভিয়াতকিনকে লেখা একটি চিঠির অংশ ঃ —

"...আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি ঃ

১ম.—ইস্ত্রাতির সঙ্গে গান্ধীকে গুলিয়ে ফেলার কিছুই নেই। কোনো অভিধাতেই এই পর্যায়ে ফেলবার মতো লোক তাঁরা নন। অতি শক্তিশালী এক লেখকের বেশি কিছু ইস্ত্রাতি নন; তাঁর হৃদয় উদগ্র ও অনিয়ন্ত্রিত, বিচারের কোনো ক্ষমতা ছিল না, কোনোই বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, মেজাজটা ছিল সবময়েই তাঁর ভালবাসা, তাঁর ঘৃণা, তাঁর খেয়ালখুশিতে তিরিক্ষি, যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে সেই মানুষ ও ঘটনার তিনি শিকার।

...গান্ধীর ক্ষেত্রে এর একেবারে বিপরীত। জগতে আমি যাঁদের সবচেয়ে উচ্চ নৈতিক ব্যক্তিত্ব, সবচেয়ে স্বার্থশূন্য ও সবচেয়ে খাঁটি ব'লে জানি, গান্ধী তাঁদের অন্যতম। আমি তাঁকে ভালো করেই জানি। আমি তাঁর জীবন ও গত ৪০ বছরের কর্মকে কাছে থেকে অনুসরণ করেছি। তাঁর মহৎ চরিত্রে কখনো ব্যত্যয় ঘটেনি। আমার নিজের মতোই তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত। তাঁর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে, ভারতবর্ষের গত ৪০ বছরের প্রকৃত অবস্থা ভালো ক'রে জানতে হবে। ভারতবর্ষ ছিল পরানুগত্য ও হতাশার চরমতম মাত্রায়। গান্ধীই তাঁর বীরোচিত দৃষ্টান্তে (প্রায়ই গ্রেপ্তার হয়েছেন, প্রহৃত হয়েছেন, মৃত্যুর মুখে পড়েছেন) ভারতবর্ষের মর্যাদাবোধের গর্বিত মনোভাব এনে দিয়েছেন, তিনিই তার মধ্যে স্বাধীনতার প্রবল প্রাণবায়ু সঞ্চার করেছেন। এটা একটা ছোটোখাটো কাজ নয়! কল্পনা করুন তিরিশ কোটি মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এক ক্ষীণদেহী মানুষের অক্লান্ত প্রচারে, যাঁর একমাত্র অস্ত্র তাঁর সর্বস্বত্যাগ, তাঁর যুক্তি এবং তাঁর চরম আন্তরিকতা। তাঁর নিজের সামাজিক শিক্ষা বেশ দুর্বল; তা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভরশীল, তা অন্যদিকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র ঃ গান্ধী হচ্ছেন এমন এক মানুষ, যিনি কম পড়েন, কিন্তু জনগণের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ রাখেন, এবং যিনি যা কিছু সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন, কর্মের মধ্যে দিয়ে তার পরীক্ষা ক'রে চলতে থামেন না ঃ পরীক্ষিত কর্ম যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তা স্বীকার ক'রে নিতে এবং সামাজিক সুবিচার ও সত্যের অভিমুখী অন্য পথ খুঁজতে তিনি ইতস্তত করেন না। এইভাবেই তাঁকে চিনেছি ব'লেই আমি তাঁর উপরে আস্থা রাখি। তিনি এমন এক মানুষ যিনি সব সময়েই এগিয়ে চলেন। কখনো থামেন না। হিংসা ছাড়া, যুক্তি দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে কেউ যদি তাঁকে দেখিয়ে দেয় কোথায় সত্য আছে, তিনি সেই পথেই চলবেন, তাঁর জন্যে তাঁকে যে দামই দিতে হোক না কেন, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই, পাকাপোক্ত খুঁটিয়ে বিচার ক'রে সে-সম্পর্কে দৃঢ়-প্রত্যয়ী হবার পর। আর যেহেতু, তাঁর গভীরতম সবটুকু সহানুভূতি রয়েছে খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি লক্ষ লক্ষ সহায়সম্পদহীন ও নিপীড়িতের প্রতি, আমি প্রায় নিশ্চিত যে, তিনি যদি আরও ১০ বছর বাঁচেন, তাহলে ভারতবর্ষের দেশী ধনতন্ত্রী ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার

সমস্ত আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে আমার সবচেয়ে প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দের সম্পর্ক, আর তাকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলতে আমি চেষ্টা করি। যখন তিনি ভুলও করেন, তাও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং স্বার্থশূন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে। এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, এমন সমগ্র ভাবে কোনো মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করেনি। আর তাঁর আন্তরিকতা চরম। পরিস্থিতির ফলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়তেও হয়, আমি তাঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা ক'রে চলবোই…"

৪ মে, ১৯৩৪। জেনেভার "ভারত সুহৃদ সমিতির" সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী হোরাপ এসেছেন আমার বোনের কাছে, আর এসেছেন এক তরুণী ভারতীয় মহিলা শ্রীমতী এম. ডি. জি,* তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়া। (প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমাদের বললেন যে, ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ঠাকুর' একটা মুসলমান পদবি, অনেক আগে তা পরিবারটিকে দেওয়া হয়েছিল।) গত আট মাস ধ'রে এই যে-তরুণীটি জেনেভায় ও আমেরিকায় ভারতীয় প্রচার চালাচ্ছেন, তাঁকে আমার ভারতবর্ষের স্বার্থের এক অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবক্তা ব'লে মনে হলো। তাঁর নাকেমুখে আগুন ছোটে; বজ্রনির্ঘোষে তিনি বললেন যে, সংগঠিত হবার জন্যে, ও চীনকে দলে টানার জন্যে, আর (রাশিয়া সমেত) ইউরোপকে এশিয়া থেকে খেদিয়ে তাড়ানোর জন্যে ভারতবর্ষকে অবশ্যই জাপানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মনে এই কথা জাগে না যে, ইংলন্ডের থাবার নিচে গেলে ভারতবর্ষের অবস্থা বেশি ভালো হবে না। জাত ও বর্ণ সম্পর্কে তাঁর নির্বোধ অহংকারই আগেভাগে ভারতবর্ষের উচ্চতর পদমর্যাদার নিশ্চয়তা দিয়েছে। আর এই কথার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ শুধু পেটমোটা প্রভাবশালী বুর্জোয়াদের কথাই বলতে শোনে। সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোনই ভাবনাচিন্তা নেই। তিনি গান্ধীর যেমন শত্রু তেমনি শত্রু সোভিয়েত রাশিয়ারও। গান্ধী-নেহরুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নস্যাৎ করার জন্যে তিনি মুখিয়ে আছেন, এমনকি সেরা এনড্রুজকেও; তাঁকে তো প্রায় এক বকধার্মিক ভন্ড পর্যন্ত ব'লে দেখানো হলো, এবং প্রচন্ডভাবে আমি তাঁর পক্ষ নিলাম। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট সৌম্যেন্দ্রনাথকে তাঁর শ্রেণীর এক ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক ব'লে তাঁর মনে হয়। এবং চীনের লাল-ফৌজ তাঁর মনে আতঙ্ক জাগায়। সংক্ষেপে বলতে, এ হচ্ছে অখন্ড জাতীয়তাবাদ এবং অখন্ড শ্রেণীসংগ্রাম, যা এই তরুণী ও টগবগে মহিলাটির মধ্যে সত্য ব'লে সমর্থিত হচ্ছে। যদি তিনি (আমি যেমনটি ভাবি) ভারতবর্ষের একটা বড়ো অংশের মতামতের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, তাহলে ভবিষ্যৎ কি হবে তা বোঝাই যায়! প্রথম ইউরোপে আসার সময় তিনি ছিলেন' ('Philippart') জাহাজে, জাহাজটায় আগুন লেগেছিল।

---

*সম্ভবত নামটি মায়া দেবী গঙ্গোপাধ্যায় (বা গাঙ্গুলি)। ওয়াকিবহাল মহলে শুনেছি, ইনি গঙ্গোপাধ্যায় পদবি ব্যবহার করতেন। এঁর নামটি রলাঁ কেন গোপন রেখেছেন, তা অনুমান করা কঠিন বলে মনে হয় না।—অনু

আধা জামাকাপড়ে তাঁকে কেবিন থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল একটা বোটে। তেমন বেশি উত্তেজিত না-হয়ে সে-কথা তিনি ব'লে গেলেন ; কিন্তু এটি যে মস্কোর কীর্তি, এতে তাঁর মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ নেই। এটা যে কমিউনিস্টদের অপচেষ্টা, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সমস্ত কিছু করার পর, তদন্তের ফলাফল একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, এই অগ্নিকাণ্ডের একমাত্র দায়িত্ব বর্তায় 'ফিলিপার' জাহাজের কোম্পানীর ও তার পদস্থ কর্মচারীদের উপরে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও, মস্কোর কীর্তি ব'লেই তিনি বিশ্বাস করেন, সে-বিশ্বাস ইস্পাতের মতো দৃঢ়।

এই কুলীন ক্ষুদ্র মহিলাটি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত এক পরিবারের, জাত সম্পর্কে তাঁর সংস্কারগুলো তিনি কম পুষে রাখেন নি ; আর মান্যগণ্য বাঙালী বুর্জোয়ার এই গোটা জাতসম্পর্কিত অস্বস্তিকর গোপন কথাগুলো তাঁর মারাত্মক দীর্ঘ রসনায় ফাঁস হয়ে গেল। এই জাতের মধ্যে মহাজনীর রবরবা, যেন অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ এক জীবনপ্রণালী। শতকরা ৩০০ টাকায় ধার দেওয়াটা মোটেই বিরল নয়। তা খারাপ চোখেও দেখা হয় না। আর মিষ্টিনামের অধিকারিণী এই ক্ষুদ্র মহিলাটি মোটেই গোপন করলেন না যে, তিনিও এই রকমই করেন। তিনি বললেন : "নইলে বাঁচবো কী ক'রে ? ব্যাংক তো শতকরা ৩ কি ৪ টাকা সুদ দেয় !...আর এই জন্যেই আজ পর্যন্ত বিধান সভায় মহাজনীর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ করা প্রায়-অসম্ভব হয়ে আছে। (এই ভাবে বলা থেকেই, আমি আগে ভাগে দেখেছি, একবার শ্রেণীসংগ্রাম জ্বলে উঠলেই দেশলাইয়ের বাক্সের মতো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাংলাদেশকে দপ ক'রে জ্বালিয়ে দেবে।)

জুলাই, ১৯৩৪। আমার বোনের বাড়িতে মীরার সঙ্গে দেখা হলো। হঠাৎ সে ভারতবর্ষ থেকে এসে পড়েছে। (যাত্রা করার মুখে তার করা হয়েছিল। তার কথা মতো, চলে-আসার এই হঠাৎ-সিদ্ধান্তের কারণ ঘটিয়েছে, এক আন্তর কণ্ঠের আহ্বানের মতো, অন্তরের "আলোকপাত"। গান্ধী তাকে ফেরাবার কোনো চেষ্টা করেননি, তাকে নিজের মতো কাজ করতে দিয়েছেন। মীরার ইচ্ছে, ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাটা জানাবার চেষ্টা করবে। সে বলতে চলেছে লণ্ডনে ও ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকদের কাছে। গান্ধী মেনে নিয়েছেন, তাদের কাছে মীরা যাচ্ছে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নয়, তাঁর ব্যাখ্যাতা হিসেবে—তাঁর কন্যা হিসেবে, যে তাঁকে সবচেয়ে ভালো জানে, আর যে তাঁর কথা বুঝিয়ে বলতে পারে। গান্ধীর সঙ্গে শেষ রাতের আলোচনার যে বিবরণ সে পড়ে শোনালো, সেই অনুসারে গান্ধী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সবসময়েই রাজী, কিন্তু তার ভিত্তি হবে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন। তিনি বলেছেন : "আমি ভারতবর্ষের সেবক নই। আমি সত্যের সেবক।" তিনি যে তাঁর কথা বোঝাতে সফল হতে পারবেন, তার সম্ভাবনা কম। আজকের ব্রিটেনের নির্দেশ-বাক্যটি মনে হচ্ছে, তিনি যেন অজানা কেউ—এমনটি

মনে করা, এবং তাও সবচেয়ে অপমানজনক ভাবে। (অন্যকে বলার অনুমতি দিয়েই) দু'জনের পরিচিত এক বান্ধবীর কাছে তাঁর সম্পর্কে বড়োলাট বলেছেন, তিনি এই নিশ্চয়তায় পেঁাচেছেন যে, রাজনীতি ও চরিত্রে গান্ধী ছিলেন আন্তরিকতা-শূন্য; তাতে গান্ধী বড়োলাটকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি চিঠি লিখেছেলেন, সেই চিঠিতে এই সমালোচনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং একথা বলার কারণ জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। তার উত্তর দেবার কষ্টটুকুও বড়োলাট স্বীকার করেন নি। সেক্রেটারীকে দিয়ে তিনি নিছক পত্র-প্রাপ্তিটি স্বীকার করেছিলেন, তাতে কৈফিয়তের একটি কথাও ছিল না। ব্রিটেনের কৌশল হচ্ছে কংগ্রেস থেকে গান্ধীকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং একমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গেই কারবার করা। গান্ধীর কৌশল হওয়া উচিত কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা, কংগ্রেসের নামে কথা বলা, এবং কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়েই সব কিছু করা। তিনি এসব করতে প্রস্তুত ব'লে মনে হয় না। আন্তরস্থির কন্ঠ (still voice) অনুসারে কাজ করতে তিনি বড়োই অভ্যস্ত। তিনি যে কর্মবিরতি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে। জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগেই স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায় বীরোচিত সৌজন্যে তিনি এই সময়সীমা পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম মুলতুবি রেখেছেন, বিরতির কাল শেষ হলে, তিনি স্বাধীনতা ফিরে পাবেন; এবং আশংকা হয় যে, তাঁর রাজনৈতিক কর্মের প্রথম উদ্যোগেই তঁাকে না নতুন ক'রে গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধী মোটেই ঢাকছেন না যে, এবার গ্রেপ্তার হবার কোনো বাসনা তঁার নেই। কিন্তু সক্রিয় না হয়েও তিনি এবং মুখ খুললে প্রথম যা কাজে লাগাবেন, তা হবে তাঁর সহকর্মী নেহেরু প্যাটেল প্রভৃতির মুক্তির দাবি, যাঁদের ছাড়া কংগ্রেস হয়ে থাকবে নেতা বিহীন। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তঁার বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার আদায় ক'রে নিতে তিনি চাইবেন। সরকার চুপচাপ আছে। এমনকি প্রদেশগুলোর ছোটোলাটদের সঙ্গেও গান্ধীর দেখা করার উপায় নেই। উপর তলার নির্দেশ হচ্ছে, তঁাকে স্বীকার না করার, তিনি যেন নেই এমনটি মনে করার। ব্রিটেনের উপযুক্তই উদ্ভট কান্ড। খালি-পায়ে-হাঁটা এই মানুষটিকে 'ওল্ড জেন্টলম্যান' তো চেনেন না, আর তার উপর, কেউ তো তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। বিবেকানন্দের মতো লোক হলে দাদতোলা বিদ্রূপে (ironic vengeresse) এর পাল্টা উত্তর দিতেন!

৪ অক্টোবর, ১৯৩৪। এলেন মনাস্তিয়েকে নিয়ে পিয়ের সেরেজোল এসেছেন। ২২ তারিখে তিনি আবার ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন দুঃস্থদের সাহায্যে সেখানে এক সেবাদল গড়ে তুলতে। তাঁর দু'মাসের প্রথম সফরের কথা বললেন, সেখানে তিনি সরাসরি সমস্যাটি বিচার করেছেন। ভারতবর্ষে লোকবল বাড়ানোর প্রশ্ন নেই: সেখানে তা অঢেল। কিন্তু তার প্রয়োজন পরিচালনার নেতার, নির্দেশের। এবং সেরেজোলের ধারণায়, তিনি যে সাহায্য দিচ্ছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তার প্রতীকমূল্য আছে; তিনি বললেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা ব'লে এই

মূল্যকে ভারতবর্ষ অত্যন্ত উপলব্ধি করেছে। ছোটো মাথা বিরাট বপু এই সুইসটির মনটি ভালো, খুবই ভালো,—সহৃদয়, কার্যকরী, উদ্ভট। যে সামাজিক কর্মের সময় হয়ে-যাওয়াটা অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় ব'লে ভালো ক'রে বুঝলেও, তার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়াতে, যাঁরা নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সবচেয়ে দীর্ঘ ও ঘোরা পথেই সেখানে সবচেয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে পেঁছনো যায়,—তিনি তাদেরই একজন। সেরেজোল বিশ্বাস করতে চান যে, ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ গেছে পাটনা ও বারানসী হয়ে। (এই রকম এ্যালবার্ট শুহ্বেইটজেরও বিশ্বাস করতে চান, পথ গেছে লাঁবারেন হয়ে।) এই জন্য তিনি ভালো ক'রেই জানেন যে, মহৎ দুঃখ ব্যতীত এই সমাধান লাভ করা যাবে না,—(দুঃখ অন্যদের ! কারণ তাঁর দুঃখের,—তাঁদের দুঃখের ক্ষেত্রে সেরেজোল ও শুহ্বেইটজের সাহসী, তাঁরা সে-দুঃখকে কর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না); আর সেখানে সেই জগতে যখন অগ্রসর হতে হবে—সেখানে আর থাকাটা তাঁর কাম্য নয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এক সহযোগিতার স্বপ্নও তিনি দেখেন। সম্ভবত ধনী ও দরিদ্রের দুই শ্রেণীর মধ্যেও সেই সহযোগিতার স্বপ্নই দেখেন। কিন্তু তিনি সৎ ও স্বার্থশূন্য। তিনি ধনী ছিলেন, যা ছিল সব তাঁর (সুইস) সম্প্রদায়ের লোকদের দিয়ে দিয়েছেন। আর ভারতবর্ষে ঢোকার জন্যে ইংলন্ড তাঁর কাছে শপথবাক্যে সই করার দাবি করেছিল,—(সমস্ত মিশনারির জন্যে শপথবাক্যের একই বয়ান), তিনি 'বিবেকের আইন'কে সম্মান করতে দায়বদ্ধ, রাষ্ট্রের আইনকে নয়—একথা না জানিয়ে, সেই শপথবাক্যে সই করেন নি। এ ছাড়া কোনো দিক থেকেই তিনি অসুবিধায় পড়েন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সেবার ও বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলো গ'ড়ে তোলার কাজের মধ্যেই।

সেরেজোল গান্ধীর প্রশংসনীয় ভদ্রতা ও ধৈর্যের গল্প করলেন; হাজার হাজার অক্লান্ত ও ক্লান্তিকর প্রশ্নকর্তা—যারা তাঁর দম বার ক'রে দেয়—তাদের সম্পর্কে কোনো আপত্তি তোলেন না, কখনো এতটুকু ক্লান্তি দেখান না, কখনো বলেন না: 'আর না!' পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিবেশ তাঁকে ঘিরে বিরাজ করে; তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকদের অবিশ্বাস্য স্বাধীনতা; তাদের তিনি বিনা বাধায় বলতে দেন; শোনেন প্রীতিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে তাতেই বিরোধী চিন্তাকে অন্য যে-কোন ভঙ্গির চেয়ে আরও নিশ্চিতভাবে জয় করা হয়ে যায়। তাদের একজন সেরেজোলকে বলেছিল: 'বৃথা চেষ্টা, যতোই করো, উনি একটা বিশাল অজগর, হাঁ ক'রে আছেন; শেষ পর্যন্ত হাঁ-র মধ্যে গিয়ে পড়তেই হবে।'

সেরেজোল তাঁর অটুট প্রাণশক্তির প্রশংসা করলেন। এই নগ্নপদ, শীর্ণ বৃদ্ধটি হাঁটার পাল্লায়—ভালো হাঁটিয়েদের, দুর্গম পথে চলায় অভ্যস্ত এই সুইস পার্বত্য পদযাত্রীকে ক্লান্ত করেছেন, তাঁদের ছাড়িয়ে চলে গেছেন। চাষীদের সম্পর্কে এলে গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে খাপ-খাইয়ে-নেবার ক্ষমতার প্রশংসাও তিনি করলেন; ছোটো একটা জলচৌকির উপরে পা মুড়ে বসতে-না-বসতেই সেই ক্ষমতার পরিচয় দেন, আর তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দেন। তাঁর প্রতিটি হ্রস্বভাষণের আগে

হয় একটা সংক্ষিপ্ত গান, বেদ থেকে একটা মন্ত্র, তাতে তাঁকে ও সমবেত সকলকে ঘিরে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় অন্তরঙ্গতার একটা পরিবেশ। গান্ধী কখনো ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন না, কখনো দিব্যত্বের দিকে নিজের জন্যে সোজাসুজি ছোটেন না। এসবই ধর্মগ্রন্থ থেকে পঠিত বা গীত অংশ,—এসবই ক্যাথলিকদের কায়দায় একটা প্রার্থনা-অনুষ্ঠান বিধি। আর তাই এই সৎ প্রোটেস্টান্টরা (সেরেজোল, এদমঁ প্রিভারা) এতে অস্বস্তি বোধ করেন। সেরেজোল কিংবা প্রিভা গান্ধীকে বলেছিলেন : “আপনার কি আশংকা হয় না যে, এতে ধর্মীয় চিন্তায় এক ধরনের যান্ত্রিকতা সৃষ্টি হবে?’ গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন : ‘হোক না কেন!’ আমার বিশ্বাস তিনি এও বলেন : ‘চিত্তের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার জন্যে সবসময়ে তার সামনে কাঠামো (বা পাত্র) বাড়িয়ে রাখলে তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ বেরিয়ে আসবে এবং কাঠামো (বা পাত্র) ভ'রে তুলবে।’

নভেম্বর, ১৯৩৪। ভারতবর্ষে ফেরার পথে মীরা ভিলন্যভ হয়ে গেল। এক দিন এক রাত্রি সে রইল মাদলিনের বাড়িতে, ভিলা লিঅনেতে (৬-৮ নভেম্বর)। বিশাল বিশাল জনসভায় গুচ্ছের বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে (আমেরিকায় দিনে তিনটে পর্যন্ত) জুলাই মাসটা সে ছুটে বেড়িয়েছে ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, ওয়েলসে ও আমেরিকায়। সর্বত্র তার কথা শুনেছে, আগ্রহ ও সহানুভূতি নিয়ে—কিন্তু ইংলন্ডের শ্রমিকরা যেমন শুনেছে, তেমন বেশি বোঝার মন নিয়ে কোথাও না, তবুও তো এখন তারা বেকারি ও দুর্দশার কঠিন কবলে পড়েছে (দক্ষিণ ওয়েলসের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই বেকার; একটা গোটা পুরুষই কখনো জানেনি কাজ কাকে বলে! ব্রিটিশ পণ্য বয়কট ক'রে যে-বিদ্রোহী ভারতীয়েরা ইংলন্ডের বেকারি বাড়িয়েছে তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হলেও যাদের যথেষ্ট ক্ষমা করা যেতো, সেই সব মানুষেরাই ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে অগ্রণী।) গান্ধীবাদের খোলাখুলি বিরোধী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনাও সব সময়ে ঠিক মতোই হয়েছে। আর আলোচনা-সভাগুলোয় ইংলন্ডের রাজনীতির তীব্র নিন্দা করা হলেও, ইংলন্ডের মফঃস্বলের কাগজগুলো সেসব আলোচনার বিবরণ নিষ্ঠাভরেই দিয়েছে। ইংলন্ডের স্বাধীনতার এক পুরনো ঐতিহ্য আছে, সম্ভবত তা আর বেশিদিন থাকবে না, কিন্তু বাকি গোটা জগতের উদারনৈতিকতার নাভিশ্বাস সত্ত্বেও তা টিকে আছে। আমেরিকায় মীরা অসংখ্য লোককে দেখেছে, যারা গান্ধীর বাণীর নৈতিক দিকটা সম্পর্কে প্রচন্ড আগ্রহ দেখিয়েছে এবং লুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেছে। শ্রীমতী রুজভেল্টের সঙ্গেও তার আলোচনা হয়েছে। উইনস্টন চার্চিল, লয়েড জর্জ, স্যর সামুয়েল হোর, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (ভূতপূর্ব আরউইন) প্রভৃতি মুখ্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে লন্ডনে সে দেখা করেছে। ‘হোয়াইট বুকের’ অসম্ভব ফতোয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রস্তরীভূত হচ্ছেন সামুয়েল হোর (তাছাড়া তিনিই এর মুখ্য রচনাকর্তা)। যাঁর সবচেয়ে বড়ো বড়ো কথা, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে

রক্ষণশীল চার্চিল। আগের সফরের সময় যিনি গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনিই মীরার সঙ্গে দেখা করেছেন সৌজন্যভরে এবং তাকে অতীব শ্রদ্ধা সহকারে গান্ধীর কথা বলেছেন, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'হোয়াইট বুকের' উল্লেখ করেছেন। তাঁর ওই অহংকার এবং বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁর বিরোধিতার জন্যেই ভারতবর্ষকে একটা বৃহত্তর সংবিধান দেবার দিকে তিনি ঝুঁকতে পারেন। তিনি মনে করিয়ে দিতে ভালোবাসেন যে, তিনিই আয়ারল্যান্ডকে ও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে তাদের স্বাধীনতার নতুন সংবিধির নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। ইংলন্ডের কোনো রাজনীতিবিদেরই তাছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই ; একমাত্র ব্যতিক্রম লর্ড হ্যালিফাক্স (আরউইন), তিনি সেখানে থেকেছেন এবং তিনি আবেগ ও প্রীতির সঙ্গে ভারতবর্ষের কথা, গান্ধীরও কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, পার্টি তাঁর হাত বেঁধে রেখেছে। বড়োলাট তেমনই—গান্ধীকে যেন জানেন না – এমন ভাব দেখিয়ে চলেছেন। গান্ধীর সঙ্গে সরকারীভাবে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তাঁর নেই। দেখেশুনে মনে হয়, তাঁর সংকীর্ণতা ও তাঁর অসহিষ্ণুতার পেছনে রয়েছে তাঁর রাশভারী ও হামবড়া স্বভাবের গৃহিণীর হুকুমনামা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম বড়োলাটের অবস্থাটা ঠিক কী রকম এবং ইংলন্ডের কোন আইনসঙ্গত অধিকারের উপর তিনি নির্ভর করেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু রাজারই অধীন, তিনি রাজার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তার ক্ষমতা তাই মন্ত্রীসভার সদস্যদের এক্তিয়ারের বাইরে। তিনি মনোনীত হন পাঁচ বছরের জন্যে ; আর মেয়াদ পেরুনোর আগে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার নজির নেই,—এমনকি মন্ত্রীসভা যদি তাঁর রাজনীতি অনুমোদন না করে তাহলেও না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই মুহূর্তে ঠিকঠাকই আছে ; আর গান্ধীর নির্দিষ্ট রূপ-দেওয়া জরুরি প্রয়োজনগুলো কংগ্রেস স্বীকার ক'রে নিলেও, গান্ধী এখন সেসব থেকে সরে আছেন, – যাতে তাদের নতুন স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। কংগ্রেসকে না জড়িয়ে, কংগ্রেসের সঙ্গে বাধ্যবাধকতায় না থেকে ইংলন্ডের রাষ্ট্রনেতাদের ও জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গান্ধী যদি ইউরোপে আসেন, তাহলে তা এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। তাতে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফলে মীরা যাঁদের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলেছে, সেই সব রাষ্ট্রনেতাদের ঘাবড়ে দিতে পারবেন না। আইনে এমন কিছু নেই যাতে ইংলন্ডে এসে সভাসমিতি করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন নাগরিককে বাধা দিতে পারা যায়। সর্বনাশা ঘটনাবলী, ইউরোপে যুদ্ধঘটার বিপদ ইত্যাদি এই পরিকল্পনা রূপায়িত করতে বাধা ঘটাবে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

আমি মীরাকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইটির* কথা বলেছি, ফরাসীতে তার অনুবাদ বেরিয়েছে ; এবং এর যে-প্রতিক্রিয়া না-হয়ে পারে না, তার কথাও বলেছি। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বোঝাবুঝি বাড়িয়ে তোলার উপরে, গান্ধীর সম্পর্কে ইউরোপের

---

*'গান্ধী'—গালিমার সংস্করণ।

লোকের মধ্যে যে অবিশ্বাস লালিত হয়, তার উপরে, আমি জোর দিলাম। এটা অত্যন্ত জরুরী যে, সমাজ-ব্যবস্থার প্রশ্নে কোনো রকম আপস না ক'রে তাঁকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মীরা আমাকে বলেছে যে, এ নিয়ে তিনি নিজেই খুব ভাবছেন এবং গত কয়েক মাস ধ'রে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নিয়ে পড়াশোনায় লেগেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, "প্রতিদিনের লড়াই," গোটা দুনিয়া জুড়ে যা শোষক ক্যাপিটালিস্টরা গরীব জনসাধারণের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে সেটাই সবচেয়ে জঘন্য লড়াই। আর মীরা তার ইউরোপ ও আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসেছে সামাজিক সংঘাতের ট্রাজিক দিকটিতে ভীষণভাবে আহত হয়ে। তাই আমি নির্ভর ক'রে আছি যে, পক্ষ বেছে নেবার প্রয়োজনের উপরে সে গান্ধীর উপরে চাপ দেবে।

গান্ধীর জন্যে তার হাতে এই চিঠিটি দিলাম (৮ নভেম্বর, ১৯৩৪)

"...মীরা আপনাকে বলবে পশ্চিমের কোন্ ট্রাজিক মুহূর্তে সে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। ইউরোপের মানুষের মন সর্বত্র উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; ইউরোপ এক ব্যাপক যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে; গত কয়েক বছর ধরে যে উন্মত্ততা পুঞ্জীভূত হয়েছে, এই যুদ্ধে তার সমস্তটাই বেরিয়ে আসার বিপদ দেখা দিচ্ছে। এবং তখন মানবতার ও যুক্তির কণ্ঠ শোনানো খুবই কঠিন হয়ে উঠবে। জ্বরাক্রান্ত ইউরোপের এই চরম নিশিপালনের মুহূর্তে আপনাকে এক আবেদন জানাতে চাই। হিংসার সমস্ত চেহারার মধ্যে বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে দুঃসহ হচ্ছে সমাজব্যবস্থার হিংসা, তার দৈত্য হচ্ছে 'চাঁদি'। এই ক্ষমতা চিরকালই বিপুল; কিন্তু গত অর্ধশতাব্দী থেকে এবং আরও বেশি ক'রে, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে, বড়ো বড়ো শিল্পের (ভারী শিল্প, অস্ত্রোপকরণ, রাসায়নিক জিনিসপত্রের) সঙ্গে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি লাভ করেছে, তা দুনিয়ার সমস্ত জাতির উপর তার শোষণ বিস্তার করেছে রাজনীতির কারবারের পরিচালনাও সে কুক্ষিগত করেছে (সরকারগুলো তার হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়); আর তার বিকট শক্তি, যারা তা প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে মানসিক ভারসাম্যের এক অভাব, যা গোটা জগতকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজিতন্ত্র যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে; সমস্ত উপায়ে মানুষের মৃত্যু নিয়ে ফাটকা খেলছে অস্ত্রশস্ত্রে, (বিষাক্ত গ্যাস, আফিং ও তা থেকে তৈরি আরও বেশি মারাত্মক হেরইন ইত্যাদি) বিষে। আর দুঃখের বিষয়, একবারও এ সম্পর্কে না-ভেবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্ধের মতো এই সব অপরাধমূলক ফাটকাবাজির মুনাফায় ভাগ বসাচ্ছে। মজুর ও চাষীরা বিদ্রোহ করছে, শ্রমের উপরে ভিত্তি ক'রে আরও সুস্থ, আরও ন্যায্য এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সংগঠিত হতে চেষ্টা করছে। যে অহিংসা তাদের হিংসাকে নিন্দা করে, তাকে এদের অবশ্যই বুঝতে হবে, তাকে অবশ্যই হিংসার উৎসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে; সেই উৎস অন্যায্য ও খুনী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে, যা এদের এই প্রয়োজনের মুখে দাঁড় করিয়েছে : হয় বিপ্লব, নয় মৃত্যু! এই সংঘাতের মধ্যে, মানুষ যখন সন্দেহাতীত ভাবে পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য, তখন আপনার কণ্ঠ

শোনাতে হবে, এটাই অপরিহার্য। এটা জরুরি: কারণ ভুল ব্যাখ্যা-করা আপনার চিন্তাধারা ও জগতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে এতে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে। তাদের ও আপনার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা লালিত করায় বহু লোকের স্বার্থ আছে। আপনার মতোই আমি সারা জীবন ধ'রে বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করেছি। এমন এক সময় ছিল, যখন শিথিল উচ্চ-নীচ বা পরস্পর সম্পর্কিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে এই সামঞ্জস্য বিকশিত হওয়া সম্ভব ছিল। সে সময় আর নেই। এমনকি সংসদীয় "উদারপন্থার" সময়েরও নাভিশ্বাস উঠেছে; অনেক দিন থেকেই তা শুধুই মিথ্যাকে আঁকড়ে ধ'রে আছে। আজ যা আছে, তা হচ্ছে সম্পদ ও হিংসার লাগাম-ছেঁড়া নৈরাজ্যবাদ (ধনতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ বিচিত্রতম বিভিন্ন আকারে যুক্ত হয়েছে)। একমাত্র মুক্তি হচ্ছে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, যার ভিত্তি শ্রমের পবিত্রতার উপরে, আর আর সংঘটিত শ্রমিকদের সাম্যের উপরে, যেখানে সবাই সমাজের সেবক। আর এরই জন্যে আমাদের কাজ ক'রে যেতে হবে। আমি নিশ্চিত, আমি জানি, এটা আপনার চিন্তাও বটে! এটাকে জোর গলায় বলুন! ভারতবর্ষের চেয়েও এটা বেশি, গোটা জগতের মুক্তির ব্যাপার। আজ যখন আপনার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন, আপনিতো মানবতার সমগ্র কর্মক্ষেত্রটি আলিঙ্গন করতে ভালো করেই পারবেন…"

৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ভিলা অলগায় আমাদের খাবার ঘরে এসে মীরা বলল, ঠিক নয় বছর আগে এই ঘরটিতেই সে আমার কাছ থেকে পথের নির্দেশ পেয়েছিল, যা তার গোটা জীবনটাই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

নভেম্বর, ১৯৩৪। সি. এফ. এনড্রুজকে চিঠি লিখলাম (ইংলণ্ড থেকে লেখা তাঁর একটা প্রীতিপূর্ণ চিঠি সদ্য পেয়েছি) জোর দিয়ে বলার জন্যে, তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইটি যেন খুব খুঁটিয়ে পড়েন এবং প্রতিটি যুক্তির উত্তর দেন,—তাতে যেন কৈফিয়তের কোনো ব্যগ্রতা না থাকে, থাকে বস্তুগত নির্ভুলতা ও যথাযথতা। মীরাকে যার ইঙ্গিত দিয়েছি, সেই একই ব্যাপারে গান্ধীর উপর প্রভাব খাটাতেও তাঁকে অনুরোধ করলাম।

নিস্-এর এক বুদ্ধিমান থিওসফিস্ট ল্যুদোভিক রেও আমাকে সম্প্রতি ছাপা একটি বই পাঠিয়েছেন, লেখাটি কৃষ্ণমূর্তির উপরে। বইটি চমৎকার, প্রচুর তথ্য আছে, যথাযথ ও আন্তরিক। এরজন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম, এবং তাঁকে লিখে পাঠালাম (২২ শে নভেম্বর) যে, "তরুণ হিন্দু সাধুটির চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও মহত্ত্ব শ্রদ্ধা জাগায়। তাঁর এমন গভীর ভাবে ভারতীয় চিন্তার কথা বলতে গেলে, তা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তাঁর জীবন্ত 'সমগ্রতার' ধারণার জন্যে, যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে, এবং মুক্তির দৃষ্টান্তের জন্যে, যে মুক্তি মানুষকে তা উপহার দেয়। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে সে-ধারণা আমাকে তৃপ্ত করে না।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে (এবং আপনার কাছে), সামাজিক সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তির একটা সমস্যা। এটা বিমূর্তভাবে সত্য। এটা স্পষ্টই যে, ব্যক্তি যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, শক্তিশালী হয়, অকলুষ হয়ে ওঠে তাহলে আইনকানুন, কাঠামো, সরকার সব পাল্টে যাবে। কিন্তু আপনি ভালোই জানেন যে, বাস্তবে কৃষ্ণমূর্তি ও জগতের সমস্ত সাধুদের শিক্ষা কুলীন মন ছাড়া কখনো অন্য মনে ঢোকে না। আর সমাজ-ব্যবস্থা বদলাবার জন্যে এই শিক্ষা প্রয়োগ ক'রে 'ব্যক্তির' পরিবর্তনের উপরে যদি নির্ভর করতে হয়, তাহলে অনন্তকাল লেগে যাবে। কিন্তু দুঃখদুর্দশা তো বসে থাকবে না। অবিচারও বসে থাকবে না। তাদের বাঁচাতে হবে, যারা নিজেরা ডুবছে, এবং তাদের ছাড়াও বেশি ক'রে, যাদের ডোবানো হচ্ছে। আর আমরা বাধ্য তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে, ধাক্কাটা যেন অভব্যের মতোই হয়, যারা তাদের ডোবাচ্ছে। আপনি বলেছেন ঃ 'যেমন মালমসলা, বাড়ি তেমনই হবে।' এতো স্পষ্টই। কিন্তু এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে যে কোনো মূল্যেই একটা বাড়ী তৈরি করতে হবে—যারা নগ্নগাত্র, যারা শীতার্ত, ঝড়-বৃষ্টিতে তারা মাথা গুঁজবে। এই মাথা গোঁজাটা সাময়িক। চিরকাল এ টিঁকবে না, কিন্তু শুধু একটা দুর্যোগের ঋতুকালই যদি এ টিঁকে থাকে বা একটা পুরুষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে, যে হতভাগ্যদের এ বাঁচাবে, তাদের কাছে কি এ কিছুই না? বাছাইকরা, খাঁটি মালমসলা দিয়ে অনন্তকালের জন্যে তৈরি করাটা তো সুন্দর। আমি তো দেখি বিত্তশালী মনই তাতে হাত দিতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের দাবি দীনতম কুটির, কিন্তু সকলের জন্যেই, এবং বিনা বিলম্বে প্রবেশাধিকার। সাহায্য করতে হবে এখুনি, আর সেই সাহায্যের অধিকার পাবে তারা, যারা সবচেয়ে বঞ্চিত। যদি, এমনই এক প্রয়োজনীয় সাহায্যের কাজে, যথেষ্ট বিশুদ্ধ না-হওয়া ও মামুলি চিত্তের কর্মীদল এগিয়ে আসে, আমি তাদের সানন্দে গ্রহণ করবো, এবং তাদের বলবো ঃ 'ধন্যবাদ।' কৃষ্ণমূর্তি ভালোই বলেছেন ঃ 'যে সত্তা যন্ত্রণা ভোগ করছে, লড়াই করছে, যে সত্তা রাস্তায় হেঁটে চলেছে, তাকে শ্রদ্ধা করো! কিন্তু 'শ্রদ্ধা করায়' কিছুই হবে না, যদি না তার সঙ্গে যোগ করা যায় ঃ 'তাকে সাহায্য করো'। তার বোঝা হাল্কা করো, এবং তার লড়াইয়ের ভাগ নাও! আর ঈশ্বরে-বিনিষ্ট আন্তর জীবনকে অস্বীকার না ক'রেই তা পারা যায়। ঈশ্বর যদি সামগ্রিক জীবন হন, তাহলে তিনি কর্মও বটেন এবং তিনি সমস্ত জীবন্তের পক্ষে ও সমস্ত জীবন্তের জন্যে সংগ্রাম।"

ডিসেম্বর, ১৯৩৪। আমার চিঠি গান্ধীর হাতে পৌঁচেছে এবং মীরা তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছে। তিনি খুব মন দিয়ে তা শুনেছেন, আমাকে এজন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন, এবং ভাবছেন যে, ভালো হবে যদি খোলা-চিঠির আকারে এর উত্তর দেন, আর সেটা আমার চিঠির সঙ্গে ছাপা হয়।

তারপর, ভারতবর্ষের সংবাদে জানতে পারলাম যে, আমেদাবাদের সুতোকলের বড়ো বড়ো শিল্পপতি (লোকে বলতো, গান্ধীর নাকি সব বন্ধু) মাইনে কমাতে

চাওয়ায় শ্রমিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর গান্ধী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৩৫

১৩ জানুয়ারী, ১৯৩৫। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি এ. সি. চক্রবর্তীর (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী) আগমন। এই তরুণ ভারতীয়টি বর্তমানে এক বছর কি দু'বছর অক্সফোর্ডের বালিওল কলেজে আছেন; যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, যেসব ভারতীয় তরুণ 'জাঁ-ক্রিসতফ' সম্পর্কে তাঁদের সরলতামাখা উৎসাহের পরিচয় দিয়ে আমাকে চিঠি লিখতেন, তিনি তাঁদের প্রথম দিকের একজন। (তখন তিনি কিশোর ছিলেন।)—তিনি আন্তরিক ও চিন্তাশীল মনের পরিচয় দিলেন। ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে চূড়ান্ত নিপীড়ন চেপে বসেছে, তিনি তার কথা বললেন। কোনো স্বাধীন চিন্তার প্রকাশও আর সম্ভব নয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও তাঁর শেষের উপন্যাসগুলো (romans) ছাপার আর অধিকার (autorisé) নেই; তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে গেছেন। সামাজিক প্রশ্ন চক্রবর্তীর মন জুড়ে আছে। গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, চক্রবর্তী মনে করেন না যে, নতুন সামাজিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো প্রয়োজনীয় মানসিক তারুণ্য তাঁর আর আছে : তিনি তাঁর পর্ব সমাপ্ত করেছেন। এখন এক নতুন পুরুষের উপরে আরও দূরে এগিয়ে যাবার ভার। আর তার নেতা হিসেবে তিনি দেখেন জহরলাল নেহেরুকে। ভারতবর্ষে এই মানুষটিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন; আর মনে হয়, ইতিমধ্যেই জনসাধারণের উপরে নেহেরুর বিরাট প্রভাব পড়েছে। কিন্তু ইংলন্ড তা ভালো করেই জানে, তাঁকে তাই জেলে আটকে রেখেছে। চক্রবর্তী সম্প্রতি জেলের মধ্যে তাঁকে দেখে এসেছেন। আমি যতটা আশংকা করেছিলাম, তাঁর স্বাস্থ্য ততটা ভাঙেনি : তাঁর সম্পর্কে নজর দেওয়া হয়। কিন্তু নেহেরুর বড়োই কষ্ট স্বাধীনতার অভাবের জন্যে, এবং গুরুতর অসুস্থ, প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্যেও। তাঁকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে এই শর্তে যে, একবছর তিনি আর রাজনীতি করতে পারবেন না। তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন; তাঁর স্ত্রীই বলেছেন : "আমার স্বামী যদি এই মূল্যে আমাকে দেখতে আসার স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেন, আমার পক্ষে সেটা হবে মৃত্যু।" নেহেরুর পরেই ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপরে যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রভাব, তিনি পাঠান নেতা, অহিংসার দূত আব্দুল-গফ্ফর খান। দু'এক মাস কাজকর্ম থেকে মুক্ত ছিলেন, পরে আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর লোকজনের সঙ্গে দেখা করার সময় পেয়েছিলেন; তাঁদের তিনি তাঁর প্রশান্তি ও অচঞ্চলতা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে গেছেন। পেশোয়ার অঞ্চলে ইংরেজরা অহিংস আন্দোলনে যে বর্বর নিপীড়ন চালিয়েছে তার ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলী তিনি বর্ণনা ক'রে গেছেন; তিনি সেসবের সাক্ষী। সৈন্যরা লোকের উপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। মেসিনগান দিয়ে নারী ও শিশুর দলকে কচুকাটা করা হয়েছে। সৎকার না ক'রে মৃতদেহগুলো রাস্তায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। আব্দুল গফ্ফর খান রাজ-

প্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। "আপনারা কী মনে করেছেন?" "আমরা এখানে আদর্শের বাণী ছড়াতে আসিনি। আমরা এসেছি সরকার চালাতে।" আব্দুল গফ্‌ফর খান এক অস্বস্তিকর সাক্ষী, তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা দরকার। গান্ধী যে গ্রাম্য কুটিরশিল্প গড়ে তুলছিলেন, তাঁর গ্রেপ্তারে নিদারুণ বিরক্তি ও ঘৃণায় সেসব অরাজনৈতিক কাজকর্ম অনিচ্ছাসত্ত্বে মুলতুবি রেখেছেন; এবং কী ঘটছে না-ঘটছে, তা জানার জন্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঢুকে পড়ার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ঢোকার অধিকার দেওয়া হয়নি। তাই এ নিশ্চিত যে, তার আগেই গান্ধী আবার গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন কয়েক বছরের জন্যে। মনে হয়, সমাজতন্ত্রের ভাবধারা অতি দ্রুত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। নেহেরু কমিউনিজমের খুবই কাছাকাছি (কিন্তু সে-কমিউনিজম ভারতীয় অহিংস চেহারার)। কমিউনিজম বলতে ঠিক ঠিক যা বোঝায় (মস্কোর জিনিস), তা ভারতবর্ষে শক্ত শেকড় গাড়তে পেরেছে ব'লে মনে হয় না, বিশিষ্ট নেতাদের পেয়েছে বলেও মনে হয় না। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন, জিজ্ঞেস করায়, চক্রবর্তী দ্বিধার সঙ্গে উত্তর দিলেন, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে কিছু অস্বস্তিকর জিনিস আছে: বাংলাদেশে যখন কোনো স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নেই, যখন তা সম্ভবও নয়, তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াতে পারেন, বলতে পারেন, ছাপতে পারেন, কর্তৃপক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ করে না। তবুও আমি তাঁকে সন্দেহ করতে পারছি না। তাঁর সততা আমার কাছে তর্কাতীত ব'লে মনে হয়। কিন্তু এটা সম্ভব যে, গান্ধীকে হেয় করার জন্যে – এবং একই সময়ে তাঁর নিজের পার্টির উপরে সন্দেহ ফেলার জন্যে পুলিশ তাঁকে (অজান্তে) কাজে লাগাচ্ছে।

চক্রবর্তী ইতালি থেকে আসছেন সেখানে মুসোলিনির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে; ভারতীয়দের ইতালিতে টেনে আনার জন্যে মুসোলিনি ভারতবিদ্যার একটা ইনস্টিটিউট খাড়া করেছেন, কিছুমাত্র মূল্য আছে এমন কোনো ভারতীয়কে তাঁর কাছে এত্তেলা না দিয়ে তিনি রোম ছেড়ে যেতে দেন না। ভারতবর্ষে কী ঘটছে না ঘটছে তার সবকিছুর খবর তিনি পুরোপুরি রাখেন। এটা স্পষ্টই যে, ইতালি প্রাচ্যে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী হবার জন্যে তোড়জোড় করছে।

ফ্লোরেন্সে পাপিনির সঙ্গে চক্রবর্তী দেখা করেছেন। তিনি অত্যন্ত মনমরা হয়ে আছেন: তিনি দেখতে পাচ্ছেন মুসোলিনি ও ভ্যাটিকানের মধ্যে শত্রুতা বাড়ছে; এবং তিনি মনে করেন যে, মুসোলিনিই ভ্যাটিকানের উপরে কর্তৃত্ব করবেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫। (মুসোলিনির সঙ্গে পিয়ের সেরেজোলের সাক্ষাৎকারের পরিশিষ্ট-টিকা।)

৩০ মে, ১৯৩৪ তারিখের পাটনা থেকে লেখা একটা চিঠিতে সেরেজোল বর্ণনা করেছিলেন ভারতবর্ষে তিনি কেমন ক'রে মুসোলিনির কথা বলতে শুনেছিলেন।

পাটনায় পণ্ডিত মালব্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল; তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, গান্ধীর পরেই ভারতবর্ষে অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি; এক বিরাট

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, যিনি সবচেয়ে সেকেলে হিন্দু বিশ্বাস (বারাণসীর গঙ্গার পাড়ে তিনি ধর্ম সম্পর্কে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন) ও সবচেয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনকে (বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে তিনি সবচেয়ে নিখুঁত যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন) যুক্ত করতে সমর্থ। বিদায় নেবার সময়, মালব্য সেরেজোলকে বলেছিলেন: "যখন মুসোলিনির সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তাঁকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি (hommage) দেবেন, এবং আমার মুগ্ধ প্রশংসার (admiration) কথা জানাবেন।"

আর, তাঁর সেক্রেটারি, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রাহ্মণ সুন্দরম সেরেজোলের সঙ্গে দিন কয়েক কাটানোর সময় টুকরোটাকরা ভাবে মুসোলিনির পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের খুচরো-খাচরা শুনিয়েছিলেন।

"অনুরাধাপুরের (সিংহল) বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের নীচে বসে তিনি তখন ধ্যান করছিলেন; বুদ্ধের ধ্যানের সময় গয়ায় যে আদি বোধিবৃক্ষটি আচ্ছাদন দিয়েছিল, এটি তারই অবশিষ্ট।···ঠিক এমন সময়ে এসে থামল একটা মোটরগাড়ি। তা থেকে নামলেন এক তরুণী, তিনি তাঁকে সম্বোধন করলেন ইংরেজিতে। তিনিই কুমারী মুসোলিনি। পরে সুন্দরম ইতালিতে গিয়েছিলেন; মুসোলিনি-পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন···আর টুকরো টুকরো ক'রে, যেন দুঃখের সঙ্গে বলা, এই কাহিনী শেষ হবার অনেক পরে, সুন্দরম আমাকে একখানা বই এনে দেখালেন: 'আমার আত্মজীবনী - বেনিতো মুসোলিনি'। সঙ্গ ইংরেজিতে এই উৎসর্গ-বাণী:

'আমার জীবনের প্রতিটি ঘণ্টায় আধ্যাত্মিক মুহূর্তই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যায়' —মুসোলিনি। রোম, ২২ জুলাই, ১৯৩১ মুসোলিনি অব্দ ৯।

'সুন্দরমকে বন্ধুত্বের সঙ্গে।'

বিদায় নেবার সময় মুসোলিনি ও সুন্দরম পরস্পর আলিঙ্গন করেছিলেন।"

এই কাহিনী ও মালব্যের অনুরোধের পরই ২৩ অক্টোবর, ৯৩৪ তারিখে সেরেজোল মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন--

কিন্তু দেখা গেল যে, সেরোজোল মনে করিয়ে দিলেও এ প্রসঙ্গে একটা কথা না-ব'লে মুসোলিনি সুন্দরমের নামটা বাদ দিয়ে গেলেন। এই সাবধানতা সুন্দরমের সাবধানতার সঙ্গে মিলে যায়, সুন্দরম শুধু তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কাহিনীটি বলেছিলেন ব'লে মনে হয়। (অন্যদিকে, সেরোজোল বলেন, তিনি 'দার্শনিক হলেও বকেন বেশি"।) তাহলে এই হবে যে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎকারের চরিত্রটা আধ্যাত্মিক অন্তরঙ্গতা গোছের, যাকে কলুষিত করাটা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। মানুষ এক অদ্ভুত জীব! কেবলমাত্র তার নীচ ছলাকলারই অভিযোগ করি! মানুষ সমস্ত বৈসাদৃশ্যের আধার হতে পারে।

এই ঘটনাবলীতে ফিরে আসাটা একটা রাষ্ট্রপ্রধানের মানহানি করা নয়, বরং হাতে-পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারায় মুন্সিয়ানা আরোপ করা, যে-সুযোগ তিনি পেয়েছেন—ভারতবর্ষের উপরে যাঁর ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী (পন্ডিত মালব্য), জাতীয়তাবাদী নেতাদের এমন এক জনের আস্থা অর্জন করতে, এবং তাঁকে তাঁর

হাতিয়ার, ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ট ইতালির প্রচারের মুখ্য প্রতিনিধি ক'রে তুলতে। এদিক থেকে দেখলে, দু'পক্ষের বজায়-রাখা চূড়ান্ত সাবধানতার ব্যাখ্যা হয়। সাবধানতার কড়াকড়ি তো হবেই। কিন্তু ব্যাপারটায় এই রকম একটা অত্যন্ত স্থূল রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে থাকবে।

প্রসঙ্গক্রমে, লিখে রাখার মতো হচ্ছে, মুসোলিনির নমনীয়তা, এবং অন্য কোনো ব্যাপারের স্বার্থে তাঁকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা, যদি কেউ সেই সূক্ষ্ম জায়গাটিতে ঘা দিতে জানে: যেমন তাঁর আত্মশ্লাঘায়। এই ভাবেই, গ্রামশ্চির* উপরে লেখা আমার যে-পুস্তিকায় মুসোলিনি সম্পর্কে কঠোর কথা বলতে বলতে, তাঁর বুদ্ধিমত্তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম (হিটলারের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে) এবং সন্দেহজনক ব'লে মনে হওয়া, তাঁর 'মহানুভবতাকে' মুচড়ে দিয়েছিলাম,—তার ফল হয়েছিল গ্রামশ্চির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'কারামুক্তি'।

এই ফলটিকে আমি নিজের উপরে আরোপ করতাম না। যদি এই ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে 'কমিতাতো সেন্ত্রালে দেই পাত্রোনাতি ইতালিয়ানি' (সেকুর রুজ অ্যাঁতরনাশিঅঁনাল) এর কথা আমাকে না জানাতেন। বিপ্লবীদের বেশির ভাগ প্রচারের ত্রুটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের অভাব। যদি তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রকৃত চরিত্রটির বেশি ক'রে হিসেব রাখে, তাহলে কোনো আপস না ক'রেই তারা তাদের স্বার্থের জন্যে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করতে পারে।

মার্চ, ১৯৩৫। রাজারাও এ. এন. কৃষ্ণরাও নামে এক ভারতীয় লেখকের অনুরোধ আমাকে পাঠিয়েছেন; তিনি ভারতীয় 'কানাড়ী' ভাষায় 'জাঁ-ক্রিসতফ' তর্জমা করতে চান (বা অত্যন্ত নির্বাচিত অংশ)। তিনি আমাকে এও লিখেছিলেন যে, 'য়ুরোপ' পত্রিকায় 'আমার সংগ্রামের পনরো বছর'-এর*** মুখবন্ধ প্রবন্ধগুলো পড়ে যাচ্ছেন, এবং 'জল আর আগুন' ভারতবর্ষের চিন্তা আর সোভিয়েত রাশিয়ার চিন্তার গাটছড়া বেঁধে দেবার আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে**, এ যেন মোটেই না ভাবি: একটা জোরালো সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতন্ত্রের পূর্বগামী আন্দোলন ভারতবর্ষকে গড়েপিটে তুলেছে, এবং এটাই সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠবে 'গোঁড়ামি' (ইঙ্গিত হচ্ছে মহাত্মার) ও জহরলাল নেহেরুর দুর্বলতা সত্ত্বেও; অবশ্য জহরলালই এই আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন।

---

* 'মুসোলিনির জেলখানায় যারা মরছেন তাঁদের উদ্দেশে: আন্তোনিও গ্রামশ্চি।' (দ্রষ্টব্য 'শিল্পীর নবজন্ম', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২-১৯২। —অনু.

**দুই খণ্ডে প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ *I Will Not Rest*, অনুবাদক কে. এস. শেলভাংকার। বাংলা অনুবাদ 'শিল্পীর নবজন্ম'। —অনু

***রলাঁ লিখেছিলেন:

" ভারতের সহিত মস্কোর, আগুনের সহিত জলের মিলন সাধনের আপাত বিপরীত কাজে আমি আত্মনিয়োগ করিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগ্রামকালীন সাম্যবাদ এবং গান্ধীর নেতৃত্বে

আমি তাঁকে উত্তরে লিখলাম (২৬ মার্চ):

"ভারতবর্ষের চেহারা ঠিক ঠিক যা, তার সমস্ত ক্ষেত্রেই, মার্ক্সীয় ভাবধারা যে আপনাদের দেশের সামাজিক বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারছে না, এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। আমার দুঃখ এই যে, অন্ধ সংস্কার অথবা যুক্তিভিত্তিকের চেয়ে বেশি আবেগচালিত মানসিক পক্ষপাতের জন্যেই গান্ধী এই সম্পর্কে নিজেকে আটকে রাখেন, এবং কলমের এক খোঁচায় একেবারে বরবাদ করার বদলে—যেমনটি তিনি করেছেন 'য়ুরোপ' পত্রিকার ১৫ই মার্চের সংখ্যায় তাঁর 'কংগ্রেসের প্রতি বক্তব্যে'—সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত ও কর্মগত বিপুল শিক্ষাকে কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখাটা অপরিহার্য ক'রে তোলেন না। তাঁর সামাজিক চিন্তার ভিত্‌ হচ্ছে এক অন্তর্গূঢ় ধর্মীয় বিশ্বাস, তা নিঃসন্দেহে খাঁটি এবং উচ্চ মার্গের, কিন্তু তা নতুন দিগন্তের অভিমুখে এগিয়ে-চলা মানবতাকে আলিঙ্গন করার মতো তেমন প্রসারিত নয়। তারই সঙ্গে তাঁকে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, নয়তো, পেছনে পড়ে থাকতে হবে। মহাত্মার হাঁটুর জোর আছে, আমি সব সময়ে এইটি দেখারই আশা করবো যে, তিনি তাঁর সেকেলে-হয়ে-যাওয়া আসন ছেড়ে উঠবেন এবং অগ্রবাহিনীকে ধরে ফেলবেন।'

ভারতীয় 'কানাড়ী' ভাষায় 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ' অনুবাদ করেছেন বাঙ্গালোরের এ. এন. কৃষ্ণরাও।

এপ্রিল, ১৯৩৫। সুভাষচন্দ্র বসু এসেছেন; তিনি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, কংগ্রেসের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী পক্ষের অন্যতম নেতা, বছর ছয়-আট জেল খেটেছেন, বর্তমানে ইউরোপে আটকে আছেন, স্বাস্থ্যের জন্যে এবং ভারতবর্ষে ফেরাটা কার্যকর হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠার জন্যে। মানুষটি এখনও তরুণ, ভাবভঙ্গি বিশেষ ক'রে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং চিন্তামগ্ন, কপালে চিন্তার রেখা কদাচিৎ মিলিয়ে যায়। তিনি বুদ্ধিমান, সে-বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছেন ভারতবর্ষের গত দশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে ইংরেজিতে লেখা তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত বইতে। বইটিতে তিনি

সংগঠিত ও পরিচালিত অহিংস অবাধ্যতা (আইন অমান্য আন্দোলন) একই বিপ্লবের দুইটি বিরাট ডানা হিসাবেই আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। আমি চাহিয়াছিলাম ডানা দুইটি যেন পরস্পরের সহিত সহযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে। এ প্রচেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়াছে এবং ব্যর্থতায় আমি বিস্মিত হই নাই। এ ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী. কারণ যে দুইটি মতবাদকে আমি মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারা আপোষ জানিত না, প্রত্যেকটিই নিজেকে সত্যের একমাত্র ধারক ও বাহক হিসাবে মনে করিত এবং অপর মতবাদের সত্যকে শত্রু বিবেচনা করিত।.. গান্ধীপন্থী ভারতবর্ষের ও সোভিয়েট ইউনিয়নের দুইটি মতবাদ ছিল আমার কাছে দুইটি বৃহত্তম প্রবলতম পরীক্ষা—যে দুইটি পরীক্ষা আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে মানুষের পৃথিবীকে টানিয়া আনিতে পারে।... এই মিলনের চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু এই চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত নই।' 'শিল্পীর নবজন্ম,'—অনুবাদ সরোজকুমার দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৪, ১ম সং। —অনু.

খাঁটি রাষ্ট্রনীতিবিদের দৃষ্টি এবং বিস্ময়কর বস্তুনিষ্ঠ প্রচেষ্টা নিয়ে ঘটনাবলী ও ব্যক্তিদের বিচার করেছেন, যদিও তিনি গোপন রাখেননি কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে কী তাঁকে আলাদা করেছে। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তাঁর মতে গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অচল অবস্থায় পেঁাছে গেছে, ভারতবর্ষ যদি সামনে এগুতে চায় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেঁাছুতে চায়, তাহলে এখন গান্ধীর নেতৃত্ব থেকে তাকে আলাদা হতেই হবে। তাঁর কথা অনুসারে অহিংস বেসামরিক প্রতিরোধের কৌশল নিশ্চিত ভাবে চড়ায় আটকেছে। যদি তা ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র ও সরকারী কাজকর্ম পুরোপুরি বিপর্যস্ত ক'রে দিতে পারতো, একমাত্র তাহলেই তা সফল হতে পারতো। যার ঘোষণা সে করেছিল, সেই বিদেশী পণ্য-বয়কট পুরোপুরি সম্ভব করতে পারেনি। গান্ধী যে-আন্দোলন পরিচালনা করেন, তা শেষপর্যন্ত তিনি নিয়ে যেতে রাজী হন না। কখনো তিনি অনুবর্তীদের জোর-খাটানোর অধিকার দেননি; তখনকার মতো দরকারী বেসামরিক প্রতিরোধের কোনো জোর-খাটানো নীতির (dictature) প্রয়োগ করতে বা করতে দিতে, গান্ধী কখনো চাননি, যা কঠোর দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে দ্বিধাগ্রস্তদের, স্বার্থসম্পন্নদের, বিলিতি মাল বয়কটে গররাজী ব্যবসাদারদের ভয় জাগাতে পারতো। অন্যদিকে ইংরেজেরা বেসামরিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, উদ্বেগের সঙ্গেই, দীর্ঘকাল পথ হাতড়ে বেড়াবার পর, একে বানচাল করার আসল ফন্দিটা বার ক'রে ফেলেছে। কয়েক বছর আগেও যেমন হাজার হাজার ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হতো, (সমস্ত জেলখানা বোঝাই হয়ে যেতো, মনে হতো শাস্তির পালা শেষই হবে না) এখন আর তা করছে না। ভারতীয় কার্যকলাপের যাঁরা আত্মস্বরূপ—সেই একমাত্র নেতাদের—জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসুদেরই গ্রেপ্তার ক'রে রাখছে। আর সামান্যতম আন্দোলনও বলপ্রয়োগ ক'রে দমন করছে। গান্ধীবাদীদের অহিংস অ-প্রতিরোধ তাদের আশ্বস্ত করেছে। তারা জানে, সেদিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই। এমনকি পার্লামেন্টের অন্যতম সমাজতন্ত্রী নেতা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন ওয়েজউড-বেনও সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণনকে বলেছেন: 'যখন দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়রা আমাদের তাড়াতে অসমর্থ, তখন আমরাই বা ছেড়ে আসতে যাবো কেন?' সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সুভাষচন্দ্র বসু অনুমোদন করতে অস্বীকার ক'রেও বললেন যে, অবশ্য একমাত্র ওরাই ভারতবর্ষে ইংরেজদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলতে পেরেছে; যদিও ওরা সংখ্যায় খুব কম এবং বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ, ওদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল গভীর হয়ে উঠেছিল। এমনকি জেলখানায় ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও তাঁর কাছে তা স্বীকার করেছেন। এবং তিনি মনে করেন যে, এই কৌশল যদি গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তো এতেই বৃটিশ নিস্পৃহতাকে কাবু করতে পারতো। কিন্তু আরও একবার, তিনি জানালেন যে সন্ত্রাসবাদকে তিনি সুস্থ রাজনৈতিক পদ্ধতি ব'লে মনে করেন না এবং তিনি সংগঠিত প্রতিরোধের পক্ষে, তাতে হিংসাকে বর্জন করা হবে না, এবং লড়াইতে তার ব্যবহারে তিনি মন ঠিক ক'রে ফেলেছেন। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, এই

লড়াইতে জনসাধারণকে আগ্রহী ক'রে তোলা। দেশের সমস্ত দল ও সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে গান্ধীর জনপ্রিয়তা প্রচন্ড। কিন্তু তিনি তা কোনো ফলপ্রদ কাজে লাগান না। গত ১৫ বছর ধরে, ভারতীয় জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে, এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমঝোতা সৃষ্টি করতে তিনি যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অপরিমেয়। কিন্তু স্বভাবে তিনি মধ্যপন্থার মানুষ, চরম বিরোধীদের মধ্যে, শ্রেণীগুলোর মধ্যে, দলগুলোর মধ্যে চিরকাল তিনি আপসের চেষ্টা ক'রে আসছেন। আর এইজন্যেই, তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্তরিক ভাবে লড়াই করেন, এবং আবার একই সঙ্গে বর্ণভেদকে সমর্থন করেন। শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি আগ্রহী, কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে বাধা দেন। যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি আর খোলাখুলি লড়ছেন না, কিন্তু গ্রামে গ্রামে তাঁর নিজের কুটিরশিল্পের (চরকার) ব্যবস্থার দিকে সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, এতে কার্যত, যে লাভ হতে পারে তা অকিঞ্চিৎকরই, এবং এ যৌথ শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় বিরাট আন্দোলনগুলোকে ভিন্নমুখী ক'রে দিচ্ছে। সামনে এগিয়ে যেতে গেলে সর্বত্র তিনি রাশ টেনে ধরেন। বিশেষ ক'রে, ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অর্থনৈতিক প্রশ্নে জোর দেওয়াটা তিনি চিরকাল সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, তাতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ ঘটে। এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতে, সমাজতন্ত্রী পার্টিকে এইটের উপরেই জোর দিতে হবে, যদি সে জনসাধারণের উপরে সত্যিই কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তাঁদের শেখাতে-বোঝাতে হবে, তাদের শ্রেণীগত দাবি সমর্থন করতে হবে, চাষীকে জমির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রচার গড়ে তুলতে হবে। এবং তা আরও বেশি ক'রে করতে হবে এইজন্যে যে, গ্রামাঞ্চলই একমাত্র ক্ষেত্র যার মাধ্যমে সৈন্যদলের কাছে পৌঁছনো যায়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চল থেকেই ভারতীয় বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, আর সৈন্যরা যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সেই পরিবেশে মনোযোগ না-দিলে তাদের মানসিকতা পাল্টানো সম্ভব নয়। গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র যুদ্ধে, বর্তমানে ও বহু দিনের জন্যে, ভারতবর্ষের যে প্রচন্ড দুর্বলতা—তা কিন্তু সুভাষচন্দ্র লুকোলেন না। আর অতি-সরল ভাবে তিনি এটাও গোপন রাখলেন না যে, তাঁর আশা আছে এক ইউরোপীয় যুদ্ধের, যা ইংলন্ডকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ভারতবর্ষের বিজয়ের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে পারে। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, এমন কামনা না-করার অন্য যুক্তি আমাদের আছে, তখন তিনি নিরাশ হলেন। (বড়োই সরল!)

…বিশেষ ক'রে যে জন্যে তিনি এসেছেন ব'লে মনে হয়, তা হচ্ছে আমার অভিমত জানতে (ভারতবর্ষে আমার অভিমতের যে মূল্য দেওয়া হয় তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই) এবং হিংসাত্মক পন্থাকে বাতিল না ক'রে ভারতীয়রা কোনো স্বাধীনতার অভিযান শুরু করলে—সে-ক্ষেত্রে আমি তাঁদের সমর্থন করবো, কি করবো না। আমি প্রকাশ্যভাবে তাদের থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে নিতে পারি ব'লে তাঁরা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। জানি না কোন ফরাসী বন্ধুরা, সম্ভবত খুব ভালো মনেই, কিন্তু আমার হয়ে বলার পক্ষে তাঁরা নিঃসন্দেহে কম যোগ্য, বসুকে জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমি

নাকি আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাবো না, যদি ভারতবর্ষ গান্ধীবাদী কর্মনীতি মান্য করা থেকে সরে আসে। আমি তার উল্টোটাই বললাম। আর, বিপ্লব, হিংসা ও অহিংসার বিতর্কের পটভূমিকায় আমি যে মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি এবং আমার নতুন বই "সংগ্রামের পনরো বছর"-এ যার ভাষ্য করেছি, অন্যের মাধ্যমে তা তাঁকে তর্জমা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলাম (কারণ তিনি শুধু ইংরেজিই বলতে ও বুঝতে পারেন।) গান্ধীর মহান্ আত্মার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বজায় রেখেও (আর এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আমার সঙ্গে এক মত) বলবো, আমি তাঁর মতবাদের সঙ্গে কোনো মতেই নিজেকেই বেঁধে রাখিনি, আমার চোখে তাঁর মতবাদ একটা বিরাট পরীক্ষা মাত্র। অপর্যাপ্ত বা নঞর্থক ফল সত্ত্বেও, গান্ধী যদি এ আঁকড়ে ধরে থাকেন, বিশেষ ক'রে, যদি শ্রমিক ও মালিকের অবশ্যম্ভাবী লড়াইতে তিনি বিনা আপসে, ভেবেচিন্তে শ্রমিকের পক্ষ না নেন, তাহলে আমি শ্রমিকের সঙ্গেই যাবো, তাতে যদি তাঁর বিরুদ্ধেও যেতে হয়। এটা আমি কখনো গোপন করিনি।

তাছাড়া, আমার মনে হলো না যে, সুভাষচন্দ্র (গান্ধীর অপরাপর বিরুদ্ধবাদীদের মতোই) গান্ধীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং আগে থেকেই তাঁকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে খুব বেশি উদ্‌গ্রীব। (গান্ধীর সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচনায় বা লেখায় যা কিছু তাঁর সামাজিক চিন্তার লক্ষণীয় বিবর্তন সূচিত করে, তা গান্ধী-বিরোধীরা দেখেও দেখেন না, এটা আমি প্রথম লক্ষ্য করছি না। বড়োই দুঃখের কথা যে, আমার জাতের ও আমার মতো নৈতিক বৈশিষ্ট্যের, মানুষ ভারতবর্ষে নেই। আমি হলে কখনোই গান্ধীকে সমাজ-বিপ্লবের পথে টেনে আনার আশা হারাতাম না, একমাত্র কিন্তু থাকতো শুধু অহিংসার প্রশ্নে, কারণ অহিংসাকে তিনি ছাড়বেন না। সুভাষচন্দ্রের মতো মানুষকে যদিও নিজে মুখে স্বীকার করতে হয় যে, গান্ধীকে তাঁদের এবং তাঁদের স্বার্থের পক্ষে পাওয়াটা এক বিরাট সাফল্য, আমি কিন্তু মনে করি না যে, গান্ধীকে তাঁদের দিকে পাওয়ায় তাঁদের খুব বেশী আগ্রহ : তাঁদের সবসময়েই নিজেদের "ছোটো" মনে হবে। সম্ভবত জহরলালের ক্ষেত্রে এই রকম ব্যাপারই ঘটেছে : ভাবধারায় তিনি অনেক দূরে, কমিউনিজমের চৌকাট যদি নাও পেরিয়ে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি তাঁর পুত্রোচিত শ্রদ্ধা কর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে ভীরু ও অনিশ্চিত ক'রে তুলেছে।)

যে সবকিছু নিয়ে মাথা ঘামান, তা থেকে মনে হলো, সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমের সীমারেখায় (a' la limite) পৌঁচেছেন ; কিন্তু কমিউনিজম সম্পর্কে কোনো কথাই তিনি শুনতে চান না। সম্ভবত, তাঁর এই বিরাগের পেছনে আছে কিছু ব্যক্তিগত কারণ, সম্ভবত তা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান প্রতিনিধিদের সম্পর্কে। কারণ তিনি জানিয়ে দিলেন, সোভিয়েত রাশিয়া ভারতবর্ষকে সাহায্য করলেও তাতে অবশ্যই তিনি কোনো খারাপ কিছু দেখবেন না ; আর বিশেষ করে রাশিয়ার প্রতি তাঁর অভিযোগ এই যে, জাতীয় স্বার্থের রাজনীতি করতে গিয়ে সে আজ বিশ্ববিপ্লবের আগ্রহ হারাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে।

এপ্রিল, ১৯৩৫। 'য়ুরোপ' পত্রিকায় ১৫ মার্চের সংখ্যায় ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর

মাসের 'বোম্বাই কংগ্রেসে গান্ধীর ভাষণ' ছাপা হয়েছিল ; সেই ভাষণে তিনি সমাজতন্ত্রকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। এই মনোভাবে প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে আমার বোনকে একথা প্রকাশ করেছিলাম, সেও আমার দুঃখের ভাগীদার ; সে প্যারেলালকে লিখেছিল এসব জানাতে এবং এসব গান্ধীর গোচরে আনতে। গান্ধী কুটির-শিল্প গড়ে তুলতে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, তারই এক ফাঁকে তাড়াহুড়ি উত্তর দিয়েছেন :

"প্রিয় মাদলেন,—প্যারেলালকে লেখা আপনার চিঠিটা পড়লাম। ভগবানের কৃপায়, আমি মৌনব্রত পালন ক'রে চলেছি, আর তাই সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারলাম। হ্যাঁ, ঋষির দীর্ঘ চিঠিটার একটা সম্পূর্ণ উত্তর আমার কাছে পাওনা আছে। কিন্তু এই "সম্পূর্ণ" বিশেষণটিকেই আমার ভয়। আমার হাতে এমন একটা চিঠি লেখার সময় নেই, যাতে ওই চিঠির প্রতি যথোচিত সুবিচার হয়। তা করার চেষ্টা করবো মৌনব্রতের এই দিনগুলোর মধ্যে। আপনার প্রশ্নটি সরল। আমার বিরোধিতা সেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যে-ধরনের সমাজতন্ত্র এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দলীয় কর্মসূচিতে। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বা দর্শনের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। কর্মসূচিটি যেমন ভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে হিংসা ছাড়া তা সমাধা হওয়া সম্ভব নয়। যে পরিস্থিতিই হোক্ না কেন, এখানকার সমাজতন্ত্রীরা হিংসাকে বাদ দিয়ে রাখেন না। যদি তাঁরা দেখেন যে, হিংসার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত করার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তাঁরা খোলাখুলিই হয়তো অস্ত্র ধরবেন। কর্মসূচিতে আরও খুঁটিনাটি যা আছে, তার মধ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। আপনাদের বোঝার যে, অসুবিধা, এতে তার উত্তর হলো কি না বুঝতে পারছি না। যদি না হয়ে থাকে, আরও যথাযথ স্পষ্টাকারে আপনাদের অসুবিধা আমাকে লিখে জানাতে হবে। আপনাদের দু'জনের প্রতি ভালবাসা।

ওয়ার্ধা, ২৮/৩/৩৫। বাপু।"

(গান্ধীর একথার আগেই আমার যন্ত্রস্থ 'বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি' ['*Par la Révolution la Paix*'] বইটির ৭৪ পৃষ্ঠায় পাদটিকা* দিয়েছি। তাতে দেখতে পাওয়া যাবে, সমাজতন্ত্রের প্রতি গান্ধীর বিরোধিতার গভীর কারণগুলো আমি ধরতে পেরেছি…)

---

* পাদটিকাটি এই : "এই সময় থেকে ('এদম' প্রিভাকে লেখা চিঠি' পৃঃ ২৯০ দ্রষ্টব্য.) পরিস্থিতির কিছুটা অদলবদল হয়েছে মনে হয়। এবং মনে হয়, মালিকদের বিরুদ্ধে আমেদাবাদের শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলো (১৯৩১) সমর্থন করেছেন। সমাজতন্ত্রবাদ মেনে নিতেই শুধু গান্ধীর আপত্তি নয়, তা নিয়ে পড়াশোনাতেও আপত্তি। (বোম্বাই কংগ্রেসে ভাষণ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) তাঁর চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করানোর (conciliation) মনোবৃত্তি, সেই মনোবৃত্তির জন্যেই বর্তমানে তিনি একবার এপক্ষের দিকে যাচ্ছেন, আর একবার ওপক্ষের দিকে যাচ্ছেন অথচ বর্তমানে প্রয়োজন হচ্ছে পক্ষ নেবার : কারণ পক্ষ নিতে ইতস্তত করলে সামাজিক সংঘাতে তা মারাত্মক ভাবে শোষিতদের বিরুদ্ধে :শোষকদের অনুকূলে চলে যাবে। মূলত, দুই পক্ষের মধ্যেকার গান্ধীর এই মনোভাবের জন্ম অহিংসায় গভীর অন্তর্গূঢ় বিশ্বাস থেকে, সেই বিশ্বাস আগে থেকেই এক ধর্মীয় কল্পনাকে (conception religieuse) স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সে-কল্পনা যতো বিশুদ্ধই হোক না কেন, তাতে তাঁর দৃষ্টির স্বাধীনতাই ব্যাহত হচ্ছে। সামাজিক পরীক্ষা চিরকালই খোলাখেলা, চিরকালই এগিয়ে চলেছে। মনোভাবের কোনো পক্ষপাতিত্বের, কোনো অন্তর্গূঢ় বিশ্বাসের অধীন তা হতে পারে না।

এপ্রিল, ১৯৩৫। আমাদের আলোচনার যে বিবরণ সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, সেটি আমাকে পাঠিয়েছেন, এবং সেটি তিনি ছাপতে চান। তাঁর বিবরণ মোটামুটি বেশ যথাযথ; তিনি শুধু সরলীকৃত ক'রে ফেলেছেন এবং আমার উত্তরগুলো প্রায় শূন্যে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রশ্নকর্তা, কিন্তু এটা হচ্ছে কেউ কারুর ভাষা না-জানা দুই আলাপকারীর, তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে আলোচনার ফল। প্রত্যক্ষতার ছাপটি ভীষণভাবে ভোঁতা হয়ে গেছে।

দুটি বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি (২৭ এপ্রিলের চিঠিতে) সংশোধন ক'রে দিলাম:

"১. আপনি বলেছেন, গান্ধী এবং ভারতবর্ষের 'ইয়াংগার জেনারেশনের' মধ্যে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে আমি যুবকদের পক্ষেই থাকবো। এটা আমি ঠিক এই ভাবে বলিনি, আমার কাছে এটা মোটেই দুই পুরুষের (deux générations) মধ্যে বা দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে পক্ষ বাছাবাছির প্রশ্ন নয় (আর, তাছাড়া, আপনার বিবরণে তাদের যথাযথ সংজ্ঞাও দেওয়া হয়নি: তাদের কী নাম—'যুবক,' সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, নির্দলীয় র‍্যাডিক্যাল, ইত্যাদি?) না! আমার কাছে প্রশ্নটা অনেক বড়ো। প্রশ্নটি জগতের শ্রমশক্তির স্বার্থের ব্যাপার নিয়ে। আমি স্পষ্ট ক'রে বলছি: যদি ঘটনাবলীর এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটে যে, গান্ধী (বা অন্য কোনো দল) শ্রমিকের ও মজুরের স্বার্থের এবং সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার অভিমুখীন তাদের প্রয়োজনীয় বিবর্তনের বিরোধিতায় নামছেন, গান্ধী (বা অন্য দল) তাতে আগ্রহ হারাচ্ছেন, এবং তা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখছেন, আমি সব সময়ই চলবো শ্রমিকের জগতের সঙ্গে, আমি তার প্রচেষ্টা ও তার লড়াইয়ে নিজেকে যুক্ত করবো: কারণ তার দিকেই রয়েছে সত্যিকারের সুবিচার, তার দিকেই রয়েছে সত্যের নিয়ম, তার দিকেই রয়েছে মানব সমাজের আবশ্যিক উন্নতি।"

২. আমার 'অহিংসার প্রতি মনোভাব' ("attitude towards non-violence") কী হবে তারই তর্ক-বিতর্কে আমি "মানসিক যন্ত্রণার" (mental agony") যে দশটি (বা পনেরোটি) বছর কাটিয়েছি তাদের কথা, এবং এ সম্পর্কে আমি যে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার কথা—আপনি বলেছেন। যে আন্তর সংগ্রামে আমি লিপ্ত হয়েছিলাম, তার ক্ষেত্র ছিল অনেক বড়ো, অনেক জটিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আমার সামাজিক ধ্যানধারণাগুলো এক সঙ্গে, এবং এমনকি আমার সমগ্র মতাদর্শকেও পুনর্বিচারে বাধ্য হয়েছিলাম। অহিংসার প্রশ্নটি ছিল সেই বিরাট মানসিক বিতর্কের একটা টুকরো মাত্র। এবং অহিংসার বিরুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত আমি মোটেই নিইনি। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, অহিংসা সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের ঘূর্ণন-বিন্দু (pivot) হতে পারে না। অহিংসা অন্যতম উপায় মাত্র, প্রস্তাবিত একটা ধারণা মাত্র এবং তা এখনো পরীক্ষাধীন। আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে অবশ্যই যাকে স্থান দিতে হবে, তা হচ্ছে, আরও ন্যায্য ও আরও মানবিক এক

অতীতের এই যে নিগড় গান্ধীর অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে, এ থেকে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত না করতে পারেন, তাহলে তিনি ভারতবর্ষের মহান্ আন্দোলনের পরিচালনা হারাবেন, যা ইতিমধ্যেই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।" (১৯৩৫ সালের মন্তব্য।)

সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে, তা জোর ক'রে চাপাতে হবে (l'imposer) : কারণ যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে বাতিল হয়ে গেছে তার সমস্ত হিংসার বিরুদ্ধে প্রবল ও সক্রিয় ভাবে সর্বপ্রথমে একে রক্ষা করতে হবে ; কারণ এই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সামাজিক অবিচারের উপরে, ধনতন্ত্রী শোষণের উপরে এবং তা থেকে উদ্ভূত সামরিক সাম্রাজ্যবাদের উপরে, এবং দুনিয়ার নয়-দশমাংশ নাও যদি হয় তিন-চতুর্থাংশের নিপীড়নের উপরে। এই সবকিছুর বীভৎস অবস্থা যা এক চিরস্থায়ী অপরাধ, এর বিরুদ্ধে চরম শক্তিতে এবং অপেক্ষা না-ক'রে দাঁড়ানোর সাহস করাটাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য (কারণ, এই আধিপত্য-বিস্তার-করা ও চিরস্থায়ী অপরাধ অপেক্ষা ক'রে থাকে না ! যদি এর ইতি ঘটানো না হয়, তাহলে এ-ই মানব-সমাজের ইতি ঘটাবে)। তাই এর বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে, হিংসা ও অহিংসার সমস্ত অস্ত্র নিয়ে, তারাই সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে। আমি কোনো অস্ত্রধারণকেই অস্বীকার করবো না, যদি-অস্ত্র থাকে সাহসী, অকপট ও নিঃস্বার্থ বীরদের হাতে। কয়েক বছর যাবৎ আমার নিজের প্রচেষ্টা ছিল, সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে, অতীতের যে-সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে পদানত করে, মানবতাকে শোষণ করে তার বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে অহিংসার ও বিপ্লবী হিংসার শক্তিগুলোর গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করা। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় বিশ্ব-কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত কমিটিগুলোয় এইটেই ছিল আমার ভূমিকা। আমি আজও বিশ্বাস করি যে, অহিংসার মধ্যে এক প্রবল বিপ্লবী প্রাণশক্তি আছে, যা সুপ্ত রয়েছে এবং যাকে কাজে লাগানো যায় ও কাজে লাগাতে হবে (সরকারী কাজকর্ম অস্বীকার, অস্ত্রশস্ত্রের, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানায় ও যানবাহনের সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি) সংগঠিত অহিংসা ও সুশৃংখল বিপ্লবী হিংসা অবশ্যই হবে বা তাদের হতে হবে দুই মিত্র বাহিনী, প্রত্যেকেই নিজের নিজের কৌশল অক্ষুণ্ণ রাখবে, কিন্তু মানবতার সমশত্রুর বিরুদ্ধে একই কর্মের প্রচেষ্টার সমন্বয় বিধান করবে : সে শত্রু হচ্ছে যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ, সামরিক ও শিল্পক্ষেত্রে ধনতন্ত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি।"

(আমি আমার প্রবন্ধের দুটি নতুন সংকলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তাতেই আমার সামাজিক চিন্তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। পুনশ্চতে আমি যোগ করলাম :

"একথা আবার বলা নিষ্প্রয়োজন যে, গান্ধীর প্রতি আমার প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ আছে, এর পরে সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে যে-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আমার কর্তব্য নির্দেশ দেয়, যে-ক্ষেত্রে, কার্যত, বহু বছর ধরে আমি সক্রিয় ভাবে প্রবেশ করেছি, সেই ক্ষেত্রের বাইরে তাঁকে থাকতে দেখার দুর্ভাগ্যও যদি আমার হয় তবুও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।")

১ মে, ১৯৩৫। স্বামী যতীশ্বরানন্দের আগমন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন পল গেহিব।

বেলুড়ের রামকৃষ্ণমিশন তাঁকে ইউরোপের মিশনের কাজে পাঠিয়েছেন। এবং প্রায় দু'বছর হলো তিনি জার্মানী, পোল্যান্ড এমনকি সুইজারল্যান্ডেও ঘুরেছেন, এখনো পর্যন্ত কাজকর্মের পরিচয় দেননি। তাঁর সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা হলো না। তরুণ, প্রাণবন্ত, জামাকাপড়ে একই রকম, কথাবার্তায় হাল্কা ও ভাসাভাসা ব্যক্তিটিকে দেখে মনে হলো, অদ্ভুত ভাবেই ইনি তাঁর মিশনের কর্তব্য করবেন। তাঁকে ছ'মাসের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তিনি তাঁর উর্ধ্বতনদের লিখেছিলেন যে, তিনি আরও ছ'বছরও থাকতে পারেন। আমি তা ভালোই জানি! তাঁর তাড়াহুড়ো নেই। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই মনে হয়, ভালো ভালো হোটেল কিংবা সব ও স্বামীজী-খ্যাপা (gobe-swamis) জাতের বদান্য গৃহস্বামীদের বাড়িতে বাড়িতে আসকোনায়, হ্বেইজবাডেনে শুয়ে-বসে কাটানো। তিনি জার্মানীতে গ্লাজনাপ বা রুডলফ অটোর মতো একজনও ভারতবিদ্যার বড়ো অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করার ঝক্কিতে যান নি, তাঁদের "সেমিনারগুলো" জার্মান ভাষায় বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী অনুবাদের ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ভালো ক'রেই দিতে পারতো, এ কাজের ভারটা তাঁর উপরেই আছে। বেশি আর কি, ভারতবর্ষের সুহৃদ ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারী যাবার চেষ্টা এখনো তিনি করেন নি। এড়ানোর ভঙ্গি ক'রে তিনি বললেন, তিনি সেখানে যাবেন "যখন ভবিতব্যের ডাক আসবে"। এ ভাঁওতা (truc) আমার জানা! ওতে আমি ভুলি না। তাঁর ভবিতব্য, সে তো তাঁর মর্জি।

পল গেহিবকে তাঁর অডেনওয়াল্ডের বিখ্যাত বিদ্যালয়টি ছেড়ে দিতে হয়েছে, এবং এক বছরের কিছু বেশি জেনেভায় আস্তানা গাড়তে হয়েছে। সেখানে তিনি নতুন একটা বিদ্যালয় খুলেছেন, সেটা বেশ ভালই দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে জন পঞ্চাশেক ছাত্র হয়েছে।

আমার দুই অতিথিই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যা বললেন তাতে সহানুভূতি নেই, এবং বিশেষ ক'রে বললেন জার্মানীর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে, নৈতিক আতঙ্কের পরিবেশ সম্পর্কে, সর্বত্র তারা যা লক্ষ্য করেছেন।

৮ আগস্ট, ১৯৩৫। ভারতীয় তরুণী শ্রীমতী কে. নায়ারের আগমণ। সুন্দরী, অত্যন্ত গাঢ় বাদামী রং। মাদ্রাজের কাছে শিক্ষিকা। ১০ লক্ষ লোকের এক সম্প্রদায়ভুক্তা, সে সম্প্রদায়ে এখনো মাতৃতান্ত্রিক শাসন। সেখানে মেয়েদের অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। ভারতবর্ষের এই দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের ত্রিবাংকুরের ক্ষুদ্র রাজ্যটি শাসন করেন একটি স্ত্রীলোক। শ্রীমতী নায়ার তাঁর সন্তানদের মৃত্যুশয্যায় আমার 'জাঁ-ক্রিস্তফ' পড়েছিলেন, তাতে তাঁর মনের অবস্থা কী হয়েছিল সে-কথা তিনি ইউরোপ সফরের পথেই আমাকে ভালো করে লিখে জানিয়েছিলেন। তবুও মনে হয়, শোকে তিনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। তিনি আর গুরু-পুরোহিতদের সহ্য করতে পারেন না, তিনি বলেন তাঁর দেশে তারা সুনাম হারিয়েছে। ঘোর দুর্দশায়

ভারতবর্ষ' পিষ্ট হচ্ছে বিশেষ ক'রে মাদ্রাজ প্রদেশ। বিবেকানন্দকে স্মরণ করার, এমনকি রাজনীতি নিয়ে ভাবনারও অবসর নেই। ইংলণ্ডের প্রতি প্রবল শত্রুতার মনোভাব। জন কুড়ি ভারতীয়ের সঙ্গে ইউরোপ সফরকালে তাঁদের যে-দেশকে সবচেয়ে ভালো লেগেছে, সে চেকোশ্লোভাকিয়া। জার্মানীতে জনসাধারণ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রী সরকারের মধ্যে তাঁরা পার্থক্য টানেন, জনসাধারণ সজ্জন, অতিথিপরায়ণ। ফরাসীদের মনে হয়েছে কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব (বিদেশীদের এইটেই সাধারণ ধারণা; ঠিক ঠিকই বলেছেন)। তিনি চন্দ্র বোসকে* জানেন। বিদায় নেবার সময় তিনি আমার আশীর্বাদ চাইলেন।

২২ অক্টোবর, ১৯৩৫। জহরলাল নেহেরু ও তাঁর মেয়ে আমার বোনের বাড়িতে খেতে এলেন ও আমাদের সঙ্গে (ভিলা অলগায়) বিকেলটা কাটালেন। নেহেরু ভারতবর্ষে বন্দী হয়েছিলেন, ফরে নোয়ার-এ (Foret-Noire) ব্যাডেন-হ্বেইলের-এ গুরুতর অসুস্থ স্ত্রীকে দেখার জন্য গতমাসে ইউরোপে আসার অনুমতি পেয়েছেন। (ক্লিনিকের প্রধান চিকিৎসকের টেলিগ্রাম করা হস্তক্ষেপের ফলেই এটা মঞ্জুর হয়েছে, কয়েক মাস ধরেই তা নেহেরুকে নামঞ্জুর করা হচ্ছিল। তিনি এসেছেন এরোপ্লেনে। তিন দিন তিন রাত্রি লেগেছে এলাহাবাদ থেকে ব্রিন্দিসি আসতে। তিনি বললেন ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অঞ্চলের আকর্ষণ সামান্যই। করাচি থেকে কায়রো তো মরুভূমির উপর দিয়েই ওড়া।) কয়েক দিনের জন্যে স্ত্রীকে ক্লিনিকে রেখে এসেছেন; সুইজারল্যাণ্ডে এসেছেন মেয়েকে একটা বোর্ডিং-এ রেখে যাবেন; সেটার সঙ্গে ইতিমধ্যেই মেয়ের পরিচয় হয়েছে, সেটা বেক্সের কাছে।

চার বছর তিনি জেলখানায় কষ্ট পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। তিনি পড়তে ও লিখতে পারতেন; এবং দুটো মোটা ইতিহাস ও আত্মজীবনী লেখার জন্যে তিনি নির্জনবাসের সুযোগটা পেয়ে গেছেন। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আসতে পেরেছেন, সেগুলো পড়ে দেখা হয়নি, তাছাড়া, জেলখানার কর্মচারীদের—তাদের প্রায় সবাই ভারতীয়—তাঁকে খুব সমীহ করতো, প্রায় ভয়ই করতো, (তিনি বললেন, "ওদের যত না ভয় করতাম, ওরা আমাকে তার চেয়ে বেশি ভয় করতো।") ঃ কারণ তাদের বন্দীই যে ভবিষ্যতে একদিন—তাঁর পার্টি'র জয়ের ফলে—তাদের প্রভু হয়ে বসবেন না, এ সম্পর্কে তারা খুব নিশ্চিত ছিল না। গোপনে গোপনে বহু সরকারী কর্মচারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে। তার বিপরীত হচ্ছে ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীরা (লাটসাহেব, জজ ইত্যাদিরা)। নেহেরু বললেন, কয়েক বছর যাবৎ তারা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি উদ্ধত, অনেক বেশি স্থূল। তারা তাদের 'ভদ্রলোকী' কেতাই হারিয়ে বসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নেহেরু কী ক'রে এই কারাবাসের স্বাস্থ্যের অতি-ক্ষতিকর প্রভাবকে রুখতে পেরেছেন। তিনি ব্যায়াম

---

*সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র এই নামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই—বিশেষ ক'রে ইউরোপে—পরিচিত দেখা যাচ্ছে।

করতেন, বাগানে মাটি কোপাতেন, এবং ভারতীয় “আসন” করতেন ; সেটা আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলো : বিশেষ ক'রে প্রতিদিন মাথা নিচে ক'রে খাড়া হয়ে থাকার আসনটি (একটা ডিভানের পিঠ-হেলানে শিরদাঁড়া চেপে রেখে) ; তিনি বললেন, এটার বিশেষ সুপারিশ চোখের জন্যে এবং তিনি এ থেকে ভালো ফল পেয়েছেন।

তাঁর চেহারা উঁচু জাতের লাতিন বুদ্ধিজীবীর মতো মার্জিত ও বিশিষ্ট, একটু টাকের লক্ষণ, কানের পাশে পাক ধরেছে, নাকটা খাড়া এবং একটু উপর দিকে তোলা। দুই চোখের নিচে বড়ো ক'রে গোল দাগ, নিচের ঠোঁটটা বেশ মোটা। তাঁর ভাবভঙ্গি পুরোপুরি ইউরোপীয় (তাঁর বেশভূষার মতোই)। তিনি আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে বলেন ; বেশ বোঝা যায় তাঁর চিন্তাকে ঠিক ঠিক ধরার জন্যে এবং একটি শব্দও যাতে চিন্তাকে ছাড়িয়ে না যায়, তার জন্যে সবসময় মনোযোগী। এই সংযমের জন্যে তাঁকে প্রায়ই মনে হয় দ্বিধান্বিত। এটা বুদ্ধিজীবীর উপযুক্ত সততার একটা খুঁতখুঁতি, কাজের ক্ষেত্রে এ তাঁকে দুর্বল করতে পারে। কিন্তু এ-ই তাঁকে সমস্ত বদ্ধধারণার হাত থেকে রক্ষা করে। তিনি সংস্কারমুক্ত মানুষ, বা আরও বেশী ক'রে জানতে তিনি সব সময়েই ছাড়তে প্রস্তুত।

ভারতবর্ষে গান্ধীর পরেই রাজনৈতিক (ও নৈতিক) ব্যক্তিত্বে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীকে ধরে নৈতিক দিক থেকে তিনি সকলের উঁচুতে। গান্ধীর প্রভাবে ও স্নেহে আবিষ্ট হলেও, তাঁর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার, অন্তত আংশিক ভাবে—ক্ষমতা তাঁর আছে। ভারতবর্ষের অগ্রগতি থেকে যে, সুরটি বেরিয়ে আসছে তা তিনি লক্ষ্য করছেন। সামাজিক চিন্তাভাবনায় গান্ধীর চেয়ে তিনি অনেক বেশি অভিভূত হন, এবং গোটা জগতের সামাজিক আন্দোলনের সমগ্রতার খবরাখবর সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ; কংগ্রেসের মধ্যেই তিনি অগ্রগবর্তী এক সোস্যালিস্ট পার্টির পত্তন করেছেন, তার স্বীকৃত নেতা তিনিই,—যদিও বার বার গ্রেপ্তার হবার জন্যে কার্যকর ভাবে তাকে চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জেলখানায় তাঁর ধ্যানধারণা এক অর্থে আরও বেশি এগিয়ে গেছে ব'লে মনে হয়, প্রায় কমিউনিজমের চৌহদ্দিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য শুধুমাত্র নৈতিক সমস্যায়, সামাজিক সমস্যায় নয় : সে-সমস্যা হচ্ছে হিংসা, না অহিংসা। কিন্তু এরই মধ্যে, তিনি বললেন, ভাবতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, অনেক অপরিহার্য লক্ষণে, গান্ধীর অহিংসাও এক হিংসা, অথবা আরও যথাযথ বলতে, যারা অহিংসাকে মেনে নেয় তাদের উপরে যেমন, তেমন যারা তা কার্যকর করে, তাদের উপরেও খাটানো এক চরম জবরদস্তি। (অসহযোগ, ধর্মঘট ইত্যাদি)। এবং তিনি এই সত্যেও পৌঁচেছেন যে, দৈহিক হিংসাই সবসময়ে নিকৃষ্টতম হিংসা নয়। এবং যে-হিংসা নৈতিক ভাবে কাজ করে, কখনো কখনো তাও এমনই বেশি নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠতে পারে। তাই হিংসা ও অহিংসার মধ্যে অলঙ্ঘনীয় কোনো প্রাচীর নেই ; এবং কর্মক্ষেত্রে প্রথমটিকে আগে থেকেই বাতিল করা চলে না। বরং তাদের পরিবেশ পরিমাপ করতে হবে। আর এইটেই গান্ধী মোটেই করতে চান না, অন্তত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে করতে চান না। কারণ কর্মের ক্ষেত্রে—নেহেরু যেমনটি বলতে চাইছেন তিনি পৃথক।

আজ পনরো বছর হলো (বা তার কাছাকাছি) নেহেরু গান্ধীকে জানেন ও ভালবাসেন। তিনি বলেন, তবু ভালো ক'রে তাঁকে জেনে উঠতে পারলেন না। গান্ধী চিরকালই সেই রকম কাজ করেছেন এবং ক'রে চলবেন যা তাঁর সুহৃদদের বিব্রত করে। তাঁকে দেখে আগে থেকে বুঝবার উপায় নেই। এবং সামাজিক প্রশ্নে তাঁকে দিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কোনো মনোভাব নেওয়াতে কেউ পারে না। আমি বললাম, নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে তাঁর স্বভাবের ঐতিহ্যিক ও যৌক্তিক দিকের এক চিরস্থায়ী সংঘাত চলে। তাঁর যুক্তি দেখিয়ে দেয় কোনটা ঠিক ও প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাঁকে আটকে রাখে, কিংবা পেছনে ঠেলে দেয়। নেহেরু বললেন, তাঁর মতে, এই সংঘাত হচ্ছে তাঁর স্বভাবের ধর্মীয় দিক ও কর্মের মানুষটির মধ্যে। কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সব সময়েই বোঝাপড়া করতে পারা যাবে (নেহেরু সব সময়ে পেরেছেন)। কর্মের ক্ষেত্রে গান্ধী কদাচিৎ ভুল করেন, এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করবেন, ও অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন, বসে থাকলে তাঁর চিন্তার আলোচনায় যতটা না এগোবেন। পরেরটাতে কিছুই লাভ হয় না: গান্ধী বসেই থাকেন; তা থেকে নড়েন না; তিনি যুক্তিতর্ক সম্পর্কে উদাসীন (বা তাঁকে উদাসীন মনে হয়)। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তাঁকে সক্রিয় হতে হবে, তিনি সক্রিয় হন, যেমন সক্রিয় হওয়া উচিত। মারী আপত্তি জানিয়ে বললেন: ' কিন্তু গান্ধী কি বহু ক্ষেত্রেই শুরু ক'রে দেওয়া কর্ম থামিয়ে দেন নি?" নেহেরু উত্তরে বললেন: "তিনি থামান না, যখন যেমন, যেভাবেই হোক, এ থামবার, কিছু পরে থেমে যায়।" তাঁর উপলব্ধির সহজাত ক্ষমতা (instinct) আছে। কিন্তু বসে থেকে তা প্রায়ই ধরতে পারা যায় না। তিনি যে ক্ষতিকারক সম্প্রীতিকে বরদাস্ত করেন এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষে যা তাঁর নাম কাজে লাগায়, সব সময়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি বলি: "শ্রেণীসংগ্রাম মানা সম্পর্কে তিনি মন ঠিক করতে পারেন না। এমনকি, যখন তাঁর প্রতিপক্ষরা তিন চার বার তাদের অসাধুতার পরিচয় দিয়েছে, তখনও তিনি তাঁদের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করাটা ছাড়েন নি। আর গোটা জগত জুড়ে যে সংগ্রাম চলছে, ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে তাকে দেখতে তাঁর আপত্তি।" নেহেরু তা মানলেন; কিন্তু আমাকে জানালেন যে, বছর দুয়েক হলো তিনি মার্কস ও এঙ্গেলস ইত্যাদি পড়তে শুরু করেছেন। অবশ্য, এতে তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। (কিন্তু কেউ কখনো তা বলতে পারে? গান্ধী তাঁদেরই একজন, যাঁদের উপর এক দীর্ঘ আন্তর ক্রিয়া নিঃশব্দে কাজ করে।) তাছাড়া, তাঁর বর্তমান মনের অবস্থার সমালোচনা করতে নেহরুর আপত্তি: গত কয়েক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেহেরুর ছিল না, জেলখানার প্রাচীর তাঁদের আলাদা ক'রে রেখেছে (গান্ধীর ইউরোপ থেকে ফেরার পর এবং তাঁদের গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে তাঁদের দু'জনের দেখা হয়েছিল)। তাই, তা বিচারের জন্যে গান্ধীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা প্রয়োজন। আমার মনে পড়ে গেল, এক বছর ধরে বৃথাই গান্ধীর সেই চিঠিটির প্রতীক্ষায় আছি, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে যে চিঠি লিখতে গান্ধী আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নেহেরু বললেন, গান্ধী সমাজতন্ত্রের

বিরোধী হলেও, তবুও কংগ্রেস-সোসালিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র রচনায় সাহায্য করছেন, তাঁর বন্ধুদের এ ব্যাপারে বিরোধিতা না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর নিজের মতামত অটুট রেখেই তিনি চান সমাজতন্ত্রের প্রকাশ ঘটুক এবং তার পরীক্ষা হোক !

গান্ধীর যে জনপ্রিয়তা—তার বিপুল ক্ষমতার উপরে নেহেরু খুব জোর দিলেন। তিনি বললেন, তাকে অস্বীকার করা, বা তা কমে গেছে দাবি করাটা হাস্যকর। বড় জোর, তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কমেছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তা বিপুল। বিশেষ ক'রে চাষীদের মধ্যে, এবং সেই চাষীরাই দেশের দুই-তৃতীয়াংশ। সমস্ত রাজনৈতিক পরিকল্পনায় একে গণনার মধ্যে রাখতে হবে। তাঁকে বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করা যাবে না। "কিন্তু এখন কি তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান নি ?"—নেহরু বললেন, না। এটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। ভারতবর্ষে যা কিছুর মূল্য আছে, তা তাঁর পরামর্শ নিয়েই চলে। তাঁর আজকের পশ্চাদপসরণ প্রায় ঠিক সেই পশ্চাদপসরণের মতোই দেখা যাচ্ছে, যা তিনি করেছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯২৩ সালের (?) দিকে। তিনি নিজেকে গোছাচ্ছেন এবং সক্রিয় হবার অপেক্ষায় থেকে লক্ষ্য করছেন। অপেক্ষায় থেকেই তিনি মগ্ন রয়েছেন তাঁর গ্রাম্য কুটিরশিল্পের সংগঠনে ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তিনি একে একটা আনুষঙ্গিক কর্ম হিসেবে দেখতে চান না, ভাবতে চান না যে, সমাজতন্ত্র যখন সমস্ত শ্রেণীকে বিলুপ্ত করবে, তখন অস্পৃশ্যতা আপনা থেকেই ধ্বসে পড়বে। (কিন্তু আমি ভাবি, ঠিক ওইটিই গান্ধী চাইবেন না : কারণ সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি অবচেতন মনে গান্ধীর ঐতিহ্যগত মনোভাবকে প্রবল ধাক্কা দেবে।)

সংখ্যার দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত দুর্বল। গোটা ভারতবর্ষে সম্ভবত ২০০০ সদস্য। কিন্তু ভারতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়া ও মাকর্সবাদ সম্পর্কে অনেকেরই আগ্রহ। নেহেরু নিশ্চিতভাবে কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তার শর্ত এই যে, ভারতবর্ষে তাকে নিজস্ব চেহারা নিতে হবে, যেন একটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ঘটানোয় পেঁছুনো যায়। সম্ভবত স্তালিন-সরকারের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই···তিনি কেবলমাত্র বললেন যে, ইডেন যখন মস্কোয় এসেছিলেন, জনতা "গড সেভ দ্য কিং" গেয়েছিল শুনে তিনি ধাক্কা খেয়েছিলেন (? ! !)।

তিনি গভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গ্রেট-ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীন জাতিগুলোর মানব-অধিকার ইত্যাদির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে তার দেখানোর এই বর্ত্তমান ভন্ডামিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন না, যখন সে ভারতবর্ষকে বীভৎস ভাবে নিপীড়িত ক'রে চলেছে, এমনকি এই মুহূর্তেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গ্রামগুলোয় গ্যাস-বোমা বর্ষণ করেছে, একজন ইংরেজের কন্ঠেও তার প্রতিবাদ হয়নি। নিখিল ভারত কংগ্রেস-সোসালিস্ট পার্টির সম্পাদক এম. আর. মাসানির লেখা একটি প্রতিবাদ তিনি আমাদের দিলেন, সেটা ছাপাও হয়েছে ১৯ অক্টোবর, ১৯৩৫ তারিখের 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান এ্যান্ড নেশন' পত্রিকায়—"ভারতবর্ষ ও আবিসিনিয়া" নামে। এতে দেখা যায়, ব্রিটেনের আগ্রাসন ও গ্রামে গ্রামে বোমা বর্ষণের নিন্দা সম্মেলনে করা হোক ব'লে মাসানি লেবার পার্টির কার্যকরী সমিতিকে

বৃথাই লিখেছিলেন (পার্টির সম্মেলন হয়েছে ব্রাইটনে)। এমনকি অধ্যাপক ল্যাস্কি, এ. ভি. গ্রিনউড ও অন্যান্যদের উত্থাপিত জরুরি প্রস্তাবটির আলোচনার অনুমতিও কার্যকরী সমিতি দেয়নি। মাসানি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ এক নিপীড়নের চাপে পড়ে কাতরাচ্ছে, তার সংবাদপত্রগুলোর মুখ বন্ধ করা হয়েছে (১৯৩৫ সালে ৭২টি সংবাদপত্রকে বন্ধ করা হয়েছে), ট্রেড-ইউনিয়নগুলোকে দমন করা হয়েছে, শ্রমিক নেতাদের অন্তরীণ করা হয়েছে, বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বাংলাদেশেই ছ' হাজারেরও বেশী লোককে বন্দীশিবিরে ঢোকানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক জেলায় প্রায় খোলাখুলি চেহারাতেই সামরিক আইন চালু রয়েছে, সীমান্তের গ্রামগুলোয় (নারী ও শিশুর উপর ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী বোমা বর্ষণ করেছে, লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি প্রত্যাখান করলেও বড়োলাট অপরাধ-আইন সংশোধন বিল (জরুরি আইনকে বর্ধিত ক'রে) মঞ্জুর করেছেন, তাতে এই ভাবেই নাগরিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এইসব অবস্থাতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আশা করতে পারে না যে, ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে, ভারতবর্ষ সেই গ্রেট-ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দেবে (ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সম্প্রতি যেমনটি বলেছেন।) "মহামান্য সম্রাট স্পষ্টতই ভুলে যাচ্ছেন যে, ১৯১৪ সালের পর থেকে ভারতবর্ষ কিছু শিখেছে, ভারতবর্ষের মনোভাব যে গভীরভাবে আবিসিনিয়ার পক্ষে এবং ইতালির বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের সংগঠিত ইতালির সঙ্গে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য বয়কটই তার প্রমাণ করেছে···তবুও বিপুল ভারতীয় জনমত – একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী জনমত— মেনে নেবে না যে, সাম্রাজ্যবাদের জীবন্ত বলি ভারতবর্ষ কূটনৈতিক দাবার ঘুঁটি হোক...যদি 'লিগ অফ্ নেশন্স' অন্যান্য জাতিগুলোর মতই স্বাধীন কণ্ঠে কথা বলতে পারতো, তাহলে যে দেশ সবশ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী— এখনো জীবিত—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিয়েছে—সেই দেশ শান্তির প্রতিষ্ঠায় ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তার অংশগ্রহণের চেয়েও বেশি কিছু করতে পারতো। কিন্তু আজ তার জাতীয় স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। জেনেভায় তাকে বলতে দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে, শুধু বলানো হচ্ছে গ্রেট-ব্রিটেনের ভাড়া করা এক মধ্যস্থ আগা খানকে দিয়ে, যিনি তাঁর প্রভুর কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। এই সব অবস্থায়, যা নিজের আধিপত্যই বজায় রেখে চলেছে সেই এক "যৌথ নিরাপত্তার" ব্যবস্থার রক্ষায় ভারতবর্ষকে অংশ গ্রহণ করতে বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের চেয়ে কিছু কম নয়।"

যে সামান্য সংখ্যক সাহসী ইংরেজ ন্যায় ও মানবতার অধিকার রক্ষায় দাঁড়িয়েছেন আমার বোন তাঁদের যখন সমর্থনের চেষ্টা করলো, এবং তাঁদের মধ্যে ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির সভাপতি ল্যান্সবেরির নাম যখন উল্লেখ করলো, যিনি তাঁর অখণ্ড ধর্মীয় শান্তিবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না-করার জন্যে, আবিসিনিয়ার বর্তমান ব্যাপারে পদত্যাগ করেছেন, তখন এক মধুর তিক্ততায় নেহেরু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কয়েক বছর আগেই তো ল্যান্সবেরি ও তাঁর দল ক্ষমতায় ছিলেন, এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে গুলি চালাতে একটুও ইতস্ততঃ করেনি। এ ছাড়াও, তাঁর এক বন্ধু যখন প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতবর্ষ যদি তার

স্বাধীনতা আবার ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তিনি কী করবেন; তাতে দ্বিধা না ক'রে তিনি নাকি বলেছিলেন; 'সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমরা জানি কী ক'রে শক্তি প্রয়োগে তাকে বাধা দিতে হয়।'

কংগ্রেসের নতুন অধিবেশনের পূর্বাহ্নে, সামনের বছর (১৯৩৬) ফেব্রুয়ারিতে নেহেরু ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাইছেন। সম্ভবত (তিনি বললেন না, কিন্তু আমি জানি) তিনি তার সভাপতি হবেন। এবং তাঁর বন্ধমূল আশা যে, যখনই কাজ শুরু হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই গান্ধী তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, বা তাঁদের নেতা হবেন।

১৯৩৬

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর আগমন। ভিয়েনায় এক হাসপাতালে সাফল্যের সঙ্গেই তার যকৃতে একটা যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচার হয়েছে, এবং তিনি জাতীয় কংগ্রেসের জন্যে ভারতবর্ষে ফিরে চলেছেন, কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে এপ্রিলের গোড়ায়। গতবারের চেয়ে তাঁকে রোগা ও আরও তরুণ মনে হলো।

গত রাতের কিছুটা সময় তিনি লোজানে জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে কাটিয়েছেন, সেখানে নেহেরু ছিলেন তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর পাশে। এবং তিনি আমাদের জানালেন যে, শ্রীমতী নেহেরুর অবস্থা খুবই খারাপ। (প্রকৃতপক্ষে, তিনি পেটের যক্ষ্মায় (pe'ritionite) আক্রান্ত, পরদিন সকালেই মারা গেলেন; আর আমার বোন ২৯ তারিখে যাচ্ছে সৎকারের সময় উপস্থিত থাকতে।)—নেহেরুর রওনা হওয়ার কথা ছিল ২৯ তারিখেই, তা পনরো দিনের জন্যে পেছিয়ে দিয়েছেন। আগামী কংগ্রেসে তিনি সভাপতি মনোনীত হয়েছেন, এবং তিনি অত্যন্ত কঠিন কাজের মধ্যে গিয়ে পড়বেন,—তা আরও বেশি এই জন্যে যে, দু'বছরেরও বেশি জেলে থাকায়, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি এখনো যোগাযোগ ক'রে উঠতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাকে সুভাষচন্দ্র নৈরাশ্যের দৃষ্টিতেই দেখছেন। গান্ধীর দক্ষিণহস্তেরা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে আধিপত্য করবেনই বলে মনে হয়, তাঁরা সব দক্ষিণ দিকে ঝুঁকেছেন; সরকারী কাজে ও কাউন্সিলে ঢোকার, এবং নতুন সংবিধানের পরীক্ষাটা মেনে নেবার সুপারিশ তাঁরা করছেন। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে কয়েক বছরের অসফল সংগ্রামের চরম ক্লান্তি। হয়তো, সমাজতন্ত্রের ভীতিও রয়েছে। গান্ধী এখনো তাঁর মতামত জানান নি, কিন্তু বাধা দিচ্ছেন না। সুভাষচন্দ্র বললেন, একথা ভাবা মিথ্যা যে, তিনি রাজনীতি থেকে সরে গেছেন। ওটা একটা ধাপ্পা (feinte)। তাঁর নির্জনবাসেই তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতির পরামর্শদাতা হয়ে বসে আছেন। নেহেরু কী নীতি নেবেন, সেটাই সবচেয়ে অজানা। তিনি নিজেই বলছেন যে, তিনি তা এখনো জানেন না। তাঁর

মতামত বামপন্থী, এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর ভয় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে বিচ্ছেদের, সেটা হবে তাঁর সোসালিস্ট পার্টির পক্ষে বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংস।

মার্চ, ১৯৩৬। অস্ট্রিয়া থেকে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন (১৮ মার্চ) যে, ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসাল জে. ডাব্লিউ. টেইলরের কাছ থেকে নোটিশ পেয়েছেন, পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারির নির্দেশে ভারত সরকার দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবেন। তা সত্ত্বেও তিনি ফিরছেন। তিনি যে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন তার জন্যে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে তাঁকে তাড়াতাড়ি আমাদের সহানুভূতির অঙ্গীকার জানিয়ে চিঠি দিলাম। (কিন্তু কে জানে কতকালের জন্যে তিনি ভারতবর্ষে বন্দী হয়ে থাকতে চলেছেন, তার চেয়ে ইউরোপে থাকলেই যেন ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্য বেশি ভালো কাজ করতে পারতেন।

৩ এপ্রিল, ১৯৩৬। আমার বোনের বাড়িতে মিস ম্যাকলিয়ড এসেছেন প্রাতরাশের জন্য জে এরবেরকে সঙ্গে নিয়ে ('লিগ অফ নেশন্স'-এর অনুবাদক, বিবেকানন্দের রচনাবলী ফরাসীতে অনুবাদের ভার নিয়েছেন)। বিবেকানন্দের এই পুরনো বান্ধবীটি আসছেন ভারতবর্ষ থেকে, প্যারীতে মাঝখানে সামান্য কয়েক দিনের জন্য থেমেছিলেন, সরবনে রামকৃষ্ণ-স্মরণসভায় (অধ্যাপক ফোশে, মাসমুর্সেল প্রভৃতি) যোগ দেবার জন্যে। তিনি তেমনই আছেন অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে তেমনি হাসিখুশী হয়ে। তিনি বেলুড়ের (রামকৃষ্ণ) সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিপূর্ণ নবজাগরণ দেখেছেন। আগের জনের (স্নিগ্ধ, পবিত্র ও প্রশান্ত শিবানন্দ) চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, সম্প্রদায়ের নতুন অধ্যক্ষ অখণ্ডানন্দ নির্জনতাপ্রিয়, কঠোর নীতিপরায়ণ, উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী বেশ কয়েক বছর তিব্বতে ছিলেন এবং বেলুড়েও এসে থাকতে অস্বীকার করেছিলেন; তিনি কিছুটা দূরে আলাদা হয়ে থাকেন, কিন্তু দৃঢ় হস্তে পরিচালনা করেন। এরবের ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন, তিনি বললেন সেখানে আমার কী বিরাট জনপ্রিয়তা, যেসব ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের কাছে ফ্রান্স বলতেই রম্যাঁ রলাঁর দেশ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার বইগুলো ইউরোপের এবং বিশেষ ক'রে, ফ্রান্সের মনের মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকেছে : বইয়ের দোকানের হিসেব তো, কার্যত, তার কোনো ধারণাই দেয় না।

ডিসেম্বর, ১৯৩৬। দেবদাস গান্ধী (গান্ধীর ছোটো ছেলে) ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে 'দি হিন্দুস্থান টাইমস'-এর জন্যে ১৩ নভেম্বর আমার কাছে একটা প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আমি তার উত্তরে লিখলাম (২ ডিসেম্বর) (বিমান ডাকে) ঃ

'প্রিয় বন্ধু,—আমি ভারতবর্ষকে কতখানি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, তা আপনি জানেন। জগতের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মহান্ অগ্রজের স্থান তাকে দিতে হবে, সেইটেই তার স্থান। আমি উদগ্র প্রার্থনা জানাই, যাতে সে যেন তার জাতীয় স্বাধীনতা আবার জয় ক'রে নিতে পারে ও সামাজিক প্রগতি বাস্তবায়িত করতে পারে, এতো দীর্ঘকালব্যাপী বলিপ্রদত্ত তার বিশাল জাতির তাতেই তো অধিকার। আমার অনুরোধ, আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনি এরই প্রাণবন্ত প্রকাশকে ভারতীয় জনগণ ও কংগ্রেসের কাছে পেঁছে দেবেন।

দুঃখের বিষয়, এই মুহূর্তে আমি আপনার প্রবন্ধটি লিখতে পারছি না। স্পেনের ট্র্যাজিক ঘটনাবলীতে এবং সমগ্র পশ্চিম জগতের—সমগ্র ইউরোপের সামনে সমুদ্যত যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায়, দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপে আমাদের সমস্ত শক্তি আবিষ্ট হয়ে আছে। মাদ্রিদের নিধনযজ্ঞের বলিদের সাহায্যের জন্যে সমস্ত জাতিকে আমি সদ্য যে আবেদন জানিয়েছি তারই একটা প্রতিলিপি আপনাকে পাঠালাম। যার চাপে ইউরোপ আজ ডুবছে, সেই উন্মত্ততা ও অপরাধের দৃশ্যাবলী দেখে ভারতবর্ষ, অন্তত যেন, নিজে শিক্ষা নিতে পারে, এটাই প্রয়োজন। এটাই প্রয়োজন যে, সে যেন সাম্রাজ্যবাদী ও জাতিগর্বী ফ্যাসিবাদের মারাত্মক বিপদকে দেখতে পায়, সর্বত্র আজ সে যুদ্ধের মশাল বয়ে নিয়ে চলেছে এবং সমস্ত স্বাধীনতাকে চূর্ণ করছে। গোটা দুনিয়াকে পদানত করার চেয়ে কমে যারা তুষ্ট নয়, তাদের সেই প্যাঁচালো ও হিংস্র রাজনীতির হাত থেকে ভারতবর্ষের বাঁচার আড়াল নেই। জার্মান-ইতালীয়-জাপানী-প্যাক্টের দিকে নজর রাখুন! ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদগুলোর আধিপত্যে এশিয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কিন্তু গতকালের সাম্রাজ্যবাদগুলোকে তাদের গণতান্ত্রিক জাতিগুলোর অধিকারের কোনো কোনো নীতিকে তবুও মান্য করতে হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদের মধ্যে দিয়ে যারা অধিষ্ঠিত হবে, তারা মানবতার শেষ চিহ্নটুকুও পায়ে মাড়াবে। গত দু'বছর ধরে আমরা ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্টের মৈত্রী গড়ে তোলার জন্যে আমাদের (সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল রিপাবলিকান, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট) রাজনৈতিক দলগুলোর ঝগড়া স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছি। ভারতবর্ষে এইরকম করার জন্য আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতি,—সেই সব বিরাট আশা, বাঁচার সেই সব যুক্তি—গোটা জগৎ জুড়ে আজ বিপন্ন!'

এলাহাবাদের স্বরাজ ভবনে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি রাম মনোহর লোহিয়াকে অন্য একটি বাণী পাঠালাম (৪ ডিসেম্বর) ঃ

"আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ও তার শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতিকে আমার সবচেয়ে আন্তরিক নমস্কার জানাই। আমাদের সুদৃঢ় আশা এই যে, অতি শীঘ্রই সে ফিরে পাবে তার পূর্ণ ও সামগ্রিক স্বাধীনতা, তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ,—যা তার অধিকার, এবং সে বাস্তবায়িত ক'রে তুলবে অপরিহার্য সামাজিক প্রগতিগুলোকে

তার বিশাল জাতির সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে, যে-জাতির শক্তিশালী বিকাশ নির্ধারিত হয়ে আছে।

ইউরোপের জাতিগুলোর (পপুলার ফ্রন্টগুলোর আজকের এই মুহূর্তের নীতির মূল সুর হলো :—'খাদ্য, শান্তি ও স্বাধীনতা'। ভারতের জনগণের মুখে এই ধ্বনি কত বেশি সত্য, কত বেশী জরুরি।

পাশ্চাত্যের আমাদের ও প্রাচ্যের আপনাদের একই শত্রুর সঙ্গে কারবার করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ও জাতিগত ফ্যাসিবাদ মৃত্যুর ও দাসত্বের কালো মেঘের মতো এই মুহূর্তে জগতের আকাশে জেগে উঠেছে। সে চায় সমস্ত স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে দিতে। জগতের অন্যতম মহিমান্বিত সভ্যতার কেন্দ্র স্পেনকে বর্বর ধ্বংসযজ্ঞে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমের বৃহৎ গণতন্ত্রগুলো বিপন্ন। আপনারা যারা ইথিওপিয়ায় ইতালীয় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন ও দখলদারি দেখেছেন, তাঁরা হিটলারী-জাপানী-প্যাক্টের প্রতি নজর রাখুন। গোটা জগৎ জুড়ে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতি আজ বিপন্ন।

আমি জানি, আমার মহান্ বন্ধু, আপনাদের সভাপতি জহরলাল নেহেরু এই পুরনো নীতিবাক্যটিকে নিজের মন্ত্র ক'রে নিয়েছেন : 'আমি মানুষ, মানুষের কোনো কিছুই আমার কাছে পরস্ব নয়।' আজকের মতো আর কখনো এই নীতিবাক্যটি এমন আদেশব্যঞ্জকভাবে স্বীকৃতি দাবি করেনি। আমরা, 'সকলেই, সেই এক অনন্য দেহের অঙ্গ' ('Membra sumus Corporis magni')। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যে-কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠুক না কেন, আমাদের মধ্যে আমরা তার অনুরণন অনুভব করি। মানবতার পবিত্রতম অধিকারগুলো রক্ষা করার জন্যে এটা সেই একই যুদ্ধ,—যা শুরু হয়ে গেছে। আসুন, ভাইয়ের মতো ভাইয়ের হাতে হাত মেলাই।'

ডিসেম্বর, ১৯৩৬। রামকৃষ্ণ-মিশন এক ধর্মমহাসভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেটা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের প্রথম দিকের কোনো মাসে কলকাতায়। আমি সেখানে যেতে পারবো না জানিয়ে এক মাস আগে চিঠি দিয়েছিলাম। সুইস ডাকবিভাগ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমার চিঠি, সেই দিনের ভারতবর্ষের সমস্ত ডাকের সঙ্গে, মেলভ্যানের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। কমিটির সভাপতি স্বামী অখন্ডানন্দকে আমি আবার চিঠি দিলাম। আমার দুঃখ আবার নতুন ক'রে লিখলাম :

'এ কখনো সন্দেহ করবেন না যে, আমার চিন্তা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। ধর্মসভাকে আমার সৌভ্রাত্রমূলক নমস্কার জানাবেন। মানব-আত্মার সমস্ত বৃহৎ শক্তি, বিশ্বজনীন জীবনে বিশ্বাসের প্রাণশক্তি এবং সমস্ত মানুষের জন্যে সক্রিয় প্রেমের শক্তির মধ্যে বোঝাপড়া ও গাঁটছড়া বাঁধার আকাঙ্ক্ষা, সারাজীবন, আমার মতো আর কেউ করেনি। আমি আনন্দিত এই জন্যে যে, এমন এক সম্মেলন হতে

চলেছে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জন্যে প্রেমের প্রভু, আমাদের প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে।

ধর্মসভায় যাঁরা যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের সকলকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, সামাজিক সেবার দিকে, মাটির মানুষের সাহায্যের দিকে তাঁদের প্রচেষ্টাকে আরও বেশি ক'রে চালিত করার। জগতের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পীড়িত ও বলিপ্রদত্ত জাতিগুলো এমন এক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে উঠছে, যা হয়ে উঠেছে আরও অনেক বেশী দাসত্বকামী ও আরও অনেক বেশি নিষ্ঠুর। আসুন, সামাজিক সুবিচারের আবির্ভাবের সাহায্যের কাজে লাগি! আমাদের স্থান হতে হবে, যারা দরিদ্র, যারা খেটে খায়, আর যারা কষ্ট পায়—তাদের পাশে।'

১৯৩৭

জুন, ১৯৩৭। কালিদাস নাগ হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, হনলুলু থেকে তিনি আমাকে একটা চিঠি ও সমস্ত জাতের ও সমস্ত জাতির হাওয়াই-বাসীর যৌথ স্বাক্ষর-করা একটা কার্ড পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, পলিনেশিয়া উপলব্ধি করছে (আমি কল্পনা করি একদল কুলীনের মধ্যে) বিশ্বমানসিকতার এক বিস্ময়কর ঐকতান। জাপানীরা, চীনারা সেখানে আমেরিকান ও পলিনেশীয়দের সঙ্গে সৌভ্রাত্রভরে মেলামেশা করছে। আমার বইগুলো (বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বইগুলো, 'বিঠোভেন' ও উপন্যাসগুলো) হনলুলুর বইয়ের দোকানগুলোয় আছে। আমার অন্যতম গোঁড়া সমর্থক হচ্ছেন হনলুলু সিম্ফনির পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ফ্রিট্‌জ হার্ট।

জুন, ১৯৩৭। জেনেভা থেকে শ্রীমতী এলেন হোরাপ দেখা করতে এসেছেন (১৩ জুন) তিন ভারতীয়কে নিয়ে: ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি (?) সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মেটা (পার্লিসিস্ট)। আমার অতিথিদের মধ্যে আদর্শগত সহানুভূতির চেয়ে কৌতুহলই বেশি। এই ভারতীয় প্রতিনিধিরা ইংরেজ সরকারের যন্ত্র হওয়াটাই সম্ভব, নয়তো, কুসুম-কুসুম-গরমপন্থী (tiédes), যাদের সরকার বরদাস্ত করে। কার্যত, প্রকাশ পেল তাঁরা দক্ষিণপন্থী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখার জন্যে যেমন তাড়া নেই।

২০ জুন, ১৯৩৭। জাঁ এরবের তাঁর সহযোগিনী কুমারী রেম-র সঙ্গে ভিলা লিঅনেতে আমার বোনের বাড়িতে খেলেন ও রবিবার বিকেলটা কাটালেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে ফিরছেন, সেখানে তিন মাস কাটিয়েছেন। ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছেন, মহাসভা শেষ হয়েছে রামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী দিয়ে। তিনি পন্ডিচেরিতে

গিয়েছিলেন, সেখানে অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে ছিলেন এবং তাঁর মোহে পড়েছেন। আমি বলতে পারছি না যে, তিনি আমার মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পারলেন। বছরে তিন দিন ছাড়া, অরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে অদৃশ্য থাকেন, তিন দিন তিনি 'দর্শন' দেন। তখন ফুলের মালায় সাজানো সিংহাসনে ব'সে নিজেকে সর্বসমক্ষে দেখান (s'exhibe) ; এবং তাঁর প্রত্যেক শিষ্য ও দর্শকের জন্যে বরাদ্দ এক মিনিট-মাত্র একটি মিনিট, তাঁরা সাষ্টাঙ্গে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। এরবের তাঁর দৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা, গভীরতা ও সৌন্দর্যের কথা বললেন : কোন মানুষেরই এমন দৃষ্টি তিনি নাকি দেখেননি। ইংরেজি বা অন্য যে-কোনো ভাষার মতোই অরবিন্দ চমৎকার ফরাসী বলেন। সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনিই সবচেয়ে সর্বব্যাপী (encyclope‘ dique) সংস্কৃতির অধিকারী। আজ তাঁর আশ্রমে ১০০ থেকে ১২০ জন শিষ্য ; আশ্রম না থেমে বেড়েই চলেছে, তার মধ্যে পাঁচ, ছয়, কি সাতটা বাড়ি। অরবিন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি হচ্ছে, প্রত্যেককে মনঃসংযোগ করতে হবে এবং নিজের পথ খুঁজে পেতে হবে, এই ভাবে নিজের বিকাশের নিজের নিয়মটি খুঁজে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে হবে, তার পৃথক প্রয়োজন অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে ; সন্ন্যাসী থাকবেন আসবাবপত্রহীন একটা ছোট্টো ঘরে ; যিনি বিদগ্ধ-পরিশীলিত, যেমন আমাদের বন্ধু সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়, থাকবেন আরামদায়ক কয়েকটা ঘর নিয়ে ; তিনি তো একটা পুরো তলা জুড়ে থাকেন এবং এমনকি সেখানে এক এক রাতে আলাদা আলাদা ঘরে তাঁর ঘুমোনোর বাতিকটাও মেটাতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে অরবিন্দ আদান-প্রদান করেন চিঠি ও তাঁর স্ত্রী "শ্রীমার" মাধ্যমে ; তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও প্রভাবেরও এরবের মুগ্ধ প্রশংসা করলেন। (তিনি ফরাসী ইহুদী, কিন্তু দীর্ঘ দিন মুসলিম প্রাচ্যে ছিলেন ব'লে মনে হয়। সবাই জানে অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগে পল রিশারের স্ত্রী ছিলেন, আর এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে তিনি অরবিন্দের উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকবেন।) এর সঙ্গে যোগ করা যাক, গোটা আশ্রমেরই বিশ্বাস যে, অদৃশ্য থেকেও, অরবিন্দ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের উপরে ক্রিয়া করেন। জাঁ এরবের এই রহস্যজনক ক্রিয়া অনুভব করতেও বাদ যাননি : দিলীপকুমার রায়ের একটি ইংরেজী কবিতা ফরাসীতে অনুবাদ করতে গিয়েছিলেন, এবং তিনি জোর দিয়ে বললেন, তাঁর কোনো রকম কাব্যবোধ নেই, তিনি চিঠির মারফতে অরবিন্দের কাছে আবেদন করেছিলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়েছিল, কলমের এক খোঁচাতেই তিনি অনুবাদটা ক'রে ফেলেছিলেন। অরবিন্দের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বহু দূরে ছড়িয়েছে। আজ তাঁকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর মনে করা হয়, ধর্মমহাসভার সভাপতি তাঁকেই হতে বলা হয়েছিল ; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরবের ভারতবর্ষ থেকে অনেকগুলো পুস্তিকা এনেছেন, সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছাপিয়ে দিয়েছেন। তার একটা অরবিন্দের চিন্তা সম্পর্কে। (অন্যটি "শ্রীমার")। এই চিন্তা নিঃসন্দেহে মহৎ শিল্পীর ও বিরাট মনের। কিন্তু তাঁর চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকে বলা হচ্ছে :

সংশ্লেষ (synthèse) (সমস্ত ধর্ম, সমস্ত অধিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সংশ্লেষ) অস্পস্টই রয়ে গেছে ; এবং কোন লেখাতেই তা যথাযথ স্পষ্ট হয়নি। 'আর্য' পত্রিকার (১৯১৪ সাল ও ১৯১৭ সালের মধ্যে) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখাগুলোর পর, ও অতি-সাম্প্রতিক গীতার ভাষ্য বাদে, অরবিন্দ বড়ো কোনো গবেষণা-প্রস্তাব (traité) লেখেননি : তিনি সুন্দর, জ্যোতির্ময়, বিরোধাভাসের উপর স্বেচ্ছাবিহারী ও সুসমন্বিতভাবে ভারসাম্য রাখা চিন্তা নিয়েই তুষ্ট আছেন। কিন্তু জ্যোতি কদাচিৎ আলোকিত করে। মেনে নিচ্ছি যে, বিশেষ ক'রে এর মূল্য আছে কুলীন মনের এক সম্প্রদায়ের মুক্ত, বৃহৎ ও বিশ্বজনীন বিকাশের উদ্দীপন হিসেবে ! কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার ক'রে নিলেও, তাঁর আভিজাত্যবাদকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে কণ্টকর। ওটা বড়ো লোকেদের এক আশ্রম। আমাদের দুঃখদুর্দশা ও নিপীড়ন হ্রাস করার বেদনাদায়ক সংগ্রামের যুগে প্রচন্ড স্বার্থপরের মতো তিনি আয়েস-করা আশ্রমে নিজেকে আটকে রেখেছেন, যাতে সেখানেই নির্বিবাদে তিনি তাঁর বিকাশের সম্পূর্ণতা অনুসন্ধান করতে পারেন। আধুনিক ভারতবর্ষের মহান্ চিন্তাবীরদের সম্পর্কে আমার বইগুলোর পরে আর অন্য কোনো কারুর সম্পর্কে আমাকে লিখতে অনুরোধ ক'রে লাভ নেই, আমি বাংলাদেশের দীন (Poveretto) রামকৃষ্ণেই থেমে থাকবো।

রামকৃষ্ণ-মিশন সম্পর্কে এরবের বললেন যে, মিশন সর্বত্র সামাজিক কর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে ; দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, সেবাদল ইত্যাদি। বেলুড়ের নতুন প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শেষ শিষ্যদের একজন ; তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, এবং তিনি একান্তে থাকেন। রামকৃষ্ণ-উৎসবে গান্ধী আসেননি, কিন্তু সেখানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁর দুই মুখ্য শিষ্য, তাঁদের একজন কালেককার। এরবের বললেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও গৌরবের বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি আমার বইগুলোর জন্যেই হয়েছে, এটা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এরবের ও কুমারী রেম্ গিয়েছিলেন স্টার্টফোর্ড অন আভনে বিবেকানন্দের পুরনো বান্ধবী মিস ম্যাকলিঅডের বাড়িতে : সেখানে তাঁদের নিবেদিতার বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁরা নিবেদিতার একটা দিক সম্পর্কে জানতে পেয়েছেন : ভারতবর্ষে নিবেদিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিক। ১৯১০ সালের আগে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি অনেক প্রবন্ধে তিনি অরবিন্দের নাম সই করেছিলেন (বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে অরবিন্দ তখন লুকিয়ে থাকতেন ও পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াতো)। নিবেদিতার এই কাজকর্ম লোকচক্ষুর গোচরে আসুক, তাতে মিস ম্যাকলিঅড তেমন গদগদ হলেন না। এ নিয়ে কুমারী রেম্ পড়াশোনা করতে চাইছেন। গান্ধী যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের হাল ধরেছেন, তার যা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত মুখবন্ধ ছিল বাংলাদেশের সেই বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের (রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ) সঙ্গে অকালে পরলোকগত বিবেকানন্দের সম্পর্কের বন্ধনটি, নিবেদিতার মাধ্যমে, ধরা যেতে পারে।

জাঁ এরবের এক মহান্ ভারতীয় অধিবিদ্যাবিদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছেন, তিনি

থাকেন ভারতবর্ষের দক্ষিণে, "মহর্ষি"* নামে পরিচিত। তিনি অপরিহার্যভাবে প্রাচীন-ঐতিহ্যপন্থী। বেদান্তের গভীরতম প্রবক্তা। উপনিষদের গুরুদের সর্বশেষ। অরবিন্দ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে "শ্রীমা" এরবেরকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন।

২৯ জুন, ১৯৩৭। রামকৃষ্ণ-মিশনের জন্যে আমি যে লিখেছিলাম, সেই পুরনো প্রবন্ধটি : "জীবই শিব" এরবের নিয়েছেন এবং বেদান্তবাদ সম্পর্কে সুইজারল্যান্ডে তিনি যে নতুন পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার গোড়ায় সেটিকে দিতে চান। কিন্তু তিনি অনুরোধ করেছেন একটি বাক্য কেটে দিতে, যাতে আমি রোমান-চার্চের নির্লজ্জতার নিন্দা করেছিলাম, যে রোমান-চার্চ খোলাখুলিই বলে যে, ভগবান আছেন প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গেই, অবশ্য যদি সে-শক্তি চার্চের ভোগকরা সুবিধাগুলোকে মান্য করে। আমি তাঁকে উত্তর দিলাম (২৯ জুন) :

"...নিশ্চয়ই, আমার একটা প্রবন্ধ যে আপনার পত্রিকায় ব্যবহার করা হবে তাতে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি চাইবো না যে, এটাকে "প্রয়োজন মাফিক কাটছাঁট" (" ad usum Delphini") ক'রে লাগান হোক। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা স্মরণ করুন : নিজের পথেই প্রতিটি মানুষকে বিকশিত হতে হবে। বেদান্তের প্রতি আমার বেশ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকলেও আমার পথ বেদান্তের পথ নয়। তা জাঁ-ক্রিসতফের পথ, যা ভন্ডামি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইতে ছোটে। এবং সেই মনই বয়েসের সঙ্গে নিজেকে সপ্রমাণ করেছে। রোমের মোহান্তরা, যাঁরা তাঁদের পবিত্র-গদি সুন্দর করতে শয়তানের সঙ্গেও কারবার করবেন (তাঁরা তা বলেছেন !) তাঁদের ছাড় দিতে আমাকে তাই অনুরোধ করবেন না। আমি যা পারি, তা হচ্ছে, এই কথা লিখে অন্যান্য চার্চ সম্পর্কেও আমার ধিক্কারকে প্রসারিত করতে :

"—ইতিহাসের গতিপথে, অতীতে ও বর্তমানে, চার্চের নেতাদের প্রায়শই নীতি ছিল এবং নীতি হচ্ছে সমস্ত বিজয়ী শক্তির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার, যদি শুধুমাত্র সেই শক্তি তাদের চার্চের ভোগকরা সুবিধাগুলোকে ছাড় দেয়। এইভাবেই তারা শক্তির কায়েম-করা অবিচারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে।"

২৮ জুলাই, ১৯৩৭। আমাদের নেভের-এ যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় ভারতীয় নেতা বাংলাদেশের সুভাষচন্দ্র বসুর এক তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র—অমিয়নাথ বসু এলেন আমাদের সঙ্গে খেতে। বিশিষ্ট-মার্জিত তরুণ, ইংরেজী আদবকায়দা। কয়েক বছর অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে চলেছেন, কিন্তু তা করতে চলেছেন যাতে ইংরেজের অস্ত্রকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লাগাতে পারেন। তিনি গান্ধীর

---

* রমন মহর্ষি

অনুগামী নন, কিন্তু ভারতবর্ষে গান্ধীর নৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেন ; (তিনি বললেন, নেহেরু তত্ত্বের দিক থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেলেও, কার্যত কখনো গুরুর প্রতি তাঁর আনুগত্য থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারবেন না।) তিনি বিপ্লবী কর্মপন্থার পক্ষে। যে-ক্ষমতাবলে ভারতবর্ষে ফরাসী এলাকায়, এবং উল্টোদিকেও, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ইংরেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ফরাসী বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণের তিনি চেষ্টা করেছেন। আমরা ফ্রাঁসি জুরদ্যাঁ ও 'মানব-অধিকার-লিগের' কাছে আবেদন পাঠালাম।

অক্টোবর, ১৯৩৭। ফ্রান্সে যখন ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে কলকাতার রামকৃষ্ণ-মিশন থেকে ২ খন্ড 'কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া' পেয়েছি। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের ফল ভারতীয় চিন্তার বিপুল বিকাশকে মুগ্ধ প্রশংসা করতে হয়। আমি রামকৃষ্ণ-মিশনকে ধন্যবাদ জানালাম (স্বামী অবিনাশানন্দের চিঠিতে)। পশ্চিমে জাঁ এরবের এক অসাধারণ সক্রিয়তা ও আবেগদীপ্ত উৎসাহ নিয়ে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণের চিন্তা ছড়াচ্ছেন ! জেনেভার 'পাসে এ আকশিঁ অ' পত্রিকার সহযোগী হবার জন্যে তিনি সদ্য শার্ল বোদুয়্যাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

১৫ অক্টোবর জহরলাল নেহেরুর সেক্রেটারি মাহমুদ উজ্ জাফর খানের আগমন ; তিনি নেহেরুর পরিচয়পত্র এনেছেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ডাঃ রশিদ জেহান। দু'জনেই মুসলমান, আর (স্ত্রী) কাশ্মীরের, (তিনি) উত্তর প্রদেশের। মহিলাটি ডাক্তার। তিনি ইংলন্ডে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন এবং বহু বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, পরে অনুভব করেছেন, এই মুহূর্তে, কেউ আর ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মের বাইরে থাকতে পারে না, এবং নেহেরুর স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন। ভারতীয় এলিতরা—যারা একরকমের নেহেরুর ডান হাত—গান্ধীর প্রতি অত্যন্ত তীব্র অনীহা প্রকাশ করেছে, এতে তিনি বেশ কৌতূহলী ও বেশ উদ্বিগ্ন। মাহমুদ, অন্তত, হুঁশিয়ার ও কথাবার্তায় সতর্ক। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কিছুই রাখঢাক করলেন না। এবং তিনিও সেসবের কিছুই সংশোধন করলেন না। আমি ভাবতেই পারি না, যে-গান্ধীর প্রতি নেহেরুর এতো শ্রদ্ধা ও প্রীতি, সেই নেহেরু এসবের সমর্থন করবেন ; কিন্তু তিনি তাঁদের মতামত না জেনে পারেন না ; আর তিনি যদি তাঁর পাশে তাঁদের স্থান দেন, তা এইজন্যে যে, এই মতামতগুলো, এক শ্রদ্ধাবর্জিত আকারে, তাঁর চিন্তার মনোভূমিকেই (le fonds) প্রকাশিত করে। মাহমুদ-দম্পতির মধ্যে, জাতিগত নাও যদি হয়, এক ধর্মীয় বিদ্বেষ যুক্ত হয়েছে। তাঁরা গান্ধীকে মূলত মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ক'রে দেখালেন, তাদের তিনি বেকায়দায় ফেলেন, তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার গোপন বিরোধিতা করেন (যেমন ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় ভাষার বিতর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে তিনি উর্দুকে কোনো মূল্য দিতেই চান না।)। তাঁরা তাঁকে দেখালেন এক

গোঁড়া হিন্দুধর্মধ্বজী ব'লে, নোঙর ফেলে আছেন প্রাচীন-পন্থী আনুরক্তিতে, ভূমিকম্পের জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ জানান—যা নাকি হিন্দুদের পাপের ফল, পেটি বুর্জোয়া, হিন্দু বড়ো বুর্জোয়াদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এবং ইংলন্ডের সঙ্গে তাদের মৈত্রী-চুক্তি বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিছুই পড়েন না, এমনকি নতুন সংবিধানটিও পড়েননি—নেহেরুই নাকি এটা পড়তে তাঁকে সম্মত করিয়েছেন, এবং তিনিই তাঁকে সংবিধানটি পড়তে দিয়েছেন)। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন, ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান তাঁর বিরুদ্ধে, আব্দুল গফ্‌ফর খান একমাত্র ব্যতিক্রম। এ তাঁদের ভালো ক'রেই স্বীকার করতে হলো যে, হিন্দু জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় তাঁর পক্ষে আছে। মুচকি হেসে মাহম্মুদ বললেন : "মিঃ গান্ধী হচ্ছেন হিন্দু টাইপ। নেহেরু বলেন : যদি গান্ধীকে বোঝাতে পারি, তখনই জানি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে বোঝাতে পারবো। নইলে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তিনি হচ্ছেন পরশ-পাথর।"

তবু, চরম শত্রুভাবও গান্ধীর বিশ্বাসের সততায় ও আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগাতে পারে না।

একই রকম বা চরমতম শত্রুভাব সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে, তাঁকে তাঁরা দেখালেন ফ্যাসিস্ট ব'লে।

ভারতীয় নেতারা একমত হবার কাছাকাছিও নন।

মাহমুদ (ও নেহেরু) ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তি-সংসদের একটি স্থানীয় শাখা পত্তনের জন্যে কাজ করছেন। এ নয় যে, নৈতিকভাবে, তাঁরা শান্তিবাদী, কিন্তু এটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চান, যাতে তার আগামী সংঘর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকে ঢোকানোর অধিকার অস্বীকার করা যায়। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে ইংলন্ডের প্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে তাঁদের খুবই কষ্ট হচ্ছে ; কারণ সেখানে ভালো মাইনে, যে-চাষীরা খিদেয় মরছে, তাদের সামনে বড়োই লোভনীয় টোপ। ভারতবর্ষের সৈন্যদের বেতনের অংক দেশী পুলিশের চেয়েও বেশি।

তিনি ভারতবর্ষে 'সংস্কৃতির রক্ষায় আন্তর্জাতিক লেখক-সঙ্ঘের' একটি শাখাও পত্তন করেছেন ; এবং আমার মনে হচ্ছে তার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের এক তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র, যাঁর সঙ্গে আমাদের কিছুকাল আগে দেখা হয়েছিল। কিন্তু মাহমুদ বললেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ভালো লেখকের সংখ্যা ভারতবর্ষে কমই : কারণ ইংরেজি শিক্ষা তাঁদের নিজেদের ভাষায় অনভ্যস্ত ক'রে দিয়েছে, আর ইংরেজিতে তাঁরা সব সময়েই অস্বস্তি বোধ করেন। ইংলন্ডও এমন করে যে, একটু উচ্চস্তরের দেখলেই তাকে সরকারী শাসনযন্ত্রে কব্জা ক'রে ফেলে। তাকে সাহিত্য থেকে অন্য পথে নিয়ে যায়, সেখানে সে হয়তো বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো।

মাহমুদ সেই বিরল ভারতীয়দের একজন, যাঁরা মোটামুটি ফরাসী বোঝেন এবং ফরাসীতে কাজ চালাতে পারেন।

অক্টোবর, ১৯৩৭। কলকাতায় স্যর জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু। এই প্রতিভাধর

ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ (ভিলন্যভে ও গ্লাঁ-য়) আমার মনে যে ছাপ ফেলেছিল তা অন্যত্র বলেছি। তাঁর মধ্যে অনির্বাণ জীবনের এমন এক শিখা জ্বলতো যে মৃত্যু তাঁকে দেখা দিতে পারে তা যেন কল্পনাই করা যেতো না।

ডিসেম্বর, ১৯৩৭। কলকাতায় গান্ধী গুরুতর অসুস্থ (রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্যে সেখানে তিনি নিজেকে অত্যধিক ক্লান্ত করেছিলেন)। রবীন্দ্রনাথও গুরুতর অসুখ থেকে অতিকষ্টে উঠেছেন, তিনি গান্ধীকে দেখতে এসেছিলেন। দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী। (দ্রষ্টব্য : 'হরিজন', ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথ এলেন, তখনো অত্যন্ত দুর্বল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারলেন না। ঢুকেই তিনি জানতে পারলেন, গান্ধী ভালো আছেন, তিনি আনন্দিত হলেন, তাঁকে বিরক্ত করতে চাইলেন না, দেখা না-করেই চলে যেতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, গান্ধী তাঁকে দেখতে চাইছেন, আর স্বাস্থ্যের এই হাল না-হলে, তিনিই শান্তিনিকেতনে যেতেন! একটা চেয়ারে ক'রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হলো; তিনি দেখলেন গান্ধী প্রার্থনা করছেন; প্রার্থনার সময় বসে রইলেন, কিন্তু কথা ব'লে প্রার্থনায় ব্যাঘাত করতে চাইলেন না, প্রার্থনা ক'রে, আশীর্বাদ ক'রে তিনি চলে এলেন।

এই একই বৃত্তান্ত থেকে এও জানতে পারছি যে, অসুখের সময়, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায় মৃত্যুর মুখে, চৈতন্য ফিরে পেয়ে এক পুরনো গান অস্ফুট স্বরে আওড়াতেন, গানটি তিনিই বেঁধেছিলেন, আর রীতি অনুসারে সেটি গাওয়া হয় পিয়র্সনের মৃত্যু-বার্ষিকীতে। সে এক আশার গান, যে-আশা ব্যর্থতার মুখে দাঁড়িয়ে হাসে, যে-আশা বিশ্বাস করে "সকল অপরিপক্ক বৃত্তি", "সকল অনিশ্চিত লক্ষ্য" সমগ্রতার উপলব্ধিতে এসে মেশে,—এমনকি ব্যর্থতাগুলোও কুমোরের প্রয়োজনীয় চাকের মাটির অংশ হয়ে ওঠে, যার হাতের পাক খেয়ে জলপাত্র (cruche) গড়ে ওঠে। ব্রাউনিং এইভাবেই গেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি রূপান্তরিত করেছেন এক করুণ কোমলতায়।

"জীবনে যত পূজা হল না সারা / জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। / যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে / যে নদী মরুপথে হারালো ধারা / জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥..."

এই গানটি গাওয়ার পর তিনি তাঁর তুলি আনতে বলেছিলেন, যাতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ডাক্তাররা আঁতকে উঠেছিলেন। এভাবে নিজেকে ক্লান্ত করার অনুমতি দিতে তাঁরা চাননি; তাঁর দরকার পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু তাঁর বাসনাকে বাধা দিতে পারেন নি। তুলি ও রং এনে দেওয়া হলো; আর তিনি আঁকলেন এক জ্যোতি, ঘন ও অন্ধকার গাছের সার ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে স্পষ্ট, দুর্দমনীয়, যেন-জীবন জয় করছে মৃত্যুকে।

(এই অপূর্ব বৃত্তান্তটি পড়ে শোনালো আমার বোন। পরদিনই আমি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলাম* ।)

---

* ২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ তারিখের চিঠি। দ্রষ্টব্য 'Rolland and Tagore. বিশ্বভারতী, পৃ ৭১—৭৩। —অনু.

১৯৩৮

জানুয়ারি, ১৯৩৮। বাগডাস্টেইন থেকে (৭ জানুয়ারি) সুভাষচন্দ্র বসু আমাকে জানানোর জন্যে মারীর কাছে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে প্রচারিত জহরলাল নেহেরুর স্বাক্ষরিত (২৪ নভেম্বর, এলাহাবাদ) একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অশান্ত পরিস্থিতি--যাকে নেহেরু আখ্যা দিয়েছেন প্রাক-বিপ্লবী অবস্থা ব'লে—এটা তার, এবং মজুর-চাষীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের সামনে ও আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসের যে ভাঙন প্রকট হয়ে উঠছে তার মুখোমুখি ওয়ার্কিং কমিটির সামনে চরম অসুবিধাগুলোর—এক বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ সংক্ষিপ্তসার। ইংলন্ড যা করে তাতে তিনি সায় দিয়ে চলতে পারেন না, তিনি জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান এবং চাষী ও মজুরের স্বার্থে পরিস্থিতির দাবি অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা জোর ক'রে চাপাতে চান—এটা দেখাতে নেহেরু যথেষ্ট বলেছেন।

সুভাষচন্দ্র নেহেরুর এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ব'লে মনে করেন। কয়েক দিনের জন্যে তিনি ইংলন্ড গিয়েছেন। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলটা এই হয়েছে যে, গ্রেটব্রিটেন ভারতীয় নেতাদের প্রতি হঠাৎ বিবেচনা দেখাচ্ছে, যা আগে কখনো দেখায়নি। যাঁকে সে বহু বছর বন্দী ক'রে রেখেছিল, সাম্রাজ্যের বাইরে আটক ক'রে রেখেছিল, সেই সুভাষচন্দ্রই দেখতে পাচ্ছেন তিনি ইংলন্ডে আসার ও সেখান থেকে কংগ্রেসের জন্যে ভারতবর্ষে ফিরে যাবার অনুমতি পাচ্ছেন, যে কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হতে পারেন। যাওয়ার পথে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে চেষ্টা করবেন; কিন্তু তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন, ইংলন্ডে তাঁকে যেন কিছু না লেখা হয়, এখানে তাঁর চিঠিপত্রের উপরে নিঃসন্দেহে নজর রাখা হচ্ছে।

নেহেরুর প্রচারিত চিঠিটির প্রামাণিক অনুলিপিটি এই :

“ব্যক্তিগত

নিখিল ভারত কমিটি—স্বরাজভবন, এলাহাবাদ
ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে
২৪ নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় সাথী,

এখন এটা স্পষ্ট যে, নিখিল ভারত কমিটির অধিবেশন ডিসেম্বরে হবে না, জানুয়ারিতেও হবে না। সদস্যদের বিরাট এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই সম্মেলনের বিরোধী। কিন্তু দেশের মধ্যে পরিস্থিতির যে দ্রুত বিকাশ ঘটছে, তা বিচার করার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশনের চূড়ান্ত প্রয়োজন। আমার আশংকা যে ডিসেম্বরে সেই অধিবেশনের দিন ঠিক করা কঠিন না হ'য়ে ওঠে। এর জন্যে আগামী কাল আসামে যাচ্ছি, ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে ফিরতে পারছি না। উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের আংশিক নির্বাচন, প্রাদেশিক সম্মেলন ও অন্যান্য

গুরুত্বপূর্ণ কাজে ডিসেম্বরের শেষ দিকটা পর্যন্ত আমাদের অনেকে আটকে থাকবেন। এই সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও সম্ভবত ব্যস্ত থাকবেন। তাই সম্ভাব্য সবচেয়ে কাছাকাছি সময়টা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গিয়ে পড়বে ব'লে মনে হয়।

এখন অধিবেশনের স্থান সম্পর্কে কথা—সাধারণ ভাবে গান্ধীজীর সুবিধার জন্যে আমরা ওয়ার্ধাকেই বেছে নিতাম। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ডাক্তারের নির্দেশ দেখে তাঁর ঘাড়ে এই বোঝা চাপানো কম প্রশস্ত ব'লে মনে হচ্ছে। তারই জন্যেই অন্য একটি স্থানের প্রস্তাব করছি। আপনারা যদি মেনে নেন, তাহলে আমার প্রস্তাব এলাহাবাদে এই অধিবেশন হোক। এর কিছু সুবিধাও আছে।

দেশের মধ্যে বিক্ষোভের (agitation) দ্রুত বৃদ্ধি—যা এক সংকটের দিকে নিশ্চিত ভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে—তা আপনারা নিঃসন্দেহে আগ্রহের সঙ্গে ও সম্ভবত কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ফেডারেশনের প্রশ্নে এক রাজনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা রয়েছে। 'সাম্প্রদায়িক'* পরিস্থিতিও আছে, মুসলিম লিগের প্রচেষ্টার ফলে তা এক বিশ্রী মোড় নিচ্ছে। কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, ছোটো বড়ো সমস্ত রাজ্য সমেত ভারতীয় রাজ্যগুলোতে বেড়ে-চলা বিক্ষোভ রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে আলোড়ন, তা সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিল্প-শ্রমিক ও চাষীদের অবস্থা। শ্রমিকদের পরিস্থিতি গুরুতর এবং বহু ক্ষেত্রে তা উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। আর সব সত্ত্বেও চাষীদের সমস্যা সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। যদি সংবাদপত্রগুলো থেকে তা বিচার করতে হয়, তাহলে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু, আসলে, তাদের মধ্যে এক প্রচন্ড জাগরণ ও আলোড়ন দেখা দিয়েছে, এবং আমি এই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছি যে, তাদের সন্তোষবিধান না-করলে তা এক আক্রমণাত্মক চেহারা নেবে।

সম্পর্কহীন মনে হলেও এইসব ঘটনাবলী পরস্পর সম্পর্কিত না-হয়ে পারে না। এর মূলগত কারণটি কী? নিশ্চয়ই জনকয়েক উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী নয়, যদিও তারা কোনো একটা জরুরী দাবি বা কোনো একটা সংঘাতকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত করতে পারে। আশু কারণটি হতে পারে কংগ্রেসের সরকার গঠন, যা জনগণের দীর্ঘকাল চেপে-রাখা আবেগের মুক্তি ঘটিয়েছে, এবং সময়ের আগেই এক মুক্তির আশার জন্ম দিয়েছে। প্রকৃত কারণটি হচ্ছে, জনগণের সমস্যা সমাধানে বিলম্ব; এবং যে দমননীতি জনগণকে দাবিয়ে রাখে তা তুলে নেওয়ায় সমস্যাগুলো ও তাদের সমাধানের দাবি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসছে।

যুক্তিযুক্তভাবেই আমরা এইসব উচ্ছৃংখলাকে আটকাবার এবং এই নতুন প্রাণশক্তিকে উপযুক্ত পথে চালিত করার চেষ্টা করেছি। আমরা পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে পারিনি, কিন্তু একথা বলতে পারা যায় যে, মোটের উপর কংগ্রেসের শৃংখলা দেশের মধ্যে একটা শক্তিশালী হেতু ছিল। এই শৃংখলা কি বজায় থাকবে?

---

*সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলো হচ্ছে ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর সমস্যা।

এ সম্পর্কে আমাদের আসল প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশ জুড়ে এই যে উদ্ভূত পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানানো উচিত, যদি না এ-থেকে-আসা উচ্ছৃংখলতা থাকে,—এর জন্যে আমাদের মৌল রাজনীতি কী হওয়া উচিত হবে? এ সম্পর্কে জানি না মনে করায় কোনো সাহায্যই হবে না। একে কায়দা করার দুটো পদ্ধতি আছে: দমননীতি, অথবা জনগণের কাজে লাগে এমন কিছু সংস্কার, এবং এইভাবে সর্বত্র জেগে-ওঠা নতুন শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা।

স্পষ্টতই, আমাদের সামনে দমননীতির পথ খোলা নেই, যদিও কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা এ পথ গ্রহণ করতে পারি। আমরা দমননীতির বিশেষজ্ঞ নই, আর তাছাড়া এতে আমাদের তিলমাত্র রুচি নেই। সর্বক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চয়ই চড়ায় আটকে যাবো, কারণ এইটেই সম্ভব যে, আমাদের দিকে জনপক্ষের সহানুভূতি থাকবে না, আর তা না থাকলে আমরা শক্তিহীন।

অন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে, জনগণের, বিশেষ ক'রে চাষীদের ও তারপরে শিল্প-শ্রমিকদের ফলপ্রদ সাহায্যের জন্যে ভীষণ ও দ্রুত জোর দেওয়া। তা করতে না-পারাটা মারাত্মক হবে।

এই চিঠিতে আমি আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কথা জানাচ্ছি। এই জটিল পরিস্থিতির গোটাটাই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারছি না, কিন্তু আমি মনে করি, ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীদের কাছে আমার চিন্তার সাধারণ ধারাটি উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। তা করার জন্যে আমি অধৈর্য হয়েছি, কারণ আমি দেখছি এক বিরাট গুরুতর সংকট ঘনিয়ে আসছে, আমাদের তা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আমার এ ধারণাও হয়েছে যে, আমাদের কোনো কোনো প্রদেশিক সরকার, মূলগত প্রশ্নগুলোতে যথাযোগ্য মনোযোগ দেবার চেয়ে, তাদের প্রাত্যহিক সমস্যাগুলোতেই বেশি মগ্ন হয়ে আছে। যেসব ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারগুলো বিশেষ-ক্ষমতা আইন ও পেনাল-কোডের রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক অংশের ব্যবহার করেছে, সেই সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও প্রকাশের আগেই সাংবাদিকদের জামিন দিতে বাধ্যতা আমাকে আশংকাপীড়িত ক'রে তুলছে। এ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ নেই যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে দমনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করাটা দরকারী হয়, কিন্তু এই কর্মপন্থা তার লক্ষ্যের মুখে চড়ায় আটকাবে, যদি তার ফলে সেই একই প্রবণতা উৎসাহ পায়, যাকে সে দমন করতে চেষ্টা করে। যখন এটা স্পষ্ট যে, দমননীতি প্রযুক্ত হচ্ছে প্রকাশ্য হিংসার বিরুদ্ধে,—এইরকম বিরল ক্ষেত্র ছাড়া, কোনো কংগ্রেস সরকারের পক্ষে দমননীতি কখনো সফল হতে পারে না। অন্য সব ক্ষেত্রে তা শুধুই অসন্তোষের শিখাই জাগিয়ে তুলবে।

ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, কোনো কংগ্রেস সরকারের হাতে বিশেষ-ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ, আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের সেই আইন প্রয়োগকেই মোটের উপর যুক্তিসঙ্গত ক'রে তোলে। যখন সংগ্রামের সময় আসবে তখন নতুন ক'রে একে প্রয়োগের জন্যে যেন তাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে; আর

যখন তা এইরকমই প্রযুক্ত হবে, যেমন তা প্রযুক্ত হবেই, তখন আমাদের মুখ বন্ধ হয়ে থাকবে ও সমস্ত সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বাটলিওয়ালার ব্যাপারটার যৌক্তিকতা থাকতেও পারে, বা নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, তা আমাদের এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসীদের ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত করেছে এবং দমননীতিতে গা-ছেড়ে দেবার জন্যে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলোকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ যুক্তি যুগিয়ে দিয়েছে। এই একই ঘটনা হচ্ছে নতুন প্রকাশনের আগে জামিন দাবি করাটা ; আমাদের সরকার ও অ-কংগ্রেসী সরকারগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কী ? ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত বড়ো কিছু নয়।

আমরা যদি এই পথ অনুসরণ করি, আর আমরা তো স্থানু হয়ে থাকতে পারি না, আমাদের এ পথেই চলতে হবে, আমরা হবো ব্রিটিশ সরকারের রীতিপদ্ধতির এক অনুকরণ। তারই কাজ ক'রে ও তা করার ঘৃণ্যতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে হয়ে উঠবো তারই নকল। এর কোনো মধ্য পন্থা নেই। তাই, এটা আমাদের কাছে একটা মারাত্মক প্রশ্ন। যারা ব্রিটিশ সরকারের পেছনে রয়েছে আমরা কি ক্রমশই তাদের সামিল হতে চলছি না ?

আরও মুখ্য হচ্ছে আমাদের জমি ও শ্রমসংক্রান্ত রাজনীতি, বিশেষ ক'রে প্রথমটি। বড়ো ভূস্বামীদের দূরে সরে যাবার ভয়ে, প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাকে নরম করার। আমরা কাউকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই না, কিন্তু যখন এই মারাত্মক প্রশ্নগুলোই কাজ করছে এবং জনগণ ও ক্ষুদ্রগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত বাধছে, তখন আমাদের প্রথমোক্ত স্বার্থই বেছে নিতে হবে। এবং তা শুধু এই জন্যে নয় যে, আমরা এই রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছি, তা এই জন্যে যে, এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। অর্ধ-পন্থা বেছে নেবার সমস্ত প্রচেষ্টা কাউকেই তুষ্ট করবে না এবং তা জনগণের কাছে আমাদের সুনাম হানি করবে।

আমি আরও বেশি ক'রে এই চিন্তায় পৌঁচেছি যে, ভূমিসমস্যাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করাই হচ্ছে 'সাম্প্রদায়িক' সমস্যা সমাধানের একমাত্র কায়দা, উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের আংশিক নির্বাচনের সফরের সময় আমি বুঝেছি যে, গ্রামাঞ্চলের মুসলমান নির্বাচকদের কাছে একমাত্র যার দাম তা হচ্ছে, উত্তর প্রদেশের সরকারের মাধ্যমে বকেয়া খাজনা স্থগিত রাখা ও ঋণের জন্য তাগিদ না দেওয়া। তারা বড়ো কিছুর জন্যে অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। যদি এই বড়ো কিছু বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তা হবে 'সাম্প্রদায়িক' প্রতিক্রিয়া। অন্যসব বড়ো কিছু দূরে থাক, পরিণামে যদি তাদের কাছে বকেয়া খাজনা পরিশোধের দাবি করাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে প্রতিবাদের গর্জন উঠবে, আর আমি নিশ্চিত যে, কার্যত খাজনা আদায় হবে গর্জনের মধ্যেই। তাই আমার মনে হয় যে, সমস্ত বকেয়া খাজনা পুরোপুরি মকুব করা উচিত। একই রকম ভাবে সমস্ত ঋণও। আর শেষেরটা করলেও যথেষ্ট হবে না !

চিঠিটি ইতিমধ্যে বড়োই দীর্ঘ হয়ে উঠেছে, আমি আর দীর্ঘ করতে চাই না। কিন্তু আমার মনে যা হয়েছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিতে পেরেছি ব'লে আশা করছি,

এবং আমি চাই যে আমার সহকর্মীরা এ সম্পর্কে মনোযোগ দেবেন। সমস্যার ভারে আমরা ভেঙ্গে পড়ছি। যথাযথ প্রেক্ষিতে সমস্যাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং প্রকৃত প্রশ্নাবলীকে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।

প্রীতি সহকারে
জহরলাল নেহেরু।'

৩০ মার্চ, ১৯৩৮। জাঁ এরবের ও তার তরুণী পত্নী আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে; আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন; কলকাতার রামকৃষ্ণ-মিশন তাঁকে পাঠিয়েছেন ফ্রান্সে, সেখানে থিতু হয়ে বসবেন এবং একটা বেদান্ত-কেন্দ্র পত্তন করবেন। ফ্রান্সে তিনিই রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রথম প্রতিনিধি, আর সেক্ষেত্রে আমি খুবই জোরালো কাজ করেছি। এপর্যন্ত ভারতীয়দের লাতিন দেশগুলো সম্পর্কে এক বিরুদ্ধ-সংস্কার ছিল, তাঁরা শুধুমাত্র এ্যাংলো-স্যাকসন দেশগুলোর সঙ্গেই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখছিলেন। আমি সে-ত্রুটি শুধরে দিয়েছি; আর যে চিঠিতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে কাজের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার এই কথা বলা হয়েছে: 'আমরা বিশেষ ভাবে খুশী যে আমন্ত্রণ পেয়ে আপনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন; তাকে আমরা ভালো বাসতে শিখেছি শুধুমাত্র এমন এক দেশ ব'লে নয়, যার সংস্কৃতিতে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার কোনো কোনো সুন্দরতম উপাদান ও গুণ দেখা যাচ্ছে, তাকে ভালোবাসতে শিখেছি, জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-ভাবনার সেই মহান্ ব্যাখ্যাতা মঁ রম্যাঁ রলাঁর স্বদেশ বলেও। দু'মাস হলো স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ পারীতে এসেছেন, এরই মধ্যে তিনি সেই ফ্রান্সের আত্মিক ঐশ্বর্যের মূল্য বুঝতে পেরেছেন, যে অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের মিলন ঘটায়; আর তিনিও তার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। (তিনি কিছুটা ফরাসী বলতে শুরু করেছেন।)

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের করুণ পরিণতি সম্পর্কে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ কিছু খুঁটিনাটি তথ্য আমাকে দিলেন,—তিনি ছিলেন মহৎ শিল্পী, তিনিই আমার কাছে প্রথম রামকৃষ্ণকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি মানসিক অশান্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন, এমনকি তাঁকে মানসিক চিকিৎসালয়েও আটকে রাখা হয়েছিল। সন্ন্যাসী হবার জন্যে, নির্জনতায় নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাঁর আবেগদীপ্ত বাসনা ও বিয়ের মধ্যে দিয়ে যে-মার্কিন জীবনযাত্রায় ঢুকেছিলেন তার মধ্যে এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। তিনি কখনো মন ঠিক ক'রে উঠতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের অন্তর যোগাযোগ ছিল (তাঁর মৃত্যুর পরদিনও তাঁর একটা চিঠি পেয়েছেন); স্বামী অশোকানন্দের চেয়ে অনেক বেশি প্রীতিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে তিনি তাঁর কথা বললেন; অশোকানন্দের আপসবিরোধী কঠোরতা আমাকে মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। ত'ার উদগ্র কল্পনা

যখন সত্যকে তাঁর কাছে বিকৃত করেছে, এমনকি তখনও তিনি গভীরভাবে আন্তরিক থেকেছেন। আমার কাছে মনে হলো স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ মহৎ মানবিক বোধের মানুষ, সে মানবিক বোধ বৃহৎ, সহিষ্ণু, উপলব্ধিক্ষম, কখনোই কাউকে ধর্মান্তরিত করতে অভিলাষী নয়, কিন্তু প্রত্যেককে নিজের আত্মিক প্রবণতা অনুসারে (রামকৃষ্ণের খাঁটি মর্ম অনুসারে) সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করতে প্রতোককে চালিত করে। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের মহান্ শিষ্য ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ; গুরুর প্রত্যক্ষ অলৌকিক উদ্দীপন-ক্ষমতা (le souffle) তিনি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, এবং অনেক গোপন কাহিনী ব'লে গেছেন, তার কিছু কিছু সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাদের শোনালেন।

এরবের-দম্পতিকে আগামী নভেম্বরে ভারতবর্ষে গিয়ে আবার নতুন ক'রে চার মাস থাকতে হবে, ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে একখানি বই লেখার জন্যে শ্রীমতী এরবের সেখানে নিবেদিতার হদিশ করতে দলিলপত্র সংগ্রহ করতে চান।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৮। জেনেভা থেকে জাঁ এরবের এসেছেন বোনের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়েক মাস ভারত সফরে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা সম্পর্কে একটা বড়ো কাজের জন্যে তাঁরা একসঙ্গে খাটছেন এবং তাঁর শ'খানেক চিঠি এবং যে দলিল-পত্র বিশেষ ক'রে ইংলন্ডের ও অন্য দেশের মহাফেজখানায় (archive) তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, তা এই চরিত্রটি সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করবে ; তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে বড়ো হয়ে উঠছে দেখা যাচ্ছে। এটি আর শুধুমাত্র বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপার নয়, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি প্রথম সারিতে যে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার ব্যাপার। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অরবিন্দ ঘোষ ও তিলকের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি (আড়ালে থেকে) লড়াই করেছেন। প্রচন্ড উৎসাহে তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন এবং ইংরেজ পুলিশ তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি প্রায়ই ইংলন্ডে এসেছেন, সেখানে বিরোধীদলকে ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করেছেন ; বিশেষ ক'রে তাঁর সম্পর্ক ছিল কেইর হার্ডি'র সঙ্গে। তাঁর মধ্যে ছিল তাঁর আইরিশ রক্তের অগ্নিশিখা, আর তা থেকেই তিনি তাঁর বিপ্লবী আবেগকে ভারতবর্ষের খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। প্রবল বুদ্ধিমত্তা তাঁকে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় সহযোগীও ক'রে তুলেছিল। নিবেদিতাই এই প্রতিভাধর পন্ডিতের প্রথম গ্রন্থগুলো সংস্কার ক'রে দিয়েছিলেন, তখন তিনি মোটেই লেখার কায়দায় (l'art d'e'crire) ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন না ; নিবেদিতা জানতেন কী ক'রে তাঁর জন্যে অর্থসাহায্য আনতে হয়, যা তাঁর কলকাতার বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব ক'রে তুলেছিল। (কৃতজ্ঞতা জানাতে জগদীশচন্দ্রও অলিন্দে নিবেদিতার আবক্ষ-মূর্তি বসিয়েছেন।) তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন চিঠি-লিখিয়ে ; আর তাঁর এই "রোগের" কল্যাণেই ভারতবর্ষে তাঁর গোটা যুগটারই ছবি আমাদের জন্যে আঁকা হয়ে আছে।

এই ছবিই আবার জীবন্ত ক'রে তুলতে গিয়ে আনন্দিত এরবের দম্পতি আমাদের বললেন যে, একই বিষয়ে তাঁদের নিঃসন্দেহে অত্যন্ত পৃথক দুটি খসড়া করতে হবে : একটি সম্পূর্ণ, যা বেশ দীর্ঘকাল না-ছেপে রেখে দিতে হবে, যাতে এখনো জীবিত সেইসব ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়া যায়, যাঁরা নিবেদিতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ; অন্যটি, অনেক সংযত।

একটি ট্রাজিক ব্যাপার নিবেদিতার জীবনের শেষ বছরটি বেদনামণ্ডিত করেছিল। বিবেকানন্দেরও বান্ধবী শ্রীমতী অল বুল অত্যন্ত অসুস্থ হ'লে নিবেদিতা তাঁকে প্রাচীন আয়ুর্বেদের ওষুধ ধরিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সবসময়েই তার ব্যবহার হয়, ফলও দেয়। তিন দিন পরে, শ্রীমতী অল বুল মারা যান। আর তিনি তাঁর সব সম্পত্তি নিবেদিতাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সম্পত্তি হাতিয়েছেন ব'লে নিবেদিতার বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন এই অভিযোগ করতে ছাড়েনি যে, তিনিই শ্রীমতী অল বুলকে মেরে ফেলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত ভয়ংকরভাবে জেগে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আর এই শোকে ও এই অপবাদে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে ছিলেন, এতেই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বলছি), তিনি কী ক'রে সম্পত্তি নিতে পেরেছিলেন ? আমাকে একথা বলা বৃথা যে, তিনি নিয়েছিলেন নিজের জন্যে নয়, এবং এ দিয়ে তিনি পুরোপুরি ভারতবর্ষেরই উপকার করেছেন (আর বিশেষ ক'রে করেছেন জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরকে) তিনি তাঁর সম্মানও ভারতবর্ষের স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছেন, আমি তা মানবো না। সিজারের পত্নীকে, ...বিবেকানন্দের মহিয়সী শিষ্যাকে সন্দেহভাজন হ'লে চলবে না। বিবেকানন্দ কখনো তার অনুমতি দিতেন না।

১৯৩৯

বর্তমানে অক্সফোর্ডে অধ্যাপনারত ভারতীয় দার্শনিক এস. রাধাকৃষ্ণান গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি উপহার দেবার জন্যে একটি সংকলন-গ্রন্থ করেছেন, তাতে আমার সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। আমি এইটি লিখলাম (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) :

"পশ্চিমের একটি মানুষের গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

গান্ধী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই জাতীয় ইতিহাসের এক নায়ক নন, যাঁর পুরাণ-কল্প স্মৃতি সহস্রবর্ষের মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তিনি শুধুমাত্র সক্রিয় জীবনের প্রাণশক্তি ছিলেন না, যিনি ভারতবর্ষের জনগণের মনে ঐক্যের স্পর্ধিত চেতনা, শক্তি, এবং স্বাধীনতার ইচ্ছা সঞ্চারিত করেছেন। পশ্চিমের প্রতিটি জাতির জন্যেই ভুলে-যাওয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা-করা খ্রীস্টের বাণীকে নতুন ক'রে তিনি তুলে ধরেছেন ; তাঁর প্রকাশের আলোকচ্ছটা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

ইউরোপের চোখের সামনে তিনি সেই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন এমন

দৃষ্টান্তকে প্রায় অলৌকিক ব'লে মনে হয়েছে, চার বছরের প্রচণ্ড যুদ্ধ থেকে ইউরোপ বেরিয়ে এসেছে কি আসেনি, তার ধ্বংসলীলা, তার ভগ্নস্তূপ আর আক্রোশ টিকেই রয়েছে, আরো বেশি অপ্রশম্য নতুন যুদ্ধের বীজকে ঢেকে রেখেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপ্লবের ওলট-পালট, সঙ্গে নিয়ে এসেছে সামাজিক ঘৃণার মারাত্মক মিছিল, যা প্রতিটি জাতির মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ইউরোপ তখন এক দুর্ভর রাত্রির পাষাণ-চাপা পড়েছে, সে-রাত্রি দুঃখদর্শা ও হতাশায় ভারি, একটি আলোক রেখাও কোথাও নেই! এই ক্ষুদ্র ও নগ্ন, শীর্ণ মানুষটি, যিনি সমস্ত হিংসাকে অস্বীকার করেছিলেন, যিনি শুধুমাত্র তাঁর যুক্তি ও প্রেমের অস্ত্রে বলীয়ান ছিলেন এবং যাঁর নম্র ও একগুঁয়ে মিষ্টতা অস্ত্রশক্তির উপরে সদ্য সদ্য বিজয় এনে দিয়েছিল, সেই গান্ধীর আবির্ভাবকে মনে হয়েছিল প্রচলিত ধ্যানধারনার বিরোধী এক চ্যালেঞ্জ, যা পশ্চিমের রাজনীতি ও চিরাচরিত, স্বীকৃত, তর্কাতীত চিন্তাধারার মুখে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ছিল একই সময়ে, মুক্তির প্রভাত-রশ্মি, যা হতাশার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। একে বিশ্বাস করা কষ্টকর ছিল। এবং এমন পরম বিস্ময়ের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মাতে দেরি হয়েছিল। আমার চেয়ে তাঁকে কে বেশি ভালো ক'রে দেখেছে? মহাত্মার বাণী আবিষ্কার করতে ও তা শোনাতে পশ্চিমে আমিই ছিলাম অন্যতম প্রথম ব্যক্তি...ভারতবর্ষের আত্মিক গুরুর অস্তিত্বের ও নিরবচ্ছিন্ন, ধৈর্যশীল প্রগতিশীল কর্মের নিশ্চয়তা যেমন যেমন স্বীকৃতি আদায় করেছে, পশ্চিম থেকে তেমন তেমনিই এক কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসের প্রবাহ তাঁর দিকে বয়ে গেছে। অনেকের কাছে তিনি ছিলেন যেন খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব। অন্যদের কাছে, সেইসব স্বাধীন চিন্তাশীলদের কাছে, যাঁরা উদ্বিগ্ন পশ্চিমের সেই সভ্যতার অনিয়মিত পদক্ষেপে যে-সভ্যতার কোনো নৈতিক নীতিই আর পথচলার নির্দেশের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, আর এমনকি যার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বিস্ময়কর প্রতিভা তার নিজের ধ্বংসের দিকে বিকটভাবে ঘুরে গেছে, গান্ধী ছিলেন তাঁদের কাছে জাঁ-জাক্ রুসোর ও তলস্তয়ের নতুন অবতার, যিনি ভ্রান্তি-মোহকে ও সভ্যতার সমড় অপরাধকে অভিযুক্ত করেন, যিনি মানুষের কাছে প্রকৃতিতে, সরল জীবনে, স্বাস্থ্যে ফিরে যাবার কথা প্রচার করেন। বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো তাঁকে না-জানার ও উপেক্ষা করার ভান করেছে, কিন্তু সে সব দেশের মানুষেরা তাঁর মধ্যেই তাদের শ্রেষ্ঠ সুহৃদকে, তাদের ভাইকে অনুভব করেছে। আমি এখানে, এই সুইজারল্যান্ডেই দেখেছি, গ্রাম ও পাহাড়াঞ্চলের দীন চাষীদের মধ্যে তিনি কী পবিত্র প্রেম জাগিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু পাহাড়ের উপরে খ্রীষ্টের ধর্মোপদেশের অনুরূপ তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের বাণী লক্ষ লক্ষ সৎ মানুষের চিন্তাকে যদি স্পর্শ করেও থাকে, সে-বাণী এক জগতের ভবিতব্যকে পাল্টাতে পারেনি, যে-জগৎ নিজেই যুদ্ধ ও ধ্বংসে আত্মনিয়োগ করেছে (যেমন পারেনি নাজারথের প্রভুর বাণী)।

রাজনীতিতে প্রযুক্ত হবার জন্যে অ-হিংসা দাবি করে, আজকের ইউরোপে যার আধিপত্য তার চেয়ে অনেক পৃথক এক আবহাওয়া : এর প্রয়োজন হচ্ছে এক সামগ্রিক, বিপুল ও সর্বসম্মত আত্মত্যাগের ; যারা আজ জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে তাদের নির্মম সাক্ষ্য রেখেছে, সেই সব গণতন্ত্রধ্বংসী ডিক্টেটরবাদের নতুন রাজত্বগুলোর সামনে সেই আত্মত্যাগের বর্তমান সাফল্যের কোনোই সম্ভাবনা নেই, জনগণের পক্ষে অতি দীর্ঘ দিনের অগ্নিপরীক্ষার পরই শুধু এমন আত্মত্যাগের বিকীরণের বিজয়ীর মতো ক্রিয়া করার আশা আছে। আর জনগণ যদি গান্ধীর বিশ্বাসের মতো এক বিশ্বাসে পুষ্ট ও উদ্দীপ্ত ব'লে নিজেদের মনে করতে পারে, একমাত্র তাহলেই সেই অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করার মতো বীরত্ব লাভ করতে পারে। পশ্চিমের সংখ্যাগারিষ্ঠ লোকের মধ্যে ঈশ্বরে এই বিশ্বাসের অভাব, যেমন তা জনগণের মধ্যে তেমনি এলিতদের মধ্যে। আর নতুন (জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী) বিশ্বাস-গুলো হিংসার জন্মদাতা। ইউরোপের জনগণের সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে সমস্ত পন্থায় তাদের মুক্তি, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ; এবং ততদিন পর্যন্ত তাদের রক্ষা করা, যতদিন পর্যন্ত হাতমেলানো ফ্যাসিস্ট ও জাতি-বিদ্বেষী রাষ্ট্রগুলোর সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদগুলো তাদের জীবনকে বিপদাপন্ন করবে। তারা রাজনীতি বর্জন করলে মারাত্মক ভাবে তা মানবতার দাসত্বকে ডেকে আনবে, এবং তা সম্ভবত বহু শতাব্দীর জন্যেই। এই পরিস্থিতিতে আমরা গান্ধীর মতবাদকে সুপারিশ বা প্রয়োগ করতে পারি না, তাঁর সম্পর্কে আমাদের যতো শ্রদ্ধাই থাকুক না কেন।

আমাদের কাছে মনে হয়, খ্রীষ্ট্রীয় মধ্যযুগের বিরাট বিরাট মঠ-বিহারের ভূমিকা নেবার মতোই তিনি যেন জগতে আহূত হয়েছেন ; উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মতো সেইসব মঠ-বিহারে নৈতিক সভ্যতার সবচেয়ে বিশুদ্ধ সম্পদ, শান্তি ও প্রেমের মনটি-মনের নির্মলত্ব সংরক্ষিত হয়েছিল। ভূমিকা গৌরবময় ও পবিত্র ! মানবজাতি এক সংকটময় ও ক্রান্তিকালের যে প্রচন্ড যন্ত্রণা-পীড়ন পেরিয়ে আসছে তার মধ্যে, চির-কালের সেই মহান্ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা সাঁ-ব্রুনো, স্যা-বের্নার, সাঁ-ফ্রাঁসোয়াদের মতোই গান্ধীর মন যেন 'ঈশ্বরের নগরী' (Civitas Dei) মানুষের ভালবাসা ও ঐকতানকে বজায় রাখতে পারে।

আর আমরা বুদ্ধিজীবীরা, বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পীরা, যারা আমাদের দুর্বল শক্তি অনুযায়ী কাজও করি মনের জন্যে সমস্ত মানুষের এই মহানগরী বানিয়ে তুলতে, যেখানে শাসন করবে ঈশ্বরের শান্তিচুক্তি (la treve de Dieu), আমরা যারা তৃতীয় সম্প্রদায় (যেমন গির্জাসংক্রান্ত ভাষায় বলা হয়ে থাকে), এবং আমরা যারা বিশ্ব-মানবতার ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীভূত, আমরা আমাদের প্রেম ও সসম্মান-প্রীতির ঐকান্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাবো গুরু ও ভ্রাতা গান্ধীকে, যিনি হৃদয়ে ও কর্মে আমাদের আগামী-কালের মানবতার আদর্শকে উপলব্ধি করছেন।"

মার্চ, ১৯৩৯। উন্মাদ শান্তিবাদীদের মধ্যে প্রচন্ড বেসামাল অবস্থা। গান্ধী মিউনিক চুক্তিকে ধিক্কার দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'পাত্রি উমেইন'-এ উদ্গার করেছেন ফেলিসিআঁ শালাইয়ে। গান্ধী লিখেছেন ঃ

"আট দিনের বেশি পৃথিবীতে বাঁচার জন্যে ইউরোপ তার আত্মাকে বিক্রি করেছে।

মিউনিকে ইউরোপ যে শান্তিকে লাভ করেছে, তা হিংসার জয়, আর সেটা তার পরাজয়ও। যদি ইংলন্ড ও ফ্রান্স বিজয়ের জন্যে নিশ্চিত হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা কর্তব্য সম্পন্ন করতো : চেকোস্লোভাকিয়াকে বাঁচাতো…কিন্তু জার্মানী ও ইতালির মিলিত হিংসার সামনে তারা পিছিয়ে এসেছে। আমি সাহস ক'রে বলতে পারি, জাতীয় সম্মান রক্ষায় চেকরা অস্ত্রের যেমন, তেমন যদি অহিংসার ব্যবহার জানতো, তাহলে জার্মানী ও ইতালির সমস্ত শক্তির মুখোমুখি হতে পারতো। যে-শান্তি শান্তিই নয়, তা ভিক্ষার অসম্মান থেকে ইংলন্ড ফ্রান্সকে রেহাই দিতে পারতো ; আর তাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যে শেষ মানুষটি পর্যন্ত প্রাণ দিতে পারতো…"

ক্ষিপ্ত শালাইয়ে তার পাল্টা দিয়েছেন :

—"…তাঁর এই বক্তব্যটি কী অদ্ভুত! এর মধ্যে কী অজ্ঞতা নিহিত! কী অপূর্ব নৈতিক বিচারের ইঙ্গিত! চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্যাবলীর অতি সাধারণ তথ্যই গান্ধী জানেন না…গান্ধী জানেন না যে, এক বিভক্ত রাষ্ট্রের আধিপত্যের বদলে, এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে ওঠার জন্যে আজ চেকরা যুক্তিযুক্তভাবেই উল্লসিত ; তিনি জানেন না যে, প্রাচীন স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হলো ব'লে, স্লোভাক ও ইউক্রেনীয়রা আজ চেকদের সঙ্গে আরও সৌহার্দপূর্ণভাবে মিলিত ব'লে এখন নিজেদের মনে করছে। গান্ধী দেখতে পাচ্ছেন না যে, চেকোশ্লোভাক দুর্গ ভেঙ্গে দিয়ে এখন থেকে সেই যুদ্ধটি অসম্ভব ক'রে তোলা হলো, জার্মানীর বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া বা ফ্রান্স…"

কারণ, একমাত্র, হিটলারের জার্মানীই ফেলিসিআঁ শালাইয়ের সস্নেহ উদ্বেগের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে! আর এই জার্মানীই সদ্য সদ্য শালাইয়ের মুখে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মেরেছে। কিন্তু অতীতের এই সৎ মানুষটির এতে চৈতন্য হবে কি? তাতে আমার সন্দেহ আছে।

৩ আগস্ট, ১৯৩৯। ভেজলে*। এক তরুণ ভারতীয় এসেছেন আমার ফিল্ম তুলতে, সেটা করা হচ্ছে গান্ধীর জীবন নিয়ে। ফটো তোলা হলো গোলাপ বাগানের ঘেরের মধ্যে, পটভূমিকায় রইল পাহাড় আর সুপ্রাচীন গির্জাটি। আমি আমার 'গান্ধী'-র প্রথম পাতা (ছবিটা) পড়ছি। তরুণ ভারতীয় চেট্টিয়ার সম্প্রতি আশ্রমে গান্ধীর ফিল্ম তুলেছেন। তিনি বললেন, (কয়েক মাস আগে স্বাস্থ্য যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল তা সত্ত্বেও) গান্ধীর স্বাস্থ্য তাঁর কাছে খুব ভালোই মনে হয়েছে ; আর ভারতবর্ষের উপরে তাঁর প্রভাব আজকের মতো কখনো এতো বিরাট ছিল না। পারী থেকে আসা এই ফটোগ্রাফারটি সম্প্রতি সুইস-জার্মানে একটি সরকারী জাতীয়তাবাদী ও সামরিক প্রচারের ফিল্ম তুলেছেন, সেটি ১ আগস্ট প্রথম মুক্তি পেয়েছে। একথা

---

*ফ্রান্সের ইয়নের ভেজলে-এ রলাঁ ১৯৩৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একটি বাড়ি কেনেন। ১৯৩৮ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯৪৪) সেখানে ছিলেন। মাঝে মধ্যে পারীর বাসায় আসতেন।—অনু

স্বীকার করা উচিত যে, গোয়েবলসের জার্মানী যদি এক নির্লজ্জ প্রচার-যুদ্ধ শুরু ক'রে থাকে, তাহলে এখন সে প্রত্যুত্তর দেবার লোক পেয়েছে। আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ফিল্ম রেডিও ও পুস্তিকার মাধ্যমে পাল্টা-প্রচারে দুনিয়া ভাসিয়ে দিচ্ছে। আর এখন ছোট্ট দেশগুলো সুইজারল্যান্ডও এই যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

১৯৪০

এপ্রিল, ১৯৪০। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সদাশয় এনড্রুজের মৃত্যু। মানুষটির মধ্যে মূর্ত হয়েছিল সমস্ত নম্রতা, সক্রিয় প্রেম, খ্রীষ্টবাণীর পরম স্বার্থ-শূন্যতা। ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্যে ইউরোপে তাঁর মতো এমন বেশি আর কেউ করেনি। গোটা জগৎ জুড়ে নির্যাতিত ভারতীয়দের তিনি পক্ষসমর্থন করেছেন, জগৎ জুড়ে তাঁর প্রচার-কাজ চলেছে। আর ভারতবর্ষেই তিনি ছিলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, তাঁকে ভালোবেসেছি। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, আমার দুই চোখ তাঁর সুন্দর দুটি প্রীতিপূর্ণ চোখে সর্বশেষ প্রীতির নমস্কার জানাচ্ছে।* ফেব্রুয়ারিতে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল (সম্ভবত পেটের ক্যানসারের জন্যে)। তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল, সেখানে তিনি মারা গেছেন। বিদায়, এনড্রুজ ও পিয়র্সন, তোমারা যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় সাহসভরে তরুণ গান্ধীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তোমরা দু'জন যারা ভিলা অলগায় আমার অতিথি হয়েছিলে! যারা জগতকে আলোকিত করেছে, সেইসব বীর ও সন্তদের জগৎ সন্দেহ করে না। অন্তত তাদের মৃত্যুর অনেক পরে ক্যাথলিক চার্চ তার নিজের লোকদের দাবি জানায়। কিন্তু সন্ত-এনড্রুজ ও সন্ত-পিয়র্সনের দাবি কে জানাবে?

১৯৪১

১৫ জুন, ১৯৪১। পারী। রাতের খাওয়ার পর জাঁ এরবের এলেন, বাবাকে দেখার জন্যে তিনি অন্য অঞ্চল** ডিঙিয়ে আসতে পেরেছেন (তাঁর বাবা নতর্-দাম-দে-শাঁ রাস্তায় আমার প্রতিবেশী…)। ভারতীয় গ্রন্থগুলো প্রকাশ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম, এরবের সেগুলো সম্পাদনা করছেন। রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজী মঁপেলিয়ের

---

* পিয়র্সনের দেওয়া ট্রান্সভালে তোলা গান্ধী-এনড্রুজ-পিয়র্সনের একখানা ফটো রলাঁর দেয়ালে টাঙানো থাকতো।—অনু.

** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স দুটি অঞ্চলের ভাগ হয়। এক অঞ্চলের শাসন থাকে সোজাসুজি জার্মানীর হাতে, অন্য অঞ্চলের দালাল ভিসি সরকারের হাতে। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া-আসা এবং খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্যেই আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ জেনেও রলাঁর পক্ষে সোজাসুজি শোকবাণী পাঠানো সম্ভব হয়নি। সেই কথা জানিয়ে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ৩০ আগস্ট এদম প্রিভা রলাঁর হয়ে ঠাকুর পরিবারের বন্ধুদের সান্ত্বনাবাণী পাঠিয়েছিলেন।—অনু.

বিশ্ববিদ্যালয়ে শংকর সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন, বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী তা শুনে চলেছেন, আর তাঁদের মধ্যে আছেন বহু পাদ্রী ও সন্ন্যাসী, তাঁরা লোভীর মতো ভারতীয় ধ্যানের পদ্ধতিগুলো অনুধাবন করছেন। তরুণ অধিবিদ্যাবিদরা সবচেয়ে বিমূর্ত এই তত্ত্ববিদ্যায় ঝাঁপ দিয়েছে। আমার বইগুলো এখন তাদের কাছে খুবই কাঁচা ঠেকে : দশ বছর আগে এগুলো তাদের কাছে ছিল খুবই অখ্যাত, তারা এদের কথা শুনতেও চাইত না। শ্রীমতী এরবের নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর বইটি শেষ করেছেন, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ভারতীয় বিদ্রোহের আন্দোলনের সবকিছু এর মধ্যে ধরা পড়েছে ও স্পষ্ট হয়েছে। ওকাকুরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও এতে আছে। এরবের রামকৃষ্ণের চিন্তার সবচেয়ে সম্পূর্ণ এক সংকলন করেছেন এবং তার সেই দেশি কাঁচা রঙটাও (verdeur) ফিরিয়ে এনেছেন, যা তাঁর শিষ্যরা সংকোচভরে ঢেকে রাখেন।

১৯৪২

মে, ১৯৪২। চন্দ্র বোস, বার্লিনে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আরও একবার তিনি ঝাঁপ দিলেন। এই দক্ষিণে, এই বামে। মস্কো। বার্লিন। টোকিও··· এই উগ্র স্বভাব, আবেগপ্রবণ বাঙালীদের কখনো যুক্তির রাজনীতি ছিল না ; এদের ঈর্ষার দমক, অহমিকা, এদের চিরকাল জ্বালাকরা ক্ষতে এরা দপ ক'রে জ্বলে জ্বলে ওঠে।

১৯৪৩

নভেম্বর ১৯৪৩।—পারীর ভারতীয়রা আমার সামনে ফাঁদ ফেলেছেন। তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (ডি. এস. মাধব রাও-এর স্বাক্ষর-নামায়) এক "আজাদ-হিন্দ কেন্দ্রের"-র অঙ্গীভূত হতে, কেন্দ্রটি সুভাষচন্দ্র বসুর (বাঙালী নেতা, যিনি জাপানীদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেছেন) দোহাই দিচ্ছে, এবং তাঁরা গান্ধীর (গ্রেপ্তারের পূর্বাহ্নের) এক তথাকথিত বাণী দেখাচ্ছেন, তাতে গান্ধী অ-হিংস প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছেন ও লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে, আমি তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না, এবং আমার কাছে আমার স্বদেশ বন্দী। কিন্তু তাঁদের উদ্বেগ শুধু তাঁদের স্বদেশের জন্যেই। আর তাকে স্বাধীন করার জন্যে, সমস্ত পন্থাই তাঁদের কাছে সৎ, এমনকি অপরকে শৃংখলিত করাও !

— — —

পরিশিষ্ট ক

১

ভারতবর্ষের সংবাদ

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধঘোষণা

ভারতবর্ষের সংবাদ বিরল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। লণ্ডনের রক্ষণশীল সরকার, যাকে মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কুক্ষিগত করেছেন (কিংবা বরং যে তাঁকে কুক্ষিগত করেছে), সমগ্র গ্রেটব্রিটেনের জনসংখ্যার চেয়ে সাতগুণ বেশি ও সমগ্র পৃথিবীর ছয়ভাগেরও বেশি এক জনসংখ্যার মহিমান্বিত প্রতিরোধ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছে। যাদের বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হয়, এমন কিছু লোকের গ্রেপ্তার, জাতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যাদের মোটেই মতের মিল নেই এমন কিছু লোকের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, উদ্বেলিত বিশাল মহাদেশের দুই কি তিনটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ভীরু প্রকাশ, ভারতবর্ষে যিনি নতুন দিল্লিতে বড়োলাটের কার্যভার গ্রহণ করেছেন সেই রোগাসোগা ব্যক্তিটির ‘মর্জিমাফিক ক্রিয়াকর্মে’’ *Hoc volosic jubeo*) সবকিছু থামিয়ে রাখা আছে :—এই ধরনের কিছু সংবাদ ছাড়া ব্রিটেনের সরকারী সংবাদসূত্র ইউরোপে অন্য কোনো সংবাদ গলিয়ে আসতে দেয় না।

আমরা নিজেদের পন্থায় সেই বিরাট সংগ্রামকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করবো, যে সংগ্রাম কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গর্ব ও সৌভাগ্যকে প্রভাবিত ক'রে তুলছে না, যে-পন্থা সে গ্রহণ করেছে এবং যে বিরল ব্যক্তিত্ব লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও তাতে আধিপত্য বিস্তার করেছে—তার ফলে সেই সংগ্রাম হয়ে উঠেছে সমগ্র মানবতার কাছে এক বিশাল ও চিত্তস্পর্শী অভিজ্ঞতা।

প্রথমে দেখাতে হবে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এই লড়াই শুরু হয়েছে।

গোড়া থেকেই গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা বুঝে নিয়েছিলেন। মার্সেই পৌঁছেই তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের সেকথা বলেছিলেন। লণ্ডনে প্রতিনিধিরা জড়ো হয়েছিল, তাদের ইংরেজ সরকার খাড়া করেছিল তার দেশীয় রাজাদের ও ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর (বলা ভালো. অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাল্প ব্রিটেন-প্রেমিকদের) মধ্যে থেকে : তারা কোনো মতেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিনিধি নয়। কিন্তু গান্ধী ছিলেন তাঁর দৃঢ়মূল আশাবাদের প্রতি বিশ্বস্ত, তিনি স্মিতহাস্যে বলেন, সে-আশাবাদ আশার অভাবেও আহত হয় না ; পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার সমস্ত পন্থা নিঃশেষ করাটাই তাঁর কর্তব্য ব'লে গান্ধী সাব্যস্ত করেছিলেন : কারণ, শেষমুহূর্ত পর্যন্তও, কোনো বিরুদ্ধবাদীর সদিচ্ছায় বিশ্বাস রাখতে তিনি সবসময়ে নিজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার বিরুদ্ধে, একই সময়ে তিনি সতর্ক থাকতেও

জানেন। তাছাড়া ইংলণ্ডে আসাটা বৃথা হয়নি ; কারণ লণ্ডন ও ল্যাকাংশায়ারে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছেন,—তার ফলে ভারতীয় সমস্যার যথাযথ অবস্থা তাদের জানাবার উপায় তিনি পেয়েছেন ও প্রচুর সহানুভূতি অর্জন করেছেন। ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্পর্কে পরে যা বলতে যাচ্ছি, তার দিক থেকেও একথা এখানে অবান্তর নয় যে, তিনি লণ্ডনে 'ফ্রেণ্ডস্ অফ ইণ্ডিয়া' গোষ্ঠী স্থাপিত করেছেন (৪৬ ল্যাংকাস্টার গেট, ডব্লিউ. ২), এবং গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা : 'দি ইণ্ডিয়া রিভিউ' (১৪৬ স্ট্র্যাণ্ড, লণ্ডন, ডব্লিউ. সি. ২) ভারতবর্ষের দাবি সমর্থনের ও সাম্প্রতিক আঘাত হানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তার দলে গণ্য করছে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, লরেন্স হাউস্‌মান, ফ্রেনার ব্রকওয়ের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষদের। ফ্রান্স ও তার বাইরের ভারত-সুহৃদদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এ সম্পর্কে মনোযোগ দিতে ও যদি সম্ভব হয়, তাঁদের সমর্থন জানাতে।

বোম্বাই থেকে গান্ধীর প্রথম সচিব মহাদেব দেশাই এই কথাই লিখেছেন যে, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হবার পরেও, লণ্ডন ছাড়ার আগে, গান্ধীর ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। "স্যর সামুয়েল হোর আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারে প্রস্তাবিত রক্ষাকবচ ও সংবিধানের সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেসের* সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের স্বাধীনতা থাকবে ; তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেসের দৃষ্টিকোণ যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। স্যর সামুয়েল হোর আরও বলেছিলেন যে, পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখার জন্যে বাংলাদেশে যাবার ও অর্ডিনান্স** সম্পর্কে গান্ধী যা ভাবেন, তা বলার অধিকার পাবেন। বড়োলাটের সঙ্গে একবার দেখা হবার প্রশ্নটাও ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের ভিলন্যভ থেকে গান্ধী স্যর সামুয়েল হোরকে এই অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন যে, একটি চিঠিতে তিনি এই আলোচনার মূলকথা পাকাপাকি অনুমোদন করুন এবং তাড়াতাড়ি এমন ভাবে পাঠান যাতে বোম্বাই পৌঁছেই তিনি উত্তর পেতে পারেন।" স্যর সামুয়েল হোর তার কোনো উত্তর দেননি, এবং তখন থেকেই তিনি বুদ্ধিমানের মতো মুখ বন্ধ ক'রে ছিলেন। এর উল্টো দিকে, ভারতবর্ষে ফেরার পথে এডেনে গান্ধী "বড়ো দিনের উপহার হিসেবে পেলেন, ভারতবর্ষে স্বৈরতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (পেশোয়ারে) লাল-কোর্তার* নেতা আব্দুল গফ্ফর খানের মতো বিশিষ্ট বন্ধুদের গ্রেপ্তারের নতুন সব খবর। তবুও গান্ধী আলোচনার শেষ

---

* লণ্ডন বৈঠকে গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত ও মনোনীত প্রতিনিধি।

** ভারতবর্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে এই প্রথম অর্ডিনান্সগুলো বাংলাদেশে জারি করা হয়েছে কিছু বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অজুহাতে।

* রুশ কমিউনিজমের সঙ্গে 'লাল কোর্তাদের' কোনোই সম্পর্ক নেই। আব্দুল গফ্ফর খান গান্ধীর ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁর এক নাম 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধী'। তিনি অহিংসার এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সমর্থক।

আশা পরিত্যাগ করেননি, । এবং ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার আগেই, তিনি তাঁর সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় এক প্রবন্ধে, কংগ্রেসের দাবি জানানো ন্যায্য অধিকারগুলোর কিছুই না-ছেড়ে সমঝোতায় পৌঁছুতে পারা যায় এমন সব পথই পরীক্ষা ক'রে দেখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর, বোম্বাইয়ে নামলে প্রণাম জানাতে এসেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বল্লভভাই প্যাটেল। কিন্তু তিনি দিলেন আগের চেয়েও আর গুরুতর সংবাদাদি: ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রদ্ধেয় নেতা, যাঁর মন ও চরিত্রের মহত্ত্বকে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানার সুযোগ হয়েছে, সেই জহরলাল নেহেরু সদ্য গ্রেপ্তার হয়েছেন নিছক এই অপরাধে যে, তিনি এলাহাবাদ ছেড়ে বোম্বাই গিয়েছেন, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদাধিকারে সেখানে যাওয়াটাই ছিল তাঁর পক্ষে যথাযথ কর্তব্য। আব্দুল গফ্‌ফর খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদের এক মাত্র অপরাধে পেশোয়ারে গুলিতে তের জন নিহত ও জন পঞ্চাশ আহত হয়েছে (তবুও সরকারী কোনো কর্মচারীর জীবননাশের প্রচেষ্টার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।) হাজারের বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে, গোটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই সামরিক আইন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব রয়েছে। দিল্লি-চুক্তির আগে অযৌক্তিভাবে দাবি-করা খাজনা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে যে-যুক্ত-প্রদেশে শান্তিপূর্ণ-আন্দোলন চলছিল, সেখানে সরকার সাধারণ আইনের অতিরিক্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, কঠোর ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা দিয়ে অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল বসিয়েছে, প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক বেশি বলপ্রয়োগের পন্থা ব্যবহার করছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এইসব খবর ও দেশের আবেগ বহন ক'রে এনেছেন; তাঁদের অভিমত এই যে, সক্রিয় হবার সময় এসে গেছে, তাঁরা গান্ধীকে তা শুরু ক'রে দেবার জন্যে তাগিদ দিতে চাইছেন। গান্ধীর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে যা লিখেছেন, সেই অনুসারে 'তখনো কিন্তু আরও একবার গান্ধীর সেই ধৈর্যই দেখা যাচ্ছিল, যে ধৈর্যে মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায়। বন্ধুদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি টেলিগ্রামে বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানানোর গোঁ ধরে রইলেন। বন্ধুজনেরা তার কাছে দরবার করলেন যে, এ ধরনের অনুরোধে জাতির মনোবল ভেঙ্গে পড়ার আশংকা আছে।" গান্ধী কোনো কিছু মানলেন না; জগতের সামনে তিনি প্রমাণ ক'রে দিতে চাইলেন যে, যা কিছু ত্রুটি ও লড়াইয়ের যা কিছু মনোভাব — তা এসেছে অপর পক্ষ থেকে।

২৯ ডিসেম্বর বোম্বাই থেকে তিনি বড়োলাটকে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন:

"গতকাল জাহাজ থেকে নেমে, বাংলাদেশের অর্ডিনান্স ছাড়াও, সীমান্ত প্রদেশের ও যুক্তপ্রদেশের অর্ডিনান্স, গুলিচালনা ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের গ্রেপ্তারের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। জানি না, এই কথা মনে করবো কিনা যে, এসব আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের অবসানেরই ইঙ্গিত, না কি আপনি এখনো চান যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি এবং কংগ্রেসের পক্ষে যে নীতি আমাকে অনুসরণ করতে হবে তার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকোণ আমি জানতে পারি। টেলিগ্রাম ক'রে উত্তর দিলে বাধিত হবো।"

লর্ড আরউইনের মতো মানুষটি যেমন করতেন, নিজের হাতে উত্তর দিতে তেমন অতিখ্যাত লর্ড উইলিংডন ৩১ ডিসেম্বর উত্তর দিইয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে দিয়ে : "যে সাংবিধানিক সংস্কারাবলীকে অতি সত্বর প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তার মহান কর্মে সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে, মহামান্য লাটবাহাদুর ও তাঁর সরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অভিলাষী" কিন্তু মহামান্য লাটবাহাদুর ও তাঁর সরকার যুক্তপ্রদেশের, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের ক্রিয়াকলাপ মানতে পারেন না ; যুক্তপ্রদেশের কৃষি-কর দিতে অস্বীকার করার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার কার্যকলাপ মহামান্য লাটবাহাদুরের সরকারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। "মহামান্য লাটবাহাদুরের জানা আছে যে, গত আগস্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আব্দুল গফ্ফর খানকে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী আন্দোলন পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন এবং তিনি যে স্বেচ্ছা-সংগঠনগুলোকে পরিচালনা করেন, তাদের কংগ্রেসী সংগঠন ব'লেই ওয়ার্কিং কমিটি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মহামান্য লাটবাহাদুর পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাইছেন যে, অপরের স্বীকৃত কোনো সংগঠন বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কারবার করবেন না। তাঁর উপরেই শান্তি-শৃঙ্খলা ও সরকারের দায়িত্ব ন্যস্ত। গোলটেবিল বৈঠকের জন্যে আপনি ভারতবর্ষে নিজে অনুপস্থিত ছিলেন ; এবং মহামান্য লাটবাহাদুর একথা মোটেই বিশ্বাস করতে চান না যে, কংগ্রেসের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার অংশগ্রহণের দায়িত্ব আছে, কিংবা আপনি ঐ সব অনুমোদন করবেন। তাই যদি হয়, তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে দেখা করা ও তার দৃষ্টিকোণ আপনার কাছে তুলে ধরাটা তো আপনারই হাতে, পথ হিসেবে যা দিয়ে আপনি সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে আপনার প্রভাবকে ভালো ক'রেই কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু মহামান্য লাটবাহাদুর মনে করেন, একথা জোর দিয়ে বলতে তিনি বাধ্য যে, মহামান্য সম্রাটের সরকারের পূর্ণ সম্মতি-ক্রমে বাংলাদেশে, যুক্তপ্রদেশে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ভারতবর্ষের সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করেছেন, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তিনি আলোচনায় রাজী নন। যেসব কারণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত এইসব ব্যবস্থা চাপানো হয়েছে, যাই ঘটুক না কেন, সেসব বলবৎ থাকবে : যেমন, কোনো সৎ সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আইন ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা ! আপনার উত্তর পেলে মহামান্য বড়োলাটবাহাদুর এই পত্রালাপ প্রকাশিত করতে চান।"

এই আদেশব্যঞ্জক বার্তার শেষের লাইনগুলোর কথা কয়টিতে থমকে দাঁড়াতে হবে : "মহামান্য সম্রাটের সরকারের পূর্ণ সম্মতিক্রমে · ভারতবর্ষের সরকার যেসব ব্যবস্থা···" গান্ধী ইংলন্ড ছাড়ার পর, তাহলে লন্ডনের নির্দেশ কড়াকড়ি ভাবেই আবার পুরনো পন্থায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রক্ষণশীলদের চাপই এতে প্রাধান্য পেয়েছিল। ইংলন্ডে ম্যাকডোনাল্ড বলেছিলেন যে, "বিশৃঙ্খলার শক্তিগুলো ছত্রভঙ্গ হবে" ; আর ৩০ ডিসেম্বরে বড়োলাট 'ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন-এ এক যুদ্ধং দেহি বক্তৃতাই দিয়েছিলেন।

একথা ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যবস্থাবলীর পেছনে ইউরোপের বা ব্রিটেনের, কিংবা ভারতবর্ষের রাজভক্তদের সর্বসম্মত স্বীকৃতি আছে। মধ্যপ্রদেশের খ্রীষ্টানরা, বাংলা ও বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা এইসব অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ও প্রত্যাহার দাবি করেছে। বিশেষভাবে রাজভক্তদের নিয়ে গঠিত, ভারতীয় 'ওয়েলফেয়ার লিগের' বহু সদস্য নিশ্চিত যে, বড়োলাটকে এসব প্রত্যাহার করতে হবে। গান্ধীর প্রথম টেলিগ্রামে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুমোদনের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বড়োলাটের প্রত্যাখ্যান ও তাঁর উত্তরের অভদ্রোচিত (ungentlemanly) সুর এক বেদনাদায়ক ছাপ ফেলেছিল।

১ জানুয়ারি গান্ধী তেজ ও মর্যাদার সঙ্গে তার পাল্টা উত্তর দিয়েছিলেন :

"বন্ধুভাবাপন্ন মন নিয়ে যে এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা মহামান্য লাটবাহাদুর এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা তাঁর মতো উচ্চপদাধিকারীর পক্ষে মোটেই সমীচীন নয়,—এতে আমি ক্ষুব্ধ · সরকার যেসব অস্বাভাবিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করলেন তাদের সম্পর্কে সরকারের প্রদত্ত ভাষ্য আমি বুঝতে চেয়েছিলাম। আমার এগিয়ে যাওয়াটার মূল্য যথাযথ উপলব্ধি করার বদলে মহামান্য লাটবাহাদুর তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই সঙ্গে আমাকে বলেছেন আগে থাকতেই আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের নিন্দা করতে, এবং এও যোগ করেছেন যে, যদি আমি এহেন অসম্মানজনক আচরণের অপরাধে অপরাধীও হই, তাহলে জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রশ্নাদির আলোচনাও আমার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে।

তীব্র প্রতিরোধ না করলে, যে অর্ডিনান্স ও যে স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার পরিণাম হবে একটা জাতির সম্পূর্ণ মনোবলভঙ্গ, তার মূল্যে সংবিধান-সংস্কারের প্রশ্নটি, আমার মতে, একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। আমার বিশ্বাস, যার আত্মসম্মান আছে, এমন কোনো ভারতীয়ই একটি সংবিধানের সন্দেহজনক সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তা দিতে জাতীয় মনকে হত্যা করার ঝুঁকি নিতে যাবে না, যখন তা কার্যকর করতে সম্ভবত যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন জাতিই থাকবে না।"

অভিযুক্ত প্রত্যেকটি প্রদেশ সম্পর্কে একের পর এক বিচার ক'রে গান্ধী ব'লে গেছেন—(টেলিগ্রামটি অতি দীর্ঘ, তার একটা অংশ সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে)। বড়োলাট ঘটনাবলীর যেমনটি বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলিচালনা ও জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের কোনো যৌক্তিকতাই স্বীকার করেননি। "আব্দুল গফ্‌ফর খান সাহেব যদি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে থাকেন, তাহলে সেটা এক স্বাভাবিক দাবিই, সেই দাবি ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে বিনা শাস্তিতেই ঘোষিত হয়েছে, এবং লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের সামনে এই দাবিকেই আমি জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেছি। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সরকার ভালো করেই জানতেন যে, কংগ্রেসের নির্দেশের মধ্যে এই দাবিটিও ছিল, এবং তবুও, কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডন বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে আমি আমন্ত্রিত

হয়েছিলাম…” যুক্তপ্রদেশ সম্পর্কে বলেছেন : “টেলিগ্রামে যেমন অবহেলাভরে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে, প্রশ্নটি তেমন ধরণের মোটেই নয়। এই মতানৈক্য অনেক পুরনো ; এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ চাষীর ভালো-মন্দ জড়িত, যাদের অর্থনৈতিক ভাবে পিষ্ট করতে চাওয়া হচ্ছে।

জনসাধারণের উপরে যার বিরাট প্রভাব এবং জনসাধারণকে সেবা করাই যার কাম্য, সেই কংগ্রেসের মতো এক বিশাল সংগঠনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতাকে, অধীনস্থ প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্যে উদ্যোগী যে-কোনো সরকারই স্বাগত জানাতো। এবং আমি আরও বলতে চাইতে চাই যে, একটি দুর্বহ অর্থনৈতিক বোঝা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় সমস্ত উপায় নিঃশেষ-করা কোনো জাতির পক্ষে খাজনা দিতে অস্বীকার করাটা চিরকালীন ও অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক অধিকার ব'লেই আমি মনে করি। বিশৃঙ্খলার উস্কানি দিতে কংগ্রেসের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আছে, এমন ইঙ্গিতের আমি নিন্দা করি। বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস একমত ; এ ধরনের অপরাধ আটকাবার জন্যে ব্যবস্থাদিতে কংগ্রেস সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির যদি সে নিন্দা করে, তাহলে সে সরকারী সন্ত্রাসবাদেরও নিন্দা করে, যেমন সন্ত্রাসবাদ চোখে পড়ছে বাংলাদেশের অর্ডিনান্স ও তার থেকে উদ্ভূত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে। কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে বৈধ সরকারের এহেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট-করা অহিংসার বিশ্বাসের গন্ডির মধ্যেই প্রতিরোধ করা…”

বড়োলাটের ব্যক্তিগত চরমপত্রের উত্তর দিতে গিয়ে গান্ধী উচ্চকন্ঠে বলেছেন : “সীমান্ত প্রদেশেই হোক, যুক্ত প্রদেশেই হোক, তাঁর সহকর্মীদের কাজের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও তিনি অনুরোধ করেই গেছেন যে, বড়োলাট যেন সাক্ষাতে রাজী হন, “যেন আলোচনার ক্ষেত্র ও বিষয় সম্পর্কে কোনো রকম শর্ত আয়োপ না কবেন।” অভিযোগের সমস্ত দিক নিরপেক্ষভাবে বিচার করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এবং যেসব প্রদেশ সম্পার্কে প্রশ্ন উঠেছে, তাদের সম্পর্কে নিজে তদন্ত করানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। অবশেষে, তিনি শেষ করেছেন তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা ক'রে :

“অহিংসা আমার পরম বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি যে, বিশেষ ক'রে, যখন একটা জাতির নিজের সরকারে কার্যকরী ক্ষমতা থাকে না, আইন অমান্য তখন কেবলমাত্র তার স্বাভাবিক অধিকারই নয়, তা সশস্ত্র বিদ্রোহের কার্যকরী বিকল্পও বটে। আমি আমার বিশ্বাসকে কখনো ত্যাগ করবো না। সরকারের বর্তমান আচরণের পর জাতিকে পরিচালিত করতে আমার পক্ষে আর কোনো ভবিষ্যৎ সুযোগ নেই, তার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি আমার পরামর্শ নিয়েছেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা সামনে রেখে এক প্রস্তাব সদ্য পাশ করেছেন। এই সঙ্গে প্রস্তাবের বয়ানটি পাঠালাম। যদি মহামান্য লাটবাহাদুর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কণ্ট স্বীকার করেন, তাহলে আমাদের আলোচনার সময়ে প্রস্তাবটি মুলতুবি থাকবে এই আশায় যে, একে শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে।

আমি মনে করি, মহামান্য লাটবাহাদুর ও আমার পত্রালাপ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, বিনা বিলম্বে তা প্রকাশ করা দরকার। এই জন্যেই, আমার প্রথম টেলিগ্রাম, আপনার উত্তর ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব আমি প্রকাশের জন্যে পাঠালাম।"

প্ররোচিত ভারতবর্ষ বড়োলাটের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। গান্ধীর কণ্ঠে অধিকারের ঘোষণা ক'রে সমানে সমানে সে ব্রিটেনের শক্তির মোকাবিলা করছে। ২-৩ জানুয়ারির রাত্রে বড়োলাটের প্রত্যাখ্যান এসে পেঁাছেছে, উদ্ধতভাবে তাতে বিনা শর্তে সাক্ষাৎকার বাতিল করা হয়েছে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্যে গান্ধী ও কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে। এটা যুদ্ধের ঘোষণা।*

এদিকে ২ ও ৩ তারিখে সারা দিন ধরে গান্ধী রাজনীতিবিদ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও 'ওয়েলফেয়ার লিগের' প্রতিনিধিদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে ছিলেন, সরকারী আপস-বিরোধীমনোভাবে তারা ভীত হয়ে উঠেছিল এবং পুরোপুরি ভাঙন এড়াবার আশায় নিজেদের স্তোক দিচ্ছিল। গান্ধীর কোনোই মোহ ছিল না: তাঁর ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির গ্রেপ্তারের প্রতীক্ষায় ছিলেন; তাঁর অবর্তমানে যাঁদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাঁদের সঙ্গে শান্তভাবে সর্বশেষ ব্যবস্থাদি করছিলেন।

৪ জানুয়ারি খুব ভোরে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হলো ১৮২৭ সালের ২৫ রেগুলেশন অনুসারে, তাঁর প্রথম গ্রেপ্তারের সময়ে এই রেগুলেশনই প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এই রেগুলেশন অনুসারে "আটক-রাখার কোনো কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই এবং আগে থেকে আটক-রাখার সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হবে না।" একই সময়ে, একই রেগুলেশনে কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলও গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুনার জেরবাদা জেলে, সেখানে গান্ধী রইলেন "রাষ্ট্রের বন্দী' হয়ে।

এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকার এই ভাঙনের অপেক্ষায় ছিল এবং এর প্ররোচনা দিয়েছে: কারণ যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতিই পাকা হয়েছে: গোটা দেশে সামরিক আইন ঘোষণা ক'রে একের পর এক চারটি অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের হাতে এই অর্ডিনান্সের বলে অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সরকার সেই ক্ষমতা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জেলাগুলোর ম্যাজিস্ট্রেট বা শহরে পুলিশ কমিশনারদের হাতে তুলে দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে 'জরুরি ক্ষমতার' অর্ডিনান্স; এর এক্তিয়ারে পড়ে: ১ম "গ্রেপ্তার, অন্তরীণ, সন্দেহভাজনদের দমন" (তাই এর ফলে পুরনো ব্রিটিশ আইন 'হেবিয়াস কর্পাস' মুলতুবি হয়ে গেছে ও তার সমস্ত গ্যারান্টি লঙ্ঘন করা হয়েছে); ২য়, যে-কোনো বাড়ি দখল ও কোনো কোনো স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ; ৩য়, বাণিজ্যদ্রব্য আটক; ৪র্থ পুলিশের সাহায্যের জন্যে নাগরিকদের তলব; ৫ম, খানাতল্লাসির পরওয়ানা জারি; ৬ষ্ঠ, যৌথ জরিমানা; ৭ম, দ্রুত দন্ডদানের ক্ষমতা দিয়ে বিশেষ ক্রিমিনাল কোর্ট গঠন···বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীদের

---

* ৩ জানুয়ারি ২য় টেলিগ্রামে গান্ধী গর্বিত সৌজন্যে উত্তর দিয়েছেন: "কংগ্রেস ও তার দীন প্রতিনিধি আমি যে আমাদের কার্যাবলীর সমস্ত ফলাফলের জন্যে দায়ী একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।'

বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থাবলীর অবিকল এই ব্যবস্থাবলী। কিন্তু এসব এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অহিংস এক আন্দোলন সম্পর্কে। অন্যান্য অর্ডিনান্সগুলোর এক্তিয়ারে প'ড়ে বিপজ্জনক ব'লে কথিত সংগঠন ও তাদের তহবিল বাজেয়াপ্ত করণ, এমনকি সব চেয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থাতেও সমস্ত রকম বয়কটের দমন, এবং কৃষিকর ও খাজনা না দেওয়া। এগুলোর এক্তিয়ারে পড়েছে কংগ্রেসের সমস্ত কাজকর্ম, কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীদের এগুলো গুরুভার শাস্তির মুখে ফেলে দিয়েছে ; এগুলো প্রস্তুত হচ্ছে কংগ্রেসকে দমনের জন্যে। এবং কার্যত, অব্যবহিত পরেই, কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; এবং প্রথম যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যিনি সম্ভবত গান্ধীর সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ নৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, যাঁকে পরবর্তী নিখিল ভারত কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। সমস্ত স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলোকে, কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগঠন-গুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেই তাদের সংখ্যা ৫০০ ; বোম্বাই সহরে ৫০। সারা দেশ জুড়ে দলে দলে কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, যদিও সাধারণ বা বিশেষ নিয়ম লংঘনে অভিযুক্ত করার মতো কোনো ঘটনাই এখনো ঘটেনি। যে ভারতীয়দের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে আটক রাখা হয়েছে ('হেবিয়াস করপাস'-এর সম্পূর্ণ বিপরীতে) তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিম দলের, জাতীয়তাবাদী খ্রীষ্টান দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নামগুলোর দিকে এবং যে গোষ্ঠীগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বোম্বাইয়ের জাতীয়তাবাদী মুসলিম দলের মতোই বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কমিটির সদস্যদের নামগুলোর দিকে ইঙ্গিত করাটা অকারণ হবে না,* নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি ও সম্পাদক জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম দমনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিরা বোম্বাইয়ে তাঁদের সহধর্মীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন সরকারী সংস্কার কমিটিতে অংশগ্রহণে অস্বীকার করেন। অবশেষে, এইটি বিশেষ লক্ষণীয় যে, রাজেন্দ্রপ্রসাদের পর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে আমন্ত্রণ করা হয়েছে দিল্লির সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ আনসারিকে। শ্রেণী ও জাতের কোনো পার্থক্য না রেখে সরকার-বিরোধীদের ফ্রন্টের ঐক্য তাই বাস্তব আকারধারণ করেছে।

বৃথাই বোম্বাই সরকার প্রজার আনুগত্যের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে, কংগ্রেসের কার্যকলাপ থেকে যারা সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

---

*সবারই জানা আছে, কী চতুরভাবে ব্রিটেনের প্রচার এই জাতিগত ও ধর্মগত জাল তাসটা নিয়ে খেলছে, এ দিয়ে দেখাতে পারছে ব্রিটেন যেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে "৭ কোটি মুসলমান ও ৭ কোটি অস্পৃশ্যের স্বার্থরক্ষক"। আর ব্রিটেনের বশংবদ ও বন্ধ হীন বড়ো বড়ো সংবাদপত্র তোতাপাখির বুলি আওড়াচ্ছে। কার্যত, এখন এটা মুসলমান ও অস্পৃশ্য গোষ্ঠীদের মধ্যেকার সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যাপার, বহু ক্ষেত্রেই তারা ঘুষ খাওয়া লোক, সব সময়েই অতিউত্তেজিত এবং ব্রিটিশ রাজনীতির হাতের পুতুল। এ হেন যুক্তির ভণ্ডামি প্রমাণে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই যথেষ্ট : উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই যে প্রদেশটি (স্বভাবতই। ব্রিটিশ সরকারের গুরুতর উদ্বেগের কারণ ঘটাচ্ছে, এখানে প্রায় সকলেই মুসলমান এবং যে সহস্রাধিক কংগ্রেসী গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের সকলেই মুসলমান।

এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রতিরোধে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে এবং শান্ত করা সাংবিধানিক সংস্কারের পরিকল্পনায় পেটি-বুর্জোয়া ও ছোটো ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নিজের দিকে পাবার জন্যে,বল ও স্বার্থ, চাপ দেবার সমস্ত পন্থাই অবলম্বন করছে। এই দরকষাকষিতে এই শ্রেণী সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঢুকতে পারবে। (বোম্বাইয়ের বড়ো ব্যবসায়ীরা, ভারতীয় ধনতন্ত্র, মনে হচ্ছে, এর বিপরীত, আপসহীন সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সঙ্গে এক মত)। ভবিষ্যতই বলতে পারবে নেতৃত্বহীন ভারতবর্ষ কেমন ক'রে আবার সক্রিয় হবে।**

কিন্তু এটাই সুন্দর যে, এই সংকটজনক মুহূর্তে এশিয়ার মহত্তম কণ্ঠ আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে, যেমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ খুলেছেন ; এবং তাঁর কণ্ঠ সীমান্তের বাইরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। সারা ভারতবর্ষের মানুষের উদ্দেশে তিনি করুণ আবেদন করেছেন। তিনি বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন যে, "ভুলে গেলে চলবে না, যে-অমানুষ প্রভুরা তাদের বৈষয়িক শক্তির জোর দেখায়, তাদের উপরে এখন নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দেখাতে হবে। ভারতবর্ষের বিদেশী প্রভুরা মনে করে যে, ভারতবর্ষের জনগণকে উপেক্ষাভরে অবজ্ঞা করা যেতে পারে। কিন্তু সময় এসেছে, যখন আমাদের জগতের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের শাশ্বত মূল্যে সেই একদিনের সরকারের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়, যা একটা পথ-চলতি দুর্ঘটনা মাত্র।"

এইভাবেই, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধক্ষেত্রে গান্ধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের ইউরোপের চিন্তা তাঁদের মৈত্রীকে নমস্কার জানাচ্ছে এবং তাঁদের সঙ্গেই মৈত্রীবন্ধন করছে।

২৫ জানুয়ারি, ১৯৩২ রম্যাঁ রলাঁ

পুনশ্চ ঃ—এই ভারতবর্ষের সংবাদ' শেষ করতে গিয়ে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করছি, গান্ধীবাদী প্রকাশনা থেকে বিস্ময়কর তৎপরতায় সেটি সদ্য সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে গান্ধীর বক্তৃতাবলীর পূর্ণ সংকলন ঃ 'দি নেশনস্ ভয়েস', আমেদবাদ, ১৯৩২। গান্ধীর কম-জানা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও এমনকি বাগ্মিতা পরিমাপের জন্যে এগুলো পড়া দরকার।

'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

**জানুয়ারির প্রথম দিনগুলোয় জনসাধারণের যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল (এখনও পর্যন্ত একমাত্র যার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে) এই বর্ণনায় তা বাদ দিয়ে যাচ্ছি এগুলো শুধুমাত্র প্রথম-দিকের সংঘর্ষ ঃ ৪ তারিখ বিকালে বোম্বাইয়ে গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এক বিশাল জনসভা, এবং সারাদেশ জুড়ে হরতাল। এলাহাবাদ, কানপুর, বেনারসে বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ। বেনারসে জনতার প্রতি পুলিশের গুলিবর্ষণ ঃ শতাধিক আহত, কেউ কেউ নিহত। কলকাতায় পুলিশের একাধিক আক্রমণ। যখন এটি ছাপতে পাঠাচ্ছি, শ্রমিকদের বিরাট বিরাট ধর্মঘট আত্মপ্রকাশ করছে।

ভারতবর্ষের সংবাদ

২

রাজা আটকেছেন

ব্রিটিশ সরকারের জারি-করা সন্ত্রাসের অনুপাতে ভারতবর্ষ কী ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে, তা জানার জন্যে আমার আগের 'ভারতবর্ষের সংবাদে' আগামী কয়েক সপ্তাহের উপরে বরাত দিয়ে রেখেছিলাম। যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার প্রথম মাসেই উত্তর পাওয়া গেছে। ইংরেজ রক্ষণশীল-প্রতিক্রিয়ার বশংবদ-যন্ত্র লর্ড উইলিংডনের বল-প্রয়োগের তাৎক্ষণিক এই ফল হয়েছে যে, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাজভক্ত ও ভারতীয় সংবিধানপন্থীদের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। গান্ধী নিজেও যা পারেননি, বড়োলাটের ঔদ্ধত্য তাঁর নাক কেটে তাই বাস্তব ক'রে তুলেছে…"রাজা আটকেছেন!"…

সরকারের অবৈধ ও খামখেয়ালি আচরণের বিরুদ্ধে, বড়োলাটের অর্ডিনান্স ও লেলিয়ে দেওয়া উচ্ছৃংখল পুলিশ-বাহিনীর সাহায্যে তা প্রয়োগের বর্বরতার বিরুদ্ধে, গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পদ্ধতি অসমর্থক মডারেটদের প্রতিবাদে গোটা জানুয়ারি মাসটা মুখর হয়েছে। প্রযুক্ত হিংসার উপরে আমি জোর দেবো না। ইউরোপের চামড়া শক্ত ঃ আঠারো বছরের যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদে তাতে কড়া পড়ে গেছে; স্বার্থপর বুদ্ধিটি অন্যের যন্ত্রণায় আর বিচলিত হয় না। গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ (লোহায় মাথা-বাঁধানো লম্বা লম্বা লাঠি), নারী ও শিশুর প্রতি বর্বরতা, জেলখানায় লজ্জাকর অত্যাচার ইউরোপের উদাসীন মানুষের কাছে গুরুতর কিছু নয়; গত দশ বছর ধরে সংবাদপত্র বল্কান দেশগুলোর, হাঙ্গারির, অথবা পোলান্ডের, ইতালির নির্মমতা ও জেলখানার আর্তনাদ তাদের কাছে পরিবেশন ক'রে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের চামড়া বড়োই পাতলা। কারণ ক্রোধটা সর্বজনীন; এবং যুক্তপ্রদেশের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, পশ্চিমী লিবারেলদের ভারতীয় কাউন্সিল, বড়োলাটের জড়ো-করা লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লির প্রায় অর্ধেক, সর্বত্র মুসলিম কনফারেন্স, "সারভেন্টস্ অফ ইন্ডিয়া," মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চেম্বার অফ কমার্স—এই রকম অসংখ্য অ-কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান এর প্রতিধ্বনি করছে। গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করবো না। জানুয়ারির শেষে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২,৫০০।* কিন্তু মান্যগণ্য সংখ্যাটি ভারতবর্ষের পক্ষে বড়োই অপ্রচুর, এবং লর্ড উইলিংডনের

---

* যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শুধু নাম করছি এঁদের : শ্রীমতী গান্ধী, বয়স ৬৩; ডাঃ আনসারি, নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, মুসলমান, তাঁর উত্তরাধিকারী শার্দুল সিং, শিখ; ডাঃ আলম, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, মুসলমান, এঁর গ্রেপ্তারে লাহোরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছে; ডাঃ এস, কে. বৈদ্য, বোম্বাই কংগ্রেসের নেতা, বিখ্যাত ব্যাকটিরিওলজিস্ট, বিখ্যাত চিকিৎসক, যুদ্ধের সময়ে লণ্ডনে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন. যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র, এক ইতালীয় জাহাজ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের ফলে কূটনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে; গান্ধীর আশ্রমের আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ, যেমন অধ্যাপক কালেলকর, সংস্কৃতবিদ ও দার্শনিক শ্রীবিনোবা;

পূর্বসূরী, যিনি গান্ধীর আন্দোলন সম্পর্কে সপ্রশংস উক্তি করেছিলেন (বেশ ভুল ক'রেই), সেই লর্ড আরউইন এর চেয়ে ভালো কাজ করেছিলেন। তাঁর আমলে ১৯৩০-৩১ সালে গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়েছিল ৯০.০০০। নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই, সময়ে লর্ড উইলিংডন এই গৌরবময় সংখ্যায় পৌঁছে যাবেন, এমনকি ছাড়িয়েও যেতে পারেন। ভারতবর্ষের মানুষের সংখ্যা প্রচুর। ভারতবর্ষ প্রস্তুত।

রাজনৈতিক গুরুত্ব ও যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা শুধু ভারতবর্ষের উত্তরে কাশ্মীরে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যা ঘটেছে তার কথাই বলবো। কাশ্মীর একটি করদ রাজ্য, কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত, তাকে কুক্ষিগত করতে ইংলন্ড প্রায়ই লুব্ধ হয়েছে : কারণ ভারতবর্ষের প্রভুত্বের জন্যে তার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার মাটির নিচে অগাধ ঐশ্বর্য. দেশের আইনে ইউরোপীয়দের পক্ষে তা কাজে লাগানো অত্যন্ত কঠিন। মহারাজা হিন্দু ; প্রজাদের বেশির ভাগ মুসলমান : কিন্তু নিরপেক্ষ শাসনাধীনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুবই মিলমিশ আছে। সম্প্রতি, মনে হচ্ছে, ইংরেজের রাজনীতি এই শান্ত জল-ঘোলা করতে ইসলামের প্রচারকারীদের এগিয়ে দিয়েছে, যাতে দুই ধর্মের মধ্যে কলহ বাধে এবং সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে ইংলন্ডের সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু মনে হচ্ছে তার পরিণাম — ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো শহরে যেখানে যেখানে এই ফন্দি ফাঁশ হয়ে গেছে — প্রতিবাদ ও হিন্দু-মুসলমানের সংহতিদিবস, যেমন কাশ্মীরে গুরুতর অভ্যুত্থান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংলন্ডের দমননীতি এক অতি উগ্র ও নিষ্ঠুর রূপ ধারণ করেছে, সামরিক আইন জারি সত্ত্বেও সাহসী প্রত্যক্ষদর্শীরা তার নিন্দা করেছেন : তাঁদের একজন হচ্ছেন এক ইংরেজ মিশনারী, ফাদার এলুইন ; তারপর থেকে তাঁকে বার ক'রে দেওয়া হয়েছে (এই রকম বার ক'রে দেওয়া হয়েছে আমেরিকান মিশনারী জি. বি. হলস্টিডকে) ; অন্যজন হচ্ছেন এক বিখ্যাত বংশের এক মহিলা, বোম্বাইয়ের "মুকুটহীন রাজা" দাদাভাই নৌরজীর* নাতনী। বোম্বাই থেকে তিনি গিয়েছিলেন তদন্ত করতে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, জেলে পোরা হয়েছিল : তাঁকে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দিলে, আবার গোঁ ধ'রে পেশোয়ার ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি ও ফাদার এলুইন যে খবরগুলো প্রকাশ করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে বীরত্বপূর্ণ অহিংসা, যা দিয়ে "খুদাই-খিদমদগার" (লাল কোর্তা) বাহিনীর আব্দুল গফ্ফর খানের পাঠান যোদ্ধারা ইংরেজের বিরক্তির

আমেদাবাদ সুতাকলের শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের এঁদের গ্রেপ্তারে ৭০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেছে : অভিজাত বুদ্ধিজীবী বা বণিকশ্রেণীর অনেকে, তাঁদের মধ্যে আছেন বহু হিন্দু ও পার্শি মহিলা, হিন্দু সাধু ও ইংরেজ মিশনারীরা — উচ্ছৃংখল পুলিশের অসম্মান ও আঘাতের মুখে তারা পড়েছেন…এবং যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোনো মতেই গান্ধীর দলের লোক নন, আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি, তারা কেবলমাত্র দমননীতির অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যেমন জানিয়েছেন বোম্বাইয়ের শক্তিশালী সুতাব্যবসায়ী সঙ্ঘের সম্পাদক তাঁকে এক বছরের জন্যে জেল দেওয়া হয়েছে।

* আমার মহাত্মা "গান্ধী" দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫—১৬। দাদাভাই ই গান্ধীর বীরোচিত অপ্রতিরোধ অহিংসার প্রথম গুরু। ১৮৯২ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা।

মোকাবিলা করছে, প্রমাণিত হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন, যা তাদের উপর চালানো হয়েছে, পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা বরফজলে ফেলে রাখা হয়েছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এল্‌উইন লিখেছেন : "আমি ইংরেজ, আমি আমার দেশকে নোংরা করতে চাই না ; কিন্তু ইংলন্ডকে ধিক্ !"**

একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার জন্যে লর্ড উইলিংডনের সরকার ভারতবর্ষের মুসলমানদের বেশি ভালো মনে করতে পারে না, হিন্দুদের সঙ্গে তাদের ঝগড়াঝাঁটির হিসাব ও আশা তার ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই মুসলমান প্রদেশটি ছিল সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সবচেয়ে সংবেদনশীল বিন্দু। ব্রিটিশ সরকার তার প্রতি এই যে নজিরহীন কঠোর ব্যবহার করেছে, তা কিন্তু কেবলমাত্র ভৌগোলিক দিক থেকে লুকানো বিপদের জন্যে করেনি, সঙ্গতভাবেই তা করেছে এইজন্যে যে, গান্ধীর কর্মপদ্ধতি ও চিন্তার প্রতি সবচেয়ে লড়ুয়ে মুসলমানদের এই আনুগত্য তার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এবং তাকে ক্ষিপ্ত করেছে। ক্রোধ এক দুষ্ট পরামর্শদাতা। সন্দেহ হচ্ছে যে, বড়োলাট ভুল চাল দিয়েছেন, একথা স্বীকার করতে এখনো এইটেই তাঁকে দিচ্ছে না। কিন্তু ভীতিপ্রদ-ভাবে ভারতীয় মুসলমানদের ক্রোধ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১লা ফেব্রুয়ারী সর্বস্তরের মুসলিম কনফারেন্সে (কংগ্রেসে ও গান্ধীর রাজনীতির অবশ্যই বিরোধী) এই মনোভাবের গর্জন উঠেছে। তদন্তের পর, সরকারের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ কার্যকরী সমিতি দাবি জানিয়েছে : ১ম., প্রদেশের দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ; ২য়, অবিলম্বে অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করতে হবে ; ৩য়, অসমীচীন ও নিষ্ঠুর দমননীতি চালাবার অপরাধে অপরাধী কর্মচারীদের অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে। এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দিয়ে কনফারেন্স বড়োলাটকে তাদের দাবি মতো কাজ করতে অনুরোধ করেছে, যদি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত

** এটা জানা আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে যে, ইংরেজের নিষ্ঠুর রাজনীতি তার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কেই সমবেত করেনি—যেমনটি আমরা দেখতে পাবো, সবচেয়ে খাঁটি কোনো কোনো খৃষ্টান শক্তিকেও সমবেত করেছে। ফাদার এল্‌উইন লিখছেন : "আজকের ভারতবর্ষ একটা যুদ্ধক্ষেত্র, এ যুদ্ধ দুটি জীবনের ধারণার মধ্যে যতটা, ততটা দুটি জাতির মধ্যে নয়। তাই এতে 'বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ভারতবর্ষের জেলখানায় আমরা তাঁদের দেখবো, যাঁদের মধ্যে বহু লোক রাজনীতি নিয়ে মোটেই কারবার করেন না, যাঁরা উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতায় অধিকারী।' তিনি তাঁদের তালিকা দিয়েছেন : তাঁদের মধ্যে আছেন আশ্রমের পরিচালকেরা, সমাজসেবক মিশনারীরা, যেমন 'সারভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া,' যাঁদের সদস্যরা তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন, দরিদ্র জীবন যাপন করছেন, দীনাতিদীনের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, হাসপাতালে রোগীর সেবা করছেন, তাঁদের কেউ ভারতীয় কেউ বা ইংরেজ, অথবা স্কচ (ডাঃ ফরেস্টার পাট্ন)! আজ এই সমস্ত মানুষেরা নির্যাতিত, বন্দী, প্রায়শই অপমানিত মারের চোটে হাড়গোড় ভাঙা, আহত, নিন্দিত। এল্‌উইন তাঁদের সাঁ-ফ্রাঁসোয়ার শিষ্যদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'কিন্তু নির্যাতন তাঁদের সরলতা ও প্রেমের সংকল্পকে ভাঙতে পারেনি। সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ফ্রানসিসকান গান্ধী কারাগারের অন্তরালে, আর তার ভাবনার তিলমাত্রও যাঁদের আছে, তাঁরা কারাগারের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন সেটা একটা তীর্থস্থান।" (২০ জানুয়ারির প্রবন্ধ : 'জেলখানার ফ্রানসিস্কানরা'।)

মুসলমানের সদিচ্ছাকে পুরোপুরি বিরূপ ক'রে তুলতে না চান। বড়োলাটের উদ্বোধন-করা লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লিতে একই বিপদ ধ্বনিত হয়েছে, সেখানে সার হরি সিং গোড় এই হিংসার রাজত্বের সম্পূর্ণ নিন্দা করেছেন, এবং সেখানে অ-কংগ্রেসী মুসলমান দলের সদস্য মোলানা সফি সৌদি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতা সম্পর্কিত ব্যক্তিগত সংবাদে জোরদার হয়ে বলেছেন যে, "সরকার যদি আন্তরিক ও সৎ হতেন, তাহলে প্রদেশের সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিতেন" ; কিন্তু আরও বলেছেন যে, তিনি সরকারকে আন্তরিকও মনে করেন না, সৎও মনে করেন না। সরকারকে নিন্দা-করা প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪২ জন, বিপক্ষে ৬৫ জন ; কিন্তু সরকারী সদস্যদের মুখোমুখি এই সংখ্যালঘুদের মধ্যেই পড়েন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ; এবং এটা একটা গুরুতর বিপদ-সংকেত।

জনমতের আরও বেশি প্রতিধ্বনি উঠেছে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সরকারের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত অভিযোগের মধ্যে দিয়ে ; তিনি এমন এক রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমগ্র ভারতবর্ষে যাঁর অতি উচ্চ নৈতিক মূল্য। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি হিন্দু-প্রতিনিধি ছিলেন, ইংলন্ডের ও ভারতবর্ষের ভাঙন তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন, সম্মানজনক আপসের চেষ্টার জন্যে তিনি সব সময়ে প্রস্তুত, বড়োলাটের বলপ্রয়োগের বিচার করার পক্ষে যে-কোনো কারুর চেয়ে তিনি বেশি যোগ্য ; এবং তিনি অন্যতম বিরল ভারতীয়, যাঁর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে নিজের কণ্ঠস্বর শোনানো সম্ভব ছিল। তিনি তা দু'ভাবে করেছেন,—একটি সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে—এবং বিশেষ ক'রে বড়োলাটকে লেখা একটা খোলা চিঠির মাধ্যমে, যা হয়ে উঠেছে গোটা ভারতীয় জাতির সর্বাঙ্গীন ও করুণ অভিযোগবাণী ('বোম্বাই ক্রনিকল', ৩১ জানুয়ারি)। তখন তিনি দেরি ক'রে ভারতবর্ষে সদ্য ফিরছিলেন এবং জাহাজ থেকেই বড়োলাটকে তার ক'রে গান্ধীর গ্রেপ্তার ও কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

"মহামান্য বড়োলাট বাহাদুর জানেন যে, মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন জীবিত ভারতীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি জানেন যে, জীবনের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতার জন্যে স্বদেশের ও মানবতার প্রতি মহান আনুগত্যের জন্যে তিনি কোটি কোটি ভারতীয়দের পূজ্য ও জগতের সর্বত্র শ্রদ্ধেয়। আপনি জানেন যে, গত দশ বছর যাবৎ তিনি ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের স্বীকৃত নেতা। আপনি জানেন যে, মাত্র কয়েকমাস আগেই, যখন আইন-অমান্য আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলছিল তখনই, সরকার তাঁর সঙ্গে এক চুক্তি করেছিলেন, এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সম্মতিক্রমেই মহামান্য বড়োলাট বাহাদুর তাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আপনি অনুমান ক'রে নিতে পারেন, এই বছরই হোক, কি আগামী বছরই হোক, যখন ভারতবর্ষে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হবে, মানবিক সম্ভাব্যতা অনুসারে, মহাত্মা গান্ধীর হাতেই আপনাকে দেশ-পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে হবে। আপনি এও জানেন যে, আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের প্রত্যাখ্যান দেশকে এক ভয়ংকর

পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এটাই বিপর্যয়কর যে, মহামান্য বড়োলাট বাহাদুর অনুধাবন করতে পারেননি এহেন মানুষের বড়োলাট বাহাদুরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সৌজন্যের প্রত্যাশা করার অধিকার আছে, সেই বড়োলাটই যখন এই মুহূর্তে এই দেশের সরকারের মাথা। এহেন সৌজন্যের অভাবের অর্থ হচ্ছে, দিল্লি-চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বোঝাপড়ার পথকে অসাধু উপায়ে এড়িয়ে যাওয়া। এটা আরও বেশি ঃ ভারতবর্ষের প্রতি জাতীয় অসম্মান প্রদর্শন। আর মহামান্য বড়োলাট বাহাদুর ও তাঁর সরকার এখানেই থেমে থাকেননি…”

অর্ডিনান্সগুলো সম্পর্কে অভিযোগ ক'রে তিনি বলেছেন যে, আইনসভার সঙ্গে প্রথমে আলোচনা না ক'রে এ জারি করার অধিকার সরকারের নেই। তিনি এগুলোকে ক্ষমতার অপব্যবহার ব'লে অভিযোগ করেছেন। তারপর তিনি বাংলাদেশের, যুক্তপ্রদেশের পরিস্থিতির পর্যালোচনায় গিয়েছেন, এবং বড়োলাটকে পাঠানো টেলিগ্রামে গান্ধী যে-সমালোচনা করেছিলেন, তার চেয়ে কম জোরালো সমালোচনা তিনি করেননি। তিনি জহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারের বৈধতার অভিযোগ করেছেন, তিনি তাঁর অধিকারের পূর্ণ সীমার মধ্যেই ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লাল কোর্তা নেতা আব্দুল গফ্‌ফর খানের নিজের প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার এবং এই স্বাধীনতাকে যা বিলম্বিত করছে, সেই সাংবিধানিক সংস্কার প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ অধিকারের দাবি তিনি কম জানাননি। গ্রেপ্তার, গুলিবর্ষণ, জোরজবরদস্তিকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন এবং কংগ্রেসকে চূর্ণ করার বাসনায় ব্রিটিশ সরকারের এই আকস্মিক মতি-পরিবর্তনের নিন্দা করেছেন।

“ভারতবর্ষে স্বাধীনতার যে মনোভাব গড়ে উঠেছে, সরকারী যন্ত্রের ভারতীয়করণ সমেত সাংবিধানিক ও অন্যান্য সংস্কার—সবই কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও প্রভাবের ফল। এদেশে বসবাসকারী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বেশির ভাগ ইউরোপীয় কর্মচারীরা এই কারণেই, পঞ্চাশ বছর আগে যেদিন থেকে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই, এর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। তারা প্রায়ই একে হত্যা করতে প্রলুব্ধ হয়েছে; কিন্তু তাদের উপেক্ষা ক'রেই এ বেঁচে আছে এবং বেড়ে উঠেছে…লর্ড আরউইন যখন গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, এই ইউরোপীয়দের অনেকেই, কর্মচারী ও অ-কর্মচারী এতে বাধা দিয়েছিল; তারা চায়নি যে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করুক; আপনার পূর্বসূরীর রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা ভীষণ হল্লা তুলেছিল। এ কারুর কাছে গোপন নেই যে, বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় কর্মচারী অস্থির হয়ে উঠেছিল…” তারা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসাতে এবং গান্ধী ও কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাতে বাধা দিতে পারেনি। ‘কিন্তু রক্ষণশীল একটা শক্তিশালী দল পার্লামেন্টে এসে গিয়েছে এবং একজন রক্ষণশীলকে ভারতসচিবের পদে মনোনীত করা হয়েছে। ততদিনে কংগ্রেসের শক্তি বেড়ে উঠেছে এবং আরো বেড়ে ওঠার মতো মনে হয়েছে, সম্ভবত সে আর এই প্রস্তাবিত সংস্কারে খুশী হবে না…বড়োলাট বাহাদুর ও ভারতসচিব ধরে নিয়েছেন যে, রাজনীতি পরিবর্তনের ও ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত শক্তিশালী আঘাত

হানার সময় এসে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিতেই বড়োলাটের কলকাতার ৩০ ডিসেম্বরের বক্তৃতায় এই পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়েছে এবং যুদ্ধ শুরু ক'রে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, স্যার স্যামুয়েল হোর এই ব্যবস্থা জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। তাই গান্ধী ফিরে আসার আগেই, সরকার যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং গান্ধীর সাক্ষাৎকার আপনার প্রত্যাখ্যানের এই হচ্ছে ব্যাখ্যা !'

তারপর তিনি সরকারের হিংসাচার, তার অবৈধতা, তার অ-মানবিকতার চিত্র দিয়েছেন।

'কিন্তু যদি অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনকে মানতে না চান, তাহলে কী ঘটবে ব'লে ভাবেন? আপনি কি মনে করেন যে, ভারতীয়রা আপনার স্বৈরাচার মেনে নেবে? জীবনের পরিবেশ আরও অসহ্য হয়ে উঠুক, জনগণের মনোভাব আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, তারা হিংসার দিকে ঝুঁকুক, আপনি কি তাহলে এই চান?··· জাতির অহমিকা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় অহিংস পন্থার গৌরবজনক সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকে অন্ধ হতে দেবেন না! সমগ্র মানবতার পক্ষে এ এক গভীর কৃতজ্ঞতার ব্যাপার যে, যুদ্ধকে পরিহার করার ও আইন অমান্যের পন্থার মাধ্যমে অধিকারের বিজয়লাভের এক উপায় নির্দেশের প্রেরণা পেয়েছেন আমাদেরই এক ভ্রাতা। অভিজ্ঞ ও মানবিক কোনো সরকারের উচিত হবে একে স্বাগত জানানো এবং একে উৎসাহিত করা, এর শ্বাসরোধ করা নয়, এবং এই ক'রে হতাশ জনগণকে এই চিন্তার দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত নরনারীর জন্মগত অধিকার যে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা, তা জয় করতে ও রক্ষা করতে যুদ্ধ ও হিংসার পন্থাই এখানে একমাত্র কার্যকরী পন্থা...এমনকি বিজ্ঞতার দিক থেকেও আপনার রাজনীতি ব্যর্থ। যখন ভারতসচিব এই বাঁধা-বুলি আওড়ান: 'যতদিন ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব আমাদের থাকবে, আমরা ততদিন শাসক হয়ে থাকবো,'—তখন তিনিও জানেন যে, এ পন্থা পুরনো হয়ে গেছে। যে-কালে এ ভাবে দেশ শাসন করা হতো সেকাল অতীত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সরকার এক বিদেশী সরকার, আর এই জন্যে, ভারতবর্ষে টিকে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার তার নেই···

কিন্তু এ যদি জাতীয় সরকারও হতো, জগতের বর্তমান স্তরে, এই অখ্যাতিজনক পদ্ধতিতে বেশিদিন শাসন করতে পারতো না। জনগণ তা করতে দিতো না··· আপনি কংগ্রেসকে হত্যা করতে পারবেন না; আপনারা যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আত্মাকে হত্যা করতে পারেন। ন্যায্য ও বিজ্ঞোচিত আচরণ হবে তাঁর প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সহযোগিতার জন্যে তাঁর উপর নির্ভর করা...লাটবাহাদুরের কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে সম্রাটের সরকারের কাছে তাই আমার অনুরোধ যে, এই দমনমূলক রাজনীতির ফল যে বিরাট অবিচার ঘটে গেছে তার প্রতিবিধান করা হোক, অর্ডিনান্সগুলো প্রত্যাহৃত হোক, গান্ধী ও সমস্ত বন্দী পুরুষ-নারী-শিশুকে মুক্ত করা হোক, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হোক, জরিমানা ফিরিয়ে দেওয়া হোক, আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, গান্ধী ও কংগ্রেসকে আলোচনার জন্যে

ডাকা হোক এবং ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে দুই দেশের পক্ষে সম্মানজনক ও মঙ্গলকর বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া হোক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এইভাবে সক্রিয় হবার জন্যে তিনি যেন বড়োলাট ও সম্রাট বাহাদুরের সরকারের বিজ্ঞতা ও সাহস জোগান...'

এই অসাধারণ অভিযোগটিকে আমি বড়ো ক'রেই উদ্ধৃত করেছি,—প্রথমত এই জন্যে যে, নতুন ভারতবর্ষ যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, এতে তাদের বীর্যবত্তার আরও একবার সাক্ষ্য মিলছে এবং আমাদের নিশ্চিত করছে যে, গান্ধীর মতো লোকও যদি না থাকেন, তাহলে শক্ত ও সতর্ক কান্ডারীর অভাব ভারতবর্ষে ঘটবে না,—দ্বিতীয়ত, এই জন্যে যে, মডারেট দলের এক বড়ো নেতার ভাষাই যদি এমন হয়, তাহলে কংগ্রেস ও গান্ধীর দল, যারা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, বড়োলাটের ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের যে কী আবেগদীপ্ত প্রচন্ডতা জেগে উঠেছে, তা অনুমান করতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ও তার ভবিষ্যতের প্রতি আমার বিশ্বাস থেকেও আশা করতে পারিনি যে, মডারেটদের মধ্যে সরকারের আঘাতের বিরুদ্ধে এমন এক গভীর এবং উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবো।

আমাদের হাতে আর এক সাক্ষ্য আছে, যা কম চূড়ান্ত নয় : সে সাক্ষ্য ইংলন্ডের বড়ো সংবাদপত্রগুলোর স্বীকৃতিতে। ভারতবর্ষের দাবি সম্পর্কে সবচেয়ে গর্বান্ধ 'টাইমস্'-এর মতো সংবাদপত্র ২৯ জানুয়ারি তারিখে স্বীকার করেছে যে, "১৯৩১ সালের শেষ থেকে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে।" অর্থনৈতিক বয়কট ও ব্রিটিশ বাণিজ্যের ধ্বংসের ফলে, মনের চেয়ে পেটেই বেশি ঘা পড়েছে ব'লে ইংলন্ড অনুভব করছে। ১০ জানুয়ারির 'ডেইলি এক্সপ্রেস', ১০ জানুয়ারির 'ডেইলি টেলিগ্রাফ', ১৮ ও ২০ জানুয়ারির 'ডেইলি মেইল', ১৯ জানুয়ারির 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' বয়কটের ফলাফল সম্পর্কে বিলাপ করেছে। বয়কট প্রায় ৯৫% কার্যকরী হয়েছে, এবং তার আশু প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে ল্যাংকাশায়ারে।* সবচেয়ে চোখে-

---

* কয়েকটি সরল সংখ্যাতে দেখা যাবে গত তিন বছরে ব্রিটিশ বাণিজ্যের কী ত্বরিত অধোগতি হয়েছে :

সুতা (১০ লক্ষ পাউণ্ডের হিসেবে)	
১৯২৯	১৪·৫
১৯৫০	৭·৯
১৯৩১	৬·১
কাপড় (১০ লক্ষ মিটারের হিসেবে)	
১৯২৯	৮০১
১৯৩০	৪২৩
১৯৩১	২৫১
রপ্তানী ধাতু (১ হাজার টনের হিসেবে)	
১৯২৯	১৬২
১৯৬০	৬৯
১৯৩১	৩১

কল্পনা করা যায়, বর্তমান বয়কট এই বিপর্যয়কর ধ্বংস কতো ত্বরান্বিত ক'রে তুলবে।

পড়ার মতো হচ্ছে, 'ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ও গোপন কার্যকলাপ' শীর্ষক ১২ ফেব্রুয়ারির 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি'-র এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। উদারপন্থী ও সওদাগরী বৃহৎ বুর্জোয়ার মুখপত্রটি সরকার ও হতভাগ্য বড়োলাটের রাজনীতি সম্পর্কে মারাত্মক অভিযোগ করেছে, বড়োলাটের পক্ষে তাঁর তাচ্ছিল্যকর সৌজন্য হয়েছে গান্ধী ও মালব্যের কাছ থেকে পাওয়া কড়া শিক্ষার চেয়ে বেশি অসম্মানজনক। কারণ, গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার ক'রে যে বিরাট ভুল করেছেন, তা থেকে লর্ড উইলিংডনকে অব্যাহতি দেবার জন্যে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি' ওকালতি করছে যে, গান্ধীর সঙ্গে যদি আলোচনা হতো, তাহলে 'বুদ্ধিবৃত্তির বৈশিষ্ট্যের নম্র বিচারে সরল-সাদা এই মানুষটি' 'চতুর রাজনীতিক' গান্ধীর হাতে গড়ান খেতেন। তাঁকে দেখানো হয়েছে, কর্তৃত্বপরায়ণ ভারতসচিব ও উল্টোপন্থী উপদেষ্টারা তাঁকে যেন নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়েছে, তারা 'নিজেরা মনে ভেবেছিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থা নিলে কংগ্রেসকে চূর্ণ করতে পারবে। আর এই সুন্দর অভিযানটির পরিণাম হয়েছে এই যে, যে-সব লোকেরা কংগ্রেস সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল, প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা এখন তার কাছাকাছি চলে গেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জোর ক'রে গোপন স্তরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক কার্যকলাপ এমন সব জায়গায় হচ্ছে, যেখানে সরকারী নজর পৌঁছুতে পারে না···যেসব লোক আমাদের গোলটেবিল বৈঠকের পদ্ধতি সাগ্রহে অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করতো, গান্ধীর প্রতি আনুগত্যে ক্ষুব্ধচিত্তে তারা জেলে চলে যাচ্ছে···আর গর্বিত বোম্বাই সহর (ম্যাঞ্চেস্টারের বণিকদের, বিশেষ ক'রে, এই সহরটিই নাড়া দেয়, কারণ এটাই ছিল কারবারের কেন্দ্র)—যেখানে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তার সঙ্গে যেন বখা ছেলের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ সরকার যে প্রদেশটির প্রতি ক্রুদ্ধ, তা সেখান থেকে বারশো মাইল দূরে! (বাংলাদেশ, পেশোয়ার···) সরকারের ক্রিয়াকলাপ শোচনীয়। তাকালেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত (সেখানে কমিউনিজমের আগুন ছাইচাপা রয়েছে) অন্যান্য প্রদেশে অনুসৃত হবে। বোম্বাইয়ে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী বেড়ে উঠছে। কমিউনিস্টরা কংগ্রেসবিরোধী, কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে···(আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতিতে) অর্ডিনান্সগুলো প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে, (স্বাধীনভাবে বিদেশী মাল বিক্রির ব্যাপারে কোনো জোর না খাটানোর প্রতিশ্রুতিতে) দেশী মাল তৈরি, বিক্রি ও প্রচারের পক্ষে ভারতীয়দের অধিকার খোলাখুলি স্বীকার ক'রে নিয়ে অতি দ্রুত শান্তি স্থাপন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন স্বায়ত্বশাসন ত্বরান্বিত করার আন্তরিক সিদ্ধান্তটি জোর দিয়ে বলা। কংগ্রেসের চিন্তার সঙ্গে যে উদগ্র আবেগ জড়িয়ে আছে, সরকারী মহলে তা ধর্তব্য ব'লে মনে করা হয় না। কংগ্রেসের মাধ্যমেই দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতীয়রা এই প্রথম বার স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাদের মধ্যে বিশিষ্টতমেরা কংগ্রেস থেকেই এসেছেন...কংগ্রেসকে হত্যা করার লোভ বিপর্যয়ে পৌঁছুবার সবচেয়ে নিশ্চিত পথ।'

স্বার্থসম্পন্ন কিন্তু বুদ্ধিমান বৃহৎ ইংরেজি সংবাদপত্রের এইসব স্বীকৃতি

ভারতবর্ষের মডারেট দলের বড়ো বড়ো প্রতিনিধিদের দাবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পরিস্থিতিকে লঘু না ক'রে এ হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ব্রিটিশ রাজনীতির মুণ্ডপাত।

এ মনে হচ্ছে না যে, সংকীর্ণ চিত্ত ও ঘাড়-বেঁকা বড়োলাট তাঁর বিপর্যয়কর আচরণের কিছুমাত্র সংশোধনের লক্ষণ দেখাচ্ছেন। এটাই ধরে নিতে হবে যে, এই দুর্বল ও চণ্ডস্বভাব লোকটি তাঁর পাত্রমিত্রের তাঁবে। দমননীতির যে যন্ত্র তিনি কাজে লাগিয়েছেন, তিনি তারই বন্দী, যেমন বহুক্ষেত্রেই ঘটে থাকে (ভুয়ো শক্তিধর মুসোলিনি তার এক দৃষ্টান্ত: তিনি দলবল চালান, কিন্তু দলবলের দ্বারা চালিত হবার শর্তে)। কিছু কিছু চোখে পড়ার মতো দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বহু ক্ষেত্রে, ক্ষমতার সবচেয়ে নিচু স্তরের লোকেরাও সবচেয়ে পরিষ্কার ইচ্ছাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। যেমন এক পার্শি ব্যারিস্টারের ব্যাপারটি: ৪ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ জজের কাছে বিধিমতে ব্যারিস্টারটি ছাড়া পেয়েছেন, পুলিশ নিজের কর্তৃত্বে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

নয়াদিল্লিতে বিশৃঙ্খলা নিশ্চয়ই খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, মুসলমানদের সঙ্গে পুরনো মৈত্রীর মাটি ব্রিটিশ সরকারের পায়ের নিচে থেকে সরে গেছে, সেইজন্যে যেন ২৫ জানুয়ারি বেতারে 'সমস্ত পার্শির উদ্দেশ্যে' এক ধরনের S.O.S. পাঠানো হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে এমন এক সংগঠনে সমবেত হতে, যে-সংগঠন ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করবে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালাবে। এবং স্বভাবতই সরকারী চাকরিতে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, পৌরসভা, ভবিষ্যতের সাংবিধানিক ভারতবর্ষে তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের আবেদনে নড়বড়ে সরকারের বিচলিত অবস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে: কারণ পার্শিরা ভারতবর্ষের মাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বুদ্ধি ও অর্থশক্তিতে তারা ধনী, কিন্তু কোনো প্রধান ভূমিকা নিতে অক্ষম; আর, তা ছাড়া, বহুসংখ্যক বিশিষ্ট পার্শি ইতিমধ্যেই শত্রুশিবিরে অর্থাৎ জাতীয় শিবিরে চলে গেছে। দাদাভাই নৌরজির নাতনীই তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে, গান্ধীর গ্রেপ্তারের একমাস পরে (গোটা দেশ জুড়ে ধর্মীয়ভাবে গান্ধীর গ্রেপ্তার উদ্‌যাপিত হয়েছে) সরকারের পরিস্থিতি তাই বিপর্যয়কর ব'লেই সূচিত হচ্ছে। এইটেই ধরে নিতে হয় (অবশ্য ইউরোপের রাজনৈতিক মানসিকতার ব্যাপক অস্পষ্টীকরণ সাপেক্ষে, যে মানসিকতা মনে হচ্ছে গত দশ বছর ধ'রে এই লোকোক্তিটি উপলব্ধি করার প্রয়াসী: 'যা সবচেয়ে খারাপ, তাই নিশ্চিত।') তাহলে এইটেই ধ'রে নিতে হবে যে, যদি রাজনৈতিক শুভবুদ্ধির উদয় হয়, সমস্ত কিছু যথাযথ বিবেচনা ক'রে যথাসময়ে ব্রিটিশ সরকার হয়তো অগ্রসর হবে বড়োলাটকে ফিরিয়ে নিতে ও বোঝাপড়ার এক আইনসঙ্গত রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, যে-রাজত্বের চেষ্টা হবে ভারতবর্ষকে সংশোধিত স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক সংবিধানের জন্যে গান্ধী ও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পাবার। কিন্তু কোনো

কিছু থেকেই বোঝা যাচ্ছে না, নিপীড়নের ফলে ক্ষতবিক্ষত ভারতবর্ষ পরে এতে রাজী হবে কি না।
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ রম্যাঁ রলাঁ

পুনশ্চ :—নতুন ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বগুলোর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের একজনের প্রতি ইউরোপীয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা আগ্রহোদ্দীপক হবে ব'লে মনে করি : তিনি লাল কোর্তার বিখ্যাত নেতা আব্দুল গফ্‌ফর খান। তাঁর ও তাঁর বাহিনীর যে চিত্র ফাদার এলুইন দিয়েছেন, তা ভোলা যায় না :

'বিশাল দেহ, বিশাল হৃদয়, বিশাল ক্ষমতা ও সম্পত্তির অধিকারী এই জমকালো চরিত্রটি পাঠানদের মন জুড়ে বসেছে। গান্ধীর সজাতীয় জীবনের এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাঁর আছে। তাঁর কথাবার্তা যতোই অগ্নিগর্ভ হোক না কেন, সব সময়েই দুটি নামকে এক ক'রে দেখা হয়; এবং মহাত্মার সেই গুণটি তাঁর নেই, যা দিয়ে শত্রুর মনকেও জয় করতে পারা যায়। তিনি এক বিস্ময়কর সংগঠক এবং একতন্ত্রী। কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা আন্তরিক।'

১৯৩০ সালের গোড়ায়, তিনি অহিংস যোদ্ধাদের এক বাহিনী গড়তে শুরু করেছিলেন, যে যোদ্ধারা সমস্ত দুঃখযন্ত্রণাকে তুচ্ছ কবতে প্রস্তুত থাকবে। তিনি নাম দিলেন 'খুদাই-খিদমদগার' ('ঈশ্বরের সেবক')। তাদের কোনো উর্দি ছিল না, কিন্তু একদিন এক স্বেচ্ছাসেবক এসে হাজির হলো ইঁটের গুঁড়োর লাল রঙে ছোপানো এক কোর্তা গায়ে, এই সুবিধাজনক পোষাক ও 'লাল কোর্তা' নামটা গ্রহণ করা হলো। সমাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, খাঁটি অহিংস থাকতে, সবকিছু সহ্য করতে, সব সময়ে সত্য বলতে, চুরি না করতে, সৎ ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে তারা কোরানের নামে শপথ নেয়। আন্দোলনটি বিস্ময়করভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এর জেনারেল ছিল, কর্নেল ইত্যাদি ছিল। গোটা দেশটা কয়েকটা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল, বেসামরিক ও সামরিক শাসনব্যবস্থা ছিল, ১৯৩০ সালে নেতাদের গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনটি বেড়ে উঠেছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর আব্দুল গফ্‌ফর খান জেলায় জেলায় ঘুরেছেন, বাহিনী সংগঠিত ক'রে চলেছেন। তাঁকে সাহায্য করেছেন দাদাভাই নৌরজির নির্ভীক নাতনী; এবং গান্ধীর ছোটো ছেলে দেবদাসের আগমন উদ্দীপনা আবার জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বিস্ময়কর এটাই যে, আব্দুল গফ্‌ফর খান পাঠানদের অহিংসার বাণীতে প্রত্যয় জন্মাতে পেরেছেন। কারণ পাঠানরা চন্ডস্বভাবের, স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহিংসাপ্রবণ এবং কোনো অপমান সহ্য করে না। আজ হিংস্র আফ্রিদিরা যখন পাহাড় থেকে নেমে পেশোয়ারের বাজারে কেনাকাটি করতে আসে এবং দেখে পাঠানরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়, হাত তোলে না, তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে যায় হতবুদ্ধি হয়ে, মনে মনে রাগ পুষে।

১৯৩১ সালে আগস্ট মাসে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'লাল

কোর্তা'কে কংগ্রেসের বাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছে। তারপর থেকেই, আব্দুল গফ্ফর খান সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসের সমস্ত কার্যকলাপের দায়িত্ব পেয়েছেন। বড়ো দিনের দিন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং দমননীতি শুরু হয়েছে। ১১ জানুয়ারির পর কোনো একটি 'লাল কোর্তাকে'ও দেখা যায়নি। আন্দোলনটি গোপন স্তরে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন ব্যাপক ও গভীর, এবং, বিশেষ ক'রে ইংরেজদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে, যাতে একটা বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, তার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু ইংরেজরা ক'রে চলেছে।

'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৫ এপ্রিল, ১৯৩২।

ভারতবর্ষের সংবাদ

'বিপ্লব,'— অদৃশ্য নেতা

যে-যুদ্ধের কাহিনী আমি বলছি, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের মতো, তা পারস্পরিক শক্তিক্ষয়ের লড়াই (guerre d'usure)। প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো, সংঘর্ষগুলো অসাধারণ। এক বিপুল জাতি দাঁতে দাঁত দিয়ে নিঃশব্দ চাপে বিদেশী জোয়াল ভেঙে ফেলতে তার শক্তি প্রয়োগ করছে। আমার 'বুলেটিন' নিয়মিত বার করতে গিয়ে নিরাপদে পেছনে অবস্থিত আমাদের মহান্ সমর-দপ্তরের বিবৃতি: 'প্রাচ্য ফ্রন্টে নতুন কিছুই ঘটেনি…' আওড়াবার বিপদ আছে। তাই আমার 'সংবাদে' মাঝে মাঝে বিরতি ঘটবে।

ভারতীয় প্রতিরোধের পদস্থ নেতারা প্রায় সকলেই রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এখন তাঁরা তাঁদের দলের হাজার হাজার লোকের সঙ্গে জেলে আটক।* কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ সদস্যা শ্রীমতী নাইডু এখনো বাইরে আছেন (কতদিন থাকবেন ?), ১৫ মার্চ তিনি নিজেকেই কংগ্রেসের সভাপতি ব'লে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, কার্যত, কংগ্রেসের আর অস্তিত্ব নেই।** এবং আন্দোলনের

---

* ফেব্রুয়ারির শেষে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,০০০।

** সরকার এখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস বৈধ, কিন্তু, অবৈধের মতোই, সমস্ত স্বাধীন আলোচনা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। যখন এটি লিখছি শ্রীমতী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্য নিষেধ অমান্য ক'রে দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভা ডেকেছেন।

(সর্বশেষ সংবাদে [২৫ এপ্রিল] শ্রীমতী নাইডু ও মালব্য গ্রেপ্তার হয়েছেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে বাধা দেবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।]

প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেমন ক'রে গান্ধীর সেনাপতিরা করেছেন, তেমনভাবে নিজেদের উৎসর্গ করতে তাঁদের ঠেলে দেওয়ার বদলে, আগে থেকে তাঁদের সম্পর্কে ব্যবস্থা না-করাটা, গান্ধীর দিক থেকে কৌশলগত বিরাট এক ভুল হয়েছে কিনা, এ প্রশ্ন তোলা যায়। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই যদি সমস্ত সেনাপতিরা ধরা পড়ে বা মারা যায়, তাহলে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কী বলা যায়? (প্রাচ্যে এ ঝুঁকিতে ভয়ের কিছু নেই! সৈন্যরাই মার্শালদের দাম দেয়…)

কিন্তু গান্ধীর প্রশান্ত আশ্বাস সাধারণ-বুদ্ধির সমস্ত হিসেব ভেঙে দিয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে, যেমন মার্চের প্রথম দিকেও, যেসব খবর পাচ্ছি, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রায় সমস্ত নেতাদের অনুপস্থিতিতে এবং কণ্ঠরুদ্ধ জাতীয় সংবাদপত্রের নীরবতার মধ্যেই সহরে ও গ্রামে জনসাধারণ সক্রিয় হয়ে উঠছে; তারা উদ্বুদ্ধ 'স্বদেশীয়' মতবাদে। বয়কট চলছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে।

বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ ফার্মগুলো প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে, সুতাকলের যন্ত্রপাতির অর্ডার পড়েছিল ৩৭ লক্ষ টাকার (৩,০০,০০০ পাউণ্ড)। সেসব অর্ডার বাতিল করা হয়েছে, বা বাতিল হবার পথে। কংগ্রেসের প্রভাবে বিদেশী ফার্মগুলোও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশী পণ্য কিনবে না। একটি গ্রীক ফার্ম কিনেছিল, কিন্তু ক্ষমা চেয়েছে এবং কংগ্রেসকে জরিমানা দিয়েছে। শ্রমিকদের কাজে অসম্মতিতে এবং প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে একটার পর একটা হরতালে ব্রিটিশ তুলা-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো অচল হয়ে পড়েছে: লর্ড লোথিয়ানের সরকারী কমিটির আগমনের প্রতিবাদে ৮ দিনের হরতাল, বোম্বাইয়ের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ (৭-১৪ মার্চ), ১৬ মার্চ 'কৃষক দিবসের' জন্যে নতুন হরতাল, গান্ধী-দিবস, নেহেরু-দিবস, 'শ্রমিক-দিবস'…সমস্ত অজুহাতই সৎ! গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর (৪ জানুয়ারি), প্রথম ১৮ মার্চ সরকারী চাপে বোম্বাইয়ের সুতাকলগুলো সুতীবস্ত্রের বাজার খুলতে চেষ্টা করেছিল। তারা তা পারেনি। জনতা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ব্যবসায়ীদের কিছু কর্মচারী আহত হয়েছে। পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। ব্যবসায়ীদের বাজার বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক প্রতিষ্ঠানকে ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে ইস্তাহার ছড়ানো হচ্ছে: 'তারা জেনে রাখুক, যতো উদ্ধত, যতো সৌভাগ্যবানই তারা হোক, তারা ভারতবর্ষে থাকতে পারবে না, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।' যারা ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়, তারা জনমতের গুপ্ত বিপদে ভীত। সেই বণিকের কাহিনীটি মুখে মুখে ফিরছে, গান্ধীর গ্রেপ্তারের দিনই বণিকটি সোনা রপ্তানী করে; পরদিন সকালেই সে দেখতে পায় স্টক এক্সচেঞ্জের বাড়ির গায়ে বিশ্বাসঘাতক ব'লে চক দিয়ে তার নাম লেখা। লজ্জায়, ভয়ে সে হার্টফেল করে।—পেশোয়ার থেকে বোম্বাই ফিরে ফাদার এলুইন পূর্ণ হরতালের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন: বাজারগুলোয় শুধু কুকুর আর বাঁদর ছাড়া মানুষ ছিল না। কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় গৈরিকবসনা নারীকর্মী সমস্ত কারবারীদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষের অতি-তৎপর স্বরাষ্ট্র-সচিব এমার্সন একমাত্র গুণী শাসনকর্তা, প্রতিরোধ ভাঙতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কিন্তু এলুইনকে তিনি বলেছেন যে, 'এই

মহিলারাই হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বিপত্তিকর !' ২১ মার্চ সরকার, হালচাল বোঝার পর, হস্তক্ষেপ করা ছেড়ে দিয়েছে এবং বুদ্ধিমানের মতো পশ্চাদপসরণ ক'রে, তুলোর কারবারকে নিজে নিজেই ব্যবস্থা করতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৩ মার্চ বোম্বাইয়ের অন্যতম প্রধান বিদেশী সুতীবস্ত্রের বাজার সরকারীভাবে খুলতে পেরে 'স্বদেশী' বাজারে পরিণত হয়েছে ; তার ৯৪টি দোকানে ভারতীয় সুতীবস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

পাঞ্জাবের কিছু মুসলমান সম্প্রদায় অ-কংগ্রেসী হলেও সবার আগে ব্রিটিশ-বিরোধী, তারাও বিলাতী বস্ত্র ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অভিযানের কেন্দ্র হচ্ছে লাহোর এবং অমৃতসর। গুজরাটেও অন্যান্য কেন্দ্র আছে। মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমান সদস্যরা 'স্বদেশীর' প্রচার সমর্থন করেছেন। ৮ মার্চ জামিয়াৎ-উলেমার (অ-কংগ্রেসী) মুখ্য পরিচালক মুফতি কিফায়েতুল্লা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন, তারা যেন "কংগ্রেসের সুপরিচিত কর্মসূচি" গ্রহণ করে, এবং তিনি খাঁটি অ-হিংসার উপরে জোর দিয়েছেন। ১৩ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুসলমানরা বিক্ষোভ করেছে, লাঠি চলেছে। দিল্লির মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী সমিতি সরকারী গোলটেবিল বৈঠক ও তৎসংক্রান্ত যে কোনো কমিটিকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স দমনমূলক রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়েছে ও বড়োলাটের অর্ডিনান্সগুলোর প্রত্যাহার দাবি করেছে।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ফ্রন্ট তৈরি ক'রে মুসলমান ও হিন্দুর সমান্তরাল ও গাঁটছড়া-বাঁধা দুই বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। এবং এই ঐক্যকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন করার জন্যে কানপুরের হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ২৯ মার্চ (গতবছরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের বার্ষিকীর দিন) এক 'ঐক্য-মেলার' আয়োজন করেছেন, যাতে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব জাগে।

এই ঐক্য "অনুন্নত" (অস্পৃশ্য) শ্রেণীগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই জানে যে, ব্রিটিশ রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে এক আন্দোলন জাগানো, যাকে বলা চলে হরিজন-জাতীয়তাবাদ, তার দাবি হচ্ছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লিতে তাদের কিছু পৃথক আসন থাকবে ; গান্ধী ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে আরোপিত অবিশ্বাস যে, তারা সন্দেহ করে তাদের গলাটিপে মারার অভিপ্রায় আছে ! তার বদলে গান্ধী ও কংগ্রেস চাইছেন সমানাধিকারসম্পন্ন একটি জাতির মধ্যে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য সকল শ্রেণীকে মিশিয়ে দিতে ; সংখ্যালঘুদের যেসব অবিশ্বাস ইংলণ্ড সুচতুরভাবে চাপিয়ে তোলে, তা দূর করার জন্যেই তাঁদের রাজনীতির সমস্ত প্রচেষ্টা হচ্ছে তাদের কিছুসংখ্যক আসনের গ্যারান্টি দেওয়া, যা তাদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি হিন্দু মহাসভা ও অনুন্নতশ্রেণীর সর্বভারতীয় সংগঠন এই ভিত্তির উপরে এক চুক্তি করতে (রাজা-মুঞ্জে চুক্তি* ব'লে কথিত)

---

* "অনুন্নত শ্রেণীর" পক্ষে রাও বাহাদুর এম. সি. রাজা এবং হিন্দু মহাসভার পক্ষে ডঃ বি. এস. মুঞ্জে।

সমর্থ হয়েছে যে, একটি মাত্র নির্বাচক মন্ডলী থাকবে, কিন্তু জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে "অনুন্নতশ্রেণীর" জন্যে কিছুসংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কংগ্রেস ও অন্যান্য সংগঠনের* মেনে নেওয়া এই মৈত্রী গুরুত্বপূর্ণ, এতে "অনুন্নতশ্রেণী"র সমস্যা ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এ সমস্ত সংখ্যালঘুদের আগ্রহ জাগাচ্ছে; হিন্দু ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে যে অসুবিধাগুলো বজায় রয়েছে, সেসব সমাধান হবে যার উপরে, এটা হবে তার ক্ষেত্র। ৬ মার্চ নয়াদিল্লিতে হিন্দু ও শিখ নেতাদের এক সম্মেলনে ২৫ ফেব্রুয়ারির এই চুক্তিকে সমর্থন ক'রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো নেওয়া হয়েছে:

১. লিগ অফ নেশনসের মানবাধিকারের সনদ—যাতে ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ অংশ নিয়েছে—তারই ভিত্তিতে অগ্রাধিকার অনুসারে সমস্ত সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে।

২. পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর প্রস্তাব নাকচ করা হচ্ছে, তা সে যে-কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্যেই হোক না কেন।

৩. কোনো প্রদেশে সংখ্যাগুরু কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে সংরক্ষিত আসন থাকবে না।

৪. সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের রক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে, প্রদেশের লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লির প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সেই প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতকে গণ্য করা হবে না (কারণ এই নীতি সংখ্যালঘুদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যেতে পারে); কিন্তু সকলের প্রতিই প্রযুক্ত হতে পারে, এমন এক নীতি অনুসারে সংখ্যালঘুদের সাধারণ গুরুত্ব মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের অনপুস্থিতিতেও বড়োলাটের সরকারী জমায়েৎকে পাত্তা না দিয়ে, স্বাধীন ভারতবর্ষ আইন প্রণয়ন করছে, তার ভবিষ্যতের সংবিধান তৈরি করছে। আর ধর্মীয় সম্প্রদায়, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর সংহতি বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ১০ মার্চ এই সংহতির এক প্রতীক অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে পন্ডিত মালব্যের সামনে ১৫০ জন অস্পৃশ্য ও সমস্ত শ্রেণীর বহু-সংখ্যক ভারতীয় আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণদের পবিত্র উপবীত ধারণ করেছে। বলা চলে যেন ৪ আগস্টের রাত্রির মতো,** সমস্ত বিশেষ-সুবিধা বিলোপ করা হয়নি, সকলের প্রতি প্রসারিত করা হয়েছে। সাম্যের চরম।

এই দু'কূল-ভাসানো জোয়ারের মুখোমুখি নয়াদিল্লির ক্ষুদ্র দ্বীপে আটকা-পড়া সংখ্যালঘু ইংরেজরা কীভাবে মোকাবিলা করছে? করছে অত্যন্ত হিংসাত্মক পন্থায়, লাঠি-চার্জ, নিষ্ঠুরতা, জেলখানায় চাবুক, গুলি, দ্বীপান্তরের মাধ্যমে। বিশেষ ক'রে

---

* বোম্বাই প্রেসিডেন্সির "অনুন্নত শ্রেণীর' ২১টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরকারের কাছে ৩০ মার্চ তার করেছেন যে, তাঁরা 'রাজা-মুঞ্জে চুক্তি' সমর্থন করেন। এই চুক্তির সমর্থনে অনুন্নত শ্রেণীদের এক শোভাযাত্রা দিল্লীর সরকারী দপ্তরের সামনে পরিক্রমা করেছে।

** ৪ আগস্ট, ১৭৮৯। এই তারিখের রাত্রিতে ফরাসী কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত বিশেষ-সুবিধা বিলোপ করেছিল।—অনু.

গ্রামাঞ্চলগুলোই এর শিকার ঃ কারণ গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নেই, যা হামলাকারীদের আটকে রাখতে পারে। সন্ত্রাসও আর লাগাম দেওয়া নয়। ইতালির "কালো কোর্তাদের" সংগঠিত শাস্তিমূলক অভিযানের কায়দায় পুলিশ গাড়ি ক'রে রাত্রে গ্রামে ঢোকে এবং বাড়ি বাড়ি হামলা ক'রে বেড়ায়। মারধোরটা তেমন বড়ো কিছু নয়, ওরা চায় অসম্মান করতে। সকলকে উলঙ্গ ক'রে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করে, গাড়ির পিছনে বাঁধে, মরে গেছে না-মনে করা পর্যন্ত পিটিয়ে চলে ; ইলেক্‌ট্রিক শক দেয় ; শিশুদের চাবুক মারে ; মেয়েদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে ; অত্যাচার করে (আমেদাবাদ অঞ্চলে মেয়েরা এখন কোমরে লম্বা ছুরি ঝোলাচ্ছে, যদি সম্মান বিপন্ন হয়, তাহলে যাতে আত্মহত্যা করতে পারে)। কোনো কিছু করতে অস্বীকার করলে গোটা গ্রামকেই সাজা দেওয়া হয়, গরুবাছুর, বাসনপত্র, মেয়েদের গয়নাগাঁটি, চাষের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়া হয় ; কয়েক আনা ট্যাক্সের জন্যে শতাধিক টাকার জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয় ; রাত্রে বৃদ্ধ ও শিশুদের রাস্তায় বার ক'রে দেওয়া হয় ; হাসপাতাল বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, রোগীদের বাইরে ফেলে রাখা হয়, সরকারী হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করতে অস্বীকার করা হয় ; আহত ও অজ্ঞান স্বেচ্ছা-সেবকদের সাহায্য করতে গেলে মাদ্রাজে এ্যাম্বুলেন্সের উপরে ব্যাটন চালানো হয়েছে। সমস্তরকম হীন পন্থায় জনগণকে চূর্ণ ও হতাশ করার চেষ্টা চলছে। একমাত্র যে উচ্চকণ্ঠ শোনানো সম্ভব হয়েছে, যে-কণ্ঠ সরকার এখনো রুদ্ধ করতে সাহস পায়নি,* তা হচ্ছে পণ্ডিত মালব্যের কণ্ঠ ; ২৪ ফেব্রুয়ারির মারাত্মক অভিযোগবাণীতে ইংলন্ডের সংবাদপত্রগুলোর কাছে ('স্পেক্টেটর', ডেইলি হেরাল্ড', ইন্ডিয়া রিভিউ') টেলিগ্রামে এইসব কলংকের নিন্দা করা হয়েছে, এবং বেনারসে এর প্রচার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণ করেছে যে, যা প্রত্যাশিত ছিল তার বিপরীত ফল এই সন্ত্রাসের রাজত্ব পেয়েছে। এতে জনসাধারণের প্রাণশক্তিই সুরক্ষিত হয়েছে এবং তিক্ত ক্রোধে গোটা দেশ টগবগ করছে। "আজ পর্যন্ত যারা রাজনীতিতে মাতেনি, তারাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সরকারের ইজ্জত ঢিলে হয়ে গেছে, এমনটি আগে হয়নি।" আর একজন বিখ্যাত ভারতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ভি. জে. প্যাটেল, স্বাস্থ্যের গুরুত্বের কারণে তিনি সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, মার্চের গোড়ার দিকে মালব্যের ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ব্রিটিশ রাজনীতি ব্রিটিশ বাণিজ্যের এবং সেইসঙ্গে ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের সুসম্পর্কের কবর খুঁড়েছে ঃ ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু ত্যাগ করার জন্য ইংলন্ড প্রস্তুত না হবার আগে কোনো বোঝা-পড়াই সম্ভব নয়…"

সেরা ইংরেজরা উদ্বিগ্ন ; ভারতবর্ষে ও ইংলন্ডে তাঁদের মধ্যে প্রাণবন্ত প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ৩ মার্চ কলকাতার খ্রীষ্টান সাপ্তাহিক 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় রেভাঃ জন কেলাস দুঃখ করেছেন ঃ

—"মনে করা হয় যে, ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের মধ্যে সরকারের বর্তমান নীতি

---

* এই ব্যাপারের পর, আজ (২৫ এপ্রিল) তিনি বন্দী।

সম্পর্কে ঐক্যমত আছে। এটা বড়োই অদ্ভুত! জাতীয় সরকারকে সমর্থন করতে ইংরেজরা নিজেদের মধ্যেই একমত নয়। যতটা ভাবা যায়, পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশী! ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় অবশ্যই দেশের জীবন থেকে এমন বিচ্ছিন্ন যে, নিরপেক্ষ বিচারে একেবারে অক্ষম। কিন্তু ব্রিটিশ জনসাধারণের এক বিরাট অংশ চুপ ক'রে আছে। এবং তাদের হয়ে কথা বলার দাবি না করেও, আমি ঘোষণা করছি যে, লর্ড উইলিংডন (বড়োলাট) শান্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে অপরাধী। কংগ্রেসের নেতা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার ক'রে আলোচনা ভেঙ্গে দিতে তিনিই প্রথমেই পা বাড়িয়েছেন।"

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় শোচনীয় রাজনীতি ও সম্মানিত ব্যক্তিদের ভয়াবহ দন্ডদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে জনৈক ইংরেজ একথা ঘোষণা করতে ভয় পাননি ঃ "এই যদি ব্রিটিশরাজ ও সরকারের ব্রিটিশ পদ্ধতি হয়, তাহলে পরিষ্কার বলবো যে, দিল্লিতে যতো শীঘ্র স্বরাজের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল।"*

২৫ ফেব্রুয়ারী লন্ডনের এক জনসভায় সরকারী রাজনীতির বিরুদ্ধে বলেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল, জর্জ ল্যান্সবেরি, অধ্যাপক ল্যাস্কি ও কিংসলে মার্টিন। ২৯ ফেব্রুয়ারি কমন্স সভায় বিরোধী শ্রমিকদল শক্তির পরিচয় দিয়েছে। মরগান জোনস, এটলি, বিশেষ ক'রে ল্যান্সবেরি ভারতবর্ষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং সরকারী ভন্ডামীর নিন্দা করেছেন ঃ "কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে না, ভারতবর্ষের জনগণ তা চায় না, এইসব হাস্যকর কথাবার্তা অনেক শোনা হয়েছে! গোলটেবিল বৈঠকে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রতিনিধি স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছেন। ভারতবর্ষ নিজেকে শাসন করতে পারে কি পারে না, তা আমাদের ঠিক করার ব্যাপার নয়। যে কানাডাবাসীদের বলা হতো, কয়েক বছরই শান্তিতে থাকতে পারবে না, তাদের মতোই ভারতবর্ষের লোকেরা বোঝাপড়ার উপায় খুঁজে নেবে। আর "অনুন্নতদের" কথা না বলাই ভালো! স্বায়ত্তশাসনের দাবির আগে কখনো এসব কিছু ছিল না।" অক্সফোর্ডে লর্ড আরউইন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, বৈধীকরণ ছাড়া ভারতবর্ষে স্বাভাবিক অধিকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনো ফল হবে না ঃ

'আমি দেখছি ভারতবর্ষের রাজনীতির বর্তমান প্রবণতা হচ্ছে, নিজের সত্তাকে বিকশিত করার মানবপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম ; এবং এই বিকাশ গত

---

* এই একই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে ইংলণ্ডের লিবারেল সংবাদপত্রগুলোতে। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি' প্রায়ই গেল গেল রব তুলছে। ৮ এপ্রিল 'ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়ার' বহু সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি পত্র এতে ছাপা হয়েছে, গ্রেটব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে অতল ব্যবধান রচিত হচ্ছে, এতে সে-সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। ভারতবর্ষের বন্ধুরা, মিশনারি, অধ্যাপক, মডারেটরা, স্বতন্ত্র ইংরেজরা যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সমর্থন করা হয়েছে, সরকারী কার্যকলাপে যে তিক্ততা ও বিদ্রোহ জেগেছে তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

লণ্ডনের সাম্প্রতিক সফরে—(এপ্রিলের প্রথম পক্ষে) দু'মাস ধ'রে দেখেশুনে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আমাদের বন্ধু এবং প্রিভা পার্লামেন্টের সদস্যদের ও সংবাদপত্রগুলোকে পরিষ্কার ধারণা দিতে অনেক কিছু করেছেন, তাঁদের তিনি নিজের ধারণা জানিয়েছেন।

একশো বছর ধ'রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে...বলপ্রয়োগ রাজনৈতিক সমস্যার আর কোনো সমাধান নয়, বলপ্রয়োগ যা করতে পারে তা হচ্ছে এক পরিস্থিতির সৃষ্টি—যখন বোঝাপড়ার যুক্তির আর বাঞ্ছিত সমাধান খুঁজে পাবার সুযোগ থাকে না।'

এবং ব্রিস্টলে কিংসলে হলের এক বিক্ষোভসভায় জনতা মিস ই. উইলকিনসনের এই কথাগুলো শুনেছে :

—"গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসা।"

গ্রেট ব্রিটেন যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে যায়, তাহলে যাবে তার সব রক্ত টেনে বার করার পর। তার রাজনীতির সবচেয়ে বাস্তব, সবচেয়ে নিরলস ব্যাপার হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত সোনা ভয়ংকরভাবে শুষে নেওয়া। ২৬ সেপ্টেম্বরের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে একটা জাহাজ এখান থেকে একটা ক'রে ভরা নিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই ২৭ ফেব্রুয়ারি তার পরিমাণ হয়ে উঠেছে ৫১,৩১,০৭,৭৯০ টাকা, ৩,৮৪,৮৩,০৮২ পাউন্ডের বেশি। এর সঙ্গে যোগ করা হোক, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে,—চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মুখ্যত সংবাদপত্রগুলোর উপরে চাপানো বিপুল জরিমানা,—বাজেয়াপ্ত ও বিক্রিকরা সম্পত্তি (মাত্র একটা জেলাতেই ফেব্রুয়ারির শেষে ৩৯৫টি সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে)। মার্চের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের বাজেট ছিল ৮৬,২৫,০০০ পাউন্ড ঘাটতি। এই ধারণাই হয় যে, ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ব'লে, ইংরেজের লুণ্ঠনের রাজনীতি তার ছাল ছাড়াতে, তাকে শুষে ছিবড়ে করতে তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে।*

তাছাড়া, এই জোরজুলুমের সোনা নয়াদিল্লির সরকার যে হাস্যকর আড়ম্বরের সঙ্গে খরচ করছে, তা ভারতবর্ষের ইংরেজদেরও বিব্রত ও স্তম্ভিত করছে ('ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', ১১ মার্চ)। ভারতবর্ষের কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরই ধারণা নেই ইংলন্ডে কী কৃচ্ছ্রতা চেপে বসেছে।

এই নয়ছয়-করাটা যদি ভারতবর্ষের ইংরেজদের পক্ষে ইতিমধ্যেই জঘন্য মনে হয়, তাহলে সেই মনোভাব সম্পর্কে কী বলা যায়, হাড়মাস চিবিয়ে খেয়ে এই বাবুগিরি যে মনোভাবকে ভারতীয় জনগণের দুর্দশার উপরে চাপিয়ে দিয়ে থাকবে! ১৯৩২ সালের ৬ জানুয়ারি (date'e d'Epiphanie) তারিখে লেখা ফাদার এলুইনের সকলের জন্যে প্রচারিত এক পত্রে, বিশেষ ক'রে যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ দারিদ্র্যের এক মর্মস্পর্শী চিত্র দেওয়া হয়েছে : গ্রামগুলো ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে, শিশুরা খিদেয় মরছে, ক্ষুধার্তদের অঙ্গে বস্ত্র নেই, খাজনার চাপে এখনো চূর্ণ হয়...নোংরা বদ্ধজলা, আশাহীন ঊষরতা...'যেখানে খাদি আছে (গান্ধী প্রবর্তিত চরকা-শিল্প) সেখানকার গ্রামগুলোর সঙ্গে কী পার্থক্য! সেখানে প্রত্যেকেরই কাজ আছে, প্রত্যেকেই প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি ; সুতা-কলের মজুররা

---

* বোম্বাইয়ের চেম্বার অফ কমার্সের ফেডারেশন সোনা রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। সোনার বাজারের দালালরা তার বিরুদ্ধতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৩০ মার্চ।

যেখানে কিলবিল করে, সেইসব গোয়াল-খোঁয়াড় থেকেও অবস্থা সেখানে একই রকম পৃথক। কিন্তু সব কিছুর শেষে গ্রেট ব্রিটেনের হাত থেকে গান্ধীবাদীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরই খাঁটি সমাধান হতে পারে না। একমাত্র, সবচেয়ে মিতব্যয়িতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক জাতীয় সরকারই খাজনার এই ভারী বোঝা কমাতে পারে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বাহিনী পোষার জন্যে নয়ছয়-করা গরীবদের সমস্ত টাকার সাশ্রয় করতে পারে। সমস্ত ডোমিনিয়নগুলো এক করলে যতো, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি টাকা, ভারতবর্ষ আজ তার সৈন্যবাহিনীর জন্যে খরচ করে। একটা জেলায় যেখানে শতকরা ৯০ জন প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় ভোগে, সেখানকার স্বাস্থ্যখাতে সরকারী বাজেটে ধার্য হয়েছিল বছরে সামান্য একশো টাকা। আজ তাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রসঙ্গক্রমে বলি, বড়োলাট তাঁর মাইনে হিসেবে প্রতি তিন মিনিটে যা পান, ওই একশো টাকা হচ্ছে তাই। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, সরকারের একজন ধর্মযাজকের মাইনে থেকে একশো শিশু নিয়ে কুড়িজন সদস্যের একটা আশ্রমের খরচ চলে যায়। নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের মতোই, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি গরীবের আশা দেখতে পাই একমাত্র ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে। আমি জানি যে কংগ্রেস বহু সমালোচনার সুযোগ দিয়েছে, বহু কংগ্রেসী সংকীর্ণমনা, হিংসাপ্রবণ ও গোঁড়া; কিন্তু এটাই ভারতবর্ষের একমাত্র সংগঠন যার মনে দরিদ্রের মঙ্গলের বাসনা আছে, এবং কার্যক্ষেত্রে যে প্রতিকারে সক্ষম।'

কংগ্রেস ও গান্ধীর অভাবে হিংসারই শুধু অবকাশ আছে। আর তার জানানও দিচ্ছে। এটা মারাত্মক, যদি না গান্ধীর সঙ্গে কারবার করতে পারা যায়। কংগ্রেসীদের গোপন যেসব খবর আমাদের হাতে এসেছে, তাতে ফেব্রুয়ারি (২৫, ২৭ ২৮, ২৯) ও মার্চের গোড়ায়, কানপুরে, সীতাপুরে (যুক্তপ্রদেশে), সীতামারীতে (পাটনা) বিদেশী বস্ত্রের দোকানে ও যারা হরতাল মানেনি তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, বোমানিক্ষেপ, পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণের স্বীকৃতি আছে। উত্তরের কোনো কোনো ধর্মীয় ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিজমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এলুইন লিখেছেন:

'বৃন্দাবনে—যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন ও গোপিনীদের সঙ্গে লীলা করতেন—সেখানে আমার ব্রাহ্মণ গৃহস্বামী লেনিন পড়েছেন। বেনারসে আমার গৃহস্বামীর গ্রন্থাগারের তাকগুলো কমিউনিজম সংক্রান্ত বই দিয়ে বোঝাই, আর সংস্কৃত পুঁথিগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছে এইটুকু জায়গায়। এঁদের মধ্যে 'সন্ন্যাসী' ও ধর্মযাজকদের এখন অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। দশ বছরের একটি ছোটো ছেলে (তার বাবাই গল্পটা করেছেন) আমার কাছে অটোগ্রাফ চাইতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। পথে আসতে আসতে সে ভেবে দেখলো: 'এই ফাদার এলুইন লোকটা ধর্মধ্বজী। ধর্ম জনগণের আফিং। এমন লোকের অটোগ্রাফ আমি চাই না।' এর অর্থ জড়বাদ নয়, এর অন্তর্নিহিত অর্থ অবশ্যই হিন্দুধর্মের ধ্বংস নয়: হিন্দুধর্ম একটা সংস্কৃতি, একটা মানসিকতা, আস্তিক ও নাস্তিক উভয়কেই স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু এই নতুন ভারতবর্ষ, নাস্তিকও যদি হয়, তার হিন্দুবৈশিষ্ট্যের

সঙ্গে আবেগভরে সম্পৃক্ত। সত্য, প্রেম ও ন্যায়ের আদর্শ বহু যুবক ও নর-নারীর ধর্ম হয়ে উঠেছে। এর বিপরীত, জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত গান্ধীকে নিয়ে 'মিথ' গড়ে উঠেছে। বৃন্দাবনে ও মথুরায় আমি গান্ধীর প্রতিমা দেখেছি, প্রতিমাগুলোয় দেখানো হয়েছে পবিত্র নদীতে পদ্মের উপরে তিনি বসে আছেন। চম্পারনের চাষীরা বলে, তিনি যখন মুক্তি পেয়েছিলেন, তখন বিচার সভায় এক দেবদূতের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনিই গান্ধীকে মুক্তি দিতে বিচারকদের বাধ্য করেছিলেন। সাপ ও অন্যান্য জন্তুর সম্পর্কে তাঁর উপর আলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা হয়। আমি নিজে দেখেছি, বৃদ্ধরা ভীড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে তাঁর কাপড়ের একটু ছোঁয়া পেতে, যাতে তাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই গান্ধী এইসব ধরণের জিনিস অপছন্দ করেন।'

সর্বশেষ একটি বিষয়ের উপরে এলুইন জোর দিয়েছেন: ভারতবর্ষ ত্যাগের আদর্শকে শ্রদ্ধা ক'রে চলেছে। কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সে জগৎ থেকে পলায়ন ও নিজের মুক্তির চেয়ে বেশি কিছু আশা করে। দারিদ্র্যের সমস্যা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনগুলোর উপরে এমন দুর্ভর হয়ে চেপে বসে আছে যে, যা এই সমস্যার সমাধানের দিকে চালিত নয়, তা তাঁরা মোটেই সহ্য করতে পারেন না। বিবেকানন্দের শিক্ষার কথাই শোনা যায়: 'আমার দেবতা আর্ত-পীড়িতেরা, আমার দেবতা সকল জাতের দরিদ্রেরা!'…তাঁর কোমলহৃদয় গুরুকে* তিনি যেমনটি কঠোরভাবে বলেছিলেন: 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' এলুইন লিখেছেন: 'নিজের মধ্যেই শেষ হয়ে-যাওয়া ধ্যানের জীবনের প্রতি বর্তমানে বিরাগ স্পষ্ট; ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, এমনকি সাহিত্য পড়াশোনাতেও বিরাগ। আমার ঘোরাফেরায় আমি যে সামান্য সংখ্যক বই দেখেছি তাতে বিস্মিত হয়েছি…' বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'আমরা এমন এক ধর্ম চাই, যা আমাদের দেবে নিজের প্রতি বিশ্বাস ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ক্ষুধার্তকে আহার্য দানের, দুর্দশাকে জয় করার, জনগণকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা। যদি ভগবানকে পেতে চাও, মানুষের সেবা করো!'

এই যেসব ধর্মগুরু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে সামাজিক কর্মের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যেই গান্ধী দেখাচ্ছেন তিনি তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এলুইন বর্ণনা করেছেন, ল্যাংকাশায়ারে সুতা-কলের মালিক ও শ্রমিকদের সম্মেলনে, যখন প্রার্থনার সমাবেশ হয়েছিল এবং বিশেষ ক'রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে, 'তাঁর দিব্য উপস্থিতির রৌদ্রালোকে তিনি যেন তাদের উষ্ণ হতে অনুমতি দেন,'—তখন গান্ধী তাদের বলেছিলেন: 'যখন সকালে একপেট খাওয়া হয়েছে, এবং যখন দুপুরে আরও ভরপেট খাবার আশা আছে, তখন ঈশ্বরকে বলাটা বড়োই ভালো…কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত আপনাদের দরজা ধাক্কাচ্ছে, তখন দিব্য উপস্থিতির রৌদ্রালোকে নিজেকে উষ্ণ করাটা অসম্ভব!'

এই সমস্ত তথ্যই এক সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন, ভবিতব্য ও আসন্নতা প্রমাণের পক্ষে আমাদের সঙ্গে মিলে যায়। ইংরেজ অত্যাচারীদের ভুলত্রুটি যেমন, তেমনই

---

* রামকৃষ্ণ।

অত্যাচারিত ভারতবর্ষের বিচিত্র আশা-আকাংক্ষা - সবকিছুই সেই সমাজ-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। গোটা প্রশ্নটি হচ্ছে সেইটি জানার, কোন্ পন্থায় সেই বিপ্লব সম্পন্ন হবে,—হিংসার পন্থায়, না অ-হিংসার পন্থায়।

কিন্তু তার নাম, তার শিক্ষা এবং তার চিন্তা, সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক, এখন সব কিছুর মূলে। ফাদার এলুইনের দেওয়া একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই তার এক জীবন্ত প্রতীক দেখছি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'বিপ্লব' কথাটির উর্দু প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ইনকিলাব' এবং নেতাহীন, ছত্রভঙ্গ, তাড়িত, 'লাল কোর্তারা,'* বীর পাঠানরা 'ইনকিলাবকে'—রক্তপাতহীন বিপ্লবের মূল নীতিকেই—তাদের নেতা বলে গণ্য করে। একে চূর্ণ করা যাবে না। সত্য, ধৈর্য, যন্ত্রণা ও প্রেমের মাধ্যমে এ জনসাধারণকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাবে। আর তাদের সমবেত হবার ধ্বনি হচ্ছে; 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' কিন্তু হিংস্র পাহাড়ী আফ্রিদিরা যারা আন্দোলনের সারমর্ম বোঝে না, কিন্তু তার বীরত্ব দেখে অবাক হয়, মনে মনে কল্পনা করে যে, বিদ্রোহী ভারতবর্ষের দুই নেতা: একজন যিনি জেলে আছেন (আব্দুল গফ্ফর, নয়ত গান্ধী); অন্যজন, সবচেয়ে বড়ো নেতা—'ইনকিলাব', এক জীবিত ব্যক্তি, তিনিই জনগণকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবেন।

তারা ভুল করছে না। 'ইনকিলাব' জীবন্তদের চেয়েও জীবন্ত। আমাদের ভারতবর্ষের ভ্রাতারা ও ইউরোপের আমরা সবাই তার অপেক্ষায় থাকবো।

২০ এপ্রিল, ১৯৩২

রম্যাঁ রলাঁ

পুনশ্চ:—'ইন্ডিয়া বুলেটিন'-এর** মার্চ, ১৯৩২ সংখ্যায় মিস এ্যামি মুরের লেখা 'গান্ধী ও ক্যাপিটালিস্ট' নামে কৌতূহলজনক প্রবন্ধটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একদিকে রদারুসের সংবাদপত্রগুলোয়, অন্যদিকে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলোয় গান্ধী ও কংগ্রেসীদের বুর্জোয়ার দালাল বা দেশী শোষকদের হাতিয়ার ব'লে যে তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে, তার বিরোধিতা ক'রে এতে দেখানো হয়েছে, যেমন, ভারতবর্ষের তেমনি ইংলন্ডের ক্যাপিটালিস্ট শোষকদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও গান্ধী অতি পরিষ্কার অবস্থান গ্রহণ করেছেন। করাচী অধিবেশনে গৃহীত কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলো বিশেষ ক'রে অতি স্পষ্ট।

'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৫ মে, ১৯৩২।

---

* মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এরা সেইসব পাঠান, যারা আব্দুল গফ্ফর খানের পরিচালনায় অ-হিংস প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করে।

** 'ইণ্ডিয়া বুলেটিন' "ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া', ৪৬ ল্যাংকাস্টার গেট, লণ্ডন, ডব্লিউ. ২. প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (সভাপতি লরেন্স হাউসম্যান; সহ-সভাপতি রেজিনাল্ড এ. রেনল্ডস)।—প্যারীতে 'আমি দ্য গান্ধী' (১৬০ বুলভার মঁপারনাস) প্রতিষ্ঠানের ফরাসী গোষ্ঠীর মাসিক পত্র 'নুভেল দ্য ল'্যাদ' প্রকাশিত হচ্ছে।

৪

মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

পৃথিবী আজ নরকের রূপ ধারণ করিয়াছে। বিশেষ সুবিধাভোগী জাতিগুলির —এবং উহাদের মধ্যকার শ্রেণীগুলির এবং ঐ শ্রেণীগুলির মধ্যকার বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীসমূহের—সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্য হইতে যদি কেহ বাহিরে আসিতে পারে তবে আজ হোক, কাল হোক, এ সত্য তাহার চোখে প্রতিভাত হইবেই যে, যে-সভ্যতা হইতে সে প্রাণরস আহরণ করিতেছে ও যে-সভ্যতা তাহার গর্বের বস্তু শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর জঘন্য, নির্মম, পাশবিক শোষণ সে-সভ্যতার বেদী রচনা করিয়াছে। এ উপলব্ধি যখন তাহার মনের গভীরে প্রবেশ করিবে, তখন জীবনের সমস্ত আনন্দ তাহার মরিয়া যাইবে; জীবনপণ করিয়া এই কর্কট ব্যাধিকে নির্মূল করিবার সংকল্প যতদিন না সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে সে-আনন্দ আর সে ততদিন ফিরিয়া পাইবে না।

যে বিরাট মেষপাল আগেভাগেই লড়াই ছাড়িয়া চলিয়া আসে, নিজের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহারা বলে, আজ যাহা দেখিতেছি তাহা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, অতএব এ অবস্থার পরিবর্তন করা যাইবে না। এ মিথ্যা কথা। মানুষের ইতিহাসে যেমন চিরদিন একদিকে জাতির, শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর নির্যাতন চলিয়া আসিতেছে তেমনই তাহার পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য নির্যাতিতের আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু গত অর্ধশতাব্দীর শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর শোষণ ও নিপীড়ন ব্যবস্থা যে-ভাবে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। নিপীড়কের সংখ্যা এক কি বহু, তাহারা দলে বিভক্ত কি রাষ্ট্রে বিভক্ত, সে প্রশ্নের কোনো মূল্যই আজ নাই। নিপীড়ক আজ একটি বিশেষ ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থা স্বর্ণসাম্রাজ্যবাদ। আন্তর্জাতিক নীতি আজ এই ব্যবস্থাই পরিচালিত করিতেছে। বড় বড় শোষণকারী রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। জাতিতে-জাতিতে হিংসা ও বিভেদ এই ব্যবস্থার মূলে রসসিঞ্চন করিতেছে। একটা বিদ্রোহী জাগরণ আজ নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁপিয়া উঠিতেছে ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতোরণ। এই আলোড়ন যতই বাড়িতেছে, ভাঙ্গনের ভয়ে ধনতন্ত্রীব্যবস্থা যত বেশি উদ্বিগ্ন হইতেছে, নিপীড়নের দানবীয় রূপ ততই নগ্ন ও নির্লজ্জ হইতেছে। স্বেচ্ছাচারকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলি যে আইনের ব্যবহার করে, সেটুকু পর্যন্ত আর নাই। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা আজ তার মুখোশ খুলিয়াছে। বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে একদিন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই বিভীষিকাই আজও তাহাকে কায়েম করিতেছে।

ধনতন্ত্রী শোষণ পৃথিবীর সর্বত্র এই ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের উপর আজ যে নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার তুলনা মেলা কঠিন। রক্ত শোষকের দল পাপের পথে আজ এতখানি আগাইয়া গিয়াছে যে, পিছু ফেরা আর তাহাদের চলে না, ফিরিলেই তাহাদের মরণ অনিবার্য।* ভারতবর্ষকে শুষিয়া নিরক্ত করিয়া গত একশত বৎসর ইংলন্ড বাঁচিয়া আছে। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইবামাত্রই ইংলন্ডের টলটলায়মান সম্পদসৌধ ধ্বসিয়া পড়িবে। হল্যান্ডের সম্পদস্ফীতির মূলে তাহার পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি। ফ্রান্সের নিকট ইন্দোচীন সাম্রাজ্য শুধু মুনাফার সামগ্রী নহে। ভাটিখানার মালিকদের লইয়া যেমন প্রাচীন রোমক গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল তেমনি এ সাম্রাজ্যও ফরাসী গণতন্ত্রের অস্ত্রসজ্জিত ধনতন্ত্রের মহারথীদের সামরিক ঘাঁটি। আসন্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের জন্য ও চীনকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এই ঘাঁটি ব্যবহার করা তাহাদের লক্ষ্য।

তাই, যেমন বাংলাদেশে তেমনি আনামে, যেমন বাটাভিয়ায় তেমনি হ্যানয় ও পেশোয়ারে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সামরিক আইনের রাজত্ব চলিয়াছে। হাজার হাজার লোক বছরের পর বছর জেলে ও বন্দীশিবিরে পচিতেছে। গান্ধীজী ও ভারতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল শুধুমাত্র এই অপরাধে ১৯৩২ সালের মে মাসে ব্রিটিশ-ভারতে ৮০,০০০ নরনারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইয়েন-বের ঘটনার পর হইতেই সরকারী ফরাসী-ইন্দোচীনে ৭,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে তিন হাজার ১৯৩০ সালের ১৪ই জুন তারিখেই ধৃত ও দণ্ডিত হয়। বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা কম নহে। ইহাদের অপরাধ ইহারা করহ্রাস, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈহিক শাস্তিদান ব্যবস্থা রহিত করার দাবী জানাইয়াছিল। ১৯৩২ সালে ডাচইন্ডিজে ১০,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে-বন্দী করা হয়। চীনের বন্দীসংখ্যা ৫০,০০০ (অবাধ হত্যালীলার কথা বাদ দিলাম)। কোরিয়ায় ৩৫,০০০। ইহা ছাড়া জাপানে হাজার হাজার লোক

১৯৩৫ সালের মন্তব্য :—ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে (এখানে স্থানাভাবে সেগুলো দেওয়া সম্ভব নয়,—বিশেষ ক'রে ১৯২৫ সালে ১৮ নভেম্বর পল কেলগকে লেখা নিউইয়র্কের 'সার্ভে পত্রিকা'য় ছাপা এক চিঠিতে)—আমি ইতিহাসের এই মারাত্মক নিয়মটিকে বিকাশিত করেছি যে শোষক রাষ্ট্রগুলো শোষিত দেশগুলোর সঙ্গে নিজের ভাগ্য এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে যে ধ্বংস না হয়ে তাদের থেকে আর আলাদা হতে পারে না। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে আমি ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলাম, যেমন করেছিলাম ফ্রান্সের ক্ষেত্রে উত্তর আফ্রিকার,—ইসলামের এক অভ্যুত্থানের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রদূত উত্তর আফ্রিকার বর্তমান অশান্তি আমি আগেই দেখতে পেয়েছিলাম···ইউরোপীয় জগৎ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এর পরিত্রাণের একমাত্র সম্ভাবনা হচ্ছে পদানত জাতিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানানো—প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্খার মুখোমুখি হওয়া, বিশুদ্ধ এক যৌথ 'মডাস ভিভেণ্ডি'র চেষ্টা করা বা পারস্পরিক প্রয়োজন মেটাবে, মানুষে মানুষে নতুন সামাজিক চুক্তি'র ভিত্তিস্থাপন করবে। এহেন পরিকল্পনার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি বেশি মোহ পোষণ করি না। কিন্তু সবসময়েই আশা করা ও সক্রিয় হওয়া দরকার।···

ধৃত, নির্যাতিত ও দণ্ডিত হইতেছে এবং ইতালীয় বেলজিয়ন ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়—নিপীড়নের বন্যা চলিয়াছে। নিষ্ঠুর, কপট, দানবীয় মার্কিন সাম্রাজ্যের ভূমিকাও দেখিবার মতো। সে আজ দুর্নীতি-জর্জরিত কুয়োমিনটাঙ সেনাপতিগণের পরম মিত্র ও কিউবার হত্যালীলার সমর্থক। অর্থনৈতিক শোষণকে আরও কায়েম করিবার জন্যই ফিলিপিনদের সে স্বাধীনতা দিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার বুকে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পীড়নকারীর বিরুদ্ধে পীড়িতের বিদ্রোহ যতদিন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটিতেছিল ততদিন দলন ও দমনের কাজ চলিতেছিল দ্রুতভাবে ও নিঃশব্দে।

কিন্তু এ বিদ্রোহ যখন ব্রিটিশ ভারতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মত বিরাট গণঅভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিতে শুরু করিল, তখন দমননীতিও সমস্ত মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। এই বিপুল গণতরঙ্গকে অহিংসার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন এই মহাপ্রতিভা। তাই যে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা আপোষ করিয়াও বর্তমান সমাজব্যবস্থা কায়েম করিতে চাহে, এই সুসংযত অভ্যুত্থান এখনও তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদার বিদ্রোহের লক্ষ্য ভারতীয় স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ স্বার্থের সমন্বয়সাধন। ভাইসরয়ের নির্বোধ আত্মম্ভরিতায় ও কূপমণ্ডুক শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতায় বাধ্য হইয়াই এ আন্দোলন শুরু করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এ আন্দোলন রূপ বদলাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প লইয়া সুসংহত, বৈপ্লবিক সংগ্রামশীল দলগঠনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। নিপীড়িত পৃথিবীর বিদ্রোহ-আন্দোলনে নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। ১৯২৮ সালে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের ধর্মঘট ও গিরনি কামগড় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার সূত্রপাত; অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইহার সূচনা মাত্র ৫ বৎসর পূর্বে। আনামে হয় আরো পরে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েৎ-নাম-কোক্‌-দান-দাং-এর (অর্থাৎ ইন্দোচীনের কুয়োমিনটাঙ, ইহারা ইয়েনানের উপরে জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণ সমর্থন করে) সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই দলনের রথচক্র চলিতে শুরু করিল। ইন্দোচীনে স্থাপিত হইল এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চিরস্থায়ী বিচারালয়—'ক্রিমিনাল কমিশন অব সাইগন'। এখানে বিচার চলিবে রুদ্ধকক্ষে, কৌঁসুলী মনোনীত করিবেন স্বয়ং সরকার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী কোনো দলিল ও কাগজপত্র দেখিবার অধিকার তাহার থাকিবে না। এই কমিশনের বিচারে ১৯৩২ সালের জুলাই পর্যন্ত ১,০৯৪ জন দণ্ডিত হইয়াছেন; উহাদের মধ্যে ৮৩ জনের হইয়াছে মৃত্যুদণ্ড, ১৩০ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪২০ জনের নির্বাসন। আগামী মার্চ ও এপ্রিল মাসে আনামের ১৮০ জন বিপ্লবীর বিচারের জন্য কমিশন এখন প্রস্তুত হইতেছে।

ইন্দোচীনের রুদ্ধকক্ষের বিচারব্যবস্থায় যেমন অবিচার ও পক্ষপাত নির্লজ্জভাবে

প্রকটমান, ব্রিটিশ-ভারতের বিচারব্যবস্থায় সেরূপ নহে। সেখানে বৈধতার একটা ছদ্মবেশ সযত্নে রক্ষা করা হয়। তাই ব্রিটিশ-ভারতের বিচারযন্ত্রটি আরো বেশি ভারী, সেকেলে ও জবরজঙ্গ। সম্প্রতি মীরাটে এই বিচারযন্ত্রটি একটি চারি বৎসরব্যাপী দানবীয় মামলা শেষ করিয়াছে এক কলংককর দন্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া। ১৯২৯ সালের জনু মাস হইতে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই মামলা চলিয়াছে। ২,৬০১ দলিলপত্র ও হাজার হাজার কাগজে যেন কাগজের পাহাড় উঠিয়াছিল; এই অর্থনৈতিক চরম দুর্গতির দিনে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। দন্ডাদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে অভিযোগের সহিত তাহার অসঙ্গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।* এ অসঙ্গতি এত চোখে লাগে যে উদারনৈতিক মধ্যপন্থী ইংরাজেরা পর্যন্ত ভীরুকণ্ঠে ইহার কিছুটা প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

কিন্তু বিশ্বের জনমতকে এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা উচিত মনে করি, কারণ, এ বিচার শুধু যে ২৭ জন অভিযুক্তের বিচার তাহা নহে, এ-বিচার সেই সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা ঐ ২৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে। নিখিল ভারত শ্রমিক ও কিসান পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর. এস. নিম্বকরের বিচার হইতেই প্রমাণ হইয়াছে ব্রিটেনের লিবারেল-পন্থীগণ শুধু যে এই বিচার-ব্যবস্থায় দন্ডাজ্ঞা পরিবর্তন করিতে অসমর্থ তাহা নহে, গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসব্যবস্থা যে অবৈধ পদ্ধতি অথবা অসাধারণ বৈধ পদ্ধতি দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যের ষষ্ঠি-সপ্তমাংশ অর্থাৎ বিশ্ববাসীগণের এক-ষষ্ঠাংশের বিচার কার্য পরিচালনা করিতেছে তাহা বুঝিবার মতো ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

কিন্তু সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা এই যে, লেবর গভর্ণমেন্ট সব কিছু জানিয়াই এই বিচার-পদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি দিয়াছেন অর্থাৎ মামলাটি চালাইয়াছেন। যে বুর্জোয়া লিবারেল আন্দোলন হইতে লেবর পার্টির জন্ম হইয়াছে সেই আন্দোলনের নীতিগুলিই লেবর গভর্ণমেন্ট এইভাবে পদদলিত করিয়াছে ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের উদাসীনতার সুযোগ লইয়া। এইভাবে সাম্রাজ্যের সাত ভাগের ছয় ভাগ লইয়া যে দেশ, সেই ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে লেবর গভর্ণমেন্ট

---

* মীরাটের বন্দীরা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে পরিচিত ও জঙ্গী নেতা। প্রধান প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন: এস. এ. দাঙ্গে—গিরনি কামগড় ইউনিয়নের সাধারণ-সম্পাদক, ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ের সুতা-কল ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন; আর. এস. নিম্বকর—ভারতীয় শ্রমিক-কিসান পার্টির সাধারণ-সম্পাদক, গিরনি কামগড় ইউনিয়নের সহ সভাপতি; ফিলিপ স্প্রাট - কেমব্রিজের তরুণ স্নাতক, ভারতীয় শ্রমিক-কিসান পার্টির কার্যকরী সমিতির সদস্য; বি. ডি ব্রাডলে- ইংরেজ ইঞ্জিনিয়র, গিরনি কামগড় ইউনিয়নের ও শ্রমিক-কিসান পার্টির কার্যকরী সমিতির সদস্য; লেস্টার হাচিনসন—তরুণ ইংরেজ সাংবাদিক, শ্রমিক-কিসান পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক, মুজাফ্ফর আহম্মদ—শ্রমিক-কিসান পার্টির বাংলাশাখার সম্পাদক, ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ সভাপতি ডাঃ আর. ঘোষ—১৯২৩ সালের ভারতীয় শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লিগের বিশ্ব-কংগ্রেসের প্রতিনিধি; কিশোরীলাল ঘোষ—বাংলাদেশের আঞ্চলিক শ্রমিক-ফেডারেশনের সম্পাদক; ডঃ জি. এম. অধিকারী—ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র, প্রভৃতি (মীরাট মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন: এস. বি. ঘাটে, এস. এ মিরাজকর, রাধারমণ মিত্র, কে. এস. যোগলেকর, সোহন সিং যোশ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, পূরণচাঁদ জোশী, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। —অনু.)

নির্মূল করিতে চাহিতেছে ব্রিটেনের বিভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতায়। ব্রিটেনের তথা ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন যদি আজও এই কলংক বহন করিয়া চলে, যদি আজও তাহার শুভবুদ্ধির উদয় না হয়, যদি নিজেদের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আজও তাহারা প্রতিবাদ না জানায়, তবে এ-পাপের গুরুভারে তাহারা নিজেরাই পিষিয়া মরিবে।

আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মহা আড়ম্বরে ডোরচেস্টরে শহীদ শ্রমিকদের আসন্ন স্মৃতি-বার্ষিকীর আয়োজন করিতেছে। ১৮৩৫ সালে এই শহীদেরা সংঘবদ্ধ হইবার অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছিল; আজ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাহাদের স্মৃতিপূজার আয়োজন চলিয়াছে। অথচ, ও-দিকে এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য মীরাটের কয়েকজন কর্মীকে যথাক্রমে যাবজ্জীবন, বারো বৎসর ও পাঁচ বৎসরের অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থায় নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। (ইহাদের মধ্যে তিন জন মহাপ্রাণ ইংরেজও আছেন। তাঁহাদের নাম ফিলিপ স্প্র্যাট, বি. ডি. ব্র্যাডলে ও লেস্টার হাচিনসন। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে ভারতীয় কর্মীদের পাশে ইঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন। চারি বৎসরের মধ্যে মীরাট মামলার একজন আসামীর মৃত্যু হয়।*) ইহাদের একমাত্র অপরাধঃ ইহারা ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ নরকযন্ত্রণার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের আত্মরক্ষায় সংঘবদ্ধ হইবার যে-কোনো প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অংকুরেই বিনাশ করিতে চাহে। বিশ্বের শ্রমিক কি তাহাতে বাধা দিবে না? বিশ্বের লেখক ও চিন্তাজীবীগণ কি নীরব থাকিবেন?

কায়িক ও মানসিক-শ্রমজীবী উভয়ের নিকটই আমরা আবেদন জানাইতেছি। ভারতীয় শ্রমিকদের যে ভয়াবহ শোষণ চলিয়াছে,** তাহাদের অর্ধাহারে ও অবসন্ন ভগ্নস্বাস্থ্যে রাখিয়া তাহাদের জমাট বুকের রক্ত স্বর্ণপিণ্ডে পরিণত করিয়া যেভাবে আপনার অতল উদর-গহ্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উহা অদৃশ্য করিয়া দিতেছে আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে সকল তেজস্বী পুরুষ এই পাপ ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছেন এবং যাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের কোন অভিযোগ আনা হয় নাই (১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ব্যবস্থাপরিষদে ভারত সরকার নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন) তাঁহাদিগকে এইভাবে স্বেচ্ছাচারীর মতো গ্রেপ্তারকে আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি।

স্প্র্যাট "উৎপাদন ও বন্টনের উপকরণসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার কথা" কহিয়াছিলেন। ইহা তো লেবর পার্টির যে-কোনো সদস্য বৈধভাবে বলিয়া থাকেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীও আদর্শত্যাগের পূর্বে বহুবার

---

* ডঃ আর থেংদি। মৃত্যুর পর হাস্যকর ভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

** ৩৫,০০০ নারী খনির কাজে নিযুক্ত। দিনে বারো ঘণ্টা ক'রে খেটে সপ্তাহে গড়ে পুরুষ শ্রমিকের বেতন ৫ শিলিং ৭ পেন্স, নারী শ্রমিকের ৩ শিলিং ১ পেন্স, শিশুদের রোজ বেতন ২ পেন্স।—(র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে লেখা শ্রীমতী দেসপান্ডের চিঠি।)

বলিয়াছেন। তথাপি স্প্র্যাটকে ঐ কথা বলিবার জন্যই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল; অভিযোগ সম্পর্কে এই হাস্যকর অজ্ঞানতা ও দুরভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ করি। সম্রাটকে তাহার সার্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা বলিয়া যে অভিযোগ আনা হইয়াছে সে-অভিযোগের আমরা প্রতিবাদ করি। এ ইচ্ছা যদি অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেক গণতন্ত্রীই অপরাধী। যে-দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম সেই দেশই ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করিবে—ইহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক আঘাতের আমরা প্রতিবাদ করি, এ আন্তর্জাতিকতা শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম যে মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য; শুধু তাই নয়, শোষণ-শক্তির আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে একান্ত প্রাণধারণের দায়েই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন। আমরা মীরাট মামলার প্রকাশ্য পরিবর্তন দাবী করি। অভিযুক্তদের আমরা সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানাইতেছি।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য সমগ্র জগত ব্যাপিয়া আজ যে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে যে হাজার হাজার মানুষ আত্মাহুতি দিয়াছে মীরাট মামলার আসামিগণ আমাদের চোখে তাহাদেরই জীবন্ত প্রতীক। ইহাদের জীবন ব্যর্থ নহে, ইহাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আমরা এক বিজয়-বার্তা পাঠ করিতেছি। কারণ, শোষকের করাল দংষ্ট্রাকে ইহারা জগতের চোখে প্রকট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু তাই নয়, যে নূতন বিদ্রোহশক্তি মানব সমাজকে আলোড়িত করিতে শুরু করিয়াছে তাহার অনিবার্য বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইহাদের জীবনের মধ্যে পাঠ করিতেছি। ইহাদের রুধিবে কে?

'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৫ এপ্রিল, ১৯৩৩।*

---

* সরোজকুমার দত্ত দিত—'শিল্পীর নবজন্ম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০-১৫৭।

পরিশিষ্ট

১. অনশনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

অস্পৃশ্যদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দাবির প্রতি ব্রিটিশ সরকার মোটেই কোনো সুবিচার না করলে গান্ধীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তের সংবাদে,—গোটা ভারতবর্ষের মতোই* রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে, কলকাতার নিকটবর্তী শান্তিনিকেতন থেকে যাত্রা করেছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবস্থা সত্ত্বেও গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে চোদ্দ শ' মাইল পেরিয়ে পুনায় তাঁর মহান্ বন্ধুর কাছে পৌঁচেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আদান-প্রদান করা টেলিগ্রামগুলো এই ঃ

১. **কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।**
"মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার বিবৃতি এসোসিয়েটেড প্রেস সাগ্রহে অতি মূল্যবান ব'লে মনে করবে। এসোসিয়েটেড প্রেস।"

২. **শান্তিনিকেতন, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে।**
"মহাত্মাজী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নিয়ে সমালোচনা অসম্ভব।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

৩. শান্তিনিকেতন, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। মহাত্মা গান্ধীকে রবীন্দ্রনাথ।
"জেরবাদা জেল, পুনা।

ভারতবর্ষের ঐক্য ও তার সামাজিক সংহতির জন্যে মূল্যবান জীবন বিসর্জনের বেদনার মূল্য আছে। যদিও আমরা আগে থেকে ধরতে পারছি না আমাদের সরকারের উপরে এর কী সম্ভাব্য প্রভাব পড়বে, আমাদের জনগণের কাছে এই ঘটনার বিপুল গুরুত্ব সম্ভবত সরকার বুঝতেও পারছে না, তবু আমরা নিশ্চিত যে, এমন উৎসর্গের চরম আবেদন আমাদের দেশবাসীর বিবেকের কাছে বৃথা হবে না। আমি উদগ্রভাবে কামনা করি যে, এমন এক জাতীয় ট্রাজিডিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে দেবার মতো তেমন হৃদয়হীন আমরা হবো না। ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের বেদনার্ত হৃদয় আপনার মহান্ প্রায়শ্চিত্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

৪. পুনা, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। গুরুদেবকে গান্ধী. শান্তিনিকেতন।
"আমি সব সময় ঈশ্বরের করুণা অনুভব করছি। আজ সকালেই আপনার আশীর্বাদ চেয়ে লিখেছি, আপনি যদি আমার কাজ সমর্থন করতে পারেন ; আর এই মুহূর্তে পাওয়া আপনার বার্তার মধ্যে আমি পেলাম প্রচুর আশীর্বাদ। ধন্যবাদ। গান্ধী।"

---

* সিমলার লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লিতে ১৩ সেপ্টেম্বর রঙ্গ আয়ার ভারতবর্ষের ব্যাপক চিন্তার সংক্ষিপ্তসার করেছেন এই কটি কথায় ঃ "যদি গান্ধীর মৃত্যু হয়, তাঁরই সঙ্গে মৃত্যু হবে ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিটি সম্পর্কের।"

৫. শান্তিনিকেতন, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ (ভারতবর্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেদন।)

"অস্পৃশ্যতা ও তার ডালপালা উপড়ে ফেলবার জন্যে আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ দিতে যেন এক মুহূর্তও দেরি না করেন, আমার দেশবাসীর কাছে আমি এই আবেদন জানাচ্ছি। এই আন্দোলনকে হতে হবে সর্বজনীন ও আশু, তার প্রকাশ হবে স্পষ্ট এবং তাতে কোনো দ্বিধা থাকবে না। ভারতবর্ষের যে-কোনো শ্রেণীই যে-কোনো অসম্মান ও অধিকারহীনতার যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সমস্ত প্রকারকে বীরোচিত প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে দমন করতে হবে। আমাদের যিনিই, এই গুরুতর সংকটের মুহূর্তে, ভারতবর্ষের সামনে উদ্যত সর্বনাশের মোড় ঘোরাবার জন্যে সাধ্যানুযায়ী কোনো চেষ্টা করবেন না, তিনিই অন্যতম বিরাট এক ট্রাজিডির জন্যে দায়ী হবেন, যা আমাদের ও জগতকে আঘাত করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

৬. শান্তিনিকেতন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ (গান্ধীর মতোই পুনার জেরবাদা জেলে বন্দী সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইকে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তীর টেলিগ্রাম)।

"গুরুদেব পুনা যাবার জন্যে অধৈর্য। মহাত্মাজির আপত্তি আছে কি না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে টেলিগ্রামে জানান। সরকারের সঙ্গে কোনো আপসে পেঁচেছেন কি না। অমিয় চক্রবর্তী।"

৭. শান্তিনিকেতন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। মহাদেব দেশাইকে রবীন্দ্রনাথ, পুনা।

"আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি সত্যের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আমার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে, যেমনটি তা প্রকাশিত হচ্ছে এক মহান্‌ জীবনের মধ্যে, যে-জীবন তার স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দিতে চলেছে; কিন্তু আমার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠছে এই কথা ভেবে যে, তার জন্যে আমাদের দলকে কী মূল্য দিতে হবে এবং আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাবার জন্যে লড়াই করছি যে, এই বর্তমান সংকটে ভারতবর্ষই এমন এক আত্মত্যাগ করতে পারে। বলা নিরর্থক যে, মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যের বিস্তারিত সংবাদ জানার জন্যে আমি কতোখানি উদ্বিগ্ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

৮. পুনা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথকে গান্ধী।

"মহাদেবকে পাঠানো আপনার ও অমিয়র প্রেমপূর্ণ বার্তা পড়েছি। আপনি আমার মনে নতুন ক'রে শক্তি দিয়েছেন। হ্যাঁ, আসুন, সত্যিই আসুন, যদি আপনার স্বাস্থ্যে কুলোয়। মহাদেব আপনাকে প্রতিদিন টেলিগ্রাম করবে। বোঝা-পড়ার আলোচনা চলছে। প্রয়োজন হলে টেলিগ্রাম করবেন। গান্ধী।"

৯. পুনা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথকে সতীশ দাশগুপ্ত।

"আপনার স্নেহপূর্ণ টেলিগ্রামের জন্যে মহাদেব আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন যে, আলো আর অন্ধকারের শক্তির মধ্যে লড়াইয়ে,

গান্ধীর পাশে আপনার উপস্থিতি এক নিশ্চিত অনুপ্রেরণা ও মঙ্গলময় প্রলেপ হবে। সতীশ দাশগুপ্ত।"

এই বার্তার পর রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ২৬ সেপ্টেম্বর, ঠিক যে সময়ে গান্ধী অনশন ভঙ্গ করতে যাচ্ছে। গান্ধী সদ্য সদ্য ব্রিটিশ সরকারের উত্তর পেয়েছেন। গান্ধী যে কড়ার করেছিলেন সরকার তা মেনে নিয়েছেন। গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন একঘন্টা ধ'রে এই উত্তর খুঁটিয়ে বিচার করার পর। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপর গান্ধী কমলালেবুর রস পান করলেন। প্রার্থনা-মন্ত্রটি সংস্কৃতে ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবির্ম এধি॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

(মন্তব্যঃ—এই কাগজপত্র সি. এফ. এনড্রুজ রম্যাঁ রলাঁকে পাঠিয়েছেন।) ১৯৩২, ১৫ নভেম্বর, 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

২. হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর মাধ্যমে ঐক্যের পথে ভারতবর্ষ

ইউরোপে গান্ধীর অনশন ভালো করে না বুঝলেও* ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এর প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে। বলা চলা যে, বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণবহির্ভূত শ্রেণীর মধ্যে, এইরকম হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বিরোধী-ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ভারতবর্ষের ঐক্যের নিষ্পত্তি করেছে।

গান্ধী, হিন্দু নেতা ও অনুন্নত শ্রেণীর (অস্পৃশ্যদের) প্রতিনিধিদের মধ্যে যে

---

* আরও যথাযথ হবে যদি ব'লি: "ভালো ক'রে না জানলেও", কারণ খবরাখবর জানতে কদাচিৎ চেষ্টা করা হয়। বিবেকসম্পন্ন ফরাসী পাঠক, যাঁরা ভালো ক'রে জানতে চান, তাঁদের একটি বইয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বইটি ভারতবর্ষে প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যথাযথতার কোনো ত্রুটি ঘটেনি; বইটি 'এপিক ফাস্ট', লেখক প্যাটেলাল, আমেদাবাদ, ১৯৩২।—এর মধ্যে দেখা যাবে, প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়, সেই নাটকীয় দিনগুলো, যখন গোটা ভারতবর্ষ পুনার জেলখানাকে ঘিরে সমবেত হয়েছে, এবং যখন সেই বৃদ্ধ, যাঁর শারীরিক ক্ষমতা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে (চিকিৎসকদের অতি গুরুতর দুশ্চিন্তা জাগছে), নিজের কাঁধে তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন হিন্দু ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনার দায়িত্ব। তিলমাত্র শিথিলতা নেই। এক একটা গোটা দিন কেটে গেছে ক্ষমাহীন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে আলোচনায়: যেমন ডঃ আম্বেদকারের সঙ্গে, তিনি অস্পৃশ্যদের আপসবিরোধী প্রতিনিধি, তিনি শুধু একেবারে শেষমুহূর্তে সম্মতি দিয়েছেন। এই বন্দী, এই মৃত্যুপথযাত্রী সত্যি সত্যি নিজের হাতে, চূড়ান্ত বোঝাপড়া পর্যন্ত, গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ধ'রে রেখেছিলেন।

পুনাচুক্তি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে অনুন্নতদের স্থান নির্ধারিত করেছে, তার অব্যবহিত পরেই একইভাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নির্ধারণের জন্যে পণ্ডিত মালব্য ও মৌলানা সওকৎ আলির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচেষ্টা চলেছে। সওকৎ আলি লক্ষ্মৌতে বিশিষ্ট মুসলমানদের সমবেত করেন এবং অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে পুনার নীতির অনুরূপ নীতির ভিত্তি সম্পর্কে বোঝাপড়ার স্বীকৃতি তাদের কাছ থেকে লাভ করেন। যথাবিহিতরূপে ভারপ্রাপ্ত হয়ে তার পরপরই মুসলমান নেতারা এলাহাবাদে হিন্দু ও শিখ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন (নভেম্বর ১৯৩২)। সমস্ত সমস্যাগুলো সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা এক বোঝাপড়ায় পৌঁছান। স্থিরীকৃত মূল নীতিগুলো এই :

কেন্দ্রীয় সরকারঘটিত যে কোনো ব্যাপারে সম্মেলনের দাবি হচ্ছে ভারতীয় জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর।

এই প্রাথমিক অপরিহার্য প্রয়োজনটি ব্যতিরেকে কোনো সংবিধানই গ্রাহ্য হবে না। ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভায় মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথম দশ বছর একজন মন্ত্রী হবেন শিখ। ভারতবর্ষের নির্বাচিত মোট সংখ্যার শতকরা ৩২ জন হবেন মুসলমান এবং শতকরা ৪'২।৩ জন হবেন শিখ।

প্রাদেশিক সরকারগুলোর ব্যাপারে, যেসব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যা এক বিশেষ জটিল আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, এলাহাবাদ সম্মেলন সেসব ক্ষেত্রের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নির্বাচনপ্রণালী হবে সাধারণ, পৃথক পৃথক ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা আর নয় ; বাংলাদেশে হিন্দুদের যেখানে শতকরা ৪৪.৭ আসন সংরক্ষিত থাকবে, সেখানে মুসলমানদের থাকবে শতকরা ৫১টি আসন ; পাঞ্জাবে মুসলমানদের থাকবে শতকরা ৫২টি, হিন্দুদের শতকরা ২৭টি, শিখদের থাকবে শতকরা ২০টি, অন্য সম্প্রদায়গুলোর জন্য শতকরা ২টি। নিজের নিজের সম্প্রদায়ের তালিকাভুক্ত ভোটের যাঁরা শতকরা ৩০টি ভোট পাবেন, তাঁদের মধ্যে যিনি যৌথ তালিকাভুক্ত ভোটের বেশি পাবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। যদি সাম্প্রদায়িক তালিকার শতকরা ৩০টি ভোট কেউ না পান, তাহলে সমস্ত প্রদত্ত ভোট মিলিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

শাসন পরিচালনার ব্যাপারে, দলনিরপেক্ষভাবে গঠিত একটি জাতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন সমস্ত সম্প্রদায়ের চাকরিবাকরির বাঁটোয়ারা সমদর্শী ভাবে দেখাশোনা করবে। প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলোতে প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এইটেই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, সৈন্যবাহিনী ও বিচারবিভাগের কর্মের নিয়োগের ব্যাপারটি সমস্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে ; ব্যক্তিগত যোগ্যতাই হবে এর একমাত্র ভিত্তি এবং জনসাধারণের প্রতিটি গোষ্ঠীরই এতে প্রবেশাধিকার থাকবে।

অধিকার রক্ষার ব্যাপারে, মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা,

লিপি ও শিক্ষার সংরক্ষণ। প্রদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতিটি অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ভার থাকবে।

২৩ নভেম্বর পণ্ডিত মালব্য লণ্ডনের ইণ্ডিয়া লিগকে এই মর্মে তার করেছেন যে, বোঝাপড়া সর্বসম্মতিক্রমেই হয়েছে। এটি এখন বৃহত্তম ঐক্য-সম্মেলনে অনুমোদন করা ছাড়া আর বেশি কিছু করার নেই; সম্মেলন হবে ডিসেম্বরে এবং সেই সম্মেলনে সমস্ত সম্প্রদায় ও ভারতবর্ষের সমস্ত দলকে (নরনারীকে) ডাকা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে এই চুক্তি সম্পর্কে জানাবার জন্যে, হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডঃ মুঞ্জে সর্বসম্প্রদায়ের ও সর্বদলীয় এক প্রতিনিধি দল ইংলণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব দিয়েছেন। ভারতীয় জাতীয় ইচ্ছার এহেন সম্মিলিত সমুত্থান লণ্ডনের সরকারের ইচ্ছা-মতো ঠিক-করা এবং কায়দা-কানুন-করা প্রতারণাপূর্ণ গোল-টেবিল বৈঠকগুলোকে নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে।

একই সময়ে, নিজেদের খরচে ভারতবর্ষে পাঠানো ইণ্ডিয়া লিগের* প্রতিনিধি দলটি তিনমাস আগে লণ্ডনে ফিরে এসেছে। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক: লিওনার্ড ম্যাটারস্, একজন ভারতীয়: কৃষ্ণ মেনন ও দু'জন ইংরেজ: মিস মনিকা হোয়াটলে ও মিস এলেন উইলকিনসন। শেষোক্ত জন ট্রেড-ইউনিয়ন সম্পাদিকা ও পার্লামেন্টের সদস্যা। লিগের সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫৫টি প্রতিষ্ঠানের ৪৬৫ জন প্রতিনিধি ২৬ নভেম্বর কিংসলে হলের সভায় উপস্থিত ছিলেন, সেখানে ভারতে প্রেরিত চারজন প্রতিনিধি, জোরালো স্পষ্টভাবে, তাঁদের তদন্তের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচার ও স্বাধীনতার ব্যভিচার, কংগ্রেসপন্থী বা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতির সন্দেহে ভারতীয়দের উপরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ দুঃখদুর্দশা এবং পুলিশের নির্মমতা (তাঁরা এর সাক্ষী,—যদিও কর্তৃপক্ষ কড়া ও গোপন নির্দেশ দিয়েছিল, প্রতিনিধিদলের সদস্যদের উপস্থিতিতে পুলিশ যেন সমস্ত বলপ্রয়োগ পরিহার করে!)—এ সবের সকলেই নিন্দা করেছেন।—তাঁরা জানিয়েছেন ভারতীয় 'জাতীয় কংগ্রেস বেশ বেঁচেবর্তেই আছে, যদিও সরকার, জাঁক ক'রে বলছেন তাকে চূর্ণ করেছে। ঝাঁকা ঝাঁকা নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে থাকলেও, কংগ্রেসের সংগঠন ও শৃংখলা অটুটই আছে; নিরন্তর গোয়েন্দা তৎপরতা ও পুলিশী ছোঁ-মারা সত্ত্বেও দিনে

---

* ইণ্ডিয়া লিগ (লণ্ডন, ১৬ ষ্ট্রাণ্ড, ডব্লিউ, সি ২) একটি গোষ্ঠী, এতে আছেন পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্যদের মধ্যে, যেমন ল্যান্সবেরি, ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতিদের মধ্যে জাগের, বড়ো লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, লরেন্স হাউসম্যান প্রভৃতিরা, শ্রমিক, ধর্মযাজক, কোয়েকার, স্বাধীন চিন্তাবিদ প্রভৃতিরা; সবাই একত্রিত হয়েছেন অবিচারের বিরুদ্ধে একই বিদ্রোহে এবং স্বাধীনতার প্রতি একই বিশ্বাসে। লণ্ডনে ও বিভিন্ন প্রদেশে সভাসমিতি, বক্তৃতা ও কাগজপত্রের মাধ্যমে তাঁরা প্রচার চালান: আর তাঁদের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া রিভিউ' তাঁদের দেশবাসীকে সবকিছু পরিষ্কার ক'রে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা ইউরোপের ভারতসুহৃদদের বলেন তাঁদের নিজের নিজের দেশের জনমত জাগ্রত করতে, কারণ অন্ধ সরকারের উপরে পশ্চিমের বিবেকের নৈতিক চাপের কার্যকারিতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন।—আর একটি সাহসী গোষ্ঠী হচ্ছে ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া (৪৬ ল্যাকাংষ্টার গেট, ডব্লিউ. সি. ২). এই গোষ্ঠীও অনুরূপ প্রচেষ্টা করেন তাদের মুখপাত্র হচ্ছে 'দি ইণ্ডিয়া বুলেটিন'।

দু'বার ক'রে, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের তৎপরতার সংবাদ গোপন রেডিওয় প্রচার করা হয়।

১২০০ শ্রোতারও বেশি দ্বিতীয় এক সভায় সভাপতিত্ব করেছেন ইণ্ডিয়া লিগের সভাপতি বার্ট্রাণ্ড রাসেল ; ভারতবর্ষের নিজের ব্যাপার নিজেই ব্যবস্থা করার অধিকার এবং ইংরেজের নামে অনুষ্ঠিত বিরাট অবিচারের জন্যে প্রতিটি ইংরেজের দায়িত্বের কথা তিনি ঘোষণা করেন। প্রতিনিধিরা নতুন ক'রে বলা শুরু করেন ; কিন্তু শ্রোতারা সবিস্ময়ে গোল-টেবিল বৈঠকের এক শিখ সদস্যের বক্তৃতা শোনেন (তাঁকে ব্রিটিশ সরকার সরকারীভাবে মনোনয়ন করেছিল) ; এই শিখ সদস্য সর্দার তারা সিং জোর দিয়ে বলেন যে, গোটা শিখ-সম্প্রদায়ের ইচ্ছা, একটি ভারতীয় জাতীয় সরকার লাভ করা ; তিনি আরও বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি ভারতবর্ষের আর আস্থা নেই, এ এক হাতে দেয়, অন্য হাতে কেড়ে নেয় ; ইংলণ্ডের জনমতকে এ কোন্ অজ্ঞতায় ফেলে রেখেছে তা জেনে, সেই অজ্ঞতা দূর করার পূর্বে ইচ্ছা নিয়েই তিনি গোল-টেবিল বৈঠকের মনোনয়ন গ্রহণ করেছিলেন।—সমস্ত বক্তারাই বিগত সপ্তাহগুলোর (বলাও চলে : বিগত বছরগুলোর) সর্বমুখ্য ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন :—হিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে বোঝাপড়ার পর, হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুলি অনুসারে জাতশত্রুদের মধ্যে) বোঝাপড়া ; এরাই নভেম্বরের ঐক্য-সম্মেলনে, সমস্ত জাতির ও সমস্ত ধর্মের যুক্তফ্রন্ট দিয়ে বিদেশী আধিপত্যের বিরোধিতায় সমগ্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীভূত-করণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। রম্যাঁ রলাঁ

১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৩ তারিখের 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৩.

ক

অস্পৃশ্যদের জন্য অনশন সম্পর্কে গান্ধীর বিবৃতি*

"আমি যা চাই, যার জন্য আমি বাঁচি, যার জন্যে আমি অতি আনন্দে প্রাণ দিতে রাজী, তা হচ্ছে অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। আমি এক জীবন্ত চুক্তি চাই, যার প্রাণদায়ী প্রভাব কেবল সুদূর ভবিষ্যতে অনুভূত হবে না ; আজকেই অনুভূত হবে ; আর এই চুক্তিটিকে, ভ্রাতৃত্বমূলক আলিঙ্গনে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যদের ঐক্যবন্ধ

---

* য়েরবাদা জেলে ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ তারিখে সংবাদ-প্রতিনিধিদের সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎকার এবং ২১ সেপ্টেম্বর 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'-য় প্রকাশিত। প্রথম দুটি বিবৃতি অনশনের আগের।

ক'রে গোটা ভারতবর্ষের এক অভিব্যক্তি দিয়ে শিলমোহর করতে হবে...আমার জীবন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আমি মনে করি, এই মহান স্বার্থে একশো জীবন দিলেও, আত্মরক্ষার ক্ষমতাহীন নরনারীর উপরে চাপানো সমস্ত বর্বর অবিচারের পক্ষে এটা হবে হিন্দুদের একটা অকিঞ্চিৎকর প্রায়শ্চিত্ত...আমার যদি আরও কিছু দেবার মতো থাকতো, এই লজ্জার বিলুপ্তি ঘটানোর জন্যে তাও আমি দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে দিতাম। কিন্তু জীবন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।

আমি বিশ্বাস করি, অস্পৃশ্যতার যদি সত্যিকারের মূলোচ্ছেদ হয়, কেবল তা হিন্দুধর্মেরই এক ভয়ংকর কালিমা ধুয়ে ফেলবে না, এই কাজের প্রতিক্রিয়া হবে বিশ্বব্যাপী। আমার সংগ্রাম মানবতার মধ্যেকার অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর সেই জন্যেই আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, মানব পরিবারের শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁরা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন..."

"আমি 'স্পৃশ্য' হয়ে জন্মালেও,—গত পঞ্চাশ বছর 'অস্পৃশ্য' হয়ে থাকাটাই বেছে নিয়েছি···অস্পৃশ্যতার জন্যে আমার মৃত্যুর প্রস্তুতি, প্রকৃতপক্ষে গোটা ভারতবর্ষের জন্যে এক মৃত্যুর প্রস্তুতি: কারণ অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি স্বরাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (তার অর্থ গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ)। যে স্বরাজ সবচেয়ে হীন ও সবচেয়ে পাপীকে বাইরে রাখবে, সেই স্বরাজে আমি দুঃখ পাবো...আমার কাছে ধর্ম, তার সারার্থে, এক, কিন্তু তার নানা শাখা আছে। হিন্দু-শাখার আমি যদি সেই গাছের প্রতি কর্তব্যে অপারগ হই, যে গাছ আমাকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে আমি এই অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য ও দৃশ্যমান ধর্মের অযোগ্য অঙ্গ···আমার আত্মত্যাগ আপাতদৃষ্টিতে প্রযুক্ত হচ্ছে জগতের একটি কোণে। কার্যত তা গোটা জগতের জন্যে পূর্বনির্ধারিত···আমি সমস্ত রূপের অস্পৃশ্যতা থেকে মানবতাকে মুক্ত করার কাজ করছি...

যাঁরা আমার তুচ্ছ কর্মজীবন, ভাসাভাসাভাবে হলেও, লক্ষ করেছেন, তাঁরা এ লক্ষ না ক'রে পারবেন না যে, আমার জীবনের একটি কাজও কোনো একটি ব্যক্তি বা কোনো একটি জাতির ক্ষতির জন্যে করা হয়নি···আমার দেশপ্রেম ও আমার ধর্ম কোনো কিছুকে বহির্ভূত করে না, সবকিছুকে অন্তর্ভূত করে এবং যা কিছু সমস্ত জীবনের সম্পদের সঙ্গে সমন্বিত হয়, তার জন্যে তাদের এমন হতেই হবে। আমি যে অভ্রান্ত তার কোনোই দাবি আমি করি না। আমি যে হিমালয়সদৃশ ভুল করেছি, সে-সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। কিন্তু তা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি ব'লে ধারণা নেই; কোনো জাতি, ব্যক্তি, মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীবন: যেই হোক না কেন কারুর বিরুদ্ধে আমি কখনো বিদ্বেষ লালিত করেছি ব'লে আমার ধারণা নেই···"

"ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, সম্ভবত আমার মতো, কেউ ঘোরেননি;

এতো গ্রামে যাননি, এতো লক্ষ লক্ষ মানুষের সংস্পর্শে আসেননি। সকলেই আমার জীবন জানে। সকলেই জানে যে, আমি কখনো 'স্পৃশ্য' ও 'অস্পৃশ্যের' জাত ও জাত-বহির্ভূতের মধ্যেকার বাধাকে স্বীকার করিনি। তারা, প্রায়ই তাদের নিজেদের ভাষায়, শুনেছে আমি অস্পৃশ্যতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছি, হিন্দুধর্মের দুর্বিপাক ও কলঙ্ক হিসেবে তাকে দেখিয়েছি। ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত শত সভায়, আমি যেভাবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সওয়াল ক'রে বেড়িয়েছি, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি। অস্পৃশ্যতাকে নিন্দা করার এবং নিজেদের মধ্যে থেকে তা লোপ করার জন্যে আত্মনিয়োগের প্রস্তাবে জনতা ভোট দিয়েছে···এই লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিপ্রায়েই আমার অনশনের উদ্যম; এবং তাদের ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড উদ্দীপনাই, পাঁচ দিনে, রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং ইয়েরবাদা চুক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। এই চুক্তি যদি লক্ষ্য পর্যন্ত কার্যে রূপান্তরিত না হয়, তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিপ্রায়কে শিরোধার্য ক'রেই আমার অনশন আবার শুরু হবে···"*

খ

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে টীকা**।

গান্ধীর পরিচলনায় বিগত তেরো বছর যাবৎ বিভিন্ন অহিংস গণ-আন্দোলনে মুসলমানরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাবে এই সুস্পষ্ট তথ্যাদিতে :

১. অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন; ১৯১৯-১৯২২ :—এই প্রথম আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ এবং খিলাফতের কেন্দ্রীয় কমিটি। দেশের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ সকল মুসলমান নেতাই গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন; এবং মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যেই ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর আন্দোলের সপক্ষে একটি প্রস্তাব ভোটে জিতেছিল। মুসলমানদের পরেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু নেতারা ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে, নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে, এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। (ব্যতিক্রম

---

* ৪ নভেম্বর, ১৯৩২ তারিখে গান্ধীর প্রদত্ত এক বিবৃতির অংশ।

** এই যে টীকাটি ব্রিটিশের হিন্দু মুসলমান বিরোধের তত্ত্ব অকাট্যভাবে খণ্ডন করছে, এটি রমাঁ রলাঁকে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে পাঠিয়েছেন ভারতবর্ষের মুসলমান আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য নেতা ডাঃ আনসারি; তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

একমাত্র মতিলাল নেহেরু ও জহরলাল নেহেরু, তাঁরা কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।) এই প্রথম পর্বের সংগ্রামে, মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতের অনেক বেশি, এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন এবং জেলে গিয়েছেন।

২. গান্ধীর পরিচালনায় ১৯৩০ সালের মার্চে 'লবণ আইন ভঙ্গের জন্যে' শুরু এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় আন্দোলন। ৬১ থেকে ৮০ হাজার গ্রেপ্তারের সংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৫ থেকে ১৮ হাজার। মারধর, আঘাত ও ক্ষত, জরিমানা, চাকরি ত্যাগ নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির দুঃখকষ্ট যাঁদের ভোগ করতে হয়েছে, তাঁদের এর মধ্যে ধরা হয়নি। মুসলমানরা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ, দেশের মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন তাঁদের শতকরায় তাঁদের জনসংখ্যার শতকরা তাই পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়েছে ;

৩. তৃতীয় আন্দোলন, শুরু হয় ১৯৩২ সালের ৩ জানুয়ারি, সমগ্র ভারতবর্ষে হঠাৎ অর্ডিনান্স জারি ও গণ-গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে :—যার স্বভাবই হচ্ছে কমিয়ে বলা, সেই সরকারী হিসাব অনুসারে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ৬৫,০০০। ভারতীয় কংগ্রেসের হিসাব অনুসারে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮০,০০০। এই মোট সংখ্যার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাই ছিল ৮০০০, তাদের সবাই মুসলমান। পূর্ববঙ্গের সংখ্যা গুনতিতে ওই রকমই হবে। ডাঃ আনসারি হিসাব করেছেন গোটা ভারতবর্ষে গ্রেপ্তার-হওয়া মুসলমানের মোট সংখ্যা হবে ২৪,০০০। এখানেও শতকরা সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরার আনুপাতিক।

যাঁদের রক্ষণশীল, 'সাম্প্রদায়িক' (অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে পৃথক এক রাজনৈতিক শাসনবিধির উগ্র সমর্থক) বা সরকার সমর্থক বলা হয়, সেই সব নেতাদের চেয়ে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা সংখ্যায় শতকরা ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। এমন একজনও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেই, যিনি আন্দোলনের সময় জেলে যাননি।

ভারতবর্ষের মুসলমান জনসংখ্যা মুখ্যত ও কেন্দ্রীভূত বাংলা দেশে (বিশেষত পূর্ব বাংলায়) এবং ভারতবর্ষের উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম জেলাগুলোয়, পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, সিন্ধুতে ও বেলুচিস্থানে। এই জনসংখ্যা ভারতবর্ষের মোট মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ। বাংলাদেশের মুসলমানদের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শতকরা ৯৯ ভাগ, পাঞ্জাবের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ, কম ক'রেও সিন্ধুর শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। এইসব প্রদেশগুলোয় যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাই প্রচণ্ড। অন্যান্য যে সব প্রদেশে মোট শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান জনসংখ্যার বাদবাকি ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৩০ অথবা ৪০ থেকে ৬০ অথবা ৭০ ভাগের মধ্যে ওঠানামা করে। বোম্বাই শহরে, যেখান থেকে আগাখানের ধর্মীয়

অনুগামীদের সংগ্রহ করা হয়, সেখানেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রচন্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এক বিরাট সংখ্যক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ৮ কোটি মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে যাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশি নয়, আগা খানের সেই অনুগামীদের মধ্যেও যদি রাজনৈতিক প্রশ্নের গণভোট নেওয়া হয়, তাহলে তারা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের নেতাদের পক্ষে ভোট দেবে, আগা খানকে দেবে না। যে আগা খান এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবি করতে পারেন, তিনিও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারেন না। সবচেয়ে জোরালো যুক্তিতেই ভারতবর্ষের গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ তারিখের 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

কলকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী (মে ১৯৩৩)

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান; গোটা দেশের নামে কথা বলার তার অধিকার আছে। ব্রিটিশ সরকার তাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং তার বার্ষিক ৪৭তম অধিবেশন নিষিদ্ধ করেছে। পুলিশের যথেষ্ট কিছু শক্তি সমাবেশ করা সত্ত্বেও এই অধিবেশন অবশ্য হয়েছে। পণ্ডিত মালব্য ছিলেন এর সভাপতি এবং তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তিনি ৯ এপ্রিল বেনারস থেকে লিখছেন যে, অধিবেশনের নির্বাচিত স্থান কলকাতা অভিমুখে, ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ থেকে ২,৫০০ প্রতিনিধি* পথে নেমেছিলেন, তাঁদের ছাড়াও কয়েক হাজারকে কলকাতায় পৌঁছুতে পারার আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১,৫০০ পৌঁছুতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সময় ও স্থান ২৪ ঘন্টা আগে ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ১লা এপ্রিল, বিকাল ৩টার সময় কয়েক শ প্রতিনিধি** মিলিত

---

* এই ২,৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে এসেছিলেন ৬৭৩ জন যুক্তপ্রদেশ, ৩০০ জন বাংলাদেশ, ২৩৪ জন বিহার, ৭২ জন মধ্যপ্রদেশ, ৪৩ জন ওড়িশা, ৬১ জন পাঞ্জাব, ৩১ জন গুজরাট, ২৭ জন মাদ্রাজ, ২৫ জন মহারাষ্ট্র, ২৯ জন আসাম, ২২ জন বোম্বাই, ১৫ জন বেরার, ১৭ জন দিল্লি, ৬ জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ৫ জন সিন্ধুপ্রদেশ, ৭ জন কেরালা, ৩ জন আজমির, ৩ জন কর্ণাটক থেকে। তাঁদের মধ্যে ১১৭ জন মহিলা ৮৩ জন মুসলমান ২৩ জন শিখ, ৭ জন পার্শি এবং ২ জন খ্রীষ্টান।

** মালব্য প্রতিনিধিদের সংখ্যা দিয়েছেন ২৫০-এরও বেশি। 'হরিজন' (সাপ্তাহিক) সংখ্যা জুগেছেন ৭১৪।

হয়েছিলেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তা সভাপতিত্ব করেন ও তাঁর ভাষণ পড়েন। আগের দিন সন্ধ্যায় কংগ্রেস কমিটি সাতটি প্রস্তাব নিয়েছিলেন। সেগুলো ভোটে দেওয়া হয়; অবশেষে, পুলিশ আসে; পুলিশ নির্মম লাঠি চার্জ করে (লম্বালাঠি, মাথায় লোহা বাঁধানো) এবং প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ততক্ষণে তাঁরা তাদের কাজ ক'রে ফেলেছেন।

ভোটে পাশ করা প্রস্তাবগুলো এই ঃ

১ম. কংগ্রেস নতুন ক'রে ১৯২৯ সালের লাহোরের ৪৪তম অধিবেশনের প্রস্তাব দৃঢ়তা সহকারে সমর্থন ক'রে ঘোষণা করছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা তার লক্ষ্য;

২য়. ঘোষণা করছে যে, জনগণের অধিকার রক্ষায় আইন অমান্য আন্দোলন একটি বৈধ পন্থা;

৩য় আইন অমান্য আন্দোলনের বর্ধিত কর্মসূচি নতুন ক'রে সমর্থন করছে এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, পরিকল্পনা অনুসারে দ্বিগুণ শক্তিতে তাঁরা যেন এই আন্দোলনকে অনুসরণ করেন।

৪র্থ. সমস্ত শ্রেণীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তাঁরা যেন বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশ মাল বয়কট করেন;

৫ম. ব্রিটিশ সরকার যখন দমননীতি, নাগরিক স্বাধীনতা হরণ, সামরিক আইনের এক নির্মম অভিযান চালিয়েছে, হোয়াইট বুকে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র তখন ভারতবর্ষের জনগণের কাছে বিবেচনার যোগ্য ব'লেই মনে হয় না;

৬ষ্ঠ. ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর গান্ধীর অনশনের শুভ সমাপ্তির জন্যে দেশবাসীকে অভিনন্দিত করছে এবং আশা করছে যে, অস্পৃশ্যতা অচিরেই অতীতের বস্তু হয়ে উঠবে;

৭ম. ১৯৩১ সালের করাচি অধিবেশনের ১৪ সংখ্যক প্রস্তাব পুনরায় ঘোষণা করছে;

(ক) এই প্রস্তাব ঘোষণা করছে ঃ জনগণের মৌলিক অধিকার (বক্তৃতা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম রক্ষা করা; জাতি, বিশ্বাস ও পুরুষ-নারী বিভেদের জন্যে কারুর উপর কোনো অসামর্থ্য আরোপিত হবে না; সকলের জন্যে সমান অধিকার); (খ) ধর্মসম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা; (গ) বয়স্কের ভোটাধিকার; (ঘ) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা; (ঙ) কম মজুরি, কাজের খারাপ পরিবেশ ও কাজের দীর্ঘ সময়, বার্ধক্যের বিপত্তি, রোগ ও কর্মবিরতির বিরুদ্ধে শিক্ষা ও শ্রমিকদের রক্ষা; (চ) শ্রমিকদের বিশেষ রক্ষা; (ছ) কারখানায় শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিষেধ; (জ) স্বার্থরক্ষার জন্যে শ্রমিকদের ইউনিয়নের অধিকার; (ঝ) কৃষি-কর গুরুত্বপূর্ণ ভাবে হ্রাস করা; (ঞ) বার্ষিক আয় ও উত্তরাধিকারের উপরে বৃদ্ধিমূলক (*Progressive*) কর; (ট) সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ অন্ততঃ অর্ধেক হ্রাস করা; (ঠ) সরকারী কর্মচারীদের ব্যয় ও বেতনের সীমা নির্দেশ ঃ ঊর্ধ্বসীমা

৫০০ টাকায় নির্ধারণ (৩৭ পাউণ্ড) ; (ড) সুরাও মাদকদ্রব্যের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ ; (ঢ) লবণকর রদ ; (ন) শিল্পসংস্থা ও ভূগর্ভস্থ মালিকানার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ; (ত) ব্যাংক ও অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ ।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উপরে যে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে পণ্ডিত মালব্য তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, প্রতিনিধিরা ভারতীয় জাতির একটা সেরা অংশ। এসব পরিচিত হওয়া ভালো। সামান্য কিছু আগে, শোনা গিয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল দলের প্রতিনিধিরা হিটলারী হিংসার বিরুদ্ধে জাঁকালো ঘৃণা-অবজ্ঞা দেখিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বলপ্রয়োগ দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ইংলণ্ড ফুরারের 'সুসমাচার' থেকে তেমন দূরে নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, আমি কিছু কিছু ঘটনা তুলে দিচ্ছি ঃ

কলকাতায় ৩০ মার্চ রাত্রে, অর্থাৎ কংগ্রেস অধিবেশনের আগে, পুলিশ যুক্তপ্রদেশের ৮৯ জন প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করে, তাঁদের পুলিশের আস্তানায় বা থানায় নিয়ে আসা হয়। তাঁরা কোনো বাধা দেননি। তাঁদের যেখানে আনা হয়, পুলিশ-ভ্যানের মুখ থেকে থানার দরজার মাঝ বরাবর পুলিশ সার্জেন্টরা দুই সারে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন ক'রে বন্দীদের নামতে বলা হয়। প্রত্যেককে তৎক্ষণাৎ ব্যাটন ও ঘুঁষি মারতে শুরু করা হয়। আঘাতগুলোর তাক ছিল পেট, চোখ, ও মুখ। ডাইনের আঘাতে প্রতিনিধি যখন টলে পড়েছেন, তৎক্ষণাৎ আঘাত খেয়েছেন বাঁ দিক থেকে। যারা পড়ে গেছেন, তাঁদের বুট দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। কারুর কারুর দেয়ালে মাথা ঠোকা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়েছেন। অনেকে চোখে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, এবং অনেকের চোয়াল ভেঙেছে। যে গুরুতর আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও একজন মুসলমান মৌলবী।

কালীঘাটেও এই একই বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ১৮০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪০ জন গুরুতর আহত। সরকারের ঠেঙ্গাড়েগুলো তাদের শিকারদের উপরে জঘন্য অপমানকর ব্যবহার চালিয়ে গেছে।

অহিংস বন্দীদের উপরে এই যে কাপুরুষোচিত বর্বরতা,—মালব্যের ভাষায়, যে বন্দীদের "একমাত্র অপরাধ, তাদের জন্যে সেই একই স্বাধীনতা চাওয়া, যে স্বাধীনতা তাদের পীড়ণকারীরা নিজের দেশে ভোগ করে,"—এ সবই জার্মানীতে শান্তিবাদী, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্টদের ঠেঙ্গাড়েদের পুরোপুরি উপযুক্ত। ফরাসী মোরগ তার ঝুঁট মোটেই না খাড়া করে ! নিজেদের দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে জেলখানায় অবরুদ্ধ, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও গুলিতে নিহত ইন্দোচীনের লোকেদের সম্পর্কে বেশি শ্রদ্ধা নিয়ে সে এগুচ্ছে না। মঁ. দালাদিয়ের ভাষায় যা ছিল "স্বাধীনতার শেষ ট্রেঞ্চ", সেই একই মঁ. দালালিয়ের কলমের খোঁচায় তা কি সদ্য সদ্য ফ্রান্সেই বিবেকের প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করেনি ?

ইউরোপের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রের একে অন্যকে ঈর্ষা করার মতো এমন বড়ো কিছু নেই। আজকের দিনেই ব্যাপারই হচ্ছে হিংসা। আর, সমস্ত জঘন্যতার সেরা হচ্ছে এই যে, এ অহিংসার বিরুদ্ধে যতো খড়্গহস্ত, ততো আর কোনো কিছুর বিরুদ্ধে নয়। যদি এ অহিংসাকে চূর্ণ করতে সফল হয়, বর্ম হিসেবে "সভ্যতার" আর কী থাকবে? পীড়নকারীদের অহিংসা আর পীড়িতদের হিংসার মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া ছাড়া আর বাছাইয়ের কিছু তোমরা রাখবে না…তোমরা তো এইটেই চাইবে, জর্জ দাঁদ্যাঁর দল *! রম্যাঁ রলাঁ

১৯৩৩, ১৫জুন তারিখের 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৫.

জহরলাল নেহেরুর বিবৃতি

১৯৩১ সাল থেকে ভারতবর্ষে সন্ত্রাসের রাজত্ব একটুও কমেনি এবং বিগত কয়েক মাসে বাংলা দেশে তা আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম হয়ে উঠেছে।

এক অদ্ভুত পরিহাসের মতোই, গত ৩ মার্চ নিউ ক্যাসলে, স্যর হারবার্ট সামুয়েল যখন এক বক্তৃতায় দেশবাসীকে ফ্যাসিস্ট বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক ক'রে দিচ্ছিলেন, "স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদার" স্তুতিগান করছিলেন এবং "সাম্রাজ্য ও ডিকটেটরবাদদের" ধিক্কার দিয়ে গণতন্ত্রের অশীর্বাদ ঘোষণা করছিলেন,—ভারতবর্ষে তখন সরকার তার ভারতীয় "প্রজাদের" ন্যায্য দাবির গলাটিপে মারার জন্যে ফ্যাসিস্ট রীতি-পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছিল।

এইটি হচ্ছে গান্ধীর পরে সব চেয়ে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা জহরলাল নেহেরুর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ; জেল থেকে মাস কয়েক হলো বাইরে আসতে না আসতেই তাঁর স্পর্ধার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সদ্য সদ্য আবার নতুন ক'রে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। র. র.

প্রাকৃতিক ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক ভূমিকম্প

"বিহার ও নেপালের ভূমিকম্পের ট্র্যাজিডিতে ভারতবর্ষের মানুষ গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল। চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও দরিদ্রতমেরা এবং মধ্যবিত্তরা উদার হস্তে—

জর্জ দাঁদাঁ (George Dandin) মলিয়েরের নাটকের অতি পরিচিত একটি কমিক নায়ক। —অনু.

সম্ভবত ধনী অথবা আয়েসী শ্রেণীর চেয়েও উদার হস্তে—দুর্গতদের সাহায্যে দান করেছিলেন। আমরা প্রকৃতির অচেতন নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ও তার বেদনাদায়ক ফলাফল কমাবার জন্যে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু অন্য ধরনেরও ভূমিকম্প আছেঃ মানুষের ভূমিকম্প চিন্তাশক্তিহীন প্রকৃতির হাতে ঘটে না। জনগণ যখন দেখে, তাদের অদৃষ্ট অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং দাস করে-রাখা বিধিব্যবস্থা চুরমার ক'রে দেয়। আবার রাজনৈতিক ভূমিকম্পও আছে, যখন একটা সরকার, তার অস্তিত্বের জন্যে ভীত হয়ে, সমস্ত সীমা, পরিপ্রেক্ষিতের সমস্ত বোধ, সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং সেই ধরনের জনতার মতোই আচরণ করে, যার চোখের সামনে থাকে শুধুই শত্রুপক্ষের ধ্বংস ও প্রতিশোধ গ্রহণের লিপ্সা। এমনকি এ ভুলে যায় একটা সরকারের মুখ্য লক্ষ্য, যা হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া, এবং যাদের সে শাসন করার দাবি করে, সর্বত্র বিপদের গন্ধ শুঁকে, এ সকলকে এবং প্রত্যেককে অন্ধের মতো আঘাত করে। যদি সে স্বেচ্ছাচারী কিংবা অত্যাচারী হয়, তাহলে সে সেই রোগে আরো বেশি ভুগবে, যে রোগ ক্ষমতাশীল সরকার বা ব্যক্তির পক্ষে অতি সুলভঃ নির্যাতনের অপকর্ম।

১৫ বছর হলো সরকারের দিক থেকে পাঞ্জাবে আমরা এই ধরনেরই এক ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করেছি। জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা, বুকে পথ হাঁটার এবং সামরিক আইনের অন্যান্য হিংস্র আনুসঙ্গিকের কথা জগতের স্মৃতিতে আছে আর বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই একই সকরার বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর, অমৃতসরের মতোই, সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার এবং একটি মহান জাতিকে অবমানিত করার লুব্ধ প্রচেষ্টার অশুভ প্রতীক হয়ে আছে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, বেশির ভাগই আমরা, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর সত্যিকারের তাৎপর্য অনুধাবন করি কিনা। নিপীড়নের দীর্ঘ ও সর্বপ্লাবী জোয়ারের পরম্পরায় আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলো কি ভোঁতা হয়ে গেছে, আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কি পাথর হয়ে গেছে? রক্তাক্ত পথরেখায় ও মানুষের জীবনের বিপুল ধ্বংসে মহাযুদ্ধ ইউরোপের মানুষের পক্ষে এই পরিণামই রেখে গেছে। মনে হয় যেন, এই ধরনেরই কিছু আজ একই সঙ্গে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘটেছে। তা যদি না হয়, তবে বাংলাদেশের এইসব অশ্রুতপূর্ব ব্যাপারগুলো এবং জনগণের উপরে তাদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কী?

এ এক অদ্ভুত কাহিনী এবং এ ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে রাখার মতো। জনাকয়েক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কিছু হিংসাত্মক কাজ করেছে, সেইজন্যে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য সৈন্য তলব করা হয়েছে এবং তারা সেসব অঞ্চল দখল ক'রে আছে, যুদ্ধের সময়ে বিদেশী সৈন্যও কখনো এমনভাবে শত্রুর অঞ্চল দখল করে না; সেখানকার প্রায় সমস্ত জনসাধারণকে সন্দেহভাজন মনে করা হচ্ছে; যুবক, যুবতী এমন কি শিশুদেরও বিভিন্ন রঙের পরিচিতি-পত্র ও ফটো সঙ্গে নিয়ে ছাড়া চলাফেরা নিষিদ্ধ; মানুষের

যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রিত এবং তারা কী পোষাক পরবে, এমন কি তাও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক ঘণ্টায় মাত্র সময় দিয়ে সৈন্যরা মানুষকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিচ্ছে ; ইস্কুল বন্ধ ক'রে দিচ্ছে এবং গোটা ছাত্রসমাজের সঙ্গে ঠিক যেন শত্রুর মতো আচরণ করছে ; প্রকাশ্যে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে এবং যে ব্রিটিশ পতাক জনসাধারণের চোখে অবমাননার প্রতীক হয়ে উঠেছে, তাকে সেলাম জানাবার জনে তারা জনসাধারণকে বাধ্য করছে ; যারা অমান্য করছে, হুকুম মানতে অস্বীকার করছে, তাদের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, প্রতিশোধের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এখানেই সব শেষ নয় ঃ চট্টগ্রামের হিন্দু যুবকদের এক সপ্তাহ অন্তরীণ ক'রে রাখা হয়েছিল ; কিছুকালের জন্যে ট্রেন, ষ্টিমার, মোটর চলাচল বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আদালত-কাছারি দুদিনের জন্যে বন্ধ ছিল। চট্টগ্রাম শত্রুর অবরুদ্ধ এক শহরে বা এক বিশাল জেলখানায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সপ্তাহ শেষ হলে অন্তরীণের মেয়াদ বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একমাস ক'রে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল···

এই সব ঘটেছে এবং তবুও সংবাদপত্র কদাচিৎ প্রতিবাদ করতে সাহস করেছে, ভয় পেয়েছে পাছে আইন ও "অর্ডিনান্স" তাদের সর্বনাশ না ঘটায় তাই বেশির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সংবাদপত্রই তার নীরব সাক্ষী। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বা যাদের হাতে এই মুহূর্তে ক্ষমতার যাদুদণ্ড, তাঁদের ক্ষেত্রে কিন্তু মোটেই এমন নয় প্রায়ই তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুধু তিরস্কার, আরও ভয়ংকর ভবিষ্যতের হুমকি, হতভাগ্য জনগণকে দম আটকে মারার জন্যে বিনা বিরতিতে নতুন নতুন শানানো অস্ত্র পাচ্ছি। তার একটা কুখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে মেদিনীপুরের কমিশনারের সাম্প্রতিক বক্তৃতা···তিনি তাঁর এবং সরকারের অভিপ্রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন···কোনো অত্যাচারী সরকারের কাজ সম্পর্কে এতো বেশি পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন, সমস্ত অধ্যাপক ও সমস্ত কেতাবও যা দিতে পারবে না। কলকাতায় আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে, এই বক্তৃতা ছাপা হোক এবং ব্যাপকভাবে ছড়ানো হোক, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে, যাদের শাসন করে তাদের উপরে সমস্ত দখল হারালে একটা সরকার নৈতিক রুচি-বিকৃতি ও বাহ্বাস্ফোটের কোন্ মাত্রায় নামতে পারে।

কিন্তু এই সবই যথেষ্ট নয়। এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি নতুন আইনের কথা, ভারতীয় অস্ত্রআইন (আপাত দৃষ্টিতে বিনানুমতিতে অস্ত্রবহন), লংঘনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রয়োগ করা হবে।

আরও বেশি করে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হবে, স্থানীয় সরকারের অসম্মতি আছে এমন কোনো কিছু প্রকাশ করতে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলোকে বাধা দেওয়া হবে। বন্দীশিবির ও আন্দামানের বন্দীদের* সম্পর্কে কোনো আগ্রহ বা কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। তারা মরে গেছে না বেঁচে আছে, অসুস্থ না সুস্থ, তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা হয় কিনা—এসব জানতে চেষ্টা করার অধিকার আমাদের নেই। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ধরা হয়েছে, মানুষের বাইরে ফেলে

---

* সকলেই রাজনৈতিক বন্দী।

দেওয়া হয়েছে, মানবিক কোনো বিবেচনা আর এইসব অস্পৃশ্যদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

বহুকাল থেকেই আমরা বইপত্র নিষিদ্ধকরণে অভ্যস্ত ; কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, এবং শুধুমাত্র স্বতন্ত্র বইপত্র নয়, একটা গোটা 'শ্রেণীর' 'সাহিত্য'কে সরকার আলাদা ক'রে নিয়েছে নিষিদ্ধ করবে বলে।

যুক্তির দিক থেকে অনিবার্যভাবে, পরবর্তী ব্যবস্থা হতে হবে সমস্যার গোড়া ঘেঁসে কোপ মারা এবং ঘোষণা করা যে, যা সরকারের প্রকাশিত নয়, সেসব বই বা সংবাদপত্র পড়াটাই নিষিদ্ধ।

আমাদের তরুণদের আচার-আচারণে মঙ্গলকর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে সরকার জেলার ম্যাজিস্টেটদের হাত শক্ত করতে ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিতে চায়, যাতে তারা তরুণদের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারা যদি এমন কিছু নাও করে যা তাদের অর্ডিনান্সের বিশাল বেড়াজালের খপ্পরে ফেলতে পারে। এইভাবে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সেইসঙ্গে তৎপর হয়ে উঠতে পারবে অসৎ সঙ্গের অজুহাতে কোনো কাউকে সন্দেহ করতে।

আর এখন সরকার পড়ছে এক কঠিন সমস্যার সামনে : এটা স্পষ্টই যে, যারা সন্দেহভাজন তাদের কায়দা করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে অন্তরীণ করা বা জেলে পাঠানো। কিন্তু সেখানে, তারা অন্যান্য যে সব অবাঞ্ছিতদের সঙ্গে মিলছে তাদের জন্যে তারা আরও খারাপ হয়ে উঠছে : এবং যখন তারা তাদের বেদনা থেকে মুক্ত হয়েছে, তখন তাদের সমাজে ছেড়ে দেয়াটা নিঃসন্দেহে বেশ ঝুঁকির ব্যাপার ! তাই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত পন্থা হচ্ছে, তাদের জেলে কিংবা বন্দীশিবিরে রেখে দেওয়া অথবা সর্বক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম গতিবিধির উপরেও কঠোর নজর রাখা…আর এই জন্যেই প্রস্তাবিত আইনে, মেয়াদ দু'বছর থেকে সাত বছরে তোলা হবে।

অবশেষে, নিপীড়নের যে অস্থায়ী আইনকানুনের মেয়াদ ১৯৩৫ সালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, তা স্থায়ী করা হবে…

তবুও মনে হয়, এইসব 'শাসন-সংস্কারগুলোর' মধ্যে একটা ফাঁক আছে। বর্তমান ও প্রস্তাবিত আইনকানুন খাড়া করা সত্ত্বেও, এও সম্ভব যে, কেউ কেউ এসব এড়িয়ে যেতে পারে। এইসব বিচিত্র আইন-কানুন, অর্ডিনান্স, বিজ্ঞপ্তি, নিয়মবিধি ইত্যাদির বদলে একটিমাত্র আইন করাই কি সবচেয়ে সহজ হবে না, যাতে বলা হবে, প্রতিটি ভারতীয় নিজেকে যেন মনে করে সে জেলে বন্দী (সি-ক্লাস), সমস্ত কলেজ, ইস্কুল বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো, সমস্ত সংবাদপত্র, সমস্ত বইপত্র নিষিদ্ধ করা হলো ; প্রতিদিন সকালে আমরা গিয়ে ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম জানাবো, দিনে দুবার ক'রে আমাদের দিব্য কর্ম হবে ব্রিটিশ জাতীয়সঙ্গীত গাওয়া, এবং বিকেলে ব্রিটিশ রাজত্বের গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যান শুনে নিজেদের হিতার্থে পবিত্র হ'তে পারবো ! এ ব্যবস্থার সপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। এই বিশ্বমন্দা ও রাজস্ব ঘাটতির যুগে, শিক্ষাসংক্রান্ত ও অন্যান্য চাকরি-বাকরি এবং সরকারী খয়রাতি-কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দিলে, এটা বিরাট আর্থিক লাভের ব্যাপার হবে। তাছাড়াও, বহুবিধ সরকারী

কাজকর্ম একটিমাত্র ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত করা চলবে। এইভাবে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটই হবে একই রকম ক'রে জেলখানাগুলোর নিয়ামক।

আর আমরা তাহলে কি এসবের দিকেই যাচ্ছি? আমরা যখন এমনধারা ট্র্যাজিডির মুখোমুখি, তখন সংবিধান, সর্বদলীয় সম্মেলন, শাসন-সংস্কার, নির্বাচন ইত্যাদির কথা বলা কি হাস্যকর নয়?"

জহরলাল নেহেরু

এলাহাবাদ, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৪
১৫ এপ্রিল, ১৯৩৪ তারিখের 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৬.

২ নভেম্বর (১৯৩৩), শুক্রবার রম্যাঁ রলাঁ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপচারী

স. ঠাকুর :—আপনার চিঠি পড়ে আমার মনে হলো আপনার সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলা দরকার। এটা ঠিকই যে, চিঠিতে অনেক কিছু প্রকাশ করা যায়, কিন্তু আলাপচারীতে সব কিছু ঠিক ঠিক গুছিয়ে বলা তেমনি সহজ! তাছাড়া, আমার ইউরোপীয় বন্ধুরা, যেমন ম' আঁদ্রে জিদ, বিশেষ ক'রে ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি মনে করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের উপরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ও তা বর্তমানে যে তুলনাহীন পাশবিকতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মুখোশ খুলে দেওয়াটা পুরোপুরি দরকার।

র. রলাঁ :—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই সন্ত্রাস সবচেয়ে প্রচণ্ডভাবে চলছে, তাই না?

স. ঠাকুর :—একেবারে ঠিক ঠিক বলেছেন। বাংলাদেশের সন্ত্রাসও অকল্পনীয় গ্রামে গ্রামে সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের উপরে তাদের অত্যাচারের বিরতি নেই। বেসামরিক কর্তৃত্ব আর নেই, সব সামরিক কর্তৃত্বের তাঁবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কায়েম-করা সন্ত্রাসের রাজত্বের মুখোশ খোলার যে কাজ আমাদের ঘাড়ে, তা ছাড়িয়ে, এই সাম্রাজ্যবাদের ধামাধরা গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে, এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল ও মালিক-ঘেঁষা চরিত্রের ঘোমটা খুলে দিতে হবে।

র. রলাঁ :—আপনার গান্ধীর এই মূল্যায়নের সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই। আমি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছি, এবং আমার এই প্রত্যয় হয়েছে

যে, ধনতন্ত্র ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ মানবিক অনুভূতি দিয়ে কমাবার জন্যে তিনি চেষ্টা ক'রে গেলেও, যখনই শ্রমিক পীড়িত হবে, তিনি সব সময়ে প্রস্তুত শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে। পারীর বিপ্লবী ট্রেড-ইউনিয়নপন্থীরা তাঁকে যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন, এখানে এই ভিলন্যভেই সেগুলো তাঁকে জানাবার সুযোগ আমার হয়েছিল, আর এই তার উত্তরের খাটি বয়ান, এটা সর্টহ্যান্ডে লিখে রাখা হয়েছিল, এটা তিনি পড়েছেন এবং অনুমোদন করেছেন।

মাদলিন রলাঁ :—গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী একই ভাবের কথা বলেছেন।

স. ঠাকুর :—এখানে ওখানে কালেভদ্রে অবস্থার পাকে গান্ধীকে এ ধরনের কথা বলতে দেখা যায় বটে, আমি কিন্তু তাঁর লেখা ও বক্তৃতা থেকে শ' খানেক উদ্ধৃতি দিতে পারি, যা প্রমাণ করে তিনি পুরোপুরি মালিকদের কুক্ষিগত, গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এতদূর পর্যন্ত গেছেন যে, বলতে পেরেছেন, এ্যাসেম্ব্লিতে চাষীদের প্রতিনিধির দরকার নেই, কারণ জমিদাররাইতো তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর তাঁর কথা ও লেখা ছাড়াও, রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিক থেকে, কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি মালিকদের পক্ষে।

র. রলাঁ :—গান্ধী ধনতন্ত্রকে সেইভাবেই বিচার করেন, যে ভাবে তিনি তাঁর কোনো ভারতীয় মালিক বন্ধুদের দেখেন, শ্রমিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যাঁরা তাঁর কাছে মানবিক ও সম্মত ব'লে মনে হতে পারেন। আর এখুনি যে কথাগুলো আপনাকে দেখালাম, তা থেকে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, গান্ধী এই স্বপ্ন লালন করেন যে, শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বংসের মধ্যে না গিয়েও মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হবে। কিন্তু ঘটনা যদি প্রমাণ করে যে, এমন আশা অসম্ভব, তাহলে তিনি নিশ্চয় শোষিতের পাশে এসে দাড়াবেন। আর আমার দুঃখ এই যে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বদলে আপনি তাঁর সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করছেন না।

স. ঠাকুর :—আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গান্ধীর উপরে আমার তিলমাত্র প্রভাব নেই, আর আমি মনে করি না যে, দুনিয়ায় এখন কেউ আছেন, যিনি কোনো ব্যাপারে গান্ধীকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারেন, সে যে-ব্যাপারই হোক না কেন। নিজের যুক্তিহীনতায় তিনি এমনই গোঁয়ার যে, তার বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। তাছাড়া, মালিকদের অসদিচ্ছা ও ভারতীয় জনগণের দুর্দশার কথা গান্ধী জানেন না, একথা ভাবলে কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত মূল্য কম ক'রে দেখা হবে। ভারতীয় ধনিক ও জমিদারদের জোয়ালে যে, দুর্দশায় ভারতীয়রা পিষ্ট হচ্ছে, গান্ধীর চেয়েও তা বেশি ভালো জানেন এমন কেউ ভারতবর্ষে আছেন ব'লে আমি বিশ্বাস করি না,—থাকলেও তাঁরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে তাঁর শেকড় এমনই গভীরভাবে ঢুকেছে যে তিনি আর নিজেকে টেনে বার করতে পারেন না। এ নয় যে, তিনি নিজের জন্যে কোন কিছু চান, তিনি শুধু তার বংশগত গোষ্ঠীর (clan), বংশগত বুর্জোয়া গোষ্ঠীর স্বার্থ বাঁচাবার জন্যেই কাজ করেন।

র. রলাঁ :- আমি এসবের কিছুই বিশ্বাস করি না। ব্রিটিশ অত্যাচারের হাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্যে গান্ধী সবার আগে একটা "জাতীয় ব্লক" গড়তে

চাইছেন ব'লে আমার মনে হয়, আর আমি বিশ্বাস করি যে, এই রাজনীতি বিজ্ঞোচিত। জাতীয় মুক্তি একবার লাভ হলেই আপনারা অন্যসব সামাজিক সমস্যা, শ্রেণীর সমস্যার সমাধানের দিকে যেতে পারবেন। গান্ধীর মতোই আমার বিশ্বাস যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ব্লকে সমস্ত ভারতীয় শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাটাই আপনাদের উচিত।

স. ঠাকুর ঃ—জাতীয় ব্লকের ধারণা একটা মোহ এবং এমনকি একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক মোহ। আধা-ঔপনিবেশিক চীনের সঙ্গে জাতীয় ব্লকের অভিজ্ঞতা আমাদের ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। তার পরিণাম হয়েছে এই যে, জাতীয়তাবাদী সংগঠন কুয়োমিনটাং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে চীনের চাষী ও মজুরদের সংগঠনগুলোকে কাজে লাগিয়েছে যতদিন পর্যন্ত তারা চীনের বুর্জোয়াদের স্বার্থের কোনো বিপদ হয়ে দেখা দেয়নি ; পরে, জনসাধারণ যখনই সামাজিক সুবিচার দাবি করেছে, তাদের উপর সবচেয়ে নির্মম সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানো হয়েছে। এই "জাতীয় ব্লকের" মূল্য হিসেবে চীনে আমাদের হাজার হাজার—হাজার হাজার সেরা কমরেডের জীবন দিতে হয়েছে। ভারতবর্ষ পুরোপুরি উপনিবেশ, এই একই পন্থায় এগুলে, এখানে এই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। বর্তমান সময়ে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের কথা বলতে, চাইলে, দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দৃষ্টি এড়ালে চলবে না ঃ প্রথম, এই ধরণের বিপ্লব বিশ্ব-শ্রমিক-বিপ্লবের সঙ্গে অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদের অবসানের সঙ্গে মিলে যাবে ; দ্বিতীয়, গত ষোলো বছর যাবৎ এক সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে। এই দুটি ঘটনা কোনো সম্ভাব্য ঔপনিবেশিক বিপ্লবের চেহারা একেবারেই পালটে দিয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়ারা মোটেই ঘুমিয়ে নেই, কিংবা মোটেই মূর্খ নয় যে, তারা দেখতে পায় না, ভারতবর্ষের কোনো বিপ্লব ব্রিটিশ আধিপত্য উচ্ছেদ করলে, তেমনি অনিবার্যভাবে ভারতীয় বুর্জোয়ার আধিপত্যও উচ্ছেদ করবে! তাই তারা একেবারে মুনাফা না-পাওয়ার চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মুনাফা ভাগ ক'রে নেওয়াটাই বেশি ভালো ব'লে মনে করে। আমি যা বলছি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মিলবে, বাংলাদেশের বেশি গুরুত্বপূর্ণ জমিদারদের তিরিশ জন ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষের বড়লাটের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিল তার মধ্যে, তাতে তারা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চূর্ণ করতে নিজেদের কাজের সাহায্য দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল। আর এইটে তেমনই বিস্ময়কর যে, যার নেতা গান্ধী সেই জাতীয় কংগ্রেস কখনো তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দুটো পৃথক শ্রেণী, দুটো পৃথক মনোভাব, এইটেই একমাত্র বাস্তব ; আর জাতীয় ব্লক একটা অতি-কথা (mythe)।

র. রলাঁ ঃ—আমার কাছে মনে হয় জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধী একটিমাত্র ব্যাপারে কখনো আপস করবেন না ঃ সেটি অহিংসার ব্যাপারে। তিনি বলেন ঃ "যদি অহিংসা ছাড়া অন্য কোনো কৌশল ব্যবহার করতে চাও তো করো! কিন্তু আমি সরে দাঁড়াবো ; আমি এতে সাহায্য করতে কখনো রাজী হবো না।" আমার ব্যাপারে, রম্যাঁ রলাঁ হিসেবে বলছি, আমি "অ-হিংসা" কথাটা পছন্দ করি না। বরং বলা উচিত ঃ "অ-গ্রহণ" ; জীবনের সর্বত্র হিংসা। সমস্ত হিংসার বিরুদ্ধে

আমাদের লড়তে হবে সেই আত্মার হিংসা নিয়ে, যে-আত্মা এদের বিরুদ্ধে। গান্ধীর নাম-দেওয়া "অ-হিংসা" অতি-প্রসারিত প্রাণশক্তির এক তীব্র প্রচণ্ড ক্রিয়া (paroxysme), না-গ্রহণের এক বীরত্ব, যার মহিমা ও প্রয়োজন অন্য সময়ের চেয়ে বর্তমান মুহূর্তে বেশি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, কারণ পাশবিকতা শিকল ছিঁড়েছে; স্পেংগলারের মতো লোকের মধ্যে সে তার পক্ষ-সমর্থক খুঁজে পেয়েছে, যিনি তাঁর সর্বশেষ রচনায়, জীবনের যা কিছুকে আমরা মানবিক মনে করি, তার সমস্তকেই বিদ্রূপ করেছেন এবং নিষ্ঠুরতাকে মহিমান্বিত করেছেন। এই জগতে গান্ধী মানবিকতার সর্বশেষ স্বার্থ-রক্ষক। এই আশা যদি ধ্বংস হয়, তাহলে বর্বরতম হানাহানি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

স· ঠাকুর ঃ –আমি গান্ধীর অহিংসা মানি না, আর আমি সবসময়েই অবাক হই যে, ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা দেখতে পান না যে, এ কিছুই না। শ্রেণীর অস্তিত্ব, বর্ণের অস্তিত্ব ইত্যাদি সমস্ত সামাজিক অবিচারের ন্যায্যতাই গান্ধী সমর্থন করেন··· এই একই রকম জিনিসের ন্যায্যতা সমর্থন করলে একজন কী ক'রে অহিংস হবার গুণ অর্জন করতে পারে? গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি হিংসার মূলের দিকে যেতে একেবারেই অক্ষম। যদি তিনি স্বীকার করতেন যে, ধনতন্ত্র নিজেই এক হিংসা, শ্রেণীর আধিপত্য এক হিংসা, তাহলে অবশ্যই মানা যেতো, তিনি সত্যি সত্যি হিংসার সমস্যাটি ধরেছেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন, আমি গান্ধীর অহিংসা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আর তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এখনও তিনি কিছু লেখেননি। তাঁর অহিংসার ধারণা গান্ধীর মতোই অসম্পূর্ণ, কারণ দু'জনেই শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজনে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জনগণের সঙ্গে নেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিগত সমস্যাটি দেখেন। গান্ধী তা একেবারেই দেখেন না।

র· রলাঁ ঃ—বুদ্ধির কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ যা চিনতে পারেন, জনসাধারণের দূরদর্শী সহজাত বৃত্তির কল্যাণে গান্ধী তা উপলব্ধি করতে পারেন।

স· ঠাকুর ঃ –সরলতার প্রয়াস সত্ত্বেও গান্ধী ভারতবর্ষের জনগণের জন্যে আন্তরিক ভালোবাসা অনুভব করেন না; সরল হবার জন্যে লেনিনের কোনো প্রয়াস ছিল না; তবুও তিনি ছিলেন জনগণের সঙ্গে, শুধু রাশিয়ার জনগণ নয়, গোটা জগতের জনগণের সঙ্গে। আর এদিকে গান্ধী ভারতীয় ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থের জন্যে জনগণকে কাজে লাগাচ্ছেন।

র. রলাঁ ঃ –আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি এসবের কিছুই বিশ্বাস করি না। আমি লেনিনের মুগ্ধ প্রশংসা করি, কিন্তু আমার চোখে গান্ধীও তাঁর দেশের মানুষের ও সকল মানুষের এক উদ্বুদ্ধ সেবক। অহিংসার প্রশ্নে ফিরে আসি; যাঁদের মনের ঝোঁক রয়েছে পরিষ্কার হিংসার দিকে, এমন ভারতীয় নেতাদেরও আমি গান্ধীকে অনুমোদন করতে দেখেছি। লালা লাজপত রায়, যিনি ভারতবর্ষের জন্যে জীবন দিয়েছেন, তিনিই আমাকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে গান্ধীর অ-গ্রহণই বর্তমানে সবচেয়ে ফলপ্রদ অস্ত্র। কারণ অস্ত্রশস্ত্রে বঞ্চিত বর্তমান

ভারতবর্ষের পক্ষে হিংসা দিয়ে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধতা করা কার্যত পুরোপুরি অসম্ভব। ইংরেজদের হাতে যেসব উপায় আছে, ভারতবর্ষের জনগণের হিংসার ধুয়ো তুলে যদি সেসব প্রয়োগ করার কোনো ছুতো খুজে পায়, তাহলে সেটা হবে এক ভয়াবহ হত্যাকান্ড। ব্রিটিশ সরকারের আধিপত্যে যতো যন্ত্রণাই ভারতবর্ষ ভোগ করুক, ভারতীয়দের প্রযুক্ত হিংসা আরও অন্তহীন বিপুল যন্ত্রণা ঘটানোর এক দমননীতির সংকেত-চিহ্ন হবে, সম্ভবত সাম্রাজ্যবাদ তার অপেক্ষায় আছে। আমি আরও বলি যে, ইংলন্ডের উপরে অর্থনৈতিক কার্যকারিতার কথা না বললেও, একটা গোটা জাতির অহিংসা অ-গ্রহণের পক্ষেই ইংলন্ডের রাষ্ট্রনেতাদের মনোভাবের উপরে প্রতিক্রিয়া করার এবং ভারতবর্ষের দাবি-করা স্বায়ত্বশাসনের অনুকূলে তাদের পরিবর্তিত করার একমাত্র সুযোগ আছে।

স. ঠাকুর:—অহিংসাকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে: কৌশলের দৃষ্টিকোন থেকে এবং তার অন্তর্নিহিত মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা নিশ্চয় যে, ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কার্যকর সংগ্রাম চালাতে পারার মতো অবস্থা বর্তমান মুহূর্তে আমাদের নেই। কিন্তু সে অবস্থা আরও পরে আসতে পারে। তাই হিংসার অথবা অহিংসার প্রয়োগ বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে পারে। যা কিছুকে ভারতবর্ষের স্বার্থ ব'লে বিশ্বাস করেছেন, তার জন্যে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, নিজেরা হিংসার আশ্রয় না নিয়ে ইংরেজ পুলিশ ও সৈন্যের হাতে নিজেদের মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার এক গভীর শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও, প্রায় গোটা আদর্শবাদটাই বৃথা ব্যয় হয়েছে, কারণ এই গোটা আদর্শবাদের ভিত্তিই যুক্তির উপরে নয়। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে অ-হিংসা পুরোপুরি অক্ষম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের—অবশ্য অন্য সব সাম্রাজ্যবাদের মতোই, হৃদয় ব'লে কিছু নেই, এটা একটা নিয়ম-ব্যবস্থা (systéme), একটা যান্ত্রিক জিনিস। আমরা একে শুধু চুরমার করতে পারি, পরিবর্তন করতে পারি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যদি পরিবর্তন ঘটে, তা-হবে এক নিকৃষ্টতম পরিবর্তন। তা হবে শুধু একতরফা সন্ত্রাস চালাবার ক্ষেত্রে লাগাম-ছেঁড়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্যে।

র. রলাঁ:—ভারতবর্ষের দুটি সত্যগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে কাটিয়ে-ওঠা এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনেতাদের মনোভাবের এবং তাঁদের দেশবাসীর মতের পরিবর্তনের প্রত্যাশাটা বড়ো বেশি চাওয়া হবে। কিন্তু সম্ভাবনার আশাটুকু আছে (অধিকন্তু তা নির্ভর ক'রে আছে অবশ্যই ব্রিটেনের স্বার্থের উপরে, যে-ব্রিটেন একটা গোটা জাতির ধর্মঘটের ধাক্কায় পড়েছে)। আমি আপনাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তারিত সবকিছু জানি না, তা অবশ্যই এ মাস থেকে ওমাসে বদলাচ্ছে, তাই আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারছি না; কিন্তু এখানে ইউরোপে যা কিছু ঘটছে সেই অনুসারে এইসব গুরুতর সমস্যাগুলো বিচার করতে পারি। এখানে, অহিংসার বা হিংসার যে সমস্ত শক্তিকে পাওয়া যাবে, সাম্রাজ্যবাদ ও

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে কার্যকরী ভাবে লড়াই করার পক্ষে তারা মোটেই বেশি নয় (তারা এখনো যথেষ্ট নয় !)। এবং ১৯৩২ সালের আগস্টে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমস্টারডামের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমাদের—বারবুসের ও আমার ভূমিকা ছিল সমস্ত মিত্রশক্তিগুলোকে আহ্বান জানাবার ও তাদের সমাবেশ করার। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে বিবেকবান প্রতিবাদীদের উপরে এবং অ-হিংস অ-গ্রহণবাদী—যারা ফ্যাসিস্ট সরকারকে বলে : "তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমার হুকুম মানবো না,"—তাদের উপরে আমি সবচেয়ে বড়ো গুরুত্ব দিই। ফ্যাসিবিরোধী বিপুল বাহিনীর এরা ডানা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইউরোপের বেশির ভাগ দেশেই ফ্যাসিস্টদের হাতে যে শক্তি আছে তা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলোর চেয়ে বেশি। তাই আমাদের শক্তিকে ভাগ কেন না করি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অ-হিংসা সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ এবং ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক আশা।

স. ঠাকুর :—আমার বিশ্বাস সময়কালে শক্তির যথেষ্ট পরিচয় না দিতে পেরে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী এক অন্যায় করেছে।

র. রঁলা :—১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে নিঃশেষ হয়েযাওয়ার কথাটাও মনে রাখতে হবে। ইউরোপের প্রতিটি জাতি শারীরিকভাবে ও নৈতিকভাবে সর্বস্ব রিক্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি তারা কোনো শক্তি প্রয়োগ না ক'রে থাকে, তাহলে সেটা সত্য বা মিথ্যা, কোনো আদর্শবাদের প্রশ্ন নয় ; যা তাদের লড়াই থামিয়ে দিয়েছিল, তা হচ্ছে নিছক ক্লান্তি।

স. ঠাকুর :—শ্রমিকেরা যথা সময়ে যে শক্তির ব্যবহার করেনি, তা নিশ্চয়ই আদর্শবাদের জন্যে অথবা আরও বিপুল হিংসাকে এড়াবার জন্যে নয় ; সেটা বরং ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সমাজতন্ত্রী নেতাদের মধ্যে আদর্শবাদের অভাবের জন্যে, তাঁরা তাদের বিপ্লব ঘটাতে বাধা দিয়েছেন। আদর্শবাদের এই অভাবই আমাদের আটকে যাওয়ার কারণ, আর এটাও কারণ কেন বর্বর ফ্যাসিবাদ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে পারল। যা সমষ্টির সম্পত্তি তা উদ্ধারের জন্যে, সমষ্টির যে হিংসার প্রয়োগ করে, আর কিছু ব্যক্তি সমষ্টির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে যে হিংসার প্রয়োগ করে—আমি এদের মধ্যে পার্থক্য টানি। প্রথম ক্ষেত্রে হচ্ছে শক্তির আত্মিক (spirituel) ব্যবহার ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিংসা।

মাদলিন রলাঁ :—অস্পৃশ্যতার সমস্যা সম্পর্কে এবং এই দিক থেকে গান্ধীর মহৎ প্রচেষ্টার সিদ্ধি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন ?

স. ঠাকুর :—বর্ণভেদকে স্বীকার ক'রে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করাটা নিরর্থক। গান্ধী মনে করেন, চতুর্বর্ণ প্রকৃতির এক শাশ্বত নিয়ম।

মাদলিন রলাঁ :—কিন্তু অস্পৃশ্যদের ব্যাপারটা সকলের চেয়ে খারাপ, যার কোনো তুলনা নাই।

স. ঠাকুর :—নিঃসন্দেহে, তবু অন্যগুলোও মোটেই বেশি ভালো নয়। যে ঘরে বসে খায় সে ঘরে আমি যদি ঢুকি, গোঁড়া ব্রাহ্মণ খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়বে,

খাবারদাবার বাইরে ফেলে দেবে। এটা কি অস্পৃশ্যতার একটা নিকৃষ্টতম রূপ নয়? এছাড়া, সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত খুবই কম মন্দিরের দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্যে খুলেছে, লক্ষ লক্ষ মন্দির আছে, যাদের দরজা আগের মতোই বন্ধ হয়ে আছে। এক বিজয়ী বিপ্লব আমাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার আগে এ সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি না। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে, বিপ্লবের পরেও, জনসাধারণের মনের মধ্যে গাঁথা কুসংস্কারগুলো ধ্বংস করা কতো কঠিন। এ এক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কাজ। আর এ সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের পরেই, আগে কখনো নয়।

মাদলিন রলাঁ ঃ—ভারতবর্ষে বিপ্লব দেখা দেবার আগে অনেক সময় লাগবে, এ কথা আপনি বলেছেন?

স. ঠাকুর ঃ—হ্যাঁ, বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ নির্ভর করে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা জগতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক কারণের উপরে। আমার বিশ্বাস তার জন্যে এক দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই। তবুও, প্রথম পদক্ষেপ অবশ্যই করতে হবে, আর তা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

দ্বিতীয় আলাপচারী ঃ বিদায় সাক্ষাৎকার

শনিবার, ২৫ নভেম্বর।

স. ঠাকুর ঃ—আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি; কিন্তু যাবার আগে, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই যে, আমাদের লড়াই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, এটা জগৎ-জীবন সম্পর্কে পৃথক দুটি ধারণার লড়াই। গান্ধীবাদ ও কমিউনিজম একে অন্যকে বাতিল করে। আমাদের সঙ্গে আপনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন, এটা দেখতে আমরা খুবই চাইছি।

র. রলাঁ ঃ—আমি মনে করি না যে, গান্ধীবাদ ও কমিউনিজম, বর্তমান মুহূর্তে, অপরিহার্য ভাবে, একে অন্যকে বাতিল করে। তার বিপরীত, আমি মনে করি যে, এরা মিত্র হতে পারে এবং এদের মিত্র হতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন সময় আসবে, যখন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যেকার লড়াইয়ে গান্ধীবাদকে পরিষ্কারভাবে তার দাঁড়াবার জায়গা বেছে নিতে হবে। তখন, সময় হবে সিদ্ধান্ত নেবার।

স. ঠাকুর ঃ—আমাদের দিক থেকে, সে সময় অনেক আগে চলে গেছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা, এক সময়ে, মনেপ্রাণে গান্ধীবাদকে সমর্থন করতেন, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, নতুন যে-জগৎ ও মানুষের নতুন যে-সম্পর্কের স্বপ্ন আমরা দেখি, আমরা যাদের আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করি যাদের জন্যে আমরা কাজ করি—এসব বাদ দিলেও, গান্ধীবাদী পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতায় পৌঁছুনো অসম্ভব।

র. রলাঁ ঃ—গান্ধী ঐতিহ্যের আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনি অতীতে থেমে নেই। তিনি এগিয়ে-চলা দলের লোক এবং তিনি পুরোপুরি আন্তরিক।

স. ঠাকুর ঃ—এ এমন একটা জিনিস যা প্রত্যেকেই বলতে পারে। এমনকি মুসোলিনিও বলতে পারেন, তিনি সত্যের সন্ধানী।

র. রলাঁ (জোরের সঙ্গে) ঃ—না, না! এই দুটো নামকে পাশাপাশি দাঁড় করাতে দেওয়া চলে না। মুসোলিনির সমগ্র সত্তাই তাঁর "অহং"-এ কেন্দ্রীভূত। তাঁর সমস্ত কাজের উপরে আধিপত্য করে তাঁর উচ্চাভিলাষ আর অহংকার। মুসোলিনির চেয়ে অনেক কম বুদ্ধিমান হিটলারও এই ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি আন্তরিক।

স. ঠাকুর ঃ—আপনি বোধ হয় জানেন না, ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ ক'রে কলকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর হিটলারের স্তুতিগানের বিরতি নেই। তারা তাঁকে জার্মানীর ত্রাণকর্তা নাম পর্যন্ত দিয়েছে।

র. রলাঁ ঃ—আমি জানি, ভারতীয় যুবকদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে মুসোলিনি, বোধহয় সর্বক্ষেত্রে, এক বিরাট সম্মান পাচ্ছেন। আর আমিও একাধিকবার এ ধরনের ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে পাল্টা বলেছি।

স. ঠাকুর ঃ—যদি এক বিজয়ী বিপ্লবের হাতে সময় মতো চূর্ণ না হয়, তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একদিন প্রবলভাবে ফ্যাসিবাদের দিকে মোড় নেবে। আপনাকে আর একবার নিশ্চয়তা দিয়ে বলা দরকার, আমাদের এই লড়াই দুটি পৃথক জগতের ধারণার লড়াই : এক্ষেত্রে কোনো কারুর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের সমস্ত কর্তব্য বাতিল।

র. রলাঁ ঃ—আমি আপনাকে তো বলেছি, আমার মতে, কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ অপরিহার্যভাবে শত্রুভাবাপন্ন দুই জগতের দুটি ধারণা নয়। যৌথ শত্রুর বিরুদ্ধে অবশ্যই হাত মেলাতে হবে ঃ সে শত্রু ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে আবেদন আমি আপনাকে একটি লিখে দেবো, আমার অনুরোধ আপনার দেশের তরুণদের কাছে আপনি সেটি পাঠিয়ে দেবেন। আমার ক্ষেত্রে, আমি গান্ধীর প্রতি বিশ্বস্ত আছি, কারণ এ যুগের যে-কোনো মানুষের চেয়ে আমি তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করি, সম্মান দিই। যদি ধনতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার সংঘর্ষে পরবর্তীকালে গান্ধীবাদ খোলাখুলি শ্রমিকের পক্ষ মোটেই না নেয় (আমি যেমন মনে করি, নেবে), তখন সময় হবে আলাদা হবার। কারণ, যাই ঘটুক না কেন, আমি শ্রমিকের দিকে আছি এবং শ্রমিকের দিকেই থাকবো।

স. ঠাকুর ঃ—আগে যেমন বলেছি, আমাদের পক্ষে সময় এসে গেছে, আর আমরা ঠিক ক'রে ফেলেছি, কোন্ আচরণ-নীতি অনুসরণ করবো। আমি নিশ্চিত যে, ঘটনাবলী আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। যে দৃষ্টিভঙ্গি আমি আপনার সামনে উপস্থিত করলাম তা হাজার হাজার ভারতীয় যুবকের দৃষ্টিভঙ্গি। আজ গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র এবং ভারতবর্ষে অতি-বিস্তৃত।

'আকার্তিভতে'-য় প্রকাশিত

৭.

আনন্দ কুমারস্বামীর 'লাঁ দাঁস দ্য শিভ' গ্রন্থের মুখবন্ধ

আমরা ইউরোপে কিছু লোক আছি, যাদের ইউরোপের সভ্যতায় আর মন ভরে না। পশ্চাত্যের মনের কিছু অতৃপ্ত সন্তান, পুরনো বাড়িতে যারা আর হাত-পা ছড়াতে পারে না, - দুই হাজার বছর ধ'রে যে চিন্তা জগতকে জয় ক'রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তার সূক্ষ্মতা, ঔজ্জ্বল্য ও বীরোচিত প্রাণশক্তির তারিফ না ক'রে পারে না,—তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের অপ্রতুলতা ও তাদের সীমিত গর্ব-অহংকারের স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা কেউ কেউ আছি যারা এশিয়ার দিকে তাকাই।

এশিয়া, মহান্ ভূমি, ইউরোপ যার মাত্র এক উপদ্বীপ, সৈন্যবাহিনীর অগ্রদল, হাজার হাজার বছরের প্রজ্ঞা-বোঝাই ভারী অর্ণবপোতের ক্ষ-বর্ম (éperon)··· তার কাছ থেকেই আমরা চিরকাল পেয়েছি আমাদের দেবতাদের, পেয়েছি আমাদের চিন্তাভাবনা। কিন্তু সূর্যের পায়ে পায়ে এগিয়ে-চলা আমাদের জাতিদের প্রদক্ষিণ-পথে মাতৃভূমি প্রাচ্যের সংযোগ হারিয়ে, আমাদের উগ্রকর্মের লক্ষ্যের জন্যে, এই বিপুল চিন্তারাশির বিশ্বজনীনতা আমরা বিকৃত করেছি, সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলেছি।

আর এখন, পাশ্চাত্যের জাতিগুলো গিয়ে ঠেকেছে এক অন্ধগলির গভীরে তারা একে অন্যকে হিংস্রভাবে চূর্ণ করছে···আমাদের মনকে ছিনিয়ে আনতে হবে এই রক্তমাখা জন-সংঘট্ট থেকে! আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিভিন্ন পথের সেই চৌমাথায় পৌঁছুতে, যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তের চতুঃসীমায় মানব-প্রতিভার নদ-নদী। আবার আমাদের উঠতে হবে এশিয়ার উচ্চ মালভূমিতে!

ইউরোপ অবশ্য এশিয়ার স্মৃতি ভুলে যায় নি, যখন সে খ্রীষ্টের ও সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে এই মাটির আধিভৌতিক সম্পদ লুণ্ঠন, গায়ের জোরে আদায়, আর শোষণ করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য থেকে কোন্ লাভ সে করতে পেরেছে? সে-সবই বিবিধ সংগ্রহ ও প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরগুলোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছে। জ্ঞানপীঠের (Académic) জনকয়েক প্রতিভাবান পর্যটক এইসব আহার্যের টুকরো-টাকরা ঠুকরে দেখেছেন, তাতে ইউরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের লাভ হয়নি।

বিশৃঙ্খলার মধ্যে পাশ্চাত্যের শৃঙ্খলাহীন বিবেক যেখানে বাঁচার জন্যে আকু-পাকু করছে, সেখানে চল্লিশ গুণ প্রাচীন ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা আমাদের উদ্বেগের কোনো উত্তর দিতে পারে কিনা, সম্ভবত আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো আদর্শ হতে পারে কিনা, তা কে খুঁজে দেখেছে?

অতি-দাবিদার ও অতি-পীড়িত এক জীবনীশক্তির অধিকারী জার্মানরা এশিয়ার কাছে সেই খাদ্য দাবি করেছে, ইউরোপে যাতে তাদের ক্ষুধার্ত মন পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি; রাজনৈতিক কর্মের মোহমুক্তি এবং অন্তর্জীবনের মহিমান্বয়নের ফলে, গত

কয়েক বছরের বিপর্যয় এই মানসিক বিবর্তন ত্বরান্বিত করেছে। কাউন্ট কাইজারলিঙের মতো মহৎ উদ্যোক্তারা এশিয়ার প্রজ্ঞাকে জনপ্রিয় করেছেন। অতিখাঁটি জার্মান কবিদের মধ্যে হেরমান হেসের মতো, কেউ কেউ প্রাচ্যের চিন্তার যাদুমন্ত্রে সম্মোহিত হয়েছেন, এতদূর হয়েছেন যে, পবিত্র সাম্রাজ্যের শিল্পী-প্রাজ্ঞদের আত্মায় নিজেদের রূপান্তরিত করেছেন।

ফ্রান্সে এই রকম ধারা অনুভূত হতে শুরু হলেও, কিছু কম খ্যাত ফরাসী এশিয়ার নবজাগরণের উদ্যোক্তাদের মধ্যে গণ্য হলেও,—কৌতূহল ও ফলপ্রসূ সহমর্মিতার এই আন্দোলনে ফ্রান্স পিছিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক পথ-যাত্রা এবং তাঁর ইউরোপীয়-এশীয় সাংস্কৃতিক যৌথ কর্মকাণ্ডের আহ্বান, ইউরোপের কোনো অংশই আর এখন অননুভূত হয়ে নেই। এক তৃপ্ত ঔদাসীন্যের প্রাচীর এই দেশকে জগতের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। রণচটা বিঅর্নসন (Bjornson) সম্প্রতি তার জন্যে তাকে সঙ্গত তিরস্কারই করেছেন। কিন্তু এই প্রাচীরে ফাটল ধরাবার জন্যে এক স্বল্পসংখ্যক ফরাসী যে-চেষ্টা করেছেন তার স্বীকৃতি না দেওয়াটা অসঙ্গত হয়েছে। এবং এই সংকলনটিই*—যা সম্পাদনা করেছেন আমাদের বন্ধু,—হুইটম্যানীয় অর্থে, যা কিছু মানবিক তার সহধর্মী বন্ধু—বাজালজেৎ—এইটিই তার সুন্দর প্রমাণ। এই ফাটলটাকে বড়ো করতে হবে! আর এই প্রাচীর ভেঙে ফ্রান্সকে যেন ভারতবর্ষের বাণী শোনানো যায়।

আনন্দ কুমারস্বামী সেই মহান ভারতীয়দের একজন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতোই ইউরোপের সংস্কৃতি ও এশিয়ার সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়ে, তাঁদের অত্যাশ্চর্য সভ্যতার সঙ্গত গর্ব নিয়েই, মানবতার কল্যাণের জন্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার ঐক্যের জন্যে, কাজ করা কর্তব্য ব'লে মনে করেছেন। সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধের দুর্দশাবলী, যা ইউরোপের সৌধ-অট্টালিকার ভাবী ধ্বংসের চিহ্নগুলো প্রকট ক'রে তুলেছে, তারাই তাঁদের ব্রতের জরুরি প্রয়োজনটা দেখিয়ে দিয়েছে। ঠিক একই সময়ে, রবীন্দ্রনাথের ঐকতানিক কণ্ঠ যখন তাঁর শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতীর' জন্যে আমাদের সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তখন কুমারস্বামী সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন: 'এশিয়াকে বাঁচাও! তার আদর্শবাদ বিপদের মুখে। যদি তাকে না বাঁচাও, ভয়ে কাঁপো, এশিয়ার হাত দিয়ে—যা দিয়ে তাকে সজ্জিত করবে, সেই মুনাফার ও হিংসার সাম্রাজ্যবাদের হাত দিয়ে, নিয়তির প্রত্যাঘাত না তোমার বিরুদ্ধে আসে! এশিয়ার অধঃপতন তোমার ধ্বংস ঘটাবে। তার পুনরুদ্ধার হবে তোমার মুক্তি…'

অহংকারী ইউরোপ স্বীকার করে না যে তার সেই এশিয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে, যাকে সে শতাব্দীর পর শতাব্দী পায়ে থেঁতলাচ্ছে, কোন সংশয়ও মনে উঁকি মারছে না যে, সে রোমের ধ্বংসস্তূপের উপরে আলারিকের ভূমিকা পালন করছে। রোম তো তবু বর্বর বিজেতাদের জয় করেছিল, যেমন রোমকে জয় করেছিল গ্রীস। যেমন ভারতবর্ষ ও চীন পরিণামে জয় করবে ইউরোপকে—মন দিয়ে।

---

* সেইভার প্রকাশনীর প্রকাশিত সংকলন।

কুমারস্বামীর গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মনের শক্তি এবং মানবজাতির মহিমা ও সুখ-সৌভাগ্যের জন্যে যা কিছু এই মন ধরে রেখেছে – তাই দেখানো।

ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, একই কেন্দ্রীয় চিন্তা থেকে সবগুলো চলতে শুরু করেছে এবং একই ছকে এসে মিলেছে ; এ গুলোয় চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত অধিবিদ্যা, তার বিশ্বজগতের ধারণা, তার সামাজিক সংগঠন,— যা ছিল সেই সময়ের জন্যে ত্রুটিহীন, যা নতুন সময়ের ছন্দে-তালে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতো ; নারীর সমস্যার সে যা উত্তর দিয়েছিল পরিবার, প্রেম, বিবাহ ; এবং তার বিপুল-মহৎ শিল্পকলার উদ্ঘাটন। জটিল ও সুবিন্যস্ত সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দিয়ে, ভারতবর্ষের বিপুল আত্মার মতো, এই একই সার্বভৌম সংশ্লেষের (Synthe'se) মনটি আত্মঘোষণা করছে। কোনো অস্বীকরণ নেই। সমস্ত কিছুই সুসমন্বিত। জীবনের সকল শক্তি শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে আন্দোলিত-সহস্র-বাহু অরণ্যের মতো, যাকে পরিচালনা করছেন নটরাজ রঙ্গেশ্বর। প্রতিটি বস্তুর নিজের স্থান আছে, প্রতিটি সত্তার নিজের কৃত্য আছে, আর দিব্য ঐকতানে, সংশ্লিষ্ট সবকিছু—তাদের বিচিত্র সুর, এমনকি বেসুর দিয়ে সৃষ্টি করেছে, হেরাক্লিডের কথা অনুযায়ী, সুন্দরতম সুবিন্যাস। পাশ্চাত্যে যখন এক কঠিন ও নিরুত্তাপ যুক্তি বি-সদৃশকে পৃথক করে এবং স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট মনের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে তাকে বাছাই ক'রে বন্দী ক'রে রাখে, ভারতবর্ষ তখন বিভিন্ন সত্তার স্বাভাবিক পার্থক্যটি মনে রেখে, তাদের মেলাতে চেষ্টা করে, সামগ্রিক ঐক্যকে তার সম্পূর্ণতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। বিপরীত 'মিথুন' গড়ে তোলে অস্তিত্বের ছন্দ-তাল। আধ্যাত্মিক নির্মলতা যৌন-সম্ভোগের সঙ্গে হাত মেলাতে ভয় পায় না,— অবাধ যৌনতার সঙ্গে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা। (বিস্ময়কর 'সহজ' এরই চূড়ান্ত নমুনা,বিরুদ্ধ মিথুনীকৃত শক্তির প্রতি এক আপাতবিরোধী প্রতিদ্বন্দ্ব ঘোষণা)। শিল্প-কলার মহত্তম সৃষ্টিগুলো সৌন্দর্যের সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন ঘটায়। সর্বত্র সুতীব্র জীবন নিজেকে অভিক্ষেপ করে বহুরূপ ও সম্বন্ধ এক ধারাবর্ষণে। সর্বত্র, একের দৃষ্টি, লক্ষ লক্ষ চোখের গভীরে। এক অমর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন গেয়েছেন :

যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে···
···অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ...

এটা নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষের জীবনের এই সৌধ পুরোপুরি একটি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে - তাই (প্রতিটি বিশ্বাসের মতোই) দাঁড়িয়ে আছে এক ভঙ্গুর ও আবেগদীপ্ত প্রকল্পের (hypothe'se) উপরে। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত বিশ্বাসের মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসই আমার কাছে মনে হয় সেই বিশ্বাস, যা বিশ্বজগতের সবচেয়ে বেশিটুকুই আলিঙ্গন করে।

অন্যদের আমি নিন্দা করছি না। আদিম বৌদ্ধধর্মের ভাবাবিষ্ট বুদ্ধিবাদ (intellectualisme), অথবা অতলের (abime) স্মিতহাস্য প্রশান্তি,– লাওৎসের

মধ্যে যার নিঃশ্বাস নেওয়া যায়, আমার কাছে অন্তহীন প্রিয়; কিন্তু সেখানে আমি দেখি মহিমান্বিত ব্যতিক্রমের কিছু মুহূর্ত, মনের জীবনের মাথা-ঝিমঝিম-করা শিখরচূড়া। এশিয়ার সমস্ত চিন্তার ঊর্ধ্বে যার জন্য আমার ব্রাহ্মণ্য চিন্তার প্রতি ভালবাসা, তা এই যে, আমার কাছে মনে হয় এ সমস্ত কিছুকে ধারণ করে। ইউরোপের চিন্তার চেয়ে এ আধুনিক বিজ্ঞানের বিপুল প্রকল্পগুলোর সঙ্গে ভালো ক'রে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতেও পারে। আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মগুলো বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছে (যখন তাদের পক্ষে অন্যরকম করার আর উপায় ছিল না), হিপ্‌পারকাস ও টলেমির সৌরজগৎ, যাকে তারা অতি শৈশবে দেখেছিল,—তা থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে তাদের কষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য চিন্তার শক্তিশালী ছন্দ-তালে পর্যায়ক্রমে ওঠা ও নামার আন্দোলনের সঙ্গে জীবনগুলোর বক্ররেখার উপরে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দেবার পর, যখন আমি এই শতাব্দীতে ফিরে আসি এবং এখানে আইনস্টাইনের প্রতিভার ফসল সৃষ্টির নতুন উৎপত্তি-তত্ত্বের (cosmogonie nouvelle) বিস্ময়কর প্রয়াস চোখে পড়ে, অথবা তাঁর আবিষ্কার থেকে অবাধে নিঃশ্বাস নিই, তখন এখানে নিজেকে নিঃসঙ্গ অবান্তর মনে করি না। ব্রহ্মাণ্ড-দ্বীপপুঞ্জগুলোর (Univers-Iles) মধ্যে, নীহারিকাচ্ছন্ন ঊর্ধ্ব-কুণ্ডলীগুলো (spirales), অযুত নিযুত ছায়াপথ, লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড—যারা আবর্তিত হয়ে চলেছে বঙ্কিম, অসীম, সীমিত দেশ-কালের পথ ধরে, যাদের নক্ষত্রমণ্ডলের আলোকচ্ছটা অনন্তকাল ধ'রে প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং বিপরীত বিন্দুতে কায়াহীন-মায়ামূর্তিদের, "দ্বৈতদের" আলোকিত করতে পারে—তাদের মধ্যে নক্ষত্রাকার (stellaire) বিপুলতা অতিক্রম ক'রে গ্রহনক্ষত্রের অতলের (l' abime sidéral) গভীর পর্যন্ত মনের পথযাত্রার গতিপথে আমি শুনতে পাই সেই জগতগুলোর মহাজাগতিক ঐকতান তখনও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়, যারা একটার পর একটা আসে, নিভে যায়, আবার জ্বলে ওঠে, সঙ্গে নিয়ে থাকে জীবন্ত আত্মা তাদের মনুষ্যধর্ম, আর তাদের দেবতাগুলো, শাশ্বত 'হয়ে-ওঠা' (Devenir), ব্রাহ্মণ্য 'সংসারের' নিয়ম অনুসারে,—আমি শুনতে পাই শিব নৃত্যরত, তিনি নৃত্যরত জগতের অন্তরে,—আমার অন্তরে…

আমি ইউরোপীয়দের এশিয়ার একটি বিশ্বাসকে মনে প্রাণে সমর্থন করতে বলছি না। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাঁরা এই যাদুকরী ছন্দ-তালে, এই উদার ও মন্দ-মধুর নিঃশ্বাসের দাক্ষিণ্যের শুধুমাত্র স্বাদ নিন। তাতেই তারা বুঝবেন, আজ ইউরোপের (এবং আমেরিকার* !) আত্মার কিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঃ প্রশান্তি, ধৈর্য, পৌরুষময় আশা, অচঞ্চল অনন্দ, "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে…**"

যে পাশ্চাত্য ব্যক্তির ও সমাজের সুখ-সৌভাগ্য জয় করার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায়,

---

* কারণ একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমি যা কিছু লিখি, যে সব জাতি নব-জগতের অধিবাসী হয়েছে, একই ভাবে তারা সব ইউরোপীয় জাতি সম্পর্কেই প্রযুক্ত।

** ভগবদগীতা।

সে জীবনের মিথ্যাচার করে, জীবনকে নষ্ট করে, এবং যে সুখ-সৌভাগ্যের পেছনে সে ছোটে, তার ক্ষিপ্র ত্বরায় তাকে অংকুরেই বিনাস করে। শ্রান্তক্লান্ত যে-ঘোড়া তার চোখ-ঢাকার মধ্যে দিয়ে কেবল তার সামনের অন্ধ পথটাই দেখতে পায়, তেমনি ইউরোপের মানুষের দৃষ্টি তারই মতো তার ব্যক্তিজীবনের সীমার বাইরে, কিংবা তার গোষ্ঠীজীবন : তার দেশ, তার দলের বাইরে কদাচিৎ গিয়ে থাকে। এই অতিক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তার ইচ্ছাশক্তি মানবিক আদর্শের উপলব্ধিকে বন্দী ক'রে রাখে। যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তাকে প্রমান করতে হবে যে, সে তা নিজের চোখে দেখে যাবে, নয়ত (মানবপ্রগতির মন্থরতায় চরম আত্মত্যাগে সম্মত হবে!) তার সন্তানেরা তার ফল ভোগ করবে। এ থেকে এসেছে স্বল্প-মেয়াদে-ধার-করা এবং অনিবার্যভাবে হারানো, নিরন্তর বিক্ষুব্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষা, এইসব পিক্রশলদের* স্বপ্ন, মেসিন-গানের মুখে অথবা গর্দান-নেওয়া হুকুমনামায় মর্তে বাস্তবায়িত সামাজিক স্বর্গ, এই পড়ি-কি-মরি ক'রে ছোটা, আর এই ক্ষীণদৃষ্টি হিংসা। আর, স্বাভাবিক ভাবেই, আশাভঙ্গ হয়, ওরা মনে করে সব হারিয়ে গেলো ; জ্বরতপ্ত উল্লাসের হ্রস্ব পর্বটুকুর পরে আসে হতাশার অসুস্থ বিষণ্ণতার এক দীর্ঘ যুগ।

ব্রাহ্মণ্য মহান্ চিন্তা পেন্ডুলামের এইসব উল্লম্ফন জানে না। সে কোনো যুদ্ধের প্রত্যাশা করে না, কোনো বিপ্লব, বা ঐশ্বরিক করুণামাহাত্ম্য, জগতের কোনো আকস্মিক, অলৌকিক রূপান্তরণ প্রত্যাশা করে না। সে আলিঙ্গন করে বিপুল কল্পগুলোকে (pe'riodes), মানব কালচক্রগুলোকে (cycles d'ages), যাদের পর্যায়ক্রমিক জীবন, কেন্দ্রাভিমুখী বৃত্তে অভিকর্ষিত হয় এবং মন্থর পদে এগিয়ে চলে কেন্দ্রের অভিমুখে মুক্তির নির্দিষ্ট স্থানে—যা আগেই উপলব্ধ হয়েছে পূর্বসূরীদের কোনো কোনো হৃদয়ে। সে বিন্দুমাত্র নিরাশ হয় না। সে বিন্দুমাত্র অধৈর্য হয় না। তার হাতে আছে কাল। পথের উপর আছড়ে পড়লে তার আঘাত লাগে না, কিংবা তাকে ক্রুদ্ধ করে না। ভ্রান্তি তার কাছে পাপ নয়, যৌবন। কালের গোটা চক্রটিকে পূর্ণ হতে হবে। সে তাকিয়ে দেখে চাকা (roue) ঘুরছে, আর তার যে-দৃষ্টি ছাড়িয়ে যায় শুভ ও অশুভের দিগন্তগুলো, সেই অচঞ্চল আলোকদৃষ্টি (lucide) বিচার করে বহমান আত্মার প্রবাহ,—তা দুর্বলের দুর্বলতার প্রতি সদয়, এবং কঠোর শুধুমাত্র সবলের পক্ষে। কারণ এই গর্বিত চিন্তা তাদের কাছেই বেশি দাবি করে, যারা বেশি পারে : আর তার ক্রমোচ্চ বর্ণবিভাগের এই ধারণা, প্রথম দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় এতো অবজ্ঞা ভরে আভিজাত্যমূলক, তা দাঁড়িয়ে আছে এই সমুচ্চ নীতির উপরে (পাশ্চাত্যের অহংসর্বস্ব গণতন্ত্রগুলোর নীতির একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত) যে, কেউ যে-পরিমাণে উঁচুতে উঠবে, সেই পরিমাণেই অধিকার কমবে, কর্তব্য বাড়বে !...তাছাড়া, যতো নীচেই কেউ থাকুক না কেন, প্রত্যেকে উঁচুতে উঠবে, প্রত্যেকেই জানে যে, আজ হোক কি কাল হোক, বক্ররেখার তুঙ্গ

**'পিক্রশল' (Picrochole) 'শার্গাতুয়া'-র (Gargantua) একটি কমিক টাইপ চরিত্র' প্রচণ্ড প্রয়াসে জয়লাভ করলেও, যার জয় অলীক মনে হয় !—অনু.

বিন্দুতে, তার অস্তিত্বগুলোর স্বাভাবিক চক্রাবর্তনের মাধ্যমেই সে তা হতে পারবে, যেখান থেকে, প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে আত্মা কাল ও তার উত্থান-পতন এড়িয়ে যাবে।

এইভাবে সত্তাগুলোর অসীম বৈচিত্র্য এবং বাসনাকামনা সমন্বিত হয় ছন্দতালের সেই অনন্তত্বের সঙ্গে, যা তাদের বাঁধে সেই একই প্রবাহের সঙ্গে, যা এগিয়ে চলে ঐক্যের দিকে।

কিন্তু প্রশ্ন এই নয় যে, মনের এই বিশাল সৌধ পাশ্চাত্যের উপরে তার শিখর-চূড়ায় রক্তচ্ছায়া বিস্তার করবে। না, ব্যাপার এই নয় যে, ইউরোপ এশিয়া হবে। কিন্তু সেও চাইবে না যে, এশিয়া ইউরোপ হবে! সে সম্মান দিতে শিখবে তার বিপুল ব্যক্তিত্বকে, তার ব্যক্তিত্ব যার পরিপূরক; আর অতীতের রূপে এক কৃত্রিম জীবন গড়ে তোলার বাসনা না রেখে (বৃথা স্বপ্ন!), এই দুটি মানব-জগৎ, তাদের প্রতিভাকে মিলিত করে ভবিষ্যতের পথ কেটে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

তরুণ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এশিয়ার সমুচ্চ আদর্শবাদের প্রতি তুলনা ক'রে গ্রন্থের শেষে আনন্দ কুমারস্বামী উদার স্পর্ধায় এই আশাই ব্যক্ত করেছেন:

"তরুণ ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শবাদীদের জাতীয়তাবাদে মন ভরে না। দেশ-প্রেম এক সংকীর্ণ স্বার্থ...উন্নততর মনদের সুন্দরতর ভূমিকা পূর্ণ করতে হবে... জীবন—কেবল ভারতবর্ষের জীবন মোটেই নয়,—আমাদের অনুগত্য দাবি করে।... মানবতার ফুলে-ফলে সমৃদ্ধির মূল্য আমাদের কাছে একটি দলের জয়ের চেয়ে বেশি... ভবিষ্যতের বাছাই-করা মানুষের একটা জাতি বা একটা কুল (race) হতে পারেন না, তাঁরা এই পৃথিবীর অভিজাতবর্গ, তাঁরা ইউরোপের কর্মের প্রাণশক্তিকে এশিয়ার চিন্তার প্রশান্তির সঙ্গে মেলাবেন*..."

ভারতবর্ষের এই বাড়িয়ে-দেওয়া হাতখানি আমাদের ধরতে হবে। আমাদের স্বার্থও একই: মানব ঐক্য ও তার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যকে বাঁচাতে হবে। ইউরোপ, এশিয়া, আমাদের শক্তিগুলো বিবিধ বিচিত্র। মহত্তম সভ্যতা, মানব প্রতিভার সমগ্র যৌথ কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ করার জন্যে তাদের এক করতে হবে। এশিয়া, আমাদের শেখাও তোমার সবকিছু, তোমার বাঁচার প্রজ্ঞা! আমাদের কাছ থেকে শেখো সক্রিয় হতে!

পারী, জানুয়ারি, ১৯২২ রম্যাঁ রলাঁ

---

* এই শেষ বাক্যটিতে আমার দুটি প্রবন্ধ: 'ফ্রাতেরনিতে এ্যাঁতেলেক্‌চুয়েল' ও 'ল্যা জান এ্যাঁদ-র' দুটি বাক্যে মিশিয়ে দিয়েছি।

৮.

'ওয়ার্ডস অফ দ্য মাষ্টার' গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থটি শুধু একটি শিক্ষা-প্রণালী, এটি একটি জীবন্ত মানুষ। এই সরল হিন্দু গুরুটির,—যাঁর কণ্ঠস্বর শ্রীমতী ই, ভন পেলেট পাশ্চাত্যের জন্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন,—বলার অভ্যাস ছিল যে, প্রচার নয়, বাঁচাতে হবে এবং এই এক সত্যজীবনের দৃষ্টান্তের মধ্যেই এক সত্য-শিক্ষার সন্ধান মেলে। এই জন্যেই তাঁর শিষ্যদের শুভেচ্ছা জেগেছিল, আবার আলাপচারীর প্রতিফলনের মধ্যে তাঁর মূর্তিটি আমাদের জন্যে অবিকৃত ধ'রে রাখা। যিনি তাঁর কথাগুলো পড়বেন, তিনি তাঁর অনুপ্রাণিত মধুর স্মিত হাসির, তাঁর বাচন-ভঙ্গির কোমল ও চতুর স্বাভাবিক মাধুর্যের এবং প্রেমের সেই উজ্জ্বল, উষ্ণ সূর্যালোক, যা তাঁর সকল চিন্তাকে আবৃত করেছে—তাঁর দাক্ষিণ্যের স্বাদ পাবেন…যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাঁর সবকিছু ভালবাসাকে ভালো বাসো। কারণ যার অস্তিত্ব আছে, তার সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা যায় · রামকৃষ্ণ থেকে যে প্রজ্ঞা বিকীরিত হয়েছিল, তার সমস্ত কিছুর মধ্যে এইটেই প্রথম ও শেষ কথা। প্রত্যাখানের কিছুই নেই, সব কিছুকে আলিঙ্গন করতে হবে ··

এ আমাদের কাছে কোনো অন্ধ-বিশ্বাস (Credo), নিয়ে আসে না, বরং নিয়ে আসে অশেষ গুণে বেশি ঃ সমস্ত বিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সৌভ্রাত্রপূর্ণ এক ভালবাসা ঃ তারা সকলেই সহোদর…

আর ঠিক এইজন্যেই, সংকীর্ণ ও স্বৈরাচারী মতবাদগুলোর গর্বোদ্ধত দুরহঙ্কার (pre'tentions), যাদের নিজস্ব একচেটিয়াত্ব প্রত্যেক জগতের উপরে চাপিয়ে দিতে চায়,—তাদের মধ্যে প'ড়ে আমাদের ছিন্নভিন্ন ইউরোপের এইটিরই বেশি প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণের ঐতিহ্য যিনি পরিচালনা করেন, সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ, যাঁকে তাঁর গুরু-সম্পর্কিত আমার হালের বইটি পাঠিয়েছি, আমাকে উত্তরে লিখেছেন ঃ

"আমি আশা করি যে, আপনার কাজটি খ্রীস্টানকে খাঁটি খ্রীষ্টান হতে, হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু হতে, মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান হতে সাহায্য করবে !" (আমি যোগ করি ঃ "স্বাধীন-চিন্তাশীলদের খাঁটি স্বাধীন-চিন্তাশীল হতে।") "এ আমাদের যেন সেই পথ দেখাতে পারে, যে-পথ ধ'রে আমাদের চলতে হবে—এইটি জানার জন্যে যে, আমরা সকলেই একই পিতার সন্তান !'

এইটিই রামকৃষ্ণের চিন্তার অনুগত ভাব ! সামঞ্জস্য ঃ এই একটি কথাতেই সবটুকু প্রকাশ হয়।…সকল চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য—শাশ্বত ঐক্যের ও শাশ্বত 'হয়ে ওঠার' (Deve'nir) সামঞ্জস্য – সামঞ্জস্য প্রতিটি জীবন্তের।

বর্তমান যুগ এ থেকে বড়োই দূরে !

এইতো অরফিউস থ্রেসের মরুভূমিতে তাঁর পবিত্র সঙ্গীত যেন খেঁকশেয়াল আর নেকড়েদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে !

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ রমাঁ রলাঁ*

৯.

জাঁ এরবেরকে লেখা দু'টি চিঠি

ক.

ভিলন্যভ (ভো), ভিলা অলগা,
ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি আনন্দিত যে, আপনার যত্নে, বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ বাণী ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সংকটের এই বহুপ্রসূ অথচ বেদনাকরুণ যুগে তাকে তার অনেক কিছু দেবার আছে। এ-যুগের বহু উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার এ উত্তর দেয়।

সব কিছুর আগে, এ যুক্তিতে বিশ্বাস আনে। এ সেইসব ধর্মীয় চিন্তা নয়, আলোয় চোখ মিটমিট ক'রে, যারা 'বিশ্বাসে মিলয়ে···তর্কে বহুদূর' (Credo quia absurdum)—এর মধ্যে আশ্রয় নেয়। এ হচ্ছে মানব মনের ঋজুতা ও শক্তির বিশ্বাস···

'মানুষের মহিমা তার চিন্তার মধ্যে।'

তাছাড়া, এর এই ঔদার্য আছে যে, সত্যের সন্ধানের বিচিত্র-বিবিধ রূপের কোনোটিকেই এ বাতিল করে না। এ সকলকে স্বীকার করে এবং তাদের ভ্রাতৃত্বভরে আলিঙ্গন করে। এ মনের এক বিশ্বজনীনতা, যার মধ্যে মিলেমিশে ও সহযোগী হয়ে থাকে বিজ্ঞান ও ধর্ম : আন্তরিক ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরদর্শী। এর একমাত্র শত্রু অসহিষ্ণুতা।

আমাদের মানুষকে যেসব যুগের সমস্যা উত্তেজিত ও বিভক্ত করছে, তার একটির ক্ষেত্রে এ প্রত্যাশিত উত্তর : সে-সমস্যাটি সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individualism) প্রশ্ন ! 'মানুষের যথার্থ" প্রকৃতি' (The Real Nature of Man) আবার পড়তে পড়তে মুগ্ধ প্রশংসা করেছিলাম। ভারতীয় ভবিষ্যদ্বক্তার স্বতঃলব্ধজ্ঞান, অজান্তেই কেমন ক'রে কমিউনিজমের মহান্ ব্যাখ্যাতাদের

---

* এটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল 'ওয়ার্ডস অফ দ্য মাষ্টার' গ্রন্থে শ্রীমতি ই. ভন পেলেটের অনূদিত জার্মান সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে। একই গ্রন্থের ('লাঁসেইঞ্যমাঁ দ্য রামকৃষ্ণ',—আলবাঁ মিশেল প্রকাশিত) ফরাসী সংস্করণে জাঁ এরবের রমাঁ রলাঁর অনুমতি নিয়ে এটি কাজে লাগিয়েছেন।

পৌরুষব্যঞ্জক যুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে :—মার্ক্স ও লেনিন বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণীটি দাবি করতে পারতেন :

— 'একমাত্র সেই বাঁচে, যে সকলের মধ্যে বাঁচে।'

এঁরা দু'পক্ষই যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে লড়েন, তা লড়েন বড়ো-ক'রে-তোলা ব্যক্তিস্বরূপের (individualité) নামে। বিবেকানন্দ বলেছেন :

'যখন পরমের কথা বলা হয়, লোকে আতংকিত হয়। তারা জিজ্ঞাসা করে : "কিন্তু আমার ব্যক্তিস্বরূপের কি পরিণাম হবে?' তাদের ব্যক্তিস্বরূপ বস্তুটি তাহলে কী? সেটা দেখতে চাই···ব্যক্তিস্বরূপ ব'লে কিছুই নেই···আমরা কেউ এখনো ব্যক্তি নই। আমরা ব্যক্তিস্বরূপের দিকে যাবার প্রয়াস করি।—আর সেটা, এই পরম, এ-ই আমাদের যথার্থ প্রকৃতি। সে-ই একমাত্র বাঁচে, যে সবকিছুর মধ্যে বাঁচে··· তারাই আমাদের সত্য-জীবনের একমাত্র মুহূর্ত যখন আমরা বাঁচি অন্যের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে···'

মহান স্বামী নিজের মধ্যে, মানুষ ও পরম সত্তার আলাপন উপলব্ধি করেছেন, বিশ্বজনীন ঐক্যে—সত্যে, যা বাঁচে এবং যা সক্রিয় হয় :

"···সত্য! তারই সঙ্গে যেন এক হই!

কিংবা, তা যদি না পারো, তবে সেই সব স্বপ্ন দেখো, যারা তার কাছে এগিয়ে যায় :

যারা অনন্ত প্রেম এবং নিঃশর্ত সেবা!"

রমঁ্যা রলাঁ*

খ.

ভিলন্যভ, ভিলা অলগা, ২০ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় মঁ. জাঁ এরবের,

আপনার চিঠি যখন পাই আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিছানায় শুয়ে, তার সঙ্গে ভীষণ জ্বর। সমস্ত কাজকর্ম নিষিদ্ধ। আপনার চমৎকার অনুবাদটি নতুন ক'রে লিখে দেওয়ার (retranscire) জন্যে, তবুও জ্বরের দাপট কমা-বাড়ার মাঝখানের একটা সুযোগ নিয়েছি; আপনার অনুবাদ খুব সামান্যই পালটাতে হয়েছে। আর একাজ শেষ হবার পরই আমি দেখতে পেলাম, আপনি যেন চাইছেন, আমি ১৯৩৬ সালের ফরাসী সংস্করণের পাঠটি গ্রহণ করি। এখন নতুন ক'রে কপি-করা শুরু করতে পারার পক্ষে আমি বড়োই শ্রান্ত।

আরও বলছি, ১৯৩০ সাল থেকে আমার চিন্তার বিবর্তন হয়েছে; আমাকে সামাজিক কর্মে নামতে হয়েছিল : এটা ছিল আমার নৈতিক প্রয়োজন। আর,

---

* 'জ্ঞান-যোগ' শিরোনামায় 'স্পিরিতুয়ালিতে ভিভাঁত'—সিরিজে প্রকাশিত (আলবাঁ মিশেল প্রকাশনী)।

আমার মনের এলাকাটি, যেখানে আমি সবকিছু বুঝতে এবং সবকিছু আলিঙ্গন করতে প্রয়াস করি, যদি যথেষ্ট বজায় রেখে থাকি, কর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু, 'কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান না-করা' এবং 'যা কিছু আছে, তাদের সব কিছুকে ভালো বাসা" অসম্ভব ঃ যা কিছু অমঙ্গলকর তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সামাজিক জীবনের সমুন্নতিতে যা কিছু বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাই সংশোধন না ক'রে ১৯৩০ সালের লেখাটি আবার ১৯৩৬ সালের উপযোগী নতুন ক'রে লিখতে আমি পারবে না।

রামকৃষ্ণপন্থী বিষয়—যা আমার আজকের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তা ঃ 'জীবই শিব'; এটি লিখেছি রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবং রামকৃষ্ণ-মিশন তাঁদের শতবার্ষিকী-গ্রন্থে এটি প্রকাশ করেছেন।

আমি তাই আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, ১৯৩০ সালের তারিখসহ শ্রীমতী ই. ভন পেলেটের গ্রন্থের আমার ভূমিকাটি ছাপবেন। নয়তো আপনি যে ভূমিকা লিখবেন তাতে এর অংশ ব্যবহার করতে পারেন।

কৈফিয়ৎ অল্প কথায় দিলাম ব'লে ক্ষমা করবেন এবং আপনার প্রতি হার্দভাবে অনুরক্ত আছি ব'লেই জানবেন।

রম্যাঁ রলাঁ

১০.

"জীবই শিব"

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে ফ্রান্সের এক তীর্থযাত্রীর অর্ঘ

(রামকৃষ্ণের জন্ম-শতবর্ষ, ১৯৩৬-৩৭, উপলক্ষে)

কাহিনী আছে, অভেদের বক্ষে পরম সমাধির প্রথম দিনগুলোর পর,—ঘটনাটি তোতাপুরীর প্রস্থানের পর -, রামকৃষ্ণ যখন তাঁর চৈতনাকে মর্ত ধরণীতে ফিরে আসতে দিয়েছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন দু'টি মাঝি ঘৃণাভরে কলহ করছে। এই ঘৃণায়, এক ক্ষতের মতোই, তাঁর হৃদয়ে রক্ত ঝরেছিল, আর তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন ঃ বিশ্বজগতের যন্ত্রণা তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল। কারণ তাঁর নবজাত চৈতন্যের অতি-কোমল ত্বকে জগতের সমস্ত বেদনা খোদাই হয়ে গিয়েছিল।

যখন মনে হচ্ছে সমগ্র মানবতা ঘৃণায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যখন জাতিতে জাতিতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে কিংবা সে-আগুন ছাই-চাপা পড়ে রয়েছে,—বর্তমান জগতের এই দিনগুলোয় তিনি তখন কী অনুভব করতেন, কী যন্ত্রণা ভোগ করতেন? কিন্তু পরমহংসের দুটি ডানা ছিল, তাদের উপরে

ভব দিয়ে তিনি জীবনের উর্ধ্বে ভেসে বেড়াতে পারতেন। যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্যে, আরও সব অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতো যদি তিনি এ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে থাকেন, তা করেননি এইজন্যে যে, বিশ্বজনীন প্রেম, যা তাঁর কাছে ছিল দ্বিতীয় দৃষ্টি, তাই মানুষের দুঃখদুর্দশার সামনে, তাঁর কাছে এক বিদ্যুৎ ঝলকে উদ্ভাসিত করেছিল যে, 'জীবই শিব', জীবন্ত সত্তাই ঈশ্বর,—যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাকে এই যন্ত্রণা, দুঃখদুর্দশার মধ্যে, এমনকি এই ভুলভ্রান্তি ও স্খলন-পতনের মধ্যে মানবস্বভাবের এই 'ভয়ংকরের' মধ্যে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

আমরা সবাই জানি, তিনি তাঁর মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দকে অতল-স্পর্শী ঈশ্বরের (Dieu-Abime) মোহ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, তাঁকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে। আর তাঁকে অনুসরণ ক'রে তাই সিদ্ধ করতে শিখেছেন আপনারা; আপনাদের রামকৃষ্ণ মিশন, আপনাদের প্রতীক-চিহ্নের হংসের মতোই, হতভাগ্যদের ডানা দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছে, ভ্রাতৃত্বভরে তাদের সেবা করছে। আপনারা আপনাদের গুরুর গভীর বাণীকে রক্ষা ক'রে চলেছেন।

যদি মনের শান্তি চাও, তবে অপরকে সেবা করো! যদি ঈশ্বরকে পেতে চাও, মানুষকে সেবা করো!...

এতো সব ধর্মের দুর্বলতা ও সর্বনাশ ঘটেছে এইজন্যে যে, তারা এইটি ভুলে গেছে। তারা মানুষকে ভুলে গেছে।—আর তার দিক থেকে মানুষও তাদেব ভুলে গেছে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই সে নিজেকে সাহায্য করতে শিখেছে (যারা ঈশ্বরকে ডেকে মরতো, তাদের যেমনটি বলতেন আমাদের ইউরোপের শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম অতি-ধার্মিক বিঠোভেন: 'ওরে মানুষ, নিজেই নিজেকে সাহায্য কর!') ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও সে নিজেকে সাহায্য করতে শিখেছে, যখন সে ঈশ্বরকে এইসব খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম ক'রে ফেলেছে, যে খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়গুলো বহু বহু ক্ষেত্রেই, নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার মোসায়েব এবং সেবাদাস। ইতিহাসের গতিপথে, বহু বহু ক্ষেত্রে অতীতে ও বর্তমানে, খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়গুলোর নেতাদের নিয়ম ছিল ও নিয়ম আছে, যে-ক্ষমতা বিজয়ী হবে, সেই ক্ষমতার পাশে গিয়ে তারা ভিড়বে: এইভাবেই শক্তির বলে, প্রতিষ্ঠিত অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে তারা নিজেদের জড়িয়েছে। মানুষেরা যখন অন্যায়-অবিচারের শক্তি—এই যে শক্তি থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে চায়—তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে তাই খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়গুলোর অবাক হবার কিছু নেই। এই সমুত্থিত মানুষ,—নিজেদের ঈশ্বর-বর্জিত কিংবা ঈশ্বর-বিরোধী মনে করলেও, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে, তাদের আলোর উর্ধ্বাভিযানে, না জেনেও তারা অবশ্যই জীবন্ত ঈশ্বর···'জীবই শিব!' আর, এইটিই আমাদের চিনতে হবে।

আমরা আজ এক বিপর্যস্ত জগতে। আর বাস্তবিকই জনসাধারণ চিরকাল নিপীড়িত হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনের আগে পর্যন্ত এই বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন সম্পর্কে তাদের পরিচয় ও চেতন ছিল না, যা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান মাধ্যমগুলো এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের অগ্রগতি। আজ যাঁরা

তাদের শেকল ছেঁড়ার জন্যে, আরও বেশি বেশি ন্যায়সঙ্গত ও আরও বেশি মানবিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে, মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেইসব মানুষ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারি না। আর তা বিশেষ ক'রে পারি না আমরা, আপনাদের পশ্চিমের বন্ধুরা, যাদের আপনাদের মতো "মরণোত্তর জীবনের" (survivances) বিশ্বাস নেই। সময় আমাদের তাড়া দিচ্ছে। কোটালের বানের মতো মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার স্রোত আমাদের ডুবিয়ে মারছে। তাদের বাঁচাতে আমাদের ছুটে যেতে হবে। যদি আমাদের সামনে "মরণোত্তর জীবনও" থাকতো, তাহলেও তারা প্রত্যেকেই একটি ক'রে "জীবন্ত বস্তু" (vivance), যে-বিশেষ সময়ে সে জন্মেছে এবং যে-মানব-পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, তাদের প্রতি তার নিজের যথোপযুক্ত কর্তব্য ও নিয়ম-নীতি আছে। যতটুকু সে পারে তার সবটুকু বর্তমান মঙ্গল না-করলে তার চলবে না, তার আজকের সমস্ত শক্তি দিয়ে আজকের সমস্ত অন্যায়-পরায়ণতার বিরুদ্ধতা না-করলেও তার চলবে না। পশ্চিমের রামকৃষ্ণপন্থী আমি, আমি স্বীকার করবো না যে, নিপীড়িতদের বাঁচাবার জন্যে যখন সক্রিয় হওয়াটা জরুরি, তখন নিজের মুক্তির জন্যে কেউ কর্ম থেকে বিদায় নিতে পারে। আমি আবার স্মরণ করবো মহান্ শিষ্যের সেই পবিত্র ক্রুদ্ধ বাণী, ঈশ্বরের মধুর স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান জগতের বেদনাকরুণ পরিণাম এড়াতে তাঁর এক ভ্রাতা চেষ্টা করলে, তিনি যা উচ্চারণ করেছিলেন :

"বেদান্ত পড়া, ধ্যানের অভ্যাস পরের জন্মের জন্যে রেখে দাও। অপরের সেবার জন্যে আজকের এই দেহ উৎসর্গ হোক!"

"···আমি যেন বারংবার জন্ম নিই এবং সহস্র দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করি, যাতে আমি সেই একমাত্র ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারি, যিনি বর্তমান আছেন,—সেই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি আমার বিশ্বাস,—যিনি সমস্ত সত্তার যোগফল,—সর্বোপরি, যিনি আমার দুষ্কৃতিকারী-ঈশ্বর, যিনি আমার আর্তপীড়িত-ঈশ্বর, যিনি আমার সমস্ত জাতির সমস্ত প্রজাতির দরিদ্র-ঈশ্বর!"

হায়রে! ধার্মিক ঈশ্বর-প্রেমিকদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ, বিশ্বাসের কী ভ্রান্তি যে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে সংবাদে তাদের প্রেম হ্রাস পাবে, তাদের সত্তা খর্ব হবে! চিরকাল অভিযাত্রী গঙ্গার মতো, চিরকাল গতিমান লক্ষ লক্ষ রূপের সঙ্গে অসংখ্য সত্তাকে, সমগ্র সত্তাকে আলিঙ্গন ক'রে তা, তার বিপরীত, নবজীবনই লাভ করবে বৃহত্তর হবে।

এইভাবে তার সঙ্গে পরিণীত হয়ে, আপনারা জীবন্ত ভগবানের প্রতিটি রূপের সেবা করবেন। কিন্তু কখনো সেই অনুভূতি এবং সেই সর্বশক্তিমান 'একত্বে' উপস্থিতি ভুলে যাবেন না যার মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ স্পন্দরত রূপ সমন্বিত হয়। যে অপরিবর্তনীয় শান্তি অস্তিত্বের ঝড়ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে সঞ্চরণ করে, সেই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে যারা যুঝে মরছে, তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা সেই শান্তির ক্ষতি করে না। সন্ন্যাসীদের বিবেকানন্দ একথা বারবার বলতে বিরত হতেন না যে, তাঁরা যে-দুটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তার প্রথমটি যদি হয় "সত্যকে উপলব্ধি করা," দ্বিতীয়টি "জগতকে সাহায্য করা"। "মানুষকে একাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে

হবে।" আমরা তাই তাদের সাহায্য করবো, যারা "একা একাই' বীরের মতো "নিজেদের পারে দাঁড়াতে" চেষ্টা করছে। তাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবো। এমনকি এই একই ভাবে পরে শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলোর সমন্বয়ে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন জগতে আপনারাই পরম সমন্বয়ের বাহক, যে সমন্বয়ের মধ্যে লড়াই ও বিরুদ্ধ প্রচেষ্টাগুলোকে মিলে-মিশে যেতে হবে। যে বিশৃংখলার মধ্যে মানুষ অন্ধের মতো ধাক্কাধাক্কি করছে, সেখানে শান্তি, শৃংখলা ও ঐক্য বিকিরণ করাটাই আপনাদের নিজস্ব ভূমিকা, আপনাদের বিশেষ অধিকার এবং আপনাদের পবিত্র কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই আপনারা হয়ে উঠুন সেই বিরাট বটবৃক্ষ, সংগ্রামে শ্রান্তক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত লক্ষ লক্ষ হৃদয় যার ছায়ায় আশ্রয় নিতে, শান্ত হতে আসছে! তাদের সমন্বয়ের সেই মধুক্ষরণ করুণ, যা মুক্তির ফল, যা প্রেমের ফলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমারা ভালো ক'রেই জানি যে, যারা পথভ্রষ্ট তারাই সবচেয়ে দুঃশীল। তারা কী করে, তা তারা, জানে না। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত মানুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন এক কাপুরুষোচিত আক্রমণে আহত হলে বুদ্ধিদীপ্ত স্মিতহাস্যে বন্ধুদের প্রতিশোধস্পৃহা শান্ত করেছিলেন এই কথা ব'লে : "কী করবে বলো! যে যেভাবে বোঝে, সে সেইভাবে কাজ করে!"

যা সে জানে না, তা থেকেই জগতের দুর্দৈব আসে। তাকে তা জানতে শেখাতে হবে! তা আলোকোদ্ভাসিত করতে হবে। কারণ যে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, সে জানে না যে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। আমাদের ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর এক মানুষ, প্রবুদ্ধ কবি ভিক্তর্ উ্যগো, যারা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাদের এই কথাটি বলেছিলেন, যা ভারতীয় প্রজ্ঞার এতো সগোত্র : "ওরে মূঢ়, তুমি ভাবো যে, তুমি আমি নও!"

রামকৃষ্ণের পরম অলৌকিকত্বই এই যে, তাঁর মধ্যে "তুমিই" হচ্ছে "আমি," সমগ্র জগৎ কেবলমাত্র নিজেকেই প্রতিফলিত করে না, মানুষের এক হৃদয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, মাটির পৃথিবীতেই ঈশ্বর নিজের বিশ্বজনীনতা, এবং নিজের বহুত্বের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করেন · "জীবই শিব"···আর রামকৃষ্ণ নিজের মধ্যে আমাদের মধ্যে—ঘটিয়ে দেন এই দিব্য অভেদকে!

রম্যাঁ রলাঁ

১৯৩৭ সালের 'আকসিঅঁ এ পাসেঁ' পত্রিকায় (জেনেভা) ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত।

রম্যাঁ রলাঁর জীবন ও কর্মের কাল-পঞ্জী

১৮৬৬ :—জন্ম ২৯ জানুয়ারি ক্লামসি নেয়েভ্র)। শিশুকাল থেকেই দুর্বল স্বাস্থ্য।

১৮৭২ : মাদলিন রলাঁর জন্ম।

১৮৭২—১৮৮০ :—কলেজ দ্য ক্লামসিতে (বর্তমানে কলেজ দ্য রম্যাঁ রলাঁ) শিক্ষার প্রথম পর্ব।

১৮৮০—১৮৮২ :—উচ্চশিক্ষার জন্যে বাবা-মার সঙ্গে পারী আগমন। সাঁ-লুই বিদ্যালয়ে শিক্ষা। ১৮৮২—স্বাস্থ্যের জন্যে সুইজারল্যান্ডে হাওয়া বদল।

১৮৮২—১৮৮৩ :—একল্ নর্মাল স্যুপেরিয়্যরে প্রবেশের উপযুক্ত হবার জন্যে লুই-লা-গ্রাঁ বিদ্যালয়ে ভর্তি। মায়ের বান্ধবী সংগীতজ্ঞা মাদাম মাতঁ্যার বাড়িতে যাবার পথে ভিলন্যভে ভিক্তর্ উগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'বৃদ্ধ অর্ফিউস' উগো কিশোর রলাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেন।

১৮৮৩—১৮৮৬—দু'বার ফেল : ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ ("সেক্সপিয়র ও উগো পড়ে যে সময় নষ্ট করেছিলাম, তা জীবনে যোগ হয়েছে।")—সহপাঠী ক্লোদেলের সঙ্গে ভাগনার শুনে বেড়াতেন। ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে একল্ নর্মাল স্যুপেরিয়্যরে ভর্তি।

১৮৮৬—১৮৮৯—প্রথম বছরের শিক্ষকরা : ব্রুনেতিয়ের, জে বোয়াসিয়ে, অলে-লাপ্রান্ প্রভৃতি। রনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। দ্বিতীয় বছরে দর্শন ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসের ছাত্র। শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেন : "গ্যুইরো, গাব্রিয়েল মন এবং ভিদাল-লাবলাসের মতো শিক্ষকদের সৎ শিক্ষা আমাদের সত্যের সন্ধানে কঠোর কর্তব্য শিখিয়েছে।" স্যুয়ারেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ১৮৮৭ সালের হুইট-সানডে-য় তলস্তয়কে চিঠি, সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় চিঠির পর ২১ অক্টোবর তলস্তয়ের উত্তর।

১৮৮৯ : ইতিহাসের ডিগ্রি লাভ। "এইসব পরীক্ষাকে এতো ঘেন্না করি!")—রোমের একল ফ্রঁসেইজের সদস্য।

১৮৮৯—১৮৯১ : পালেই ফার্নেজ-এ অবস্থিতি। ভাটিকানের মহাফেজ খানায় গবেষণা। ফ্লোরেন্স, সিয়েনে, সিসিলির যাদুঘরগুলো পরিদর্শন। বৃদ্ধা মালভিদা ভন মেইজেনবাগের সঙ্গে শিক্ষক মন-র কল্যাণে সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গতা। প্রথম নাটক রচনা : 'অরসিনো' (১৮৯০)—অপ্রকাশিত। ইতালিতেই 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর কল্পনা। বেইরুট ভ্রমণ। জুলাই মাসে পারী প্রত্যাবর্তন।

১৮৯১—১৮৯২ : কার্সকায় শিক্ষকের পদলাভ। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে যোগ দিতে অপারগ। ১৮৯২, অক্টোবরে কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রাচীন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মিশেল ব্রেআলের কন্যা ক্লতিল্দ্ ব্রেআলের সঙ্গে বিবাহ। ১৮৯২ সালের ইস্টার পর্যন্ত রোমে বাস। পারী ফিরে গবেষণা পেশ।

১৮৯৫ ঃ—ডি. লিট. ডিগ্রি। গবেষণা-প্রবন্ধ পরীক্ষক ঃ ইমুলি, লারুমে, সে-এই, লমঁনিয়ে, জেবার্ এবং দেজব্। বিষয় ঃ 'আধুনিক থিয়েটারের উৎপত্তি ঃ লুল্লি ও স্কারল্যাত্তি-পূর্ব অপেরার ইতিহাস'। মন্তব্য ঃ 'ত্রে অনরাবল্'। একল্ নর্মাল স্যুপেরিয়রের শিল্পের ইতিহাসের অধ্যাপক।

১৮৯৫—১৮৯৭ ঃ—নাটক রচনা ঃ 'স্যাঁ লুই' (১৮৯৫-৯৭); 'জাঁ দ্য পিআন' (১৮৯৬)—অপ্রকাশিত।

১৮৯৭ ঃ—রচনা ঃ 'আয়ের' (প্রকাশ—১৮৯৮); ১৮৯৮ সালে অভিনীত।

১৮৯৮ ঃ—'লে লু' 'মরিত্যুরি' নামে অভিনীত, শার্ল পেগ্যীকে উৎসর্গ, 'বিপ্লব চক্র' নাটকমালার প্রথম নাটক ("১৫ দিনে দ্রেফ্যু মামলার উত্তেজনার ঘোরে লেখা।") এল স্যাঁ জুস্ত ছদ্মনামে প্রকাশিত।

১৮৯৮—১৯০৪ ঃ 'ল্য তেআতর দ্যু প্যপল্' (১৯০৩); 'ত্রিঅঁফ দ্য লা রেজঁ" (১৮৯৯); 'দাঁতঁ,' (১৯০০); 'ল্য ১৪ জ্যুইয়ে' (১৯০২); 'লা তঁ ভিঅঁদ্রা (১৯০৩)।

১৯০১ ঃ—বিবাহবিচ্ছেদ ঃ ফেব্রুয়ারি। ("যাকে ভালো বেসেছি, যাকে এখনো ভালো বাসি, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো কারণ আমাদের দুটি জীবন কেউ কারুর জন্যে ত্যাগ করতে চায়নি, দুটিই গিয়েছে দুই বিপরীত লক্ষ্যে।")

১৯০১—১৯০৪ ঃ—একল্ দেজোংজেত্যুদ সোসিআলে সংগীতের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতা।

১৯০৩ ঃ—পেগ্যার 'কাইয়ে দ্য লা ক্যাঁজেইন'-এ 'লা ভী দা বেতভ্যাঁ' প্রকাশ।

১৯০৪ ঃ—সরবনে সঙ্গীতের ইতিহাসের অধ্যাপক।

১৯০৪—১৯১২ ঃ—'জাঁ-ক্রিসতফ' রচনা ও প্রকাশ শুরু।

১৯০৪—১ম খণ্ড 'ওব্'; ২য় খণ্ড 'ল্য মাত্যাঁ'; ১৯০৫—৩য় খণ্ড 'লাদলেসসাঁ'; ১৯০৬—৪র্থ খণ্ড 'লা রেভল্ৎ'; ১৯০৮—৫ম খণ্ড 'লা ফোয়ার স্যুর লা প্লাস'; ৬ষ্ঠ খণ্ড 'আঁতোয়ানেৎ'; ১৯০৯—৭ম খণ্ড 'দাঁ লা মেজঁ"; ১৯১১—৮ম খণ্ড 'লেজামি'; ৯ম খণ্ড 'লা ব্যুইসনারদাঁ'; ১৯১২—১০ম খণ্ড 'লা নুভেল জুর্নে" ।

এই সময়ের মধ্যে রচনা ঃ 'মিশেলাঁজ', (১৯০৫), 'আয়েন্দেল' (১৯০৮), ভী দ্য তলস্তয়' (১৯১১)।

১৯১০ ঃ—রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা। ('ভাঙা জোড়া লাগেনি।') বাঁ-হাত ও বাঁ-পা চিরকালের জন্যে প্রায়-অকেজো। মামলায় জিতে ক্ষতিপূরণ পান ২৫,০০০ ফ্রাঁ।

১৯১২ ঃ—জুলাই মাসে সরবন থেকে পদত্যাগ ও সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ।

১৯১৩ ঃ—সুইজারল্যান্ডে অবস্থিতি (ভেভে, স্পিয়েজ, স্কোয়েন-ব্রুন)। উপন্যাস ঃ 'কলা ব্রাঞঁন"। আকাদেমি ফ্রঁসেইজের সাহিত্যের 'গ্রাঁ পি' লাভ।

১৯১৪ ঃ—বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা।—২ সেপ্টেম্বর জার্মানদের লুভ্যাঁ ধ্বংসের প্রতিবাদে গেরহার্ড হাউপ্টমানকে খোলা চিঠি; 'ও দেস্যু দ্য লা মেলে' (সংকলন প্রকাশ—১৯১৫)।

১৯১৫ :—জানুয়ারি—রুশ বলশেভিক নেতা আনাতোল লুনাচারস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ। জুলাই পর্যন্ত রেড-ক্রশের অধীনে ডাঃ ফেরিয়েরের যুদ্ধবন্দীদের আন্তর্জাতিক সাহায্য-প্রতিষ্ঠানে কাজ।

১৯১৬ :—আঁরি গ্যীলবোর 'দেম্যাঁ' প্রকাশে সহযোগিতা এবং ১৯১৮, অক্টোবর পর্যন্ত তাতে রচনা প্রকাশ (সংকলন 'লে প্রেক্যুরসর' প্রকাশ—১৯১৯)। ১০ নভেম্বর নোবেল পুরস্কার। পুরস্কার লাভের সমস্ত অর্থ রেডক্রশকে দান।

১৯১৭ : ১ মে রুশবিপ্লবকে অভিনন্দন : 'মুক্ত ও মুক্তিদাতা রাশিয়ার উদ্দেশে'।

১৯১৮ :—১৫ মার্চ : 'মনের আন্তর্জাতিকের জন্যে' ; ১৬ এপ্রিল ; 'আঁপেদক্ল দাগ্রিজাঁং' রচনা শেষ ও 'লিলুলি' ও 'ক্লেরাঁবো রচনা শুরু।

১৯১৯ :—৪ মে মায়ের গুরুতর অসুখের জন্যে ফ্রান্সে আগমন ('আমার যা কিছু ভালো— সংগীত ও বিশ্বাস— তার জন্যে মায়ের কাছে ঋণী।")

২৩ জুন ভের্সাই চুক্তি ('বেদনাকর চুক্তি। মানুষের দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যেকার হাসির জন্যে বিরতিপর্ব।')

২৬ জুন—ইস্তাহার 'মনের স্বাধীনতার ঘোষণা', 'ল্যুমানিতে'-র প্রকাশিত এবং বিশ্বের প্রায় সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবী (রবীন্দ্রনাথসহ) স্বাক্ষরিত।

২৬ আগস্ট রবীন্দ্রনাথকে চিঠি।

১৯২০ :—'পিয়ের এ লুস'।

১৯২১—১৯২২ :—বারব্যুসের 'ক্লাতে' গোষ্ঠীর সঙ্গে বিতর্ক।

১৯২১, ১৯ এপ্রিল—পারীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ১৯২১, ৩০ এপ্রিল সুইজারল্যান্ড যাত্রা। বাবা ও বোনকে নিয়ে স্থায়ীভাবে সুইজারল্যান্ডে ১৯৩৭ পর্যন্ত বাস (ভিলনাভে ভিলা অলগার)। 'আমাশাঁতে' [বিমুগ্ধ আত্মা] উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ : ১ম খণ্ড 'আনেৎ ও সিলভি' দুই বোন'] (১৯২২) ; ২য় খণ্ড 'লেতে' [সুন্দরের পিয়াসী'] (১৯২৪)।

১৯২৩ - ১৯২৪ :—ভারতবর্ষ ও গান্ধী সম্পর্কে আগ্রহ ও গবেষণা। 'মহাত্মা গান্ধী' প্রকাশ (১৯২৩)।

১৯২৪—১৯২৬ :—'ল্য ভোয়াইয়াজ এঁ্যাতেরিয়ার' রচনা শুরু কিন্তু অসমাপ্ত।

—নাটক : 'ল্য জ্য দ্য লামুর এ দা লা মর' (১৯২৪) ;—'পাক ফ্লরি' (প্রকাশ—১৯২৫) ; 'লে লেঅনিদ্' (প্রকাশ ১৯২৯) ; 'আমাশাঁতে'-র ৩য় খণ্ড 'মের এ ফিস' ['মা ও ছেলে'] প্রকাশ—১৯২৭)।

১৯২৬, জানুয়ারি—৬০তম জন্মদিবস উপলক্ষে 'য়ুরোপ' পত্রিকার উদ্যোগে 'লিবের আমিকোরাম' প্রকাশিত।

২০ মে জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।—২২ জুন ইতালি-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।

১৯২৭—১৯৩১ ;·· 'দ্য লেরইক আ লাপাসিঅনাতা' (১৯২৯) ; 'গেৎ এ বেতভ্যা' (১৯৩০) ; 'লা ভী দ্য রামকৃষ্ণ' (১৯২৯) ; লা ভী দ্য বিবেকানন্দ' (১৯৩০)।

১৯৩০, আগস্ট—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ।

১৯৩১, ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধীর ভিলন্যভ আগমন।

১৯৩২—১৯৩৩ ঃ—এপ্রিল মাসে আমস্টারডামে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় বিশ্ব-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব। ১৯৩৩, এপ্রিল ঃ হিটলার চ্যানসেলার হওয়ায় জার্মান সরকার প্রদত্ত 'গ্যয়টে মেডেল' গ্রহণে অস্বীকার। ১ মে রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকান্ডের ধিক্কার। 'আমাশাঁতে' রচনা শেষ, ৪র্থ খন্ড 'লানোসিআত্রিস' (১৯৩৩)।

১৯৩৪ ঃ—দ্বিতীয় বিবাহ।

১৯৩৫ ঃ 'ক*্যাজ আঁ দ্য ক*বা' ও 'পাব লা রেভলু্যসিঅ*, লা পেই' প্রকাশ।—২৩ জুন সোভিয়েত রাশিয়া যাত্রা। গোর্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর বাড়িতে অবস্থিতি।

১৯৩৬ ঃ—প্রবন্ধ সংকলন 'ক*পাঞন' দ্য রুৎ'। জুন মাসে গোর্কির মৃত্যু।

১৯৩৭ ঃ—বিঠোভেনের পরবর্তী গ্রন্থ 'ল্য শাঁ দ্য লা রেস্যুরেকসিঅ*'।—৩০ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ইয়েনের ভেজলেয় বাড়ি ক্রয়।

১৯৩৮ ঃ—২৬ বছর পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন। জর্নাল' ও 'মোমোআর প্রকাশ—১৯৪০) ; 'রবেসপিয়ের' রচনা প্রকাশ – ১৯৩৯।

১৯৩৯ ঃ—জুলাই মাসে ফরাসী বিপ্লবের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কমেদি-ফ্রাঁসেইজ কর্তৃক 'ল্য জা দ্য লামুর এ-লা মরু' অভিনয়।

১৯৪০—১৯৪৪ ঃ—পারীতে বাসা ভেজলেয় অবস্থিতি—১৯৪১, ৩০ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এদম' প্রিভার মাধ্যমে ঠাকুর-পরিবারের বন্ধুদের শোকবার্তা জ্ঞাপন। ১৯৪২ ঃ 'লা ভোয়াইয়াজ এ*্যাতেরিয়ার' প্রকাশ। মৃত বন্ধু পেগ্যীর জীবনী রচনা। বিঠোভেন সিরিজের সমাপ্তি ঃ ১. 'লা নভিয়েমু স*্যাপানি' (১৯৪৩) ; ২. 'লে দেরনিয়ের ক্যাতুঅর' (১৯৪৩) ; ৩ 'ফিনিতা কমেদিআ ১৯৫৫)।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ রম*্যা রলাঁর মৃত্যু। প্রথমে ক্লামসিতে সমাহিত, শেষ ইচ্ছানুযায়ী পরে ক্লামসি থেকে ১০ কিঃ মিঃ দূরে ব্রেভ এর ছোটো একটি কবরখানায় স্থানান্তরিত।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

'পেগ্যী' (১৯৪৫) ; 'ল্য সাই, প্রসেদে দ্যু রোয়াইওম দ্যু তে' (১৯৪৫) ; 'ল্য পেরিপ্ল' (১৯৪৬) ; 'দ্য জাঁ-ক্রিসতফ আ কলা ব্রাঞ্চন' ; পাজ দ্য জর্নাল' (১৯৪৬) ; 'সুভনির দ্য জ্যনেস' (১৯৪৭) ; 'এ*্যাদ' (১৯৫১) ; ' জর্নাল দেজানে দ্য গ্যের' (১৯৫২) ; 'হেরমান হেস—রম*্যা রলাঁ ঃ ব্রিফ' (১৯৫১)।

পত্রাবলী

১. 'শোয়া দে লেতরু আ মালহ্বিদা ভন মেইজেনবাগ' (১৯৪৮) ; ২. 'করেসপদাঁস আঁতর লুই জিলে এ রম*্যা রলাঁ' (১৯৪৯) ; ৩. 'রিশার স্ট্রস এ রম*্যা রলাঁ, করেসপ*দাঁস, ফ্রাগমাঁ দ্য জর্নাল' ১৯৪৯) ; ৪. 'লা ক্লোয়াত্রু দ্য লা রু্য। দ্যুডল্ম' (১৯৫২) ; ৫. 'সেৎ আমারদাং' (১৯৫৪) ; ৬. 'প্রাত* রম*্যা' (১৯৫৪) ; ৭. 'উন আমিতিয়ে ফ্র*সেইজ' (১৯৫৫)।

নির্ঘণ্ট

(কেবল গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি নামের)

অ

অখণ্ডানন্দ ৪৩১, ৪৩৩
অটো, রুডলফ (Otto Rudolf) ২৩৬, ৪২৪
অৎলে (Otlet) ৩২৫
অর্দনে, পিয়ের (Herdner, Pierre) ২৫২
অধিকারী, ডঃ (জি. এম.) ৪৮৫
অন্নদাশঙ্কর রায় ২০৫
অবলা বসু (লেডী বসু) ১৯৭, ২০০, ২২০, ২৬০
অবিনাশানন্দ ৪৩৮
অব্যয়ানন্দ (মারি-লুইজ) ১৮০
অভেদানন্দ ১৭৬
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ২০, ২৫২, ৪১৩-৪১৪
অমৃত ষাস্থ্যখানি ৭৩
অল, বুল (Ole, Bull) ৪৪৭
অশোকানন্দ ১৯১, ১৯৩, ১৯৯, ২০২, ২০৫, ২৩৫, ২৪৩, ৪৪৫
অশোকাবদান ৭০
অরবিন্দ ঘোষ ৩২, ৫০, ১৩৮, ১৫৮, ১৭৪, ২০৩, ২০৪, ২২৩, ২৩৬, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৭, ২৯৮, ৩৭৩, ৪০২, ৪৩৪-৪৩৭, ৪৪৬
অম্বালাল সারাভাই ২১৬-২১৭

আ

আইনস্টাইন ১২৫, ২৫৭, ২৬১, ২৮৮, ২৯১, ২৯৯
আকবর (মোগল সম্রাট) ২৩
আগাখান্ ৩৬৩, ৪৯৭
আডামস্, জেন (Addams, Jane) ৪৯
আনসারি (ডাঃ) ৩৬৩-৩৬৫, ৪৬০, ৪৬২, ৪৯৫-৪৯৬
আনাগ্নিন, ইউজেনিও (Anagnine, Eugenio) ৬২
আনন্দকুমার স্বামী (ডঃ) ১৭, ১৮, ৩৫, ৫১২-৫১৪, ৫১৭
আন্তোনিনি, হেতি (Antonini, Hetty) ৩৭২
আবেল ২৫৪
আব্দুল বেহা ৫৫, ১৩৬, ১৬০
আব্দুল গফফুর খান্ ৩৬৪, ৪১৩, ৪৩৯, ৪৫৪-৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৭১, ৪৭২, ৪৮১
আমেনদোলা (Amendola) ১০৫, ১১০, ২৮৯, ৩২২
আমাইয়া, আমেরিকো (Amaya, Americo) ৭৩
আম্বেদকর (ডঃ) ৪৯০
আয়মেরলি (ডাঃ) (Haemmerli) ৬৮
আরকস, রনে (Arcos, Rene') ২৩৫
আরউইন (লর্ড) (Irwin) ৩৬০, ৩৬৪, ৪০৯, ৪৫৬, ৪৬৬, ৪৭১, ৪৭৭
আরিয়াস্ (Arias) (সাংবাদিক, আর্জেন্টিনা) ২৪০

আলম্‌ (ডাঃ) ৪৬২
আলবের্তীন ৩২৪
আলবঁ্যা মিশেল (প্রকাশক) ৫১৯, ৫২০
আলাভি, হার্তিন ৭৩
আলারিক ৫১৩
আলি (ভ্রাতৃদ্বয়) ৩৭, ৪৩
আলেকজান্ডার ১২৯
আসাজিওলি (Assagioli) ১০৯, ১৫০
আয়ার (রঙ্গ) ৪৮০

ই

ইডেন (ইংরেজমন্ত্রী) ৪২৮
ইডেন, ফ্রেডেরিক ভান (Eeden, Frederik Van) ২২
ইন্দিরা নেহেরু ৯৮, ১৭৩
ইবানেজ (ব্লাজকো) (Ibanez, Blasco) ৩৬৩
ইভান্স (Evans) ২৮১
ইস্ত্রাতি (Istrati) ১৪১, ১৫৮, ৪০৩
ইয়াসঁ্যাং, পের ১৮২

উ

উইলিংডন, বড়লাট ৩৩৬, ৩৪৬, ৪৫৬, ৪৬২ ৪৬৩, ৪৬৯, ৪৭৫
উইলকিন্‌সন, মিস. ই. ৩৭৮
উইলসন (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ৫৮, ২৭৮
উইট্‌কিন, জারা (Whitkin, Zara) ৩৯৫
উ্যগো, ভিক্তর (Hugo, Victor) ১৪০, ৫২৪
উন্‌রুহ্‌, ফ্রিট্‌সভন (Unruh, Fritz Von) ১২৫
উস্ত (ডিউক) (Aoste) ১২৩

এ

এঞ্জেলো, মাইকেল ৩৩৪
এডিসন, সেলর (Addison, Celar) ৩৫০
এডি (শ্রীমতী) (Eddy) ২২
এন্‌ড্রুজ, সি. এফ. ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫০ ৫৩, ৫৫, ৬১, ৬২-৬৪, ৬৬, ৭৬, ৮৫, ১২২, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৬১, ১৭০, ২১৭, ২২৪-২২৮, ২৩২, ২৫৩, ২৫৬-২৫৮, ২৬৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৪০১, ৪১১, ৪৫১, ৪৯০
এটাঁল ৪৭৭
এরবের, জাঁ (Herbert, Jean) ৪৩১, ৪৩৪-৪৩৭, ৪৪৫-৪৪৭, ৪৫১, ৫১৯, ৫২০
এরবের (শ্রীমতী) (Mile. Reymont) ৪৪৫-৪৪৭, ৪৫১
এরহেনবুর্গ, ইলিয়া ৩৮৭
এমারসন (ভারত সরকারের সচিব) ৩৫৭
এলিজা ৯৩
এলমহার্ষ্ট, এল. কে. ৭৬, ৮৩-৯০, ১৫৪, ১৬৬, ২৩৭
এল্‌উইন (Elwin, Fr.) ৩৫৮-৩৬১, ৩৬৪, ৪৬৪, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৯-৪৮১
এঙ্গেলস (Engels ৪২৭
এরিও, এদুয়ার (Herriot) ৮০

ও

ওকাকুরা ১৫৮, ১৮৮, ৪৫২
ওঙ্কার ঠাকুর ৪৭২-৪৭৩
ওয়েজউড, বেন (Wedgewood, Ben) ৪৯৮
ওয়েলস (Wells, H. G.) ৩৩০
ওয়েলক (Wellock, Wilfred) ৫৪
ওয়েলিংটন ৩৫৫

ওল্ডেনবার্গ (Oldenburg) ৭৮

ক

কবীর ২২, ৫১
কনেল, ফ্রানসিস, জে, এম. ৩৭৬
করসিনি (Corsini, Comte) ৫৩
কস্তুরবা গান্ধী ৪৩, ৪৬, ৫৯, ২৪১, ৩০২, ৩০৯, ৩৪১, ৪৬২
কাইজারলিং (কাউন্ট হেরমান) ৫১৩
কাজিন্স, শ্রীমতী (Cousins) ৩৫২, ৩৫৪
ক্রাইলেংকো ২৬৬
কাভিল্লা, মারেশাল ৩৩১
কাতায়ামা ২৪৬
কার্নেভালি, কাউন্টেস ২৮৩, ৩৩৪
কার্পেলে (Karpele`s, Andre'e) ২৯, ১৩৪, ১৬৫, ২৩৬, ২৩৮
কারাজি ৭৫
কারজন, লর্ড ৫৮, ১৩৫
কালিদাস নাগ ৩৩-৩৬, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৫-৪৮, ৬০-৬১, ৬৫, ৬৮-৭০, ৭৭-৭৮, ৮২, ৯০-৯২, ১৫৬-১৫৭, ১৬৮, ২৪৬-২৫০, ২৫৮, ২৬১, ৪৩৪
কালিদাস, কবি ৩০৯
কারাজি, কে. এল. ৭৫
কালেলকার, অধ্যাপক ৬৩, ৬৭, ১৬৯, ৩৩৬, ৪৬২
কালভে, এমা (Calve', Emma) ১৮২, ১৯১
কিপলিং, রুডিয়ার্ড ২৪, ২২১
কিফায়েতুল্লা, মুফতি ৪৭৩
কিংসলে, মার্টিন ৪৭৭
কিরুচিন, রুশ অধ্যাপক ৩৬৫
কিশোরীলাল ঘোষ ৪৮৫
ক্রিস্টিন (ভগিনী) ১৭৬, ১৮১, ১৮৯, ১৯২, ২০৫, ২১৯, ২৪৪
ক্রুপি, লুইজ (Cruppi, Louise) ৪৭, ৯২
কৃপানন্দ (Landsberg Lenon) ১৮০
কৃষ্ণ মেনন ৪৯২
কৃষ্ণমূর্তি ৪১২
কৃষ্ণ রাও, এ. এল. ৪১৬-৪১৭
কে, এলেন ৯২
কেলগ, পল
কেলাস, জন, রেভাঃ ৪৭৬
কেলাম্পন ৩৬৮
কেলের, মাদাম (Keller, Madame Von) ২৪২-২৪৪, ২৪৫, ২৪৬
কেলভিন, লর্ড ১৯৭
ক্রোচে, বেনেদেত্তো (Croce, Benedetto) ১০১, ১০৯, ১২৩, ১৩১, ১৩৩
ক্ষিতিমোহন সেন ৫১, ৬৫

খ

খান্ডওয়ালা, টি. সি. ৩৯৫

গ

গণেশন, প্রকাশক ৩৬, ৪৩, ৬১, ৬২, ৬৮
গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ) ২৪, ২৬, ২৭, ৩৫, ৩৬-৪৭, ৫০-৫৪, ৫৬-৫৯, ৬১-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭-৮০, ৮৬, ৯৩-১০০, ১০৫, ১০৬, ১১২, ১১৪, ১২২-১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৪৪, ১৫২-১৫৫, ১৫৯-১৬৫, ১৬৮-১৭১, ১৭৩, ১৮৮, ১৯৮, ২০৬-২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২৯-২৩১

২০০, ২০৬, ২০৮, ২৪০-২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮-২৬০, ২৬২-২৬৬, ২৬৮-২৭২, ২৭৪-২৭৭, ২৮০-২৮৬, ২৮৮-২৯১, ২৯৩-৩০৬, ৩০৮-৩৩০, ৩৩২-৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০-৩৪৭, ৩৫০-৩৫৬, ৩৬১-৩৬২, ৩৬৫-৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮০-৩৮৫, ৪০০-৪০৪, ৪০৫-৪০৬, ৪০৭-৪০৮ ৪২১-৪২৩, ৪৪০, ৪৪৭-৪৪৯, ৪৫০, ৪৮৮-৪৯০, ৪৯২-৪৯৫
গ্রামশ্চি (Gramsci, Antonio) ৪১৬
গ্লাজনাপ (Glasenapp) ৪২৪
গ্ল্যাডস্টোন ৫৮
গিজো, দেনিজ (Ghiso, Denise) (রাসেলসের নার্স) ২৬৬, ৩৪৮-৩৪৯, ৪০১
গ্রীনউড, এ. ভি. ৪২৮
গ্রীনস্টাইডেল (ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য)
গুজ, জে.-ই. (Goudge, J.-E.) ২৬৬
গুডউইন (Goodwin) ১৮০
গ্লুক (Gluck) ১০১, ১১৭, ১১৮
গুাইয়েস (গীইয়েস) (Guieysse, Louisette) ২৭৫, ৩২০
গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য)
গেডেস, প্যাট্রিক ৬৬, ৬৯, ১১৮, ১৯০, ৩৪৭
গেহিব, পল (Geheeb, Paul) ৪২৪, ৪২৫
গ্যেটে (গ্যয়টে) ৩৪, ১১৮, ১২০, ২০৩, ৩১০
গ্যেরাঁ (Guerin) ৩২৪
গ্রেভস, মিস ২৫২
গোর্কি ২৫, ৩৮১, ৩৮৭
গোখেল ৪৬
গোপেন চক্রবর্তী ৪৮৫

ঘ

ঘাটে, এস. বি. ৪৮৫

চ

চমনলাল, দেওয়ান ৩৪৪
চার্চিল, উইনস্টন ৪২, ৪০৮
চিত্তরঞ্জন দাস ৭৪, ৭৭
চেট্টিয়ার ৪৫০
চেম্বারলেন, হাউসস্টন স্টুয়ার্ট ১০৯

জ

জগদীশচন্দ্র বসু ৬২, ৬৪, ৬৯, ১৫৪, ১৭৬, ১৯৩-১৯৯, ২১৯, ২২০-২২৪, ২৬০-২৬১, ৩৪৮, ৪৩৯-৪০, ৪৪৬
জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ১৫৪
জহরলাল নেহেরু ৯৮-৯৯, ১৬০-১৬১, ১৭৩-১৭৪, ২৩৮, ৩৪৫, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৯১, ৪০৪, ৪০৬, ৪১৩, ৪১৬, ৪১৮, ৪২০, ৪২৫-৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৮-৪৩৯, ৪৪১-৪৪৭, ৪৭৩, ৪৯৬, ৫০০-৫০৪
জাগের (Jager) ৪৯২
জাঙ্গের, অধ্যাপক (Zangger) ১২০
জাহারুফ (সার বেসিল) ২৭৮
জানোত্তি-বিআঙ্কো, উমবের্তো ১০৫, ১১৭, ২৮৪, ২৮৬
জানদার্ক (Jeane d'Arc) ২০৮
জিদ, আঁদ্রে (Gide, Andre') ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৭, ৫০৪
জিবার্তি ৩৭০, ৩৮৭
জুইগ, স্টেফান(Zweig, Stefan) ৩১,৯১

জ্যুভ, শ্রীমতী (Jouve, Madame) ৩১৩
জ্যুরদ্যাঁ, ফ্রাঁসি (Jourdin, Francis) ৪৩৮
জেন্তিলে ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ৩১৩
জোসক্যাঁ দেস্‌প্রে (Josquin Des pre') ১১৯
জোহা ১৫৪

ড

ডাঙ্গে, এস. এ. ৪৮৫
ডেটেরডিং ২৭৮

ত

তমা, আলবের (Thomas, Albert) ৩০৬, ৩১২
ত্রৎস্কি ৩৮০
তলস্তয় ২৪, ২৬, ২৭, ৩৭, ৫১, ১৮২, ১৯১, ২০৪, ২১৬, ৩০৮, ৩২৪, ৩২৮, ৩৭১, ৪৪৮
তাকাতা, জাপানী ভাস্কর ২৯০
তানসেন ২৩, ২৪
ত্রাফেল্লি, লুইগি, অধ্যাপক ১৫২
তিলক, বালগঙ্গাধর ৪৭, ৫১, ৫৬, ৬৭, ৯৩, ১০৮
তুচ্চি, অধ্যাপক (Tucci) ১০৭, ১০৮, ১৬৬, ২০৬
তোয়েপলিজ, মাদাম (Toeplitz) ২৮৩
তোতাপুরী ৫২১
তোরেস, আয়াদেলিয়া (Torre, Haya Della) ৭৬, ৮৮, ১১৯

থ

থেরঁদ, আর, ডঃ ৪৮৫, ৪৮৬

দ

দত্তরেভাঁস্ক ২৪
দাদাভাই নওরোজি ৪৬৩, ৪৭০
দানিয়েল্‌ (Danielou) ৩৬৯
দান্তে ২৬
দালাদিয়ে (Daladier) ৪৯৯
দিলীপ কুমার রায় ২৩ ২৫, ২৮, ৩৬-৩৭, ৫৯
দ্যুআমেল, জর্জ (Duhamel, Georges) ১২৬-১৩১, ১৩৪, ১৪০, ১৪৫, ৭৯, ২০৩-২০৫, ৩০৭-৩৭৪, ৪৩৫
দ্যুচে (মুসোলিনি দ্রষ্টব্য)
দ্যুপ্যাঁ, জর্জ (Dupin) ২০
দ্যুশেন (Duchene, Gabrielle) ৫৮
দেবদাস গান্ধী ২৭৬, ৩০১, ৩১২, ৩২৭, ৩৩৯
দেব্যুসি, ক্লদ (Debussy) ২৭
দেমিয়েভিল, ডাঃ (Demieville) ১৩৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১
দেসপার, শ্রীমতী (Despard) ৪৮৬
দোদে, লেও (Daudet, Le'on) ১৩২

ধ

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৫৭-১৬০, ১৭৪, ১৮৪, ১৯০, ১৯১, ২০১, ২১৯, ৪৪৫-৪৪৬
ধরণী গোস্বামী ৪৮৫

ন

নটরাজন ২২৪, ২৩২-২৩৪
ন্যানসেন ৩৬৯
নায়ার, কে., শ্রীমতী ৪২৪
নারায়ণ স্বামী ২২৪, ২৩২, ২৩৩
নারায়ণ, কোলেনগাদের কুমার মেনন ১৭০
নিউম্যান, অটো ৭০
নিবেদিতা (ভগিনী) ১৭৪, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯ ৩৩৬, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৫২
নিংশে ১২৫, ২০৩

নেপোলিয়ন (Napole'on) ১২৯, ১৩০, ১৫০
নোবেল, মার্গারেট (নিবেদিতা দ্রষ্টব্য)

প

পণ্ডিত, আর. এস. ১৬০-১৬১
পল, এ. এ. ২২৮-২২৯, ৩৯৫
পল, কে. টি. ১৪৪, ১৫২-১৫৪, ১৫৯, ১৭০-১৭৯
পশা, ক্ষামরো পেস্টনজি ৫৯
পাদ্, ১৬ শতাব্দের কবি ৫২
পালামাস, কস্তিস ২৪৮, ২৫৮, ২৬১
পালামাস, নোসিকায়া ২৫৮
পাসকাল ২০২, ২৭২
পাস্তেরনাক, বরিস ২৫৪
পাহাড়ী বাবা ১৮৫
পিয়র্সন, ডরোথি ৫৩
পিয়র্সন, ডব্লিউ. ডব্লিউ. ৪৫-৫১, ৫৩-৫৪, ৬৬, ২২৬, ২২৮, ৪৪০, ৪৫১
পিরানদেল্লো ৩৬৯
পিলনিয়াক, বরিস ৩২৫
পিল্লাই, পি. পি. (ডঃ) ৩৪৪
পূরণচাঁদ জোশী ৪৮৫
প্রজ্‌জিলাক, জে ৭০
প্রিভা, এদম্‌ (Privat, Edmond) ২৬৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৮২, ২৯০, ৩১১, ৩২০, ৩২২, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৬-৩৪৪ ৪০৮, ৪৫৯, ৪৭৭
পেগ্যী, শার্ল (Peguy, Charles) ৫১৯
পেরে, ডাঃ (Perret) ২৯০
পেলেট, মাদাম. ই. ফন ২৪৫, ৫১৮, ৫১৯, ৫২১
পেলিও (Pelliot) ২৫৮
প্রবস্ত, অধ্যাপক (Probst) ২৩৯
প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ ৯৪, ১০০, ১০২ ১০৩-১১০, ১১৫-১১৭, ১৪০, ১৪৬, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭
প্রতিমা ঠাকুর ১০০, ১০২, ১১০, ১১১, ১২৫, ১২৮, ১৩৪, ২১৮
প্রেমানন্দ ২৪২
প্লেটো ৪৩
পোর্টল্যান্ড, লর্ড ৩৪৬
প্যাটারসন, মার্কিন কনসাল ১৮৪
প্যারেলাল ২৭৬, ৩০১, ৩০২, ৩১১, ৩১২ ৩১৪, ৩৪০, ৩২১, ৪৯০

ফ

ফর্মিচি, ১০৭-১০৯, ১২৬, ১৩১, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৬৬, ১৬৭, ২০৭ ২০৮, ২৮৩, ২৮৬
ফরেল, অগ্যুস্ত (Forel, Auguste) ১২০ ১২৪, ১৯৪
ফ্রাঁস, আনাতল (France, Anatole) ২৭০
ফ্রাঁসোয়া, আলেকসি (Fracois, Alexis) ৩৮
ফিলিপ, আঁদ্রে (Philip, Andre') ২৪০
ফুলপ-মুলার ১২০
ফ্যুশে, অধ্যাপক (Fouche') ৪৩১
ফেরিয়ের, ডঃ (Ferriere) ১৩৬
ফেরিয়ের, আদলফ (Adolphe) ১৩৬, ১৩৭
ফ্রেজার, স্যর জেমস ১৩৪, ১৩৫
ফোর্ড, জুলিয়া এলসওয়ার্থ ৯৫-৯৬

ব্লক, জাঁ-রিসার (Bloch, Jean-Richard) ২৩৪, ২৩৫
ব্রকওয়ে, ফ্রেনার ৩২৬, ৪৫৪

বতিচেল্লি ৩৩৪
বনসেল্স, হ্বালডেমার ৫৪
বনফিল্ড, মার্গারেট ৫৯
বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য)
বশী সেন ১৭৬, ১৯৩, ২০৫, ২১৮-২২০
বাখ ২৭, ৭৫, ১২১, ২০২
বাজালজেৎ (Bazalgette) ৫১৩
বাপু (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দ্রষ্টব্য)
বারব্যুস, আঁরি (Barbusse, Henri) ৩৩, ৭৯, ৩৮২, ৩৮৭, ৫০৯
বারেস্তো, ফ্রান্সিসকো আদেওদাতো ৯৩
ব্রজেন্দ্রকিশোর, কুমার (লালু কর্তা) ১১৫, ১১৬, ১২৪
ব্রাউন, ব্রুনহাম ২৩১, ২৭৪, ২৮৮
ব্রাউনিং, রবার্ট ৪৪০
ব্রাবানক্ক, আঞ্জেলিকা ১৪৬
বিঅর্নসন (Bjornson) ৫১৩
বিজয়ানন্দ ৩৫৬-৩৫৮
বিঠোফেন ২৭, ৭৫, ১১৭, ৩০৮, ৩১১, ৫২২
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ১৬০
বিনোভা, শ্রী ৪৬২
বিরুকফ, পল ৫১
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩০, ২৩২
বেনোয়া, এফ, অধ্যাপক (Benot) ৬৫
বেসান্ত, আনি ৪৭, ৭৫, ২০৩
ব্রেমঁ, আঁরি (Bremond, Henri) ২৫০, ২৫১
বোদুয়াঁ, শার্ল, (Baudouin, Charles) ১১১, ১১৫, ১৪১, ৪৩৮
বোয়া, জুল (Bois, Jules) ১৮২, ১৮৭
বোরা, মার্কিন সেনেটর ৯৫, ৩১৭
বোশে (Bauchet) ৩১৭
বৈদ্য, ডঃ এস. কে. ৪৬২
বয়ার (Bojer) ৫৬৯
বিবেকানন্দ ১৫৭-১৬০ ১৭৪-১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৯, ২০১, ২০৫, ২০৮, ২১৮ ২২০, ২২৫, ২২৯, ২৩৩, ২৪৩, ২৫০, ২৫২, ২৬৭, ৩২৩, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৬৮, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪০১, ৪৩৬, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৫২, ৪৮০, ৫২০, ৫২২
বুকানন, মার্কিন সাংবাদিক ১৫৫
বুখারিন, নিকোলাস ৫৮৭
বুভিয়ে, বের্ণার ৩৮
বুলগাকফ ৬৫
বের্গসঁ (Bergson) ৩৬২, ৪০২
বের্তালঁ, ভ্রাতৃদ্বয় (Berthalon) ২০৬, ২০৮
বেত্রোলান, মাদাম সোফিয়া ৩০০, ৩২০, ৩২৪, ৩২৯, ৩৫০

ভ

ভাগনার, রিচার্ড ১৭, ১০৩
ভান্দেকর, মাদাম মিলিস ২৩০
ভালেরি, পল (Vale'ry, Paul) ২৫৫
ভাসকনথেলোস, জোসে ৭৩, ৭৬
ভিয়ার্তাকিন ৪০৩
ভিঁশি ১০৩, ২০০
ভিক্টোরিয়া ১১৯
ভোতিয়ে, ডাঃ (Vauthier) ২৯৬

ম

মণিলাল প্যাটেল ২৩৬
মণীন্দ্রলাল বসু ২০৫

মতিলাল নেহেরু ৯৮, ২৫৮, ২৬০
মদনমোহন মালব্য ৩৩৭, ৩৪৫, ৪১৪, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৫, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৭
মনাস্তিয়ে, এলেন (Monastier, Helene) ২৯৩, ৪০৬
মনাৎ (Monatte) ২৮০, ২৯০, ৩১৪, ৩২৪
মন্তেসরি, মাদাম ৩২১
মনো-এরজেন, এদুয়ার (Monod-Herzen) ৩৫, ৪৭
মনো-এরজেন, গাব্রিয়েল ৭৫, ২০০
মরিস (জেনেরাল) ২৮৬, ৩০০, ৩২০, ৩২২, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩১-৩৩৫, ৩৩৮, ৩৫০
মরেল, ই. ডি. ৪২, ৯৫, ৩৩০
মর্গান, জোনস ৪৭৭
মহেন্দ্রপ্রতাপ, রাজা ১৭১, ১৭২
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮
মহেন্দ্রনাথ সরকার ৪০২
মাত্তেওতি ১১০, ১৪৬, ৩২২
মাদলিন, রলাঁ ১৮, ৭৭, ১১১, ১১৫, ১২৫, ১২৮, ১৩৪, ১৪১, ১৪২, ৩৬৭, ৪০৮, ৪২১, ৫০৫, ৫০৯
মাধব রাও ৪৫২
মার্কস, কার্ল ১২০, ৩৬১, ৫২০
মার্তিনে, মার্সেল (Martinet, Marcel) ১০০, ১১০, ১২৫, ১৪০, ২৩৪
মায়াদেবী গঙ্গোপাধ্যায় (এম. ডি. জি.) ৪০৪-৪০৫
মারী, রলাঁ ২৭৬, ২৮২, ২৯০, ৩১৪, ৩৮৩, ৪২৭, ৪৪১
মারী, ইতালীর রাজকুমারী ৩৩৫
মারিচি, এইচ. ১৬৮
মারেনি, ক্লেমাঁত ৩৫০
মালরো, আঁদ্রে (Malraux) ৩৭০, ৩৮৭
মালহ্বিডা মেইজেনবার্গ ১২৫, ১৫৪
মালাঁ, লিদি (Malan, Lydie) ১১৯
মাসঁনুর্সেল, পল (Masson-Oursel) ৫৪, ৭০, ২৫৮, ৩৬২, ৪০১
মাসারিক, প্রেসিডেন্ট ১৪৪
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামসে ৫৫, ৫৮, ৮০, ৯৬, ২৫৬, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৬, ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৪, ৪৫৩, ৪৫৬, ৪৮৬
ম্যাকলেওড, মিস ১৭৪-১৭৮, ১৮১-১৮৫, ১৮৮, ১৯০-১৯১, ২৪২, ২৪৩, ৪৩১, ৪৩৬
ম্যাকনিলে ১৮৪
ম্যাটারস, লিওনার্ড ৪৯২
ম্যাডক, মেজর ৫৯
মিনু মাসানি ৪২৮, ৪২৯
মিরাজকর, এস. এ. ৪৮৫
মিরিয়াম (শ্রীমা) ৩২, ৩৭৩, ৪৩৫, ৪৩৭
মীরা বেন (মাদলিন শ্লেড দ্রষ্টব্য)
মুঞ্জে, ডাঃ ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৯২
মুজফ্‌ফর আহম্মদ ৪৮৫
মুনজেনবার্গ, হ্বিলি ২৯০, ৩৭০
মুলার, হেনরিয়েটা ১৮১
মুর, মিস এ্যামি ৪৮১
মুসোলিনি (দুচে) ১০১, ১০৭-১০৯, ১১৭, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪৯, ১৫১, ১৬৩, ১৭১, ১৯৫, ২০৭, ২৮২-২৮৪, ২৮৬, ৩২০, ৩২১, ৩২৮, ৩৩১-৩৩৪, ৩৩৫, ৩৫০, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯২, ৪০২, ৪১৪, ৪১৬ ৫১১
মেয়ো, মিস ২০৩
মোদিগ্লিয়ানি ১৪৬

য

যতীশ্বরানন্দ ৪২৩-৪২৪
যোগলেকর ৪৮৫

র

রনাঁ (Renan) ৪৫
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭-২৮, ৯৩, ১০২, ১০৬. ১০৭, ১৬৭, ২১৮, ২০৭, ২৩৮
রনাজ্ঞ শাবানি ২৬২-২৬৩
রনিজে, এমিল (Roniger, Emil) ৪৭, ৮১. ৯১, ৯৪, ১২৬, ২২৮, ১৩২, ১৬৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫-৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২. ৪৩-৪৫, ৪৯, ৫৩, ৫৭, ৬০-৬১, ৬২, ৬৫-৬৬, ৬৯, ৭১-৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮০-৮৫, ৮৭-৯২, ৯৩-৯৪, ৯৬-৯৭, ১০০-১০৯, ১১১ ১১৫, ১১৭-১১৯, ১২০-১৩২, ১৩৩-১৩৪, ১৩৫-১৫১, ১৫৩, ১৬১-১৬৩, ১৬৬-১৬৭, ২০৩. ২২৬-২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৬-২৩৮, ২৪৬-২৪৮, ২৫২-২৫৮, ২৬১-২৬২, ২৭০, ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ৩৩৭, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৬৯, ৩৮০, ৩৮২. ৩৮৬, ৩৯৬, ৪০৪, ৪১৩, ৪৪০, ৪৬১, ৪৮৯-৪৯০, ৫০৭, ৫১৩, ৫১৪
রাজা রাও ২৫০, ২৫৩, ৩৪৪, ৪১৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদ. বাবু ২১৭-২১৮, ৩৯৬, ৪৬০
রাদিৎচ ২৩০
রাধাকৃষ্ণাণ ৪১৮, ৪৪৭
রাধারমণ মিত্র ৪৮৫
রানা, এস. আর. ৭৬, ২৫১
রাণী মহলানবীশ ১০১, ১০৪, ১১৫, ১১৯, ১২৮, ১৩৬, ১৪১, ১৪২
রামকৃষ্ণ. পরমহংস ১৫৩. ১৫৭-১৬০, ১৭৪, ১৭৬-১৭৮, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৩, ২০১, ২১৯, ২৪৯, ২৬৬, ২৭০, ৩২৩, ৩৫০, ৩৫৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৮০, ৫১৮, ৫২১-৫২৪
রামমনোহর লোহিয়া ৪৩২
রামমোহন রায়, রাজা ২৩১, ২৫৩, ৩৮৪
রামাইয়া নাইডু ৭৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৫৪, ১৬৭, ১৬৮
রাসেল, বার্ট্রান্ড ৩০, ৩২৬, ৪৫৪, ৪৭৭, ৪৯২
রিচ্চিওত্তি-গ্যারিবলদি ১৬৩
রিড, জন ২৬৬
রিডিং, লর্ড ৬৮
রিশার, পল ৩১-৩২, ৫০, ৫৫-৫৮, ৭৩, ৭৫, ৯৩, ২০৩, ৪০৫
রিশানন্দ (?) ৩০৯
রুজভেল্ট, শ্রীমতী ৪০৮
রুডলফ, অটো (Rudolf, Atto) ২৩৬
রুশো ৪৪৮
রেও, লুদোভিক ৪১১
রেনল্ডস, রেজিনাল্ড ২৪১, ২৫৭, ২৫৯, ২৬২, ৩৭৪, ৪৮১
রেমঁ, মাদমোয়াজেল (Reymont) ৪৩৪, ৪৩৬
রেনোদেল (Renaudel) ৫৮
রেমস্ত, স্তানিশ্লাভ ৯২

ল

লয়েড-জর্জ ৩৫৬, ৪০৮, ৪২৯
ল্যান্সবেরি, জর্জ ৪২৯, ৪৭৩
ল্যাস্কি, হ্যারল্ড ৩২৬, ৪২৯, ৪৭৭
লিটন, লর্ড ১০৯

নিয়ন, ইউজেন ৩৯০
লেনিন ১২০, ২৬৩, ২৬৬, ৩৩০, ৩৪৯, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৯০, ৪০১, ৫০৭, ৫২০, ৫২৪
লেভি, সিলভ্যাঁ ৩৩, ৪৭, ৭০, ২৫৮, ৩৬২
লেস্টার, মুরিয়েল ২৮১, ৩১৩, ৩২০
লোথিয়ান, লর্ড ২৮৭

স

সম্মুখম চেট্টি ৩৪৪
সাইমন ২২৬, ২৩০
সারদা দেবী ১৭৭, ১৮৩
সারদানন্দ ১৭৬, ১৮৩, ২০১
সালভাদোরি, অধ্যাপক ১৪০, ১৪৪
সালভাদোরি, শ্রীমতী ১৪৫, ১৪৬
সালভেমিনি ১০৫, ১১৬, ১৩১, ১৪০, ১৪৪ ১৪৬
স্যামুয়েল, হোর ৪০৮
স্যাংকে, লর্ড ৩৬০
সিদ্ধেশ্বরানন্দ ৪৪৫, ৪৪৬
সিনক্লেয়ার, আপটন ২৬৫
সুন্দরম ৪১৫
সুপো (Soupault) ৭৮
সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৯, ২৭০
সেনার (Senart) ৭০
সেনো (Senaud) ১৫২
সেরভিয়ের (Servier) ১৮১, ২৬৭
সেনেশাল (Se'ne'chal) ৩৯৯
সেরেজোল, পিয়ের (Ceresole) ২৯০-২৯২, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০৬-৪০৮, ৪১৪-৪১৫
সোপেনহাওয়ার ২১৬
সোহনসিং জোশ ৪৮৫
সুভাষচন্দ্র বসু (চন্দ্র বসু) ৪১৭-৪২০, ৪২৫, ৪৩০-৪৩১, ৪৪১, ৪৫২
সৈয়দ, এম. এইচ. (ডঃ) ৩৬২, ৩৬৫, ৪০২
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৩-৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩-৩৯৫, ৩৯৭, ৪০৪, ৪০৯, ৪১৪, ৫০৪-৫১১
স্কার্পা ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৬, ৩১২, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৫০
স্কোত্তি, ডিউক (Scotti) ১০৭, ১০৯, ১২৬
স্টাইনার ৭২
স্টাণ্ডেনাঠ, মাদাম ২১৮
স্তারাচে ৩২১, ৩৩৫
স্তালিন ৩৪৯, ৩৫১, ৩৮৭
স্নোডেন ৩২৬
স্পেঙ্গলার ৫০৭
স্পিটলার ২৪৮
স্টিড, উইলিয়ম ১৮৬
স্প্র্যাট, ফিলিপ ৪৮৫
স্মাটস, জেনারেল ৪৬
স্লেড, মাদলিন (মীরা বেন) ৫১, ৯৫-৯৭, ১৫৫, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৮৮, ২০৬-২১০, ২১২, ২১৩, ২৪১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৯৬, ৩০০, ৩০১-৩০৪, ৩১৯, ৩২০, ৩২৬, ৩২৯ ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৬১, ৪০৫, ৪০৮-৪১০, ৪১১, ৪১২

শ

শ, বার্নার্ড ২৮৭, ৩৩০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৫, ১১২, ১৫১
শান্তা চট্টোপাধ্যায়, (নাগ) ১৩৬

শাপুরজি সাকলাতওয়ালা ৩৭১
শার্দূল সিংহ ৪৬২
শ্রাম, এরিখ ৩১৮
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৫
শিবানন্দ ১৭৬, ২০১, ২২০, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৬৬, ৩৩৭, ৩৪৮, ৩৫৬-৩৫৮, ৪৩১, ৫১৮
শুবার্ট ২১৮
শ্লেমের ১০০, ২৯৬
শেষাদ্রি, পি. ২৬৯
শ্‌হেবইট্‌জের, আলবার্ট (Schweltzer) ১৫৬, ৩৫২-৩৫৩

হ

হগমান ২৩৬
হরি সিং গৌড় ৪৬৫
হর্থি ১৬৭
হাইনে ৩৪
হাউসমান, লরেন্স ৩২৬, ৪৫৪, ৪৮১, ৪৯২
হাচিনসন, লেস্টার ৪৮৫
হার্ডি, টমাস ২৪, ২১৬
হাতোশি ১৩৯
হাম্পস্টেড ৪৬৩
হ্যামসুন, ক্নুট ৩৬৯
হ্যালিফ্যাক্স, লর্ড (আরউইন দ্রষ্টব্য)
হিটলার ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯০, ৪১৬, ৪৫০, ৪৫২, ৫১১
হিন্ডে, কুমারী ৭৫
হিরণ্ময় ঘোষাল ২২৬
হিরাসাওয়া ৭৩
হিবনটারনিজ, অধ্যাপক (Winternitz) ৫২, ১৪৬
হুইটম্যান ৫১৩
হের্লবিগ ৩৩১-৩৩৬, ৩৩৮, ৩৫০
হেস, হেরমান ৪১, ৭৮, ৫১৩
হোমস, এইচ. ডি. ৯৫, ১৪৪
হোর, স্যামুয়েল ৩৩৮, ৪০৮, ৫১৪
হোরাপ, শ্রীমতী ৪০৪, ৪০৪

সংশোধন

পৃষ্ঠা ২১। লাইন ১০ ;

'রবীন্দ্রনাথ বাস্তব সম্বন্ধে মোটেই'—পরিবর্তে পড়তে হবে 'রবীন্দ্রনাথ **বর্তমান** সম্বন্ধে মোটেই'।

পৃষ্ঠা ৫২। লাইন ৩ ঃ

'দ্রষ্টা দাদু'—পড়তে হবে 'দ্রষ্টা **পাদু**'।

পৃষ্ঠা ৯৮। লাইন ২০ ঃ

'তাঁর ছয় বছরের মেয়ে'—পরিবর্তে 'তাঁর **সাত** বছরের মেয়ে'।

পৃষ্ঠা ১০২। লাইন ২২ ঃ

'যাদুকর ব্ল্যাববার্ড'গুলো'—'যাদুকর **ব্ল্যাকবার্ড** গুলো'।

পৃষ্ঠা ১০৯। লাইন ২৮ ঃ

'হাডসন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন'—পড়তে হবে '**হাউসস্টন** স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন'।

পৃষ্ঠা ১১৫। লাইন ২৩ ঃ

'দূরগত ও অনপেক্ষিত সংক্রমণে'—পরিবর্তে পড়তে হবে 'দূরগত ও অনপেক্ষিত **পরিবর্তনে**'।

পৃষ্ঠা ১৫১। লাইন ১৬ ঃ

'গুরুনিজেলের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়লাম'—পরিবর্তে পড়তে হবে '**গুরুনিজেলে পড়লাম**'।

পৃষ্ঠা ১৫২। লাইন ২৩ ঃ

'আফেল্লির'—পরিবর্তে পড়তে হবে '**ব্রাফেল্লির**'।

পৃষ্ঠা ৫২৫। লাইন ৩২ ঃ

'ক্লতিল্দ ব্রেআলের'—পরিবর্তে পড়তে হবে '**ক্লতিল্দ** ব্রেআল'।